ॐ

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

মহাভারত

ও

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

(প্রথম খণ্ড)

আচার্য – স্বামী সমর্পণানন্দ

অনুলিখন ও সম্পাদনা – অমিত রায় চৌধুরী

Talks delivered by Swami Samarpanananda on Mahabharata before the students of Indian spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math

Year - 2011

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

মহাভারত ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

(প্রথম খণ্ড)

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Mahabharata* before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math in the year 2011
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য জানার প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক ভারতবাসীকে বিশেষ করে যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে চাইছেন তাঁদের সবাইকেই ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানা অত্যন্ত আবশ্যক। ভারতের আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যকে জানার আগে বুঝতে হবে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানার প্রয়োজনীয়তাটা কেন আসছে। স্বামীজী তাঁর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ বাবুর কাছে একদিন দুঃখ করে বলছিলেন – আগেকার দিনের লোকেরা তাদের চৌদ্দ পুরুষের বংশ পরম্পরার নাম জানতেন, কিন্তু এখনকার দিনে কেউ সাত পুরুষের নামও ঠিক মত জানেনা। এটা স্বামীজীর সময়কার হিসাব। ইদানিং কালে আমরা তিন পুরুষের নামও বলতে পারবো না। স্বামীজীর কথা শুনে প্রিয়নাথ বাবু বলছেন, পূর্বপুরুষদের নাম জেনে কি লাভ? এই কথা শুনে স্বামীজী প্রিয়নাথ বাবুর উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন।

এখনও বৈবাহিক সম্বন্ধ করার আগে উভয় পক্ষই পরস্পরের গোত্রের খবর নেয়। এই গোত্র থেকেই জ্ঞাতি এসেছে। গোত্রের ধারণার মধ্যেই বংশ পরম্পরার ঐতিহ্যের ধারাটাকে নিয়ে আসা হচ্ছে। গোত্রের মাধ্যমে আমরা কারুর বংশের ধারাটা কোন্ ঋষি বা মুনি থেকে আসছে, অর্থাৎ সেই বংশের উৎসকে জানবার চেষ্টা করি। গোত্রের দুটো পরম্পরা ছিল, একটা পরম্পরাতে দেখা যেত কোন একজন বড় ঋষি ছিলেন, সেই ঋষির থেকে পরম্পরাগত ভাবে যে সন্তানরা এসেছেন, তারাই পরের দিকে নিজেদের সেই ঋষির নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বললেন আমাদের এই গোত্র। দ্বিতীয় পরম্পরা হচ্ছে গোত্র পরিবর্তন। গোত্র পরিবর্তনে একজন বললেন, আমি অমুক বংশে জন্ম নিয়েছি, কিন্তু আমি অমুক ঋষিকে গুরু রূপে বরণ করলাম এবং এই গুরু থেকে আমার গোত্র পরিবর্তন হয়ে গেল। গুরুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়ার পর বলে দিল – ইনিই আমার গুরু আর এইখান থেকেই আমার গোত্র শুরু। ভারতে একটি গোত্রকে একটি পরিবার বলেই সবাই মনে করত, পরিবার মানে সবাই ভাই-বোনের মত, সেইজন্য এখানে বাধ্যতামূলক নিয়ম ছিল যে একই গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক কার্য চলবে না। স্বামীজী আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে বলছেন, আমাদের ভারতে সবাই নিজের বংশ পরম্পরার উৎসকে ধরতে গিয়ে কোন এক দরিদ্র উচ্চকোটির ঋষির কাছে নিয়ে যাবে, সেই ঋষি হয়ত তাঁর সারাটা জীবন একটা গাছের তলায় গভীর তপস্যাতেই কাটিয়ে দিয়েছেন, বলবে ঐ ঋষি থেকে তাদের পরম্পরাকে শুরু হয়েছে। আর আমেরিকা ইংল্যাণ্ডে কেউ যখন তার পূর্বপুরুষের খোঁজ নিতে শুরু করে তখন দেখে তার পূর্বপুরুষ হয়তো কোন এক জলদস্যু ছিলেন। কিন্তু ভারতের যিনি রাজা সেও কিন্তু তার বংশপরম্পরাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় এক দরিদ্র ঋষির কাছে। সেই ঋষি কত বড় ছিলেন, তার উপর আধার করে সেও নিজেকে ততটা মহান ও ঐতিহ্যশালী মনে করে।

স্বামীজীরও ঠিক এই ভাব ছিল। তিনি আরও বলছেন, একজন মানুষ যদি সব সময় নিজের বংশের ব্যাপারে সচেতন থাকে, আমি অমুক বংশের লোক, তখন দেখা যায় ভুল কাজ বা অসম্মানজনক কাজ করার প্রবণতা তার অনেক কমে যায়। যখনই সে তার পরম্পরাকে জেনে গেল, তখনই তার মধ্যে একটা আত্মসম্মানবোধ জেগে ওঠে, আর এই আত্মসম্মানকে ধরে রাখার জন্য আর কখনই কোন ভুল কাজ করতে প্রবৃত্ত হতে চাইবে না। বৃহত্তর ক্ষেত্রেও আমরা যখন আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে জেনে যাব তখন কি আর আমাদের ইচ্ছে হবে কোন ধরণের নোংরা কাজ করতে? আজ আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে ভুলে গেছি বলেই সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে বড় বড় করে দেখতে পাই অমুক মন্ত্রী এত হাজার কোটি টাকার ঘুষ কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে গেছে। মানুষ এখন নিজেকে একটা হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে। যদি শান্ত ভাবে দেখি তাহলে এরা সব নোংরা পাঁকের শুয়োরের মত। কামিনী-কাঞ্চন তো সেই পাঁক, যেখানে সবাই গিয়ে শুয়োরের মত মুখ গুজে পড়ে আছে। কিন্তু মানুষ যখন একবার তার ঐতিহ্যের ব্যাপারে সচেতন হয়ে যাবে, তখন এই ঐতিহ্যের শক্তিতেই নিজেকে বলতে পারবে আমি তো এই বংশ পরম্পরার এই ঐতিহ্যের লোক আমি তো এই ধরণের নোংরা কাজ করতে পারিনা, অন্যরা করতে চাওতো করুক, আমি করছি না। যে মন্ত্রী আজ দু হাজার কোটি টাকার ঘুষ নিচ্ছে, তাকে যদি দশ টাকার ঘুষ কেউ দিতে চাইত সে কি নিত? কখনই নিত না। ঠিক তেমনি মানুষ যখন নিজের চৈতন্য

সত্তার ব্যাপারে সজাগ হয়ে যায় – আমি হলাম এই চৈতন্য সত্তার সাথে একাত্ম আর আমি এই উচ্চকোটি ঋষির পরম্পরার সাথে যুক্ত, তখন মন্ত্রীর কাছে দশটি বা পাঁচটি টাকার ঘুষ নেওয়া যেমন অতি নগণ্য মনে হয়, কামিনী-কাঞ্চনের জগৎ তার কাছে ঠিক সেই পর্যায়ে চলে যায়, দু হাজার কোটি টাকাও তার কাছে খড়কুটো বলে মনে হবে। ঠাকুর লাট সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছেন, হৃদয়রাম বলছে – মামা, এই হচ্ছে লাট সাহেবের বাড়ি। ঠাকুর বলছেন – আমি দেখলুম ইটের ঢিপি। ঠাকুর কি করে দেখছেন যে লাট সাহেবের বাড়ি ইটের ঢিপি? চৈতন্য সত্তার ব্যাপারে কেউ যখন জাগ্রত হয়ে যায়, নিজের বংশ পরম্পরার ঐতিহ্যে সচেতন হয়ে যায়, তখন জড় সত্তা, মানে প্রকৃতির সত্তা, অর্থাৎ জগতের ঐশ্বর্য তাকে আর মোহিত করতে পারেনা। এরপর জীবনের সর্ব অবস্থায় সে একটা আলাদা আত্মসম্মান বোধ নিয়ে চলে। স্বামীজী তাই বলছেন, তুমি যদি তোমার নিজের বংশ পরম্পরার ঐতিহ্যকে না জানো তাহলে কখনই তোমার মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হবে না। আমি যদি জানি আমার বাপ-ঠাকুর্দা চুরি ডাকাতি করে জেল খেটেছিলেন, আমার মনোভাবের মধ্যে সব সময় একটা গ্লানির ভাব কাজ করতে থাকবে, আমি কখনই আর ভালো হতে পারবো না।

একটা মজার কাহিনী আছে, এক চোর ছিল। তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর সে জানতে পারল তার বউ আরও বড় চোর। দুজনেই খুশি। এবার তাদের একটা ছেলে হয়েছে। কিন্তু জন্মের পর থেকেই ছেলেটির একটা হাতের মুঠো বন্ধ, অন্য হাতের মুঠো খোলা। ডাক্তার নার্স সবাই চেষ্টা করছে হাতের মুঠোটা আলগা করতে, কিন্তু কিছুতেই হাতের মুঠোটা খোলা যাচ্ছে না। এরপর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি ছেলের বংশের পেছনের ইতিহাস, তার বাবা মার পরিচয় সব জেনে নেওয়ার পর নার্সদের বললেন একটা থালায় কিছু স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে ছেলের সামনে রাখতে। কয়েকটি সোনার মুদ্রা সহ থালাটা ছেলেটির কাছে রাখার পর তার মুঠোটা একটু আলগা হয়েছে, আলগা হতেই হাত থেকে একটা কানের দুল গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। নার্স দুলটা দেখতে পেয়েই বলছে – আরে! এইতো আমার হারিয়ে যাওয়া দুলটা। আসলে জন্মাবার সময় ছেলে কখন নার্সের কান থেকে দুলটা খুলে নিয়ে হাত মুঠো করে দিয়েছে কেউ টেরই পায়নি, নার্স ভেবেছিল কোথাও দুলটা খুলে পড়ে গিয়ে থাকতে পার। জন্ম নিয়েই সে চুরি করে হাতটা মুঠো করে নিয়েছে। এখন থালার মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রা দেখে সেটাকে নেওয়ার জন্য হাতটা আলগা হতেই দুলটা পড়ে গেছে। বাবা চোর, মাও চোর, বাচ্চাটাকে তাদের থেকে বড় চোর হতে হবে, জন্ম নিয়ে তাই প্রথমেই নার্সের কানের দুলটা হাতিয়ে নিয়েছে।

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানার এইটাই উদ্দেশ্য। আমার আদর্শ হচ্ছেন সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা, স্বামীজী বলছেন আমাদের আদর্শ সীতা, সাবত্রী, দময়ন্তী, আমার আদর্শ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আমার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, এই পরম্পরাতেই আমরা বড় হয়েছি, আমার আচার-আচরণ যেন এনাদের পরম্পরা ও তাঁরা যে আদর্শ দিয়ে গেছেন সেই আদর্শ ও পরম্পরার বাইরে যেন না যায়। আজকাল প্রায়ই লোকেরা বলে যে, তুমি কেন সৎ? তুমি যে সৎ তার মানে এই নয় যে তুমি ভেতর থেকে সৎ। কারণ তুমি সুযোগ পাওনি বলে তুমি চুরি করছ না, তুমি সুযোগ পাওনি তাই তুমি লম্পটগিরি করছ না, তোমার সুযোগ থাকলে তুমি আরও বড় চোর হতে। কিন্তু যে নিজের পরম্পরার আদর্শ ও ঐতিহ্যকে জেনে নিয়ে সাথে সাথে আধ্যত্মিকতার সত্যের ব্যাপারে সচেতন হয়ে যাবে সে হাজার প্রলোভনের মধ্যে পড়েও এই জিনিষ কখনই করবে না। এই কারণেই আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে সচেতন হওয়াটা সব সময়ই খুব প্রাসঙ্গিক।

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উৎস *(সাহিত্য, বিজ্ঞান কিভাবে সৃষ্টি হয় – মৌনতার শক্তি – ধ্যানের গভীরে – শাস্ত্রের মূল ভাষাতেই শাস্ত্রকে অধ্যয়ণ করতে হয় – অধিকারি ভেদে সাধনার পথ – সম্প্রদায় বিদ্যা – মাস্টার মশাইকে ঠাকুরের সতর্ক বার্তা – সত্যের পরীক্ষা – মুণ্ডোকপনিষদে গুরুর গুণাবলী – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি – শ্রুতি ও স্মৃতির সংজ্ঞা – প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ এবং চার পুরুষার্থ – বর্ণাশ্রম ধর্ম ও স্বধর্ম – ধর্মের চারটি স্তম্ভ – ইতিহাস মূলক শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য – ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরা – ধর্মের পরিভাষা)*

জাগ্রত অবস্থায় দৈনন্দীন জীবন-যাপনে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে চলেছি। কিন্তু বেশীর ভাগ তথ্যই অর্থহীন। বাড়ি থেকে এখানে আসার সময় আমার চোখের সামনে দিয়ে কত বাস, কত গাড়ি চলে গেছে, কিন্তু আমি একটি গাড়ির নম্বরও বলতে পারবো না, অথচ চোখের মাধ্যমে সবই আমার ভেতরে এসেছে, বিভিন্ন রকমের শব্দ এসেছে, গন্ধও এসেছে, কিন্তু কোনটাই মনে নেই। কারণ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করলেও মস্তিস্ক সব কিছুকে গ্রহণ করে না। এর মধ্যেই কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য বা ঘটনা আমাদের ভেতরে থেকে যায়, হঠাৎ বাস থেকে দেখতে পেলাম রাস্থা দিয়ে আমার খুব পরিচিত কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে। এটা কিন্তু সহজে মন থেকে মুছে যাবে না, বছর পাঁচেক পরেও মনে থাকবে যে আমি সেদিন বাস করে যাচ্ছিলাম, তখন তাকে রাস্থা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। কিছু কিছু ঘটনা বা দৃশ্যের ছাপ ভেতরে অনেক দিন থেকে যায়। বেশীর ভাগ জিনিষই আমাদের জীবনে অর্থহীন হয়ে ভেতরে পড়ে থাকে। কিন্তু অর্থহীন হয়ে পড়ে থাকা কিছু তথ্যগুলোর মধ্যেও কোন একটা বিশেষ তথ্যের সঙ্গে একটা সম্পর্ক খুঁজতে

চেষ্টা করি। এই সম্পর্ক খোঁজা থেকেই একটা বিজ্ঞান বেরিয়ে আসে। যেমন নিউটন ছোটবেলা থেকেই দেখছেন আকাশে সূর্য উঠছে, চাঁদ উঠছে আবার গাছ থেকে আপেল মাটিতে গিয়ে পড়ছে, এগুলোর কোনটারই পারস্পরিক কোন যোগ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যত বড় হচ্ছেন ততই চিন্তা করছেন, চিন্তা করে করে অনেক গভীরে গিয়ে একদিন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে ধরতে পারলেন। এখানে দৈনন্দিন কয়েকটা ঘটনা নিত্য দেখে গেছেন, সূর্য উঠছে আবার অস্ত যাচ্ছে, চন্দ্র উঠছে সেও অস্ত যাচ্ছে, ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে, তার সঙ্গে দেখছেন গাছ থেকে ফল মাটিতেই পড়ছে। কিছুতেই এগুলোর সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই নানান জিনিষকে মনের মধ্যে নিয়ে চিন্তা করতে করতে একটা জায়গাতে গিয়ে Law of Gravitation এর তত্ত্বটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। পরে পরে বৈজ্ঞানিকরা এসে দেখলেন তাদের কাছেও কিছু সমস্যা আছে, নিউটনের এই তত্ত্বকে মেলানো যাচ্ছে না, কারণ ইতিমধ্যে আরও অনেক তথ্য এসে গেছে। সেগুলোর মধ্যেও কিছু জিনিষ মেলানো না গেলেও কিছু নতুন জিনিষ দাঁড়িয়ে গেল, সেগুলোকে যখন মেলানোর চেষ্টা করছেন তখন আরেকটা সমাধান বেরিয়ে আসছে। এইভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি কোন কবি বা একজন শিল্পী কোন নৈসর্গিক দৃশ্য দেখছেন। সেই দৃশ্য তার মনে একটা ভাব তরঙ্গ সৃষ্টি করল, অনেক দিন পর সেই দৃশ্যটা মনে উঠতেই ভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন আর সেই তন্ময় ভাব থেকেই তাঁর তুলি বা কলম থেকে একটা সুন্দর ছবি বা কবিতা বেরিয়ে এল। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তথ্য প্রথমে বাইরে থেকে আসে আর বাইরের তথ্যের কোনই তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু যারা চিন্তার গভীরে প্রবেশ করতে চাইছে তাদের কাজ হচ্ছে কিছু যে তথ্য ভেতরে ছাপ ফেলে গেছে সেটার সঙ্গে নিজের একটা সংযোগ স্থাপন করা। এই সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়েই একটা নতুন জিনিষ দাঁড়িয়ে যায়।

এই সংযোগটা সব সময় হয় মৌন অবস্থায়। সাধারণ ভাবে যে দৈনন্দিন জীবনচর্চার মধ্যে আমরা অতিবাহিত করি, ওই অবস্থায় কখনই এই সংযোগ করা যাবে না, খুব সাধারণ স্তরের চিন্তা ভাবনা করা ছাড়া কোন উচ্চ চিন্তা করার ক্ষমতা হবে না। তার কারণ আমরা মৌন হতে পারিনা। মৌন মানে কথা বন্ধ করে থাকা নয়। আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে সেগুলো কখনই শান্ত থাকে না আর শান্ত রাখার চেষ্টাও করিনা। আর এখন তো মোবাইল ফোন সবারই হাতে, অনর্গল কানের মধ্যে মোবাইল ফোন লাগিয়ে কথা বলেই যাচ্ছি। দিনের শেষে যখন আর কিছু কাজ থাকে না তখন মস্তিষ্ক সারা দিন যত রকমের আবর্জনা সংগ্রহ করেছে সব পরিষ্কার করতে থাকে, এই আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ যদি না হত তাহলে মানুষ পাগল হয়ে যেত। ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নের মধ্যে মস্তিষ্ক সংগ্রহিত তথ্যগুলিকে সাজাতে থাকে, এগুলো আবর্জনা এগুলো ফেলে দাও, এগুলো কাজের জিনিষ রেখে দাও, এটাকে এর সাথে আর ওটাকে এটার সাজিয়ে রাখ। এই কারণে দেখা যায় যারা বেশী কথা বলে, নানা রকমের কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকে তারা স্বপ্নও বেশী দেখে, কারণ মন ঘুমের মধ্যে সব আবর্জনাগুলিকে সে তখন ফেলতে থাকে। মৌন অবস্থাতেই মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায়। স্বপ্নের মধ্যে যে সাজানো গোছান হয়, মৌনের সময় মন সেখান থেকেই তার দরকারি জিনিষটা বের করে নেয়। সবাই বলে জপ-ধ্যানের সময় মন খুব চঞ্চল হয়, মন কিন্তু তখন আদপেই চঞ্চল হয় না, মন তখন একটা অবসর পায়। এই অবসরে মন সারা দিনে যত আবর্জনা সংগ্রহ করেছে, সারা সপ্তাহে যত কিছু জমিয়েছে, সারা মাসে যা কিছু করেছে, এর আগের আগের জন্মে যত আবর্জনা জমা আছে, মন ঐ সময় সব গোছাতে থাকে, কিছুই ফেলে দিচ্ছে না, সব গোছাচ্ছে। ঐ আবর্জনার মধ্যে কিছু জিনিষ তার কাছে একেবারেই ফালতু, সেগুলোকে ফেলে দেয়, আবার কিছু জিনিষ মনের কাজের জিনিষ, সেগুলোকে গুছিয়ে রাখবে। বাড়ির গিন্নীরা যখন ঘরদোর গোছায় তখন যেমন বাসনগুলো রান্নাঘরে রাখবে, জামা-কাপড় আলমারিতে রাখে, কিছু ডিভানের মধ্যে রাখে, মস্তিষ্ক ঠিক এই একই জিনিষ করছে।

মৌন অবস্থায় যে শব্দগুলো বেরোয় সেই শব্দগুলিরই ঠিক ঠিক শক্তি থাকে। প্রথমে শব্দ থেকে শব্দ জন্ম নেয়, এ একটি কথা বলল, প্রত্যুত্তরে সে আরেকটি কথা বলছে, এইভাবে শব্দ থেকে শব্দের জন্ম হয়। বাক্ শক্তি মনকে সব সময় চঞ্চল করে দিচ্ছে, সেই কারণে সেই শব্দের কোন শক্তি থাকে না। কিন্তু যিনি কবি বা লেখক বা চিত্রশিল্পী বা সুরস্রষ্টা, এনাদের শব্দগুলো মৌন থেকে বেরোয়। কবি একটা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখেছে, ঐ দৃশ্যটা অনেক দিন ধরে তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরছিল, একটা সময়ে তিনি সেটাকে কয়েকটি লাইনে কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন, এই কবিতাই কালজয়ী হয়ে যায়।

ধ্যানের গভীরে মানুষ আরও মৌন হয়ে যায়। যাঁরা ধ্যানের গভীরে চলে যান তাঁরা আর বেশী কথা বলতে চান না। তখন তিনি এই জগতের বাস্তবিক সত্তা, সেই চরম সত্যের মুখোমুখি হয়ে যান, ঠাকুরও তাঁর ধ্যানের গভীরের উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে বলছেন – কাকেই বা বলবো আর কেউ বা বুঝবে। সেইজন্য ধ্যানের পরে তাঁরা চুপ হয়ে

যান, কারুর সাথে কথা বলতে চান না। কচিৎ কদাচিৎ দু একটা কথা হয়তো বা শিষ্য বা তাঁর কাছের লোককে বলে দিলেন, কিন্তু ধ্যানের গভীরে বা সমাধি থেকে উঠে আসার পর তাঁরা যে কথাগুলো বলেন সেগুলোকে আর শব্দ বলা হয় না, আমরা যে অর্থে শব্দ মনে করি সেই অর্থে শব্দ নয়, এই শব্দগুলোই হয়ে যায় বেদ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাস্তবিক সত্যই হল বেদ। ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে জিনিষটা প্রত্যক্ষ হয়, সেটাকে যে ভাষাতেই বলা হোক না কেন, সেটাই হয়ে গেল বেদ। যেমন, বিশ্বামিত্র ঋষি ধ্যানের গভীরে থেকে উঠে এসে তিনি যখন মুখ খুলছেন তখন বেরিয়ে এলো – *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ*। বিশ্বামিত্র ঋষি সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন। কি সেই সত্য? হে পরমেশ্বর, যিনি এই ত্রিলোকের রচনা করেছেন, যিনি জ্যোতির্ময়, একমাত্র তিনিই বরণীয়, তিনি যেন আমার বুদ্ধিকে আলোকিত করেন, যাতে আমি এই জগতের সব কিছুকে বুঝতে পারি সাথে সাথে এই জগতের যিনি স্রষ্টা তাঁর ব্যাপারটাও আমি যেন বুঝতে পারি। এইটাই হচ্ছে মূল বক্তব্য। এখন গায়ত্রীমন্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করে – হে প্রভু, আপনি এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন, আপনি আমার বুদ্ধিকে প্রকাশিত করুন এবং আমার বুদ্ধিকে আপনার কাছে নিয়ে চলুন, যদি এটাকেই আমি জপ করতে থাকি তাহলে আমার কিছুই হবে না। কথা ও বক্তব্য একই কিন্তু কিছু হচ্ছে না কেন? কারণ প্রথম কথা এই শব্দগুলো শব্দ থেকে বেরিয়েছে। মুসলমানদের নিয়ম আছে, তুমি যদি ঠিক ঠিক মুসলমান হতে চাও তাহলে জীবনে তোমাকে একবার আরবী ভাষায় কোরান পড়তে হবে, অন্য ভাষায় অনুবাদ করা কোরান পড়লে চলবে না। কারণ যিনি ধ্যানের গভীরে যে ভাষায় এই শব্দগুলো পেয়েছেন, তার বাইরে অন্য কোন ভাষায় সেটাকে পাঠ করলে কোন ফল হবে না। ঠাকুরের বেদ হল কথামৃত, গস্‌পেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ নয়। বেদের অনুবাদ কখনই বেদ নয়, গীতার অনুবাদ কখনই গীতা নয়। উপনিষদও তাই, উপনিষদের অনুবাদ কখনই উপনিষদ নয়, সংস্কৃতেই উপনিষদ পড়তে হবে। কোন বড় কবিকে দিয়ে গীতার প্রত্যেকটি শ্লোককে কবিতায় ছন্দাকারে রচনা করে পাঠ করলে কিছুই হবে না, কিন্তু সংস্কৃতে গীতা পাঠ করলে আস্তে আস্তে ভেতরে চৈতন্য সত্তা জাগ্রত হতে থাকবে। গীতা ভগবানের কথা। আমি বলতে পারি, বাংলায় পাঠ করলে কি ক্ষতি, ভাবটা তো একই আছে। এইখানেই লোকেরা ভুল করে বসে, শুধু ভাব এক হলেই হবে না, ভাব, শব্দ, ছন্দ সব এক হতে হবে। উপনিষদের কিছু ভাবকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক গান রচনা করলেন, কিন্তু সেই গান গাইলে উপনিষদের ঋষি হওয়া যাবে না, কারণ ঋষিরা এগুলো ধ্যানের গভীরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৌন থেকে লিখেছিলেন ঠিকই কিন্তু ধ্যানের গভীরে যাননি। ঋষিরা সারা জীবন তপস্যা করে দুটো কি চারটে মন্ত্রকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। বেদ বলতে এটাকেই বোঝাচ্ছে, ধ্যানের গভীরে গিয়ে তিনি কি সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন, আর তিনি কি ভাষায় তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করলেন, সেটাই হচ্ছে বেদ। স্বামীজীর যে বক্তৃতা, লেখা, চিঠির অনুবাদ হয়ে গেছে সেটা আর বেদ নয়। তাই স্বামীজী যেটা ইংরাজীতে বলেছেন সেটা ইংরাজীতেই পড়তে হয়, যেটা বাংলায় লিখেছেন সেটা বাংলা ভাষাতেই পড়তে হয়।

বিশ্বামিত্র যেমন ধ্যানের গভীরের গিয়ে একটা সত্যকে দর্শন করলেন, যিনি এই ত্রিলোকের রচনাকারী, তিনিই একমাত্র বরণীয়, তিনি জ্যোতির্ময়, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করুন। ঠিক তেমনি অন্যান্য ঋষিরাও ধ্যানের গভীরে গিয়ে দেখলেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। ঠাকুর যাকে নিজের ভাষায় বলছেন, ঈশ্বরই নিত্য বাকি সব অনিত্য, এই সত্যকেই উপনিষদের ঋষি তাঁর ভাষায় বলছেন - *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। সচ্চিদানন্দকে আমি কি নামে সম্বোধিত করছি সেটার কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হচ্ছে তিনিই আছেন, তাঁর বাইরে কিছু নেই। এই টেবিল, টেবিলের উপর মাইক্রোফোন, বোতল, গ্লাশ, চক, আমি আছি, আপনারা আছেন, যাই থাকুক সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছুই নেই। তাহলে এই যে আলাদা আলাদা সব কিছু দেখছি, এগুলোকে আলাদা কেন দেখছি, এই আলাদাটা কি করে হচ্ছে? ঋষিদের কাছেও ঠিক এই একই সমস্যা ছিল। ধ্যানের গভীরে গিয়ে দেখছেন সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, ধ্যানের গভীর থেকে উঠে এসে চোখ খুলে দেখছেন তিনি আলাদা জগৎ আলাদা। তাহলে কি এই জগতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবেন? সেটাও করতে পারছেন না। আবার ধ্যানের গভীরে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন, তাতো সত্যকে প্রত্যক্ষ করার আরও উচ্চতম অবস্থা, সেই সত্যকে কখনই অলীক বা মিথ্যা বলতে পারছেন না, জগতকে ফেলে দিতে পারবেন কিন্তু ধ্যানের গভীরের প্রত্যক্ষ করা সত্যকে তো কিছুতেই না করতে পারবেন না। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আর পারমার্থিক সত্তা, যে সত্তাতে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, এই দুটোকে মেলান খুব কঠিন। ঋষিরা চেষ্টা করেন কিভাবে এই দুটোকে মেলানো যায় আর তাঁর শিষ্যরা দর্শন শাস্ত্রের মাধ্যমে চেষ্টা করেন এই দুটোকে কিভাবে মেলানো যায়। ব্যবহারিক সত্তাতে আরেকটা যে অত্যন্ত বিসদৃশ জিনিষ দেখা যায় সেটা হচ্ছে, মানুষ স্বভাবে কামী, ক্রোধী ও লোভী। বেশীর ভাগ মানুষই বলছে আমি ভোগ করতে চাই, আমার ভেতরে লোভ আছে, কাম আছে, এই ধরণের নানান ভাবের মানুষ নিয়ে এই জগৎ। অন্য দিকে যে সচ্চিদানন্দের কথা বলা হচ্ছে, সচ্চিদানন্দ ছাড়া

আর কিছু নেই, সেই সচ্চিদানন্দের মধ্যে এই জিনিষগুলি কল্পনাই করা যাবে না। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলা হচ্ছে – *মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্*, কারুর ধনে লোভ করো না, নিজের যেটা আছে সেটার প্রতি আসক্তি রেখো না। আবার বলছেন *তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ*, সচ্চিদানন্দই যখন আছেন তাহলে সেখানে কোন জিনিষকে পাওয়ার লোভ আর মোহ কি করে আসবে, কোন জিনিষ যদি জীবন থেকে চলে গিয়ে থাকে তাহলে সেই জিনিষকে নিয়ে কেন শোক করবে! সচ্চিদানন্দই শুধু আছেন যদি জানি তাহলে কোন শোক মোহ থাকতে পারে না, অথচ আমরা দিনরাত শোক আর মোহকে নিয়েই জীবন অতিবাহিত করছি, নিজের জিনিষের প্রতি আসক্তি আছে, অপরের জিনিষের প্রতি লোভ আছে। এগুলোকে মেলানো সত্যিই খুব কঠিন। যে কোন ধর্ম, যে কোন অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে এটা এক বিরাট বড় সমস্যা।

দ্বিতীয় হচ্ছে অধিকারী ভেদ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের মন এক রকম আবার আমার মন অন্য রকমের। দুজনের জন্য যদি একই নিয়ম করা হয় তাহলে সেটা কারুর পক্ষেই মঙ্গলদায়ক হবে না। আমাদের সবার মন ভোগের দিকে বলে শ্রীরামকৃষ্ণকেও বলতে পারিনা আপনিও ভোগে নেমে পড়ুন, তাহলে তাঁর হয়তো জীবন সংশয় হয়ে যাবে, আর অন্য দিকে আমাকে যদি বলা হয় তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের মত পূর্ণত্যাগী হয়ে যাও, তাহলে আমাকে তখন হয়ত আত্মহত্যা করতে হবে। তার মানে পথ কখনই দুজনের জন্য এক হতে পারে না। ভোগের পথে স্বামীজীকে নামিয়ে দিলে তিনি মরে যাবেন, আর আমাকে পূর্ণত্যাগের পথে নামিয়ে দিলে আমি মরে যাব, তাহলে ধর্ম হয় আমার জন্য, নয়তো স্বামীজীর জন্য, ধর্ম কখনই দুজনের জন্য এক হতে পারেনা। তৃতীয় পথ আছে, যদি দুজনের জন্য পথ আলাদা করে দেওয়া হয়। আমাদের যে এত বিশাল আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পরম্পরা, এর মধ্যে কোন ঋষিই বলছেন না যে ভগবান অনিত্য, কেউ বলছেন না যে ভগবানের সত্তাটা মিথ্যা। সবাই বলছেন সচ্চিদানন্দই বস্তু বাকি সব অবস্তু, যা কিছু আছে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু আমি চোখের সামনে দেখছি সব আলাদা। এই দুটো বিপরীত ভাবকে মেলানোর জন্যই এত আধ্যাত্মিক শাস্ত্র।

কাল একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে দিল পারমার্থিক সত্তা এই রকমের। এখন যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কোথা থেকে এই ভাব পেলেন, আপনার পরম্পরাটা কি? তিনি বললেন আমি আমার চিন্তা ভাবনা থেকে এই ভাব পেয়েছি। এই জায়গাত এসেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠা ভদ্রলোক নিজেকে ভুল প্রমাণ করে দিলেন। ঠাকুরের সময়েও ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বলা হত ঈশ্বর এই রকম, ঈশ্বর সেই রকম। মাস্টার মশাই শুনে এসে ঠাকুরের কাছে ব্যাখ্যা করে বলছেন। ঠাকুর খুব মন দিয়ে শুনলেন। শুনে-টুনে বললেন, তুমি এখান সেখান আর যেও না, এইখানেই আসবে। ঠাকুর দেখলেন এরা সব ভুলভাল ব্যাখ্যা করছে, মাস্টার মশাইয়ের মত কিছু যুবক তখন সবে উঠছেন, এই সব ভুলভাল ব্যাখ্যা শুনলে আসল জিনিষের ধারণা করতে গিয়ে এদের গোলমাল হয়ে যাবে দেখে ঠাকুর মাস্টার মশাইকে নিষেধ করছেন এখানে সেখানে যেতে। ঠাকুর আবার আরেকজনের ব্যাখ্যা শুনে বলছেন আমার মামার গোয়ালে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। অর্থাৎ এদের কথার কোন মিল নেই। কেন মিল নেই? কারণ তার ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণাটা বেরোচ্ছে মাথা থেকে, স্বাভাবিক অবস্থায় তার শব্দ থেকে শব্দ জন্ম নিচ্ছে, খুব হলে মৌন থেকে বেরিয়েছি, কিন্তু ধ্যানের গভীরে শব্দগুলি বেরোয়নি, তার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়নি।

আধ্যাত্মিক জগতে একটা জিনিষ সত্য কিনা তার জন্য কয়েকটি পরীক্ষা নিতে হয়। প্রথমে দেখতে হবে তুমি এই সত্য সম্বন্ধে কার কাছে শুনছ। যার কাছেই শুনে থাকো না কেন, তিনি আচার্যই হন বা তোমার গুরুই হন, তাঁর কয়েকটি গুণ থাকতে হবে। যার তার কাছে শুনলে হবে না। মুণ্ডোকপনিষদে বর্ণনা করা হচ্ছে – *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*, সেই পরমার্থ তত্ত্বকে জানার জন্য তোমাকে গুরুর কাছে যেতে হবে। *সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্* - খালি হাতে যাবে না, হাতে যজ্ঞ কাষ্ঠ, সমিৎপাণি নিয়ে যাবে, *শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্*, গুরুকে শ্রোত্রিয় হতে হবে, উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের হতে হবে, অর্থাৎ যাঁর পরম্পরা আছে, বংশ পরম্পরায় শুধু শাস্ত্র পড়ে গেছেন। হঠাৎ উঠতি বড়লোক নন। ব্রহ্মনিষ্ঠম্ শুধু যে তাঁর পাণ্ডিত্যই আছে তা নয়, তিনি সব সময় ব্রহ্ম চিন্তনে বসে থাকেন, ব্রহ্মের বাইরে তাঁর আর কোন চিন্তা নেই। এই রকম গুরুর কাছে যখন তুমি যাবে, গুরু তখন তোমাকে উপদেশ দেওয়া শুরু করবেন।

গুরু যে উপদেশ দিচ্ছেন সেটা সত্য কিনা বিচার করার তিনটে সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে, এই তিনটে হল, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি বলতে বোঝান হচ্ছে শাস্ত্রকে। গুরু যে সত্যের উপদেশ দিচ্ছেন সেটা বেদে আছে কিনা। গুরু যে কথা গুলো বলছেন তিনি এগুলো কোথায় পেয়েছেন? আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে যে এত শাস্ত্র রয়েছে, এই সব শাস্ত্রের কোথাও না কোথাও তাঁর এই কথাগুলোকে থাকতে হবে। এখন যদি কোন গুরু বলতে শুরু করেন, আমার এই কথা গুলো

আমি নিজে পেয়েছি, এগুলো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তাহলে বলতে হবে, আমি তাহলে আপনার কথা শুনতে রাজী নই। পরম্পরা যদি না থাকে, সম্প্রদায় বিদ্যা যদি না হয় আমি আপনার কথা শুনবো না। ভারতে কখনই অসম্প্রদায়বিৎকে গুরু হিসাবে মানবে না। এদিক সেদিক কিছু এই ধরণের মহাত্মাদের আবির্ভাব হামেশাই হয়ে থাকে, কিন্তু এনারা যত দিন বেঁচে থাকেন তত দিনই লোকে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করে, অন্তর্ধানের পর আস্তে আস্তে তাঁর ছবিটা মানুষের মন থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কারণ তাঁর পেছনে সুদীর্ঘ সম্প্রদায় আছে, যে সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য থেকে শুরু হয়েছে। শঙ্করাচার্যের যে পরম্পরা তা আবার ব্রহ্মা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। ব্রহ্মারও আবার পরম্পরা আছে, যেটা এর আগের আগের কল্পে সাক্ষাৎ ঈশ্বর থেকে আসছে। ঈশ্বরের কথা ছাড়া বাকি যত কথা, মানুষের কথা, যে কথার মধ্যে বুদ্ধি খেলা করেছে সেই কথার কোন দাম নেই। ঈশ্বরের মুখ থেকে যদি সেই কথা না এসে থাকে সেই কথার কোন দাম নেই। ঈশ্বরের কথাই শ্রুতি, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই শ্রুতি। বেদ উপনিষদের কথা কেন শ্রুতি? এগুলো সব ঈশ্বরের মুখের কথা তাই শ্রুতি।

এরপর আসছে যুক্তি। তুমি বলছ আমার কথাগুলো বেদে আছে তবে পরিষ্কার এই ভাবে নেই, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা এই রকমই বেদে বলা আছে। তখন দেখা হবে তোমার কথা যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে কিনা, যুক্তি সঙ্গত কিনা। বেদেও যদি কোন অযৌক্তিক কথা থাকে তখন সেটাকেও বেদে আছে বলেই মানা হবে না। যুক্তিসঙ্গত যদি না হয় তাহলে ঐ কথাকে নেওয়া হবে না। যেমন ব্রাহ্ম সমাজে একদিকে ব্রহ্মকে নিরাকার বলছে, অন্য দিকে বলা হচ্ছে তাঁর চরণদুটি। একদিকে ঈশ্বরকে বলছে অবয়বহীন, নিরাকার অন্য দিকে বলছে তাঁর চরণদুটি, পুরোটাই অযৌক্তিক। এখন যদিও অযৌক্তিক হল, কিন্তু এই জিনিষটাই যদি বেদের কোথাও থাকে তাহলে কোথাও গিয়ে এই জিনিষটাই দাঁড়াবে, কারণ বেদে যদি এটা থাকে তাহলে কেউ না কেউ এর উপর ভাষ্য দিয়ে থাকবেন। কেই যদি তাঁর ভাষ্যে বলেন একদিকে তিনি নির্গুণ নিরাকার আবার অন্য দিকে তাঁর চরণে মাথা লুটিয়ে দিচ্ছি তখন সেটা আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া থাকার মত কথা হয়ে গেল।

তৃতীয় মাপকাঠি হল অনুভূতি। আপনারা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর দর্শন করেছেন, কিন্তু তাতে আমার কি হল, আপনি আগে বলুন আমি কি ঈশ্বরকে দেখতে পারব। আপনি বলে দিলেন – হ্যাঁ, তুমিও দেখতে পারবে। তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু মহম্মদ বলছেন, আমি পয়গম্বর, আমার আগেও পয়গম্বররা ছিলেন, ওল্ড টেস্টামেন্টে যত পয়গম্বরের কথা বলা হয়েছে সেখানে ঠিকই বলা হয়েছে, কিন্তু আমি হলাম শেষ পয়গম্বর। শ্রুতিতে আছে অবতার অনেক হবেন, অবতারের আসার বিরাম নেই, এটা তাই যুক্তিতেও দাঁড়াচ্ছে। এর আগে আগে যদি অবতারাদিরা থাকতে পারেন তাহলে এর পরে ইনিও হতে পারেন। মহম্মদের পর আমরা আর অবতার দেখতে পাবো না, অনুভূতিতে কিন্তু মহম্মদের কথা দাঁড়াচ্ছে না। আবার যুক্তিতেও একটা জায়গায় দাঁড়াবে না, মহম্মদের আগে পঁচিশ জন পয়গম্বরার এসেছিলেন, কিন্তু এনার পরে কোন পয়গম্বর হবে না, এটা যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে ন। হিন্দুরা বলবে, তোমার ধর্ম সত্যিই খুব ভালো, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভাব আছে, কিন্তু আমি মহম্মদের এই কথাকে মানতে পারবো না, কারণ তোমার কথা যুক্তিতে দুর্বল, আর অনুভূতিতে পুরোটাই মার খেয়ে গেছে। তখন মুসলমান বন্ধু বলবে, তোমার এই তিনটে মাপকাঠিকে মানিনা, আমার কোরানে আছে। কিন্তু তোমার কোরানে থাকতে পারে কিন্তু আমার উপনিষদে আছে, আমার বেদে এই রকম আছে, আমি কেন তোমার কথা শুনতে যাব। একদিকে মহম্মদ বলছেন আমিই শেষ অবতার অন্য দিকে যিশু বলছেন আমিই ঈশ্বরের সন্তান, তার মানে যিশুর আগেও আর কেউ ছিলেন না, এটা আরও অযৌক্তিক হয়ে যায়। আমাদের ক্ষেত্রে এর আগে আগে অনেক অবতার হয়েছেন, এর পরে আরও অবতার আসবেন। যুক্তিতে কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, অনুভূতির ব্যাপারে হিন্দু বলবে, অবতার যা উপলব্ধি করেছেন তুমি চেষ্টা করলে তুমিও উপলব্ধি করতে পারবে, তুমিও সেই রকম মুণ্ডু কাটা তপস্যা কর। শ্রীরামকৃষ্ণ পেরেছেন আর কেউ পারবে না, এই কথা কেউ বলবে না। যেটা বলার মত তা হল, এটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিশেষ শক্তি সম্পন্ন, কিন্তু একেবারেই অসম্ভব এই কথা কেউ বলবে না। তুমি সময়ের কাছেই মার খেয়ে যাবে, যে জিনিষটা উনি তিন দিনে করেছেন, আমাদের পক্ষে সেটাই হয়তো তিরিশ বছর লেগে যাবে। এই হচ্ছে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির সম্বন্ধে বক্তব্য। এই তিনটে হচ্ছে সত্যের পরীক্ষার শেষ মাপকাঠি।

যেখান থেকে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির বিচার করা হয়, সেখান থেকে আমাদের শাস্ত্রের দুটো বিভাজন হয়ে যায়। ধ্যানের গভীরে বা সমাধিতে আধ্যাত্মিক সত্যগুলোকে প্রত্যক্ষ করার পর তিনি তাঁর শিষ্যকে যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথা গুলিকেই বলা হচ্ছে শ্রুতি। এই শ্রুতি বাক্যকে আধার করে মৌনে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির দ্বারা যখন কেউ সাধারণ মানুষের

জন্য উপযোগী করে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে উপস্থাপনা করছেন, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে স্মৃতি। কথামৃতে ঠাকুরের উপলব্ধির কথাগুলো বলা হয়েছে তাই কথামৃত শ্রুতি। কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলোকে আধার করে মৌনের গভীরে গিয়ে কোন সাধক কবি যখন কোন কিছু একটা রচনা করছেন তখন এই রচনা হয়ে গেল স্মৃতি। দুটোতে কিন্তু কোন তফাৎ নেই, কেননা আধ্যাত্মিক সত্য দুটোর ক্ষেত্রে একই থাকল। একটাই সমস্যা হয়, স্মৃতিকাররা রচনার সময় নিজের বুদ্ধির উপর বেশী ভরসা করে থাকেন, বুদ্ধির আশ্রয় করলেই নিজের চিন্তা ভাবনা এসে যায় বলে শ্রুতির কথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা হতে পারে। যদি দেখা যায় শ্রুতির কথার সঙ্গে স্মৃতির কথা মিলছে না, তখন স্মৃতির কথাকে বাদ দিতে বলা হয়। কারণ, স্মৃতি হচ্ছে তোমার বুদ্ধির আশ্রিত। যেমন ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মকে নির্গুণ নিরাকার ভাবে উপাসনা করা হত, কিন্তু তারাই আবার প্রার্থনা করতেন তাঁর চরণে আমার মাথা নত করে দাও। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্গুণ নিরাকার বলা হচ্ছে, আবার কোথাও শুনেছেন যে ঈশ্বরের পা আছে, যেমন গীতাতেই বলা হয়েছে – *সর্বতঃ পাণিপাদং* তৎ *সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্*, এটাও শ্রুতির কথা। এবার ব্রাহ্ম সমাজের যারা বুদ্ধিজীবি তারা দুটোকে দিলেন মিলিয়ে, মিলিয়ে দিতেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের হাত, পা, চোখ সব বেরিয়ে এলো। শাস্ত্রে কোথাও বলা হচ্ছে না নির্গুণ নিরাকারের হাত পা থাকতে হবে, কিন্তু স্মৃতিতে বলা হচ্ছে। এখানে বুদ্ধির বিলাসের জন্য গোলমাল হয়ে গেল। তাই বলা হয় শ্রুতি আর স্মৃতির মধ্যে যদি কোথাও বিরোধ হয় তখন তুমি শ্রুতিকেই অনুসরণ করে স্মৃতির কথাকে বাদ দেবে। কারণ স্মৃতিতে বুদ্ধির খেলা আছে। শ্রুতি আর স্মৃতিতে মূল কথা কি বলতে চাইছে? একটা কথাই বলছে, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আমি কিছু জানিনা। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই বলেই ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর ছাড়া যদি কিছু থাকতো তবেই তো তিনি জানতে পারতেন। কখনই কোন মানুষ ঈশ্বর আর জগৎ এই দুটোকে এক সঙ্গে জানতে পারবে না, যার কাছে জগৎই আছে তার ঈশ্বর থাকবে না, আর যিনি ঈশ্বরকে জানেন তাঁর কাছে জগৎ বলে কিছু নেই – যঁহা কাম ওঁহা নহি রাম, যঁহা রাম ওঁহা নহি কাম, দোনো না মিলে এক থাম, দুটো এক জায়গায় কখনই হবে না। যিনি ঈশ্বর জানেন তিনিই বলবেন, মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই কিছু জানিনা। যিশুও এই একই কথা বলছেন, এক খাপে দুটো তলোয়ার ঢুকবে না, ঠিক তেমনি ঈশ্বর আর জগত এই দুটোকে একসাথে সেবা করতে পারো না।

মানুষ বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন, প্রত্যেকটি মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে তারতম্য, এই তারতম্যকে দেখেই বেদে রুচিভেদে কিছু কথা এসে গিয়েছিল। পরের দিকে স্মৃতিকাররা এই জিনিষগুলোকে আরও বিস্তার করে সামনে নিয়ে এলেন। এনারা দেখলেন জগতে মোটামুটি দুই ধরণের লোক দেখা যায়। এক ধরণের লোকের মধ্যে সংসার বাসনা আছে অর্থাৎ সংসারের দিকে প্রবৃত্তি আছে, এদের জন্য ঠিক করে দিলেন প্রবৃত্তিমার্গ ধর্ম। আরেক ধরণের লোক আছে যাদের জগতের প্রতি কোন আসক্তি নেই কিন্তু কোন কারণে অজান্তাই হোক আর জান্তাই হোক, তাদের শরীর ধারণ করতে হয়েছে। এরা তাহলে কিভাবে জীবন-যাপন করবে? এদেরকে বলা হল তুমি আর কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ কোন কিছুতে মন দিও না, কোন সঞ্চয় করো না, তোমার মনকে সব সময় সচ্চিদানন্দে দিয়ে রাখো। এরাই হয়ে গেলেন নিবৃত্তিমার্গের সাধক। এই দুটো পথ প্রথম থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। নিবৃত্তিমার্গের সাধক সব সময় সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী যারা হয় তারা জন্ম জন্ম ধরেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কি করে সন্ন্যাসী হলেন, এই প্রশ্নই করা উচিৎ নয়। সন্ন্যাসী যদি ভুল করে গৃহস্থ হয়ে যায় তখন বলা যেতে পারে আপনি কি করে গৃহস্থ হয়ে গেলেন। যেমন কোন সৎ লোক যদি রাজনীতিতে চলে আসে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনার মত লোক রাজনীতিতে এল কি করে, এটাতো আপনার পথ নয়। ঠিক তেমনি যার মন সব সময় সংসারেই লিপ্ত হয়ে আছে, সে যদি কোন ভাবে সন্ন্যাসী হয়ে যায় তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা যায়, আপনি সন্ন্যাসী হলেন কি করে। আবার যার মানসিকতা সন্ন্যাসীদের মত সে যদি গৃহস্থ হয়ে যায় তাকে জিজ্ঞেস করে আপনার মত লোক গৃহস্থ হলেন কি করে। যারা ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী তারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী, তারা জন্ম থেকেই সন্ন্যাসীর ভাব নিয়ে বড় হয়, গত জন্মেও সে সন্ন্যাসী ছিল, কোন কারণে সে আটকে গেছে, তারপর সে সাধনা করে করে সে জানতে পারে কেন সে আটকে গিয়েছিল। এরাই হল নিবৃত্তিমার্গের।

আর প্রবৃত্তিমার্গে, মানুষের মন যখন ভোগের দিকে থাকবে তখন তাকে বলা হয় তুমি বিয়েথা করবে, কামনা বাসনা পূরণের সাধনা করবে, সন্তান উৎপত্তি করবে। এই কামের পুর্তির জন্য তোমার অর্থের দরকার হবে। সেইজন্য তোমাকে তোমার ভোগ চরিতার্থ করার জন্য অর্থ উপার্জন করতে হবে আর ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করবে। তোমার কাম সাধনা শুধু এই লোকের জন্যই করবে না, মৃত্যুর পরেও তোমার কামনা বাসনার পুর্তি চাই, তাই তোমাকে স্বর্গে যেতে হবে। সেইজন্য তোমাকে ধর্ম করতে হবে। ধর্ম করলে ইহকাল আর পরকাল, এই দুটো কালের জন্যই তুমি শক্তি পাবে। ধর্ম পালনে যে শক্তি হবে, সেই শক্তি তোমাকে ইহলোকে জীবন-যাপনের জন্য কিছু সুখের ব্যবস্থা করে দেবে, আর ইহ

জীবনে ধর্ম পালনের দ্বারা পূণ্য অর্জন করতে হবে, যে পূণ্যের শক্তিতে মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে সুখ ভোগ করতে পারবে। এই চারটিকে মিলিয়ে আমাদের হিন্দুদের জন্য চারটে পুরুষার্থের কথা বলা হয়, এই চারটে পুরুষার্থ হল – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। যারা একেবারে অধর্ম পথে পা বাড়িয়ে আছে, লাঙল ছাড়া গরুর মতো ভোগ করতে চাইছে, আমাদের ঋষিরা তাদের জন্য কোন বিধান দিচ্ছেন না, ধর্ম তাদের জন্য নয়। এদেরকে বলে দেওয়া হল তোমরা শূদ্র। এটা অবশ্য অনেক আগেকার কথা, কারণ এখন যারা শূদ্র আছে তারা এখনকার ব্রাহ্মণদের থেকে অনেক উন্নত হয়ে গেছে। স্বামীজী তাই বলে গেলেন, ভারতে আর শূদ্র থাকবে না, শুধু সরকারী খাতায় সংরক্ষণের তালিকায় থাকবে। সংস্কৃতি এখন পুরো দেশে এক হয়ে গেছে। কিন্তু যে ধর্ম পথে যেতে চাইছে তার জন্য ঋষিরা বিধান দিয়ে দিলেন তোমার জন্য এই চারটে পুরুষার্থ।

তোমার মধ্যে কাম আছে, তুমি ভোগ করতে চাইছ, অর্থ না হলে তুমি ভোগ করতে পারবে না। আর ইহলোকেই তুমি ভোগ করবে না, পরলোকে গিয়েও তুমি ভোগ করবে, তাই ইহলোকে তোমাকে ধর্ম সাধন করতে হবে। তাই তোমার জন্য ধর্ম, অর্থ আর কাম। যারা নিবৃত্তিমার্গের সাধক তাদের জন্য মোক্ষ। গৃহস্থের জন্য কখনই মোক্ষ নয়, মোক্ষ মানেই পূর্ণ ত্যাগ। গৃহস্থ কি করে সব কিছু ত্যাগ করবে! গৃহস্থের জন্য ত্যাগ নয়, সেতো ভোগ করতে চাইছে। আমি যদি বলি আমার যা ভোগ করার হয়ে গেছে, আমি আর ভোগের মধ্যে থাকতে চাইনা। তাহলে তুমি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়। সন্ন্যাসতো নিতে পারি কিন্তু আমার যে হাঁটুতে ব্যাথা, বৌমা রোজ গরম জলের শেঁক দিয়ে দেয়, সন্ন্যাস নিলে এটা কে করবে। তোমার মন তাহলে এখনও শরীরে পড়ে আছে, তুমি এখনও সুখ সুবিধা চাইছ, তাই সন্ন্যাস জীবন তোমার জন্য নয়। তোমার স্ত্রী পুত্র রয়েছে, তাদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স হয়ে গেছে নতুন করে অর্থ রোজগারে নামতে পারবে না, সন্তানের উপার্জনের উপর তোমাকে নির্ভর করে থাকতে হবে। তুমি আগে থেকেই জানো বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে সন্তানের উপর নির্ভর করতে হবে, তাই প্রথম থেকে তোমাকে সন্তানের জন্ম দিতে হবে। তোমার যদি সন্তান না হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে বিভিন্ন ভাবে সন্তান দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মনুস্মৃতিতে বলে দেওয়া আছে তোমার সন্তান যদি না হয় তাহলে কিভাবে সন্তান দত্তক নেওয়া যেতে পারে, সেখানে আট রকমের উপায়ের কথা বলা আছে। অনেকে যে বলে আমি বিয়েথা করবো না, ব্যাচেলার জীবন কাটিয়ে দেব, আমাদের শাস্ত্রে কোথাও এই ধরণের অনুমতি নেই। আমি বিয়ে করবো কিন্তু আমার সন্তান চাই না, স্বামী স্ত্রী দুজনেই প্রচুর টাকা রোজগার করছে কিন্তু সন্তান নেই, এই ধরণের কাজকেও আমাদের শাস্ত্রে কোথাও অনুমতি দেবে না। বিয়ে করেছ মানেই সন্তানের জন্য, নাহলে বুড়ো বয়সে তুমি কষ্ট পাবে, এইটাই বাস্তব দিক। তুমি তো আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নও যে তোমার শিষ্যরা তোমার দেখাশোনা করবে। শাস্ত্র আমাদের সমাজের পরিকাঠামো একেবারে পরিষ্কার করে তৈরী করে দিয়েছে, হয় তোমাকে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে পুরো ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে, আর তা নাহলে তোমাকে গৃহস্থ ধর্ম পালনের মধ্যে দিয়ে পরিবার ও সমাজের উপর নির্ভর করতে হবে। তার জন্য তোমাকে ধর্ম, অর্থ ও কামের উপর জোর দিতে হবে, এই তিনটের উপর জোর না দিলে তোমাকে বিপদে পড়তে হবে।

এই চারটে পুরুষার্থকে পূর্ণাঙ্গ রূপে সার্থক রূপায়ণের জন্য আমাদের ঋষিরা সাথে সাথে চারটে বর্ণ আর চারটে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচলন করলেন। চারটি বর্ণ হল – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অন্য দিকে চারটে বর্ণাশ্রম – ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। বাণপ্রস্থ হল গৃহস্থ থেকে সন্ন্যাসের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি পর্ব। কিন্তু বাণপ্রস্থের ধারণা আমাদের সমাজ থেকে অনেক আগেই উঠে গেছে, থেকে গেল ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ আর সন্ন্যাস। পরের দিকে এসে ব্রহ্মচর্যের প্রথাটাও উঠে গেছে। ব্রহ্মচর্য আশ্রম যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, গুরুগৃহে বাস, এটা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। যখন ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রচলিত ছিল তখনও মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিবেচিত ছাত্রকে নিয়েই ব্রহ্মচর্য আশ্রম চলত। আমরা যে প্রায়ই পুরনো ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম প্রথার কথা বলি, সেখানে ব্রহ্মচর্য আর বাণপ্রস্থ কখনই সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল না। সবাই যেটা অনুশীলন করত সেটা এই দুটোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, গৃহস্থধর্ম আর সন্ন্যাসধর্ম, যে দুটো এখনও অনুশীলন হয়ে চলেছে। অনেক আগে থেকেই ব্রহ্মচর্য আর বাণপ্রস্থ উঠে গেছে। যখন তোমার কম বয়স তখন তুমি একভাবে থাকবে, যখন তোমার বেশী বয়স তখন তুমি আরেক ভাবে থাকবে। কিন্তু এই চারটে আশ্রম আর চারটে বর্ণের যে কথা বলা হল, এর মধ্যে যিনি সন্ন্যাসী তাঁর আর কোন বর্ণ থাকতো না। কিন্তু বাকি তিনটে আশ্রমের জন্য চারটে বর্ণ নির্দিষ্ট করা ছিল, যেমন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ বৈশ্য ও গৃহস্থ শূদ্র।

বর্ণাশ্রম প্রথাকে প্রয়োগ করা হয়েছিল স্বধর্ম পালনের ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য। একটা মানুষের কোন্ আশ্রমে কি কর্তব্য হবে, সে কি কাজ করতে করতে ধর্মের পথে এগোতে পারবে এবং সেখান থেকে সে কিভাবে মুক্তির পথে

এগিয়ে যেতে পারবে, এইগুলোকে সঠিক ভাবে করার জন্যই বর্ণাশ্রম প্রথা আর স্বধর্মের পালনের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন করা হয়েছিল। সবাইকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হত তুমি যে বংশে জন্ম নিয়েছ, সেই বংশের সংস্কৃতি ও ধারা অনুসারে যদি তুমি কর্তব্য কর্ম করতে থাক তাহলে তোমার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। যদি কেউ বলে দিত, আমি বংশের ধারা অনুযায়ী কাজ করতে চাইনা, আগেকার দিনে এই ব্যাপারে খুব একটা কড়াকড়ি ছিল না, যেমন বিশ্বামিত্র, তিনি আগে ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু পরে তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন, ঠিক তেমনি দ্রোণাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, কিন্তু পরে তিনি হয়ে গেলেন ক্ষত্রিয়, এই ব্যাপারে খুব একটা আপত্তি বা বাধাও দেওয়া হতো না। এই জিনিষগুলো তখন ছিল, পরের দিকেও ছিল কিন্তু বেশী প্রচার ছিল না। ব্রাহ্মণ ছেলেরাও ক্ষত্রিয় হয়ে যেত আর ক্ষত্রিয়ের ছেলেরাও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করত। খুব বেশী না থাকলেও কিন্তু নিষেধ ছিল না। কিন্তু সাধারণ ভাবে যেটা ছিল সেটা স্বধর্ম, তুমি যে বংশে জন্ম নিয়ে শৈশব কাল থেকে যে ভাবে শিক্ষা পেয়ে এসেছ, সেই শিক্ষানুসারে তুমি যদি নিজেকে তৈরী কর তাহলে তাতে তোমার উন্নতির গতি ত্বরান্বিত হবে। এখানে বৃদ্ধের জন্য স্বধর্ম আলাদা আর অল্প বয়সীদের জন্য আলাদা স্বধর্ম। এই পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে এনারা স্বধর্মকে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

শাস্ত্রের একটা মূল কাজ ছিল স্বধর্মকে ব্যাখ্যা করা। স্বধর্ম কখনই স্থিতিশীল ছিল না, স্বধর্ম সব সময়ই গতিশীল। তোমার যেমন যেমন বয়স পাল্টাবে তোমার কর্তব্য কর্মও পাল্টাতে থাকবে। কর্তব্য পাল্টানো মানে তোমার স্বধর্মও পাল্টাবে। স্বধর্ম যখন যেমন যেমন পাল্টাবে তোমাকেও ঠিক তেমন তেমন ধর্ম পালন করতে হবে, যদি না কর তাহলে তুমি বিপদে পড়বে। তার কারণ তোমার কাছ থেকে কিছু জিনিষ আশা করা হচ্ছে যেটা স্বধর্মের বাইরে থেকে তোমার পক্ষে করা অসম্ভব। আগেকার দিনে একটা নিম্ন বর্ণের ছেলে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে তার বাবা মা সমাজে ঝাড়ু দেওয়া, লোকের বাড়ির নোংরা পরিষ্কার করার কাজ করে আসছে, সেও একটু বড় হতেই বাবা-মার সাথে কাজে হাত লাগাতো। এখন একটা বয়সে এসে সে ঠিক করল আমি এসব কাজ না করে বেদ অধ্যয়ণ করব। সে নিশ্চয়ই বেদ পড়তে পারে, সেই রকম গুরু যদি পায়, গুরু যদি দেখেন শাস্ত্রের কথাগুলো ধারণা করার মত তার মেধা আছে, তাতে গুরুও রাজী হয়ে বেদ শেখাতে পারেন, আর সেও হয়তো বেদ পড়ে বড় হতে পারবে। কিন্তু তার জীবনের উন্নতির স্বাভাবিক ধারা হবে সেবার মাধ্যমে, কারণ সে এই পরিবেশের মধ্য থেকেই বেড়ে উঠেছে। এখন যদি কোন ব্রাহ্মণ ছেলের ইচ্ছে হয় আমি খুব ভোগ করব, তাকেও বলা হবে যে, নিশ্চয় তুমি ভোগ করতে পার, আর এটাও ঠিক যে ভোগান্ত না হলে তোমার স্বাভাবিক উন্নতি হবে না। কিন্তু তার আগে ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করে যে শ্রেণীর লোকেদের জন্য ভোগের অনুমতি দেওয়া আছে তাদের মধ্যে গিয়ে তোমাকে বাস করতে হবে। যে বেদ অধ্যয়ণ করতে চাইবে তাকে যেমন খুশি ভোগ করা কিছুতেই চলবে না।

ঋষিরা অনেক চিন্তা ভাবনা করে সবার স্বার্থেই এই ধরণের বর্ণ ও আশ্রম প্রথা চালু করেছিলেন। কারণ তাঁরা দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই, অথচ জগতের সত্তা, যে সত্য আমাদের প্রত্যক্ষ হচ্ছে এই সত্তা ও ঈশ্বরের সাথে মেলাবে কি করে? একমাত্র জগতকে নিয়ে পড়ে থাকলে তোমরা দুঃখ, কষ্ট পেতেই থাকবে, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতেই থাকবে। কিন্তু ঈশ্বরই সব কিছু, একমাত্র তিনিই আছেন এই জ্ঞান হয়ে গেলে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এই চরম লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঋষিরা চারটে পুরুষার্থকে নিয়ে এলেন। পুরুষার্থের ধারণা থেকে জন্ম নিল স্বধর্ম তত্ত্ব। স্বধর্ম আবার সার্থক ভাবে পালন করার জন্য সৃষ্টি হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। ঈশ্বর, জগৎ, পুরুষার্থ, স্বধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম এই পুরো ব্যাপারগুলোকে বোঝান হল আমাদের শাস্ত্রের কাজ।

শাস্ত্র দুই রকমের – শ্রুতি ও স্মৃতি। ভারতে যত আধ্যাত্মিক শাস্ত্র রচিত হয়েছে সব শাস্ত্রকে চারটে ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। শুধু ভারতের ধর্মই নয়, যে কোন ধর্মকে দাঁড়াতে হলে তার চারটে স্তম্ভের দরকার হয়, প্রথম হচ্ছে দর্শন, দ্বিতীয় পুরান, তৃতীয় তন্ত্র বা উপাচার এবং চতুর্থ স্মৃতি, সামাজিক আচরণ বিধি, নিজে আমি কিভাবে থাকব সাথে সাথে সমাজে আমি কিভাবে থাকব। হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে এই চারটে একটা আরেকটার সাথে মিশে গেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মে প্রথম থেকেই এই চারটে পরিষ্কার আলাদা ভাবে রাখা হয়ে আছে। হিন্দুধর্মের দর্শন আসে উপনিষদ থেকে, পুরান আসছে পৌরানিক কাহিনী ও ইতিহাস মূলক শাস্ত্র থেকে, পূজা অর্চনা ও উপাচার কিছু কিছু পুরান থেকে আসে কিন্তু মূলতঃ তন্ত্র থেকেই আসে। আচরণ বিধি আসে স্মৃতি থেকে। এই চারটের উপর ধর্ম দাঁড়িয়ে থাকে। বেদ হল এই চারটেরই উৎস, বেদের মধ্যে এই চারটেই আছে। পরের দিকের কোন কোন ঋষি নিজের বুদ্ধি ও মেধার সাহায্যে বেদের যে কোন একটাকে অবলম্বন করে শুধু ওটাকে নিয়েই পড়ে থাকলেন। এদের মধ্যে ব্যাসদেবই একমাত্র ব্যাতিক্রমী, তিনি এই চারটেকেই নিয়েই এগিয়ে গেলেন। গীতাতে তিনি দর্শনকে নিয়ে এলেন, পুরানকে তিনি আঠারোটি পুরান আর ইতিহাস

মূলক শাস্ত্র মহাভারতে রেখে দিলেন, মহাভারতেই তিনি সামাজিক আচার আচরণগুলিকেও সাজিয়ে দিলেন। পরে ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র রচনা করে দর্শনকে আরও বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপনা করলেন। এটাই হল ব্যাসদেবের ব্যাতক্রমী প্রতিভা।

এই হল ভারতের আধ্যাত্মিক কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই কাঠামো শুরু হয় খুব সাধারণ একটা তত্ত্ব দিয়ে তা হল, সচ্চিদানন্দই একমাত্র বস্তু আর বাকি সব অবস্তু। কিন্তু আমাদের সবার কাছে অবস্তুটাই বস্তু হয়ে আছে, এই দুটোকে মেলাতে গিয়ে কতকগুলো জিনিষকে অবলম্বন করতে হয়, সেই জিনিষগুলোই সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হল। এই জায়গা থেকে আমরা মহাভারতের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। মহাভারত হল ইতিহাস মূলক শাস্ত্র। মহাভারতকে পৌরানিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করা হলেও, পুরান বলতে আমরা আঠারোটা পুরানকেই মনে করি। ইতিহাস মূলক শাস্ত্র একটা বিশেষ শ্রেণীর শাস্ত্র হলেও ইতিহাস আর পুরান একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

ইতিহাস মূলক শাস্ত্রের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। তবে ইতিহাস মূলক শাস্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চারটে পুরুষার্থের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দেওয়া হয়; এই চারটের শিক্ষার কথা যদি না বলা হয় তাহলে তাকে কোন ভাবেই ইতিহাস মূলক শাস্ত্র বলা যাবে না। এই ইতিহাস আর স্কুল কলেজে যে ইতিহাস পড়ান হয়, এই দুই ইতিহাসের কোন মিল নেই। শাস্ত্রে যখন ইতিহাসের কথা আসে, তখন তার অর্থ একটাই, কোন একটি বড় চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনীর মাধ্যমে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এই শিক্ষা যদি না দেওয়া হয় তাহলে সেটা ইতিহাস মূলক শাস্ত্র হবে না, তখন এটা নিছক একটি বিশেষ রাজার বংশের কাহিনী বা বংশাবলী হয়ে থাকবে, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র অধ্যয়নকারী ছাত্রের কাছে যার কোন মূল্য নেই। বিদেশীরা যে বলে ভারতীয়দের ইতিহাস বোধ বলে কিছু নেই। ইতিহাস বোধ থাকবে কি করে? আমরা এই ধরণের ইতিহাসকে কোন মূল্যই দিই না। কুইন ভিক্টোরিয়া কি পোষাক পড়তেন, কবে জন্ম নিয়েছেন, কত দিন রাজত্ব করেছেন এগুলো জেনে আমার কি হবে! কিন্তু যখন রাবণের কাহিনী শুনছি, দুর্যোধনের গল্প যখন শুনছি, তখন সেই গল্প ও কাহিনীর মাধ্যমে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে, এই রকম চরিত্র যদি তোমার হয় তাহলে তোমারও এই একই পরিণতি হবে। যত শাস্ত্র আছে, মনুস্মৃতি, তন্ত্র, বাল্মীকি রামায়ণ, ভাগবদ পুরান সবাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটেকে শিক্ষা দিচ্ছে। একমাত্র উপনিষদই ব্যতিক্রম, উপনিষদ বলবে আমার কাছে ধর্ম, অর্থ ও কামের কোন সম্পর্ক নেই, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষ, উপনিষদ তাই মোক্ষশাস্ত্র। কথামৃতও তাই, মোক্ষশাস্ত্র। মোক্ষশাস্ত্রে মোক্ষের কথা ছাড়া আর কোন আবর্জনা থাকবে না। টাকা সঞ্চয় তুমি কিভাবে করবে, ভোগ কিভাবে করবে, স্বর্গে কিভাবে যাবে এই ধরণের কোন কথা কথামৃত, গীতা, উপনিষদের কোথাও পাওয়া যাবে না, কারণ এগুলো হল মোক্ষশাস্ত্র। মোক্ষ শাস্ত্রের অর্থই হল, এখানে এই তিনটে জিনিষ, ধর্ম, অর্থ ও কামের কথা থাকবে না। গীতাতে কোথাও এই তিনটে জিনিষকে নিয়ে আলোচনা করবে না, বরঞ্চ নিন্দা করবে। কিন্তু মহাভারত ধর্ম, অর্থ ও কামের কথা বলবে, কারণ মহাভারত মোক্ষশাস্ত্র নয়। মহাভারত হল ধর্মশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এই চারটে জিনিষকে সমন্বয় করে নিয়ে এগিয়ে যাবে। বাল্মীকি রামায়ণও তাই, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের অন্য সমস্যা হল এখনে মোক্ষের কোন কথাই নেই, তাই বাল্মীকি রামায়ণও অসম্পূর্ণ ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্র তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে যখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটেকেই শিক্ষা দেবে। এই চারটে যদি না থাকে তাহলে সেটা একাঙ্গী, মোক্ষশাস্ত্র সেই ক্ষেত্রে সর্বোপরি, কারণ যদি মোক্ষশাস্ত্র হয় সেখান থেকে বাকি তিনটে বেরিয়ে চলে আসবে। কিন্তু যেমন নাট্যশাস্ত্র বা বাৎসায়নের কামশাস্ত্র, যদিও বলছে কামশাস্ত্র তাতে কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু ঠিক ঠিক অর্থে এটা শাস্ত্র হয় না, শাস্ত্র মানেই সেখানে এই চারটে জিনিষকেই শিক্ষা দেবে। এদের বক্তব্য হল, তোমার কাম যদি ঠিক থাকে থাহলে তোমার ধর্ম সাধনও হবে, অর্থ সাধনও হবে আবার মোক্ষ সাধনও হবে, কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি। শাস্ত্রের দ্বিতীয় সংজ্ঞা হল, এই চারটের যে কোন একটির শিক্ষা দেবে। গীতাঞ্জলী যদিও সাহিত্যের ও বক্তব্যের মূল্যায়নে অত্যন্ত উচ্চমানের কিন্তু যেহেতু এই চারটের কোন একটিকেও শিক্ষা দিচ্ছে না তাই গীতাঞ্জলীকে শাস্ত্র বলা যায় না। সেইভাবে ভারতীয় সংবিধানও শাস্ত্র নয়। মহাভারতই একমাত্র শাস্ত্র যেখানে এই চারটেকেই বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের কাঠামোটা মোটামুটি এই রকম – এখানে মূল বক্তব্য হল ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু আমাদের সামনে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ দেখছি এটাকেও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই আপাত বিরোধ দুটো সত্তাকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করেন। আমাদের ঋষিরাও এই দুটোকে অস্বীকার করেননি। তাই তাঁরা দুটো পথের ঠিকানা বলে দিলেন। যাদের মন ঈশ্বরের দিকে বেশী এবং সংসারের দিকে কম তাদের জন্য নিবৃত্তিমার্গ। এদের পথ পুরো আলাদা, এরা সন্ন্যাস জীবন যাপন করে মোক্ষের সাধন করতে থাকবে। যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস

আছে কিন্তু জগৎকে বেশী সত্য বলে মনে হয় তাদের জন্য প্রবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গের জন্য তিনটে পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ ও কামের কথা বেশী বলা হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম কিভাবে সাধন করা হবে তার জন্য বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যেই স্বধর্মের ধারণার জন্ম নেয়। ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এই কাঠামোর মধ্যেই বিস্তার লাভ করে, এই কাঠামোর বাইরে কিছুই যাবে না।

ঋষিরা কখন পরমার্থ তত্ত্বের আলোচনা করবেন আবার কখন স্বধর্মের আলোচনাও করবেন। চারটে পুরুষার্থের মধ্যে যে ধর্মের কথা বলা হয় তার সাথে আমরা যে ধর্ম পালনের কথা বলি এই দুটো পুরো আলাদা। ধর্মের পরিভাষাকে একেক জায়গায় একেক রকম ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। ধর্মকে বিভিন্ন অর্থে নেওয়া যেতে পারে, একটা যেমন হিন্দুধর্ম, খ্রীশ্চান ধর্ম এই গুলিকেও ধর্ম বলা হচ্ছে, তুমি ধর্ম পালন কর যাতে তুমি স্বর্গে যেতে পার, এখানে ধর্ম মানে স্বধর্ম পালনের কথা বলা হচ্ছে। শাস্ত্রে যখন ধর্মের আলোচনা করা হয় তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বধর্ম অর্থেই নেওয়া হয়। হিন্দুধর্মের কথা যখন বলা হবে তখন সেই ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম শব্দকেই গ্রহণ করা হবে, আর যেখানে যজ্ঞ-যাগের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয় সেখানে এই ধর্ম শব্দের ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না, তবে পুরুষার্থের ধর্ম বলতে ঐ ধর্মকেই ইঙ্গিত করে, যেটা করলে আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। আমরা যে ধর্ম পালনের কথা বলি সেটা ইহলোকের জন্য, এটাই হল স্বধর্ম। একটা হল স্বধর্ম পালন, আরেকটি হল হিন্দুধর্ম, অন্যটি যজ্ঞাদি ক্রিয়া রূপ ধর্ম পালন। মোটামুটি এই তিনটে অর্থেই ধর্ম শব্দকে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এখানে আমরা ধর্মকে স্বধর্ম অর্থেই ব্যবহার করব। যখন শাস্ত্রের কথা আসবে, বিভিন্ন কথা কাহিনী যেখানে থাকবে বা সাধারণ আলোচনা থাকবে সবটাতেই মূল উদ্দেশ্য থাকবে এই চারটে পুরুষার্থের দিকে কিভাবে আমরা এগোব।

সাথে সাথে আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে ধর্মের চারটি স্তম্ভকে নিয়ে – দর্শন, পুরান, তন্ত্র ও স্মৃতি। এই চারটি স্তম্ভের আলোচনাতেও ঘুরে ফিরে এই চারটি পুরুষার্থের কথা আসবে। যেমন মহানির্বাণ তন্ত্রে বিভিন্ন পূজা উপাচারের কথা বলা হচ্ছে, কারণ এই উপাচার পদ্ধতিও ধর্মের একটি স্তম্ভ। এদের বক্তব্য হচ্ছে তন্ত্রের এই নিয়মকে যদি তুমি অনুসরণ করে চল তাহলে তোমাকে প্রথমে ধর্ম, অর্থ ও কাম দেবে, পরে তোমাকে মোক্ষের দিকে নিয়ে চলে যাবে, এই চারটে পুরুষার্থের বাইরে কেউ যাবে না। ঠিক তেমনি, মনুস্মৃতিতে স্বধর্ম পালনের কথা বলতে গিয়ে বলা হবে স্বধর্মটা কি, স্বধর্ম পালন কিভাবে হবে। স্বধর্ম পালন করলে তোমার ধর্ম, অর্থ ও কাম তিনটেই হয়ে যাবে, সাথে সাথে তুমি যদি মোক্ষ সাধনও করে রাখ তাহলে তোমার মোক্ষও হয়ে যাবে। মহাভারত ও পুরানে এই একই কথা বলবে। পুরান বা মহাভারতের কোন কথা ও কাহিনীর মধ্যে খুব গভীর ভাবে মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এই কাহিনীর মাধ্যমে কি বলতে চাইছে তাহলে সেখানেও ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটেই বেরিয়ে আসবে, যেটা তুমি চাও সেটাই তুমি পেয়ে যাবে। এই হল হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের কাঠামো।

আমরা এখানে মহাভারতের কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি। প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনে একবার অন্তত মহাভারত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নেওয়া দরকার। মহাভারত একবার আগাগোড়া পড়ে নিলে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকের হিন্দুধর্মের পুরো ছবিটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মহাভারত কি শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস? *(পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও ভারতের যুক্তিবাদীদের ধারণা – মহাভারতে বিষ্ণু আর শিবের স্থান – ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা – ঠাকুরের সাধনা – সাধকেরসিদ্ধির পথে অবলম্বন)*

আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি মহাভারত কৌরব আর পাণ্ডবদের পারিবারিক বিবাদের কাহিনী। কিন্তু কৌরব আর পাণ্ডবদের কাহিনী মহাভারতের খুব ছোট্ট একটা অংশ। মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোকের মধ্যে মাত্র দশ থেকে বারো হাজার শ্লোক কৌরব আর পাণ্ডবদের নিয়ে, বাকি আশি হাজার শ্লোক অন্যান্য বিষয় ও কাহিনীকে নিয়ে। হিন্দুদের মানসিকতার মধ্যে দর্শন ও পৌরানিক কথা কাহিনীর প্রভাব প্রথম থেকেই। হিন্দুরা গোঁড়া ঐতিহাসিকও নয় আবার গোঁড়া বিজ্ঞান মনস্কতারও নয়। যার ফলস্বরূপ আমরা যখনই কোন বিরাট কিছু দেখে নিই, সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে হয় একটা দর্শনের রূপ দিয়ে দিই নয়তো পৌরানিক রূপ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিই। মহাভারত কে লিখেছেন, কিভাবে লেখা হয়েছে, কিভাবে সারা ভারতে হিন্দুদের মধ্যে মহাভারতের সম্প্রসার হয়েছে এটাই একটা বিরাট আলোচ্য বিষয়।

পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক পণ্ডিতরা মহাভারতের প্রাচীনত্বকে নিয়ে অনেক ধরণের কথা বলে, কিন্তু এদের কোন কথাই যুক্তি ও তথ্যের নিরিখে দাঁড়াতে পারেনা। এদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের দেশের তথাকথিত যুক্তিবাদীরা বিশেষ

করে মার্ক্সীয় তত্ত্বের পোষক ঐতিহাসিকরা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে সচেষ্ট। এদের একটা তত্ত্ব হল, উপনিষদ হল বেদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। আর মহাভারতকে বলা হল, উচ্চবর্ণের ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ নিপীড়ত মানুষের কন্ঠস্বর। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটা কথাই বলা যেতে পারে, মহাভারত রচনা করেছেন ব্যাসদেব ও তাঁর শিষ্যরা, যাঁরা ছিলেন তখনকার দিনের উচ্চবর্ণের ব্রাক্ষণ। এখন উচ্চবর্ণের ব্রাক্ষণরা কি করে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের কথা বলতে যাবেন, এদের এই তত্ত্বকে কিছুতেই মেলানো যায় না। এদের কাছে আধ্যাত্মিকতা বলে কিছু নেই, ধর্ম বলে কিছু নেই এরা সব কিছুতেই শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে নিয়ে আসেন, শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়া এরা আর কিছুই জানে না। মহাভারতকেও শ্রেণী সংগ্রামের দলিল বলে চিহ্নিত করে দিলেন। মহাভারতের আগে যে বিষ্ণু ছিলেন চাষাভুশোদের একজন সাধারণ দেবতা, মহাভারত তাঁকে উচ্চস্থানে নিয়ে এল। শিব যিনি ছিলেন আদিবাসীদের দেবতা তাঁকেও মহাভারত উচ্চ আসনে বসিয়ে দিল। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে মহাভারত কখনই কোন দেবতাকে উচ্চস্থানে নিয়ে আসেনি, এর পেছনে যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ঋষিরা দিয়ে গেছেন, এগুলো বোঝার ক্ষমতা এদের কারুরই নেই। এগুলো বুঝতে অনেক সময় লাগে এবং তার জন্য অনেক দিনের সাধনা চাই। ঠিক এই ভুলটা অনেকে ঠাকুরের ক্ষেত্রেও করে ফেলেন। কিছু বক্তা ভাষণে বলেন – শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম হল নারীজাতির কল্যাণ। এর পেছনে কি যুক্তি দেখাচ্ছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু রূপে বরণ করলেন এক মহিলাকে, তিনি তাঁর সাধনার সব ফল অর্পণ করলেন এক মহিলা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে, আর তাঁর ইষ্টদেবী হলেন একজন মহিলা, মা কালী। এখানে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীটাই পরিষ্কার নয়। তাহলে ভৈরবী ব্রাক্ষণী ছাড়া ঠাকুরের যে এত গুরু ছিলেন তাঁরা কোথায় গেলেন? আর মা কালীকে যে তিনি ইষ্ট রূপে গ্রহণ করেছেন, এর সাথে আধ্যাত্মিকতার কি সম্পর্ক আছে? শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি আমরা সাধক রূপে দেখি, তখন সাধক সাধনা করে যে সিদ্ধির অবস্থায় পৌঁছান তখন তিনি মা কালীকেও দেখেন না, শ্রীকৃষ্ণকেও দেখেন না, তিনি দেখেন সেই অখণ্ড আধ্যাত্মিক সত্তা, যাঁকে সচ্চিদানন্দ বলা হচ্ছে। সচ্চিদানন্দ কোন নাম বা রূপ নয়। তিনি তখন দেখছেন একটাই জিনিষ আছে, যেটা আছে সেটা সৎ, সেটা চিৎ আর সেটাই আনন্দ। কিরকম আছে? যেমন এই বোতলটা আছে, আছে মানে সৎ। আর কি দেখছেন? ইনি জড় নন, ইনি চিৎ, চৈতন্যময়। আর কি দেখেন? ইনি আনন্দময়, শুধুই আনন্দ। এই তিনটেকে মিলিয়ে বলা হয় সচ্চিদানন্দ। যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি ঈশ্বর, সৎ, চিৎ কি তাঁর উপাধি, আনন্দ কি তাঁর স্বভাব? না, যিনি সৎ তিনিই চিৎ আবার তিনিই আনন্দ। এই তিনটে তাঁর রূপ নয়, যেটাই এটা, সেটাই এটা। ইংরাজীতে একটা খুব বিখ্যাত উক্তি আছে to know is to love একটা জিনিষকে জানা মানে ভালোবাসা, ভালোবাসা মানে আনন্দ। একটা জিনিষটাকে যত জানবো সেই জিনিষটার প্রতি তত ভালোবাস বাড়তে থাকে। আর যে জিনিষের প্রতি যত ভালোবাসা বাড়তে থাকবে তত বেশী আমি জানতে থাকবো। চিৎ ও আনন্দ সব সময়ই একসাথে থাকে, এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আর যেটাই সৎ সেটাই চিৎ।

সাধক যখন ঐ সিদ্ধির অবস্থায় পৌঁছান তখন তিনি দেখেন সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে এসে অনেক সাধকের মনটা সচ্চিদানন্দে লীন হয়ে যায়। মন যদি লীন না হয়ে থাকে তাহলে তিনি সেখান থেকে আবার এই জগতের মাঝখানে মনটাকে নামিয়ে আনেন। তিনি যখন জগতের মাঝখানে ফিরে আসেন তখন তিনি যে জিনিষকে অবলম্বন করে সিদ্ধির ঐ চরম অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, সেটাই তখন তাঁর কাছে সচ্চিদানন্দের সর্বোচ্চ প্রকাশ হয়ে যায়। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করে সিদ্ধির অবস্থায় গিয়েছিলেন, তিনিই যখন ঐখান থেকে ফিরে আসবেন তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই সবচেয়ে উপরে দেখবেন, তখন তিনি বলবেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এই আপেক্ষিক জগতে তাঁর কাছে এটাই সত্য, শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। ব্যাসদেব যখন বিষ্ণুকে নিয়ে সাধনা করছেন, বেদে যে বিষ্ণু ছিলেন একজন অতি সাধারণ দেবতা, সাধনার পর সেই বিষ্ণুই হয়ে গেলেন ব্যাসদেবের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান। আমাদের ঠাকুরের ভাবধারায় কে সর্বশক্তিমান? সবাই, কালী, শিব, কৃষ্ণ সবাই। ঠাকুরের প্রথম সাধনা মা কালীকে অবলম্বন করেই হয়েছিল, সেখান থেকে যখন নীচে নেমে এলেন তখন তিনি মাকেই অবলম্বন করে থাকলেন। তাই বলে কি ঠাকুর মাতৃসাধনাই করেছেন? এখানেই আমরা ভুল ধারণা করে বসি। ঠাকুর একটাই সাধনা করেছেন, সেটা হল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সাধনা। কিন্তু জগতের মধ্যে যখন তিনি বিচরণ করেন তখন অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সর্বোচ্চ প্রকাশকে ঐ মা কালী রূপেই দেখেন যে মা কালীকে অবলম্বন করে তিনি সিদ্ধি পেয়েছিলেন। ঠাকুর যখন রামমন্ত্রে সাধনা করছেন তখন তিনি দেখছেন সবই রামময়। যখন নির্গুণ নিরাকারের রূপে সাধনা করছেন তখন বলছেন ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রক্ষঃ। যখন মা কালীর সাধনা করছেন তখন বলছেন ওঁ সচ্চিদানন্দ কালীঃ, ঠিক তেমনি কোন সময় বলছেন ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ। আমি যদি কাল কোন সাধারণ দেবতাকে সাধনা করে সচ্চিদানন্দে পৌঁছে যাই, সেখান থেকে নেমে এসে দেখবো তিনিই হলেন highest manifestation of অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। এখন এটাকে কি আমরা শ্রেণী সংগ্রাম বলে চালিয়ে দেব, না এটা আমারই মনের একটা বিশেষ অবস্থার রূপ?

এই জিনিষগুলোই তথাকথিত যুক্তিবাদী মার্ক্সিস্ট ঐতিহাসিকরা ধরতে পারেন না। নিজেদের ধারণার বাইরে বলে নিজের যেটুকু সীমিত বোধ বুদ্ধি আছে সেটুকুকে নিয়েই যত কেরামতি দেখাবার জন্য প্রাণপাত করে।

আমরা যা কিছু দেখি সবটাই আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে দেখি। আমরা দেখি এখানে কোন শ্রেণী সংগ্রামের নাম গন্ধ নেই, এখানে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে সংগ্রাম তার ইতিহাস। শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, পুরান এগুলোকে বিশ্লেষণ করার দুটো পথ আছে, একটা হল ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ আর একটা পথ হল পরম্পরা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা। আমাদের সব শাস্ত্রই হল সম্প্রদায় বিদ্যা। ভুল সব ক্ষেত্রেই হতে পারে, ঐতিহাসিক পদ্ধতিতেও ভুল আছে আবার পরম্পরাগত বিদ্যাতেও ভুল থাকতে পারে। ম্যাক্সমুলার বেদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমের দিকে বলে দিলেন, বেদের এই চারটি বিভাজন, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ঠিক ঠিক খাপ খায় না। কিন্তু যত তিনি ভেতরে ঢুকতে থাকলেন ততই তিনি আগেকার চিন্তাধারা থেকে সরে এসেছিলেন। পরের দিকে এসে বললেন, পরম্পরাগত ভাবে বেদের এই চারটি বিভাজন করাতে কোন ভুল নেই। কারণ প্রত্যেকটি সামাজিক কাঠামোতে তাদের নিজস্ব সমস্যা আছে।

মহাভারতের রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক

মহাভারতের রচনাকালকে নিয়ে এখনও প্রচুর গবেষণা চলছে। প্রত্যেকেই তাদের মতকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য কত রকমের তথ্য আর যুক্তি নিয়ে মারামারি করবে ভাবা যায় না। আমাদের সেই সব আলোচনার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিত ঐতিহাসিকদের মতে বলা হয় মহাভারতের রচনা আজ থেকে চার হাজার বছর আগে, এনারা কিছুতেই চার হাজারের নীচে মানতে রাজী হবেন না। আবার অনেক ঐতিহাসিকই এই হিসাবকে কোন গুরুত্বই দেয় না। অন্য দিকে এরাও বলছে যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারতে একটা বিরাট যুদ্ধ হয়েছিল, যাকে মহাভারতের যুদ্ধ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাসদেব নিজেই বলছেন যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল তার পাশেই তাঁর কুঠিয়া ছিল। যদি সাড়ে তিনি হাজার বছর আগের যুদ্ধের কথাটা মেনে নেন, তাহলে ব্যাসদেবের কথাটা কত দিন আগেকার বলে মানবেন? আর ব্যাসদেব তিনি তাঁর জীবদ্দশায় লিখেছিলেন না মৃত্যুর পর তাঁর প্রেতাত্মা এসে লিখেছেন? মরার পরতো তিনি মহাভারত রচনা করেননি, জীবদ্দশাতেই তিনি রচনা করে গেছেন, তাহলে এমনিতেই সাড়ে তিন হাজার বছর হিসেবে এসে যাচ্ছে। কিন্তু এনারা বলবেন, যুদ্ধ হয়েছিল সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর মহাভারত রচনা হয়েছিল দুই কি আড়াই হাজার বছর আগে। আবার এনারাই বলছেন গীতা লেখা হয়েছে তিন হাজার বছর আগে, কিন্তু মহাভারত রচনা হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগে। ছেলের আগে জন্ম হয়ে গেছে আর মায়ের জন্ম পরে হয়েছে এটা কি কখন সম্ভব!

পরম্পরাতে মহাভারত সম্বন্ধে বলছে ব্যাসদেবের চোখের সামনে এই বিরাট নরসংহার হয়েছিল। নরসংহার দেখে তিনি মহাভারত রচনার প্রেরণা পেলেন। তিনি লিখলেন, কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না, মনে কষ্ট যেটা ছিল সেটা থেকেই গেল। সেই সময় নারদ ব্যাসদেবকে বললেন – আপনি ভগবানকে আধার করে এই মহাভারত রচনা করেননি, আপনার মনকে যদি শান্ত করতে চান তাহলে ভগবানকে আধার করে কিছু রচনা করুন। ব্যাসদেব তখন ভাগবদ্ রচনা করলেন। একই জিনিষ, ভাগবতেও মহাভারতের অনেক কিছুরই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রধান চরিত্র। মহাভারতেও শ্রীকৃষ্ণ আছেন কিন্তু প্রধান চরিত্র নন।

জয়, ভারত ও মহাভারত

সমগ্র মহাভারতে পরিষ্কার তিনটি ভিন্ন নামে তিন ধরণের রচনা পাওয়া যায়। প্রথমটা জয়, জয় বলা হয় এই কারণে যে কৌরবদের উপর পাণ্ডবদের জয় হয়েছিল। জয় রচনা করার পর ব্যাসদেব ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, খুব ছোট হয়ে গেছে। তারপর তিনি রচনা করলেন ভারত। ভারতে ভারত বংশের কথা। ভারতের পর ব্যাসদেব তৃতীয় যেটি রচনা করলেন তার নাম দিলেন মহাভারত। জয় গ্রন্থে বলা হয় আট থেকে দশ হাজারের মত শ্লোক ছিল, যখন ভারত রচনা হল তাতে তখন চব্বিশ হাজারের মত শ্লোক রাখলেন, শেষে মহাভারতে গিয়ে এক লক্ষ শ্লোক রচনা করলেন। মহাভারতের গল্পটা এমন ভাবে চলছে মনে হয় যেন তিনটে আলাদা আলাদা স্তরে সাজানো। অথচ মহাভারতের মধ্যেই এই তিনটে আলাদা স্তর দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে বলাই আছে, যখনই বড় কবি কোন কাহিনী শ্লোকের আকারে রচনা করেন তখন পুরো কাহিনীটাকে প্রথমে সংক্ষেপে বলে দেন, তারপরে বিস্তারিত ভাবে বলেন। বাল্মীকি রামায়ণেও এই বৈশিষ্ট্য নজরে আসবে, প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে রামায়ণ কথা বলার পর পরে বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে।

ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করার পর প্রথমে তিনি তাঁর সন্তান শুকদেবকে মহাভারত শুনিয়েছিলেন। শুকদেব পরে বৈশম্পায়নকে শুনিয়েছিলেন। বৈশম্পায়ন মুনি ব্যাসদেবরই শিষ্য ছিলেন। যজুর্বেদ বৈশম্পায়নকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ব্যাসদেব যখন বেদের বিভাজন করেছিলেন তিনি সেই সময় বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদের দায়ীত্ব দিয়েছিলেন। বৈশম্পায়ন আর শুকদেব যদিও দুজনে গুরুভাই ছিলেন কিন্তু শুকদেবের স্থান অনেক উঁচুতে ছিল, কারণ শুকদেব হচ্ছেন পরমহংস পরিব্রাজক অন্য দিকে বৈশম্পায়ন ছিলেন ঋষি মাত্র।

নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ ও জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ

মহাভারতের কাহিনী শুরু হয় এই ভাবে, নৈমিষারণ্যে একজন ঋষি বারো বছর ধরে একটা যজ্ঞ করছিলেন। সেই সময় সেখানে সৌতি নামে একজন ঋষির আগমন হয়েছে। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা, যাঁরা বারো বছর ধরে যজ্ঞ করছিলেন, তাঁরা সৌতি ঋষিকে বললেন – আমাদের এই যজ্ঞ অনেক দিন ধরে চলবে, আর সারা দিন ধরে যজ্ঞ তো চলবে না, মাঝখানে প্রচুর অবসর সময় আছে, ঐ সময়ে আপনি আমাদের মহাভারতের কথা শ্রবণ করান। সৌতি ঋষি মহাভারত শুনেছিলেন বৈশম্পায়নের কাছে। সৌতি বৈশম্পায়নের কাছে যেমনটি শুনেছিলেন ঠিক তেমনটি ঋষিদের কাছে মহাভারতের কাহিনী বলতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে স্তরগুলো বাড়ছে। বৈশম্পায়ন শুনেছিলেন শুকদেবের কাছে।

বৈশম্পায়ন ঋষি কোথায় মহাভারতের কথা বলেছিলেন? তক্ষকের দংশনে রাজা পরীক্ষিৎএর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান জনমেজয় সঙ্কল্প করল এবার আমি সর্প যজ্ঞ করব। সর্প যজ্ঞ করার উদ্দেশ্য এই জগতে যত সাপ আছে সব সাপকে আমি যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেব। এই সর্প যজ্ঞের সময় বৈশম্পায়ন ঋষি মহাভারতের কথা বর্ণনা করেছিলেন, সেই সময় সৌতিও সেখানে ছিলেন। এনারা সবাই বিরাট শ্রুতিধর ছিলেন, একবার শুনলেই সব কিছু মনে রাখতে পারতেন। সৌতি ঋষি মহাভারতের যে কাহিনী জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে শুনেছিলেন, সেই কাহিনীকেই তিনি নৈমিষারণ্যে ওখানকার ঋষিদের শুনিয়েছিলেন। আমাদের কাছে যে মহাভারত এসেছে সেখানে সৌতির বর্ণনা থেকেই শুরু হচ্ছে। এখানে তাই সৌতি বলবেন – বৈশম্পায়ন উবাচ। বৈশম্পায়ন আবার বলবেন – শুক উবাচ। এই ভাবেই মহাভারতের সব কাহিনী এগিয়ে গেছে। তবে পরম্পরাতে আমরা জানি মহাভারত ব্যাসদেবের রচনা, কিন্তু ব্যাসদেবের রচনা কাহিনীটা অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয়।

ভারতে এখন মহাভারত দুটো আলাদা সঙ্কলনে পাওয়া যায়, একটা উত্তর ভারতের আরেকটা দক্ষিণ ভারতের সঙ্কলন। দক্ষিণ ভারতের মহাভারতে ছয় হাজার ছ'শ শ্লোক বেশী পাওয়া যায়। গীতা প্রেস থেকে যে মহাভারত ছাপা হয়ে বেরিয়েছে সেখানে এই অতিরিক্ত শ্লোক গুলিকেও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেখানে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে এই শ্লোক দক্ষিণ ভারতের মহাভারতের থেকে নেওয়া হয়েছে। উত্তর ভারতের মহাভারতে যেখানে একটা শ্লোক বলে জিনিষটাকে উল্লেখ করে বেরিয়ে গেছে, সেখানে দক্ষিণ ভারতে জিনিষটাকে মেলাবার জন্য আরও চারটে অতিরিক্ত শ্লোক বলে ব্যাপারটাকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছে। এইসব কারণে অনেকে মনে করেন যে মহাভারতে অনেক শ্লোকই পরের দিকে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ শুকদেব নিজে ব্যাসদেব থেকে যেটা শুনেছিলেন সেটাই আবার বৈশম্পায়ন ঋষিকে শুনিয়েছিলেন, কোথাও বই থেকে কিছু পাঠ হতো না, যেটা শুনেছিলেন সেটাই বলছেন। এগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল মহাভারতকে আধার করে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের দিকটাকে উন্মোচন করা।

বিভিন্ন পর্বের নামকরণ

জয় ও ভারতের কথা আমরা আগেই বলেছি। ভারত অংশের আলোচনায় শুরু হবে শকুন্তলা দুষমন্ত থেকে। সেখান থেকে রামায়ণ কথাকে টেনে নিয়ে শেষ করা হবে কৌরব বংশের কাহিনীতে গিয়ে। এখানে সূর্যবংশীর আলোচনাই বেশী করে আসে, চন্দ্রবংশীদের আলোচনা বেশী আসে পুরানে। ভারতে এই দুটো বংশই খুব প্রাচীন ও নামকরা বংশ। মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব। আদিপর্ব দিয়ে শুরু হবে আর শেষ হবে স্বর্গারোহণ পর্ব দিয়ে। মাঝখানে এক একটি পর্বের নাম এক একটি পরিস্থিতির উপর আধার করে দেওয়া হয়েছে, যেমন যখন পাণ্ডবরা বনে থাকবেন তখন সেই পর্বের নাম হয়ে যায় বনপর্ব, যখন যুদ্ধের আয়োজন শুরু হবে তখন তার নাম হবে উদ্যোগপর্ব, যুদ্ধের সময় যেমন যেমন

সেনাপতিরা আসবেন সেই ভাবে পর্বগুলির নাম হবে, যেমন প্রথমে ভীষ্মপর্ব, তখন ভীষ্ম ছিলেন সেনাপতি, ভীষ্মের পতনের পর দ্রোণাচার্য যেই সময়টা সেনাপতি ছিলেন সেই পর্বের নাম দ্রোণপর্ব, এইভাবে কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব।

তখনকার দিনের যাঁরা খুব বিখ্যাত নেতা বা যোদ্ধা ছিলেন তাঁদের নানা যশ গাথা মহাভারতে পাওয়া যাবে। সাথে সাথে সেই সময়ে যত রকমের পৌরানিক কাহিনীগুলো প্রচলিত ছিল সেই কাহিনীগুলোকে মহাভারতে সন্নিবেশীত করা হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিয়ে, বংশাবলী, বিষ্ণু আর শিবের উপর অনেক পৌরানীক কাহিনী মহাভারতে পাওয়া যাবে। মহাভারতে বেশ কিছু আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ও ধর্মীয় শাস্ত্র পাওয়া যায়, যেমন গীতা, অনুগীতা, ব্যাধগীতা। ভারতে যত তীর্থ আছে, তীর্থের ইতিহাস, সেই তীর্থের মাহাত্মাদির বর্ণনা মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অনেক রকম লোককথা, নীতিকথাও মহাভারতে দেওয়া আছে। সবথেকে বড় কথা মহাভারত ঘুরে ফিরে স্বধর্মের কথা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করছে, বিশেষ করে রাজার যে ধর্ম সেটাকে বিরাট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া ভারতের অনেক নামকরা ঋষিদের নাম ও তাঁদের ইতিহাস আমরা মহাভারতে পাই।

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ব্যক্তিত্বের স্থান

সম্প্রদায় বিদ্যা, যেটা আমরা পরম্পরাতে পাচ্ছি সেটাই আমাদের কাছে মূল্যবান। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে পাণ্ডিত্যের বিচারে যে আলোচনা গুলো করা হয় সেগুলোকে যদিও বা কোন কোন ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে পরম্পরা বিদ্যার বহির্ভূত কোন কথারই আমাদের কাছে কোন গুরুত্ব নেই। স্বামীজী বলছেন, আজকে যদি প্রমাণিত হয়ে যায় শ্রীকৃষ্ণ বলে আদৌ কেউ ছিলেন না, অর্জুন বলে কেউ ছিলেন না, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। গীতার দর্শন, গীতার বাণীই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতে ব্যক্তি বিশেষকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই ব্যাপারটাকে যতক্ষণ না কেউ বুঝতে পারছে ততক্ষণ ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে কেউ ধরতেই পারবে না। ভারতের মানসিকতা আধ্যাত্মিক আদর্শের তত্ত্ব এবং তার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গঠিত আর পাশ্চাত্যের মানসিকতা গঠিত হয় ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে। আধ্যাত্মিক আদর্শের তত্ত্বটা একবার বুঝে নিতে পারলেই হল, এরপর এই তত্ত্ব কে বলেছেন, কোথায় কবে কাকে বলেছেন এগুলোর কোন গুরুত্বই থাকে না। কোন পণ্ডিতকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় বেদ কোথা থেকে এসেছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন ভগবানের থেকে এসেছে, সৃষ্টি যবে থেকে হয়েছে তার আগে থেকেই বেদ চলে আসছে। পুরানের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা হয়। মহাভারতের স্থান বেদের থেকে একটু নীচে বলে মহাভারতের ক্ষেত্রে এসে বলা হবে কুড়ি হাজার বছর আগে মহাভারত রচনা করা হয়েছিলে। মহাভারত যদি গতকালও লেখা হয়ে থাকে তাতেও কিছু এসে যাবে না, কেননা এখানে তত্ত্ব ও নীতিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষ শুধু একটা ভৌগলিক দেশ নয়, ভারত একটা জাতি নয়, ঠিক তেমনি হিন্দুধর্ম শুধু নিছক কোন ধর্ম নয়। ভারত ও হিন্দুধর্ম একটা ভাব, একটা আদর্শের মুর্ত রূপ। মানুষ এখানে কখনই কেন্দ্র নয়, আদর্শই কেন্দ্র, নীতি ও ভাবই কেন্দ্র। নীতি ও আদর্শের সাথে কখনই এখানে বোঝাপড়া করা হয় না। আদর্শ ও নীতিকে রক্ষা করার জন্য যদি এক কোটি মানুষের জীবনও চলে যায় তার জন্য ভারত কখনই ভ্রুক্ষেপ করবে না। ভারতে যখন ধর্মান্তর শুরু হয়েছিল তখন ঠিক এই জিনিষটাই হয়েছিল। যখন হিন্দুদের বলা হল, হয় তুমি তলোয়ার নাও, নয় তো তুমি কোরান নাও। তখন বেশীর ভাগ হিন্দুই বলল তুমি আমার গলায় তলোয়ার চালিয়ে দাও আমি আমার আদর্শ থেকে কখনই বিচ্যুত হবো না। যার জন্য ইসলাম সারা বিশ্বে ধর্মান্তর করতে পারল শুধু ভারতকেই পুরোপুরি ধর্মান্তর করতে পারলো না, শুধু এই একটি কারণেই। ভারতে যখন জোর করে ধর্মান্তর করা শুরু হয়েছিল তখন গ্রাম থেকে শহর থেকে লোক পালাতে শুরু করল। তার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রচণ্ড মন্দার ফলে রাজকোষে অর্থ আদায় কমে গেল। তাই আকবরের সময় থেকে জোর করে ধর্মান্তর করাটা বন্ধ করা হল। ঔরঙ্গজেবের সময় আবার ধর্মান্তর করাটা বেড়ে গিয়েছিল, তার বোন নিষেধ করেছিল, দাদা তুমি এ কাজ করো না, তাহলে তুমি শেষ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল, ঔরঙ্গজেবকে দিল্লী ছাড়তে হল, আর কোন দিন দিল্লীতে ফিরে আসতে পারলো না। তারপরই পুরো মোঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল।

ভারত আর হিন্দু দুটোই সমার্থক, হিন্দু আদর্শের জন্যই জীবন ধারণ করে, হিন্দুর কাছে ব্যক্তির কোন প্রাধান্য নেই। এদের কাছে মহাভারতের রচনা কাল দশ বছর আগে পরে হলে কিছুই হবে না। হিন্দু বলবে মহাভারত যদি দশ বছর আগে লেখা হয়ে থাকে আর যদি দশ বছর পরেই লেখা হয়ে থাকে তাতে আমার কি লাভ। ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল প্রশ্ন, আধ্যাত্মিকতার এই ভাব ও আদর্শে আমি কি পাব। মহাভারতের যুদ্ধ পনেরশ খ্রীষ্টপূর্বে হয়েছিল না কি চৌদ্দশ

খ্রীষ্টপূর্বে হয়েছিল এটা জেনে আমার কি লাভ? ঠাকুর বলছেন, লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা কেঁদে আকুল হল। ভারত এই জিনিষকে কখনই প্রশ্রয় দেয়নি। সেইজন্য ঋষিরা কিছু রচনা করে নিজের নামটি পর্যন্ত দিতেন না। বেদে কোন ঋষি বলছেন না যে আমি এই মন্ত্র রচনা করেছি। পরের দিকে এসে কোন মুনি বা ঋষি রচনা করে দিয়ে ব্যাসদেবের নামে চালিয়ে দিতেন। ব্যাসদেব কে? তিনি কবিগুরু, যা কিছু রচনা হচ্ছে সব ব্যাসদেবের লেখা। ইদানিং কালে কপিরাইট নিয়ে কত মারামারি, মামলা মকোদ্দমা চলছে। এদের কাছে এখন নিজের নামটাই বড়, আদর্শটা বড় নয়। ভারতের ঋষি মুনিরা নিজের চিন্তা ভাবনা দিয়ে একটা রচনা দাঁড় করিয়ে কোথাও নাম দিলেন না। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, আমার নামের জন্য কিছু পরোয়া নেই, আদর্শটাই মূল, আদর্শটা যাতে প্রসারিত হয় সেটাই প্রধান গুরুত্ব। স্বামীজী বলছেন, আমি হলাম voice without form, আমি কটি শব্দ উচ্চারণ করছি মাত্র, এই শব্দগুলো সনাতন। এই জিনিষকে যখন কেউ বুঝে নেবে তখন সে বুঝতে পারবে ভারতের আধ্যাত্মিকতা কিভাবে তার নিজের কাজ করে চলেছে। ব্যক্তি এখানে প্রধান নয়, আদর্শই সত্য।

মহাভারতের বিষয় বস্তু

আমরা এর আগে উল্লেখ করেছিলাম যে মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোকের মধ্যে আট হাজার আটশটি কূট শ্লোক আছে। বলা হয় এই শ্লোকগুলিকে একমাত্র ব্যাসদেব বুঝেছিলেন, গণেশ ঠাকুর বুঝেছিলেন আর শুকদেব বুঝেছিলেন, বাকিরা চেষ্টা করেও বুঝতে পারেনা। এগুলো হল গ্রন্থস্তুতি। আমেরিকায় একটা নামকরা লাইব্রেরী ছিল। লাইব্রেরীর এক কর্মচারী লাইব্রেরীয়ানকে বলছে, আমাদের কয়েকটা বই আছে এগুলো কোন দিনই কেউ নেয় না, রোজই আমাদের বইগুলোর ধুলো ঝাড়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। লাইব্রেরীয়ান বলল, ঠিক আছে, আমি এমন প্রচার করে দেব দেখবে কাল থেকে আর বইগুলোকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। যে কটি বই কোন দিনই ইস্যু হতো না সেই বইগুলোকে কয়েকটা আলমিরাতে রেখে আলমিরার গায়ে লিখে দিয়েছে only for very intelligent readers, কেবল মাত্র অতি বুদ্ধিমান পাঠকদের জন্য। এর পরই হিড়িক পড়ে গেল বইগুলোতে কি আছে জানার জন্য, সবাই নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণিত করার জন্য বইগুলো নিতে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল। এবার মহাভারতে কোনটা কূট শ্লোক আর কোনটা কূট শ্লোক নয় আমরা বুঝতেই পারবো না, কিন্তু বলে দেওয়া হল আট হাজার আটশটি কূট শ্লোক দেওয়া আছে।

আচার্য শঙ্কর, রামানুজ ও মাধ্বাচার্য তিনজনই ছিলেন বিরাট মাপের পণ্ডিত। ঠাকুর তো আচার্য শঙ্করকে অবতার রূপে চিহ্নিত করেছেন। মাধ্বাচার্যও ছিলেন সংস্কৃতের বিরাট পণ্ডিত, সেই পাণ্ডিত্যের সাহায্যে তিনি তো আধ্যাত্মিক জগতে ক্রান্তি এনে দিয়েছিলেন আর তিনি নিজেকে মনে করতেন বায়ুপুত্র। এই ধরণের শাস্ত্রের উপর মাধ্বাচার্য প্রচুর ভাষ্যাদি রচনা করেছেন। মাধ্বাচার্য শারীরিক দিক থেকে যেমন প্রচণ্ড শক্তিমান ছিলেন অন্য দিকে তাঁর মেধা ও বুদ্ধি ছিল তুখোড় আবার আধ্যাত্মিক দিকেও ছিলেন বড় মাপের পুরুষ। শরীরের শক্তি, বুদ্ধির জোর আর আত্মবল এই তিনটের মিলন তাঁর মধ্যে হয়েছিল, যেটা খুবই দুর্লভ। তিনি এক জায়গায় বলছেন, উপনিষদে যত মন্ত্র আছে প্রত্যেক মন্ত্রের তিনটে করে আলাদা অর্থ বার করা যায় আর মহাভারতের প্রত্যেকটি শ্লোকের ছয় রকম ভাবে ছটি আলাদা অর্থ বার করা যায়। ভাগবতে কিছু শ্লোকের তিনি চব্বিশটি অর্থ আলাদা আলাদা করে বার করে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। মহাভারতের জন্য সারাটা জীবন দিয়ে দিলেও মহাভারতের সব কিছুকে মাথার মধ্যে পুরোপুরি বসিয়ে নেওয়া যায় না। গীতার মত শাস্ত্র মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত, গীতার মত ছোট বড় মিলিয়ে আঠারোটা গীতা মহাভারতে আছে। বিদগ্ধ পণ্ডিতরা বলেন মহাভারতে তিন ধরণের শিক্ষা দেওয়া আছে। প্রথমে বলেন, আস্তিকাদি। আস্তিকাদি মানে ঐতিহাসিক, বলছেন মহাভারতে ঐতিহাসিক বর্ণনাদি আছে। দ্বিতীয় শিক্ষা হল, মণ্বাদি, মনু আদি, মনু বলতে মানুষকে বলা হচ্ছে। মণ্বাদি হল, নৈতিক শিক্ষা, মানুষের কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত নয়। তৃতীয় শিক্ষা ঔপরিচয়। ঔপরিচয় বলতে বোঝায় আধ্যাত্মিক বিবর্তনের বর্ণনা। মহাভারত পরিষ্কার ভাবে এই তিন রকমের আলোচনা করছে, ঐতিহাসিক, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।

এর বাইরেও আমরা মহাভারতে অনেক রকমের আলোচনা পাব, যেমন ইতিহাস। এই ইতিহাস স্কুলে যে ইতিহাস পড়ান হয় সেই ইতিহাসের কথা বলা হচ্ছে না। অসাধারণ পুরুষ হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিত্ববান পুরুষের জীবনের কয়েকটা মূল জিনিষকে আধার করে যখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দেওয়া তখন তাকে বলা হয় ইতিহাস। কিন্তু তিনি অমুক সালে জন্ম নিলে এই ক'বছর রাজত্ব করলেন আর অমুক সালে মারা গেলেন এই তথ্য নিয়ে যে ইতিহাস রচনা হচ্ছে তার কোন মূল্য আমাদের কাছে নেই। এখানে দেখানো হচ্ছে দুর্যোধন কিভাবে মারা গেল, কেন এইভাবে মারা গেল? কারণ তার মধ্যে হিংসা ভাব ছিল, তার মানে তুমিও তোমার মধ্যে হিংসা ভাবকে প্রশ্রয় দিও না। অর্জুন কেন সাফল্য পেয়েছিলেন? কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কে? তিনি সর্বদা যোগে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।

আমিতো ভগবান মানিনা। যোগের অবস্থাটাতো মানো, তিনি যোগে অবস্থিত ছিলেন। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তুমিও যদি মনটাকে যোগের অবস্থায় নিয়ে যাও বা এমন কোন মহাপুরুষের শরণাগতি নাও যিনি যোগে অবস্থিত, তাহলে তোমারও কখন পতনের আশঙ্কা থাকবে না। ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলছেন – বাপ যখন ছেলের হাত ধরে তখন আর ছেলের পড়ার ভয় থাকে না। যখন আমি নিজে থেকে ধরছি তখন আমি নিজে হাত বাড়িয়ে ধরছি, তখন আমার পড়ে যাবার ভয় আছে। কিন্তু যখন আমি শরণাগতি নিয়ে নিলাম তখন বাপ এসে হাতটা ধরে নিচ্ছেন। মহাভারত যে কথা বলছে সেই কথাই ঠাকুর খুব সরল ভাষায় বলছেন। অর্জুনও যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি নিলেন তখন অর্জুনের আর পতনের ভয় থাকলো না। দুর্যোধনও শরণাগতি নিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে পূর্ণ শরণাগতির কোন ভাব ছিল না। আর এটাই জীবনের বাস্তবিক স্বরূপ। যখন এই শিক্ষা মহাভারত আমাদের দিয়ে দিল, তখন এটা হয়ে গেল ইতিহাস। এই শিক্ষা না দিয়ে যদি বলা হত এত সৈন্য ছিল, এত লোক মারা গিয়েছিল, অর্জুন এইভাবে তীর মেরেছিল, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে রথ চালিয়েছিলেন, তখন এটা হয়ে গেল একটা মামুলি ইতিহাস, আমাদের কাছে এর কোন মূল্যই নেই।

মহাভারতে অনেক পুরানের কাহিনীও পাওয়া যাবে। পুরানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্যতাকে আধার করে ঠিক করা হয় কোন্ শাস্ত্রকে আমরা পুরান বলব। তবে পুরান আর ইতিহাসের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। পুরানে পৌরানিক কাহিনীগুলো অনেক বেশী দেওয়া হয়। এছাড়া যত রকমের শাস্ত্র মানুষের জ্ঞান অর্জন ও ব্যবহারের জন্য রচিত হয়েছে তার সবটাই মহাভারতে পাওয়া যায়, যেমন বিভিন্ন আখ্যায়িকা, নীতি শাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, যত রকমের শাস্ত্র হতে পারে সবই মহাভারতে সন্নিবেশীত করা হয়েছে।

সাহিত্যের দৃষ্টিকোণে মহাভারতের মূল্যায়ন

সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ দিয়ে যদি বিচার করা হয় তাহলে মহাভারত হচ্ছে ঠিক ঠিক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য। কোন রচনাকে সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে যে যে বৈশিষ্ট্যের দরকার মহাভারতে তার সব কটি বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যাবে। একদিকে যেমন গীতার মত মোক্ষশাস্ত্র রয়েছে অন্য দিকে নল-দময়ন্তীর মত প্রণয় কাহিনীও পাওয়া যাবে। যে বই গীতার মত উচ্চ আধ্যাত্মিক দর্শনকে ধরে রেখেছে সেই বইই আবার নল-দময়ন্তীর অমর প্রেম-ভালোবাসাকে ফুটিয়ে তুলছে। অন্য দিকে একটা মানুষ কতটা লোভী ও কামী হতে পারে সেই চরিত্রকেও ফুটিয়ে তুলেছে। একদিকে যেমন লোভী, কামীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অন্য দিকে সাবিত্রীর মত নিষ্ঠাবতী নারী যে নিজের স্বামীর প্রতি পুরো সমর্পিত একটি প্রাণ, তার বর্ণনা করা হচ্ছে। একদিকে যেমন বৈচিত্রের বাহারে সমৃদ্ধ অন্য দিকে বিপরীত চরিত্রের সমাহার ঘটিয়ে দুটো দিককেই মহাভারত দেখিয়ে দিচ্ছে। নাটকের মধ্যে যত রকমের ভাব ও রস থাকে মহাভারতে তার সব কটির সমাবেশ ঘটেছে। আজকের দিনে কাব্য বলতে যেটা বোঝায়, কি কি উপাদান থাকলে একটা সাহিত্যকে কাব্যগ্রন্থ বলা হবে, এই জিনিষগুলো এনারা নিয়েছেন বাল্মীকি রামায়ণের শৈলীকে আধার করে। মহাভারতও বাল্মীকি রামায়ণের শৈলীতে রচনা করা হয়েছে। কিন্তু কাব্যের বিচারে, কবিতা বলতে যেটা ঠিক ঠিক বোঝায়, সেই দিক থেকে বাল্মীকি রামায়ণ মহাভারত থেকে শ্রেষ্ঠ। বাল্মীকি ছিলেন সত্যিকারে কবি, ব্যাসদেব ছিলেন মূলতঃ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের পুরুষ, তিনি মানব জীবনের সমগ্র দর্শনকে পুরোটাই কাব্যের ছন্দে উপস্থাপনা করেছেন। সেই দিক থেকে মহাভারতের কাজটা অত্যন্ত দুরূহ। আবার ব্যাসদেবের পাণ্ডিত্য কাব্যের মাধ্যমে বেরিয়েছে ভাগবতে, সেইজন্য বলা হয় বড় বড় পণ্ডিতদের পরীক্ষা হয়ে যায় ভাগবতে। তবে কাব্যিক মাধুর্যতা, শব্দের চয়ন আর তার লালিত্য বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া আর কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই জিনিষগুলো আবার পাওয়া যাবে কালিদাসের সাহিত্যে, কিন্তু কালিদাস বা অন্যান্য বড় বড় কবিদের যে রচনা সেটা সাহিত্য কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার যুগলবন্দি। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের মাধ্যমে সাহিত্যকে এতো উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাল্মীকি রামায়ণের ধারে কাছে আজ পর্যন্ত কোন সাহিত্যই দাঁড়াতে পারেনি। বাল্মীকি রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের বিষয় বস্তু প্রচুর কিন্তু কাব্যিক প্রতিভার কাছে বাল্মীকি রামায়ণ অনেক এগিয়ে।

মহাভারতকে কেন সমন্বয় গ্রন্থ বলা হয় *(বেদের প্রভাব ও বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ – ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে নতুন ভারতের জাগরণ – সাহিত্যিক হিসাবে ব্যাসদেব ও স্বামীজী – বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতে সাধারণ মানুষের প্রতি দৃষ্টি)*

মহাভারতের সবচেয়ে বড় যে বিশেষত্ব তা হল মহাভারত হল সমন্বয় গ্রন্থ। ভারতের এক যুগ সন্ধিক্ষণে ব্যাসদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তখন ভারতে অনেক কিছুই বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন করে রূপ পরিগ্রহ করছিল। বিশেষ করে বেদের মাহাত্ম্য ও বেদের প্রভাব, বেদকে আমরা যে ভাবে জানি, সেই দিক থেকে বেদের মাহাত্ম্য ও প্রভাব খুব হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। বেদের সব দেবতারা যজ্ঞ যাগের মাধ্যমে যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা সেখান থেকে নীচে

নেমে গিয়েছিলেন। অন্য দিকে বহিরাগতদের যে ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছিল তার ফলে ভারতের চিরাচরিত সংস্কৃতির সাথে বহিরাগত জাতির সংস্কৃতের মধ্যে সজ্ঘাত বেঁধে গিয়েছিল। একদিকে বহিরাগতরা ভারতের সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে এক করে দিতে চাইছিল, অন্য দিকে এদের সংস্কৃতি, আচার, ব্যবহার ভারতের সেই সময়কার কোন কিছুর সাথেই খাপ খাচ্ছিল না। ভারত তখন একটা জগা খিচুড়ির অবস্থার মধ্যে চলে গিয়েছিল। তখন ভারতের জন্য নতুন ধরণের সংস্কৃতি, নতুন ধরণের সাহিত্যের আবশ্যকতার অনুভব হচ্ছিল। কারণ বেদের পণ্ডিতরা কখনই এই ধরণের বিদেশীদের হাতে বেদকে যেতে দেবেন না। ব্যাসদেব এসে একটা নতুন পথের সন্ধান দিলেন। এখন আমরা দেখছি ঠাকুর স্বামীজীর যে ভাব, এই নতুন ভাব আসার পর থেকে ভারত এখন এক নতুন চিন্তাধারার মাঝখান দিয়ে চলছে। যেখানে কিছু দিন আগেও ধর্ম বলতে যা বোঝত, ঠাকুর স্বামীজী আসার পর সেই চিন্তাধারা থেকে সরে এসে ধর্মের আগেকার চিন্তা ভাবনা গুলোর অর্থ এখন অপ্রাসঙ্গিকতায় পৌঁছে গেছে। যে জাতিপ্রথা এতদিন ভারতকে ধরে রেখেছিল সেই জাতিপ্রথা এখন তার তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলেছে। ব্যাসদেবের সময়েও ঠিক এই জিনিষটাই হয়েছিল, যে সামাজিক প্রথা, মূল্যবোধ চলে আসছিল সেগুলোই তখন অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। সমাজকে নতুন ভাবে গঠন করার জন্য তখন নতুন এক চিন্তাধারার দরকার হয়েছিল। একজন এসেই যে চিন্তাধারাকে নতুন ভাবে তৈরী করে দেবেন তা কখন হয় না, যেমন এখনকার চিন্তাধারার বীজ ঠাকুর স্বামীজীর বাণীর মধ্যেই নিহিত আছে, পরবর্তি কালে কেউ একজন এসে এটাকে কার্যে পরিণত করবেন। বলা হয়, ভারতের আগামী পনের'শ বছরের যে ইতিহাস রচিত হবে তা ঠাকুর স্বামীজীর বাণীর আধারেই পরিচালিত হবে। কিভাবে পরিচালিত হবে এটা এখনও নির্ধারিত হয়নি।

ব্যাসদেব একদিকে বিরাট চিন্তাবিদ ছিলেন, অন্য দিকে তিনি ছিলেন একজন উচ্চকোটির ঋষি তার সঙ্গে তিনি একজন বড় মাপের কবি ও সাহিত্যিক। সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় সেই হিসাবে স্বামীজী ঠিক লেখক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুবক্তা, ঠাকুরও লেখক ছিলেন না, তিনিও ছিলেন বক্তা। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামীজী একটা কোন বিষয়ের উপরেই দশ বারো বার বক্তব্য রেখেছেন, আর পরিষ্কার দেখা যায় তিনি সেখানে তিনটে আলাদা আলাদা বিপরীত কথা বলছেন। এবার যদি আমরা খুব গভীরে গিয়ে স্বামীজীর এই বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করি তখন পরিষ্কার বোঝা যায় স্বামীজী একটা নতুন ভাবধারাকে সামনে নিয়ে আসতে চাইছেন। আজকে তিনি যে কথাটা বললেন, সেই কথাকে নিয়ে যখন দু বছর পরে আলোচনা করছেন তত দিনে তাঁর মাথায় আরও নতুন নতুন আইডিয়া এসে গেছে, পরবর্তি কালে ঐ নতুন আইডিয়ার জায়গায় আরেকটা নতুন আইডিয়া এসে যাচ্ছে। কারণ ঐ বিষয়টি এতই গভীর যে, ভারত চার পাঁচ হাজার বছর ধরে এক রকম চিন্তা ভাবনা করে এসেছে, স্বামীজী ঐ চিন্তা ভাবনাটাকে পুরো পাল্টে একটা নতুন রূপ দিতে চাইছেন। কিন্তু যখন একটা পাঁচ হাজারের চিন্তা ভাবনাকে পাল্টাতে যাবেন তখন সেটাকে পাল্টাতে একটু সময় দিতে হবে। ব্যাসদেবের এই সমস্যাটা ছিল না। ঠাকুরেরও এই সমস্যা হয়নি, কারণ ঠাকুর কোথাও সমাজনীতি নিয়ে কোন কথা বলেননি, ওনার একটাই কথা – মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই কিছু জানিনা। স্বামীজীর আবার বিখ্যাত সৃষ্টি হল বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের জন্য নিয়মকানুন, এত নিখুঁত প্রণালীবদ্ধ যে কল্পনাই করা যায় না। একশো বছরের বেশী হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পড়লে মনে হয় স্বামীজী যেন গতকাল এই নিয়মগুলো করে দিয়ে গেছেন। স্বামীজী এও বলে গেছেন সবার জন্য একটা নতুন স্মৃতি লেখা দরকার। কিন্তু এখনও লেখা হয়নি, কারণ সেই রকম প্রতিভাবান এখনো কেউ আসেননি। ব্যাসদেবের এটাই বিশেষত্ব, তিনি স্বামীজীর মত ঋষি, তাঁর পাণ্ডিত্য স্বামীজীর মত বরং আরও বেশী প্রাচীনপন্থী, কিন্তু ব্যাসদেব স্বামীজীর মত বক্তৃতা দিতেন না, যা কিছু তাঁর চিন্তা ভাবনার মধ্যে খেলা করত সেটাকে তিনি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। লিখতে বসলে চিন্তা ভাবনাগুলো আরও সাজানো গোছানো হয়, বক্তৃতার মধ্যে যেটা সম্ভব হয় না।

ব্যাসদেবের চিন্তা ভাবনা খুব সংগঠিত ছিল, এই যে নতুন সমাজ একটা নতুন রূপ নিতে চলেছে একে একটা দিশা দিতে হবে, এই পরিকল্পনাটাকে মাথায় রেখে তিনি তাঁর সুসংগঠিত চিন্তা ভাবনাকে নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। তিনি তখন প্রচলিত ভাবধারা গুলির সাথে নতুন ভাবধারার একটা সুন্দর সমন্বয় করে দিলেন। অনেক ঐতিহাসিকরা বলেন, ব্যাসদেব এইভাবে সমন্বয় করতে গিয়ে ট্রাইবালদের যে দেবতা শিব ছিলেন তাঁকে তিনি উচ্চ স্থানে নিয়ে এলেন, আবার সমতল এলাকার দেবতা ছিলেন বিষ্ণু, তাঁকেও একটা বড় স্থান দিয়ে দিলেন। ব্যাসদেবের সমন্বয় ভালো বোঝা যায় গীতাতে, তখনকার দিনে যত আলাদা আলাদা দর্শন ছিল, সাংখ্য, ন্যায়, যোগ সব কটিকে গীতাতে তিনি সমন্বয় করে দিলেন। গীতাতে যে সমন্বয় দেখা যায় মহাভারত হল তারই বৃহৎ রূপ। এই নয় যে গীতাতে সমন্বয় করা হয়েছে আর মহাভারতে সমন্বয় করা হয়নি। মহাভারতে সমন্বয় আছে বলেই গীতাতে সমন্বয় করা হয়েছে। গীতা হল শুধু আধ্যাত্মিকতা আর দর্শনের সমন্বয় আর মহাভারত হল ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সামাজিক নিয়ম নীতি সব কিছুর সমন্বয়। একটা মানুষকে

বেঁচে থাকার জন্য, সমাজকে টিকে থাকার জন্য যা কিছু দরকার, ব্যাসদেব তার সব কিছুকে সমন্বয় করে দিলেন। কোথাও তিনি ব্রাহ্মণকে বিরাট উঁচুতে তুলে দিচ্ছেন তার পাশেই আবার তিনি ধর্মব্যাধের কাহিনীতে দেখাচ্ছেন, ব্যাধ নিজের স্বধর্ম ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছেন বলে সেই ব্যাধেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে এক ব্রাহ্মণ। কিছু ঐতিহাসিক বলেন সেই কালে নারী উৎপীড়ন ছিল কিন্তু মহাভারতে প্রচুর কাহিনী আছে যেখানে ব্যাসদেব নারীকেই কত উচ্চস্থানে নিয়ে গেছেন। ধর্মব্যাধের কাহিনীতেই আছে এক গৃহিণী শুধু নিজের স্বামীর সেবাটুকু নিয়েই থাকে, তার বাইরে সে কিছুই করে না, তাতেই সেই নারী আধ্যাত্মিকতার এক চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছে গেছে। এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক সমন্বয়। তুমি কি কাজ করছ তার কোন গুরুত্ব নেই, কিভাবে কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছ সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকির প্রচেষ্টা ছিল অন্য ধরণের। যে বেদ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল, বাল্মীকি রামায়ণ রচনার মাধ্যমে এমন একটা উপায় করে দিলেন যার ফলে সাধারণ মানুষ ধর্মের একটা দৃঢ় অবলম্বন পেয়ে গেল। আর ব্যাসদেব সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য একটা নতুন জিনিষ দাঁড় করিয়ে দিলেন। মহাভারতের সব কাহিনীই ব্যাসদেবের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়, কিছু কাহিনী আগে থাকতেই সমাজে লোকেদের মধ্যে প্রচল ছিল, ব্যাসদেব সেই কাহিনী গুলিকে নিয়ে ছন্দোবদ্ধ করে একটা জায়গাতে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। আবার অনেক কিছু তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে, যেমন কুরুবংশ ও পাণ্ডব বংশের কাহিনী, সাথে সাথে তিনি আঞ্চলিক কাহিনীগুলিকে টেনে মহাভারতের মধ্যে সমন্বয় করে দিলেন। ব্যাসদেব ছিলেন সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। ঘর ঝাড় দেওয়া থেকে শুরু করে মাংস কাটার কাজ তার সাথে ঘরে বসে ধ্যান করা পর্যন্ত সব কাজকে সুন্দর ভাবে সমন্বয় করে দিলেন। শুধু তাই নয় কাহিনীর মাধ্যমে এই সমন্বয়ের দুরূহ কাজটা নিঃশব্দে করে গেছেন। ঠাকুর স্বামীজীর অনেক কথা যেগুলো সরাসরি ব্যাসদেব থেকে নেওয়া। ভারতের ধর্ম এখন গীতার উপর দাঁড়িয়ে আছে, গীতার কথাই শেষ কথা, সেই গীতা পুরোটাই ব্যাসদেবের সৃষ্টি। এইসব দেখে ব্যাসদেবের মূল্যায়ন করতে গেলে একটা কথাই বলা যায়, এই বিরল প্রতিভা ভারতে আজ পর্যন্ত এখনও আসেনি, যে প্রতিভাতে এত বিশাল কাজ একা কেউ করতে পেরেছেন। মহাভারতের মত সৃষ্টি এই ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় আর একটিও আজ পর্যন্ত হয়নি।

মানবিক দুর্বলতার প্রতি মহাভারতের দৃষ্টিভঙ্গী

মহাভারতের কাহিনীর মূল বক্তব্য মানুষের মধ্যে মানবিক দুর্বলতা থাকবেই কিন্তু এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে তোমাকে উপরের দিকে উঠতে হবে, যদি দুর্বলতাকে ইন্ধন দিতে থাকো, একে যদি কাটাতে না পারো তুমি যে তিমিরে পড়ে আছ তার থেকে আরও তিমিরে চলে যাবে। যুধিষ্ঠির, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সবারই মধ্যে মানবিক দুর্বলতা ছিল। এনারা যে তাঁদের সব দুর্বলতাকে জয় করে নিয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু এই দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যুধিষ্ঠিরের মধ্যে জুয়া খেলার নেশা ছিল সেটাকে তিনি কখনই জয় করতে পারেননি কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। নল-দময়ন্তী কাহিনীর মূলে রয়েছে সেই জুয়া খেলা। নলেরও জুয়া খেলার মারাত্মক নেশা ছিল, আর সব সময় হেরেই যেত, তার ফলস্বরূপ নলের কি করুণ পরিণতি হল। নলও কিন্তু কোন দিন জুয়া খেলাটা ছাড়তে পারলেন না, নল যে শেষ পর্যন্ত তার রাজ্য সম্পদ সব উদ্ধার করতে পেরেছিল তা এই জুয়া খেলেই। যুধিষ্ঠির অবশ্য তা করেননি কাহিনীটা এখানে অন্য দিকে ঘুরে যায়। মানুষের মধ্যে দুর্বলতা থাকতেই হবে, দুর্বলতা থাকবে না এটা কখনই হবে না। কিন্তু তোমাকে এই দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যেমন দুর্যোধন, তার মানবিক দুর্গুণগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারলো না বলে তার এই পরিণতি হল। যুধিষ্ঠির তার দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন, দুর্বলতা আছে থাকুক না, ও ওর জায়গায় আছে থাকুক। মহাভারতের এটাই হল আমাদের সবার জন্য অন্যতম প্রধান শিক্ষা।

গতানুগতিক জীবনচর্চা দিয়ে কখনই কাহিনী হয় না, কাহিনী তখনই কাহিনী হবে যখন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈচিত্রের সমারোহ থাকবে, যে বৈশিষ্ট্যে একদিকে তার যেমন শক্তি সামর্থ আছে অন্য দিকে তার চরিত্রের দুর্বলতাও আছে। সাধারণ মানুষের জীবনে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এতই কম আর তার দুর্বলতাও এতই কম যে, তাই দিয়ে কোন কাহিনী দাঁড় করানই যায় না। এদের যেমন ভালো করার কোন ক্ষমতা নেই তেমনি কোন খারাপ করারও ক্ষমতা নেই। আমাদের অনেককে গলা উঁচু করে বলতে শোনা যায় – আমাদের সেই স্বর্ণযুগে ফিরে যেতে হবে, সমাজকে তাই শোধরাতে হবে। এদের তখন বলতে হয়, তোমরা যেটাকে স্বর্ণযুগ বলছে সেই সময় রাজার স্ত্রীকে বলপূর্বক হরণ করা হয়েছিল, তোমাদের তথাকথিত স্বর্ণযুগে রাজসভায় প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে রাজার স্ত্রীর বস্ত্র হরণ করার চেষ্টা হয়েছিল। আজ কেউ করুক তো প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে অপহরণ, পার্লামেন্টে কোন নারীর বস্ত্র হরণ করুক দেখি, তারপর দেখুক তার কি হয়! যে

কোন দেশে কোন রাজার স্ত্রীকে অপহরণ করুক দেখি, রাবণ যেভাবে সীতাকে অপহরণ করেছিল, আর কোন নারীর শাড়ি ধরে একবার সবার সামনে টানা হোক তো, তারপর নারী নির্যাতন বাহিনী থেকে শুরু করে কত মানবাধিকার সমিতি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঐ যুগে যারা ছিল তাদের বদমাইশি করারও ক্ষমতা ছিল। যখন অপহরণ করবার ইচ্ছে হত তখন হারু পাঁচুর বউকে তুলে আনছে না, একেবারে রাজার বউকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, লুটিত ভাণ্ডার মারিতো গণ্ডার। একেই বলে ক্ষমতা, আমরা এখন সবাই হয়ে গেছি বিষ্ঠার ক্রিমির মত। এখন মানুষের ভালো কিছু করারও ক্ষমতা নেই আর খারাপ কিছু করার ক্ষমতার তো কোন প্রশ্নই নেই। আগে এই ক্ষমতাকে অর্জন করতে হবে, যখন বলতে পারবে যে আমার এই ক্ষমতা কিন্তু একে আমি খারাপ কাজে লাগাবো না, সমস্ত সুখভোগের ক্ষমতা অর্জন করার পর সেই ভোগকে পদদলিত করে সরিয়ে দিতে পারবে তখনই নিজেকে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তৈরী করতে পারবে। আমরা এখন সেই ভোগের ক্ষমতাই অর্জন করতে পারিনি। ঠিক এই জিনিষটাকে স্বামীজী বলে গেছেন, আগে তোমার ক্ষমতা দেখাও, তোমার পৌরুষত্ব অর্জন কর। আমাদের অর্থ উপার্জন করার ক্ষমতা নেই, কামভোগ করার ক্ষমতা নেই, আমরা আবার বলছি ঈশ্বর দর্শন কি করে হবে! মনের স্বাভাবিক গতি সব সময় অধোগতি, এখন আমাদের মন হয়ে গেছে স্থবির, মনের নড়াচড়ার ক্ষমতাই নেই। মনের স্থবিরতা চলে যাওয়ার পর যে গতি হবে প্রথমে তার অধোগতিই হবে, কিন্তু এই অধোগতিই মনকে পরে উপরের দিকে গতি এনে দেবে।

মহাভারতে এইটাই দেখানো হচ্ছে, বদমাইশি যখন করছে তখন দুর্যোধনের মত করছে, দুর্যোধনও কিন্তু সচেতন যে আমি অধর্ম করছি, তারও ক্ষমতা আছে। আবার যখন শক্তির খেলা দেখাচ্ছে তখন অর্জুনকে নিয়ে আসছে। এখন এই চরিত্রগুলো আদৌ ছিল কি ছিল না আমাদের কাছে গুরুত্ব নয়। সাহিত্যকরা যখন কোন কিছু রচনা করেন তখন কোন একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্য সেটাকে তুলে নিয়ে আসেন, এটাই হল সেই চরিত্রের সার। এইবার লেখক ঐ সারটুকু নিয়ে নতুন উপাদান দিয়ে একটা নতুন চরিত্র দাঁড় করিয়ে দেন। এই সারটাকে একটা কাঠামোর মত বলা যেতে পারে। ব্যাসদেব ছিলেন এই ব্যাপারে সেরা, অবশ্য বাল্মীকিও এই ব্যাপারে একজন শ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন, কত সামান্য একটা ঘটনাকে কল্পনার জগতে নিয়ে তাকে কাব্যিক মাধুর্যের ফুটিয়ে তুলেছেন, বাল্মীকি রামায়ণ না পড়েলে বোঝা যাবে না। এগুলো হল কাব্যিক প্রতিভা, যখনই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে কাটাছেঁড়া করতে যাব তখন সাহিত্যের রস আস্বাদন থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হবে। ব্যাসদেবও ঠিক তাই করেছেন। ব্যাসদেব মানবজাতির ব্যক্তিত্বের মধ্যে যত রকমের ভাব থাকতে পারে সব ভাবগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করলেন, যুধিষ্ঠিরও ছিল, কৌরবরাও ছিল, এদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ছিল, কে ঠিক কে ভুল পরিষ্কার বলা যায় না। মানুষের মধ্যে সততার ভাবকে নিয়ে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের মত একটা চরিত্র অঙ্কন করলেন, সততাকে টেনে কোন্ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে সেটাকে তিনি যুধিষ্ঠিরের মধ্যে দিয়ে বার করে দেখালেন।

হিংসা ভাব থাকলেই যে মানুষ খারাপ হবে তা তো নয়, সবার মধ্যেই কিছু না কিছু হিংসা ভাব আছে। আমাদের মধ্যে যারা ছোটবেলায় লেখাপড়াতে ভালো ছাত্র ছিল না, সে পরীক্ষায় একশোর মধ্যে যদি পঁয়তাল্লিশ পায় তাতেই সে খুশি। আবার যারা ভালো ছাত্র তাদের একজন নব্বুই পেয়েছে আরেকজন ঊননব্বুই পেয়েছে সেখানে তাদের মধ্যে এক নম্বর নিয়ে বিরাট রেশারেশি হতে থাকবে। খারাপ ছেলের সাথে সেরা ছাত্রের কখনই রেশারেশি হবে না। আমার আর মনমোহন সিং এর মধ্যে কখনই হিংসা হবে না। হিংসা সব সময় হয় সমানে সমানে। যে দুই ছাত্র বরাবার চল্লিশ একচল্লিশ পেয়ে আসছে, কোন কারণে একজন যদি পঞ্চাশ পেয়ে যায় তখন তার শরীরের মধ্যে কেমন যেন জ্বালা হতে থাকবে। খুব নীচু আর খুব উঁচুর সাথে কখনই হিংসা বা রেশারেশি হয় না। আমার মধ্যে হিংসা আছে, তাই বলে কি আমার মধ্যে আর কোন ভাল গুণ নেই? তা কখনই হবে না, সবার মধ্যে যেমন খারাপ গুণ আছে আবার তার মধ্যে প্রচুর সদ্‌গুণও থাকতে হবে। দুর্যোধনেরও অনেক ভালো গুণ ছিল। কিন্তু একটা জায়গাতে গিয়ে দুর্যোধন আটকে গেল, ঐখান থেকে সে আর বেরোতে পারল না। যে জিনিষটাতে দুর্যোধন আটকে গিয়েছিল, ব্যাসদেব সেটাকে ধরে তাঁর কাব্যিক প্রতিভার সাহায্যে চিন্তা ভাবনা, কল্পনা দিয়ে এমন একটা চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, কাউকে যখন বলা হবে এই লোকটা দুর্যোধন তখন সে বুঝে নেয় লোকটি কেমন। এই হচ্ছে এই ধরনের সাহিত্যের উৎকর্ষতার বৈশিষ্ট্য। এই কারণে আগেই বলা হয়ছিল যে, আমাদের কাছে ইতিহাসের কোন মূল্য নেই, ব্যক্তিরও কোন মূল নেই, আমাদের কাছে মূল্য হচ্ছে আদর্শ, নীতি ও ভাবের, এই আদর্শের কথা, নীতির কথাই মহাভারতে বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তি কালে মহাভারতকে আধার করে অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশেও বিশেষ করে কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও মহাভারতের খুব প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

অনুবন্ধ চতুষ্টয়

তখনকার দিনে গ্রন্থকারদের একটা নিয়ম ছিল, যখনই কোন গ্রন্থ রচনা করা হত প্রথমেই উপক্রম থাকতো, যেখানে সংক্ষেপে বলা হত এই গ্রন্থে কি বলতে যাওয়া হচ্ছে। এর সাথে থাকত গ্রন্থের মহিমা, এই গ্রন্থ পাঠ করে কি লাভ হবে। আরেকটা জিনিষ থাকত, যে কোন গ্রন্থে অনুবন্ধ চতুষ্টয় দেওয়া হত। প্রথমে বলে দেওয়া হত গ্রন্থের বিষয় বস্তু কি। দ্বিতীয় হল, এই গ্রন্থ কার জন্য। তৃতীয় হল, বিষয় বস্তু আর গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে সম্বন্ধটা কি। শেষে চতুর্থ হল প্রয়োজন, এই গ্রন্থ পাঠ করে আমার কি লাভ হবে। এই চারটে জিনিষকে প্রথমেই আলোচনা করে নেওয়া হত, এর বিষয়বস্তু কি, এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারি কে, এর সম্বন্ধটা কি আর প্রয়োজন, এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আমার কি লাভ হবে। যেমন উপনিষদে বলা হয় উপনিষদের বিষয় হচ্ছে আত্মব্রহ্মৈক্য, যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। এখন কেউ বলল আমিতো জানতে চাইছি অর্থ কি করে রোজগার করা যায়, তখন তাকে বলে দেওয়া হবে তোমার জন্য উপনিষদ নয়। উপনিষদ পাঠের অধিকারি কে? যে কোন লোককে উপনিষদ পড়ান যাবে না, উপনিষদ পাঠ করতে হলে তাকে কিছু গুণ অর্জন করতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে সম্বন্ধ, এইখানে যে মন্ত্রগুলো আছে এগুলোর মধ্য দিয়ে আত্মব্রহ্মৈক্য বিষয়কে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বিষয়টাকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। উপনিষদ পড়ে আমার কি লাভ হবে? তোমার জীবনে যে শোক, মোহ রয়েছে এইটা তোমার কেটে যাবে, তুমি নিজেকে যে ক্ষুদ্র মনে করছ এই ক্ষুদ্র মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তোমার দুঃখ কষ্টের মূলে হচ্ছে তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করছে, যখন তোমার এই মনোভাব কেটে যাবে তখন তুমি সব দুঃখ কষ্টের পারে চলে যাবে। এইটাই হল প্রয়োজন, মহাভারতেও এইভাবে করা হয়েছে, একে বলা হয় গ্রন্থস্তুতি। গ্রন্থস্তুতি অধ্যাত্ম রামায়ণে খুব স্পষ্ট দেখা যায়, প্রত্যেক অধ্যায়ের পরেই থাকবে, যারা এই অধ্যায় নিয়মিত মন দিয়ে পাঠ করবে তার এই এই লাভ হবে। এক জায়গায় বলছে যে স্ত্রী এই অধ্যায় পাঠ করবে তার কখন দাম্পত্য কলহ হবে না।

এর আগেও বলা হয়েছে যে, ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছিলেন, রচনা করে তিনি প্রথম শুকদেবকে শুনিয়েছিলেন, শুকদেব আবার বৈশম্পায়নকে শুনিয়েছিলেন। এই তথ্যগুলো ঠিক পরিষ্কার করে কোথাও বলা নেই তবে মহাভারতে আমর পাই ব্যাসদেব বৈশম্পায়নকে বলছেন 'আমি তোমাকে মহাভারতের কথা যেমনটি বলেছিলাম তুমি সেই রকমটি বল'। বৈশম্পায়ন ঋষি আবার উগ্রশ্রবা সৌতি নামে তাঁর এক শিষ্যকে মহাভারতের কথা বলেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী শুরু হয় নৈমিষারণ্য থেকে। নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষি বারো বছরের এক যজ্ঞ করছিলেন। সেই যজ্ঞে সৌতি এসেছেন, সৌতি সেখানে মহাভারতের কাহিনী বলতে গিয়ে বলবেন আমি কিভাবে এই কাহিনী বৈশাম্পয়নের কাছে শুনেছিলাম। আবার বৈশম্পায়ন বলবেন, ব্যাসদেব কি বলেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণেও প্রথমে একটা ভূমিকার ব্যাপার আছে, ভূমিকা থাকলেও পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভূমিকাটা তাঁর শিষ্যরা লিখেছেন আর এই জায়গা থেকেই বাল্মীকি নিজে লিখতে শুরু করছেন। মহাভারতে কোথাও সৌতির কথা আসছে, কোথাও বৈশম্পায়নের কথা আসছে, ব্যাসদেবের মূল রচনা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে বোঝা যায় না, কোথায় যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

জীব, জগৎ, মায়া ও ঈশ্বর

বিশ্বের যে কোন ধর্ম মাত্র তিনটে জিনিষকে নিয়ে আলোচনা করে, এই তিনটের বাইরে অন্য কোন কিছুর আলোচনা পাওয়া যাবে না। প্রথম হল ঈশ্বর, ঈশ্বরকে গড বলা যেতে পারে কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের ধারণার সাথে খ্রীশ্চানদের গডের পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় হল জীব, জীবের ইংরাজী অনুবাদ হয়ে যাবে সোল, কিন্তু আমাদের এখানে জীব আলাদা সোল্ আলাদা। তৃতীয় হল জগৎ। যে কোন ধর্মের দর্শন নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন এই তিনটের উপর সব আলোচনা চলে, এই তিনটের বাইরে আর কোন আলোচনা নেই। উপনিষদ থেকে বাইবেল কোরান যেখানেই যাই না কেন এই তিনটে জিনিষ আর এই তিনটের মধ্যে কি সম্পর্ক এই নিয়েই আলোচনা করে গেছে। যখন হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে নজর দেব তখন দেখবো ঈশ্বরের দুটো রূপ এসে যাচ্ছে, একটা নির্গুণ আরেকটি সগুণ। নির্গুণ নিরাকারকেই বলছে ব্রহ্ম অন্য দিকে সগুণ সাকারকে বলছে ঈশ্বর। হিন্দু দর্শনের শেষ কথা হচ্ছে যিনি ব্রহ্ম তিনিই জীব। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় ঈশ্বর কি করে জীব হয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বর থেকে জীবের মাঝখানে একটা সংযোগ রেখা আছে, এটাকে বলা হচ্ছে মায়া। মায়া সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে মায়া বলতে বোঝাচ্ছে সৃষ্টির প্রক্রিয়া। ঈশ্বর থেকে জীব কিভাবে হচ্ছে আর ঈশ্বর থেকে জগৎ কিভাবে আসছে, এটাকে আমরা চতুর্থ একটা বিষয় ধরে নিই তাহলে এর নাম হবে মায়া। খ্রীশ্চান বা ইসলাম বা যে কোন দ্বৈতবাদী মতের দর্শনে এই মায়াকে বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা তাঁর লীলা কিন্তু বেদান্তে বলা হয় মায়া। জীব আর জগতের মধ্যে জগত হচ্ছে জড় পদার্থ, আমি নিজেকে যে জীব বলছি, এখানে আমি হলাম চিজ্জড়গ্রন্থি, আমার মধ্যে চৈতন্য আছে আবার জড়ও আছে। যেমন এই বোতলটার মধ্যে

চেতনা বোধ নেই এটা একটা জড় পদার্থ, কিন্তু একটা পিঁপড়ের মধ্যে চৈতন্য আছে বলে সে জীব। এখন প্রশ্ন এই ঈশ্বর থেকে জড় কি করে আসছে, আর জড়ের মধ্যে চৈতন্য কি করে আসছে, এই তিনটেকে কেন্দ্র করেই ধর্মের সমস্ত দর্শন। আধ্যাত্মিক দর্শনে এই তিনটের বাইরে কিছু আলোচনা করা হয় না। বিজ্ঞান শুধু জীব আর জগতকে ব্যাখ্যা করছে, এরা আবার একটা নতুন শব্দ নিয়ে আসে সেটা হল মন, জগৎ আর মন। হিন্দুদের কাছে এই মন জগতেরই অংশ তাই মনটাও একটা জড় পদার্থ। আমাদের হিন্দুদের কাছে মন, বুদ্ধি এগুলো সবই জড়। তাই হিন্দু দর্শনে যখন মনের আলোচনা করবে তখন জগতের মধ্যে মনের আলোচনা করে দেয়, চৈতন্যকে যখন ব্যাখ্যা করে তখন বলে ওটা আলাদা জিনিষ, কিন্তু আমার মধ্যে যে চৈতন্য আর সর্বব্যাপী চৈতন্য ব্রহ্ম, এই দুটো এক, এদের কোন ভেদ নেই। অবশ্য এটা অদ্বৈতের মত, কিন্তু অন্যান্য মতে অন্য ভাবে আলোচনা করে। ব্যাসদেবকে ব্রহ্মা এই কথাই এখানে বলছেন, এই জিনিষগুলোর তত্ত্বকে তুমি যত ভালো বোঝ অন্যরা সেই রকম বোঝে না। ব্রহ্মার এই বক্তব্যকে ভালো বোঝা যায় গীতাতে, ব্যাসদেব ছাড়া বাকিরা সবাই একাঙ্গী। রামানুজ, মাধ্বাচার্যরা এঁরা হলেন একাঙ্গী কিন্তু ব্যাসদেব যত রকমের তত্ত্ব আছে সব কটাকে নিয়ে এসে সমন্বয় করে দিলেন। ব্রহ্মা তাই বলছেন এই তিনটে জীব, জগৎ আর ঈশ্বরকে তুমি যে রকম বোধে বোধ কর এই রকম বোধ আর কারুর নেই, সেইজন্য তোমার এই রচনার সাথে কোন রচনার তুলনাই করা যাবে না, এক কথায় তুমি মহান।

ভারতীয় ঐতিহ্যে মুর্ত ও অমুর্তের ধারণা

(বেদ কাকে ভয় পায় – মুর্ত ও অমুর্তের ধারণার নিরিখে ঠাকুরের কয়েকটি দিব্য দর্শনের বিশ্লেষণ)

গ্রন্থস্তুতি করতে গিয়ে সৌতি বলছেন দইয়ের মধ্যে মাখন যেমন শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদের মধ্যে উপনিষদ, ঔষধের মধ্যে অমৃত যেমন শ্রেষ্ঠ ঠিক তেমনি যত রকমের ইতিহাস আছে তাদের মধ্যে মহাভারত শ্রেষ্ঠ। ধর্মের চারটি স্তম্ভের মধ্যে যদিও আক্ষরিক অর্থে ইতিহাসকে রাখা হয় না, কিন্তু ইতিহাসকে পুরানের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। একটি শ্লোকে বলছেন *ইতিহাসপুরানাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।।* ১/১/২২৯। বলছেন, যদি তুমি বেদ বুঝতে চাও, বেদকে জানাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তোমাকে ইতিহাস আর পুরান জানতে হবে। ইতিহাস আর পুরান যদি জানা না থাকে তাহলে তুমি বেদ বুঝতে পারবে না। ইতিহাস আর পুরানে যারা অজ্ঞ তাদের থেকে বেদ ভয় পায়। কোন ব্রাহ্মন যখন শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দেয় শিষ্য যদি ইতিহাস আর পুরানের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে তখন বেদ বলে *মাময়ং প্রহরিষ্যতি*, এ আমাকে প্রহার করবে। ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে অমুর্ত মুর্ত হয়ে যায় আর মুর্ত অমুর্ত হয়ে যায়। মুর্ত আর অমুর্তের মাঝখানে যে বিভাজন রেখা সেটা কোথায় যে উধাও হয়ে যায় বোঝা যায় না। বেদ আসলে একটি শাস্ত্র, কিন্তু যখনই বেদকে নিয়ে আলোচনা শুরু হবে তখনই বেদ যেন একটা মুর্ত রূপ ধারণ করে নিয়েছে। এখানে বেদ মুর্ত রূপ ধারণ করে ভয় পাচ্ছে। মুর্ত ও অমুর্তের এই ধারণা প্রথম বাল্মীকি রামায়ণে নিয়ে আসা হয়েছে। বিশ্বামিত্র যখন শ্রীরামচন্দ্রের হাতে দিব্যাস্ত্র গুলি তুলে দিচ্ছিলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র দেখছেন প্রত্যেকটি অস্ত্রের যে অভিমানি দেবতা সবাই একে একে শ্রীরামচন্দ্রের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। কারণ শ্রীরামচন্দ্রকে যখন দিব্যাস্ত্র সমর্পণ করে দেওয়া হল তখন এই অস্ত্রের মালিক হয়ে গেলেন শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্র তখন প্রতি প্রণাম করে বলছেন – আপনারা নিজ নিজ স্থানে গমন করুন, আমার যখন যেমন প্রয়োজন হবে আমি আপনাদের স্মরণ করব। যেমন ব্রহ্মাস্ত্র, শ্রীরামচন্দ্র যখন কোন অস্ত্রকে তুলে ব্রহ্মাস্ত্রকে স্মরণ করে মনে মনে জপ করবেন তখন ব্রহ্মাস্ত্রের আধ্যাত্মিক শক্তি সেই অস্ত্রের মধ্যে এসে যাবে। এবার সেই অস্ত্রকে প্রয়োগ করলে ব্রহ্মাস্ত্রের যা শক্তি সেটা প্রকাশ হয়ে তার কাজ করবেই করবে।

অন্য দিকে মায়ের সন্তানের প্রতি যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসা ব্যক্তি বিশেষের ভালোবাসা, এই ভালোবাসাকে নিয়ে চলে যাবে অমুর্ত রূপে। সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কোন দাম থাকে না, 'ভালোবাসা' এই জিনিষটার প্রতি দাম থাকে। মানুষ যখন একটা পাথরকে শিবলিঙ্গ রূপে পূজো করছে, সেটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে অমুর্ত রূপে। এই যে শিবলিঙ্গ তিনি হচ্ছেন সেই শিব যিনি নির্গুণ নিরাকার। শিবলিঙ্গ একটা রূপ। কার রূপ? শিবের রূপ, অথচ তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে নির্গুণ নিরাকারে। অন্য দিকে অস্ত্রের কোন রূপ নেই, একটা তীর মাত্র কিন্তু হঠাৎ দেখছে তীরের জায়গাতে একজন দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের কাছে এই মহাভারত একটা গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু আমি রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম মহাভারত এক দেবতার রূপে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরের দিন আমি যদি কাউকে এই কথা বলি সে আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু তা নয়, এটাই বাস্তব। এর বাস্তবতা কোথায়? যে কোন শাস্ত্র পড়তে গেলে আমাদের কয়েকজনের কৃপার অপেক্ষায় থাকতে হয়। প্রথমে আত্মকৃপা, আমি শাস্ত্র অধ্যয়ণের জন্য পরিশ্রম করছি, দ্বিতীয় গুরুকৃপা, যার মাধ্যমে আমি শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করছি, কিন্তু শেষে দরকার শাস্ত্র কৃপা। শাস্ত্রের যখন কৃপা হয়

তখন হঠাৎ তিনি তাঁর হৃদয়টাকে খুলে দেন। শাস্ত্র কৃপা হলেই শাস্ত্র কি বলতে চাইছে ঐটা স্পষ্ট হয়। আমি যতই শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে থাকি না কেন, শাস্ত্র কৃপা না হলে শাস্ত্রের অর্থ স্পষ্ট হয় না। গীতা উপনিষদ, এনারা একটু নাক উঁচু শাস্ত্র, ফলে অত সহজে এনাদের রূপ দেখান না। সাধারণ সাহিত্যিক বা কবিদের যে রচনাগুলো এতই হাল্কা যে চিকচিক করে নিজদের রূপটা দেখিয়ে দেয়, কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ নিয়ে লেখা বলে কোন উচ্চ ভাব নেই। কিন্তু শাস্ত্র কি বলতে চাইছে সেটাকে স্পষ্টিকরণ করতে হলে আমাকে সাধনা করতে হবে সাথে সাথে দীর্ঘ দিন ধরে ঐ শাস্ত্রের সেবা করে যেতে হবে, তখন শাস্ত্র নিজেকে খুলতে থাকবে। তখন শাস্ত্রকে আমি মুর্ত রূপে দেখতে পারি, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

ঠাকুরের কাছে অষ্টধাতুর যে রামলালার মুর্তি ছিল সবাই দেখছে অষ্টধাতুর একটা মুর্তি, কিন্তু ঠাকুর স্পষ্ট দেখছেন এক জীবন্ত বিগ্রহ। রামলালাকে ঠাকুর যখন স্নান করাচ্ছেন তখন বাকিরা দেখছে অষ্টধাতুর মুর্তিকে স্নান করান হচ্ছে, কিন্তু ঠাকুর দেখছেন সাক্ষাত রামলালা স্নান করছেন। এটা কি ঠাকুরের মনের ভ্রম? আদপেই নয়। শুধু তাই নয়, যাঁর কাছ থেকে ঠাকুর এই রামলালাকে পেয়েছিলেন সেই জটাধারী, সেও ঠিক তাই দেখত। যখন দেখল রামলালার মন ঠাকুরের দিকে বেশী চলে গেছে, তখন একদিন তিনি পবিত্র ভাবে রান্না করে রামলালাকে বিশেষ ভোগ নিবেদন করে ঠাকুরের কাছে রামলালাকে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

প্রথমে এটি একটি ছোট্ট অষ্টধাতুর মুর্তি, এটি মুর্ত রূপ, এরই অমুর্ত রূপ হয়ে যাচ্ছে দিব্য রূপ আবার সেই দিব্য রূপে এসে যাচ্ছে রামলালার রূপ। লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ খুব ভাবের সাথে এই রামলালার বর্ণনা করেছেন। ঠাকুরের কাছে রামলালার গল্পটল্প শুনে শরৎ মহারাজ রামলালার মুর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, এই কি সেই রামলালার মুর্তি! এখনও রাখা আছে কিন্তু এখন আর সেই প্রকাশ নেই। ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুর মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মা কালীর মর্মর মুর্তি, এখন আস্তে আস্তে সেই মর্মর মুর্তি অমুর্ত রূপ ধারণ করছে। তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈত মতে সাধনা করতে গিয়ে ঠাকুর তিন দিন সমাধিতে লীন হয়ে রইলেন, সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে ঠাকুর আবার সেই মা মা করতে লাগলেন। এই মা কালী প্রথমে মর্মর মুর্তিতে মুর্ত রূপ, তারপর সেই মুর্ত রূপ অমুর্ত রূপ ধারণ করল, সেখান থেকে আবার নেমে এলেন মুর্ত রূপে। এবার মুর্ত রূপে কি করছেন মা? ঠাকুর দেখছেন মা বাচ্চা মেয়ের বেশে পায়েল পড়ে ছম্ ছম্ আওয়াজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একবার দেখছেন মা পাঁচ বছরের মেয়ে দিগম্বরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একদিন দেখছেন মন্দিরের আলসে তে মা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর চোখের চাহনিতে জগৎ নড়ছে। একদিন দেখছেন মা চুল শুকোচ্ছেন। মন্দিরে ভবতারিণীর মুর্তি যেমন আছে তেমনই আছে, মুর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে না, কিন্তু ঠাকুর মাকে নানা ভাবে মন্দিরের বাইরে দেখছেন। রামলালার ক্ষেত্রে রামলালার মুর্তিকে যেমন যেমন যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে তেমন তেমন রামলালাকে দেখছেন। মা কালীর ক্ষেত্রে ঠাকুর মন্দিরের মুর্তিকে কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন না, মুর্তি মন্দিরে যেমন থাকার তেমনিই আছে। ভবতারিণীর মুর্তি প্রথমে ঠাকুরের কাছে হয়ে যাচ্ছে অমুর্ত রূপ, যেখানে তিনি দেখছেন চৈতন্য সমুদ্রের জ্যোতির ঢেউ একের পর এক এসে আছড়ে পড়ে সমস্ত মন্দির দেবালয়কে জ্যোতিতে ঢেকে ফেলেছে। উনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরে এসেছে তখন তিনি মা মা করে যাচ্ছেন। কিন্তু খেলা এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। মন্দিরে মায়ের বিগ্রহের সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে নিবেদন করে মন্ত্র পড়া শুরু করেছেন তখন বলছেন – মা একটু সবুর কর, মন্ত্রটা শেষ করে নিতে দে। মানে মা আগেই এসে খেতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আবার বলছেন – তুই কি চা ? ও বুঝেছি আমাকেও খেতে হবে! এই নে আমি মুখে দিচ্ছি। বলে নিজেই খেতে শুরু করেছেন। এটা একটা দিক, আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রসঙ্গকে সরিয়ে এখানে আমরা বলতে পারি যে ঠাকুর মুর্তিটা ভেবে ভেবে ঠাকুর এই রকম দেখছেন। কিন্তু যখন ঠাকুর নিজের ঘরে শুয়ে আছেন ঠাকুর শুনতে পাচ্ছেন ছম্ ছম্ আওয়াজ, বাইরে এসে ঠাকুর দেখেন মা একটা বাচ্চা মেয়ের রূপ ধরে পায়েল ও পাঁজর পড়ে সিড়ির উপর উঠছেন। আবার দেখছেন মন্দিরের আলসেতে মা দিগম্বরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর চাহনিতে জগৎ নড়ছে। এটাই ভারতের আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব। যাঁরাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরমে পৌঁছে যান তাঁরাই দেখেন যিনি অমুর্ত, যাঁর রূপ হতে পারেনা তিনি মুর্ত রূপ ধারণ করে নেন। যিনি মুর্ত, বিগ্রহ রূপ ধরে পূজো নিচ্ছেন তিনিই আবার অমুর্ত রূপ হয়ে যান। সেইজন্য ভারতের কাছে নির্গুণ নিরাকার আর সগুণ সাকার কোন সমস্যা নয়। কারণ যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ, যিনিই সাকার তিনিই আবার নিরাকার। যাঁর মুর্তি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখা হয়েছে তিনি আবার সচ্চিদানন্দ সাগরের ঢেউয়ের পর ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়েন। তিনিই আবার পায়েল পরে ছম্ ছম্ আওয়াজ করতে করতে দিগম্বরী হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। অনেক দিন ধরে ঠিক ঠিক সাধনা না করা হলে, তপস্যা, জপ-ধ্যান, সাধুসঙ্গ, নির্জন বাস না করা থাকলে এই জিনিষগুলোকে বোঝা যায় না। এই কারণে শাস্ত্র বোঝা অত্যন্ত কঠিন। মহাভারত একটা শুধু ইতিহাস নয়, ভারতের সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু আছে এক মহাভারতেই সব কিছু পাওয়া যাবে। আমরা

যে মনে করি মহাভারত পাণ্ডব আর কৌরবদের ঝগড়া বিবাদ আর লড়াইয়ের কথাই আছে, কর্ণ আর অর্জুনের লড়াইয়ের কথাই আছে, আসলে তা নয়। এগুলো মহাভারতের কিছুই নয়, মহাভারতের আসল হচ্ছে এর আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

এই যে এখানে বলছেন বেদ ভয় পান পড়ে মনে হবে এটা একটা নিছক কাব্যিক বর্ণনা। আসলে এটা কোন কাব্যিক অভিব্যক্তি নয়, এখানে ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাস্তব দিকটাকে উন্মোচন করা হল। শাস্ত্র কৃপা না হওয়া পর্যন্ত এই জিনিষ গুলো কখন স্পষ্ট হবে না। স্বামী তুরিয়ানন্দ বলছেন গীতার একটা শ্লোককে নিয়ে এক মাস ধরে চিন্তন করতে করতে শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট হয়। শব্দ থেকে শব্দ জন্ম নেয়, কিন্তু যখন মৌন থেকে যে শব্দ তৈরী হয় সেই শব্দ দিয়েই সৃষ্টি হয় সৃজনশীল সাহিত্য, আর সমাধি থেকে যে শব্দ হয় সেটাই ভগবানের বাণী। ঠিক এই কথাই বিখ্যাত সাহিত্যিক খালিজ ইব্রাম্‌ বলছেন সাহিত্য বা কাব্য মৌন থেকে সৃষ্টি হয়। নোবেল জয়ী তুর্কি সাহিত্যিক ওরহান পামুর তাঁর 'মাই নেম ইজ রেড' বইয়ের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এই বইটি লেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন 'আমি যখন বইটি লিখতে বসতাম, অনেক সময় দেখেছি একটা জিনিষ মাথায় ঠিক করে লিখতে গিয়ে আমার মনে হয় কেউ যেন আমার হাত ধরে অন্য কিছু লিখিয়ে দিচ্ছেন'। এর জন্য অনেক দিনের সাধনার দরকার। এই সাধনা যখন থাকে তখন বিদ্যা স্পষ্ট হয়। আস্তিকাদি অর্থাৎ শুধু ঐতিহাসিকতার কোন মূল্য নেই এগুলো শব্দ মাত্র। ঔপরিচক যখন হবে তখন তার শব্দের দাম হবে, কিন্তু ঔপরিচকের শব্দকে বুঝতে হলে সাধনার দরকার। যিনি ঔপরিচক সৃষ্টি করছেন এবার তার সাধনা কল্পনা করুন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বুঝতে হলে কাব্যিক বোধ চাই, ভাষার জ্ঞান থাকা চাই, কিন্তু যিনি এই কবিতা রচনা করেছেন তার তাহলে কত জ্ঞান ও কাব্যিক বোধ থাকলে পরে তিনি এই কবিতা রচনা করতে পেরেছেন। মহাভারতের ভাব ও অর্থ বোধ করতে হলে সাধনা চাই। তাই বেদ বলছে যে ইতিহাস বা পুরান পড়েনি, মানে যার সাধনা নেই, জ্ঞান নেই তাকে আমি ভয় পাই। তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তার একটা কথাও ভুল নয়।

চারটে পুরুষার্থ ও বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য

আমাদের হিন্দু ধর্মের মূল কথা হল একমাত্র আধ্যাত্মিক সত্তাই আছেন, জীবনের উদ্দেশ্য হল এই আধ্যাত্মিক সত্তার সাথে এক হওয়া, কিন্তু এটা সবারই পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে অতি সাধারণ, সাধারণ মানুষ রয়েছে, সেইজন্য আমাদের মুনি ঋষিরা অধিকারি বিশেষে বিভিন্ন ধর্মাচরণের কথা বললেন, আর সবার জন্যই বলে দিলেন না যে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম তত্ত্বের সাথে এক হওয়া, তাই এনারা চারটে পুরুষার্থকে নিয়ে এলেন – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। মোক্ষ হল সন্ন্যাসীদের জন্য, ধর্ম হল যারা ইহকালে সুখভোগ ও পরকালে মানে মৃত্যুর পর স্বর্গ কামনা করছে, দান করা, উপোস করা, সেবা করা এগুলো করলে তোমার নাম-যশও হবে আর মরার পর ভালো স্বর্গে যাবে। বাকিদের জন্য বলে দিলেন অর্থ আর কাম, তোমার মধ্যে কামনা বাসনা রয়েছে, তাতে কোন অসুবিধা নেই, তুমি চুটিয়ে কাম ভোগ কর কিন্তু শাস্ত্রে যেরকমটি বলেছে তার বাইরে ভোগ করবে না। ভোগ করতে গেলে অর্থের দরকার, হিন্দুধর্মের শাস্ত্র তাই বলে, আগে ভোগ করার ক্ষমতা অর্জন কর। তোমার ভোগের ইচ্ছে আছে, তাই বলে তুমি অপরের গলা কেটে অর্থ আদায় করে ভোগ করবে সেটা চলবে না, আগে খেটেখুটে অর্থ উপার্জন কর, তারপর সেই অর্থ দিয়ে ভোগ কর। অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে এবার তোমাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে গেলেই অনেক রকমের কর্তব্য এসে যাচ্ছে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কর্তব্য আলাদা আলাদা, আবার বয়স অনুসারে এবং সে কি ধরণের পেশাতে আছে সেই অনুসারেও প্রত্যেকের কর্তব্য পাল্টে যায়। এই পুরো ব্যাপারটাকে মহাভারত আলোচনা করছে। গ্রীক সাহিত্যিক হোমার যে ইলিয়ড ওডিসি লিখেছেন বলা হয় বিশ্ব সাহিত্যে সব থেকে বৃহৎ মহাকাব্য, কিন্তু মহাভারত তার থেকে সাত গুণ বড়।

আমাদের ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র হল বেদ, মহাভারতকে সেই দিক থেকে ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র বলা যায় না। যে কোন ধর্মকে দাঁড়াতে হলে চারটে জিনিষ লাগে – দর্শন, পুরান, তন্ত্র আর স্মৃতি, এই নিয়ে আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। এই চারটে না থাকলে কোন ধর্মই সম্পূর্ণ হয় না। হিন্দুধর্মে ইতিহাস আর পুরানকে পৌরানিক পর্যায়ের মধ্যে রাখা হয়। ইতিহাস আর পুরান আমরা একসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকি, ইতিহাস পুরানে বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, আঠারোটি পুরান আর আঠারোটি উপপুরান, মোট আটত্রিশটি গ্রন্থে মোটামুটি বারো লক্ষ শ্লোক দেওয়া আছে। ইতিহাস আর পুরানের মূল আলোচনা কথা ও কাহিনীর মাধ্যমেই করা হয়, মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে ধর্ম শেখানো। এখানে ধর্ম হচ্ছে যেটা মানুষকে ধরে আছে, সেটা হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে মানুষকে কিভাবে শেখায়?

চারটে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে – প্রথম শেখায় দর্শনের মাধ্যমে, দ্বিতীয় শেখায় পৌরানিক কথা ও কাহিনীর দ্বারা, তৃতীয় শেখায় তান্ত্রিক আচার পদ্ধতির দ্বারা আর চতুর্থ শেখায় আচার ব্যবহারের মাধ্যমে, যেটা আমরা মনুস্মৃতি ইত্যাদিতে পাই।

ইতিহাস আর পুরানের পার্থক্য

ইতিহাস আর পুরানের মধ্যে সামান্য একটু তফাৎ আছে, পুরানে কাল্পনিক চরিত্রের সমাবেশ অনেক বেশী ইতিহাসে কাল্পনিক চরিত্র কম অন্য দিকে ঐতিহাসিক চরিত্র বেশী কিন্তু অন্যান্য সব কিছু এক। যেমন অর্জুন, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ এনারা হচ্ছেন মানবীয় চরিত্র, এঁদের মধ্যে মানুষের গুণ, মানুষের শক্তি, মানুষের দুর্বলতা সব কিছুই পাওয়া যাবে। কিন্তু যখনই পুরানে যাব প্রথমেই শুরু হয়ে যাবে – ভগবান শিব কৈলাসে বসে ছিলেন, নন্দিকে বললেন নন্দি তুমি একটা হুঙ্কার দাও। এগুলো হয়ে গেল কাল্পনিক চরিত্র। ইতিহাস ও পুরানের উদ্দেশ্য একই, মানুষকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দেওয়া। এই চারটের বাইরে যা কিছু আছে সবটাই অপ্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয় যেটা হল, আমি যদি দিল্লী থেকে ঘুরে এসে আপনাকে বলি দিল্লীতে দেখে এলাম কি বড় বড় বাড়ি, কত বিশাল বিশাল ফ্লাইওভার। তাতে আপনার কি হবে, আমাকে কলকাতার ট্রাফিক জ্যামের মধ্যেই ঘুরতে হবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যদি দিল্লীর রাস্থাঘাট দেখে এসে বলেন, আমাদের এখানেও এই রকম কিছু একটা করতে হবে, কলকাতার ট্রাফিকটাকে একটু গতিশীল করতে হবে। তখন ঐটা হবে কাজের জিনিষ। আমাদের শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঠিক এটাই। যখন কথা কাহিনী বলা হচ্ছে, যেটাই বলা হোক প্রথমে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি এটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারো। এখন ভগবান শিব পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, নাকি নন্দির পিঠে চেপে গিয়েছিলেন, নাকি নিজের ইচ্ছামাত্র চলে গেলেন, এগুলোর কোন দাম নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ এগুলোকে নিয়েই মাতামাতি করছে।

শ্রেয় ও প্রেয় এবং মহাভারতের শিক্ষা

মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি মুহুর্তে দুটো রাস্থার মোড় এসে পড়ে, এই দুটো রাস্থার মধ্যে আমাকে কোন একটা রাস্থাকে বেছে নিতে হবে, এই বেছে নেওয়ার শিক্ষাটা আমরা এই শাস্ত্রগুলি থেকে পাই। এই দুটো হল প্রেয় আর শ্রেয়, বাহ্যিক পরিণাম ও অন্তর জীবনের পরিবর্তন। ছোটবেলায় ক্লাশ সিক্সে বিজ্ঞানে কত নম্বর পেয়েছিলাম এখন মনে নেই, কিন্তু ভালো নম্বর পেয়ে থাকলে তাই নিয়ে কত আনন্দ হয়েছিল, নম্বর ভালো না হয়ে থাকলে মনের মধ্যে তখন কত অশান্তি হয়েছিল। আজকে এইখানে দাঁড়িয়ে সেগুলো আমার কাছে আর কোন গুরুত্ব নেই, আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ক্লাশ সিক্সে শিখেছিলাম H_2O মানে জল, এই জ্ঞানটা হারিয়ে যায়নি। প্রেয় হল নম্বর পাওয়া আর ভেতরে অন্তরের পরিবর্তন হল জ্ঞান, H_2O মানে জল, এটাই জ্ঞান, এটাকেই বলা হয় শ্রেয়। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে এই প্রেয় আর শ্রেয়র মধ্যে সজ্ঘাত লেগেই থাকে। ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে এমন ভাবে তৈরী করে রেখেছেন যার জন্য আমরা সব সময় প্রেয়র দিকে আকৃষ্ট হই। যে প্রেয়র দিকে না তাকিয়ে অন্তরের পরিবর্তনের দিকে অর্থাৎ শ্রেয়কে বরণ করে নেয় সেই হয়ে যায় মহাত্মা, পরমহংস। জীবনের উদ্দেশ্যও তাই। ইতিহাস পুরান ঠিক এই জিনিষটাকেই শিক্ষা দেয়, তোমার বাইরে যা কিছুই হয়ে থাকুক, তুমি ছোটবেলায় অনেক ভালো কাজ করেছ, খারাপ কাজও করেছ। একটা দুটো খারাপ কাজ, কিছু ছেলেমানুষি ঠিক আছে, জীবনের অভিজ্ঞতার জন্যও এগুলোর দরকার, কিন্তু এই খারাপ কাজ করাটা যদি একটা অবস্থার পর না বন্ধ করা হয়, বড় হয়ে সেই হয়ে উঠবে এক বড় অপরাধী। যখনই মানুষ কিছু জানার জন্য, বোঝার জন্য এগিয়ে আসে তখনই সে কিন্তু অন্তরের বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বড় পদক্ষেপ নিয়ে নিল। এই যে এখানে সবাই ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানবার জন্য কত দূর দূর থেকে আসছেন, এখানে ভর্তি হয়ে কারুর প্রমোশন হবে না, অর্থ আসবে না, চাকরিও পাবে না, প্রেয়কে কেউ পেতে এখানে আসেনি। কিন্তু কি হচ্ছে? একটা জিনিষের জ্ঞান লাভ হচ্ছে। এখান থেকেই অন্তরের বিকাশ শুরু হয়ে গেছে, এখান থেকেই তার শ্রেয়র দিকে যাত্রা শুরু হয়ে গেল। যে শুধু শ্রেয়কেই বরণ করে নেয় তার প্রেয় মানে বাইরের সাফল্য এমনিতেই এসে যাবে। কিন্তু শ্রেয়র দিকে নজর না দিয়ে শুধু বাইরের সাফল্যের অর্থাৎ প্রেয়র দিকে নজর দিলে সেই সাফল্য আসবে না, যেটা অন্তর জগতের বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আসবে।

মহাভারত কি করছে? মহাভারত মানব জীবনের যত রকমের ঘটন, অঘটন হতে পারে সবটাকে সামনে তুলে ধরে বলছে – এই দেখো, জীবন কিভাবে বিভিন্ন চরিত্রের সামনে দুটো পথ দেখাচ্ছে, এই দুটো পথের সামনে এসে একজন মানুষ প্রেয়কে বরণ করেছে তার ফলে তার এই পরিণাম প্রাপ্ত হল আরেক জন শ্রেয়কে বরণ করে কোথায় পৌঁছে গেল। সবাই একই কাজ করছে কিন্তু দুজনের ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে দুটো খাতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তন হয়ে গিয়ে একজন

দুর্যোধন হয়ে গেল আরেকজন যুধিষ্ঠির হয়ে গেল, একজন শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যাচ্ছে আরেকজন কংস হয়ে যাচ্ছে। সবার কাছেই জীবন একই পরিস্থিতি নিয়ে আসছে। স্টিফেন হকিং হুইল চেয়ারে করে ঘুরে বেড়ায় সে হয়ে গেল পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ। কিন্তু আমাদের কারুর শরীরের একটু ব্যাধি হলেই আমরা ছটফট করতে থাকি, শরীর ছাড়া আমাদের মাথায় কিছুই নেই। মহাভারত পরিষ্কার বলছে এই জিনিষ, এই সমস্যা সবারই কাছে আসছে, সমস্যার প্রতি তুমি কিভাবে প্রতিক্রিয়া করছ এটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন। তুমি যদি বাহ্যিক সফলতার মুখাপেক্ষি হয়ে থাক তাহলে তুমি সাধারণ একজন হয়ে থাকবে আর তুমি যদি বল বাহ্যিক পরিণামে আমার কোন আগ্রহ নেই আমি চাই আমার অন্তরের বিকাশ, শ্রেয়কে বরণ করতে চাই, তাহলেই তুমি মহৎ হয়ে যাবে। মহাভারত কোথাও বলবে না তুমি মহৎ হও, মহাভারত শুধু বলে দেবে অমুক এই করেছিল অমুকের এই হয়েছিল, এগুলোকে কাহিনীর মাধ্যমে বলে বেরিয়ে যাবে। কাহিনী বলার সময় একটাই উদ্দেশ্য থাকবে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের দিকে ঠেলা। ঠেলার সময় বলবে অর্থ ও কামের থেকে ধর্ম অনেক ভালো। আসলে অর্থ আর কাম একসাথে জড়িয়ে আছে, অর্থ আর কামকে আলাদ ভাবে দেখা হয় না। আমার কাছে শুধু অনেক টাকা আছে তার কোন দাম নেই, অর্থ হচ্ছে কাম পুর্তির জন্য। একটা অবস্থার পর এসে বলবে ধর্মেরও তেমন গুরুত্ব নেই, ধর্ম ও অধর্মের পারে মুক্তির অবস্থাটাই শ্রেয়। তবে মহাভারত সাধারণত ধর্মকেই বেশী আলোচনা করছে, অর্থকেও আলোচনা করছে, কামের কথাও বলছে আবার মোক্ষের কথাও বলা হচ্ছে, কারণ গীতা মহাভারতেরই অন্তর্গত, গীতা মোক্ষশাস্ত্র। সহজ কথা হল, পড়াশুনো করছি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্যও পড়তে পারি আবার জ্ঞান লাভের জন্যও পড়তে পারি, মহাভারত বলছে তুমি জ্ঞানের জন্য পড়। মহাভারত কখনই বলবে না যে তুমি পরীক্ষার নম্বরের জন্য পড়াশুনো করো না, মহাভারত বলবে তুমি যদি শুধু পরীক্ষার বেশী নম্বর পাওয়ার আশাতেই পড় তাহলে নম্বর পাবে কিন্তু তোমার অন্তরের জ্ঞানকে উন্মোচিত করতে পারবে না, আর তুমি যদি তোমার অন্তরের বিকাশের জন্য জন্য পড়াশোনা কর তাহলে তুমি জ্ঞানও পাবে পরীক্ষায় নম্বরও পাবে। ধর্ম বলতে মহাভারত বলছে তুমি ভেতরের জিনিষটাকে ধর, বাইরের জিনিষকে দেখতে যেও না, বাইরের জিনিষকে যদি দেখতে যাও তাহলে তোমার কিছুটা ভেতরে যাবে কিন্তু যতটা যাওয়ার কথা ততটা যাবে না। যারা বাইরে ধর্মাচরণ করছে তাদের কি হবে না? হবে, তবে কম হবে। মহাভারত বলছে তুমি এটাকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলে দাও, তখন তুমি ঈশ্বরকেও পাবে জগতটাকেও পাবে, কিন্তু জগতের প্রতি তোমার কোন আগ্রহ থাকবে না। আর তুমি জগতকে যদি ধরতে যাও ঈশ্বর কিন্তু ছাড়া হয়ে যাবে। ইতিহাস পুরানের এটাই মূল বক্তব্য।

এখন কেউ হয়তো পরিস্থিতির প্রতিকূলতার জন্য অন্য কিছু হয়ে গেল, জীবন তাকে সুযোগ দিল না। হয়তো কোন একটা লাইন হোটেলের বেয়ারা বানিয়ে দিয়ে জীবন তার প্রতি তাচ্ছিল্যতা আর বিদ্রুপ ছুড়ে দিল। এখন কি পথ থাকবে? একটা পথ আছে, জীবনকে এখন সে গালাগাল দিতে থাকুক, ঈশ্বরকে অবহেলা করতে পারে, খদ্দেরকে পরিবেশন করার সময় বলতে থাকবে – মনে করবেন না আমি কোন সাধারণ ব্যক্তি, আমি একটা গ্রাজুয়েট, দুর্ভাগ্যে পড়ে আজ এই কাজ করতে হচ্ছে। মেজাজ দেখিয়ে টেবিলে খাওয়ার প্লেটটা রেখে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে বেরিয়ে গেল। খদ্দের এখন খাবারের অর্ডার দিয়েছে, পরিবেশন করতে সে বাধ্য। আরেকটা পথ আছে, জীবন আমার সাথে যাই করে থাকুক, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমাকে আজ এই কাজ করতে হচ্ছে, যে কাজই করিনা কেন সেটাই আমি খুব নিষ্ঠা সহকারে করে যাব। এরপর দেখা যাবে যে কর্মের জন্য তার জীবনে এই দুর্বিপাক এসেছিল, এই নিষ্ঠাপূর্বক কর্মের জন্য ঐ কর্মটা আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকবে। মহাভারতে ঠিক এই জিনিষটাকেই দেখানো হচ্ছে। যুধিষ্ঠির ছিলেন এক সম্রাট কিন্তু তিনি ভাগ্যের পরিহাসে হয়ে গেছেন অন্য এক রাজার সভাসদ, সোজা বাংলায় বলা যায় মোসায়েব। অর্জুন এত বড় যোদ্ধা, সে হয়ে গেল হিজড়া। তাই বলে কি অর্জুন গলায় দড়ি দিয়ে দিল? কিছু দিন আগে খবর কাগজে একটা খবরে দেখাচ্ছে একজন এয়ার হোস্টেশকে চাকরি থেকে সরিয়ে দিয়েছে বলে মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে দিল। এদের জন্যই মহাভারত লেখা হয়েছে, এই পরিস্থিতি যে কোন লোকের জীবন যখন তখন আসবে। যুধিষ্ঠির এতো বড় রাজা, মহাভারতে তাঁর রাজসভার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হবে ঐ রকম রাজসভা ভূমণ্ডলে আর কখনই হবে না, বক্তব্য হল তিনি বিরাট রাজা। সেই বিশাল রাজার কি হল? জুয়া খেলে সর্বস্ব খোয়ালেন, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন, তারপর বারো বছর জঙ্গলে নির্বাসন, আর তারপর একটা রাজার মোসায়েবি করতে হচ্ছে। যুধিষ্ঠির কি বিষ পান করে নিল? দুর্যোধনেরও একই জিনিষ অন্য ভাবে হল, পাণ্ডবদের বিশাল সম্পদ দেখে তার ভেতরটা হিংসার আগুনের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে গেল। তার পরিণতি আমরা সবাই দেখলাম। দুজনেরই সমান শক্তি ছিল, কিন্তু একজন বাইরের চাকচিক্য নিয়ে পড়ে রইল আরেকজন ভেতরের দিকে দৃষ্টিটাকে ফেলে রাখল। শেষ পর্যন্ত যখন দুজন দুজনের মুখোমুখি হল তখন বাইরের শক্তি ভেতরের শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে গেল। বাইরের শক্তির উপরর নির্ভর করে থাকলে সব সময় যে সে হেরে যাবে তা নয়, মহাভারতেও দেখাবে পাণ্ডবরা একটুর জন্য জয়লাভ করেছে। মহাভারত এটা কখনই বলবে না যে, শ্রেয়কে বরণ করলেই যে তুমি সব সময় সাফল্য

পাবে তা নয়। পরে পাণ্ডবদের পুরো বংশেরই নাশ হয়ে গেল, পাণ্ডবদের একটি সন্তানও জীবিত থাকল না। আর যে পৌত্র ছিল সেও শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাকে কোন রকমে রক্ষা করেছেন। তবে কি হয় শ্রেয়কে বরণ করলে তোমার জীবনে একটা সন্তুষ্টির ভাব থেকে যাবে।

প্রত্যেকটি কর্মই দুভাবে প্রতিক্রিয়া করে একটা বাহ্যিক দিকে আরেকটা তার অন্তরের দিকে। ধর্ম এই অন্তরের দিকে আমাদের দৃষ্টিটাকে নিয়ে যায়, সমাজ মানে বাহ্যিক দিকে দৃষ্টি। শুধু মহাভারতেই নয় পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই এই শিক্ষা দিচ্ছে তুমি তোমার দৃষ্টিটাকে বাইরের দিকে না দিয়ে কিভাবে ভেতরের দিকে নিয়ে যাবে। যখন বলা হয়, সত্য কথা বলবে, আসলে বলতে চাইছে তুমি যদি মিথ্যে কথা বল তাহলে তোমার তাৎক্ষণিক কিছু লাভ হবে, হয়তো কিছু টাকা পয়সা লাভ হবে, টাকা পয়সা হওয়াতে তুমি পরিবার ও সমাজের মধ্যে ভালো থাকবে কিন্তু ভেতরটা তোমার দুর্বল হয়ে যাবে। এই যে বলা হয়, মিথ্যে কথা বলা পাপ, পাপ-পূণ্য কে দেখেছে? চিত্রগুপ্তকে কে দেখেছে পাপ-পূণ্যের হিসাব রাখতে? স্বামীজী কোথাও পাপ-পূণ্যের কথা বলছেন না, যে নিজেকে ও অপরকে পাপী বলে সেই পাপী, বেদান্তে পাপ-পূণ্যের কোন স্থান নেই। মিথ্যে কথা বলার ফল হল তুমি কিছু টাকা হয়তো পেয়ে গেলে, হয়তো কিছু নাম-যশ পেয়ে যাবে, এগুলো সবই তোমার হয়ে গেল বাইরের ফল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তুমি ফোঁপড়া হয়ে যাবে। মহাভারত বলতে চাইছে তুমি তোমার ভেতরের কাণ্ডকারখানার দিকে নজর দাও। সত্য কথা বললে টাকা-পয়সার অভাব হয়ে যাবে, লোকে ভাববে এ নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল করেছিল তাই আজ এর এই অবস্থা, কিন্তু বাইরের লোক তাকে দেখলে বুঝতে পারবে না, তাদের চোখের সামনেই সে একদিন মহৎ হয়ে উঠবে। মহাত্মা গান্ধী কি ছিলেন? সাধারণ বৈশ্যকুলের এক মধ্যম শ্রেণীর ছাত্র, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কোন সাফল্যের মুখ দেখতে পেলেন না, ভারতে ফিরে এসে কোন চাকরি পেলেন না। কোন রকমে একটা সাধারণ চাকরি পাওয়ার পর তাঁর হঠাৎ কি হল, বললেন আমার প্রেয়কে চাইনা শ্রেয়কে পেতে হবে, সত্য আর অহিংসাকে বেছে নিলেন। জগতে আগুন লাগলে লাগুক, আমার ছেলে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? যাক, আমি কি কারুর দায়ীত্ব নিয়েছি নাকি, আমার স্ত্রী আমাকে গালাগাল দেবে? দিক, ভবিষ্যত আমাকে গালাগাল দেব, তাই দিক, আমি এই তিনটে জিনিষকে ছাড়বো না, সত্য, অহিংসা আর ব্রহ্মচর্য। এই তিনটেতে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকবো। তাঁর সহকর্মিরা সবাই সাধারণ থেকে গেলেন আর তিনি মহৎ হয়ে গেলেন, আজকে সবাই মহাত্মা গান্ধীকে পূজো করছে।

প্রত্যেকটি ধর্ম ঠিক এটাই করছে, শুধু inner aspect of an action কে বর্ণনা করে। আমরা অনেক সময় মূল্যবোধ আর ধর্মকে মিশিয়ে ফেলি আর মনে করি ধর্মই মূল্যবোধকে শিক্ষা দেয়, কিন্তু ধর্ম কখনই মূল্যবোধের কথা বলে না। ধর্ম যেটা করে তা হল, যে কোন কাজ করা হয় তার বাহ্যিক পরিণতি হল সাফল্য আর অন্তরের outcome হচ্ছে এই মূল্যবোধ, সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি। ধর্ম শিক্ষা দেয় যদি তুমি inner outcome এর দিকে দৃষ্টি দাও তাহলে তুমি ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তোমার পক্ষে আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে আমার কি লাভ? তোমার যে বাস্তবিক স্বরূপ, তোমার যে প্রকৃত স্বভাব সেই স্বভাবে তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। জীবনের উদ্দেশ্য কি? নিজের স্বরূপকে জানা। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি এদিকে এগোতেই পারবে না। সত্ত্বগুণে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? By focusing more on the inner outcome of an action সমস্ত ধর্ম এই শিক্ষাই দেয়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ কত রকমের দুষ্কর্ম করে গেছেন অথচ আমরা তাঁকে ভগবান বলে পূজো করছি। কেন? বাহ্যিক ক্রিয়াতে তার কোন ভ্রুক্ষেপই নেই, রুক্মীনিকে বলছেন – আত্মজ্ঞান ছাড়া আমার কোন সম্বল নেই। আত্মজ্ঞান থাকা মানেই তিনি সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে ত্রিগুণাতীত হয়ে গেছেন। যিনি সন্ত মহাত্মা তিনি সত্ত্বগুণে পোঁছাবার চেষ্টা করছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সত্ত্বগুণের পারে চলে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাই বোঝা খুব মুশকিল, আমাদের মত সাধারণ মানুষের তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের বাইরের টুকুই দেখছি, কিন্তু ভেতরে তিনি কিভাবে অবস্থান করে আছেন আমরা তার কিছুই জানিনা, জানলেও ধরতে পারবো না। তাই মহাভারত আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য এইসব নানা কাহিনী উপাখ্যানের দিয়ে ধর্মটাকে বুঝিয়ে দিয়ে বলতে চাইছে, তুমি এগুলো দেখে শেখ আর সেইভাবে তুমি নিজেকে তৈরী কর। ধর্মের সঠিক বিশ্লেষণ মহাভারতে যেভাবে করা হয়েছে অন্য কোন শাস্ত্র এতো বিস্তারিত ভাবে করা হয়নি।

ঋতমের ব্যাখ্যা

ধর্ম কি, ধর্মের ব্যাপারে আমাদের ঋষিরা কি বলছেন এই ব্যাপারে এখানে কিছু কথা বলা দরকার। উপনিষদে বা বেদে সাধারণ মানুষ ধর্মকে সাদা কালো হিসেবে দেখে। যারা নিজের ব্যাপারে বেশী কথা বলে, নিজের ব্যাপারে বেশী কথা

বলতে গিয়ে তারা বলে, আমি যা বলার পরিষ্কার সোজা কথা বলি। সোজা কথা পরিষ্কার করে বলতে গিয়ে তারা কি বলতে চান তারা নিজেরাও জানেনা। কিন্তু ধর্মের যখন সংজ্ঞা দেওয়া হয় তখন দুই রকমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, একটা সোজা হিসেবে আরেকটা সংজ্ঞা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সোজা করে যখন ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তখন বলবে সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না ইত্যাদি। এতে কারুর কোন সন্দেহ হবার কোন কারণ নেই যে সবাইকে সত্য কথাই বলতে হবে, সদাচরণ করতে হবে, চুরি করবে না। শৈশবকাল থেকে আমরা এই কথা গুলোই শুনে এসেছি। উপনিষদে যে ভাবগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো ঠিক এগুলোর উপরই আধার করে চলে। যখন নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তখন ঠিক এই কথাগুলোই শেখান হয়, এটা করবে, সেটা করবে না, এটা সাদা এটা কালো, এখানে সন্দেহের কিছু থাকে না। অথচ দুর্ভাগ্য হচ্ছে জীবন ঠিক এই ভাবে চলে না। যারাই বলে আমি খুব স্পষ্টবাদী বুঝে নিতে হবে তার মত অস্পষ্টবাদী আর কেউ নেই। স্পষ্টবাদী একমাত্র ঋষিরা হতে পারেন, ঋষিরা ছাড়া স্পষ্টবাদী আর কেউ হতে পারেনা। আর যারা আদিম বর্বর তারাও স্পষ্টবাদী। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোক যারা সভ্যতার একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ তাদের পক্ষে স্পষ্টবাদীতা কখনই সম্ভব নয়।

আমাদের ঋষিরা কিছুটা ধ্যানের গভীরে কিছুটা চিন্তন রাজ্যে প্রবেশ করে জগতের ব্যাপারে কিছু জিনিষকে চোখের সামনে দেখতে পেলেন। রোজ সকালে সুর্য উঠছে, এক সময় সুর্য অস্তে চলে যাচ্ছে, আকাশে তারা উঠছে, সেই তারার গতিবিধিকে লক্ষ্য করলেন, ধরণীর উপর বৃষ্টি নেমে ধরণীকে শীতল করে দিচ্ছে, তারপর দেখলেন গাছে ঠিক সময়ে ফুল হচ্ছে ঠিক সময়ে ফল আসছে। অন্যদিকে দেখছেন সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দই সত্য, এই সত্য ছাড়া আর কিছুই নেই। একদিকে এই সত্যকে দেখছেন আরেক দিকে এই স্থূল জগত আর তার উপর যত কার্য হয়ে চলেছে সেগুলোকেও দেখছেন। এই দুটোর মাঝখানে দেখছেন একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে সব কিছু হয়ে চলেছে, ঠিক সময়ে সুর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, গাছে ফুল ফল আসছে, গরু দুধ দিচ্ছে সব একটা নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট নিয়মে আসছে, যাচ্ছে ও হচ্ছে। তখন তাঁরা আবিষ্কার করলেন একটা নির্দিষ্ট নিয়মে এই জগৎ চলছে, যে নিয়মটাকে পুরোপুরি বোঝা যায় না, অথচ সৃষ্টির আগে থাকতেই সব নিয়ম ঠিক করা হয়ে আছে। সৃষ্টিও এই নিয়মকে স্বীকার করেই চলেছে। ঋষিদের দর্শনে এটাই ধরা পড়ল, প্রথমে ভগবান, ভগবানের পর নিয়ম, নিয়মের পরই সৃষ্টি। ঋষিরা নিয়মের পরিভাষা নিয়ম বললেন না, নিয়মের পরিভাষা দিলেন ঋতম্।

এই ঋতম্ শব্দের অনেকগুলো অর্থ করা হয়। ঋতম্ বলতে সত্যকেও বোঝায়, ঋতম্ বলতে ধর্মকেও বোঝায় আবার ঋতম্ বলতে নিয়মকেও বোঝান হচ্ছে আবার ঋতম্ বলতে শুধু ঋতমকেও বোঝান হয়। বেদে একটি প্রার্থনা মন্ত্র আছে – *ওঁ শং নো মিত্র শং বরুণঃ*, এখানে মিত্র বরুণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে *ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি*, তোমাকে আমি সত্য বলে ডাকব, তোমাকে আমি ঋতম্ বলে ডাকব। ঋতম্ একটি বিশ্বজনীন শব্দ, যার একটা দিক হল সত্য, আরেকটি দিক হল ধর্ম, আর এই ঋতমই আমাদের ভৌতিক জীবনে এসে জীবন-মৃত্যু হয়ে যায়। ফিজিক্সের যত নিয়ম আছে, কেমেস্ট্রির যত ফরমুলা আছে, বায়োলজির যত নিয়ম আছে সব নিয়মই এই ঋতমকে অনুসরণ করে চলে। ঋতমকে এক কথা বলায় যেতে পারে ভগবানের নিয়ম, যে নিয়মকে কেউ উল্লঙ্ঘন করতে পারেনা। অন্য দিকে যখন আমরা মানুষের মূল্যবোধ, নৈতিকতার দিকে যাই, কোনটা করা উচিৎ কোনটা করা ঠিক নয়, কোনটা সত্য কোনটা সত্য নয়, এটাও ঋতমের মধ্যেই পড়ে। ঋতমের ধারণাটা বেদেরই। স্বামীজী যখন ঠাকুরের স্তোত্র রচনা করলেন তখন সেখানেও এই ঋতমকে নিয়ে আসছেন – *ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো*, হে রামকৃষ্ণ আপনি হলেন সেই ওঁ পরমাত্মা ব্রহ্ম, হ্রীং, মানে শক্তি বাচক, আপনিই সৃষ্টির আদি কারণ, আপনিই ঋতম্ অর্থাৎ মহাজাগতিক নিয়ম, যে নিয়মে এই জগত চলছে। আপনি হলেন এই সব কিছু, আপনিই পরব্রহ্ম, আপনিই সৃষ্টির রচয়িতা ও সৃষ্টির নিয়ম, আপনিই সত্য, আপনিই ধর্ম, আপনিই সব, মাধ্যাকর্ষণ, অভিকর্ষণ সব আপনারই, বিজ্ঞানের যত নিয়ম এই সবই আপনি, অথচ আপনি ত্বমচলো, আপনি অচল। আপনার কোন জায়গায় নেই যে আপনি কোথাও যাবেন, কারণ আপনি সর্বব্যাপী। ভগবানকে অচল কেন বলা হয়? তাঁর কি হাত, পা নেই, পঙ্গু বলে চলতে পারেন না? তা নয়, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বব্যাপী যিনি তিনি কোথায় যাবেন, সর্বত্র তিনিই আছেন। স্বামীজী তাই বললেন ত্বমচলো, তুমি অচল। আবার শ্রীশ্রীমা বলছেন, তিনি পাথরের মুর্তি না, তিনি হাতপাওয়ালা ঠাকুর, অন্য দিকে স্বামীজী বলছেন অচল। হাতপাওয়ালা ঠাকুর অচল হলেন কি করে? এটাও গীতাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে – *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্*, তাঁর হাত-পা সব জায়গাতেই আছে, সেইজন্য তাঁর কোন যাওয়ার জায়গাই নেই। ভগবানের যদি দুটি হাত, দুটি পা থাকে তাহলে তিনি আবার জগতের

সীমানায় আবদ্ধ হয়ে যাবেন। বলছেন তিনি গুণজীৎ সব গুণের পারে অথচ তিনি গুণেড্য সব গুণ তার মধ্যে। এই বৈপিরত্যকে এই জন্যই দেখানো হয়, ভৌতিক জগতে সব কিছুকে যেভাবে দেখি, ভগবানকে সেইভাবে দেখা যায় না।

সাদা-কালো ও ধর্মের সজ্ঞাৎকে মহাভারত কি ভাবে দেখছে

এই বিশ্বকে যদি ঋতম্ বলে মনে করা হয় তখন কলকাতা শহরটা হয়ে যাচ্ছে ধর্ম, অর্থাৎ ধর্মটা হচ্ছে ঋতমের একটা ছোট্ট অঙ্গ। আর ধর্ম যেটাকে আশ্রয় করে চলবে, সেটা হয়ে গেল ধর্মের একটা ছোট অঙ্গ, যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম। এই ধর্মকে মহাভারত ব্যাখ্যা করছে বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে। মহাভারতে মূল ভাব হচ্ছে যতো ধর্মো ততো জয়ঃ, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। অথচ ধর্ম বলতে মহাভারত কয়েকটি জায়গায় শ্রীকৃষ্ণকে বোঝান হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের আরেকটি নাম হল ধর্ম। ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর অনেকগুলো নাম হয়, তাঁর একটা নাম সত্য, তাঁরই নাম ধর্ম। বলছেন যতো ধর্ম ততো জয়ঃ, মানে যেখানেই শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই জয়, শ্রীকৃষ্ণ যাঁর সাথে আছেন তাঁরই জয় হবে। আবার সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি যেখানে ধর্ম আছে সেখানেই জয়। অথচ চোখের সামনে দেখতে পাই যারা অধর্ম করছে তাদেরই জয় হচ্ছে। তাহলে মহাভারতের কথা কোথায় ঠিক হল। এখানে আমাদের কয়েকটি জিনিষ বুঝে নিতে হবে। প্রথমের দিকে আমরা বললাম ধর্ম বলতে আমরা বুঝি সাদা কালো। সাদা কালো পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু মহাভারত দেখল শুধু সাদা কালো দিয়ে জীবনটা চলে না। যারা বলে আমি স্পষ্টবাদী, সত্য কথা বলতে আমি ভয় পাইনা, হয় তারা মহামুর্খ নয় তারা মহা অহঙ্কারী। তাদের কে জিজ্ঞেস করতে হয়, আপনি স্পষ্টবাদী শুধু বলার সময় না শোনারও সময়? মহাভারত দেখল জীবন কখনই সাদা কালো নিয়ে চলে না, জীবন সব সময় সাদা কালোয় মেশানো। আমাদের এমন অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তখন একটা জিনিষ করলে এক ধরণের বিপদ, ওটা যদি না করি তখন অন্য ধরণের বিপদ। সত্য কথা যদি বলি তাহলে চারজন লোকের প্রাণ যাবে, আবার যদি সত্য কথা না বলি তখন প্রাণ হয়তো যাবে না, কিন্তু আমার অসত্য ভাষণ হয়ে গেল। কিন্তু শাস্ত্রই বলছে সত্য কথা বলতে, শাস্ত্র বলছে অহিংসা করতে না। এখন যদি সত্য কথা বলি তাহলে হিংসা হয়ে যাবে আর সত্য কথা না বলি তাহলে হিংসা হবে না। এখন আমি কি করব? এখন ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে গেল। মহাভারত কখনই বাচ্চা ছেলেকে উপদেশ দেওয়ার মত বলবে না, সত্য কথা বলবে, হিংসা করবে না, চুরি করবে না। মহাভারত হল পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য, মহাভারত কোথাও ধর্ম অধর্মের লড়াই দেখাবে না, দেখাবে ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াইকে। যখন দুটো ধর্মের লড়াই লেগে যাবে তখন কখনই মহাভারত আমাদের বলে দেবে না তুমি এই ধর্মকেই গ্রহণ করবে। এর আগেও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক পদক্ষেপে জীবন আমাদের সামনে দুটো সুযোগ এনে দেয়, শ্রেয় ও প্রেয়। আমাকে তখন এই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। যেটাকে আমি বেছে নেব তার উপর ভিত্তি করেই আমার চরিত্র গঠিত হবে, এই বেছে নেওয়া থেকেই বলে দেবে আমি কি ধরণের। মহাভারত কখনই বলবে না তুমি এই পথ অবলম্বন কর, মহাভারত তার বদলে দেখাবে এর আগে আগে যখন এই পরিস্থিতি হয়েছিল, যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদেরও এই সমস্যা এসেছিল। তাঁরা এই পরিস্থিতিতে এই পথটাকে বেছে নিলেন। তাহলে উল্টোটাকে কি কেউ বাছেনি? হ্যাঁ উল্টোটাকেও বেছেছে। এর ফলে একজনের ব্যক্তিত্ব এই রকম হয়েছিল আরেকজনের এই রকম ব্যক্তিত্ব হল। মহাভারত সাধারণত অহিংসার উপরই জোর দিয়েছে। মহাভারত তাই বলবে যখন সত্য আর অহিংসার মধ্যে দ্বন্দ্ব আসবে তুমি এমন কাজ করবে যাতে অহিংসাটা বজায় থাকে হিংসা যাতে না হয়। সব সময় চেষ্টা করবে যাতে কারুর ক্ষতি যেন না হয়। সমগ্র মহাভারতে আমরা ধর্মের অনেক পরিভাষা দেখতে পাই।

মনের চারটি অবস্থা ও প্রজ্ঞা

যুধিষ্ঠির এক জায়গায় প্রজ্ঞা ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন, প্রজ্ঞা হচ্ছে বুদ্ধি। আমাদের মনের চারটি অবস্থা, মনের একটি অবস্থাকে বলে চিত্ত, চিত্তের কাজ হল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের বিভিন্ন বিষয়কে সংগ্রহ করা। আমরা যখন রাস্তা দিয়ে চলি তখন কত বাস, গাড়ি, কত লোকজন আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মনের মধ্যে সব কিছুরই ছাপ পড়ছে কিন্তু মন সব ছাপ গুলো ভেতরে ধরে রাখে না, তা নাহলে মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে পড়ত। মানুষ যখন রাত্রে ঘুমোয় তখন মন তার ভেতর থেকে অনেক আবর্জনাকে স্বপ্নের মাধ্যমে পরিষ্কার করে দেয়। চিত্তের কাজই হচ্ছে সংগ্রহণাত্মিকা, শুধু সংগ্রহ করে যাচ্ছে। গরু যখন মাঠে ঘাটে চড়ে বেড়ায় তখন শুধু খেতেই থাকে, পরে অবসর সময়ে বসে জাবর কাটতে থাকে। মনও ঠিক তাই করে, খালি সংগ্রহ করতে থাকে। জাব কাটা তার হয় দুটো সময়ে একটা ধ্যানের সময় আর মৌন অবস্থায়। সেইজন্য যে মানুষ কম ঘুমোয় আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্কের মধ্যে চাপ বাড়তে থাকে। চাপ বাড়ার ফলে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায়। ঘুমটা কেন কম হচ্ছে? মাথায় বেশ কিছু জিনিষ ঢুকে মস্তিষ্কের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করছে। তখন বেশ

কিছু দিনের জন্য কাজকর্ম থেকে সরিয়ে একটা দুটো জিনিষকে নিয়ে থাকতে আর বিশ্রাম নিতে বলা হয়। এতে খিটখিটে মেজাজটাও চলে যাবে। তাতেও বন্ধ হয় না, কারণ ভেতরে যে জিনিষগুলো থেকে গেছে সেগুলো মাঝে মাঝেই চাড়া মারতে থাকে।

চিত্তের পরে আসছে মন, মনের কাজ হল সংকল্পাত্মিকা ও বিকল্পাত্মিকা। রাতের অন্ধকারে যেতে যেতে দূরে কিছু একটা দেখছে, ভাবছে এটা মানুষ না কোন জন্তু, মানুষ যদি হয় তাহলে চোর না পুলিশ, বন্ধু না শত্রু। মন ঠিক করতে পারছে না, এটা হচ্ছে মন। তৃতীয় হয় বুদ্ধি, বুদ্ধি নিশ্চিত করে বলে দেয়, তাই এর নাম নিশ্চয়াত্মিকা, বুদ্ধি ঠিক করে বলে দেয় ওটা মানুষ আর এ আমার বন্ধু। এরপর চতুর্থ হল অহঙ্কার, বুদ্ধি বলে দিল এ তোমার বন্ধু, এবার দৌড়ে গিয়ে বলছি এইতো আমার সেই বন্ধু, কত দিন পর তোমার সাথে দেখা। এই যে দৌড়ে গিয়ে বলছি, কত দিন তোমাকে দেখিনি, এটাকে বলে অহঙ্কার, এর কাজ অভিমানাত্মিকা। অভিমানাত্মিকা মানে নিজেকে কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক তৈরী করে নেওয়া। অভিমানাত্মিকা আবার তিন রকমের, একটা হল রাগ, রাগ মানে রঞ্জনাত্মক, অনুরাগ, ভালোবাসা থেকে। দ্বিতীয় দ্বেষ, দ্বেষ মানে যেটা থেকে আমি পালাতে চাইছি – ওরে বাবা, সেই লোকটি, এর মুখ আমি দেখতে চাইনা, আমার সামনে যেন না আসে। তৃতীয় হল উপেক্ষা। এই চারটেকে নিয়েই আমাদের জীবন চলে, সংগ্রহাত্মিকা, আমি চাই আর নাই চাই, বাইরের বিষয় আমার ভেতরে আসবেই। এবারে যত বিষয় ভেতরে এসেছে সেগুলো চালনি দিয়ে চালতে শুরু করে, এরপর মন ঠিক করতে থাকে। একই মন, চার অবস্থায় চার রকমের কাজ করছে। জীবন চালানোর জন্য এই চারটের মধ্যে বুদ্ধি হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বাড়িতে মেয়ের বিয়ে লেগেছে, এখন টাকার অভাব হয়ে গেছে। অফিসে একজন কন্ট্রাক্টর বলল আপনি যদি ফাইলে একটা সই করে দেন তাহলে আমি এই কন্ট্রাক্টটা পেয়ে যাব, তার জন্য আপনাকে আমি এক লাখ টাকা ঘুষ দেব। এখন কে ঠিক করবে সই করবে কি করবে না? বুদ্ধিই ঠিক করে দেবে।

'প্রজ্ঞা' ও 'হ্রী'র ব্যাখা

বুদ্ধি যখন খুব পরিশোধিত হয়ে যায় তখন সেই বুদ্ধিকে বলা হয় প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাই হল প্রকৃষ্ট জ্ঞান। যখন অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ণ করা হয়, অনেক সাধুসঙ্গ কর হয়, গুরুর সেবা করা হয়েছে, প্রচুর জপ-ধ্যান করা হচ্ছে, তখন বুদ্ধির আরও উচ্চতর অবস্থার উন্মোচন হয়ে যায়, যেটা সাধারণ মানুষের থাকে না। বুদ্ধি সবারই আছে, একটা কুকুর বেড়ালেরও বুদ্ধি আছে, সেও জানে কোনটা খাবো কোনটা খাবো না, কিন্তু প্রজ্ঞা এদের কখনই হয় না। প্রজ্ঞা সব সময় হয় সাধুসঙ্গ, শাস্ত্র অধ্যয়ণ থেকে, সবচেয়ে বেশী হয় জপ-ধ্যান করে। জপ-ধ্যান না করলে বুদ্ধি স্থির হয় না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন - *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*, কথাগুলো তোমার প্রজ্ঞাবান লোকের মত অথচ যেটা নিয়ে শোক করতে নেই সেটাকে নিয়েই শোক করছ, চরিত্রের মধ্যে তোমার বৈপিরত্য এসে গেছে। শাস্ত্র যখন অধ্যয়ণ করা হয়, যখন জপ-ধ্যান করা হয় তখন শাস্ত্রের জ্ঞানটা পাকা হয়, এটাকে বলা হচ্ছে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা যখন হয়, তখন একটা পরিস্থিতিতে প্রলোভন এলো তখন প্রজ্ঞা সেই প্রলোভনটাকে আটকে দেয়। শাস্ত্রে যে রকমটি বলা আছে তার বাইরে যেও না। এর জন্য কয়েকটি জিনিষের দরকার, প্রথম শাস্ত্র পড়া, দ্বিতীয় জপ-ধ্যান করা, তৃতীয় সৎপুরুষের সঙ্গ করা। প্রজ্ঞাবান পুরুষ সব সময় ধর্মাচরণ করে।

হ্রী – কেউ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কিনা কি করে বোঝা যাবে? গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা থাকলেই কি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বোঝা যাবে? এই ব্যাপারে মহাভারত কতকগুলি সংজ্ঞা দিয়ে বেঁধে দিচ্ছে, যাঁরা ধার্মিক পুরুষ, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের চরিত্রের একটা গুণ সব সময় প্রস্ফুটিত থাকে, সেটা হচ্ছে হ্রী, হ্রী মানে লজ্জা। মেয়েদের যেমন আভূষণ হল লজ্জা, ধার্মিক পুরুষেরও আভূষণ হল লজ্জা। একজন সন্ন্যাসীর জীবন আর একজন বিধবার জীবন এক। বিধবাদের যেমন অনেক কিছু করতে নেই, সন্ন্যাসীদেরও অনেক জিনিষ করতে নেই। এই দুজনের জন্যই হ্রী, যারাই ধার্মিক পুরুষ তাদের জন্য হ্রী হল সব থেকে উচ্চ গুণ। কারুর মধ্যে যদি হ্রী থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে ধার্মিক। হ্রী শুধু লজ্জাকেই বোঝায় না, হ্রী হল একটা বিনয়ের ভাব। কোন সন্ন্যাসী যদি বারে বসে চাও খায় লোকে বলবে, এ কি ধরণের সন্ন্যাসী বারে বসে চা খাচ্ছে! সন্ন্যাসী কেন বারে বসে চা খায় না? কারণ এই হ্রী সন্ন্যাসীকে আটকে দেয়। সন্ন্যাসী যদি কোন গর্হিত আচরণ করে তখন সামনের লোকরা ভাববে এই সন্ন্যাসী কি করে এই গর্হিত কাজ করছে! সন্ন্যাসী যদি মনে করে কে কি ভাবছে আমার তাতে কি। কিন্তু যে ধার্মিক পুরুষ তাকে সব সময় ভাবতে হয়ে আমার কাজ দেখে সামনের লোকটা কি ভাবছে। সন্ন্যাসী মানে সে পুরোপুরি শতকরা একশো ভাগ ধার্মিক, সে শুধু ধার্মিকই না, গেরুয়া পরিধান করা মানে সে ধর্মের ঝাণ্ডাটা ধারণ করে নিয়েছে। ধার্মিক পুরুষকে সর্বদা এই লজ্জার ভাবটাকে আশ্রয় করে নিতে হবে। শ্রীশ্রীমায়ের স্তবে যেমন শ্রীমাকে বলা

হচ্ছে লজ্জাপটাবৃতে, লজ্জার পটে তিনি সব সময় আবৃতা। যারাই বলে আমি ঠাকুরের ভক্ত তাকেও এই রকম লজ্জাপটাবৃতের মত হ্রীকে ধারণ করে চলতে হবে। নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, গাড়ি বাড়ির কথা লোককে বলে বেড়াতে নেই ঠিক তেমনি যে ভক্ত সাধনা করে আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জন করেছে তাকে কখনই এই আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা লোককে বলে বেড়াতে নেই, এগুলো হ্রীর অভাব। আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা যেমন লোকের কাছে বলে বেড়াতে নেই, অপর দিকে ধার্মিক পুরুষ তার দুর্বলতার কথাও লোকের সামনে প্রকাশ করবে না। দুর্বলতা সব মানুষের মধ্যেই থাকবে, কিন্তু সেটাকে নিজে থেকে সামনে নিয়ে আসতে নেই। যেমন কোন ধার্মিক পুরুষের হয়তো ধূমপান করার নেশা আছে, বা মদ খাওয়ার নেশা আছে, এগুলো থাকতেই পার কিন্তু তাই বলে আমি কাউকে তোয়াক্কা করি না বলে সবার সামনে নেশা করতে লেগে যাবে তা কখনই করা উচিত নয়, এগুলোই হল হ্রীর অভাব। নেশা করতে হলে তুমি কর, কেউ তোমাকে বারণ করছে না, কিন্তু আড়ালে কর যাতে কেউ না দেখতে পায়। কিন্তু যারা নিম্ন শ্রেণীর তারা নেশা করে রাস্থায় এসে মাতলামো করবে, এদের লাজলজ্জা কিছু নেই, তার মানে হ্রীর অভাব।

ধর্মের ক্ষেত্রে হ্রী একটি অত্যন্ত মূল্যবান গুণ। পুরানের একটি বিশেষত্বই হল যে, পুরান সব সময় অমুর্তকে মুর্ত করে দেয় আর মুর্তকে অমুর্ত করে দেয়। ধর্ম একটি অমুর্ত, পুরান অমুর্ত ধর্মকে মুর্ত করে একটা পুরুষ বানিয়ে দিয়েছে। এখন পুরুষ থাকলে তার একজন স্ত্রীরও প্রয়োজন হবে। ধর্ম এখন হয়ে গেল পুরুষ, এবার তার বেশ কয়েকজন স্ত্রীও এসে গেল, এই কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে হ্রীও ধর্মের একজন অন্যতম স্ত্রী। আসলে ধর্ম নামে কোন এক দেবতা আছেন আর তার এই দেবীরা আছেন তা নয়, পুরানে যা কিছু মুর্ত রূপে দেওয়া আছে সেই মুর্ত রূপ গুলিকে সব সময় অমুর্ত করে নিতে হয়। ধর্ম এখানে পুরুষ তাঁর প্রিয় রানী হলেন হ্রী, মূল অর্থ হল যিনি ধার্মিক পুরুষ তাঁর হ্রী থাকে। হ্রীবান পুরুষ সব সময় পাপকর্ম থেকে দূরে থাকে, পাপকর্মে তার সব সময় লজ্জাভাব থাকে, পাপকর্মের ব্যাপারে নিজের প্রতিই একটা ছ্যা ভাব থাকবে। আমাদেরও পাপের ব্যাপারে ছ্যা থাকে, কিন্তু সেটা অপরের প্রতি নিজের ব্যাপারে ছ্যা থাকে না। ভারতকে কিভাবে ভালো করা যায় মানুষকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এই নিয়ে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে, আগে নিজে কিভাবে ভালো হয়ে উঠতে পারে সেই ব্যাপারে কেউ আলোচনা করবে না। হ্রীবান পুরুষ পাপকর্ম করতে গেলেই মনের মধ্যে খুঁত খুঁত করতে থাকবে, এই খুঁতখুঁতানিই তাকে পাপকর্ম করা থেকে আটকে দেবে। মানুষ যখন প্রথম কোন পাপকাজ করে তখন তার মন প্রচণ্ড খুঁতখুঁত করতে থাকে। দ্বিতীয়বার যখন পাপকাজ করার সুযোগ এসে যায় তখন মনে পড়ে যায় প্রথম বারে তো কেউ বুঝতে পারেনি, এইবার তার খুঁতখুঁতানিটা কমে যাবে। তৃতীয়বার আরও কমে যায় আর চতুর্থবারে যদি কেউ দেখে ফেলে তখন বলে, বেশ করেছি তাতে তোমার কি। এইবার তার হ্রী পুরোমাত্রায় বিদায় নিয়ে নিয়েছে। ঠাকুর বলছেন, মেথর অনেকদিন মাথায় ময়লা বইতে বইতে তার ঘেন্নাটা চলে যায়। এর অর্থ হল, সাধারণ মানুষ অনেক দিন ধরে যখন পাপকর্ম করতে থাকে তখন তার হ্রী বোধটা একেবারে চলে যায়। হ্রী যার চলে গেল বুঝে নিতে হবে তার জীবন থেকে ধর্ম উড়ে গিয়ে সে এখন পশুস্তরে চলে গেছে। যার ধর্ম চলে গেছে তার প্রজ্ঞাও থাকবে না। বলছেন, যখন মানুষের হ্রী থাকে, ধর্ম থাকে তখন তার টাকা-পয়সা, সম্পদ এগুলো অত সহজে নাশ হয় না, সমাজে তার প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন থাকে। যে মানুষের মধ্যে হ্রীর ভাব যত বেশী তার মধ্যে ধর্মের ভাব তত বেশী হবে, ধর্মের ভাব যত বেশী থাকবে তার প্রজ্ঞা তত বেশী হবে। এই তিনটে যার যত বেশী সে তত ঠিক ঠিক পুরুষ। যার প্রজ্ঞা নেই তার ধর্মও নেই, যার ধর্ম নেই তার হ্রীও নেই, যার হ্রী নেই আজ হোক কাল হোক তার অর্থ, সম্পদ, মান, সম্মান সবই নাশ হয়ে যাবে।

যুধিষ্ঠির বলছেন, যার হ্রী নেই, যে বোকা মুর্খ মানে যে প্রজ্ঞাহীন, শাস্ত্র বোঝে না, ধর্ম পালন করে না, সে পুরুষও নয় নারীও নয়। এরা ধর্ম অনুশীলন করার যোগ্যই নয় এরা নরকে পতিত হয়ে গেছে। বাড়িতে কিছ অশান্তি হলেই যে স্ত্রী রেগেমেগে বলে দিল আমি চললাম বাপের বাড়ি, তুমি তোমার সংসার সামলাও। বলেই দুটো বাচ্চাকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল, বুঝে নিতে হবে এর হ্রী চলে গেছে, যে মেয়ের হ্রী হারিয়ে গেছে তার বাড়িতে আর সুখ শান্তি ফিরবে না। একবার যদি কোন বাড়ির স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় বলে দেয় আমি চললাম বাপের বাড়ি, ঐ বাড়ির সর্বনাশ নিশ্চিত হয়ে গেল। নারীই পরিবারের শক্তি, আর তার চোখের হ্রী চলে যাওয়া মানে নারীর শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। হ্রী চলে গেছে মানে তার ধর্মও চলে গেছে, ধর্ম চলে গেছে মানে তার প্রজ্ঞাও চলে গেছে, সে এখন পুরুষও না নারীও না। এইভাবে মহাভার আমাদের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে আমাদের জীবনের মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মহাভারত যত রকমের বক্তব্য দিয়ে গেছে তার একটি বক্তব্যকেও এখনও আমরা অপ্রাসঙ্গিক বলতে পারিনা, এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেও আমরা কোন কথাই বলতে পারিনা, অথচ সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মহাভারত এই মতগুলো দিয়ে গেছে। কবি বলতে ঠিক যা বোঝায় ব্যাসদেব সেই অর্থে প্রকৃত কবি, কবি মানে যিনি ভূত, ভবিষ্যত সব দেখতে পান।

একাধিক ধর্মের লড়াই ও সঙ্কটে মহাভারতের শিক্ষা

মহাভারতের বক্তব্য হল, মানুষ যে দৈনন্দিন জীবন যাপন করছে, এর মধ্যে বিভিন্ন সঙ্কট আসবেই, তার আচার ব্যবহারে এমন অনেক পরিস্থিতি আসবে যেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম এক রকম বলছে, তার কুল ধর্ম এক রকম বলছে তার ভেতর থেকে এক রকম বলছে কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়, এই দ্বন্দ্ব, এই সংঘাত প্রতি মুহুর্তে আসবে। শাস্ত্র সব সময় নিজের সময়কার যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হচ্ছিল সেগুলোকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। মহাভারতও এই দ্বন্দ্বগুলোকে সাজিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল, এই সংঘাত তোমার জীবনে আসবেই, যুগে যুগে আসবে, তুমি বুঝতে পারবে না কোনটা করা ঠিক কোন জিনিষটা করাটা ঠিক নয়। এর মধ্যেই তোমাকে বেছে নিতে হবে, বেছে নেওয়ার সময় দেখতে হবে তোমার লক্ষ্য অন্তরের শ্রেয়র দিকে না বাইরের প্রেয়র দিকে। অন্তর জগতের শ্রেয়র দিকে যদি তোমার লক্ষ্য থাকে তাহলে তোমার কোন সংঘাত হবে না, কিন্তু বাইরের প্রেয়র দিকটাই যদি তোমার লক্ষ্য হয় তাহলে সমস্যা হবে, সংঘাতও আসবে। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সব সময় এই বাইরের প্রেয়কে নিয়ে হয়। মহাভারত খুব দক্ষতার সাথে বাইরের জগতটা দেখিয়ে খুব সুকৌশলে দেখিয়ে দেবে অন্তর্জগতটা এই রকম। যেমন মহাভারত এক জায়গায় বলবে, যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, যার স্ত্রী আছে তার কখনই মানসিক সমস্যা হয় না, হতাশা, হতাশা থেকে আত্মহত্যার প্রবণতা, ঘুমের অভাব, স্নায়ুর চাপ এগুলো কখনই তার হয় না। এই ব্যাপারে মহাভারত একেবার দৃঢ়, তুমি যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে থাকো তাহলে কখনই তোমার মধ্যে হতাশার ভাব আসবে না, এই ধরণের কোন মানসিক সমস্যা হবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম মানে এইটাই, তোমাকে যে কর্ম দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ওর বাইরে তুমি কিছু করতে যাবে না, যদি এর বাইরে কিছু করতে যাও তাহলেই নানান ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে। এই জিনিষকেই মহাভারত দেখিয়ে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, পাণ্ডবদের মত জ্ঞানী কোথায়, পাণ্ডবদের মত ভক্ত কোথায়। জ্ঞানী দেখে আত্মাই সর্বত্র বিরাজমান, আত্মা আর আমি অভেদ, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, আত্মা রূপে আমিই সব কিছু হয়েছি। ভক্ত দেখে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তিনিই সব কিছু হয়েছেন। জ্ঞানী ও ভক্ত একই কথা বলছে। তাই যিনি জ্ঞানী তিনিই ভক্ত, যিনি ভক্ত তিনিই জ্ঞানী। একটা জিনিষকে আমি যত জানবো তত সেই জিনিষকে ভালোবাসতে থাকব। আবার একটা জিনিষকে যত ভালোবাসব তত তাকে বেশী জানব। ঈশ্বরের স্বরূপকে যত বেশী জানব ঈশ্বরকে তত বেশী ভালোবাসব, আবার ঈশ্বরকে যত বেশী ভালোবাসব তত ঈশ্বরের স্বরূপকে জানতে থাকব। জ্ঞানী হচ্ছেন যারা জানেন আর ভক্ত হচ্ছেন যারা ভালোবাসেন। ঠাকুর বলছেন পাণ্ডবদের মত এই রকম জ্ঞানী কোথায়, পাণ্ডবদের মত এই রকম ভক্ত কোথায়, কিন্তু তাদেরও জীবনে দুঃখের শেষ নেই। দুঃখ যন্ত্রণা শ্রীকৃষ্ণকেও রেহাই দেয়নি, যিশু এত বড় ভক্ত ও এত বড় জ্ঞানী কিন্তু তাঁকেও ক্রুশবিদ্ধ হতে হল। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়ও তিনি ঈশ্বরের চিন্তা করে যাচ্ছেন, তখনও তিনি তাঁর এই আধ্যাত্মিক ভাবটাকে ছাড়ছেন না। এটাতো গেল একজন অবতারের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে, কিন্তু যে এই উচ্চ অবস্থার কথা জানেনা, বোঝেনা, যারা একেবারে সাধারণ মানুষ তাদের এই ব্যাপারটাই থাকবে বর্ণাশ্রমের ক্ষেত্রে, বর্ণাশ্রম জনিত যে কর্তব্য তোমার এসে গেছে সেটাকে তুমি কখনই ছাড়বে না, ঐ কর্তব্যের বাইরে তুমি কখনই যেও না। বর্ণাশ্রমে যদি তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাহলে তোমার কখনই মনে কোন ধরণের অবসাদ আসবে না। যাদের মানসিক চাপ, অবসাদ, অস্থিরতা, আত্মহত্যার প্রবণতা আসে তাহলে বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও সে বর্ণাশ্রম ধর্মকে লঙ্ঘন করেছে। আমার বর্ণাশ্রম ধর্মটা কি, এটা শিখিয়ে দিচ্ছে শাস্ত্র। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করলেই যে সমস্যা আসবে না, তা নয়, দুঃখ-কষ্টও আসবে, পাণ্ডবদের কত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, তাৎক্ষণিক একটা ধাক্কা লাগবে ঠিকই কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা থাকলে সেই ধাক্কাটা সহ্য করার ক্ষমতাও এসে যাবে। বর্তমান সমাজে যে অস্থিরতা চলছে এর মূল কারণ কিন্তু এটাই, কেউ বর্ণাশ্রম ধর্মকে পালন করছে না, মা ছেলেকে শাসন করতে গেলে ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যাচ্ছে, ছেলে তার স্বধর্ম ভুলে গেছে। হিসেবে বলা হচ্ছে এখন ভারতে প্রতি ঘন্টায় আটজন করে লোক আত্মহত্যা করছে। অথচ কয়েক বছর আগেও ভারতে আত্মহত্যার ঘটনা অকল্পনীয় ছিল।

আপৎধর্ম

মহাভারতে অনেক রকম ধর্মের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যেমন রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম, দানধর্ম, শীলধর্ম, যোদ্ধাধর্ম। সব থেকে মজার ব্যাপার, মহাভারতেই একটা বিশেষ ধর্মের আলোচনা বেশী করা হয়েছে, যেটা মনুস্মৃতিতে হাল্কা করে ছুঁয়ে গেছে, এই ধর্মের নাম হল আপৎধর্ম। আপৎধর্ম বলছে, যখন তুমি বিপদে পড়বে তখন তুমি সব ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আগে বিপদ থেকে নিজেকে বার করে নিয়ে এস। আপৎধর্ম হিন্দুধর্মেরই বিশেষত্ব, মহাভারতই প্রথম এর উল্লেখ করেছে, মনুস্মৃতি এটাকে তুলে এনেছে আর কিছু কিছু স্মৃতিগ্রন্থ এটাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইদানিং কালে এই আপৎধর্মকে

নিয়ে কেউ খুব বেশী আলোচনা করে না। আপৎধর্মে কি হয়, কেউ একজন এক মহা বিপদে পড়ে গেছে, তার জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে, তখন বলবে আগে তুমি যে করে হোক তোমার জীবনকে রক্ষা কর। মহাভারতেই আছে, একবার এমন দুর্ভিক্ষ হয়েছে কেউ কোথাও কোন খাবার দাবার পাচ্ছে না। সবাই নিজের সন্তান পরিবারকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐ দুর্ভিক্ষে বিশ্বামিত্র এক চণ্ডাল, যে শূদ্রেরও নীচে, তার বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে মরা কুকুরের পশ্চাদাংশকে টানতে শুরু করেছে কাঁচা মাংস খাবে বলে। ঐখানে চণ্ডাল আর বিশ্বামিত্রের মধ্যে একটা সংলাপ আছে। চণ্ডাল বলছে – তুমি কে, যে এই জঘন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েছ? আমি চণ্ডাল, জাতের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট, আমার বাড়িতে ঢুকে কুকুরের মাংস, যে কেউই খায় না, আবার কুকুরের সব থেকে নিকৃষ্ট অংশ তার পশ্চাদাংশকে চুরি করছ? তখন বিশ্বামিত্র নিজের পরিচয় দিয়েছেন। চণ্ডাল বিশ্বমিত্রের নাম শুনেই চমকে উঠে বলছে – আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে কেন এই রকম জঘন্য কাজ করছেন? তখন বিশ্বামিত্র বলছেন, এটা হচ্ছে আপৎধর্ম, আমাকে আগে প্রাণ বাঁচাতে হবে, আমি ব্রাহ্মণ এই বোধ থাকলে এখন আমার জীবন রক্ষা হবে না। চণ্ডাল বলছে, এই পাপ যেন আমার না হয়। বিশ্বামিত্র তখন ঐ কাঁচা মাংস নিলেন, এই মাংস ছাড়া কোথাও আর খাওয়ার কিছু নেই, মাংস নিয়ে ভোগ দিয়ে স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণকে আহ্বাণ করেছেন। ব্রাহ্মণ দেবতাদের নিবেদন করে ভোগ না দিয়ে খাবে না। দেবতারা তখন হন্তদন্ত হয়ে হাতজোড় করে বিশ্বামিত্রকে বলছেন – দোহাই এ রকমটি করবেন না, মরা কুকুরের মাংস আমাদের নিবেদন করবেন না। তারপর দেবতারাই কুকুরের মাংসকে ভালো খাদ্যে রূপান্তরিক করে দিলেন, কারণ দেবতারাতো কুকুরের মাংস খাবে না। শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) জীবনেও ঠিক এই রকম এক ঘটনা আছে। চেন্নাই মঠে তখন কিছুই খাবার দাবার ছিল না। সারাদিন অভুক্ত রয়েছেন, দুপুরে ঠাকুরকে কি আর ভোগ দেবেন ভাবছেন, তখন তিনি কিছু বালি এনে থালায় করে ঠাকুরের পটের সামনে দিয়ে শশী মহারাজ বলছেন – ঠাকুর আজ কিছুই জোটেনি তুমি এই বালিই গ্রহণ কর, তোমাকে বালি ভোগ দিচ্ছি, তুমি এটা খাও আমিও এটাই খাবো। শশী মহারাজ বালির ভোগ দিতে যাচ্ছেন ততক্ষণে একজন কোথা থেকে এসে হাজির, সে বাড়িতে কি বিশেষ ভোগ দিয়ে ভেবেছে কোন সন্ন্যাসীকে খাওয়াবে আর শশী মহারাজের নাম শুনে একটা থালাতে খুব সুন্দর করে অনেক খাবার-দাবার সাজিয়ে গুছিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে। ভগবানকেও ধমক না দিলে ভগবান সোজা হন না, বিশ্বামিত্র কি রকম দেবতাদের সোজা করে দিল, শশী মহারাজও সোজা করে দিল। কিন্তু আসলে এটাই হল আপৎধর্ম। স্বামীজীর খুব ইচ্ছে ছিল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নিজের সন্ন্যাস নাম রাখবেন, কিন্তু যখন দেখছেন শশী মহারাজের ঠাকুরের প্রতি এমন ভালোবাসা, ঠাকুরের প্রতি তাঁর এমন সেবা তিনি এই নাম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শশী মহারাজকে দিয়ে দিলেন। বরানগর মঠের প্রথম অবস্থায় শশী মহারাজের গুরু ভাইরা ধ্যানের গভীরে হারিয়ে আছে, শশী মহারাজ কোথা থেকে একটু চাল ডাল জোগাড় করে সামান্য ভাবে একটু সিদ্ধ করে ঘি নুন মাখিয়ে দলা করে করে ধ্যানের মধ্যেই সবার মুখে গুজে দিতেন, এমনই তাঁর সেবানিষ্ঠা। সেই শশী মহারাজ সেদিন বাধ্য হয়ে ঠাকুরকে দিলেন বালি ভোগ, এই নাও ঠাকুর আজ তুমি যেমন ব্যবস্থা করেছ সেই রকমই তুমি নাও। ঘরে কিছুই সেদিন ছিল না, অথচ ঠাকুরকে অভুক্ত রাখা যাবে না, এটাই হল আপৎধর্ম। মহাভারতই প্রথম আপৎধর্মকে নিয়ে এসেছে। পরের দিকে এই ধর্মকে অনেকেই নিয়েছিল কিন্তু ইদানিং কালে সেই ভাবে খুব বেশী নেওয়া হয় না।

ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ

মহাভারত একদিকে যেমন বলছে *যতো ধর্ম ততো জয়ঃ* আবার মহাভারত এও বলছে ধর্ম রক্ষতি রক্ষতঃ, যে ধর্মের রক্ষা করে, ধর্মকে যে আশ্রয় করে থাকে, ধর্মই বিপদে তাকে রক্ষা করে। আবার বলছে *গহনা ধর্মোহি গতিঃ*, ধর্মের গতি খুব সূক্ষ্ম। আমরা ধর্ম বলতে বুঝি সাদা আর কালো, কিন্তু ধর্মের গতি এইভাবে চলে না, ধর্মের গতি সব সময় সাদা কালো মিশিয়ে চলে, সেইজন্য বলা হয় ধর্মের গতি অতি গহন। অনেক ক্ষেত্রে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় ধরা খুব কঠিন। ধর্মের এই ধরণের সংজ্ঞা প্রথম আসে মহাভারতে। বেদে পরিষ্কার ধর্মের লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে, ঐদিকটা সাদা এই দিকটা কালো। উপনিষদেও সাদা কালোকে পরিষ্কার বোঝা যায়। বাল্মীকি রামায়ণে এসে ধর্মের প্রথম সজ্ঘাত শুরু হয় যখন শ্রীরামচন্দ্র কয়েকটি কাজ করছেন। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টেও পুরাতন আর নতুনের মধ্যে সজ্ঘাত। অন্য দিকে জুদাইজিমে পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে এটা সাদা এটা কালো, এখানে কোন সজ্ঘাত নেই। যিশু খ্রীষ্ট এসে এটাকে পুরো পাল্টে দিলেন, তিনি দেখালেন শুধু সাদা আর শুধু কালোতে ধর্ম চলে না। তিনি তাই ধর্মের মূলটাকে পুরো পাল্টে দিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি যেটা বলে দিয়েছেন সেটাই আবার সাদা কালো হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মে এই জিনিষ কখন হয় না, হিন্দুধর্মের প্রত্যেক হাজার বা দেড় হাজার বছর এসে প্রত্যেক স্মৃতিকাররা একটা নতুন স্মৃতি রচনা করে দেন আর তখন থেকে ঐটাই সাদা কালো হয়ে চলতে থাকে, আগামী হাজার বছরের জন্য শান্তি হয়ে গেল।

ধর্মের ব্যাপারে আরও বাস্তব রূপটা যেটা মহাভারত দিচ্ছে তা হল, কিভাবে বুঝবে ধর্মটা কি? তখন বলে দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যেটা বলছেন সেটাই ধর্ম। তার মানে কলকাতার সবাই একটা জিনিষ করে চলেছে, এখন সেটাই কি ধর্ম? না, আগে তুমি দেখ তোমার বিচারে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে, তারপর দেখ তিনি কি করছেন, তিনি যেটা করছেন সেটাই ধর্ম। ধর্মের আবার একটা সংজ্ঞা দিচ্ছেন, বহুজনায় হিতায়, অপরের যেটাতে মঙ্গল হয় সেটাই ধর্ম, নিজের নয় অপরের মঙ্গল। আবার বলছে, যে জিনিষটা করে পরে অপরাধ বোধে মনকে আচ্ছাদিত না করে দেয় সেটাই ধর্ম। কোন কিছু করার পর পরে যদি অপরাধ বোধ আসে, লজ্জাবোধ হয়, ছিঃ কেন এটা করতে গেলাম, সেই কাজটাই অধর্ম। ব্যক্তি বিশেষে ধর্মের সংজ্ঞা পাল্টে যাবে, যেখানে সার্বজনীন ধর্মের কথা বলা হয় সেখানেই ধর্মকে নিয়ে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। সংগঠিত ধর্ম যত আছে এদের এটাই সমস্যা, এরা সবার জন্য একই ধর্ম বলে দেয় কিন্তু ধর্ম সবার ক্ষেত্রে এক হয় না, আমার ধর্ম এক রকম হবে আপনার ধর্ম আরেক রকম হবে। মহাভারত সবার জন্য এই সুযোগটাকে সামনে নিয়ে আসে, এতগুলো ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হল এবার তুমি বেছে নাও, বেছে নিয়ে তুমি তোমার লক্ষ্যে এগোতে থাকো। যেমন গান্ধীজী দেখলেন এতগুলো ধর্মের সংজ্ঞা আছে আমি তার মধ্যে সত্য, অহিংসা আর ব্রহ্মচর্যকে বেছে নিলাম। আমরাও যে কোন একটা ধর্মকে নিয়ে এগোতে পারি, হয়তো আমি অহিংসা বা ব্রহ্মচর্য বা সত্য এগুলোর একটাকেও অবলম্বন করতে পারবো না, কিন্তু এর বাইরেও ছোট ছোট অনেক কিছু আছে যেটাকে অবলম্বন করতে পারি। যেমন আমি ঠিক করলাম রোজ সকালে আমি এত জপ না করে কিছু কাজ করবো না। এইবার আমি দিব্যি খেয়ে সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে জপ করতে শুরু করলাম। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা যাবে নানা রকমের বিঘ্ন আসতে শুরু করেছে। হয়তো ছেলের অসুখ হয়ে যাবে, নয়তো নিজেরেই কিছু ব্যাধি এসে যাবে, প্রকৃতি এবার আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। এর পরেও যদি আমি বলি, আমার যাই হয়ে যাক, মরে যাইতো মরে যাবো, ছেলে যতই যন্ত্রণায় কাতরাক আমি ছাড়ছি না। যেমনি এই গোঁ নিয়ে নিলাম তখনই এসে গেল মহাভারতের ধর্মের সঙ্ঘাত, একদিকে আমি যে ব্রত নিয়েছি তার সাথে আমার সন্তানের প্রতি কর্তব্যের ধর্ম। কিন্তু মহাভারতই বলে দিচ্ছে *ধর্মো রক্ষতি রক্ষতঃ*, যখন আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি এটাই আমার ধর্ম আমি এই ধর্মের প্রতিষ্ঠিত থাকবো, নিজের অহঙ্কার বশতঃ এই প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনাও করছি হে ঠাকুর তুমি আমাকে এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলো না, তারপর যখন এই পরীক্ষাতে আমি উত্তীর্ণ হয়ে গেছি, তখন এই সাধনাই কিছু দিনের মধ্যে আমাকে মহৎ বানিয়ে দেবে। আমি যখন কারুর মুখোমুখি হব তখন লোকেরাও অবাক হয়ে ভাববে এই লোকটির এত শক্তি কোথা থেকে আসছে। লোকে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আপনার সামনে শ্রদ্ধায় তার মাথা এমনিতেই নত হয়ে যাবে। কারণ আমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছি। যে কোন একটা কিছুকে যদি জীবনে অবলম্বন করে নিই, আমি এটাই করব, আমি ঠিক করলাম প্রতি দিন কোন গরীব কাঙালী খুঁজে বার করে একটি টাকা দেব তারপরে আমি খাবো। একদিন শুরু করে দিলাম, কিছু দিন পরে দেখা গেল পাড়া থেকে ভিখারীগুলো যেন কোথাও উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু আমি দিব্যি খেয়ে নিয়েছি, এক টাকা না দিয়ে আমি কিছু খাবো না। এবার আমাকে অন্য পাড়াতে ভিখারী খুঁজতে যেতে হবে, দরকার পড়লে দশ কিলোমিটার ধরে খুঁজতে থাকবো, কোথাও ভিখারী পাওয়া যাবে না। বিঘ্ন এসে গেল। কিন্তু তারপরেও আপনি ঠিক খুঁজে খুঁজে রোজ একটা টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, কিছু দিন পরে দেখা যাবে আপনার ব্যক্তিত্বই পাল্টে গেছে। লোকে জানতেও পারবে না যে আমি রোজ কোন ভিখারীকে এক টাকা করে দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমার সামনে সবার মাথা নত হয়ে যাবে, এটাই হচ্ছে ধর্মের বিশেষত্ব। যখনই কোন ধর্মকে আমরা আশ্রয় করে চলতে শুরু করব তখন প্রথমে চলতে দেবে কিন্তু কিছু দিন বাদেই এমন সমস্যা নিয়ে আসবে যে ধর্মের আশ্রয়কে ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করবে। সমস্যাকে যদি উপেক্ষা করেও ধর্মকে ধরে থাকি তখন এই ধর্মই আমাকে সব দিক থেকে রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়াবে, তখন কেউ আমাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। এটাই ঘটনা, আর এগুলো শাস্ত্রের কথা, শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস আনতে গেলে এগুলোর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।

ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা

ধর্মের আরেকটা দিক হল অহিংসা পরমো ধর্ম, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, মানসিক ও শারীরিক কোন ভাবে কাউকে পীড়া না দেওয়া। এই ভাবে ধর্মের অনেক সংজ্ঞা দেওয়া হবে। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে একটা জায়গায় সাবিত্রী বলছেন – যে ব্যক্তি ঠিক ঠিক ধর্মে অবস্থান করে থাকে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই একাকী জীবন যাপন করতে পারে। সংসারে কিছু একটা অশান্তি হলেই, বা জীবনে কোন কারণে হতাশা এসে গেলে অনেকেই বলে আমি সব কিছু ছেড়েছুড়ে কোথাও গিয়ে একা একা থাকব। এরা কোথাও থাকতে পারবে না, তিন দিন থাকলেই মাথা গরম হয়ে যাবে। কেন? সাবিত্রী বলছেন, তুমি পারবে না, কারণ তুমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নও। বেশীর ভাগ মানুষই অধর্মে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের ব্যাপারে আরেকটা মজার ঘটনা হবে যখন পাঁচ ভাই মিলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করবে। সেখানেও বলবে মহাজনরা যে পথে গমন করেছেন

সেটাই পথ। দ্রৌপদীর যখন চীর হরণ অবস্থায় রয়েছেন তখনও মহাভারত ধর্মের একটা নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছে। দ্রৌপদী তখন রাজসভায় সবাইকে প্রশ্ন করছেন – আপনারা সবাই বলুন এটা ধর্ম কিনা। দ্রৌপদীর প্রশ্নটা ছিল, যুধিষ্ঠির আগে নিজে জুয়াতে হেরেছিলেন নাকি আমাকে আগে বাজিতে হারিয়েছিলেন? যদি তিনি আগে হেরে গিয়ে থাকেন তাহলে আমি বাকি চারজনের স্ত্রী, তখন সেতো আমাকে বাজিতে লাগাতে পারবে না, তাঁর তো সেই অধিকারই থাকল না। আর যদি না হেরে থাকেন তাহলে তিনি বাকি চারজনকে না জিজ্ঞেস করে কেন আমাকে বাজিতে লাগালেন? আমিতো একা যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী নই। দ্রৌপদীর প্রশ্ন এক জটিল সমস্যাকে সামনে নিয়ে এসেছিল। সবাইকে এই প্রশ্ন করার পর কেউ উত্তর দিতে পারছিলেন না, খুব জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল, সবাই মাথা নিচু করে বসে রইল। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর ভীষ্ম সেখানে খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন – মা, সঙ্কটকালীন অবস্থায় যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তখন তারা যা বলে সেটাই ধর্ম। ক্ষমতা এখন দুর্যোধনের হাতে, ও এখন যেটা বলবে ওটাই ধর্ম, আমার আর কিছু বলার নেই। যে পার্টি ক্ষমতায় থাকবে সেই পার্টি ক্যাডাররা যা বলবে সেটাই ধর্ম। কে এই কথা বলছেন? অষ্টবসুর একজন পিতামহ ভীষ্মদেব। কাকে বলছেন? নিজের নাতবৌ কে। কখন বলছেন? যখন দ্রৌপদীর চীর হরণ হতে যাচ্ছে, দ্রৌপদী তখন এক অসহায় অবস্থায়। ক্ষমতার সামনে ধর্ম চাপা পড়ে যায়, কিছুই করার থাকে না। মহাভারত কিভাবে ধর্মকে বিশ্লেষণ করছে, ধর্মকে একেবারে বাস্তব অবস্থায় হাজির করা হচ্ছে। এই ধর্মকেই নিয়ে যুদ্ধের সময় অর্জুনকে কর্ণ যখন কথা বলতে এসেছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এখন তোমার মুখে ধর্মের খৈ ফুটছে, যখন দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করা হচ্ছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল, তখন কেন চুপ করে ছিলে? মূল কথা হল, আমরা ধর্ম বলতে যেটা বুঝি, মূল্যবোধের কথা বলতে গিয়ে যা বলা হয়, এটা কখনই স্থিতিশীল নয়, এর স্বভাবই হল গতিশীল। নির্দিষ্ট করে চিরন্তন ভাবে ধর্মকে কখনই নিরূপণ করা যাবে না। সেইজন্য ধর্মকে নিজের আচরণে নিজস্বতার নিরিখে অনুশীলন করতে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে একজন রাজা তার নাম ছিল রুক্মি, তার বিরাট হস্তিবাহিনী ছিল, সে এসে যুধিষ্ঠিরকে বলছে, আপনি যদি ভয় পেয়ে থাকুন তো বলুন আমি আমার সব সৈন্যদের কৌরবদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেব। পাণ্ডবরা হাতজোড় করে বলছে, আমরা ভয় পাইনি, আপনি আসতে পারেন। এরপর রুক্মি দুর্যোধনের কাছেও গেল, দুর্যোধন তুমি বল তুমি ভয় পেয়েছ কিনা, আমি একাই তোমার হয়ে যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের জয় করে দেব। দুর্যোধনও বলে দিল, না না, আমি ভয় পাইনি, আপনি আসুন। রুক্মি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশই নিতে পারলো না। কারণ এটা ছিল ধর্মযুদ্ধ, আপনি যদি মনে করে থাকেন আমিই ঠিক তাহলে আপনি আমার হয়ে যুদ্ধে অংশ নিন। এখানে ভয়টয়ের কোন দৃশ্যই নেই। আরও অবাক কাণ্ড, যুদ্ধ শুরু হবার আগে দুই পক্ষের মাঝখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির বলছেন যারা মনে করছেন তিনি ভুল দলে আছেন তাহলে আপনাদের অবস্থান বদল করে নিতে পারেন। তখন বিকর্ণ নামে কৌরবদের এক ভাই এসে পাণ্ডবদের শিবিরে যোগ দিল। অন্য দিকে কর্ণকে ভীষ্ম, কুন্তি ও শ্রীকৃষ্ণ এই তিনজন মিলে বোঝাল, তুমি হলে কুন্তির সন্তান এই যুদ্ধে তুমি অংশ নিও না। কর্ণ বললেন, না না, তা কি করে হবে আমি মিত্রধর্মে প্রতিষ্ঠিত, দুর্যোধনের হাত আমি ধরেছি, সে আমার বন্ধু, আমি তাকে ছাড়বো না। কুন্তিকে কর্ণ বলছেন, ঠিক আছে, আমি পঞ্চ পাণ্ডবদের দাদা, আমার লড়াই অর্জুনের সাথে, আমি যদি মরি তোমার পাঁচ সন্তান থাকবে, অর্জুন যদি মরে তাহলেও তোমার পাঁচ সন্তানই থাকবে, কিন্তু মিত্রধর্ম আমি ছাড়বো না। তাই বলে কি কর্ণ কোন ভুল করেছিল? কিছুই ভুল করেনি, কারণ কর্ণের সামনে যখন ধর্ম সঙ্কট এসে গেল তিনি তখন একটা ধর্মকেই বেছে নিলেন, তাই আজও কর্ণ কর্ণই। ধর্ম সঙ্কটে দুটো জিনিষ সামনে এসে যাবে, এর দুটোর মধ্যে একটাকে আমায় বেছে নিতে হবে, মহাভারত কখনই আমাকে বলে দেবে না যে তুমি এই ধর্মটাকে বেছে নাও। আমি যে ধর্মকে বেছে নেব সেই অনুসারে আমার ব্যক্তিত্ব গঠিত হবে। একদিকে কর্ণ মিত্রধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে সমস্ত প্রলোভনকে সে হেলায় প্রত্যাখ্যান করে দুর্যোধনকেই আঁকড়ে রাখলো, আবার দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণ মনে করল আমার ভাইরা অন্যায় করছে তাই সে অন্য দিকে চলে গেল। মহাভারত কোথাও কাউকে নিন্দা করছে না। শুধু দেখিয়ে দেবে এই এই হয়েছিল, কিন্তু কোন উপদেশ দিয়ে আমাকে বলবে না যে তুমিও তোমার ক্ষেত্রে এই ধর্মকে অবলম্বন কর। এই হচ্ছে মহাভারতে ধর্মের রূপ। ধর্মের যে কত রকমের রূপ হতে পারে, মহাভারত ছাড়া আর কোথাও এত রূপ পাওয়া যাবে না। মূল কথা হল ধর্ম হল একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার, ধর্মকে যখনই সার্বজনীন করে দেওয়া হবে তখনই ধর্মে অনেক ধরণের জটিলতা এসে যাবে।

কর্মবাদ, অপূর্বতা ও পুনর্জন্মবাদের ধারণা

মহাভারতের কাহিনী জানার উদ্দেশ্য নিয়ে এই আলোচনা করা হচ্ছে না, আমাদের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় মনীষিদের চিন্তাধারা কিভাবে বিবর্তিত হয়ে মহাভারতে এসে কিভাবে একটা স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। মহাভারত রচনার আগে মানবজীবনের কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাপারে ঋষিদের মাথায় নতুন চিন্তা ভাবনা এসেছিল। এরমধ্যে একটি খুব গুরুত্ব যে ধারণার উদ্ভব হয়েছিল তা হল অপূর্বতা। মানুষ স্বর্গে যাওয়ার জন্য বা পরের জন্মটা যেন ভালো হয় এই আশা নিয়ে

যখন যজ্ঞ-যাগ করে তখন তার ফলটা সঙ্গে সঙ্গে পায় না। খাওয়া-দাওয়া করার ফল সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই, খেলে আমাদের পেট ভরে যায় আমরা তৃপ্তি পাই, কিন্তু এই যজ্ঞ-যাগ করার ফল সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এই ফলটা নিশ্চয়ই কোথাও বসে থেকে অপেক্ষা করতে থাকবে। কোথাও তো ফলটাকে থাকতে হবে, তা নাহলে ফলটা হারিয়ে যাবে। ঋষিরা এই নিয়ে বিচার করতে থাকলেন, বিচার করে একটা ধারণা তাঁরা নিয়ে এলেন, এই ধারণা তাঁরা ধ্যানের গভীরে পেয়েছিলেন নাকি চিন্তা ভাবনা করে বার করেছিলেন এই ব্যাপারে আমাদের কারুরই এখন জানার কথা নয়। মার্ক্সিস্ট ফিলজফিতে ধর্মকে আফিং বলা হয়, ধর্ম আফিং কিনা সেটাও বলা যাবে না। কিন্তু ঋষিদের এই ধারণা যদি চিন্তা ভাবনা থেকে এসে থাকে তাহলে ধর্মটা আফিং হয়ে যাবে, কিন্তু যদি মনে হয়, না, তাঁদের কোন একটা দিব্য দৃষ্টির শক্তি ছিল যেখান থেকে তাঁরা যদি এই ধারণাটাকে দেখে থাকেন তাহলেই কিন্তু ধর্মের একটা প্রাসঙ্গিক অর্থ এসে যায়, সেই প্রাসঙ্গিক অর্থটা হল অপূর্বতা।

অপূর্বতাতে বলা হয়, মানুষ যজ্ঞ-যাগ করে যে ফল পায় সেটা থেকে যায়, ঠিক উপযুক্ত সময় যখন আসে তখন সেই ফলটা ফলিয়মান হয়। এই ধারণাটাকে বীজের সাথেও তুলনা করা হয়, ঠাকুরও এই উপমা দিচ্ছেন – পাখি বটবৃক্ষের ফল খেয়ে কোন বাড়ির কার্ণিশে বিষ্টা ত্যাগ করেছে। বিষ্টার সাথে বটবৃক্ষের বীজটাও বাড়ির কার্ণিশে থেকে গেল। বাড়িটা কালের গতিতে একদিন পোড়ো বাড়ি হয়ে গেলো, তারপর দেখা গেল সেখানে এক বিশাল বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে। ছোট্ট একটা বীজ কোথায় কোন কার্ণিশে পড়েছিল সেখান থেকে কালে কালে এক বিশাল বট গাছ বেড়িয়ে এলো। বীজ যেখানে এসে পড়ে, আজ হোক বা কাল হোক ঠিক সময় হলে সেই বীজটা ফলবতী হয়। হয়তো এসব দেখেই এনারা দেখলেন যে, যখন যজ্ঞ-যাগ করা হয় তার ফল সঙ্গে সঙ্গে হয় না, জমে থাকে, তারপর সময় হলে সেই বীজ কার্যকর হতে থাকে, এটাকেই এনারা বলছেন অপূর্বতা।

অপূর্বতা ছাড়া ঋষিরা আরেকটি জিনিষ নিয়ে এলেন, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনাদিকাল থেকে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলছে, এই মহাজাগতিক নিয়মকে ঋষিদের পরিভাষায় বলা হয় ঋতম্। এই অপূর্বতার ধারণা আসছে আহুতি থেকে, যজ্ঞে যখন কেউ আহুতি দিচ্ছে তখনই একটা ক্রিয়া সম্পন্ন হল। অথচ রামায়ণ মহাভারতে এসে বেদের এই যজ্ঞ-যাগের গুরুত্ব কমতে কমতে পেছনের দিকে সরে যেতে থাকে। যজ্ঞ-যাগের স্থান এখন নিয়েছে কর্ম। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে মহাভারত দেখাচ্ছে যে, সাবিত্রী শুধু মাত্র পতিব্রতা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার মৃত স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। এছাড়া মহাভারত দেখাচ্ছে শুধু নিজের স্বধর্ম করে কি করে মহৎ হয়ে গেছে। ধর্মব্যাধে এইটাই দেখানো হয়েছে, একজন সামান্য ব্যাধ নিষ্ঠাপূর্বক তার নিজের বংশের ধর্ম পালন করে কি করে একজন জ্ঞানী পুরুষ হয়ে গেল। তূলাধর নামে একজন ফেরিওয়ালার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াত, সেও নিষ্ঠা নিয়ে এমন কাজ করতে থাকলেন যার ফলে সেখান থেকেই সেও একজন জ্ঞানী হয়ে গেল। পিঙ্গলা একজন বারবণিতা ছিল। গ্রাহকের জন্য অপেক্ষা করছিল, কোন গ্রাহকই সেদিন তার কাছে আসেনি, সেদিন তার মনে কি একটা অনুশোচনা থেকে পরিবর্তন এলো যার ফলে সে আস্তে আস্তে জ্ঞানী হয়ে গেল। বেদের সময় উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল তোমাকে উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিতে হবে। মহাভারতে এসে ব্যাসদেব এই ধারণাটাকে পুরো পাল্টে দিলেন।

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, এই জিনিষগুলো শুধু একজনের চিন্তাতেই এসেছিল তা নয়, শুধু যে ব্যাসদেবই এই চিন্তাধারাকে নিয়ে এসেছিলেন কিংবা বাল্মীকিই নিয়ে এসেছিলেন তা নয়, এগুলো সমষ্টি চিন্তাধারার ফলপ্রসু। সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একই চিন্তা সেই সময় অনেকের মাথাতেই এসেছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় একটা থিয়োরি একই সাথে অনেক বিজ্ঞানীর মাথায় এসে যায়, এটা কি করে হয় আর কেন হয় বলা মুশকিল, এটাই একটা রহস্য। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, যারা গ্রামের দিকে থাকেন তারাও এটা লক্ষ্য করে থাকবেন, আম গাছে, জাম গাছে অনেক ফল হয়ে আছে কিন্তু এখনও পাকছে না, হঠাৎ একদিন একটা ফল পাকল, তারপর দিনেই দেখা গেল প্রত্যেক গাছেই প্রচুর ফল একসাথে পেকে গেছে। কিংবা গাছে ফুল হচ্ছে না, কিভাবে একটা ফুল হল, তারপরেই দেখা গেল সব কটি গাছেই ফুল হতে শুরু করল, এগুলো বিজ্ঞানের কাছে এখনও রহস্য। এই নিয়ে অনেক গবেষাণাদি করে এরা এটাই পেলেন যে একই সময়ে একই চিন্তা অনেকের মাথায় এসে পড়ে। কেরালার দিকে ট্যাপিওকানা, আলুর মত এক জাতীয় কচুর প্রচুর চাষ হয়। বানররা আলু খায় কিন্তু বিশ্বের কোন বানরই এই কচু খায় না। একবার একটা পরীক্ষা করবার জন্য কিছু বানরকে একটা নির্জন দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোন কিছুই নেই শুধু বালি আর বালি। এরা বালির মধ্যে ঐ ধরণের কিছু কচু পুতে রেখেছিল। কিছু খাবার না পেয়ে বানরগুলো কয়েক দিন খুব

ছটফট করতে লাগল। কতদিন আর না খেয়ে থাকবে, তারপর বালি খুড়ে কচুই খেতে শুরু করল। এরা কচু খাওয়া শুরু করতেই কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেল সার বিশ্বের সব বানর কচু খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এখন সারা বিশ্বের বানর কচু খায়। এটাই রহস্য, কোথায় একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বানর কচু খাওয়া শুরু করল সাথে সাথে বিশ্বের সব বানর কচু খাওয়া শুরু করে দিল। এইটাই বলা হচ্ছে একই চিন্তা একই সাথে অনেকের মাথায় আসে।

হিন্দু সমাজ মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলে। ধর্ম ও অধ্যাত্মের বিভিন্ন ধারণা ও ভাবগুলিকে নিয়ে এনারা দিনরাত চিন্তা ভাবনা করে যেতেন। যে চিন্তা ভাবনাগুলি উপরের দিকে চলে এসেছিল আর যে চিন্তা ভাবনাগুলি ব্যাসদেবের মাথাতেও এসেছিল, সবগুলোকে নিয়ে তিনি মহাভারতে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। এই চিন্তা ভাবনার মধ্যে কর্মের ব্যাপারটাও এসে গিয়েছিল – অপূর্বতা, ঋতম্ আর আহুতি। এই তিনটের সাথে আরেকটি ধারণা এসে গেল, যেমনটি কর্ম করবে তেমনটি ফল পাবে, এই সব কিছু নিয়ে কর্মবাদের জন্ম নিল। কর্মবাদ মহাভারতের সব থেকে বড় অবদান। মহাভারতে নানা রকমের দার্শনিক চিন্তা ভাবনার মধ্যে কর্মবাদ অন্যতম। হিন্দুধর্ম মানেই কর্মবাদ, কর্মবাদকে হিন্দুধর্ম থেকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হিন্দুধর্মের বিশেষত্বই হারিয়ে যাবে আর ইসলাম, জিউস ধর্মের সাথে এক হয়ে যাবে। কর্মবাদই অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মকে আলাদা করে রেখেছে। কর্মবাদ বলছে, যেমনটি কর্ম করবে তুমি তেমনটি ফল পাবে, আর এই জন্মে যদি না পাও তাহলে পরের জন্মে পাবে, একেবার যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। আমি অনেক কুকর্ম করলাম আর তার ফল এই জন্মে পেলাম না, তাহলে তো কর্মবাদ মার খেয়ে গেল। কর্মবাদ নিয়ে অনেকে মুনি ঋষিই পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেছেন। মনুস্মৃতিতে বলছে, তুমি যদি ফল না পাও তাহলে তোমার ছেলে পাবে, ছেলে যদি না পায় ছেলের ছেলে সেই ফল অবশ্যই পাবে, ভালো-মন্দ যে কাজই করুক তার ফল পেতে সে বাধ্য। কিন্তু মহাভারত এদিক দিয়ে যাবে না, মহাভারত দৃঢ়তার সাথে বলে অন্য কেউ ফল পাবে না, তুমি নিজেই তোমার কর্মের ফল পাবে, এই জন্মে যদি না পাও পরের জন্মে পাবে, পরের জন্মে যদি না পাও তার পরের জন্মে পাবে। তোমার মধ্যে হিংসাবৃত্তি যদি থেকে থাকে আর হিংসাবৃত্তি করার সুযোগ যদি কয়েক জন্ম না পেয়ে থাকো, কোন এক জন্মে তোমাকে সিংহ নয়তো বাঘ বানিয়ে দেবে, বা সাপ বানিয়ে এমন হিংসাবৃত্তি দেবে যেটা দিয়ে তোমার হিংসাবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়ে ছাড়বে।

পরবর্তিকালে ভারতে যত রকমের ধর্মের জন্ম হয়েছিল আর যারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতেন, মজার ব্যাপার হল তারা কিন্তু হিন্দুধর্মের কর্মবাদকে ছাড়তে পারলেন না, সবাই কর্মবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যেমন জৈনধর্ম, জৈনধর্ম পুরো কর্মবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুদের থেকেও বেশী কর্মবাদকে জোর দিল বৌদ্ধরা। শিখধর্মও একই ভাবে কর্মবাদকে আঁকড়ে থাকল। ভারতের মাটিতে চারটি ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ। হিন্দুধর্ম বাকি তিনটে ধর্মের মা, আর তিনজনই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গুরু নানক অতটা হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেননি যতটা বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম থেকে করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর জৈন আর গুরু নানক এনারা হিন্দুদের অনেক ব্যাপারেই সমালোচনা করে গেছেন কিন্তু কর্মবাদকে গ্রহণ করেছেন। এর ফলে ভারতবর্ষ মানেই হল কর্মবাদের দেশ। ইদানিং কালে অবশ্য কর্মবাদ বিদেশেও ছড়াতে শুরু করেছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে কর্মবাদ বলতে বোঝায় আমি যদি তোমার গালে চড় মারি তুমিও একদিন আমার গালে চড় মারবে। কিন্তু মহাভারতে কর্মবাদ তা বলছে না। মহাভারতের কর্মবাদ হল মানসিক বৃত্তি, তোমার মধ্যে যদি হিংসার বৃত্তি থাকে তার বহিঃপ্রকাশ হল কারুর গালে চড় মারা, কারুকে গালাগাল দেওয়া। চড় মারা গালাগাল দেওয়াটা কোন ব্যাপার নয়, গুরুত্ব হল তোমার ভেতরের প্রবৃত্তি, এই যে তোমার ভেতরের হিংসা বৃত্তি, এই বৃত্তি তোমাকে আজ হোক কাল হোক গ্রাস করে নিয়ে তোমাকে ফল দিতে শুরু করবে। ঋষিরা বলে দিলেন সচ্চিদানন্দই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য। অথচ চোখের সামনে জাজ্জ্বল্যমান এই সংসার দেখতে পাচ্ছি, এই দুটোকে মেলানো যাবে কিভাবে? তখনই বুদ্ধিটা লাগাতে হবে। ঋষিরা দেখলেন কর্মবাদকে সত্য হতেই হবে তা নাহলে ধর্মের কোন তাৎপর্যই থাকে না। মজার ব্যাপার হল কর্মবাদকে ছেড়ে দিলে কোন ধর্মেরই কোন অর্থ হয় না। একটু যুক্তি দিয়ে দেখলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে কর্মবাদকে মানছে না সে কখন ধর্মকেও মানতে পারবে না, সে যে ধর্মেরই হয়ে থাকুক, ইসলাম, জহুদি, খ্রীশ্চান যাই হয়ে থাকুক না কেন। এরাও বলে আমি যেমনটি কর্ম করেছি সেই অনুসারে ঠিক করা হবে আমি স্বর্গে যাব, কি নরকে যাব। তার অর্থ হল, আমি যখন মারা যাচ্ছি, মরার পর আমার একটা কিছু থেকে যাচ্ছে যেটা ফল পাবে। সেটা তাহলে কি? স্থূল শরীর তো হতেই পারেনা, স্থূল শরীরকে হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নয়তো কবর দেওয়া হয়ে গেছে। স্থূল শরীর ছাড়া কোন একটা কিছু চলতে থাকছে। কি নিয়ে চলছে? যেমনটি করেছে, আর সেই অনুসারে সে হয় জন্নতে

যাবে নয়তো জাহান্নমে যাবে। তাহলে এখানেও কর্মকেই মানা হচ্ছে। সেই কারণেই বলা হচ্ছে, যে কর্মবাদকে মানে না ধর্ম তার জন্য কখনই হতে পারেনা।

ধর্ম মানেই তোমার মৃত্যুর পরে তোমার জীবন কোন না কোন ভাবে চলতে থাকবে, এটাকে যদি তুমি না মানো তাহলে ধর্ম তোমার জন্য কখনই নয়। তুমি যদি বলো, আমি মরে গেলাম, আমাকে পোড়ান হয়ে গেল, এবার পোড়ানর পরে আমার আবার শরীর হয়েছে কে দেখেছে? এই তত্ত্বেই যদি তোমার ঠিক ঠিক বিশ্বাস থাকে তাহলে ধর্ম তোমার জন্য নয়। তাহলে ধর্ম কার জন্য? যদি কেউ বলে, আমি, এই আমি শরীরের কথা বলা হচ্ছে না, এই আমিটা কে তার উত্তর কেউ দেবে না, এটা তোমাকেই বার করতে হবে, এই আমিটা মৃত্যুর পরও কোন না কোন ভাবে চলতে থাকে আর যেমনটি এই আমিটা তার শরীর, মন, বুদ্ধি দিয়ে কর্ম করেছে তেমনটি সে ধাক্কা খেতে থাকবে। খ্রীশ্চানরা বলবে, তুমি যদি জীবনে বাইবেলের কথা মত চলে থাকো তাহলে মৃত্যুর পর কবরে শুয়ে থাকবে, আর যেদিন জাজমেন্ট ডে আসবে সেদিন যিশু এসে তোমাকে পার করে দেবে আর তুমি চিরকালের মত স্বর্গে চলে যাবে, আর জীবনে যদি বাইবেলের কথা মত না চলে থাক তাহলে চিরদিনের মত নরকে চলে যাবে। পার্সি ও জহুদিদের একই ভাব। পার্সিদের থেকে জুদাইজিমের উপর অনেক প্রভাব এসেছিল, তাই এই দুটো ধর্মের মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়। ইসলামও একই কথা বলছে, তফাৎটা হল ওদের বাইবেল এদের কোরান, বাকি সব কিছু একই থেকে গেল – তুমি যদি কোরানের কথা মত বা মহম্মদের কথা মত চল তাহলে তুমি জন্নতে যাবে। জন্নতের বর্ণনাও খ্রীশ্চানদের হেভেনের মত, ওখানে হুরিরা তোমাকে সেবা করার জন্য অপেক্ষা করে আছে, সেখানে সুন্দর সুন্দর খাবার-দাবার থাকবে, নদী থাকবে ইত্যাদি। এখন এগুলো কার জন্য ব্যবস্থা করা আছে? তোমার জন্য। কিন্তু তোমাকে তো কবরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে পোকাগুলো তোমার শরীরকে খেতে শুরু করেছে। এই শরীরটাতো স্বর্গে বা নরকে যাচ্ছে না, তবে কে যাচ্ছে? তুমি যাচ্ছো। এই তুমিটা কে? এই প্রশ্ন থেকেই ধর্মের শুরু হয়। কে যাবে? তুমি যাবে। কিভাবে যাবে? যদি তুমি ভালো কর্ম করে থাক। ভালো কর্ম বলতে কি? কোরান বা বাইবেলের কথা মত কর্ম। হিন্দুধর্ম তাহলে কোথায় দোষ করল? সবাই তো হিন্দুদের কর্মবাদের কথাই বলছে। অথচ হিন্দুদের বক্তব্য পুরোপুরি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করা। আমি দোকানীকে এক টাকা দিলে খুব জোর দেড় টাকার মাল আদায় করে নিতে পারি কিন্তু এক টাকা দিয়ে কখনই আমি হাজার টাকার মাল আদায় করতে পারবো না, তুমি যতটা শক্তি লাগাবে জিনিষটা ততটাই যাবে। এটাই নিউটনের সেকেণ্ড ল অফ মোশান। ঋষিদের বক্তব্য হল তুমি এক জন্মের মত যদি ভালো কাজ কর তাহলে ফলটাও এক জন্মের মতই পাবে, এবারে মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে গেলে এই এক জন্মের ভালো কাজের জন্য তোমাকে একটা অনুপাতে সময় বেঁধে দেওয়া হবে, আর অতটুকু সময়ের জন্যই তুমি স্বর্গে থেকে সুখ ভোগ করতে পারবে, অনন্ত কালের জন্য স্বর্গে থাকার কোন প্রশ্নই আসে না, আর এটা যুক্তিতেও দাঁড়ায় না। এই জায়গাটাতে এসেই হিন্দুদের চিন্তাধারা থেকে অন্যান্য ধর্মের চিন্তাধার পাল্টে যায়, কিন্তু কর্মবাদকে মানছে সবাই। এখন যদি কেউ প্রথম তিরিশ বছর খুব বাজে কাজ করল, আর শেষ তিরিশ বছর বাইবেল বা কোরানের কথা মত কাজ করেছে। এখন প্রথম তিরিশ বছরের খারাপ কাজের জন্য সে কোথায় যাবে, তাকে যদি অনন্ত কালের জন্য নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শেষের তিরিশ বছরের কর্মের ফলটা পেলনা। আর যদি শেষের তিরিশ বছরের ভালো কাজের জন্য অনন্ত কালের জন্য তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রথম তিরিশ বছরের বাজে কাজের ফলটা পেল না, এইজন্য অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ বা নরক যুক্তিতে দাঁড়ায় না। আরও সমস্যা হল, একটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার একদিন পরেই মরে গেল, এখন এই শিশুটি নরকে যাবে না স্বর্গে যাবে? এদেরকে এই ধরণের জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, উত্তর দিতে গিয়ে এদেরকে তাই খুব অস্বস্থির মধ্যে পড়তে হয়।

কর্মবাদে বলছে তুমি যে কর্মই করছ তার ফল তোমাকে পেতে হবে। বাছুর যেমন নিজের মাকে ভিড়ের মধ্যে ঠিক খুঁজে বার করে নেয়, কর্মও ঠিক তোমাকে খুঁজে বার করে নেবে সে তুমি যেখানেই লুকিয়ে থাকো না কেন, ভগবানের দরবারেই থাকো আর পাতালেই থাকো। শ্রীমাও বলছেন, ভগবানের শরণ নিলে যেখানে ফাল লাগার কথা সেখানে হয়তো ছুঁচ হয়ে ফুটবে, কিন্তু কিছু একটা ফুটবে, ছাড়বে না কিছুতেই, তবে ফলের পরিমাণটা কমতে বা বাড়তে পারে, কর্মফল চলে যাবে না। এটাই হচ্ছে কর্মবাদ, এই কর্মবাদই হিন্দুধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা করে দেয়। এই কর্মবাদ আমরা উপনিষদেই পেয়ে যাই, কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন জীবনে যেমন তোমার জ্ঞান, যেমন তোমার কর্ম সেই অনুসারে তোমার পুনর্জন্ম হবে। মহাভারতে এসে কর্মবাদ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। মহাভারতে কর্মের ব্যাপারে যা কিছু তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতে আজকে এটাই চলছে, এর কোন সংশোধন আজ পর্যন্ত হয়নি। বেদের কিছু কিছু ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, রামায়ণের দর্শনেরও পরিবর্তন হয়েছে, তন্ত্রের দর্শনও পাল্টেছে, স্মৃতিও পাল্টে গেছে কিন্তু মহাভারতের

কর্মবাদের তত্ত্ব এতটুকু কোথাও পাল্টায়নি, ব্যাসদেব যেমনটি মহাভারতে দিয়ে গেছেন তেমনটিই এখনো চলছে। সেইজন্যই তো ব্যাসদেবকে বলা হয় গুরু, হিন্দুরা যে গুরুপূর্ণিমা উদ্‌যাপন করে সেটা ব্যাসদেবের জন্মদিন। হিন্দুধর্মের কে জন্ম দিয়েছেন জিজ্ঞেস করলে এর উত্তর দেওয়া যাবে না, কারণ হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম, সৃষ্টির আগে থাকতেই হিন্দুধর্মের দর্শন চলে আসছে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় হিন্দুধর্মের রূপ কে দিয়েছেন? তার উত্তর ব্যাসদেব। ব্যাসদেব হিন্দুধর্মে যেটা দিয়ে গেছেন সেটাই থেকে গেছে, যেটাকে তিনি দেননি সেটাতে কেউ হাত দেয়নি। গরু যেমন ঘাস খাচ্ছে, জাব কাটছে, জল খাচ্ছে আর তার স্তন থেকে দুধ হয়ে সব কিছুর সার বেরিয়ে আসছে। ব্যাসদেব হলেন সেই স্তন। হিন্দুধর্মে বেদের সময় থেকে যা কিছু ছিল তিনি ঘাস খড়ের মত সব খেয়ে গেছেন আর হিন্দুধর্মের বর্তমান রূপ সার হয়ে ব্যাসদেব রূপী স্তন থেকে বেরিয়ে এসেছে। হিন্দুধর্মের যে বর্তমান রূপ এরজন্য ব্যাসদেব ছাড়া শুধু মাত্র একজন লোককে কৃতিত্ব দেওয়া যাবে না। ব্যাসদেবকেও পুরো কৃতিত্ব দেওয়া যাবে না, ব্যাসদেবের আগেও অনেকে আছেন আবার তাঁর পরেও অনেকে আছেন। যদি আদপে একজনকে কৃতিত্ব দিতে হয় তাহলে ব্যাসদেবকেই দিতে হবে, এই কারণেই তাঁর জন্মদিনকে গুরুপূর্ণিমা রূপে পালন করা হয়।

কর্ম সাধারণত তিন ভাবে হয়ে থাকে, শারীরিক ভাবে, বাচিক রূপে আর মানসিক ভাবে, এই তিনটেকে বলা হয় মনসাবাচ কর্মণা। যে ভাবেই কর্ম করা হোক না কেন তিনটে কর্মের ফল কিন্তু একই হবে। আমি যদি বলি তোমাকে এক চড় মারবো, এখন আমি তোমার গালে হাত দিয়েই মেরে থাকি আর মুখেও যদি বলি আর মনে মনেও যদি ভাবি তোমাকে এক চড় মারবো, কর্মের দিক থেকে তিনটেই সমান। তবে তারতম্যের দিক থেকে একটু অন্য রকম হয়। যদি মনে মনে ভাবি এক চড় মারবো তাহলেও সেটা মনের গভীরে একটা ছাপ ফেলে যাবে, যদি মুখে বলে থাকি তাহলে ছাপটা আরেকটু গভীর হবে, আর যদি মেরে দিলাম তাহলে ছাপটা আরও গভীর হবে। ঠাকুর বলছেন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়, কিন্তু এই কথা গৃহস্থদের জন্য, সন্ন্যাসীদের তিনটের কোনটাই করা চলবে না। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে মনের পাপও পাপ, কারণ দাগ একই কাটবে। সন্ন্যাসীর মনেও যদি কিছু খাবারের লোভ আসে বা কারুর প্রতি হিংসা ভাব এসে থাকে তাহলে এই ভাবই তার জন্য কিছু কর্মকে দাঁড় করিয়ে দেবে। কোন না কোন জন্মে কিছু একটা করিয়ে খাবারের ঐ লোভটাকে চরিতার্থ করিয়ে ছাড়বে। সেইজন্য সাধকের সাধন-জীবনে বলা হয়, তুমি কি ভাবছ সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, বরঞ্চ কি করছে সেটার গুরুত্ব অনেক কম। অনিচ্ছাকৃত অনেক কিছুই করতে হয় সেগুলো কিছু দাগ কাটবে না কিন্তু মনে যে ইচ্ছাটি আছে সেটা কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না। অনেক সময় ঘর সংসার চালাতে তোমাকে টাকা পয়সা রাখতে হবে, বাড়ি করতে হবে, বউকে খুশি করার জন্য অনেক কিছু করতে হচ্ছে, কিন্তু ভেতর থেকে তুমি এগুলো করতে চাইছো না, তুমি সংসারী হয়েও কিন্তু বিরাট জয় করে নিলে। সন্ন্যাসীর দুটোর কোনটাই রাখা চলবে না। সন্ন্যাসী যদি বলে এই বাজে কাজগুলো আমাকে করতে হচ্ছে বটে কিন্তু আমার ভেতরটা পরিষ্কার তাহলেও কিন্তু তার বিপদ, বাইরে বাজে কাজগুলোও বন্ধ কর ভেতরের বাজে চিন্তাগুলোও সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে। এই দর্শন মহাভারতের আর এটাই আজকের হিন্দুধর্মের দর্শন।

মানুষ যে কাজই করুক ভালো বা মন্দ, কাজের আগে তার মনে চিন্তা আসে, তারপর সে মুখে বলতে শুরু করে, পরিশেষে সেটাকে কার্যে পরিণত করে। কার্যে পরিণত করা আর মনে চিন্তা করা সবটাই পাথরের উপর দাগ পড়ে যাওয়া। এই দাগটাই সংস্কার হয়ে থেকে গেল আর এই সংস্কার থেকেই আবার তার মনে চিন্তা আসবে সেখান থেকে আবার নতুন করে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই মনে চিন্তা করা হলেও তাকে বাঁচানো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। মনে চিন্তা এলেও মুখটাকে যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলেও অনেকটাই সে বেঁচে যাবে। মুখটা হল ঘরের দরজার মত, চিন্তা আর কার্যে পরিণত হওয়ার সংযোগ হচ্ছে মুখ। একজন বলছে আজ হোক কিংবা কাল হোক আমি ঘুষ নিতে শুরু করব। তার মানে তার মাথায় ঘুষ নেওয়ার চিন্তা এসে গিয়েছিল এবার সে মুখে বলছে মানে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরপরই সে ঘুষ নেওয়াতে নেমে পড়বে। প্রথম দিন ঘুষ নিতে একটু ভয় পাবে, দ্বিতীয় বার ঘুষ নেওয়ার সময় সে ওস্তাদ হয়ে যাবে, তারপর তাকে আর কেউ আটকাতে পারবে না। মন থেকে শুরু হয়ে মুখে প্রকাশ পেতে থাকে, তারপরই কার্যে নেমে পড়ে। কোন ভাবে যদি মুখটাকে আটকে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু মনের চিন্তা কার্যকর হতে পারেনা। সেইজন্য যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাদি করা হয়, প্রভু আমার মনটাকে পরিষ্কার কর তখন মনের দাগটা পরিষ্কার হতে শুরু হয়। মনের দাগটা যখন পরিষ্কার হতে শুরু করে তখন আস্তে আস্তে ঐ সংস্কারগুলো কমতে শুরু করে। এবার যদি সে বলে আমার ঘুষ নেওয়ার অভ্যেসটা কিছুতেই যাচ্ছে না। তখন এনারা বলবেন, ঠিক আছে ভালো লোক ও গরীব লোকদের থেকে ঘুষ নিও না, আর একশটি ঘুষ নেওয়ার পর আর ঘুষ নিতে যেও না। এবার সে একটু ভালোর দিকে মোড় ঘুরল, এইভাবে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তুমি কিভাবে খারাপ থেকে ভালোর দিকে যাবে।

আমি যেমনি কর্মবাদকে মেনে নিলাম, অপূর্বতাকে যখনই স্বীকার করে নিলাম তখনই পুনর্জন্মবাদ স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। পুনর্জন্মাবাদই যদি না থাকে তাহলে এই কর্মের ফলগুলো কার্যকর হবে কোথায়? একটা লোক প্রচুর বাজে কাজ করল, এখন তার এই বাজে কাজের ফল এই জন্মে ফলপ্রসু হওয়ার সুযোগ পেল না, এখন তার বাজে কর্মের ফলটা অপেক্ষা করে থাকবে পরের কোন এক জন্মের জন্য। যদিও আমরা বেদে ও উপনিষদে পরিষ্কার ভাবে কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ পাইনা, কিন্তু কঠোপনিষদের একটি মন্ত্রে যমরাজ বলছেন – *যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেহনুসংযন্তি যথাকর্মে যথাশ্রুতম্।।* (২/২/৭)। মানুষ যখন মারা যায় সে যেমনটি কর্ম করেছে, যেমনটি তার জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়েছে, সেই অনুসারে সে শরীর গ্রহণের জন্য গাছপালা হয়ে জন্মায় নয়তো মানুষযোনি বা তির্যকযোনি প্রাপ্ত হয়। কঠোপনিষদ হাল্কা ভাবে যে দর্শনকে নিয়ে এসেছে, সেই দর্শনকে মহাভারত শক্ত ভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দিল। কর্ম, অপূর্বতা, কর্মবাদ, পুনর্জন্মবাদ পুরোপুরি আজ যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে গেছে, যার কৃতত্ব পুরোপুরি মহাভারতের।

অনাসক্ত কর্ম ও মুক্তির ধারণা

কর্ম কর্মকে জন্ম দেয়, সেই কর্ম আবার একটা কর্মকে জন্ম দিচ্ছে, এইভাবে সবাই আমরা এই কর্মচক্রের মধ্যে অবিরত ঘুরেই চলেছি। এটাই আবার আমাদের পুনর্জন্ম করিয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিটাও চক্রাকারে ঘুরছে, সৃষ্টির লয় হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন সৃষ্টি হচ্ছে তখন কিন্তু এই কর্মই আমাকে টেনে নিয়ে নতুন সৃষ্টির মধ্যে নিয়ে আসছে, কর্ম কিন্তু আমাকে ছাড়ছে না। এই চক্র থেকে মানুষ বাঁচবে কি করে? এই চিন্তা ভাবনাও এনাদের মনে এসেছিল আর এখান থেকেই এসেছে মুক্তির ধারণা। এই মুক্তির ধারণাতে এসেই মহাভারত খুব জোর দিল অনাসক্ত কর্মের উপর। ফলের আকাঙ্খা না করে তুমি কাজ করে যাও। এনাদের মত হল, যখনই কোন কাজ করা হল সেই কাজের একটা বীজ থেকে যায়, সেই বীজ থেকেই আবার ফল হতে শুরু করবে, সেটাই আবার কর্মের দিকে ঠেলে দেয়। এনারা বললেন এই বীজটাকে নাশ করে দাও। বীজটাকে কিভাবে নাশ করা যাবে? যখনই যে কোন কাজ করছ তখন কোন ফলের আকাঙ্খা করো না। এই যারা এখানে শাস্ত্র কথা শুনতে আসছেন, এনারা সবাই কিসের আশা করে এখানে আসছেন? দুপুরে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কত দূর দূর থেকে শাস্ত্র কথা শোনার জন্য আসতে হচ্ছে। এই শাস্ত্র শুনে কোন অর্থ উপার্জন করা যাবে না, মান-সম্মানও বাড়বে না, উল্টে বাড়ির লোকেদের গঞ্জনা শুনতে হচ্ছে। তারপর ট্রেন ভাড়া, বাস ভাড়া দিতে হচ্ছে, শাস্ত্র শোনার জন্য অর্থ দিতে হচ্ছে কিন্তু তার বিনিময়ে কি পাচ্ছেন? কিছুই না। এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক অনাসক্ত কর্ম। সারা জীবন আমরা নিজের জন্য আর পরিবারের জন্যই কাজ করে গেলাম এখন এইটুকু যে ইচ্ছে হয়েছে দেখি আমাদের সনাতন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে শাস্ত্র কি বলছে, এটাই আমাদের অনাসক্ত কর্মের দিকে ঠেলে দিল।

অনাসক্ত কর্ম যখনই করা হল তখনই ঐ কর্মের যে বিশাল চক্র ঘুরছে ওর উপর তলোয়ারের বিরাট একটা কোপ পড়ে গেল। এখান থেকেই এবার সে মুক্তির পথে চলতে শুরু করে দিল। যখন আমি নমাজ পড়ছি তখন আমার মাথায় আছে আমার ধর্ম আমাকে বলে দিয়েছে দিনে তিনবার নমাজ পড়, যখন জপ করছি তখনও মাথায় আছে গুরু বলে দিয়েছেন তুমি দিনে অন্তত দুবার জপ করবে, কিন্তু এখানে শাস্ত্র কথা শোনার জন্য আমাদের কেউ বাধ্য করেনি। ধর্ম করতেও আসছি না, টাকা খরচ করে শারীরিক পরিশ্রম করে আসতে হচ্ছে। এর ফল কি পাব? কিছুই না, শুধু শাস্ত্র জ্ঞান একটু হবে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করত যাতে রাজার দরবারে একটা ভালো চাকরি জোটাতে পারে আর যজমানদের কাছে কিছু ভালো দক্ষিণা পেতে পারে। আমাদের এরও কোন সম্ভবনা নেই। গীতাতে যে অনাসক্তের কর্মের কথা বলা হয়েছে, এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক অনাসক্ত ভাবে নিঃস্বার্থ কর্ম। এত লোক তীর্থে যাচ্ছে, বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছে, এরা সবাই ধর্ম করতে যাচ্ছি এই মনোভাব নিয়ে যাচ্ছে, ভাগবতের দুটো কথা কানে গেলে কর্ণের শুদ্ধি হবে, আমার পূণ্য হবে এই আশায় তীর্থাদিতে যাচ্ছে, এখানে এই মনোভাব নিয়েও কেউ আসছেন না, শুধু আমি জানতে চাইছি শাস্ত্র কি বলছে। জেনে তোমার কি হবে? কিছুই হবে না, আমি শুনে গেলাম। কঠোপনিষদ ঠিক এটাই বলছে – তোমার জন্ম কিসের উপর নির্ভর করবে? *স্থাণুমন্যেহনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, শ্রুতম্ মানে জ্ঞান, জীব জ্ঞান ও চিন্তানুযায়ী শরীরগ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। এই জ্ঞানের বিনিময়ে আমরাতো টাকা-পয়সা, মান-যশ, ইন্দ্রিয় সুখ কিছুই চাইছি না। এই যে জ্ঞান একটু ভেতরে যাচ্ছে এটাই আমাদের একটু একটু করে উপরের দিকে ঠেলে দেবে।

মহাভারত বুঝতে পারল যদি কেউ নিঃস্বার্থ ও অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে শুরু করে তখন তার কর্মের এই ঘূর্ণিপাকটা দুর্বল হয়ে যায়। মানুষের এই কর্মের বাঁধনকে ঠাকুর বলছেন জীব আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আর স্ক্রুপ দিয়ে বাঁধনটাকে

আরও শক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমনি অনাসক্ত কর্ম শুরু হয়ে গেল তখনই কর্মের এই আষ্টেপৃষ্টের শক্ত বাঁধন আলগা হতে শুরু করল। এইটি মহাভারতের অত্যন্ত মূল্যবান তত্ত্ব, যে তত্ত্বটাকে গীতাতে আরও জোরালো ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। মহাভারত উপমা দিচ্ছে, ব্যাধ মাংস বিক্রী করছে অনাসক্ত ভাবে, রাজা রাজধর্ম চালাচ্ছে অনাসক্ত ভাবে, ঋষি অনাসক্ত ভাবে তপস্যা করে যাচ্ছেন, আবার আসক্ত হয়ে কর্ম করে কিভাবে তার পতন হচ্ছে তারও উপমা মহাভারত দিয়েছে। মহাভারত কখনই বলবে না, তুমি ব্যাধ হয়েছ তোমাকে অমুক হতে হবে তা নাহলে তুমি এগোতে পারবে না। মহাভারত উপদেশ দিচ্ছে তুমি যেখানেই আছো সেখান থেকেই অনাসক্ত ভাবে কর্ম করে গেলে তুমি মহৎ হয়ে যাবে। মহাভারতের এটাই মৌলিক বিবর্তিত দর্শন। যে কোন ধর্মই মহাভারতের এখানে এসে পুরো আলাদা হয়ে যায়। মহাভারত কখনই বলবে না, তুমি যদি স্বর্গে যেতে চাও তাহলে তোমাকে ভক্ত হতে হবে, তোমাকে যজ্ঞ করতে হবে, তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে। তার বদলে বলবে, তুমি যে কাজটি করছ সেটাই ঠিক ভাবে কর, দ্বিতীয়, ঐ কাজটাকে এবার অনাসক্ত ভাবে কর, তোমার মুক্তি অবশ্যম্ভাবি। বড় বড় মুনি ঋষিরা তপস্যা করে যা ফল পাচ্ছেন তুমিও ঐ একই ফল পাবে, তবে তোমাকে দুটো জিনিষ পালন করতে হবে, যে কাজটি তুমি জন্মসূত্রে পেয়েছ সেটি ঠিক ভাবে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে কর, আর অনাসক্ত ভাবে কর, মানে কোন ফলের আকাঙ্খা করবে না। অনাসক্ত মানে কোন ফলের আশা না করা। তাই বলে এটা বলছে না যে তুমি অফিসে কাজ করে মাইনে নেবে না। আমার কর্মের জন্য কর্তৃপক্ষ যে মাইনে ধার্য করেছে সেই মাইনে পুরোটাই নেব, ঐ মাইনে থেকে সংসারে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের জন্য, বাবা-মায়ের জন্য, সমাজের জন্য, দান-দক্ষিণার জন্য অবশ্যই খরচ করবে। ভালো জামা-কাপড় পড়বে, ভালো খাওয়া-দাওয়া করবে, সুখ-ভোগ করবে, সব কিছুই ভালোমত করবে, গীতা কখনই এগুলো করতে নিষেধ করে না, মুর্খদেরই ধারণা যে গীতা সব কিছু ত্যাগ করে চুপচাপ বসে থাকতে বলছে। মহাভারত বলছে তুমি ধর্মকর্ম করবে, অর্থোপার্জনের জন্য কর্ম করবে আবার কাম সাধনও করবে, কিন্তু সব কিছুই অনাসক্ত ভাবে করবে। এরজন্য তোমার পেশাকে পাল্টাতে হবে না, তোমাকে চাকরি পাল্টাতে হবে না, তোমার জীবন যাত্রাকে পাল্টে দিতে হবে না, তুমি যা আছ তাই থাকো। তুমি যদি চাও আমি সারা জীবন ছাত্র থেকে অধ্যয়ণ করে জ্ঞান অর্জন করতে চাই, মহাভারত বলবে তুমি তাই থাক, কিন্তু কোন কিছু আকাঙ্খা করো না, তাহলে তুমি ঐ অবস্থা থেকেই সর্বোচ্চ অবস্থা এমনকি শ্রীকৃষ্ণের স্তরে চলে যেতে পারবে। তুমি যদি চাও আমি সারা জীবন শিক্ষকতা করে যেতে চাই, তোমাকেও মহাভারত বলবে তুমি তাই করে যাও, অনাসক্ত ভাবে করে তুমিও মুক্তি পেয়ে যাবে। অন্য কোন ধর্ম এমনকি আমাদের প্রাচীন হিন্দুধর্মও এটাকে মানতে চায় না অথচ মহাভারত এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে বলছে, গীতা এই তত্ত্বকেই আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভারতের আজকের যে দর্শন এটা অনাসক্তির দর্শন।

যদি কেউ বলে, আপনার অনাসক্তির কথা সব শুনলাম, বুঝলাম কিন্তু আমি অনাসক্তির অনুশীলন করতে পারছি না, আমার ফলের খুব আকাঙ্খা থেকে গেছে, খারাপ কাজের দিকেও মাঝে মাঝে মন চলে যায়, আমার জন্য কি কোন উপায় আছে। মহাভারত বলবে, হ্যাঁ, তারও উপায় আছে, তোমার পাপের বোঝা অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে, তাই তুমি শরণাগতির উপায় অবলম্বন কর, প্রভুর শরণাগত হয়ে প্রার্থনা কর। যদি একদিকে তুমি শরণাগতির অনুশীলন করছ আর অন্য দিয়ে চুরি চামারিও করে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবে, এটা কোন ভাবেই চলবে না। প্রথমের দিকে তোমাকে শরণাগতির সাধনা করে যেতে হবে, তারপর তোমার স্বভাব চরিত্রকে পাল্টাতে থাকো, যদি চরিত্র না পাল্টাও, তাহলে তোমার শরণাগতি মুখের কথাই থেকে যাবে। এতে তোমার ডবল পাপ হবে, একদিকে তুমি পাপকর্ম করছে সেটার পাপ হচ্ছে অন্য দিকে তুমি পাখণ্ড করছ সেটার পাপ।

প্রায়শ্চিত্তের বিধান

মহাভারত তৃতীয় একটা পথ বার করল, এটা হল কর্মের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। অজান্তায় বা জান্তায় সবাই কিছু না কিছু দোষযুক্ত কর্ম করে ফেলে। এখন এই কর্ম থেকে কি করে বেরোন যাবে, এই পাপ তো আমার পেছনে পেছনে ঘুরতে থাকবে। কর্মের চারটি বিভাগ করা হয়েছে, এটি মহাভারত থেকেই শুরু হয়েছিল ১) নিত্যকর্ম, যে কর্ম মানুষকে প্রত্যেক দিন করতে হবে, সকালে ঘুম থেকে উঠে পূজো-পাঠ করা, জপ-ধ্যান করা, এই ধরণের কর্মকে বলা হয় নিত্যকর্ম। নিত্যকর্মের ব্যাপারে বলা হয়, অকরণে প্রত্যবায়, নিত্যকর্ম না করলে পাপ হবে, করলে যে পূণ্য হবে তা নয়, না করলে পাপ লাগবে। যেমন ঘর ঝাড় দেওয়া, ঘর যদি ঝাড় দাও এমন কিছু পূণ্য হবে না, কিন্তু ঝাড়ু যদি না দাও ঘর নোংরা হবে, নিত্যকর্মও ঠিক তাই ঝাড়ু মারার মত, মনকে রোজ নিত্যকর্ম দ্বারা পরিষ্কার করতে হয়। ২) নৈমিত্তিক কর্ম, নিমিত্ত থেকে নৈমিত্তিক, বিশেষ দিনে, বিশেষ সময়ে এই কর্মগুলো করতে হয়, যেমন বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশন বা উপনয়ন হবে, একটা বিশেষ দিন, যেমন দুর্গাপূজা, শিবরাত্রির দিনে উপোস থাকা, একাদশীর উপোবাস এগুলো সবই নৈমিত্তিক কর্ম,

এগুলো একটা বিশেষ দিন, সেই দিন আমি কিছু করলাম। নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হবে, আমার যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম তার সাথে আপনার নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম কখনই এক হবে না। ৩) প্রায়শ্চিত্ত কর্ম এবং ৪) কাম্যকর্ম, আমার মনে ইহলোক আর পরলোকে প্রচুর ভোগ বাসনা রয়েছে। এখন যেটা আমার ভোগ করার ইচ্ছে সেটার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেও পাচ্ছি না। তখন বলবে, তুমি এক কাজ কর, এই ভোগটা পাওয়ার জন্য তুমি এই পূজোটা দাও, কিংবা এই যজ্ঞ কর অথবা এই মানত কর। এগুলো সবই কাম্যকর্ম। আর শেষ হচ্ছে নিষিদ্ধ কর্ম, যে কর্মটা করতে শাস্ত্র নিষেধ করছে। মহাভারত অবশ্য নিষিদ্ধ কর্ম নিয়ে কোন আলোচনা করবে না, স্মৃতি শাস্ত্রই এই ধরণের কর্মের কথা বলে গেছে। এখন বলছে হিন্দুরা গরুর মাংস খাবে না, কোরান বলছে শুয়োরের মাংস খাবে না, এখন অজান্তে হিন্দু কিংবা মুসলামান একজন গরু আর শুয়োরের মাংস খেয়ে ফেলল, তখন কি হবে? তখন তাকে বলবে তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ম কর, যেটা তিন নম্বরে বলা হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আবার দুই ধরণের হয়, আমি জেনেশুনে যে পাপ কাজটা করছি তার জন্য এক ধরণের প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আর আমি না জেনে কিছু পাপ কাজ করে ফেলেছি, আমাদের জীবন চালাতে গিয়ে পাঁচ ধরণের পাপ কাজ করতেই হয়, তার জন্য আরেক ধরণের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। যেমন আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এতে অনেক জীব হানি হচ্ছে। এই পাপেরও তো প্রায়শ্চিত্তের দরকার। চলতে ফিরতে কাকে কোথায় কষ্ট দিয়েছি, কত পোকামাকড় পায়ের তলায় পিশে যাচ্ছে আমি নিজেও জানিনা, কিংবা মনে চিন্তার মাধ্যমে কত রকমের পাপ করছি জানিনা। এইগুলোকে ঠিক করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আরেক ধরণের হয় আমি জানি যে দোষ করেছি, হঠাৎ কোন কারণে আমি রেগে গেছি, রাগ হলে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, এখন রেগে গিয়ে আমার কোন গুরুজনকে অপমান করে দিয়েছি। রাগটা চলে যাওয়ার পর আমার মধ্যে অনুশোচনা হতে শুরু করল, আমি কেন মিছিমিছি গুরুজনকে অপমান করতে গেলাম। এই দুই ধরণের পাপ কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়। একাদশীর দিন আমি ঠিক করলাম আমি এই দিন নির্জলা একাদশী করব কিংবা ঠিক করলাম আমি পায়ে হেঁটে চার ধাম করব বা তীর্থ করব। এগুলো করে কি হবে? এগুলো হল প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, এই প্রায়শ্চিত্ত কর্ম দ্বারা আমার জান্তে বা অজান্তে যে পাপ কাজ করেছি সেগুলোকে কাটান হয়। এছাড়া অনেক ধরণের ব্রত আছে যেগুলো প্রায়শ্চিত্ত কর্মের মধ্যে পরে। জন্ম জন্মান্তরে কত কিছু ভুল কাজ করেছি সেগুলোকে পরিষ্কার করার জন্যই বেশীর ভাগ প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করা হয়।

দৈব ও ভাগ্যের ধারণা

কর্মের কথা বলার সাথে সাথে আরেকটি ব্যাপার এসে যায়, সেটাকে বলা হয় বিধান বা ভাগ্য, সংস্কৃতে বলা হয় দৈব। বাড়িতে আমার এমন এক পরিস্থিতি এসে গেছে যে হাতে একটিও টাকা পয়সা নেই, মন খারাপ করে বসে আছি। বন্ধু বান্ধবরাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে বলছে, আরে ভাই তোমার বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর কাছ থেকে আমি কিছু টাকা ধার করেছিলাম, তখন আমার খুব খারাপ অবস্থা হয়েছিল, এখন পরিস্থিতি শুধরে গেছে তাই এই দশ হাজার টাকা ফেরত দিতে চাই। এটাকে বলা হয় দৈব। আমি একটা কিছু পাওয়ার আশা করছি, কিন্তু আমি জানিও না যে এই রকম জিনিষ হতে পারে, কিন্তু দুম্ করে সেই জিনিষটা হয়ে গেল, যেটা আমাদের সবারই জীবনে আসে। রাস্থা দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একটা বাড়ির ইট এসে আমার ঘাড়ে পড়ল, বিদেশে হলে প্রথমে তারা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ছুটে যাবে, তারপর বাড়িওয়ালার নাম বার করবে যাতে তার বিরুদ্ধে একটা কেস ঠুকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। আর ভারতীয়রা প্রথমেই বলবে, আমি কোন কর্ম করেছিলাম যে ইটটা এসে আমার ঘাড়ে পড়বে। মানে ভারতীয়রা কর্মকে এত দূর নিয়ে চলে যায়। কর্ম দুই ভাবে চলে পুরুষকার মানে চেষ্টা আর প্রারব্ধ, যেটা পেছন থেকে হিসেবে আসছে। প্রারব্ধের অনেকগুলো পরিভাষা আছে, কেউ বলে দৈব, কেউ বলে কপাল বা ভাগ্য। শব্দের তারতম্য যাই থাকুক ভাবটা একই। এটাই পরের দিকে ভক্তিশাস্ত্রে বলা হতে থাকল ঈশ্বরের কৃপা বা ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু শব্দগুলি একই কথা বলছে, যে জিনিষটার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যেমন আমার জলতেষ্টা পেয়েছে আমি জল খেলাম, আমার জলতেষ্টা মিটে গেল, এখানে ভগবানের ইচ্ছার কিছু নেই, এটা হল কার্য কারণ সম্পর্ক। একটা কার্য করা হল, তার পেছনে একটা কারণ ছিল, তার একটা ফল হয়ে গেল, সব মিটে গেল। আরেকটা হচ্ছে, হবার কথা নয় কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কি একটা হয়ে গেল। এই ব্যাপারে মহাভারত কিন্তু কোন নিদান দিতে পারেনি। কর্ম বলবান না ভাগ্য বলবান, পুরুষকার বলবান না প্রারব্ধ বলবান, এর নিদান কিন্তু মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোকের কোথাও দেওয়া হয়নি। সেইজন্য আজও হিন্দুধর্মে এর কোন মীমাংসা নেই। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন – সাধনার পথে দু রকমের সাধক হয়, একজনের স্বভাব বেড়ালের ছানার মত, তার মা মুখে করে কখন তাকে হেঁসেলে রাখছে কখন ছাইয়ের গাদায় রাখছে, বেড়ালের ছানা শুধু মিউ মিউ করে মাকে ডেকে যায়, এটা হল পূর্ণ শরণাগতির ভাব। ভাগ্যে যা হবার হবে, মূল কথা হল প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দিয়েছে। আরেকজনের স্বভাব হল বানরের ছায়ের মত, সে মাকে আঁকড়ে ধরে আছে। এটা হল পুরোপুরি পুরুষকারের স্বভাব। দুই

সিনিয়র মহারাজ এই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন এই দুটোর মধ্যে ঠিক পথ কোনটি? এনাদের আলোচনাতে সিদ্ধান্ত হল, পথ বলে এখানে কিছু নেই, প্রত্যেক সাধকই কখন এদিকে যায় কখন ঐদিকে যায়, কখন সে বেড়ালের ছায়ের মত করে কখন বানরের ছায়ের মত করে। মহাভারত ঠিক তাই করে, কখনই সিদ্ধান্ত দেবে না যে, তোমাকে ভাগ্য চালাবে না পুরুষকার চালাবে।

দ্রোণাচার্য আর রাজা দ্রুপদ ছিলেন দুই বন্ধু, সেখান থেকে তাদের মধ্যে হয়ে গেল শত্রুতা। রাজা দ্রুপদকে দ্রোণাচার্য শিষ্যদের নিয়ে আক্রমণ চালালেন, রাজা দ্রুপদ হেরে গেলেন। এখন দ্রোণাচার্যকে বধ করার জন্য রাজা দ্রুপদ এক যজ্ঞ করলেন। দ্রোণাচার্য জানতে পারলেন দ্রুপদ রাজা একটা যজ্ঞ করেছেন, সেই যজ্ঞ থেকে দ্রৌপদী আর ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হল। কিসের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হল? দ্রোনাচার্যকে বধ করার জন্য। ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজকুমার, তাকে কার কাছে পাঠানো হবে অস্ত্রবিদ্যা শেখার জন্য? দ্রুপদ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে গেছেন রাজকুমারকে অস্ত্রবিদ্যা শেখানোর অনুরোধ করতে। অথচ দুজনের মধ্যে মারামারি, দ্রোণাচার্য খেতে পারছে না, সাহায্যের জন্য দ্রুপদ রাজার কাছে গেছে, কারণ তারা দুজনে একই গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়েছিল, সেখানে তাদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। রাজা দ্রুপদ এখন দ্রোণাচার্যকে বার করে দিয়েছে, যখন বন্ধু ছিলাম তখন ছিলাম এখন আমি রাজা আর তুমি সামান্য একজন ব্রাহ্মণ। দ্রোণাচার্য তখন কি করল? নিজের শিষ্য, কৌরব আর পাণ্ডবদের দিয়ে আক্রমণ করিয়ে দ্রুপদকে বন্দী বানিয়ে প্রতিশোধ নিলেন। তখনতো খুব বলছিলে বন্ধুত্ব সমানে সমানে হয়, এবার আমরা সমানে সমানে আছি। কিন্তু আমি তোমাকে বন্ধুর মত সম্মান দিচ্ছি, এই নাও তোমার রাজ্য, আমি ফেরত দিয়ে দিলাম। দ্রুপদ ভেতরে ভেতরে খুব অপমানিত বোধ করল, সেও এবার প্রতিশোধ নেবার জন্য একটা যজ্ঞ করল। যজ্ঞ করানই হল দ্রোণাচার্যকে বধ করার জন্য। সেখান থেকে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হল। নিজে তো কিছু করতে পারলো না, সন্তানকে দিয়ে বদলা নেবে। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের সেনাপতি হয়েছিল, আর ধৃষ্টদ্যুম্নের অধীনেই পাণ্ডবদের জয় হয়েছিল। এই ধৃষ্টদ্যুম্নকেই অস্ত্রশিক্ষার জন্য রাজা দ্রুপদ নিয়ে গেলেন দ্রোণাচার্যের কাছে, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যে একে অস্ত্রশিক্ষা দিতে পারে। দ্রোণাচার্যও রাজী হয়ে গেলেন। লোকেরা এসে দ্রোণাচার্যকে বলছে, এর জন্মই হয়েছে আপনাকে বধ করার জন্য, একে আপনি কি করে শিক্ষা দিতে রাজী হয়ে গেলেন। দ্রোণাচার্য তখন বলছেন – আমার ভাগ্যে যদি লেখা থাকে এর হাতে আমার বধ হবে, তা আমি চেষ্টা করলেও এর হাত থেকে বাঁচবো না, তাই আমি আমার ধর্মকে কেন বিসর্জন দিতে যাবো। আমি আচার্য, আমার কাজই হোল শিক্ষা দেওয়া। আমার কপালে যদি লেখা থাকে এর হাতে আমার মৃত্যু, আমি যদি একে শিক্ষা নাও দিই তাতেও আমি এর হাতে মরব, তাহলে আমি আমার ধর্মকে ছাড়বো কেন। এইটাই হল মহাভারতের মৌলিকত্ব। তুমি যখন জেনে গেছ তোমার ভাগ্যে এর হাতে তোমার মৃত্যু, সে কিন্তু ছাড়বে না। কর্ণকে এতো সম্মান কেন করা হয়? সেও জানে যে মরবে, তাঁর গুরু পরশুরাম অভিশাপ দিয়ে রেখেছিলেন, আসল মুহূর্তে তুমি তোমার এই বিদ্যা ভুলে যাবে। তার মা কুন্তি বোঝাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন, ভীষ্ম বোঝাচ্ছেন, কর্ণ জানে আমার মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু তাও তার মিত্রধর্ম ছাড়লো না।

গান্ধীজীরও এই রোগ ছিল, যদিও আমরা মহাভারত থেকে সরে যাচ্ছি। গান্ধীজী এক সময় বলতে শুরু করলেন, যত ধরণের পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি আছে এগুলো একটা পাপ। তিনি নেচারোপ্যাথিকে আঁকড়ে থাকলেন। ওনার স্ত্রীর নিউমোনিয়া হয়েছে, ডাক্তাররা বারবার বলছে, এনাকে পেনিসিলিন দিলে এক্ষুণি সেরে যাবে। গান্ধীজী কিছুতেই দিতে দেবেন না। শেষ মুহূর্তে গান্ধীজীর ছেলে কাউকে না বলে কলকাতা থেকে এ্যারোপ্লেনে করে পেনিসিলিন আনিয়েছিলেন, তাও মৃত্যুর একদিন আগে। গান্ধীজী জানতে পেরে খুব রেগে গিয়েছিলেন। বলছেন, মরে যাবে তো মরে যাবে কিন্তু সে নিজের ধর্মকে যেন না ছাড়ে। কি ধর্ম? নেচারোপ্যাথি। একদিন পর স্ত্রী মারা গেলেন, মৃত্যুর পর গান্ধীজী বলছেন, আমার স্ত্রী আমার কোলেই মাথা রেখে মারা গেলেন আর মৃত্যুর সময়ও সে ধর্মকে ছাড়লো না। বলছেন পেনিসিলিন দিলেও সে মরবে, আজকে না মরলে দশ বছর বা কুড়ি বছর পর কোন এক সময়ে তো মরতে হবে, কিন্তু যে ধর্মের জন্য দাঁড়িয়ে আছে সেই ধর্মকে ছাড়ল না। ধর্মকে ধরে রাখা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিণ। যারা ধর্মকে ধরে রাখে তারা মৃত্যুকেও নির্বিকার ভাবে নেয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ এই জিনিষগুলিকে ধরতে পারবো না। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল, তিনি এথেন্সের যুবকদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছেন। সক্রেটিসকে বিষ খাইয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। সক্রেটিসের প্রধান শিষ্য প্লেটো মাথা খাটিয়ে প্ল্যান করে নিয়েছে কিভাবে সক্রেটিসকে জেল থেকে বার করে পালিয়ে নিয়ে যাবে। সক্রেটিসকে জানানো হল আপনার জন্য সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়ে গেছে। সক্রেটিস প্লেটোকে বলছেন – আমি যে মূল্যবোধের জন্য এতদিন দাঁড়িয়েছিলাম, এই শেষ মুহূর্তে তুমি সেটা আমার থেকে কেড়ে নিতে চাইছ? তুমি এখান থেকে চলে যাও। তাঁর স্ত্রী এসে সেই সময় কাঁদছে। সক্রেটিস বলছেন – ওকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাও, আমাকে যেন

বিরক্ত না করে। জেলরকে ডেকে বলছেন সময় হয়ে গেছে আমাকে বিষ দাও। কূট বিষের পাত্র সক্রেটিসের হাতে তুলে দেওয়া হল। তিনি ঘট্‌ঘট্‌ করে সেটাকে পান করে নিলেন। পান করে খুব সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করছেন – শরীরের এই বিষকে তাড়াতাড়ি ছড়ানোর জন্য কি করতে হয়? জেলর বলল, পায়চারি যদি করতে থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাবে। সক্রেটিস পায়চারি করতে আরম্ভ করে দিলেন। তখনও তিনি প্লেটো আর বাকি শিষ্যদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর শিষ্যরা হাউহাউ করে কাঁদছে। সেই মুহূর্তে তিনি একজন শিষ্যকে বলছেন, আরে আমি অমুক লোকের কাছ থেকে অমুক জিনিষ কিনেছিলাম, তার দাম দেওয়া হয়নি ঐ দামটা মিটিয়ে দিও। এই কথা বলেই বলছেন, আমার শরীরটা শিথিল হয়ে আসছে। তিনি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, কয়েক সেকেণ্ড পর মারা গেলেন। তিনি তো পালিয়ে যেতে পারতেন। তিনি যদি পালিয়ে যেতেন সক্রেটিস আমার আপনার মতই একজন সাধারণ হয়ে থাকতেন, তার কথা আমরা এখানে আর আলোচনা করতে যেতাম না। গান্ধীজী যদি স্ত্রীকে পাশ্চাত্য চিকিৎসায় চিকিৎসা করাতেন তাহলে আজকে আমরা এখানে ওনার নাম নিতাম না। যখন তিনি একটা ধর্মকে ধরে নিয়েছেন তখন তার বউ মরুক, তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হোক তাতে তার কিছুই আসবে যাবে না। তখনই তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চয় হয়, তখনই সমস্ত মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। এখন যদি কোন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি সন্ন্যাসী কেন হলেন? বিয়ে করলেই তো পারতেন। এগুলো একই জিনিষ। মহৎ শব্দের একটাই অর্থ তিনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ধর্ম মানে কি? ধর্মতো বৈপিরত্যের সমাবেশ। মহম্মদের যারাই বিরোধিতা করছিল তলোয়ার নিয়ে তাদেরই গলা কেটে দিতে লাগলেন, আর যিশু যারা ওনার বিরোধী তারা তাঁকে ক্রুশিফাইড করে দিচ্ছেন, তিনি বলছেন তুমি আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করতে চাইছো, ভালো কথা করে দাও। আমরা মহম্মদকেও পূজো করছি যিশুকেও পূজো করছি। ঠাকুরের তিথি পূজোর দিন মহম্মদের নামেও ভোগ দেওয়া হবে আবার যিশুর নামেও ভোগ দেওয়া হবে। শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণ দুজনেরই বিপরীত চরিত্র কিন্তু আমরা দুজনকেই পূজো করি। এনারা একেকটি ধর্মকে ঠিক করে নিয়েছিলেন, এটাই আমার ধর্ম এর থেকে আমি কোন কিছুতেই সরে আসব না। গান্ধীজী ঠিক করে নিলেন আমি সত্য আর অহিংসার ধর্মকে মেনে চলব, এখন তিনি কোন পরিস্থিতিতেই সত্য থেকে সরছেন না, মাথা ফাটিয়ে দিলেও তিনি অহিংসাকে ধরে রেখেছেন। তিনি ঠিক করলেন আমি এ্যালোপ্যাথিতে চিকিৎসা করবো না, এখন তিনি যদি এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাতে যান তাহলে ওখানেই তাঁর সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। গান্ধীজী গরুর দুধ খাবেন না, তার জন্য ছাগল নিয়ে আসা হল। গান্ধীজী বলে দিলেন আমি ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে চাপবো না, থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে যাব। বিলেতে যখন গেলেন সেখানে ওরা বলে দিল এখানে থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট হয় না, শুনে তিনি বলে দিলেন হয় না তো আমি পায়ে হেঁটে যাবো। তখন গান্ধীজীর জন্য ওরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট সরিয়ে থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট তৈরী করাল। এই নিয়ে খবরের কাগজে কত লেখালেখি। গান্ধীজী বলে দিলেন, যে যাই বলুক আমি আমার সত্য থেকে বিচলিত হব কেন। আমরা মনে করতে পারি গান্ধীজী একগুঁয়ে লোক ছিলেন, কিন্তু এটাই ধর্ম। গান্ধীজীর নামে যত নিন্দা স্তুতি হয় সবাই এটাকে নিয়েই করে। যদি কেউ বলে গান্ধীজী বউয়ের চিকিৎসা যদি এ্যালোপ্যাথিতে করাতেন তাহলে এমন কি হত, তাহলে এটাও বলা যেতে পারে কর্ণের কি দরকার ছিল যুদ্ধ করার, সেতো পাণ্ডবদের বড় ভাই ইচ্ছে করলেই কর্ণই রাজা হয়ে দিব্যি রাজ করতে পারতো। কর্ণ যদি আজকে দুর্যোধনকে ছেড়ে চলে আসতো তাহলে আমরা কি আর শাস্ত্রীয় কথা পড়তে আসতাম। এটাই ধর্ম, সেইজন্য বলা হয় গহনা ধর্মো হি গতিঃ, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। আমি আপনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কিনা পাঁচশো বছর পর জানা যাবে, তার আগে কিছুই জানা যাবে না। দেশে এতো বিধবা যারা কত কঠোর সংযম জীবন যাপন করছে, নিরামিষ খাচ্ছে, কোন পুরুষের সঙ্গ করে না, কিন্তু কই তাদের নামে তো কেউ পূজো করে না, অথচ শ্রীশ্রীমার পূজো সবাই করছে।

সাবিত্রীর ক্ষেত্রে আবার উল্টো হচ্ছে, সাবিত্রী জেনে গেছে আমার স্বামী এক বছর পর মারা যাবে, দৈব নির্ধারিত হয়ে আছে। সাবিত্রী বলে দিল আমি দৈবকে পাল্টে দেব। মুখে কাউকে কিছু বলছে না, মনে মনে ঠিক করে সে তার সাধনা শুরু করে দিল। শেষে কায়দা করে যমরাজকে বাকজালে ফাঁসিয়ে বর নিয়ে সত্যবানের প্রারব্ধকে পাল্টে দিল। কিন্তু কর্ণের দৈব পাল্টালো না, যদিও সে ধর্মে অবস্থিত ছিল, দ্রোণাচার্যের দৈব পাল্টালো না, যদিও তিনি ধর্মে অবস্থিত ছিলেন অথচ সাবিত্রী ক্ষেত্রে পাল্টে গেল। এর নিষকর্ষটা কি দাঁড়ালো। কিছুই না। সাবিত্রী পতিধর্মকে নিলেন, আমি পতিধর্ম পালন করে যাবো, এরপর স্বামী যদি মারা যায় আমার কিছু করার নেই, স্বামী যদি বেঁচে যায় তাও আমি পতিধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকবো। দ্রোণাচার্য বললেন আমি ধর্ম ছাড়বো না, তিনি মরে গেলেন, তাতে কি হল? যাই হয়ে যাক না কেন আমি ধর্ম থেকে নড়বো না। মহাভারতের বৈশিষ্ট্য এটাই। কর্ম ফল দেয় কিনা, পুরুষকার বড় না প্রারব্ধ বড় এগুলোর কোন গুরুত্ব

নেই, সব থেকে বড় হল ধর্ম, তুমি যেটাকে ধর্ম বলে ঠিক করে নিয়েছ সেটাতেই তুমি অবস্থিত থাকতে পারছ কিনা। মহাভারতের এটাই মূল বক্তব্য।

আদিপর্ব

মহাভারতের প্রার্থনা মন্ত্র

মহাভারত শুরু হচ্ছে বিখ্যাত একটি মন্ত্র দিয়ে – ***নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।*** যিনি ভগবান, তিনি নিজেকে নর ও নারায়ণ এই দুটো অংশে বিভক্ত করে নিলেন। নর ও নারায়ণ দুজনই ঋষি এবং এনারা বদ্রিকাশ্রমে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তপস্যায় রত। বেদের সময়ে অবতারের ধারণা ছিল না। আগেকার দিনে ছিলেন ঋষি, এনারা ছিলেন খুব উচ্চস্তরের বিরাট ঋষি। যোগশাস্ত্রে বর্ণনা আছে, যখন কেউ সাধনা করে করে এমন এক স্তরে পৌঁছে যান যে অবস্থায় তাঁর মধ্যে স্রষ্টার সমান ক্ষমতা চলে আসে, তিনি ক্ষমতাকে প্রয়োগ করেন না কিন্তু ক্ষমতাটা চলে আসে। সেইজন্য তাঁদের ঋষি বলা হয়, যিনি ঋষি তিনিই ভগবান, যিনি ভগবান তিনিই ঋষি, এটাই আমাদের প্রাচীন ধারণা। পরের দিকে দেখা গেল সব ঋষিরই ভগবান বা স্রষ্টার মত ক্ষমতা হয় না। তখন ঋষিদের একটা অংশকে আলাদা করে দেওয়া হল। তখন থেকে ঋষি ভগবানের থেকে একটু নীচে চলে এলেন এবং ভগবান ঋষির থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। যদিও নর ও নারায়ণ ঋষি একই সত্তার দুটো অংশ কিন্তু পরের দিকে নারায়ণ ঋষিকে নর ঋষির থেকে অল্প একটা উঁচু স্থান দেওয়া হল, নর ঋষি যেন ছোট ভাইয়ের মত হয়ে গেলেন। বর্তমান যুগে বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ নারায়ণ ঋষি আর স্বামী বিবেকানন্দ নর ঋষি। ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ হলেন নারায়ণ ঋষি আর অর্জুন হলেন নর ঋষি। তবে পৌরানিক কাহিনীকে নিয়ে বেশী টানাটানি করলে অনেক কিছু মিল খাবে না। যেমন ঠাকুর আবার স্বামী যোগানন্দকে বলছেন অর্জুনের অংশ। তাই যদি হয় তাহলে স্বামী যোগানন্দ নর ঋষি হয়ে গেলেন, অন্য দিকে তাহলে স্বামীজীর কি হবে। এগুলো বেশীর ভাগই স্তুতি বাক্য, কারুকে প্রশংসা করার জন্য অনেক সময় এগুলো বলা হয়, তাই বলে সব কিছু যে বিজ্ঞানের হিসাবের মত মিলে যাবে তা নয়।

প্রার্থনা মন্ত্রে বলা হচ্ছে – আমরা এখন গ্রন্থের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি, এই গ্রন্থের নাম জয়, জয়মুদিরয়েৎ। মহাভারত গ্রন্থের তিনটে নাম, জয়, ভারত ও মহাভারত। মহাভারতের বেশীর ভাগ অংশকেই জয় বলা হয়। পরের দিকে ভরত বংশের কাহিনীর কথা বলা হয়েছে বলে একে ভারত নামে সম্বোধন করা হত। জয় ও ভারত এই নামের মধ্যে যাতে কোন সংশয় না হয় তাই পরে একে মহাভারত নামেই অভিহিত করা হতে থাকে। কিন্তু গ্রন্থ যখন শুরু হচ্ছে তখন জয় বলেই সম্বোধিত করা হচ্ছে।

মহাভারত পাঠ করার পূর্বে এঁদেরকে প্রণাম করে পাঠ্যারম্ভ করতে হবে। নারায়ণং নমস্কৃত্য, নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করবে, নরঞ্চৈব নরোত্তমম্, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর ঋষিকে প্রণাম করবে। তার মানে, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করবে আর অর্জুনকে প্রণাম করবে, এই দুই মহান ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে মহাভারত হবে না। দেবীং সরস্বতীং, দেবী সরস্বতীর কৃপা না থাকলে মহাভারত পাঠ করা যাবে না আর ব্যাসম্, ব্যাসদেবকে প্রণাম করবে। এই শ্লোকটি ব্যাসদেবের রচিত নয়, পরে ওনার কোন শিষ্য রচনা করে এখানে সংযোজন করে দিয়েছেন। ব্যাসদেব কখনই বলতে যাবেন না যে, এনাদের সবার সাথে আমাকেও প্রণাম কর। ঠাকুর বলছেন আমাকে বকল্মা দাও, ঠাকুর বলছেন এই ছবি পরে ঘরে ঘরে পূজো হবে, ঠাকুর ভগবানের অবতার তাই তিনি এই রকম কথা বলতে পারেন, ব্যাসদেব কিন্তু ভগবান নন তাই উনি এইভাবে বলতে পারেন না। যখনই মহাভারত পাঠ করবে তখনই সর্ব প্রথমে এই চারজনকে প্রণাম করবে – শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, মা সরস্বতী এবং ব্যাসদেবকে।

নৈমিষারণ্যে তপোভূমিতে শৌনক ঋষি ছিলেন। তিনি সেই সময়কার একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন। শৌনক ঋষি একটা যজ্ঞ করবেন, যে যজ্ঞ বারো বছর ধরে চলবে। তখনকার দিনে লোমহর্ষণ নামে একজন বড় সূত ছিলেন। সূত একটা বিশেষ সম্প্রদায়। বৈদিক যুগে চারটি বর্ণের কথা আমরা জানি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এমনিতে যদিও বর্ণের বাইরে বৈবাহিক সম্পর্কের নিয়ম ছিল না, কিন্তু অসবর্ণের মধ্যেও বিবাহ হত। অসবর্ণের মধ্যে বিবাহের ফলে সমাজে অনেক রকম সমস্যা হতে শুরু হল। আলাদা বর্ণের বিবাহ যদিও বা মেনে নেওয়া হত কিন্তু তার বাইরে গিয়ে আলাদা ধর্মের মধ্যে বিবাহ আরও গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে। পার্সিদের মধ্যে পুরোহিত বংশের যারা একমাত্র তারাই পার্সিদের ফায়ার টেম্পেলে পূজো করতে পারবে। পুরোহিত বংশের কোন ছেলে যদি কোন ভাবে অন্য ধর্মের কারুকে বিবাহ করে

নেয় সে কিন্তু আর মন্দিরে পূজো করতে পারবে না, এমনকি তার সন্তানরাও পূজো করতে পারবে না। কিন্তু ঐ সন্তান যদি কোন পার্সিকে বিবাহ করার পর তার যে সন্তান হবে সে আবার মন্দিরে পূজো করার অধিকার পাবে। ধর্ম এতো পবিত্র জিনিষ বলে ধর্মকে নিয়ে আগেকার দিনে নিজের মত খেলা করতে দেওয়া হতো না। এখনও ভারতের কোন পুরোহিতের ছেলে বিজাতীয় মেয়েকে বিবাহ করার যদি পর পুরোহিতের কাজ করতে আসে গ্রামের লোকেরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা। পাঁচ হাজার দশ হাজার বছরের সংস্কারকে মানুষ সহজে ছাড়তে পারেনা।

অসবর্ণ বিবাহ ও তৎকালীন সমাজ

আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচল ছিল। ব্রাহ্মণরা বেশীর ভাগই দরিদ্র ছিলেন বলে অনেকেই ব্রাহ্মণদের মেয়ে দিতে চাইতো না। এর ফলে ব্রাহ্মণদের মনটা নীচু জাতের মেয়ের দিকে চলে যেত। এরা অনেক সময় ক্ষত্রিয় মেয়ে বা বৈশ্য মেয়েকে বিয়ে করে নিত এমনকি অনেককে শূদ্র মেয়েকেও বিয়ে করতে দেখা যেত। আমাদের শাস্ত্রে অন্য জাতের মেয়েকে বিবাহ করার অনুমতি দিচ্ছে কিন্তু ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মধ্যে বিবাহকে অনুমতি দেওয়া হতো না। আর শূদ্র যদি কোন ভাবে ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করে নেয় তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত, এদের সন্তানকে চণ্ডাল বলে সমাজের বাইরে বার করে দেওয়া হত। তখন বিভিন্ন দিক থেকে ভারতে অন্যান্য বহিরাগত জাতিগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটছিল, এদের সাথে মেলামেশাও চলতে থাকল। কিন্তু ভারত প্রথম থেকে খুব গোঁড়া ধর্মীয় কাঠামোর মধ্য দিয়ে নিজেদের সংরক্ষিত করে বিকশিত হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও বাইরে থেকে যারা আসছিল গোঁড়া হিন্দু পরিবার থেকে কোন ছেলে বা মেয়ে তাদের কাউকে বিয়ে করে নিত, এখন এদেরকে ধর্মের অধিকার কতটা দেওয়া যেতে পারে, এই নিয়ে গভীর সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। মনু স্মৃতিতে এই সমস্যাকে নিয়ে নাড়াচাড়া দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণের যদি চারটে স্ত্রী থাকে, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনটে বর্ণের যদি থেকে থাকে তাহলে সম্পত্তি বিভাজনের জন্য কে কত অংশ পাবে মনুস্মৃতিতে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে শূদ্রকে নিয়ে কোন প্রশ্নই হবে না, তবুও বলা আছে শূদ্র স্ত্রীর জন্য এত পরিমাণ সম্পত্তির অংশ রাখতে হবে। মহাভারতেই আছে এক ব্রাহ্মণ খুব আক্ষেপ করে বলছে, আমি মহাপতিত, আমি এক শূদ্রাকে বিয়ে করেছি, তার গর্ভ থেকে আমার সন্তান হয়েছে, আমি মহা পাপী, পাতক। অন্য দিকে মনুস্মৃতিতে বলা হচ্ছে, তুমি যদি কোন শূদ্রাকে বিয়ে করে থাক তাহলে তার দেখাশোনার জন্য তোমার সম্পত্তির এত পরিমাণ অংশ তোমাকে তার জন্য রেখে দিয়ে যেতে হবে। এইখানেই বোঝা যায় মহাভারত মনুস্মৃতির আগে রচিত হয়েছে। অথচ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনুস্মৃতির ব্যাপারে বলছে পাঁচ থেকে ছয় খ্রীষ্টপূর্বে মনুস্মৃতি লেখা হয়েছে আর মহাভারত তিন খ্রীষ্টপূর্বে লেখা হয়েছে। একদিকে বলছে মহাভারতের চিন্তাধারা মনুস্মৃতির আগের, যখন রচনাকালের হিসেব করছে তখন বলছে মনুস্মৃতির পরে মহাভারত রচনা হয়েছে, এটা কি করে সম্ভব? এই কারণেই বলা হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথাকে গ্রাহ্যের মধ্যে ধরতে নেই।

সূত জাতি ও তাদের সামাজিক অধিকার

ব্রাহ্মণের ছেলে বা মেয়ের সাথে ক্ষত্রিয়ের মেয়ে বা ছেলের বিয়ের পর তাদের যে সন্তান হত সেই সন্তানকে বলা হত সূত। সূত আবার তিন রকমের হত, শাস্ত্রে এই তিনটেকে পরিষ্কার করে বিভাজন করে দেওয়া হয়েছে। এক ধরণের সূত হল, যারা সারথির কাজ করত, রথের দড়িটা ধরে রাখত বলে এদেরকে সূত্রধরও বলা হয়। দ্বিতীয় সূতরা মন্ত্রীর কাজ করত। তৃতীয় সূত হল, সূতেদের মধ্যে যারা পাণ্ডিত্য অর্জন করত তখন এদের ব্রাহ্মণের মতই সম্মান করা হত কিন্তু এদের বেদের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছিল, এরা বেদ পাঠ করতে পারবে কিন্তু বেদ পড়াতে পারবে না, যজ্ঞ করাতে পারবে না। অর্থোপার্জনের প্রধান উৎসকেই বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন এদের জীবিকা চলবে কি করে? তাই এদের জন্য বলা হল তুমি ইতিহাস আর পুরানাদি পাঠ করে শোনাতে পারবে।

মহাভারতে তিনজন খুব নামকরা সূতের উল্লেখ পাওয়া যায়, এরমধ্যে একজন হল অধিরথ, যার সন্তান কর্ণ, এই কারণে অনেক জায়গায় কর্ণকে সূতপুত্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় হলেন সঞ্জয়, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের একাধারে মন্ত্রী ও সারথির কাজ সামলাতেন। তৃতীয় সূত হলেন লোমহর্ষণ, যিনি পুরান ইতিহাসে বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। লোমহর্ষণের নাম মহাভারতে যেমন আসে অন্য দিকে পুরানেও তাঁর নাম পাওয়া যায়, তিনি যদিও বিরাট পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু বেদ পড়াবার ও যজ্ঞ-যাগ করাবার অধিকার তাঁর ছিল না। তিনি জন্ম থেকেই জানতেন আমার এগুলোতে অধিকার নেই। তিনি যদিও সূত ও ব্রাহ্মণদের থেকে নীচ কুলের কিন্তু তাঁকে প্রচণ্ড সম্মান দেওয়া হত।

লোমহর্ষণের সন্তান ছিলেন উগ্রশ্রবা। সেই উগ্রশ্রবা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শুনলেন নৈমিষারণ্যে বিরাট বড় যজ্ঞ হচ্ছে, তিনিও যজ্ঞ দেখার জন্য নৈমিষারণ্যে পৌঁছেছেন। সেখানকার ঋষি মুনিরা তাঁকে সম্মান দিয়ে প্রণামাদি করে আপ্যায়ন করে বলছেন – আপনি মহাভারতের কথা আপনার পিতা লোমহর্ষণের কাছে শুনেছেন, বৈশম্পায়নের কাছে শুনেছেন, আপনি আমাদের মহাভারতের কথা শোনান। এবার সৌতি মহাভারতের কথা বলতে শুরু করেছেন। আমরা যে মহাভারত পাই সেটা সৌতির মুখে পাচ্ছি, সৌতি বলছেন তিনি যেমনটি বৈশাম্পয়নের কাছে শুনেছেন, বৈশম্পায়ন বলছেন তিনি যেমনটি ব্যাসদেবের মুখে শুনেছি। পুরো মহাভারতের কাহিনী এই তিনটে স্তরে চলতে থাকবে।

ব্যাসদেবের জন্মের ইতিহাস

সৌতি প্রথমেই গ্রন্থ মহিমা বর্ণনা করছেন – *আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে। আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।।*(১/১/২৬)। মহাভারতের যে ইতিহাস তাকে অনেক কবিরা আংশিক বর্ণনা করেছেন, এখনও অনেকেই বর্ণনা করছেন এর পরেও মহাভারতের কথা অনেকেই বর্ণনা করবেন। কিন্তু ব্যাসদেবের মূল মহাভারতের সাথে এগুলো কোনটাই কোন দিন তুলনা করা যাবে না। সৌতিও এরপর বর্ণনা করছেন মহাভারতের বিষয় বস্তুগুলি কিভাবে কিভাবে ব্যাসদেবের মাথায় এসেছে। ব্যাসদেব ছিলেন পরাশর মুনির সন্তান। পরাশর ছিলেন বিরাট বড় ঋষি আর তাঁর ছিল বিশাল যোগশক্তি। একবার কিভাবে কিভাবে এক মৎসগন্ধা মেয়ের প্রতি পরাশর ঋষি আকৃষ্ট হয়ে যান। তিনি এক কুয়াশার সৃষ্টি করে মৎসগন্ধাকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। যে সন্তান জন্ম নিল, সেই সন্তান ঋষি সন্তান, শুধু ঋষি সন্তানই নয়, বৈবাহিক সূত্রে সন্তানের জন্ম হয়নি এই সন্তান হল ভালোবাসার সন্তান। পরাশর ঋষি নিজের পুরো যোগশক্তি সন্তানের উপর ছেড়ে দিলেন। ব্যাসদেব জন্ম নিতেই বেদ, উপনিষদ, বেদাঙ্গ থেকে শুরু করে যত রকমের শাস্ত্র আছে তার পূর্ণ জ্ঞান তাঁর মধ্যে এসে গিয়েছিল। উনি মাকে প্রণাম নিবেদন করে বলে দিলেন, আমার এই জগতের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, আমি তপস্যায় চললাম, তবে তুমি যখনই চাইবে আমি তখনই তোমার সেবার জন্য হাজির হয়ে যাব। পরের দিকে কাহিনীতে দেখা যায় এই ব্যাসদেব থেকেই ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হয়েছে। ভারতে প্রত্যেকটি জিনিষকে এমনকি সন্তান উৎপত্তিকেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা হত।

মহাভারতের কূটশ্লোক ও ভগবান গণেশ

ব্যাসদেবের মনে যখন মহাভারত রচনা করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল তিনি তখন চাইছিলেন খুব দ্রুত গতিতে রচনা করে শেষ করতে হবে, তাঁর বয়সও হয়ে আসছিল। তিনি তখন ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন, ব্রহ্মা আবার গণেশজীর নাম সুপারিশ করলেন। গণেশজীকে রাজী করান হল কিন্তু তিনি একটা শর্ত আরোপ করে দিলেন, আমার লেখা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমি কিন্তু আর লিখবো না, তার মানে ব্যাসদেবকে অনর্গল শ্লোক তৈরী করে বলে যেতে হবে। তখন ব্যাসদেবও একটা শর্ত রাখলেন, আমার প্রত্যেকটি শ্লোকের অর্থকে বুঝে নিয়ে লিখতে হবে। বলা হয় মহাভারতে আট হাজার আটশটি কূট শ্লোক আছে, কূট মানে যার অর্থ খুব জটিল ও বুঝতে গেলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দরকার হয়। ব্যাসদেব মাঝে মাঝে একটা করে কূট শ্লোক তৈরী করে গণেশকে বলে দিতেন, গণেশ ঠাকুর যতক্ষণ চিন্তা করতে থাকছেন এই শ্লোকের কি অর্থ, সেই অবসরে ব্যাসদেব পঞ্চাশটি শ্লোক মনের মধ্যে তৈরী করে রাখতেন। পরম্পরার মতে বলা হয় মহাভারত রচনা করতে ব্যাসদেবের তিন বছর লেগেছিল। তিন বছরে যদি এক হাজার দিন ধরা হয় তাহলে প্রতিদিন তিনি গড়ে একশটি শ্লোক রচনা করতেন। ব্যাসদেবের মত বিরাট কবি ও পণ্ডিত, যিনি এত কিছু রচনা করেছেন, বেদের বিভাজন করেছেন, তাঁর পক্ষে দিনে একশটি শ্লোক রচনা বিরাট কিছু নয়।

ব্রহ্মাকে ব্যাসদেবের মহাভারতের বিশেষত্ব বর্ণন

ব্যাসদেব মহাভারতকে প্রথমে মনে মনে রচনা করে রেখেছিলেন। এরপর তিনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন এই এত বড় রচনাকে তিনি কিভাবে কাকে দিয়ে লেখাবেন। সেই সময় ব্রহ্মা এসে হাজির হয়েছেন। ব্যাসদেব তখন নিজে থেকেই ব্রহ্মাকে মহাভারতের বিশেষত্বগুলি বলতে শুরু করলেন *ব্রহ্মান্ বেদরহস্যং চ যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া। সাঙ্গোপনিষদং চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া।।*১/১/৬২। হে পিতামহ ব্রহ্মা, এই মহাকাব্যে আমি বেদের সম্পূর্ণ রহস্যকে রেখেছি, এই লোকে যত রকমের শাস্ত্র হতে পারে, সব শাস্ত্রের সার এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তখনকার দিনে একটা সমস্যা ছিল যে, বেদ, উপনিষদ আর বেদাঙ্গ ছিল একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদের জন্য, গুরু যাকে তাকে বেদ উপনিষদের শিক্ষা দিতেন না, ব্যাসদেব এই সমস্যাটাকে ভালো করেই জানতেন। এই অবস্থায় একজন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যার মনে

ভোগের বাসনা আছে কিন্তু এখন সে জানতে চাইছে এইসব শাস্ত্রে কি আছে। ব্রাহ্মণদের কাছে গেলে তাঁরা উপেক্ষা করে বলে দিতেন, তোমার জন্য বেদ নয়। এখন এরা তাদের ধর্মের কথা কোথায় জানতে যাবে। ব্যাসদেব তখন মহাভারত রচনা করে বলে দিলেন, এই নাও তোমার জন্য এই শাস্ত্র তৈরী করে দিলাম, তোমার বেদ পাঠ নিষেধ কিন্তু বেদের যা যা বক্তব্য তার সবটাকে আমি নিজের মত সাজিয়ে তোমার জন্য রচনা করে দিলাম। এর মধ্যে তুমি শুধু বেদই পাবে না, বেদাঙ্গের ছটি অঙ্গই পাবে, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকারণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ সবটাই পাবে।

আমাদের যে আঠারোটি পুরান আর তাতে যত কাহিনী আছে সেগুলো সবই ব্যাসদেবের মনের কল্পনা নয়, বেশীর ভাগ কাহিনী আগে থাকতেই সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ব্যাসদেব এই কাহিনীগুলিকে নিয়ে কাব্যিক ছন্দে সাজিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি কাহিনীগুলিকে সংগ্রহ করে নিজের কাব্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। মহাভারতের মত মহাকাব্যে ব্যাসদেব কি কি বর্ণনা করেছেন তারই বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন ব্রক্ষাকে – জীবনের অসারত্বের কথা, বিভিন্ন লোকের আশ্রমের কথা, বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের সমস্ত তীর্থের মাহাত্ম্য ও ইতিহাসের বর্ণনা করা হয়েছে, শহর কিভাবে তৈরী করা হবে, দুর্গ কিভাবে নির্মাণ করা হবে, লোকব্যবহারে জন্য কি কি দরকার এই সব কিছুর বর্ণনা এতে দেওয়া হয়েছে। ব্যাসদেব বলছেন – আমার মনে হয় আমার পরে এই ধরণের গ্রন্থ আর কেউ রচনা করতে পারবে না। ব্যাসদেবের কথা শোনার পর ব্রক্ষা বলছেন – এই জগতে যত মুনি ঋষি আছেন সবার থেকে তুমি শ্রেষ্ঠ, তার কারণ জীব, জগৎ আর ঈশ্বর এই তিনটে তত্ত্বকে তুমি যেভাবে উপলব্ধি করে এই তিনটের ব্যাপারে যেভাবে বুঝেছ এই ভাবে অন্য কেউ জানেনা। তোমার মুখ থেকে কখন সত্য ছাড়া কোন মিথ্যা কথা উচ্চারিত হয়নি। সেইজন্য তোমাকে আমি বলছি, ভবিষ্যতে সংসারে বড় বড় কবিরা এই বিষয়গুলিকে নিয়ে অনেক কিছু রচনা করবে কিন্তু তোমার মত কেউ রচনা করতে পারবে না।

পরীক্ষিৎএর প্রতি ঋষিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপ

আদিপর্বে অনেক কিছুর বর্ণনা করা হচ্ছে, মহাভারতের মূল কাহিনীটাকে প্রথমে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হচ্ছে। মহাভারতে যুদ্ধের সময় অক্ষৌহিণী শব্দটা বার বার আসবে। এই অধ্যায়ে অক্ষৌহিণীর সংখ্যার বর্ণনা করা আছে। তারপর রথী, অধিরথী, মহারথী কেমন হয়। প্রথমের দিকে যত বর্ণনা আছে সব সৌতি বলে যাচ্ছেন, এখনও মূল কথাতে আসতে সময় লাগবে। মূল কথাতে আসার আগে এখানে কিছু কাহিনী বলা হবে।

সৌতি বিভিন্ন কাহিনী বলতে বলতে পরীক্ষিৎএর কাহিনীতে চলে গেছেন। ভাগবতে পরীক্ষিৎএর কাহিনী খুব বড় করে আছে। এখানে দেখাচ্ছে কলি যুগ এসে গেছে, পরীক্ষিৎ বলছে আমি কলিকে বধ করব। কলি দুঃখ করে বলছে আমি তাহলে কোথায় থাকব। এখানেও একদিকে যুগের কথা বলা হচ্ছে যেটা অমুর্ত কিন্তু আবার যুগকে মুর্ত করে দেওয়া হল। মূল কথা হল, পরীক্ষিৎ স্বর্ণ মুকুট পড়ে মৃগয়ায় গেছেন, সেই স্বর্ণের মধ্যে কলি অবস্থান করে পরীক্ষিৎএর বুদ্ধিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে তার জলতেষ্ঠা পেয়েছে। এক ঋষির কুটিরে জলের জন্য গিয়ে দেখছেন শমীক ঋষি চোখ বন্ধ করে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। ডাকাডাকিতেও ঋষির কোন সাড়া না পেয়ে পরীক্ষিৎ কাছে একটা মরা সাপ পড়েছিল সেটাকে তুলে ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। শমীক ঋষির ছেলে বাইরে খেলা করছিল, তার বন্ধুরা গিয়ে তাকে বলল তোমার বাবার গলায় মরা সাপ ঝুলছে। গিয়ে দেখে সত্যিই তাই, প্রচণ্ড রেগে গেছে, ব্রাক্ষণ সন্তান রেগেমেগে অভিশাপ দিল যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে সাত দিনের মধ্যে তক্ষক সাপের দংশনে তার মৃত্যু হবে। ইতিমধ্যে শমীকের ধ্যান ভঙ্গের পর সব শুনে নিজের সন্তানকে খুব বকাবকি করতে থাকলেন, তুমি তোমার অভিশাপ ফেরত নিয়ে নাও। ছেলে বলছে, আমি হাসি ঠাট্টাতেও মিথ্যা কথা বলিনা, আমি একবার বলে দিয়েছি এটা আর মিথ্যে হবে না। তখন শমীক ঋষি তাঁর ছেলে শৃঙ্গীকে বলছেন 'তুমি তপস্যা করেছ, তপস্যা করে তোমার মধ্যে দিব্য শক্তি এসে গেছে। তপস্যার দ্বারা যারা ঐশ্বর্য লাভ করে দেখা যায় এর ফলে তাদের ক্রোধ বেড়ে যায়'। এটা শমীক ঋষির মত, তাই হয়তো দুর্বাসার খুব ক্রোধ ছিল। তপস্যা করলে ভেতরে খুব তেজ বেড়ে যায়, তেজ বেড়ে যাওয়া মানেই তার রাগটাও বেড়ে যাবে। ঋষি পুত্র তো নেহাতই বাচ্চা সে কি করে রাগকে হজম করবে! অনেকেই তপস্যা করে শক্তি অর্জন করে নেয় কিন্তু সেই শক্তিকে হজম করার ক্ষমতা তাদের থাকে না, এই ব্যাপারটাই অশ্বত্থামার কাহিনী রূপে পরের দিকে খুব সুন্দর ভাবে আসবে। অশ্বত্থামা তপস্যা করে ব্রক্ষাস্ত্র চালাতে শিখে গেছে কিন্তু ফেরত আনার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

পুত্রের প্রতি শমীক ঋষির উপদেশ

শমীক ঋষি বলছেন তোমাকে আমি কিছু উপদেশ দেব। তুমি তপস্যা করেছ ঠিকই, তোমার তেজ আছে সেটাও ঠিক আর তাতে যে ক্রোধ হবে সেটাও ঠিক, কিন্তু ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তোমার হয়নি। শমীক ঋষি ছেলেকে বলছেন – *কিং পুনর্বাল এব ত্বং তপসা ভাবিতঃ সদা। বর্দ্ধতে চ প্রভবতাং কোপোহতীব মহাত্মনাম্।।*(১/৩৭/৫)। কারণ বড় বড় মহাত্মারাও তপস্যা করে তপোবলে বলীয়ান হওয়ার পর তাঁদের ক্রোধ বৃদ্ধি হয়, আর তুমি তো নেহাতই শিশু, তাই তোমার এই ক্রোধ অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই কারণে তোমার কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার দরকার। তপস্যায় বসে প্রথমে তুমি তোমার মন আর ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ কর। ইন্দ্রিয় নিগ্রহের জন্য তুমি কন্দমূল খাবে আর সাথে সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য প্রযত্নশীল হও। মনে রাখবে – *ক্রোধ হি ধর্ম্মং হরতি যতীনাং দুঃখসঞ্চিতম্। ততো ধর্ম্মবিহীনানাং গতিরিষ্টা ন বিদ্যতে।।* (১/৩৭/৮)। অনেক কষ্ট, অনেক তপস্যা করে মানুষ ধর্ম লাভ করে, আর এই পুরো ধর্মরাশি ক্রোধে নাশ হয়ে যায়। এই ক্রোধের উপর মহাভারতে অনেক কাহিনী আসবে। যোগীর মধ্যে একবার যদি ক্রোধের জন্ম নেয় তাহলে সেই ক্রোধ তাকে একেবারে সর্বনাশ করে দেব। গীতায় তাই ক্রোধকে বলছে - *ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ*, ক্রোধ এলেই মাথা ঘুরে যাবে। শমীক ঋষি তাই বলছেন, অনেক কষ্ট করে তুমি যে ধর্ম সঞ্চয় করেছ এক মুহুর্তের ক্রোধ তোমার সব ধর্মকে নাশ করে দেবে। সেইজন্য কি করতে হবে তোমাকে? *শম এষ যতীনাং হি ক্ষমিণাং সিদ্ধিকারকঃ। ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।*।(১/৩৭/৯)। যাঁরা যোগী, জিতেন্দ্রিয়, শম গুণ দ্বারা তাঁদের ক্ষমার অনুশীলন করতে হয়, ক্ষমাশীল মানুষই এই লোক আর পরলোকে শান্তি ও সুখ পায়, তাই তুমিও সর্বদা ক্ষমার অনুশীলন কর। *তস্মাচ্চরেথাঃ সততং ক্ষমাশীলো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ক্ষময়া প্রাপ্স্যসে লোকান্ ব্রহ্মণঃ সমনন্তরান্।।*(১/৩৭/১০)। সুতরাং তুমি ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে সর্বদা বিচরণ করার অনুশীলনে রত হও। ক্ষমা ধর্ম যদি না পালন কর তাহলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। শুধু ক্ষমা ধর্ম পালন করে করে তুমি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত চলে যেতে পারবে।

বাবার উপদেশ শুনে শৃঙ্গীর মন কিছুটা শান্ত হয়েছে কিন্তু অভিশাপ ফেরত নেবে না, অহঙ্কারী কিনা। যোগশাস্ত্রে বলছে *সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্*, যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কাজ না করেই সেই কাজের ফলটা তিনি পেয়ে যান। যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনি যদি বলে দেন আজ রাত্রে বৃষ্টি হবে, প্রকৃতি তখন বাধ্য যেখান থেকে হোক মেঘ এনে তাকে বৃষ্টি করাতে হবে। ক্রিয়া না করে ক্রিয়ার ফল তাঁকে আশ্রয় করে নেয়। তিনি যদি কোন বন্ধ্যা নারীকে বলে দেন পুত্রবতী ভব, প্রকৃতি বাধ্য হবে যে করেই হোক বন্ধ্যা নারীর পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে। ঋষিপুত্র এইটাই বলছে, আমি চিরদিন সত্যের অনুশীলন করে এসেছি, যা বলে দিয়েছি এটা হবেই। তবে একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে, রাজাকে খবরটা পাঠানো যেতে পারে। রাজা পরীক্ষিৎ খবর পেয়ে গেছেন, ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁর সাতদিনের মধ্যে তক্ষক সাপের দংশনে মৃত্যু হবে। এই খবর পেতেই সবাই খুব তটস্থ হয়ে গেছে। সুরক্ষিত কেল্লা বানানো হল যাতে তক্ষক কোন ভাবেই প্রবেশ না করতে পারে। কিন্তু মুনির অভিশাপ, বিফল হবার নয়।

তক্ষক ছিল খুব অহঙ্কারী, এদিকে অভিশাপের ফলে সে একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। অন্য দিকে ঋষি মুনিরাও তক্ষকের অহঙ্কারী আচরণের জন্য তার উপর খুব অসন্তুষ্ঠ ছিল। আমাদের শাস্ত্রকাররা এমনকি বাল্মীকিও দুটো জিনিষকে মিশিয়ে দিয়েছেন, একদিকে কিছু কিছু জাতিকে পশু পাখির সাথে মিশিয়ে দিয়ে একটা বিচিত্র জিনিষের সৃষ্টি করলেন। সাপ একটা জাতি, অন্য দিকে সাপ মানে একটা সরিসৃপ শ্রেণীর প্রাণী। সাপ জাতি আর সরিসৃপ সাপকে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে, যেমন একজনের নাগ উপাধি, নাগেদের বাড়ি দেখিয়ে বলা হচ্ছে এটা নাগেদের বাড়ি। এই রকম মানুষের মধ্যে বাঘ, হাতি সিংহ উপাধি থাকে, এখন এরা কি সত্যিই হাতি, সিংহ হবে? ঠিক তেমনি বানর একটা বিশেষ জাতির নাম কিন্তু তাদের মিশিয়ে দেওয়া হল বানর পশুর সাথে। পুরানে এই ধরণের বহু কাহিনী আছে যেখানে একজনকে কখন মানুষ বানিয়ে দিচ্ছে কখন তাকে সাপ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাই কাব্যের মাধুর্য, কারণ কাব্য একটা ভাবকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলে, ভাবের কাছে স্থুল শরীরের কোন মূল্য নেই। অসুরদের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটেছে, অসুরও একটা জাতি। দৈত্য আর দেবতা এরা একই বংশের, এদের দুজনের বাবা হলেন কাশ্যপ মুনি। দেবতাদের মা হলেন অদিতি, অদিতির সন্তান বলে দেবতাদের বলা হয় আদিত্য আর দৈত্যদের মায়ের নাম দিতি। অদিতি আর দিতি হলেন দুজন আপন বোন। দুই বোন মিলে বিয়ে করেছেন কাশ্যপ মুনিকে, এদের একজনের সন্তানরা হলেন দেবতা অন্য বোনের সন্তানরা হল

অসুর বা দৈত্য। এদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ লেগেই আছে, অথচ আমরা ভুলে যাই দেবতা আর দৈত্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক ঠিক সেই একই সম্পর্ক শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষণের মধ্যে। এদের আবার দুটো মা শুধু নয়, এরা দুজন বোন। ঠিক তেমনি সাপেদের মায়ের নাম কদ্রু, গরুড়ের মায়ের নাম বিনীতা, এরা সবাই বোন। কাশ্যপ মুনি অনেক বোনকে বিয়ে করেছিলেন, আর একেকটি বোন থেকে একেক শ্রেণীর জাতির জন্ম হয়েছে। সরমার থেকে কুকুর, বেড়াল, শেয়াল এদের জন্ম হয়েছে। সেইজন্য কুকুর বেড়াল শেয়াল সব এক জাতি। যারা একটু উন্নত, ক্ষমতা ও বুদ্ধি যাদের বেশী কিন্তু ভোগের দিকে বেশী নজর তাদের বলা হল দৈত্য জাতি, এরা বেরিয়েছে দিতি থেকে। কিন্তু এদের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। এদের সবার মিল কোথায়? এদের সবার বাবা কশ্যপ আর এদের মায়েরা সবাই আপন বোন। এরা সবাই দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। এখানেও সেই একত্ব ভাবটা প্রচ্ছন্ন ভাবে নিয়ে আস হয়েছে। সচ্চিদানন্দই সত্য, একমাত্র সচ্চিদানন্দই আছে আবার বহু যে দেখা যাচ্ছে এটাও সত্য। কিন্তু বহুর সাথে এককে মেলানো হবে কিভাবে? এই সমস্যা আমাদের ঋষিদের কাছেও ছিল, এনারা বিভিন্ন কাহিনী ও আখ্যায়িকার মাধ্যমে দুটো জিনিষকে মিলিয়ে দেন। এখন যদি মনে প্রশ্ন হয় কাশ্যপ মুনির কোন স্ত্রী যখন জন্ম দিতে শুরু করলেন তার গর্ভ থেকে কি সব সাপই বেরোতে শুরু করেছিল? তা কেন হবে। পৌরানিক আখ্যায়িকাকে আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই, আমাদের ঋষি মুনিরাও এই সব আখ্যায়িকাকে খুব আক্ষরিক অর্থে নিতে বারণ করে গেছেন, নিলে অনেক সমস্যা এসে যাবে। দৈত্য, অসুর, সাপ, বাঘ, হাতি এগুলো সব জাতি। অসুর কাকে বলছে? অসু মানে ইন্দ্রিয়ের প্রাণশক্তি, এই প্রাণশক্তির উপর যাদের মন বেশী পড়ে থাকে তাদেরকে অসুর বলা হচ্ছে। অসুরদের দৈহিক শক্তি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিরাট, বুদ্ধিও খুব কিন্তু আধ্যাত্মিক দিকে এরা মন দেয় না। অসুর দৈত্যরা ধর্মের অনুষ্ঠান বিরাট করে করবে, পূজো-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ খুব সমারোহ করে করবে কিন্তু এদের মূল শক্তিটা ইন্দ্রিয়ের উপরেই কেন্দ্রীভূত।

বেদের মন্ত্রশক্তির প্রশংসা

কেন শৃঙ্গী মুনি এই অভিশাপ দিলেন এর ওপর এক বিরাট কাহিনী চলবে, এই কাহিনীতে আমরা যাবো না। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে, ঋষির অভিশাপে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। এদিকে কশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণ বলে দিলেন, তক্ষক কিংবা অন্য কোন সাপ যদি রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করে আমি কিন্তু রাজাকে বাঁচিয়ে দেব। তক্ষক আসলে ছিল খুবই ক্রুর প্রকৃতির। মুনি বাক্যকে যদি সত্য করতে হয় তাহলে তুমি দংশন করে দাও বিষ না ঢাললেই হল। তক্ষক তা করবে না, আসলেই তক্ষক ছিল প্রচণ্ড বদমাইশ। কশ্যপ ব্রাহ্মণও জানতেন। কশ্যপ চলেছেন রাজা পরীক্ষিৎকে রক্ষা করতে। ছদ্মবেশে তক্ষক কশ্যপের পথ আটকে বলছে 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন'? 'আমি রাজা পরীক্ষিতের কাছে যাচ্ছি, তক্ষক তাঁকে দংশন করবে আর আমি রাজাকে বাঁচিয়ে দেব'। তক্ষক বলছে 'আপনি জানেন না তক্ষকের বিষ কি সাংঘাতিক, কখন কেউ পারে নাকি সেই বিষকে আটকাতে, আপনিও পারবেন না'। কশ্যপ বলছেন 'হ্যাঁ আমি পারব'। তক্ষক তখন নিজের আসল রূপটা ধারণ করে নিয়েছে, সামনে একটা গাছ ছিল সেই গাছকে দংশন করতেই সঙ্গে সঙ্গে গাছটা ভস্ম হয়ে গেছে, এমনই তার বিষের ক্ষমতা। গাছটাকে ভস্ম করে দিয়েই কশ্যপকে তক্ষক বলছে 'এবার আপনার ক্ষমতাটা দেখান'। কশ্যপ কমণ্ডুলু থেকে একটু জল নিয়ে নিজের মন্ত্রশক্তিকে কাজে লাগালেন। বেদের মন্ত্রশক্তি লাগাতেই ভস্ম হয়ে যাওয়া গাছের ছাইয়ের ঢিপিতে ছোট্ট একটা অঙ্কুর বেরোল, তারপর ডালপালা ছড়িয়ে পুরো গাছটা যেমন ছিল ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে গেল।

মহাভারতে এখানে বেদের স্তুতি করা হল। বেদের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, বেদের মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা হয় তাহলে বেদের মন্ত্রের ঠিক ঠিক ফল দিতে আরম্ভ করবে। মাধ্বাচার্যের জীবনেও ঠিক এই ধরণেরে এক সত্য কাহিনী প্রচলিত আছে। মাধ্বাচার্য ছিলেন বেদের বিরাট পণ্ডিত। তিনি রাজার কাছে গিয়ে বেদের প্রশংসা করতেই রাজা বলছেন বেদের সব আজগুবি কথা। মাধ্বাচার্য শুনেই বললেন 'আপনি কি তাই মনে করেন! আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কিছু ছোলা নিয়ে আসুন'। গুটি কয়েক ছোলা নিয়ে আসা হল। বেদে ওষধি মন্ত্র আছে, যেখান থেকে সৃষ্টি হয়। মাধ্বাচার্য হাতে ছোলাগুলো নিয়ে বেদের ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করে রাজমহলের মেঝেতেই ফেলে দিলেন, তারপর তিনি ওষধি মন্ত্রোচ্চারণ করেই চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল ছোলার মধ্য থেকে অঙ্কুর বেরোতে শুরু করল, কিছুক্ষণ পর ছোলার গাছ তৈরী হয়ে গেল। তখনও তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করেই যাচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ছোলা গাছে ফুল দেখা দিল। মন্ত্রোচ্চারণ যখন শেষ করলেন তখন ছোলার ফল তৈরী হয়ে গেছে। তিনি ছোলা গাছ থেকে ছোলা নিয়ে সবাইকে খাইয়ে দিলেন। মাধ্বাচার্য রাজাকে দেখিয়ে বলছেন – এই দেখুন বেদের মন্ত্রশক্তির নমুনা। স্বামীজীও বলছেন, মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা হয় মন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে তার ফল দেবে।

পরীক্ষিৎকে তক্ষকের দংশন

এরপর তক্ষক কশ্যপকে বোঝাতে লাগলো, আপনি কেন পরীক্ষিৎকে বাঁচাতে চাইছেন, আপনি কেন ব্রাহ্মণের বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাইছেন, আপনি অর্থের প্রত্যাশা করেই তো যাচ্ছেন, এই নিন আপনাকে আমি প্রচুর অর্থ দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে কশ্যপকে কোন ভাবে সেখান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এবার তক্ষক একটা আপেলের মধ্যে ছোট পোকা হয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এরপর লম্বা কাহিনী। এই একই কাহিনী আবার ভাগবতে ঘুরে আসবে। এখন সাত দিন অতিক্রান্ত হতে চলেছে। পরীক্ষিৎও হাঁফ ছেড়ে বেচেছে। তখন পরীক্ষিৎ বলছেন 'যাক ঋষির বাক্য যাতে মিথ্যে না হয়, এই পোকাকেই আমি তক্ষক নাম দিলাম তাই এই পোকাই আমাকে দংশন করে ঋষি বাক্যের সত্যকে রক্ষা করুক'। পরীক্ষিৎ কথা বলা শেষ করতেই আসল তক্ষক এসে দংশন করে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। পরীক্ষিৎও সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। চারিদিকে এত মুনি ঋষিরা জড়ো হয়েছিলেন, আর সমস্ত রকমের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ছিল, কিন্তু তার মধ্যে তক্ষক একটা পোকার বেশে এসে দংশন করে বেরিয়ে গেল, তক্ষকেরও শক্তি ছিল।

ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। এই ব্রাহ্মণকে তক্ষক একবার নাকি খুব অপমান করেছিল, সেই ব্রাহ্মণও তক্ষকের উপর খুব রেগে ছিল। এরও আবার বিরাট কাহিনী। সেই ব্রাহ্মণ ওখানে এসে জনমেজয়কে তাঁতাতে শুরু করল, আপনি সর্পযজ্ঞ শুরু করুন, জগতের সমস্ত সাপেদের নাশ করে দিন, সাপেদের বাঁদরামোর একটা সীমা আছে সেই সীমাকে এরা লঙ্ঘন করে দিয়েছে, আপনিই পারবেন এদের শায়েস্তা করতে, আপনি শীঘ্রই সর্পযজ্ঞ শুরু করুন। এইসব শুনে জনমেজয় খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, ঠিক আছে সর্পযজ্ঞই করা হবে, সব সাপেদের আমি নাশ করে দেব। সর্পযজ্ঞ হচ্ছে দেখে বৈশম্পায়ন ঋষি সেখানে হাজির হয়েছেন আর সেখানে ব্যাসদেবও এসেছেন। এদিকে যজ্ঞ চলছে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, পুরো সর্প জাতিকে চিরদিনের মত নাশ করে দেওয়া হচ্ছে। যজ্ঞের মধ্যে প্রচুর সময়ও আছে, তখন সবাই মিলে ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন 'আপনি অবসর সময়ে মহাভারতের কাহিনী আমাদের শোনান'। ব্যাসদেব আবার তখন বৈশম্পায়ন ঋষিকে বললেন – তুমি তো আমার কাছে মহাভারতের পুরো কাহিনী শুনেছ, তুমিই এদের সেই কাহিনী শোনাও যেটা তুমি আমার কাছ থেকে শুনেছ। ভাগবত কথা শোনান হয়েছিল যখন পরীক্ষিৎ মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন। ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন শুকদেব, সেটাও ব্যাসদেবের রচনা। তক্ষকের দংশনে পরীক্ষিৎএর মৃত্যুর পর জনমেজয় বদলা নেওয়ার জন্য যখন সর্পযজ্ঞ করেছিলেন সেই যজ্ঞের সময় শোনান হয়েছিল মহাভারত। এরমধ্যে মজার ব্যাপার হল, বৈশম্পায়ন যখন মহাভারত কথা শোনাচ্ছিলেন তখন জনমেজয় দুর্যোধন সম্বন্ধে কিছু কটূ মন্তব্য করেছিলেন, তখন বৈশম্পায়ন ঋষি জনমেজয়কে সাবধান করে বলছেন – জনমেজয় তুমি সংযত হয়ে মন্তব্য করো, ভুলে যেওনা, উনি তোমার ঠাকুর্দা হন। ভাগবত পুরান আর মহাভারত মূলতঃ ভরত বংশাবলীর ইতিহাস।

যারা জয়ী হয় ইতিহাস তাদের নিয়েই লেখা হয়, পরাজিতদের নিয়ে ইতিহাস রচিত হয় না। সেইজন্য মহাভারতের প্রথম নাম ছিল জয়। এই কারণে এখানে অর্জুনের খুব প্রশংসা, অর্জুনের সন্তান অভিমন্যুর খুব প্রশংসা। অভিমন্যুর সন্তান পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎকে নিয়েই পুরো ভাগবত উৎসর্গীকৃত। পরীক্ষিৎএর সন্তান জনমেজয়, জনমেজয়কে নিয়েই পুরো মহাভারতের কাহিনী বিস্তার করা হয়েছে। চারটে বংশের প্রশংসা এসে গেল। যারাই মহাভারতাদি নিয়ে গবেষণা করতে এগিয়ে আসেন তারাই এর মধ্যে অনেক ফাঁক বার করার চেষ্টা করেন। যত যাই বলা হোক না কেন, এটা ঠিকই যে পুরো মহাভারত আর ভাগবতে অর্জুন, অভিমন্যু, পরীক্ষিৎ আর জনমেজয় এই চারটি প্রজন্মকে নিয়েই এগিয়ে গেছে এদের আগে পিছে আর কারুর কথা আসেনা। আমাদের দেশে যখনই কোন নতুন প্রজেক্ট শুরু হয় তার সাথে হয় গান্ধীর নাম নয়তো ইন্দিরা বা নেহরুর নাম লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখন রাজীব গান্ধীও জুড়ে গেছেন। দেখে মনে হয় আমাদের দেশে গান্ধী আর নেহরু ছাড়া আর কেউ নেই। এখন যদি মহাভারত লেখা হয় তাতে মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, ইন্দিরা, রাজীব আর সোনিয়ার কথাই লেখা হবে।

ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু ছিলেন ব্যাসদেবের ঔরসজাত সন্তান। অর্জুনের জন্মও তিনি দেখে গেছেন, শুধু তাই নয়, জনমেজয় পর্যন্ত ব্যাসদেবকে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে। একটি প্রজন্মকে যদি কুড়ি বছরের ব্যবধানে রাখা হয় তাহলে জনমেজয় পর্যন্ত ব্যাসদেব যদি জীবিত থাকেন, সেই সময় তাঁর বয়স মোটামুটি একশ কুড়ি বছরের কাছাকাছি হবে। এত বছর ব্যাসদেব যে জীবিত ছিলেন এটাকে একেবারে অসম্ভব বলেও মনে হবে না, বেলুড় মঠের অনেক সন্ন্যাসীকে একশ তিন থেকে একশ পাঁচ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা গেছে। মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে কোন ফাঁক নেই, তাই ব্যাসদেবের বয়স নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই, আর তিনি একজন বিরাট ঋষি ছিলেন।

কদ্রু ও বিনীতার বিবাদ

পরীক্ষিৎএর উপর অভিশাপ ও জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের প্রেক্ষাপটের আগে একটা কাহিনী আসে কদ্রু আর বিনীতার মধ্যেকার বিবাদকে নিয়ে। সেই আদিম কাল থেকে নারীই নারীর প্রধান শত্রু, কোন পুরুষ নয়, নারী নির্যাতনের পেছনে নারীর ভূমিকাই প্রধান। কদ্রু সব সময় চেষ্টা করে চলেছে বিনীতাকে কিভাবে নিজের দাসী বানিয়ে নেওয়া যায়। একই মায়ের পেটের বোন, স্বামীও একজন, কাশ্যপ ঋষি এদের সবার স্বামী কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকে। উচ্চৈঃশ্রবা বলে এক বিখ্যাত পৌরানিক ঘোড়া ছিল, তার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, লেজটাও সাদা। কদ্রু বিনীতাকে জিজ্ঞেস করছে ঘোড়ার লেজটা কি রঙের বলতো? বিনীতা বলছে সাদা। কদ্রু বলছে – সাদা কেন হবে, ওটা সাদা কালো মেশানো, ঘোড়াটা সাদা কিন্তু লেজটা কালো। বিনীতা বলছে – তাহলে চলো কাছে গিয়ে দেখা যাক কে ঠিক বলছে আর কে ভুল বলছে। কদ্রু বলল, আমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে তুমি আমার গোলাম হয়ে যাবে আর তোমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আমি তোমার গোলাম হয়ে যাব। এদিকে কদ্রু তার সব সন্তানদের বলে দিল তোমরা ঘোড়ার লেজে গিয়ে সবাই ঝুলে থাক, তাহলে লেজটা কালো দেখাবে। সাপেরা কেউ রাজী হচ্ছে না। কদ্রু তখন নিজেরই সন্তান সাপেদের অভিশাপ দিয়ে বলছে – ঠিক আছে, তোমরা আমার কথাকে অবজ্ঞা করছ, তোমাদের বংশের নাশ হবে। সাপেদের ক্ষেত্রে এটাও একটা মজার ব্যাপার, সর্পিণী যখন ডিম দেয় তখন খুব সামলে রাখে, কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা গুলো যখন বেরোতে থাকে তখন মা বাচ্চাগুলোকে কপ্‌কপ্ করে খেয়ে ফেলে। সাপেরা একমাত্র নড়াচড়াকেই বুঝতে পারে, কোন কিছু নড়াচড়া করলেই মনে করে হয় এ আমার শত্রু না হয় এ আমার ভোজ্য। এতদিন ধরে ডিমে তা দিয়ে যাচ্ছিল, ডিম থেকে যেই বাচ্চাগুলো কিলবিল করে বেরোতে থাকে তখন সে ভাবে এগুলো আমার শত্রু, অন্য দিকে ক্ষিদেও পেয়ে থাকে, তাই গপাগপ খেতে থাকে। তার মধ্যেই কিছু বাচ্চা মায়ের ভয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে যায়। তাতেই এত সাপ। এখন কোন ঋষিকে বা পণ্ডিতকে কোন চাষাভুশো লোক জিজ্ঞেস করছে – আচ্ছা পণ্ডিত মশাই সাপ কেন নিজের বাচ্চাকে খেয়ে নেয়? এখন যদি বলা হয় সাপেদের মস্তিষ্ক এমন ভাবে তৈরী তাতে তারা দুটো জিনিষই জানে, হয় পালাও না হয় ভক্ষণ কর। এই থিয়োরি চাষির কাছে জমবে না, মস্তিষ্কই বা কি আর তার গঠনটাই বা কি, এগুলো চাষাভুশোরা বুঝতে পারবে না।

তখন বলবে, আসলে কি ব্যাপার হয়েছিল বলছি, ব্রহ্মা একদিন ব্রহ্মলোকে বসেছিলেন। সাপেদের মা ছিল কদ্রু, কদ্রুর সাথে তার বোনের ঝগড়া লাগলো, তারপর এই সেই হয়ে হয়ে এমন হয়ে গেল ব্রহ্মা সেখান থেকে অভিশাপ দিলেন, তোমরা নিজের সন্তানদের ভক্ষণ করবে। তখন এরা বলবে, এবার ঠিক আছে, সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কোথায় এটা আছে? বেদে আছে। বেদে শুধু কাশ্যপ আর কদ্রুদের নাম আছে, এই কাহিনী কিছু নেই। কিন্তু এই যে গল্পটা দাঁড় করিয়ে দিল এটাই হয়ে গেল পুরান, পৌরানিক কথা। এইভাবেই পুরান জন্ম নিল। তত্ত্বটা ঠিক আছে, সাপ তার বাচ্চাকে খায় এটা ঠিক আছে। কিন্তু যেই এর পেছনে বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে যাব তখন এরা বলবে আমার এই তত্ত্ব লাগবে না। কিন্তু যখনই কাহিনীর মাধ্যমে নিয়ে গিয়ে বলা হল, তখন এদের মন শান্ত হয়ে গেল। এইভাবেই আমাদের ধর্মীয় সাহিত্য বেরিয়ে এসেছে। সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য এই কাহিনীগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে। উপনিষদের এই সব কাহিনীর কোন দরকার নেই কারণ উপনিষদ সাধারণ মানুষের কাছে যাবেই না। তাই উপনিষদে কখনই আজগুবি গপ্পো পাওয়া যাবে না।

আস্তিক মুনির জন্ম ও সর্পবংশের রক্ষা

যাই হোক, কদ্রুতো নিজের সন্তানদের অভিশাপ দিয়ে দিলে। এবার তো এদের বংশ নাশ হয়ে যাবে, তাহলে এদের কি হবে? তখন এরা কায়দা করে জরাৎকারু নামে এক ঋষিকে প্রায় তুলে নিয়ে নিজেদের একটা মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে। জরাৎকারুর থেকে এক সন্তান হল তার নাম ছিল আস্তিক মুনি। আস্তিক মুনিকে বাচ্চা বয়সেই বলে দেওয়া হল – দ্যাখো, তোমার বাবাকে আমরা অপহরণ করে নিয়ে এসেছিলাম। তাই আসলে তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আমরা হলাম সর্পকুলের লোক। এখানেই বোঝা যায়, একটা মানুষ একটা সাপের সাথে কি করে সঙ্গম করবে, সর্পজাতি আর মানুষ জাতির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হল। এইভাবেই কাহিনী এগিয়ে যায়। আস্তিককে বাচ্চা বয়স থেকে তার মা সামলে রেখেছিল, কোন দিকে তার মন যেতে দেয়নি। শুধু বলে গেছে, তোমার বংশকে তুমি রক্ষা করবে, সর্প বংশের উপর এক অভিশাপ আছে সেই অভিশাপ থেকে তুমিই বাঁচাবে, তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান। পরের দিকে যখন জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করেছিল তখন সেখানে এই আস্তিক মুনিই সেই দুর্দিনে সাপেদের বংশকে রক্ষা করেছিলেন, সেটা আবার অন্য কাহিনী।

এদিকে জনমেজয় করে যাচ্ছে সর্পযজ্ঞ, আর কঠোর ভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে কেউ যেন যজ্ঞভূমিতে না ঢুকতে পারে। আস্তিককে পাঠানো হয়েছে সর্পদের বংশকে রক্ষা করার জন্য। আস্তিক তখন নেহাতই শিশু। তিনি ঐ যজ্ঞভূমির কাছাকাছি এসে দেখছেন কিছুতেই ঢোকা যাবে না। ঠিক তাই হল, যত দ্বারপালরা ছিল সবাই তাঁর পথ আটকে দিয়েছে। উনি তখন বাইরে থেকেই যজ্ঞের অগ্নির স্তুতি করতে শুরু করে দিয়েছেন। এখন আস্তিক মুনি অগ্নির স্তুতি করাতে একটা কর্ম শুরু হয়ে গেল, অগ্নি দেবতা প্রসন্ন হয়ে যাবেন, অগ্নি প্রসন্ন হলে রাজার মন পাল্টে যাবে। অগ্নির স্তুতির সাথে সাথে তিনি রাজারও স্তুতি করতে থাকলেন। রাজার কানেও সেই স্তুতি পৌঁছেছে। অষ্টাবক্রের কাহিনীতেও ঠিক এইভাবে অষ্টাবক্র জনক রাজার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। এদকে আস্তিকের স্তুতি শুনে রাজা, অমাত্যগণ, দেবতারা এত খুশি হয়েছেন যে সবাই বলছেন ওকে ভেতরে নিয়ে আসা হোক। ইতিমধ্যে নানান রকমের সাপ এসে অগ্নি কুণ্ডে এসে পড়ছে আর সব পুড়ে মরতে শুরু করেছে। আস্তিক মুনি যখন ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন জনমেজয় বলছেন – তুমি কি বর চাও বল। আস্তিক মুনি বর চাওয়ার ব্যাপারে বলতে যাচ্ছেন তখন হোতা, যিনি আহুতি দিচ্ছিলেন, বলছেন – আরে, এতো সাপ এসে গেল তক্ষকতো এখনও আসেনি। জনমেজয়ের মন তখন আবার আস্তিক মুনির কাছ থেকে সরে গেছে। জনমেজয় বলছেন – খোঁজ নাও তক্ষক কোথায় আছে। অগ্নি ছিলেন পুরোহিত, তিনি খবর দিলেন, তক্ষক ইন্দ্রের কাছে লুকিয়ে আছে। ইন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের রাজা, তক্ষক আবার তাঁর মিত্র। ইন্দ্র তক্ষককে বললেন 'সর্পযজ্ঞ হচ্ছে তো কি হচ্ছে, তুমি আমার কাছে থাক, দেখি কে কি করতে পারে তোমাকে'। যখন বেদের মন্ত্র শুরু হয়েছে, তখন মন্ত্রশক্তি স্বর্গে গিয়ে তক্ষককে বেঁধে নামাতে শুরু করেছে। তক্ষক তাড়াতাড়ি ইন্দ্রের উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে গেছে। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা বলে তক্ষকের কিছু হচ্ছে না। এদিকে জনমেজয় চিৎকার করে বলছেন – কোথায় তক্ষক, কোথায় তক্ষক। তখন পুরোহিত আবার খবর দিল তক্ষক ইন্দ্রের উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। জনমেজয় তখন বলছেন – হে বিপ্রগণ, তক্ষক যদি ইন্দ্রের বস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাহলে তক্ষকের সাথে ইন্দ্রকেও এই অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দাও। জনমেজয়ের আজ্ঞা পাওয়া মাত্র ব্রাহ্মণরা সঙ্গে সঙ্গে বেদের মন্ত্র পাঠ করে আহুতি দিতে শুরু করেছে। এদিকে তখন মন্ত্রের শক্তি তক্ষককে টান মারছে, তক্ষক ইন্দ্রের বস্ত্রকে আঁকড়ে আছে, তখন ইন্দ্র সমেতে তক্ষকের স্বর্গ থেকে পতন হতে শুরু করেছে। মানে, তক্ষককে যে আশ্রয় দিয়েছে, মন্ত্রের শক্তিতে আশ্রিত আর আশ্রয়দাতা দুজনকে সমেতে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়ে দাও। যেই মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল ইন্দ্রও তখন যজ্ঞের অগ্নিতে পড়তে শুরু করেছে। ইন্দ্র দেখছে আমি অগ্নিকুণ্ডে পড়তে যাচ্ছি, ঐ দেখে ইন্দ্র নিজের উত্তরীয়কে ফেলে দিয়ে পালিয়েছেন।

মহাভারতে বেদের দেবতাদের ক্ষমতার হ্রাস

এই যে কাহিনী বলা হল, কাহিনী শোনাবার জন্য কাহিনী বলা হয়নি। এখানে দুটো জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে। বেদের যজ্ঞের এমনই শক্তি আমরা যদি চাই দেবতাকেও নামিয়ে আনতে পারি। বেদের মন্ত্রের শক্তিতে দেবতাকেও নামিয়ে আনা যায়। ব্যাসদেব বেদের যজ্ঞের এই শক্তিটা এখানে দেখিয়ে দিলেন। কিভাবে নামাচ্ছে? দেবতাকে তো আর সরাসরি যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হবে না, কিন্তু তক্ষক ইন্দ্রের উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়েছে, তাই ইন্দ্রকে শুদ্ধু যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে নামিয়ে দাও। ঠিক তাই হল। দ্বিতীয় যেটা দেখান হচ্ছে, বৈদিক যুগে বেদের যত দেবতা ছিলেন তাঁদের খুব সম্মান ছিল, কিন্তু রামায়ণ যুগে এসে বিশেষ করে মহাভারতের সময়ে পুরো চিত্রটা পাল্টে গেল, দেবতাদের আর সে সম্মান থাকল না। পুরো মহাভারতে ইন্দ্রকে পদে পদে হাস্যাস্পদ করা হয়েছে। প্রথম কি রকম হাস্যাস্পদ করা হল? তুমি হলে স্বর্গের দেবরাজ, তুমি এমনই অসীম ক্ষমতাবান দেবতা যে, তোমার যে আশ্রিত, তুমি যখন বিপদে পড়লে আশ্রিতকেই তুমি ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলে। অথচ বেদে ইন্দ্রকে একজন উচ্চ আদর্শের দেবতা রূপে স্বীকৃতি দিয়ে আসা হয়েছে। শুধু ইন্দ্রকেই নয়, বেদের যত দেবতা আছে ব্যাসদেব মহাভারত আর ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে সবাইকে তুলে একেবারে নীচে ফেলে দিয়েছেন। ব্যাসদেব একদিকে বেদের যজ্ঞাদিকে ধরে রেখেছেন অন্য দিকে বেদের দেবতাদের যাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হচ্ছে তাঁদের জোকার বানিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু অগ্নি দেবতাকে ব্যাসদেব উচ্চস্থান দিচ্ছেন। তবে মূল কথা হল ব্যাসদেব যজ্ঞকে অমুর্ত রূপে নিয়ে এলেন।

ইন্দ্র তক্ষককে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবার পর এবার তক্ষক যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে পড়তে আরম্ভ করছে। তক্ষকের শরীরেও শক্তি ছিল, সেই শক্তিতে সেও আপ্রাণ বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই পড়তে একটু সময় নিচ্ছে। জনমেজয়ও বুঝে গেলেন তক্ষকের আর বাঁচার ক্ষমতা নেই। তখন জনমেজয় নিশ্চিত হয়ে আস্তিক মুনিকে বলছেন 'হ্যাঁ, তুমি বল তোমার কি বর চাই'। আস্তিক মুনি তৎক্ষণাৎ বর চাইলেন 'এই মুহূর্তে এক্ষুণি এই যজ্ঞকে বন্ধ করে দেওয়া হোক'। তক্ষক তখনও ঝুলছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে এসে পড়বে। আস্তিক মুনির বর চাইতেই জনমেজয়ের মুখ

শুকিয়ে গেল। কারণ এই যে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল আর এত যে সাপের বলি দেওয়া হল এর পুরোটাই করা হয়েছিল একমাত্র তক্ষকের বিনাশের জন্য। তক্ষক পড়তে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহুর্তে আস্তিক মুনির বর তাকে রক্ষা করে দিল। জনমেজয় অনেক করে বোঝাতে চাইলেন অন্য বর প্রার্থনা করার জন্য, কিন্তু আস্তিক মুনি কিছুতেই মানলেন না। তখন নিরুপায় হয়ে জনমেজয় বললেন 'যখন কথা দিয়েছি আপনাকে বর দেব, সুতারং আপনার ইচ্ছাকেই মান্যতা দিতে হবে'। তখনই যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেল।

এখানে ব্যাসদেব বিরাট তালিকা দিয়েছেন সর্পযজ্ঞে কারা কারা মারা গেছে। আস্তিক মুনি তখন সর্পদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিলেন, যারা এই আখ্যানকে অধ্যয়ণ করবে আমি তোমাদের কিভাবে রক্ষা করেছিলাম, তাদের কাউকে যেন তোমার বংশের কেউ দংশন না করে। কিছুদিন আগেও গ্রামদেশে বাবা-মা ঠাকুর্দারা তাদের সন্তানদের বলতেন, যখন অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আসবে তখন আস্তিক মুনির নাম করতে করতে আসবে তাহলে আর সাপে কামড়াবে না। কোথায় একটা মহাভারতে আখ্যায়িকা আছে আর তার প্রভাব কোথায় অজ গ্রামের মানুষের মধ্যে এসে বিস্তার করে নিয়েছে। মহাভারতের এটাই বিশেষত্ব, গ্রাম দেশে কোন চাষা মাঝ রাত্রে হয়তো ক্ষেতে যাচ্ছে, অন্ধকারে এর বাড়ি ওর বাড়ি আনাগোনা করছে, গ্রামে চারিদিকে সাপ বিছে আছে, মহাভারত এখানে মানুষকে সাহস যোগাচ্ছে, তুমি হাততালি দিয়ে বলতে থাকো আস্তিক মুনি আস্তিক মুনি তাহলে তোমার কাছে আর সাপ আসবে না, মানুষের মধ্যে একটা শক্তি এলো। এরও একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে, মানুষকে সাপ খুব ভয় পায়, আর সাপ গন্ধ ও শব্দকেও ভয় পায়। মানুষ যখন চলতে থাকে তখন যদি হাততালি দিতে থাকে সেই শব্দেই সাপ পালিয়ে যাবে, সাধারণতঃ এইটাই হয়, কিন্তু তাও যে দুর্ঘটনা হবে না তা নয়, তবে রোজ রোজ তো সাপ শত শত লোককে কামড়াচ্ছে না, কিছু লোক তাও সাপের কামড়ে মারা যায়। এখন বাচ্চা বয়সেই বাবা মা বলে দিলেন সন্ধ্যের পর রাস্থা ঘাটে চলতে গেলে হাততালি দিয়ে আস্তিক মুনির নাম করবে, এতে বাচ্চার ভেতরে একটা আত্মবিশ্বাস জন্মাচ্ছে আর বাইরে হাততালি দেওয়ার জন্য সাপ পালিয়ে যাবে। এই পরম্পরা মহাভারতই দিয়ে গেছে, আস্তিক মুনির নাম করবে তাহলে তোমাকে সাপে কামড়াবে না।

এদিকে যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে গেল, যে উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়েছিল সেটাও ফলপ্রসু হলো না। তখন সবাই কি করবে, সবাই মিলে ব্যাসদেবকে বললেন আপনি কথা কাহিনী শোনান। ব্যাসদেব তখন বৈশম্পায়নকে বললেন – তুমি মহাভারতের কাহিনী শোনাও। বৈশম্পায়ন তখন মহাভারতের কথা ও কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করলেন। এইখান থেকেই মূল মহাভারতের কাহিনী শুরু হয়।

সর্পযজ্ঞে তক্ষক যেভাবেই হোক বেঁচে গেছে। আমরা দেখলাম, মন্ত্রশক্তি কিভাবে ইন্দ্রকে শুদ্ধু স্বর্গ থেকে নামিয়ে এনেছিল। বেদের এটা পরম্পরা মত, বেদের যে কোন মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে পাঠ করা হয় তাহলে ঐ মন্ত্রের যে কাজ ও উদ্দেশ্য সেটা সাধিত হবেই হবে। স্বামীজীও এই ব্যাপারে এক মত ছিলেন। স্বামীজীর শিষ্য বলছেন – আমি যদি ঘটি ঘটি বলি তাহলে এখানে কি ঘটের আবির্ভাব হবে? স্বামীজী বলছেন, হ্যাঁ হবে, যদি তুমি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পার, যে উচ্চারণটা হওয়ার কথা। বাল্মীকি রামায়ণে বেদের মন্ত্রশক্তি কিভাবে কাজ করে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। যখন ভরত বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে জঙ্গলে থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। ভরদ্বাজ মুনি এই বিশাল সেনাবাহিনী দেখে ভাবছেন এই সামান্য কুটিরে এত লোকের সমাদর করবো কি করে? সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেদ মন্ত্র পাঠ করতে শুরু করে দিলেন। এক একটি মন্ত্রের এক এক জন দেবতাকে এক একটা দায়ীত্ব দিয়ে বলছেন আপনি সুখাদ্য দিয়ে যান, আপনি সুন্দর পেয় বস্তু দিয়ে যান। তারপর এমন এলাহি আয়োজন করা হল অযোধ্যার সেনারা বলছে এমন সুস্বাদু খাবার তারা কোন দিন চোখেই দেখেনি। এমন সব পেয়, সেটা মদও হতে পারে, কোল্ডড্রিঙ্কসও হতে পারে, এমন স্বাদ তারা কোন দিন আস্বাদই করেনি। আর এতো সুন্দর অপ্সরা তারা কখন দেখেইনি, আর এক একজন সৈনিকের জন্য দুজন করে অপ্সরা। সৈন্যরা বলাবলি করতে শুরু করে দিল, অযোধ্যায় রামই রাজ করুক আর ভরতই রাজ করুক তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, আমরা এখানে সুখে আছি এখান থেকে আমরা আর নড়ছি না। সকাল হতেই সব উধাও। ভরদ্বাজ ঋষি মন্ত্রশক্তিতে এক রাত্রির জন্য এই সব কিছুকে নামিয়ে এনেছিলেন।

সিন্ধু নদের তীরে অবস্থান করার সময় স্বামীজীর সেখানে একটা দিব্য দর্শন হয়েছিল। ভোরের আবছা আলোতে তিনি সিন্ধু নদের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ তাঁর সামনে ঘন কুয়াশার একটা আবরণ নেমে গেল। সেই কুয়াশার মধ্যে তিনি এক সৌম্য দর্শন শশ্রু মণ্ডিত ঋষির দর্শন পেলেন, তিনি সরস্বতির নামে বেদের একটি মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন

– আবহি বরদে দেবী, শুনেই স্বামীজী এক দিব্য আবেশের মধ্যে চলে গেলেন। পরে তিনি এক জায়গায় বলছেন, সেদিন যে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ ঋষির কন্ঠে শুনেছিলাম, আধুনিক কালে বেদের যে উচ্চারণ হয় তার সাথে কোন মিল নেই। ঋষির কন্ঠস্বরে যে বেদের উচ্চারণ শুনেছিলেন স্বামীজী বলছেন এটাই ঠিক ঠিক বেদের উচ্চারণ। ব্রহ্মার মনে যখন প্রথম ঘটির উদয় হল তখন তিনি ঘটি বলা মাত্র ঘটির জন্ম হয়ে গেল, ঠিক এই ভাবে মানুষের কথা যখন তাঁর মনে উদয় হল তখন তিনি মানুষ হোক বলা মাত্র মানুষের সৃষ্টি হয়ে গেল। এখন ব্রহ্মার মনে যে এই বিচার আর তাঁর যে শব্দ এর সাথে যখন কোন শব্দ ও বিচার এক হয়ে যাবে তখনই সেটা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আমাদের সাধারণ মনে এগুলোর এক পয়সার বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়, এটা ঠিকই যে এই জিনিষগুলোকে মানা খুব কঠিন, কিন্তু এটাই ঘটনা। ঋষিরা যাঁরা যোগশক্তি অর্জন করেন তাঁরা যাই করেন তখন ঠিক এই জিনিষটাই হয়। যোগ সাধনায় তাঁদের শরীর মনের এমন পরিবর্তন হয়ে যায় তখন তাঁরা যা চান ঠিক তাই হয়ে যায়। এখন তখনকার দিনের যাঁরা ঋষি সেই সর্পযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন, ব্যাসদেব তখনও বেঁচে আছেন, যদিও তিনি এই যজ্ঞে অংশ নেননি, তাঁরা মন্ত্র পাঠ করে আহুতি দিচ্ছেন, যে মন্ত্রের শক্তি বলছে তক্ষক যেখানেই থাকুক সে এই অগ্নিকুণ্ডে পতিত হোক। তক্ষক আসছে না, না আসার তো কথা নয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তক্ষক ইন্দ্রের উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তখন তাঁরা আবার মন্ত্র বলছেন, ঠিক আছে ইন্দ্র শুদ্ধু তক্ষক নেমে আসুক। স্বর্গ থেকে ইন্দ্র পড়তে শুরু করলেন। এখন ইন্দ্র বলছে আমি পড়ে যাচ্ছি কেন? তখন একজন বলল তক্ষকের জন্য পতন হচ্ছে। ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তরীয়কে খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এই হচ্ছে দেবতাদের চরিত্র। ব্যাসদেব যখন পরবর্তি কালে মহাভারত রচনা করলেন তখন এই দেবতাদের বানিয়ে দেওয়া হল হাসির পাত্র। কেন দেবতাদের হাসির পাত্র বানিয়ে দেওয়া হল এটা বলা মুশকিল। কারণ হিন্দু ধর্মে কাউকে অত সহজে হাসির পাত্র বানানো হয় না, তা সত্ত্বেও হাসির পাত্র করা হয়েছে। ঋকবেদের প্রথম মন্ত্র অগ্নিকে নিয়ে, অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, ব্যাসদেব যদিও অগ্নিকে সম্মান দিয়েছেন কিন্তু তিনিও অগ্নিকে মজার পাত্র করেছেন। অন্য দিকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণকে তো একেবারে লম্পট বানিয়ে ছেড়েছেন। ইসলাম ধর্মে যেমন বলা হয় আল্লা ছাড়া কিছু নেই, ব্যাসদেবও অনেকটা ঠিক এই রকম বলতে চেয়েছেন পরম ব্রহ্ম ছাড়া, বিষ্ণু ছাড়া বা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই। বাকি যত দেবতারা এরা মানুষেরই একটু বড় রূপ। যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি, তোমরা ভগবান নও তোমরা একটু উচ্চ ক্ষমতাবান পুরুষ। বৈদিক যুগ থেকে মহাভারতের যুগের এটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন। বেদের একটা অংশকে রাখা হল, আরেকটা অংশকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল। রাখা হল বেদের মন্ত্র শক্তিকে, বাদ দেওয়া হল মন্ত্রে যাদের প্রশস্তি করা হয়েছে। উত্তরীয় ফেলে দিতেই তক্ষকের থেকে ইন্দ্র আলাদা হয়ে গেল, ইন্দ্রও বেঁচে গেল। আসলে ইন্দ্রকে এখানে ঠাট্টা করা হল। তুমি ইন্দ্র কিন্তু এইতো তোমার চরিত্র! তুমি খুব তো শরণাগতির ভাব দেখাচ্ছিলে, তোমার নিজের উপর যখন বিপদ এলো তখনতো বললে না, আমার বন্ধু তোমার সাথে আমিও অগ্নিতে পুড়বো। যাই হোক আস্তিক মুনির বরে তক্ষক রক্ষা পেল।

মহাভারতের গুরু-পরম্পরা

ইতিমধ্যে ব্যাসদেবের অনেক বয়স হয়ে গেছে। ব্যাসদেব ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বাবা, পাণ্ডুর ছেলে অর্জুন, তার ছেলে অভিমন্যু, অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয়। সেই জনমেজয় রাজা হয়ে এখন করছে সর্পযজ্ঞ। সেই যজ্ঞে ব্যাসদেব এসে উপস্থিত হয়েছেন। ব্যাসদেবের তখন বয়স কম করে একশো কুড়ি হবে। কিন্তু এখানে বোঝা যাচ্ছে তিনি বয়ঃবৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এদিকে যজ্ঞ ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কিছু করার নেই, প্রচুর সময় হাতে রয়ে গেছে। তখন ওখানকার সবাই ব্যাসদেবকে ধরেছেন, আমরা শুনেছি আপনি মহাভারত নামে মহাকাব্য রচনা করেছেন, আপনি আপনার মহাভারতের কথা শোনান। ব্যাসদেব তখন বৈশম্পায়ন ঋষিকে বলছেন – তোমাকে এর আগে আগে মহাভারতের কথা যে রকমটি শুনিয়েছিলাম ঠিক সেই রকমটি সবাইকে শোনাও। বৈশম্পায়ন এইবার বলতে শুরু করলেন, কাহিনীর পর কাহিনী, একটা কাহিনীর মধ্যে আরও অনেক কাহিনী ঢুকে যাচ্ছে। সেখানে সৌতিও শুনছেন।

কিন্তু মহাভারতের কাহিনীটা মূল বলতে শুরু করেছেন সৌতি। সৌতি বলছেন শৌনক ঋষিকে। মহাভারতের প্রথম আটান্নটি অধ্যায় হল মহাভারতের ভূমিকা, এটাকে ঠিক মূল মহাভারত বলা যায় না। এতক্ষণ যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম এটা মহাভারতের ভূমিকা থেকেই আলোচনা করা হচ্ছিল। মূল মহাভারত আলোচনা শুরু হয় সেখান থেকে যেখানে জনমেজয় সর্পযজ্ঞ শুরু করছে। আমরা এর আগে দেখেছিলাম চারজনকে নমস্কার জানিয়ে এই জয় নামক কাহিনীকে শুরু করতে বলা হচ্ছে, নর ও নারায়ণ ঋষি, সরস্বতি দেবী ও ব্যাসদেবকে প্রণাম জানিয়ে জয় নামক এই কাহিনী শুরু করা হচ্ছে। মহাভারতের আদি নাম জয়, পরে এর নাম হয় ভারত তারপরে এর নাম হয়ে গেল মহাভারত। পুরানের পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্যই হল কাহিনী যখনই শুরু করা হবে বলবে নারায়ণ ছিলেন, সেই নারায়ণ ক্ষীরসাগরে অনন্ত

নাগের উপর শুয়ে ছিলেন, এইখান থেকে শুরু করে ব্রহ্মা, তারপর ব্রহ্মা থেকে পর পর চলতে থাকবে। ইতিহাসেও এই পরম্পরা বৈশিষ্ট্য আছে, যদি আদিতে নাও থাকে তবে কোন একটা জায়গায় গিয়ে এইখান থেকেই শুরু করবে। কালিদাস এই প্রথাটাকে ধরে রেখেছিলেন। এখনও আমরা যখন কাহিনী শুরু করি তখন কোন একটা জায়গা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে মূল চরিত্রে এনে ফেলা হয়। যেমন শ্রীরামকথা যখন শুরু হয় দশরথ থেকেই শুরু করা হয়, শ্রীরাম থেকে শুরু হয় না, একটা প্রেক্ষাপটকে আগে তৈরী করা হয়।

এখানে প্রথমে তিনটে চরিত্র আসছে, বৈশম্পায়ন, সৌতি এবং শৌনক। বৈশম্পায়ন হলেন ব্যাসদেবের প্রধান শিষ্য। ব্যাসদেবকে যখন মহাভারতের কাহিনী বলতে বলা হল তখন ব্যাসদেব বলছেন – *কুরুণাং পাণ্ডবানং চ যথা ভেদোহভবৎ পুরা তদস্মৈ সর্বমাচক্ষ্ব যন্মত্তঃ শ্রুতবানসি।।*১/৬০/২২, হে বৈশম্পায়ন তোমাকে এর আগে বলেছি পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যে কিভাবে লড়াই হয়েছিল আর তাদের বৈরী ভাবের কোথা থেকে সূত্রপাত তাও বলেছি – *তদস্মৈ সর্বমাচক্ষ্ব যন্মত্তঃ শ্রুতবানসি*, যেমনটি তুমি আমার কাছে শুনেছ, সেই রকমটি তুমি সবাইকে শোনাও আর আমিও এখানে আছি। এইবার বৈশম্পায়ন বলতে শুরু করবেন। প্রথমে শুরু হয়েছে সৌতি উবাচ বলে, সেখানে আছেন শৌনক মুনি। শৌনক মুনি বলছেন যখন বৈশম্পায়ন বলেছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত থেকে পুরোটা শুনেছি, বৈশম্পায়ন বলছেন আমি যেমন ব্যাসদেবের কাছে শুনেছি। এখানেই আমরা মহাভারতের চারজন ধারাভাষ্যকার পেয়ে যাচ্ছি। ব্যাসদেব নিজে লিখেছেন, ব্যাসদেব বলেছেন বৈশম্পায়নকে। বৈশম্পায়ন এই মহাভারতকে জন সমক্ষে বলছেন ঠিক জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের পরে। সেখানে বসে ছিলেন শৌনক ঋষি, তিনি বৈশম্পায়নের কাছ থেকে সরাসরি শুনেছিলেন। শৌনক ঋষি এই কাহিনীটা পুরোপুরি আবার বলেছিলেন উগ্রশ্রবা সৌতিকে। সেই সৌতি গেছেন নৈমিষারণ্যে যেখানে বারো বছর ধরে এক যজ্ঞ চলছে। সেখানে সবাই সৌতিকে বলছেন আপনি সেই কাহিনী শোনান। সেই যজ্ঞটা আবার করছিলেন শৌনক ঋষি, এটা আরও মজার ব্যাপার, যাঁর কাছ থেকে শুনেছিলেন তাঁকেই আবার শোনাচ্ছেন। বৈশম্পায়নও তাই, তিনি তাঁর গুরু ব্যাসদেবের কাছে শুনেছিলেন, আবার ব্যাসদেবকেই শোনাচ্ছেন। গুরুর কাছে শিষ্য শিখেছে, শিষ্য এবার বাকিদের শোনাচ্ছে আর গুরুও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন, তিনি নিজেও শুনছেন। মহাভারতের কথা আসছে ব্যাসদেব থেকে বৈশম্পায়নের কাছে, বৈশম্পায়নের কাছ থেকে শৌনক, শৌনক থেকে সৌতি। সৌতির দুটি নাম ছিল, সৌতি আর উগ্রশ্রবা। জনমেজয়ের প্রজন্ম এসেছে ব্যাসদেব থেকে, ব্যাসদেব থেকে পাণ্ডু, পাণ্ডু থেকে অর্জুন, অর্জুন থেকে অভিমন্যু, অভিমন্যু থেকে পরীক্ষিৎ এবং পরীক্ষৎ থেকে জনমেজয়। গুরুর পরম্পরাটা এই রকম – ব্যাসদেব, ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন, বৈশাম্পয়নের শিষ্য শৌনক আর শৌনকের শিষ্য সৌতি। মজার ব্যাপার হল, রাজা বিচিত্রবীর্যের সন্তান উৎপত্তির ক্ষমতা ছিল না, সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুরের জন্ম দিয়েছিলেন ব্যাসদেব। ব্যাসদেবের দুটো লাইন এসে গেল, একটা রাজার দিকের লাইন অন্য দিকে পণ্ডিতদের লাইন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম ব্যাসদেবের থেকে হয়েছিল।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম

সত্যবতী যখন বুঝলেন বিচিত্রবীর্যের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নেই, তিনি তখন তাঁরই সন্তান ব্যাসদেবকে ডেকে বললেন তুমি আমাদের এই রাজবংশ রক্ষা কর। ব্যাসদেবের কাছে প্রথম পত্নিকে পাঠানো হল, প্রথম পত্নি তো ব্যাসদেবের চেহারা দেখে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। ব্যাসদেব নাকি খুব কুরূপ ছিলেন। প্রথম পত্নির ছেলে হয়ে গেল অন্ধ, যার নাম ধৃতরাষ্ট্র। এরপর দ্বিতীয় পত্নিকে পাঠানো হল, এই পত্নি আবার ব্যাসদেবকে দেখে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। তার যে সন্তান জন্ম নিল তার শরীর পুরো হলুদ হয়ে গেল, তার নাম হল পাণ্ডু। দ্বিতীয়বার সে ব্যাসদেবের কাছে গেলই না, না গিয়ে নিজের দাসীকে ব্যাসদেবের কাছে পাঠিয়ে দিল। দাসী নিজেকে খুব ধন্য মনে করল, এত বড় ঋষি তিনি আমাকে সন্তান দিচ্ছেন। সেই দাসী নিজেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাসদেবের কাছে নিজেকে সমর্পিত করল। তার সন্তান হয়ে গেল বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বিদুরকে কখনই দাসী পুত্র রূপ গণ্য করতেন না, নিজের ভাই রূপেই দেখতেন।

পাণ্ডু ব্যাসদেবের থেকে জন্ম নিল কিন্তু অর্জুনকে ব্যাসদেবের নাতি বলা হয় না, বিচিত্রবীর্যেরই নাতি বলা হয়। তার কারণ, যখন দেখা যায় কেউ সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম তখন নিজের বংশের কাউকে বা কোন উচ্চবংশের কাউকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়, যাকে ভাড়া করে আনা হয় তার জন্য তাকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া হয়। এর মধ্যে অনেকগুলো নিয়ম আছে, প্রথম হল সে মেয়ের মুখ কোন দিন দেখতে পারবে না, মেয়েও ছেলের মুখ কোন দিন দেখতে পারবে না, মেয়ে কখনই সেজেগুজে প্রসাধন করে যেতে পারবে না, মেয়ের সারা অঙ্গে তেল লাগানো থাকবে, এই ধরণের

অনেক নিয়ম ছিল। এই সব নিয়মের সাথে সাথে ঐ পুরুষকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আপ্যায়ন করা হবে। যখনই জানা যাবে মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেছে তখনই তাঁকে ঐ দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হবে। আজ ভারতে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন চালু হয়ে গেছে, অথচ আমাদের পরম্পরাতে এই জিনিষ অনেক দিন আগে থাকতেই চালু আছে। এখন বংশ বা জাত দেখা হয় না, কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য দেখে নেওয়া হয়। আগে বংশ ও জাতটাও দেখা হত। এসব ক্ষেত্রে যে সন্তান দিয়েছে সেই সন্তানের উপর তার কোন অধিকার দেওয়া হতো না। এই সন্তান এখন এই পরিবারেরই সদস্য, কারণ তার জন্য তাকে আগেই দক্ষিণা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাসদেবকে কি দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে? ব্যাসদেবকে বলা হল এটা তোমার মায়ের আদেশ, সত্যবতী তো ব্যাসদেবের মা। মায়ের আদেশ এটাই ব্যাসদেবের মূল্য, কারণ ব্যাসদেব মাকে কথা দিয়েছিলেন, মা তুমি যেটা আদেশ করবে আমি তা পালন করব।

মনুস্মৃতিতে এই ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সন্তান কত রকম ভাবে হতে পারে। যদি কেউ ভালোবেসে বলে তুমি আমার সন্তান তখন সেও সন্তান আবার অপরের সন্তানকে দত্তক নেওয়া যায়, এই ভাবে সাত রকম ভাবে সন্তান নেওয়া যায়। আজকে এগুলো শুনলে আমাদের অবাক লাগে, কিন্তু সারা বিশ্বে আজ এই প্রথাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়েছিল কলসিতে, আর এখন এসে গেছে টেস্ট টিউব বেবী, একই জিনিষ। ক্লোনিং, টেস্ট টিউব বেবী এগুলো আমাদের কাছে কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আমাদের ইতিহাসে যত বিখ্যাত চরিত্র আছে তাঁদের অনেকের এভাবেই জন্ম হয়েছিল। ব্যাসদেবের সন্তান শুকদেব। ব্যাসদেবের বউয়ের কি নাম? কেউ বলতে পারবে না, কারণ উনি কোন দিন বিয়েই করেননি। এক অপ্সরাকে দেখে ব্যাসদেবের জীবনে একবারই কাম উদয় হয়েছিল। তিনি যখন কামকে প্রশমিত করতে পারলেন না, তখন তিনি সেই সন্তানোৎপত্তির শক্তিটাকে অগ্নিতে স্থাপিত করে দিলেন। অগ্নিই তখন হয়ে গেল মাতৃগর্ভ, সেখান থেকে জন্ম নিলেন শুকদেব। অথচ শুকদেবের কোন মা নেই। অপ্সরার নাম ছিল শুকী, সে আবার একটা টিয়া পাখির রূপ ধারণ করে বসেছিল, সেই থেকে ব্যাসদেবের সন্তানের নাম হয়ে গেল শুকদেব, আর তাঁর নাকটাও ছিল টিয়া পাখির মত। আসলে এই সব কাহিনীর বলার একটাই উদ্দেশ্য সন্তান উৎপত্তিতে শারীরিক সংযোগের কোন মূল্যই নেই।

এখন কে কিভাবে জন্ম নিচ্ছে এগুলোরও মহাভারতের কাছে কোন দাম নেই। সমগ্র মহাভারত মূল্য দেয় একমাত্র ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে। তুমি এই পৃথিবীর বুকে এসে গেছ, কিভাবে এসে পড়েছ তার কোন মূল্য নেই, এখন তুমি এক মানবজীবন পেয়ে গেছ। এরপর এই জীবনকে তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়ে ওপরের দিকে যাবে সেটার জন্য তোমাকে মহাভারত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দেবে।

মহাভারতের উপক্রমণিকা *(মহাভারতের মাহাত্ম্য বর্ণন –দিনে একশটি শ্লোকের রচনা–চারটি পুরুষার্থের কথা-পৃথিবীর পাপের বোঝা বৃদ্ধি-উনপঞ্চাশ মরুৎএর জন্ম – অবতারের অংশ, কলা ও পূর্ণের ব্যাখ্যা – গান্ধারীর একশ পুত্রের জন্ম রহস্য)*

বাল্মীকি রামায়ণের মত বলা যায় না আসল মহাভারত ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে। কোথাও ব্যাসদেব বলছেন আর কোথায় ব্যাসদেব থেকে দায়ীত্ব নিয়ে বৈশম্পায়ন শুরু করছেন, এটা ঠিক পরিষ্কার বলা যায় না। সেইজন্য ঊনষাটতম অধ্যায়কে বলা হয় উপক্রম। এর মধ্যে প্রথমে মহাভারতের মাহাত্মর বর্ণনা করা হচ্ছে। মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বৈশম্পায়ন বলছেন *ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ। মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতম্*।। ১/৬২/৫২। প্রত্যেক দিন সকালবেলা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই মহাভারত রচনা করতে বসতেন। এই মহাভারত রচনা করতে তাঁর তিন বৎসর লেগেছিল। এখন যদি হিসাব করা যায়, তিন বছর মানে মোটামুটি এক হাজার দিন, আর এক লক্ষ শ্লোকের হিসাবে দিনে একশটি শ্লোক তিনি রচনা করতেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন পুরো এক লক্ষ শ্লোক ব্যাসদেব নিজে রচনা করেননি, প্রথম দিকে প্রায় হাজার শ্লোক ব্যাসদেবের নিজের রচনা নয়। তবে যারা প্রতিভাবান কবি তাঁর পক্ষে, যেখানে বিষয় বস্তু জানা আছে সেখানে দিনে একশ শ্লোক রচনা করা খুব বিরাট কিছু বলে মনে হয় না। তিন বছরে ব্যাসদেব যদি পুরো মহাভারতকে সাজিয়ে দিতে পারেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, আর ব্যাসদেবের মত মুনি ঋষিদের আমরা কেনই বা সন্দেহ করতে যাব। আর এটা এমনিতেও যুক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়, যিনি এত বড় পণ্ডিত, তপস্বী, এত বড় সাধক, যিনি বেদ বেদান্ত সবই জানেন আর জন্ম থেকেই সব কিছু জানেন, তাঁকে কিছু শিখতেই হয়নি, তিনি যদি দিনে একশটি শ্লোক রচনা করেন তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

এরপর বৈশম্পায়ন বলছেন, এটি মহাভারতের খুব নামকরা শ্লোক *ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ। যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ।।১/৬২/৫৩।* – হে জনমেজয়, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের ব্যাপারে মহাভারতে যা বলা হয়েছে অন্যত্র এইটাই পাওয়া যায়, এখানে যেটা নেই সেটা অন্যত্র কোথাও নেই। জগতে যত বইয়ে এই চারটের ব্যাপারে যা আছে তার সবটাই এই মহাভারতে দেওয়া আছে, মহাভারতে এই চারটের ব্যাপারে যেটা বলা নেই সেটা জগতের কোথাও নেই। পুরো সভার মাঝখানে বৈশম্পায়ন ব্যাসদেবের সামনে এই কথা জনমেজয়কে বলছেন। এটি অত্যন্ত খাঁটি কথা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ব্যাপারে যত কথাই বলা হোক না কেন, আর সে যত বড় লেখকই হোন, মহাভারতকে অতিক্রম করে যাওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। মহাভারতের ভেতরে যতই ঢুকবো ততই মহাভারতের উপরে এই বক্তব্যের সারমর্ম বুঝতে পারব।

এরপরই কাহিনীর শুরু হচ্ছে। মহাভারত হল ইতিহাস পুরান, ইতিহাস পুরান সব সময়ই পুরানের ঢংয়ে লেখা হয়ে থাকে। পুরানে দেখা যায়, যখনই পৃথিবীতে প্রচুর অনাচার আর অধর্ম বেড়ে যায় তখনই পৃথিবী বা অন্য কেউ ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা শিবের কাছে গিয়ে বলবে – আমি আর এই অনাচার আর অধর্মের ভার বইতে পারছি না। ঠিক এই রকম পৃথিবী যখন খুব বিপদে পড়ে গেছে তখন সে ব্রহ্মার কাছে গেছে। ব্রহ্মা শুনে বললেন, হে পৃথিবী তোমার উপর অনেক পাপের বোঝা চেপে গেছে, আমি জানি তুমি আর এই পাপের ভার বইতে পারছো না। ঠিক আছে আমি সব দেবতাদের এই ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছি। ব্রহ্মা হচ্ছেন বিষ্ণু বাদে সবারই স্রষ্টা, দেবতাদেরও তিনি স্রষ্টা, বিষ্ণু হলেন ভগবান। বিষ্ণুর দুটি দিক আছে, একজন হলেন ভগবান বিষ্ণু, আরেকজন হলেন আদিত্য নামের দেবতাদের মধ্যে একজন আদিত্য বিষ্ণু। বেদে ভগবান বিষ্ণু বলে কিছু নেই, বেদে বিষ্ণু একজন দেবতা মাত্র।

ব্রহ্মা বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে যখন বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করেছিলেন তখন তিনি এই আদিত্য দেবতাদেরও সৃষ্টি করেছিলেন। দেবতারা একটা জাতি, সেই রকম দৈত্য, অসুর, সর্প, রাক্ষস এরাও নানা রকমের জাতি। কাশ্যপ মুনির চৌষট্টি জন পত্নি ছিল, প্রত্যেকেই এক অপরের বোন। তাদের থেকে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। অদিতির সন্তানদের বলা হল আদিত্য, বারোজন আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু একজন আদিত্য, ইন্দ্রও দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন আদিত্য। দিতির থেকে যে সন্তানদের জন্ম হল তাদের বলা হত দৈত্য। ঠিক তেমনি আরেকটি বোন ছিল কদ্রু, কদ্রু থেকে সর্পজাতির জন্ম হল, তক্ষক হল এই বংশের। এই রকম বিনীতার সন্তানের নাম গরুড়। সব সন্তানই শক্তিমান কিন্তু বিভিন্ন সন্তানের বিভিন্ন রকমের শক্তি ছিল।

এদের অনেকের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল আবার শত্রুতাও ছিল, যার ফলে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি হত। দিতির সন্তানরা যখন ইন্দ্রের হাতে প্রচণ্ড মার খেতে থাকল তখন দিতি কাশ্যপের কছে এমন সন্তান চাইল যে ইন্দ্রকে শেষ করে দেবে। কাশ্যপও বর দিয়েছেন, বর দিয়ে বলে দিলেন, তুমি খুব নিয়মের মধ্যে নিজেকে সংযত ভাবে রাখবে, এই এই করবে না, খুব সাবধাণে থাকবে, দেখবে তোমার এই সন্তানকে কেউ হারাতে পারবে না। ইন্দ্র খবর পেয়ে খুব ভয় পেয়ে গেছে। তখন থেকে ইন্দ্র উঠে পড়ে লেগেছে কিভাবে দিতির এই গর্ভটাকে নষ্ট করে দেওয়া যায়। একদিন দিতি সারাদিন উপোস আর ব্রত করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সেদিন সে পা না ধুয়ে শুতে চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র ছিদ্র পেয়ে গেল। এখানে মহাভারত সবাইকে শিক্ষা দিয়ে দিল, ঘুমোতে যাবার আগে পা ধুয়ে তারপর ঘুমোতে যাবে। এইবার ইন্দ্র ঐ পায়ের মাধ্যমে নিজের সৎ মায়ের গর্ভে ঢুকে গেছে। গর্ভে ঢুকেই বজ্র দিয়ে ঐ গর্ভকে সাতটি টুকরো করে দিয়েছে। গর্ভের মধ্যে সাতটি টুকরো এখন কাঁদতে শুরু করেছে। ইন্দ্র তাদের বলছে 'মা রুদ', মানে তোমরা কেঁদো না। তখন এরা বলছে আপনি কে। ইন্দ্র বলছে, আমি তোমাদের দাদা। আমাদের দাদা হয়ে তুমি আমাদের কষ্ট দিচ্ছ কেন। ইন্দ্র দেখছে এখনো এদের থেকে আমার ভয়ের কারণ আছে, তখন সে প্রত্যেকটি টুকরোকে আরও সাত খানা করে টুকরো করল। যখন জন্ম হল তখন দিতি দেখছে একটা সন্তানের জায়গায় ছোট ছোট ঊনপঞ্চাশটি সন্তান। এরাই হয়ে গেল মরুৎ। দিতি খুব রেগে গেছে। কশ্যপ মুনিকে গিয়ে বলছেন, এটা কি হল! কশ্যপ মুনি বলছেন, তোমাকে তো বলেই ছিলাম খুব সাবধানে থাকতে, তুমি পা না ধুয়ে কেন শুতে গিয়েছিলে। দিতির রাগ কমার কোন লক্ষণই নেই, সে এখন ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে চলেছে। ইন্দ্র আবার ছুটে এসে সৎ মায়ের পা ধরে বলছে, মা তুমি আমায় ক্ষমা কর। কপাল এমন, ইন্দ্র এদের বলেছিল আমি তোমাদের দাদা, এরাও ইন্দ্রকে দাদা মনে করে ইন্দ্র যেদিকে যায় এরাও ইন্দ্রের পেছন পেছন যেতে শুরু করল, এরা হয়ে গেল ইন্দ্রের চেলা। ঊনপঞ্চাশটি মরুৎ এইভাবে সৃষ্টি হল, যখন মিষ্টি বাতাস চলে তখন এক রকম বায়ু, ঝড় যখন বয়

তখন এক রকম বায়ু, এই ভাবে ঊনপঞ্চাশ রকমের বায়ু হয়ে গেল। ইন্দ্র হলেন বৃষ্টির দেবতা, আমরা বলি বাদলা বৃষ্টি, বাতাস আর বাদল এক সঙ্গে চলে। মরুৎ আর ইন্দ্রকে কথাকাররা এক সঙ্গে সুন্দর করে কাহিনীর মাধ্যমে মিশিয়ে দিলেন। একদিকে চলছে মেঘ, বাতাস ছাড়া মেঘ চলবে না, বাতাস ছাড়া মেঘের কোন শক্তিই নেই। তাই বাতাসের যারা দেবতা তাদের ইন্দ্রের সঙ্গী হতে হবে, পুরানের কাহিনীর মাধ্যমে ইন্দ্রের সাথে ঊনপঞ্চাশ রকমের বাতাসকে জুড়ে দেওয়া হল। ঊনপঞ্চাশটি বাতাস ইন্দ্রের বন্ধু হয়ে গেল, এদের বলা হয় মরুৎগণ। এইভাবে পুরানের সব কথা কাহিনী দাঁড়িয়েছে। এই কাহিনী কবে থেকে চলে আসছে আমরা কেউ বলতে পারবো না, আট হাজার দশ হাজার আগে থাকতেই চলে আসছে। এগুলো ব্যাসদেবের রচনা নয়, এই কাহিনীগুলো আগে থাকতে মানুষের মুখে মুখে চলে আসছিল। ব্যাসদেব শুধু এই কাহিনীগুলিকে সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে পরিবেশন করে দিলেন।

এখন একজন মুর্খ চাষা কোন সাধু বা পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা এই মেঘগুলো আকাশে কি করে ভেসে বেড়াচ্ছে? তখন পণ্ডিত তাঁর কাল্পনিক শক্তি দিয়ে বললেন, ইন্দ্র আর মরুৎ হচ্ছে বন্ধু। আচ্ছা বাতাস এত রকমের কেন হয়? পণ্ডিত তখন ঐ কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। এখন ঐ কাহিনী এত প্রিয় হয়ে গেল যে সবাই এটাকেই মেনে নিয়েছে। এই কাহিনীকেই আস্তে করে ব্যাসদেব নিজের মহাভারতে ঢুকিয়ে দিলেন। পৌরানিক কাহিনী ঠিক এই ভাবেই সৃষ্টি হয়। একটা প্রাকৃতিক বিষয় রয়েছে, সেটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আরেকটি অতিপ্রাকৃতিক কিছুকে নিয়ে আসা হয়। এই ধরণের কাহিনী, যেমন মরুৎ আর ইন্দ্রের এই কাহিনীতে আমাদের জন্য কোন তাৎপর্য নেই। অন্যান্য কাহিনীতে আমাদের জন্য অনেক কিছুর শিক্ষা থাকবে কিন্তু সব সময় যদি তাৎপর্যকেই খুঁজতে যাই তখন সেটা শুধু শিক্ষাই হয়ে যাবে। যেমন সদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করিবে না, এই কথা শুধু বলে গেলে কেউ মানতে চাইবে না, এর মধ্যে ঝাল-মশলা না দিলে কেউ মানবে না, এগুলো হল ঝাল-মশলা।

ব্রহ্মা পথিবীকে বলে দিলেন আমি দেবতাদের সব কাজের দায়ীত্ব দিচ্ছি যাতে তাঁরা তোমার উপর যে পাপের বোঝা চেপেছে সেটাকে লাঘব করতে পারে। দেবতারা এদিকে নারায়ণের কাছে গিয়ে সব বলছেন। নারায়ণ বলছেন – ঠিক আছে আমিও অবতরণ করছি, আপনারাও বিভিন্ন জায়গায় অংশ অবতার হয়ে অবতরণ করুন। ইন্দ্র তখন বিষ্ণুকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন – *তং ভুবঃ শোধনায়েন্দ্র উবাচ পুরুষোত্তমম্। অংশেনাবতরেত্যেবং তথেত্যাহ চ তং হরিঃ।।১/৬৪/৪৪।*.ইন্দ্র বলছেন আপনার অংশ অবতার থেকে আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হউন। কিন্তু ভাগবতে এর ঠিক বিপরীত দেখানো হয়েছে। ভাগবতে যখন অবতারাদির বর্ণনা করা হবে তখন বলবে, বাকি অবতাররা হলেন কলা আর অংশ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। মহাভারতে ব্যাসদেব বলছেন, *অংশেনাবতরেত্যেবং* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি নারায়ণের অংশ অবতার। এই ব্যাসদেব আবার যখন ভাগবত লিখছেন তখন বলছেন শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ঠাকুরও কথামৃতে অনেকবার অংশ আর কলার কথা বলছেন। ঠাকুর ভাগবত শুনেছিলেন, আর ভাগবত পরম্পরাতেই তিনি জোর দিয়ে গেছেন, সেইজন্য এই শব্দগুলো প্রায়ই তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ দেখা গেছে। স্বামীজী বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারবরিষ্ঠায়, ঠিক তেমনি কাউকে পূর্ণ অবতার, কাউকে অংশ অবতার বলা হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটাই এখানে আনা হচ্ছে। তবে ব্যাসদেব মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে অংশ অবতার বলছেন কিন্তু ভাগবতে গিয়ে এই শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণাবতার বলছেন। আবার দক্ষিণশ্বরে পণ্ডিতদের বিচার সভার শেষে একজন ঠাকুরকে বলে দিলেন – আপনাকে অবতার বলে এরা ছোট করছে, আপনি হলেন অবতারি। এখানে আবার অবতারের নতুন একটা পরিভাষা এসে গেল, অবতারি, মানে যেখান থেকে যার শক্তিতে অবতাররা অবতরণ করেন, ঠাকুর সেই অবতারি। এগুলো আসলে শব্দের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। গীতার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। এখন যিনি স্বয়ং ভগবান তিনি এখন ভগবানের পূর্ণ না অংশ না কলা এগুলোর আর কোন অর্থই হয় না। ভগবান ভগবানই, এখন তিনি তাঁর শক্তির খেলা কতটা দেখাবেন সেটা তাঁর যেমন প্রয়োজন হবে, ইচ্ছে হবে সেইটুকুই দেখাবেন। শ্রীরাম থেকে শ্রীকৃষ্ণ বড় না শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এঁদের দুজনের থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বড়, এই ব্যাপার গুলো একেবারেই ছেলেমানুষি। ঠাকুরই বলছেন মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টিই লাগবে।

নারায়ণের কাছে সবাই গিয়ে আর্জি জানানো থেকে মহাভারতের মূল প্রেক্ষাপটটা তৈরী হয়ে গেল। এরপর শুরু হচ্ছে আসল কথা কাহিনী। এরপর আসবে মরীচির কাহিনী, সেখান থেকে চলে আসবে দক্ষের কাহিনী, তার সব কন্যাদের বিবরণ, সেই কন্যাদের কোথায় কোথায় বিয়ে হল, কোথা থেকে কার জন্ম হল এই নিয়ে এক বিরাট জটিল তালিকা।

সেখান থেকে কিভাবে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম, ধৃতরাষ্ট্রের একশটি সন্তানের জন্ম তাদের সবার নাম। এদের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণের নামই সবাই মনে রাখে। আবার একশ সন্তানের মধ্যে যেমন ভীম নামেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র আছে কর্ণ নামেও পুত্র আছে। একদিকে কর্ণ যেমন অধিরথ সূত পুত্র যে দুর্যোধনের বন্ধু আবার অন্য দিকে কর্ণ নামে দুর্যোধনের এক ভাইও আছে, সেই রকম ভীম কৌরবদের এক ভাইয়ের নাম আবার পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে মধ্যম পাণ্ডবের নাম ভীম। এদের মধ্যে যুযুৎসুর নামও খুব প্রচলিত। রাজস্থানের দিকে যুযুৎসুর অনেক অনুগামী পাওয়া যায়। যুযুৎসুকে নিয়ে পরে অনেক কাহিনী তৈরী হয়েছিল।

গান্ধারীর ইচ্ছে ছিল তাঁর একটি খুব শক্তিশালী পুত্র হোক। গান্ধারীকে ব্যাসদেব সেই রকমই বর দিয়েছিলেন। পাণ্ডু তখন কুন্তি ও মাদ্রী সহ জঙ্গলে ছিলেন। হস্তিনাপুরে গান্ধারীর কাছে খবর এলো জঙ্গলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়েছে। গান্ধারী তখনও অন্তঃসত্ত্বা, খবর পেয়ে গান্ধারী খুব ভেঙ্গে পড়লেন। এমনিতে গান্ধারী খুবই ভালো নারী ছিলেন, কুন্তি ও মাদ্রীকে খুব ভালোবাসতেন। মেয়েদের চরিত্র যে একেবারেই বোঝা যায় না, এটা মহাভারতে খুব ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছে। যেমন যেমন আমরা কাহিনীর মধ্যে ঢুকবো তখন দেখতে পাবো মেয়েদের চরিত্র কত জটিল থেকে জটিলতর। গান্ধারী চিরদিনই কুন্তিদের ভালোবেসে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে একটা আশঙ্কা ছিল আমার পুত্র যদি জেষ্ঠ না হয় তাহলে আমি হয়তো মুশকিলে পড়ে যাব। সন্তানের জন্ম হচ্ছে না দেখে গান্ধারী পেটে ঘুষি মেরে মেরে সন্তানের জন্ম দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সন্তান হল কিন্তু একটা মাংস পিণ্ডের মত বেরিয়ে এলো। গান্ধারী তখন কান্নাকাটি করতে শুরু করলেন। যথারীতি ব্যাসদেবকে খবর পাঠানো হল। ব্যাসদেব এসে বললেন, তোমাকে তো বলা হয়েছিল অপেক্ষা করতে, তুমি কেন এই ভাবে জোর করে সন্তানের জন্ম দিতে গেলে। এখনতো আর কিছু করার নেই, তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, এখন তুমি কি চাও বল। গান্ধারী তখন বললেন আমার একশটি সন্তান চাই। একটি শক্তিশালী পুত্রের জায়গায় একশটি পুত্র চাইলেন। তখন ব্যাসদেব গান্ধারীকে ঐ মাংস পিণ্ডকে টুকরো করে দিতে বললেন। টুকরো করতে গিয়ে গান্ধারী একশো বার টুকরো করে দিয়েছে। একটাকে এক টুকরো করলে দুটো হবে, সেই ভাবে একশোর জায়গায় একশো একটি টুকরো হয়ে গেছে। গান্ধারী একশোটাই পুত্র সন্তান চেয়েছিলেন, এখন এই একটি টুকরো একটি মেয়ে হয়ে গেল, সেই মেয়ের নাম দুঃশলা। এই কাহিনীগুলো পরের দিকে আসবে।

বিশ্বামিত্র ঋষির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মহাভারতে কিছু কিছু নাম ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মেলানো যায় না। এরমধ্যে সব থেকে বিখ্যাত নাম হল বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠের নাম। এই দুজনের নাম কোথায় কোথায় নেই! এত কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে যে এনাদের ইতিহাসটা কিছুতেই মেলানো যায় না। আরেকজন হচ্ছে যাজ্ঞবল্ক্য, এই তিনজনকে ইতিহাসের কোন জায়গা থেকে শুরু করা হয়েছে বলা খুব মুশকিল। বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠের কাহিনীর কোনটা যে পৌরানিক আর কোনটা যে ইতিহাস বোঝাই যায় না। যাজ্ঞবল্ক্যের ক্ষেত্রে আরো গণ্ডগোল হয়ে যায়, পুরো বৃহদারণ্যক উপনিষদ হচ্ছে যাজ্ঞবল্ক্যের, অথচ তাঁর কাহিনীগুলোকে মেলানো যায় না। আমাদের এগুলোকে নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না করাই ভালো।

বিশ্বামিত্র ছিলেন একজন খুব বড় তপস্বী ঋষি। কিন্তু প্রথমে জীবনে তিনি ছিলেন একজন ক্ষত্রিয় রাজা। অন্যদিকে বশিষ্ঠও ছিলেন খুব উচ্চমার্গের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি। বিশ্বামিত্র যখন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন সেই সময় কোন এক ঘটনায় বশিষ্ঠ ঋষির সাথে বিশ্বামিত্রের ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হয়। সেই সময় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির কাছে পরাস্ত হওয়ার পর তাঁর ক্ষত্রিয়ের প্রতাপের উপর প্রচণ্ড ধিক্কার এসেছিল। আমি একজন ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে এই সামান্য ব্রাহ্মণের কাছে হেরে গেলাম, ধিক্ আমার ক্ষত্রিয়ের প্রতাপে। আমি আর রাজ্যে ফিরে যাবো না। এই বলে তিনি সব সৈন্য সামন্তকে পাঠিয়ে দিয়ে জঙ্গলে তপস্যা করতে চলে গেলেন। তপস্যা করতে করতে যখন তাঁর শক্তি লাভ হল, প্রথম শক্তি পেতেই তিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে বশিষ্ঠকে আক্রমণ করেছেন। বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ড দিয়ে বিশ্বামিত্রের সব শক্তিকে শুষে নিলেন। আবার বিশ্বামিত্র তপস্যায় চলে গেলেন, এবারেও আবার ঘোর তপস্যা করে শক্তি পেতেই সেই শক্তি দিয়ে একটা রাক্ষস তৈরী করে বশিষ্ঠের সন্তানকে মারিয়ে দিলেন। বিশ্বামিত্র বুঝে গিয়েছিলেন লড়াই করে বশিষ্ঠের সাথে পেরে উঠবেন না, তাই ঐ শক্তিকে অন্য ভাবে কাজে লাগিয়ে বশিষ্ঠের সন্তানের জীবন নাশ করে দিলেন। মাঝখান থেকে বিশ্বামিত্রের তপস্যার সব শক্তিও চলে গেল, অন্য দিকে ব্রাহ্মণও হতে পারলো না। বিশ্বামিত্র আবার তপস্যা করতে চলে গেলেন। এবার আগের থেকে তিনি আরও জোর তপস্যা করতে লাগলেন। এদিকে এই তপস্যার তেজ দেখে ইন্দ্রও ঘাবড়ে গেছে, এই বুঝি আমার ইন্দ্রত্ব চলে গেল। ইন্দ্র তখন স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গের জন্য লাগালেন। মেনকা এসে বিশ্বামিত্রের

তপস্যার স্থলে নাচ গান করতে শুরু করে দিল। বিশ্বামিত্র তো আসলে ঋষি নন, তিনি জোর করে ঋষি হতে চাইছেন। মেনকার রূপে আকৃষ্ট হয়ে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন, এরপর মেনকার সাথে সমাগম হয়ে গেল। সমাগম হতেই বিশ্বামিত্রের হুঁশ হল, এটা কি হয়ে গেল। তখন তিনি আবার প্রচণ্ড রেগে গেছেন। মেনকাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার অন্য জায়গায় তপস্যার জন্য চলে গেলেন। এরপর স্বর্গের যত অপ্সরাকে পাঠানো হল তারা এসে বিশ্বামিত্রের ভয়েই পালিয়ে গেল। এরপর বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা দেখে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা এসে বিশ্বামিত্রকে বলছেন – তোমার মত এত বড় তপস্বী আর নেই। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাকে বললেন, আপনার কথাতে হবে না, বশিষ্ঠ এসে বলুক। তখন বশিষ্ঠ এসে বললেন, আপনি ব্রহ্মর্ষি। বিশ্বামিত্রকে প্রথমে বলা হল রাজর্ষি, কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ঠ হলেন না, আমি তপস্যা করে ব্রহ্মর্ষি হব। তারপর তিনি তপস্যা করে ব্রহ্মর্ষি হন, ক্ষত্রিয় থেকে তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। বিশ্বামিত্রের জীবনটা খুবই অদ্ভুত ও মজার ছিল। একটু তপস্যা করতে না করতেই তাঁর পতন হয়ে যেত। একবার তিনি এই রকম খুব তপস্যা করেছেন। তখন একজন এসে সব ঋষিদের বলতে লাগলেন, আমি সশরীরে স্বর্গে যেতে চাই। কোন ঋষিই রাজী হচ্ছেন না। তখন সে বিশ্বামিত্রের কাছে প্রার্থনা করতেই তিনি বললেন আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব। বিশ্বামিত্র পুরো তপস্যার শক্তিতে তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইন্দ্র এসে আবার তাকে লাথি মেরে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। বিশ্বামিত্রও তখন প্রচণ্ড রেগে গেছেন। বেচারা এখন স্বর্গ থেকে পড়তে শুরু করেছে, মাঝখানে আসতেই বিশ্বামিত্র বলছেন তুমি ঐখানেই থেমে যাও, তোমার জন্য আমি একটা নতুন স্বর্গই বানিয়ে দিচ্ছি। সেবার সব তপস্যার ফল চলে গেল ত্রিশঙ্কুর জন্য নতুন স্বর্গ বানাতে। মাঝখানে ব্রহ্মা এসে বিশ্বামিত্রকে নতুন স্বর্গ বানাতে আটকে দিয়েছেন। বেচারা এখন স্বর্গেও যেতে পারলো না, মর্তেও ফিরে আসতে পারলো না, বিশ্বামিত্রের জ্বালায় ত্রিশঙ্কু হয়ে এখনও ঝুলে আছে।

বিশ্বামিত্র যখনই কোন একটা তপস্যা শুরু করতে যাবেন তখন কোন না কোন একটা বিঘ্ন এসে যেত। তখন তিনি এমন একটা অলৌকিক কাজ করতে নেমে যেতেন যার ফলে সব শক্তি সেখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলেই সবাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আজকে আমরা যে বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি, বিশ্বামিত্রই এই গায়ত্রী মন্ত্র উদ্ধার করেছিলেন। বিশ্বামিত্রের কাহিনী গুলো শুনে আমাদের অনেক কিছু মনে হতে পারে, কিন্তু বিশ্বামিত্র ছিলেন প্রচণ্ড এক উচ্চশ্রেণীর ঋষি। ওনার সন্তানরা সবাই ব্রাহ্মণ। ইতিহাসে একমাত্র উনিই যিনি নিজের জীবদ্দশায় ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছেন। অথচ তাঁর বাবা পিতামহ এনারা সবাই ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, বিশ্বামিত্র হলেন গাধি পুত্র।

শকুন্তলার জন্ম

এখন বিশ্বামিত্রের সাথে মেনকার সমাগমে সন্তান হয়ে গেল, তাও একটি কন্যা সন্তান। কন্যার মা চলে গেল স্বর্গে, মেনকার তো সন্তান উদ্দেশ্য ছিল না, এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বামিত্রকে পথে বসানো। মেনকার তো কাজ হয়ে গেল, বিশ্বামিত্রের সব তপস্যার শক্তিকে শেষ করে ডুবিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। বিশ্বামিত্রের এখন দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে, কোথা থেকে কোথায় আমার পতন হয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে আবার তপস্যায় চলে গেলেন। এই কন্যা সন্তানকে তার মাও ছেড়ে চলে গেল স্বর্গে আর বাবাও ফেলে দিয়ে চলে গেলেন তপস্যায়। কয়েকটি শকুন পাখি সামান্য খাদ্য দিয়ে তাদের ডানার তলায় আশ্রয় দিয়ে ঐ বাচ্চাটির জীবন রক্ষা করল। এরপর কণ্ব ঋষি বাচ্চাটিকে তুলে আশ্রমে নিয়ে এসে লালন পালন করতে লাগলেন। শকুনরা বাচ্চাটার দেখাশোনা করেছিল বলে মেয়েটির নাম হল শকুন্তলা। বাবা ঋষি আর মা অপ্সরা, তাদের মেয়ে কি রকম রূপসী হবে কল্পনাই করা যাবে না। মহাভারতের এই শকুন্তলার কাহিনীকে আধার করেই কালিদাস তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ অভিজ্ঞান-শকুন্তলা সৃজন করেন।

এরপর রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে করতে কণ্বমুনির আশ্রমে এসে শকুন্তলাকে দেখে তার রূপে সম্মোহিত হয়ে গেছেন। তখন কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না, তাও রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে নিলেন। বিয়ের পর দুষ্মন্ত তাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন। এদিকে শকুন্তলার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। সন্তানের নাম রাখা হল ভরত। ভরত এখন কণ্বমুনির আশ্রমে বড় হতে লাগল। ভরত ছোটবেলা থেকেই এত শক্তিমান যে বাচ্চা বয়সেই সিংহের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াত। এখানে এসে কালিদাস অনেক নাটকীয়তা নিয়ে এসেছেন। শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের কথা চিন্তা করতে করতে এত তন্ময় হয়ে গেছে যে কখন দুর্বাস মুনি আশ্রমে এসেছেন খেয়ালই করতে পারেনি। দুর্বাসা তখন শকুন্তলাকে অভিশাপ দিচ্ছেন যার চিন্তা করতে গিয়ে তুমি আমাকে আপ্যায়ন করতেও ভুলে গেছে সেই কিন্তু আসল মুহুর্তে তোমাকে চিনতে পারবে না। মহাভারতে এত সব কথা বলা হচ্ছে না। এখানে দেখানো হচ্ছে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে বলছেন – যারা পতিব্রতা নারী দেবতারাও তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। তোমাকে আমি পালন করেছি, তুমি আমার কন্যা, এটাই তোমার পিতৃগৃহ।

তবে তুমি শুনে রাখো, *নারীনাং চিরবাসো হি বান্ধবেষু ন রোচতে। কীর্তিচারিত্রধর্মঘ্নস্তস্মান্নয়ত মা চিরম্।*।১/৭৪/১২। যে কোন স্ত্রীকে ভাই, বন্ধু ও বাপের বাড়িতে অপ্রয়োজনে বেশী দিন বসবাস করতে নেই। এগুলো হচ্ছে মহাভারতের ধর্মের উপর শিক্ষা। একটা শিশুকে কিভাবে থাকতে হবে, একজন নারীকে কিভাবে থাকতে হবে, কুমারীকে কিভাবে থাকতে হবে, বিবাহিতাকে কিভাবে থাকতে হবে মহাভারতে সব পর পর আলোচনা করা হবে। মহাভারত শাস্ত্রে কণ্ব ঋষির মুখ দিয়ে পরিষ্কার বলে দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে অযথা বাস করা যাবে না। কণ্বমুনি শকুন্তলাকে বলছেন, বিয়ের পর তুমি যদি বাপের বাড়িই থাকো বা বন্ধুর বাড়ি, আত্মীয়ের বাড়িই হোক বা ভাইয়ের বাড়ি হোক, মোদ্দা কথা স্বামীকে ছাড়া যদি কোথাও অনেক দিন বাস কর তাহলে তোমার তিনটে জিনিষ চিরতরে নাশ হয়ে যাবে – কীর্তি, চরিত্র ও ধর্ম। সেইজন্য মা, তোমাকে বলছি যত তাড়াতাড়ি পারো, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তুমি তোমার পতিগৃহে যাও।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত সংবাদ

শকুন্তলা পতিগৃহে এসেছে। কিন্তু দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে নিজের স্ত্রী বলে স্বীকারই করছেন না, আর খুব আঘাত করে শকুন্তলাকে বলছেন – *অব্রবীন্ন স্মরামীতি কস্য ত্বং দুষ্টতাপসি।*।১/৭৪/১৯। আমি তো তোমাকে মনে করতে পারছি না, হে দুষ্ট তাপসী তুমি কার স্ত্রী? মানে, শকুন্তলা জঙ্গলের কোন এক তপস্বীনি বেশে দুষ্টা নারী। তুমি আমার উপর ছল করে অধিকার কায়েম করতে চাইছ। মহাভারতে এইবার ধর্ম, অর্থ ও কামের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়ে গেল, এখানে মোক্ষ হবে না। যখন স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, যখন বন্ধুর সাথে সম্বন্ধ হয় তখন দেখতে হবে চারটে পুরুষার্থ সাধন হচ্ছে কিনা। চারটে পুরুষার্থ সাধন না হলে অন্ততঃ একটা পুরুষার্থ সাধন যেন হয়, একাধিক হলে আরও ভালো। স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে যখন সম্পর্ক হবে তখন তিনটে পুরষার্থের অবশ্যই সাধন হওয়া চাই – ধর্ম, অর্থ ও কাম। গুরু শিষ্যের সম্পর্কে সব সময় মোক্ষ সাধন। যদি কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক করতে চাই, কারুর সঙ্গে কথা বলতে চাই, কারুর সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে চাইছি আর যদি আমি জীবনে উপরের দিকে উঠতে চাই অর্থাৎ প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে বরণ করতে চাই তাহলে যদি দেখি এগুলো করে আমার এই চারটে পুরুষার্থের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কোনটাই সাধন হচ্ছে না তাহলে তক্ষুণি সেখান থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। দুষ্মন্ত এটাই বলছেন *ধর্মকামার্থসম্বন্ধং ন স্মরামি ত্বয়া সহ। গচ্ছ বা তিষ্ট বা কামং যদ্ বাপীচ্ছসি তৎ কুরু।*।১/৭৪/২০। আমারতো মনে হয় না, ধর্ম, অর্থ ও কামের কোন সিদ্ধির জন্য আমি তোমার ধারে কাছে গিয়েছিলাম। পুরুষ স্ত্রীর কাছে কেন যাবে? ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটের জন্যই যাবে। তিনটে যদি না হয়, দুটো, দুটো যদি না হয় একটা। আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না এই তিনটের কোন একটার জন্য আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, আমি তো রাজা, আমার এখানে তুমি যদি কোন আশ্রয় চাও তাহলে সেটুকুর ব্যবস্থা করে দিতে পারি, এরপর তুমি চাইলে থাকো, না থাকতে চাইলে চলে যেতে পারো।

মনে রাখতে হবে শকুন্তলা যার তার সন্তান নয়, স্বর্গের অপ্সরার কন্যা আবার বিশ্বামিত্র মত ঋষি তার বাবা। আবার কন্বমুনির কাছে তার শিক্ষাদীক্ষা। শকুন্তলা দুষ্মন্তের কথা শুনে রাগে আগুন হয়ে উঠেছে। শকুন্তলা বলছে – *মন্যতে পাপকং কৃত্বা ন কশ্চিৎ বেত্তি মামিতি। বিদন্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবান্তরপুরুষঃ।*।১/৭৪/২৯। 'যাঁরা অসত্য থেকে দূরে থাকেন, অর্থাৎ যাঁরা সাধুপুরুষ ধর্মই হচ্ছে তাঁদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ, ধর্ম ছাড়া তাঁদের কাছে কিছু নেই। ধর্ম কখনই কোন মানুষকে কষ্ট দেয় না। মানুষ মনে করে পাপ কর্ম করার সময় আমাকে কেউ দেখতে পায়নি, আমার পাপের কথা কেউ জানেনা, কিন্তু এরা জানেনা তিনজন সব সময় তোমার পাপকে দেখতে পাচ্ছে, এই তিনজন হলেন – দেবতারা, অন্তর্যামী আর পরমাত্মা'। পরের দিকে অন্তর্যামী আর পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে এই দুটোকে আলাদা করে দেখা হত। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে আত্মা আলাদা ঈশ্বর আলাদা, আমাদের পরম্পরাতে প্রথমে আলাদা ছিল পরের দিকে দেখা গেল শুদ্ধ চৈতন্য কখনই দুই হতে পারে না। যাই হোক, এখানে বলা হচ্ছে, তুমি যে পাপই করে থাকো এই তিনজনের দৃষ্টিকে এড়িয়ে তুমি কোন পাপ কর্মই করতে পারবে না। যে কারণে বলা হয়ে থাকে তুমি যে পাপ কর্মই করে থাকো না কেন, যেমন কেউ জানতে পারলো না ঘুষ নিয়ে তোমার হাতে কিছু টাকা এসে গেল, সত্যিই কেউ জানতে পারলো না। কিন্তু তিনজনের নজরে এটা থাকবেই, দেবতা মানে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ কারণ এনারা সব জায়গায় থাকেন বলে সব কিছু জানতে পারেন, আর অন্তর্যামী ও পরমাত্মার কাছ থেকে তুমি কোন ভাবে ছাড়া পাবে না।

শকুন্তলা বলছে *আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌ চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্।*।১/৭৪/৩০। 'তুমি যদি মনে করে থাক এই তিনজন ছাড়া আর কেউ দেখতে পায়না তাহলেও কিন্তু তুমি ভুল করবে। এই তিনজনের বাইরেও অনেকেই তোমার পাপকর্মের সাক্ষী হয়ে থাকছেন। তাঁরা কারা? সূর্য, চন্দ্রমা, বায়ু, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, জল, হৃদয়, যমরাজ, দিন, রাত, দুই সন্ধ্যা (ঊষা ও সন্ধ্যা) আর ধর্ম। এনারা সকলে মানুষের প্রত্যেকটি ভালো আর মন্দকে জানেন, প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কর্মকে লক্ষ্য রাখছেন'। আর বলছেন *যমো বৈবস্বতস্তস্য নির্যাতয়তি দুষ্কৃতম। হৃদি স্থিতঃ কর্মসাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো যস্য তুষ্যতি।*।১/৭৪/৩১। যখন হৃদয়স্থিত পরমাত্মা কারুর উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তখন সূর্যপুত্র যমরাজ তার সব পাপকে নাশ করে দেন। এখানে বলতে চাইছেন, যখন পরমাত্মা কারুর উপর সন্তুষ্ট থাকেন তখন সে যত পাপই করুক তার সব পাপ যমরাজ নাশ করে দেন। যমরাজ কে? তিনি সূর্য পুত্র। বিবস্বান হল সূর্যের এক নাম, তাঁর ছেলের নাম বৈবস্বত, যমের আরেকটি নাম। যমরাজ সব কিছুর হিসেব রাখেন, কিন্তু যমরাজ, সূর্য এনারা সবাই আবার অন্তর্যামীর অধীনে। তাই অন্তর্যামী যদি কারুর উপর সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তার কোন পাপকে হিসেবের মধ্যে আনা হয় না। পাপ, পূণ্য, ভালো, মন্দ, মূল্যবোধ এগুলো কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। ঠাকুর আবার একটি বাক্যের দ্বারা ধর্ম-অধর্ম এবং পাপ ও পূণ্যের পরিভাষাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেটা করলে মন খুঁতখুঁত করে সেটাই পাপ, সেটাই অধর্ম। পুরো মহাভারত পড়ে নিলে এই কথাই বেরিয়ে আসে। এখনে শকুন্তলা কি বলছেন? হৃদয়স্থিত পরমাত্মা যার উপর প্রসন্ন তার সব পাপকে তিনি নাশ করে দেন। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়স্থিত পরমাত্মা কে? শ্রীকৃষ্ণ নিজে। নিজে নিজের উপর কখন কেউ অসন্তুষ্ট হয়? তিনিতো পরমাত্মা, তাঁর কি কখন পাপ হবে! শ্রীরামচন্দ্রের কি কখন পাপ হবে? কোন প্রশ্নই নেই। সেইজন্য তিনি পুরো রাক্ষসকুলের বিনাশ করে দিলেন তাতে তাঁর কোন পাপ হলো না। বালিকে যদি লুকিয়ে মারেন তাহলেও কোন পাপ হবে না। সীতাকে যদি জঙ্গলে পাঠিয়ে দেন কোন পাপ হবে না। যাই তিনি করে থাকুন না কেন কোন কিছুতেই তাঁর পাপ হবে না। কারণ মহাভারতের এইখানে বর্ণনা করে রাখা হয়েছে – যার উপর অন্তর্যামী প্রসন্ন তার কখনই কোন পাপ হয় না। যার উপর অন্তর্যামী প্রসন্ন নন তার কি হবে? হাঁটু ব্যাথা, ঘাড়ে ব্যাথা, কোমর ব্যাথা, পেট খারাপ, ব্লাড প্রেসার, আর সব শেষে মাথা খারাপ। একজন ভক্ত এসে শ্রীমাকে বলছে – মা আশীর্বাদ করুন যেন ঠাকুরের নামে পাগল হয়ে যাই। শ্রীমা বলছেন – সেকি বাবা, অনেক পাপ করলে মানুষ পাগল হয়। তাই মহাভারতে বলা হচ্ছে, যার উপর হৃদয়স্থিত পরমাত্মা প্রসন্ন হন তার পাপকে কে নাশ করে? যমরাজ। যমরাজ কে? সুর্যপুত্র।

মহাভারত হল সমন্বয় শাস্ত্র, পুরনো চিন্তাধারা আর নতুন চিন্তাধারাকে মহাভারতে সমন্বয় করা হয়েছে। পরম্পরার চিন্তানুযায়ী যমরাজ সমস্ত খবরাখবর রাখেন। কিন্তু আমি পাপ করলে তার ফল আমার লাগবে না এটা কি কখন সম্ভব? ঠাকুর বলছেন – লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে। এখন লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না এটা কি কখন সম্ভব হবে? লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে এটাও ঈশ্বরের বিধান। তেমনি সন্ন্যাসী যদি কোন নারী সঙ্গ করে তাহলে তার পাপ লাগবে, যমরাজ এসবের হিসেব রাখেন। কিন্তু আমার অন্তর্যামী যদি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন তাহলে এই পাপটা কোথায় যাবে? যমরাজ মুছে দেবেন। যম হচ্ছেন ধর্মরাজ, যমরাজ শুধু মৃত্যুর ব্যাপারটাই দেখেন না, যমরাজের আসল কাজ হল তিনি ভালো মন্দ সব কিছুর হিসেব রাখেন। শকুন্তলা তাই দুষ্মন্তকে বলছেন – খুব সাবধান, আপনি আমার সাথে চালাকি করে পার পেয়ে যাবেন না, আপনার অন্তর্যামী জানেন আপনি আমার সাথে কি করছেন। আপনি এও ভালো জানেন এটি আপনারই সন্তান।

স্ত্রীকে কেন জায়া বলা হয়?

এইভাবে শকুন্তলা আর দুষ্মন্তের মধ্যে বিরাট কথোপকথন চলছে। আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় পুরোটা এই ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা, তাই কয়েকটি শ্লোক ধরে আলোচনা করা হচ্ছে। শকুন্তলা ঋষি কন্যা, তাই তাঁর কথার মধ্যে অনেক গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। বলছেন, স্ত্রীকে কেন জায়া বলা হয়? কারণ – *ভার্যাং পতিঃ সংপ্রবিশ্য স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়ো বিদুঃ।*।১/৭৪/৩৭। পুরুষ যখন তার স্ত্রীর মধ্যে প্রবেশ করে যায়, প্রবেশ করে আবার সেই পুরুষই পুত্র রূপে সন্তান হয়ে বেরিয়ে আসে সেইজন্য স্ত্রীর আরেক নাম জায়া। জায়ার যে জায়ত্ব, এখানে বলা হচ্ছে না যে স্ত্রীর স্ত্রীত্ব, বলছে জায়ার জায়ত্ব। কেন বলছে? *স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ*, জায়া হচ্ছে জন্ম হওয়া, যিনি জন্ম দেন। কাকে জন্ম দেন? নিজের স্বামীকেই জন্ম দেন। যে কোন স্ত্রী নিজের স্বামীকেই জন্ম দেয় নিজের পুত্র রূপে। এখানে শকুন্তলা বলছেন – পুরানের যারা কবি বা পণ্ডিত তাঁরা এই কথা বলছেন। এইখানে এসে আমাদের একটা জিনিষকে বুঝতে হবে।

পুরানে বলা হয় পুরান আগে থাকতেই সমাজে ছিল। কবে থেকে ছিল? বেদের রচনাকাল থেকে ভারতে তিন থেকে চারটে পরম্পরা চলছিল, বেদের একটা পরম্পরা ছিল, তন্ত্রের একটা পরম্পরা ছিল আর ছিল পুরান কথা, যেটা পণ্ডিতরা বলতেন, তারও আলাদা একটা পরম্পরা ছিল, আর ছিল লোককথা তার সাথে ইতিহাসও চলছিল। মহাভারত যখন রচনা চলছে তখনও পুরানের পরম্পরা চলছিল, তাই শকুন্তলা বলছেন – পুরানের যাঁরা পণ্ডিত বা কবি তাঁরাই এই কথা বলে গেছেন। তখনও কিন্তু পুরানের রচনা হয়নি, পুরানের রচনার আগে মহাভারত রচনা হয়ে গেছে। তাহলে পুরান শব্দটা এখানে কি করে এলো? কারণ পুরান কথা চিরদিনই ছিল। এই চারটে বেদ, তন্ত্র, পুরান কথা আর লোককথা এগুলো সবই আগে থাকতেই ছিল। হঠাৎ কেউ দাঁড়িয়ে বলে দিল আজ থেকে তোমরা এই রকমটি করবে আর সবাই সেই রকম করতে থাকল, ব্যাপারটা তা নয়। লোকেরা যেটা করে আসছিল ঋষিরা সেটা প্রণালীবদ্ধ করে সাজিয়ে দিয়েছেন। তখনকার দিনে অনেক ধরণের ঋষি মুনি ছিলেন, বেদের ঋষিরা যাঁরা ছিলেন তাঁরা যজ্ঞ-যাগ করাতেন আর পৌরানিক ঋষিরাও বড় চিন্তাবিদ ছিলেন কিন্তু তাঁরা লোকেদের মধ্যে কথা কাহিনী বলে সময় কাটাতেন। এনারাও বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক হতেন, তাঁরা বলছেন, পুরুষ নারীর ভেতরে গিয়ে নিজেই আবার জন্ম নিয়ে বাইরে আসে। এটা কি তাঁদের নিছক কল্পনা? তা নয়, এই চিন্তাধারা আমরা বেদেই পাই। বেদেই বলছে মম পুত্র মম আত্মা, আমিই আমার পুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছি। সেইজন্য মানুষ নিজের সন্তানকে এতো ভালোবাসে, সে মনে করে আমিই আমার পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি। জন্ম গ্রহণ কোথা থেকে করছে? নিজের স্ত্রীর থেকে, *স যস্যাজ্জায়তে পুনঃ*। মজার ব্যাপার হল, মা সব সময় নিজের সন্তানের সাথে একত্ব বোধ করে তাই মায়ের সব থেকে স্নেহ প্রীতি থাকে সন্তানের প্রতি অথচ প্রীতি বেশী হওয়ার কথা পুরুষের। কেননা যে বাবা সেই সন্তান, বাবা যিনি তিনিই সন্তান হয়ে জন্ম নিচ্ছেন, যে আধারে গিয়ে এই রূপান্তর হচ্ছে, সেই আধারটি কে? স্ত্রী, সেইজন্য তার নাম জায়া। সংস্কৃতে হুটহাট্ করে কোন শব্দ বলে দেবে না, প্রত্যেকটি শব্দের পেছনে এক গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে। এই জায়া বলা হচ্ছে কেন? জায়তে, জন্ম নেয়। কে জন্ম নেয়? সন্তান? না, পুরুষ নিজেই পুত্র রূপে জন্ম নেয়। স্ত্রীকে তাই অত্যন্ত সম্মান দেওয়া হচ্ছে, তুমি না থাকলে আমি তো জন্মাতে পারতাম না। আমরা কি বলি? তুমি না হলে আমার সন্তান হতো না। সিনেমাতে বলে – আমি তোমার সন্তানের মা। মহাভারত একটি বারো এই কথা বলবে না। মহাভারত কি বলবে? *স যস্যাজ্জায়তে পুনঃ*, তুমি নিজেই আবার জন্ম নিচ্ছ। এই যে সন্তান দেখছ, এ আমার সন্তান নয় তোমার সন্তানও নয়, এটা তুমি নিজে। কেন তুমি নিজে?

বলছেন – *পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।।*১/৭৪/৩৯। একটা নরক আছে, ঐ নরকের নাম পুত, পুত হচ্ছে পচা, বাসি হয়ে যাওয়া। একটা দুর্গন্ধ যুক্ত নরক আছে, তার নাম পুত। নিজের পিতৃকুলকে যে এই দুর্গন্ধ যুক্ত পুত নামক নরক থেকে ত্রাণ করে সেই পুত্র। তোমার যদি সন্তান না থাকে তাহলে কেউ তোমাকে পিণ্ড দান করবে না। মানুষ যেমন এখানে খাওয়া-দাওয়া না পেলে অভুক্ত থাকে ঠিক তেমনি মৃত্যুর পর তোমাকে যদি পিণ্ড দান না করা হয়ে থাকে তাহলে তুমি কোথায় গিয়ে পড়বে? পুত নামে এই নরকে গিয়ে পড়বে। পুত নরকে পতন থেকে তোমাকে বাঁচায় বলে তার নাম পুত্র। পুত্রের পুত্রকে বলা পৌত্র, পৌত্রের পুত্রকে বলা হয় প্রপৌত্র। সব ক্ষেত্রেই পুত্র যোগ আছে। এইটাই পরে গিয়ে মহাভারতে বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। আচ্ছা, যদি কারুর পুত্র না হয়ে থাকে তাহলে তার কি হবে? তাহলে তো তার পুত নরকে পতন হয়ে যাবে। এর পর সবাই পুত্র সন্তানই কামনা করতে থাকল, কেউ আর কন্যা সন্তান চাইছে না। কিন্তু পরের দিকে মহাভারতেই আসবে একজন ঋষি বলে দিলেন যদি দৌহিত্রও এই কাজ করে তাহলেও সে পুত নামক নরকে পতন থেকে বেঁচে যাবে। পুত নামে এই নরকের কথা কে বলছে? মহাভারত বলছে। কেন বলছে? এইটাই ধর্ম, ধর্মের কাজ হল মৃত্যুর পর যে অবস্থা তার সাথে সংযোগ করা। মানুষ ভাবে মৃত্যুর পরেও যেন আমি শান্তিতে থাকতে পারি, কোন অশান্তি যেন না হয়। তখন বলে দিল, তুমি সন্তানের জন্ম দাও তাহলে তোমার অশান্তি হবে না। সন্তানের জন্ম দিলে তোমার ধর্ম সিদ্ধি হবে, ধর্ম সিদ্ধি মানে মৃত্যুর পর তুমি শান্তিতে থাকবে। সন্তানের জন্ম দিতে গেলে একজন নারীর দরকার, তাই একজন ভালো দেখে নারীকে তুমি স্ত্রী রূপে নিয়ে এসো, তাকে সম্মান দাও, সম্মান দিলে সে তোমাকে সন্তান দেবে। নারীকে সম্মান না দিলে তুমি সন্তান পাবে না, সন্তান যদি তুমি না পাও তাহলে বিয়ে করেও নরকে যাবে। বিয়ে করা মানে তুমি নিজেকে তনোতি, মানে নিজেকে বিস্তার করা। পুত্র রূপে তুমি নিজের বিস্তার পেলে, সেইজন্য সন্তানকে বলে তাত। তাতের অর্থ হচ্ছে তনোতি, বিস্তার করা। যেমন আমি আমার বাবার বিস্তার, বাবা আমাকে ডাকছে তাত বলে, বাবাও আমার বিস্তার সেইজন্য ছেলেও বাবাকে বলে তাত। অন্য দিকে গুরু তাঁর নিজের বিদ্যাটা শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে নিজেকে বিস্তার করছেন বলে শিষ্যকে বলছেন তাত।

অবশ্য গুরুকে তাত বলে সম্বোধন করার রেওয়াজ আমাদের মধ্যে নেই। ঠাকুর্দা নাতিকেও তাত বলে সম্বোধন করছে আবার নিজের ছেলেকেও তাত বলে সম্বোধন করছে, কিন্তু নাতি ঠাকুর্দাকে তাত বলছে না।

দুষ্মন্তকে শকুন্তলার স্ত্রী ধর্মের বর্ণনা

এরপর ব্যাসদেব শকুন্তলার মুখ দিয়ে স্ত্রী ধর্মের বর্ণনা দিচ্ছেন। ভার্যা কে? *সা ভার্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্যা যা প্রজাবতী। সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্যা যা পতিব্রতা।।*১/৭৪/৪০। গৃহকার্যে যে দক্ষা সেই ভার্যা, সেই ভার্যা যে সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সেই ভার্যা যে পতিপ্রাণা, যার প্রাণ পুরোপুরি স্বামীর উপরেই পড়ে আছে, নিজের স্বামী ছাড়া আর কারুর দিকে দৃষ্টি দেয় না সেই ভার্যা। এখানে ভার্যার চারটে গুণের কথা বলা হচ্ছে, যে পতিব্রতা, স্বামীর সব কাজকর্ম দেখাশোনা করছে, স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, সন্তান দিয়েছে আর চতুর্থ হচ্ছে গৃহকার্যে সুদক্ষা। এই চারটে গুণ না থাকলে তাকে ভার্যা বলা যায় না। *অর্ধং ভার্যা মনুষ্যেস্য ভার্যাঃ শ্রেষ্ঠতম সখা। ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্যা মূলং তরিষ্যতঃ।।*১/৭৪/৪১। ভার্যা মানে স্ত্রী, স্ত্রী হল স্বামীর অর্ধ অঙ্গ, ইংরাজীতে বলা হল my better half। ভার্যা স্বামীর সব থেকে প্রিয় মিত্র, ভার্যা যে কোন পুরুষের ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটের মূল, এখানে মোক্ষের কথা বলা হচ্ছে না, কারণ মোক্ষ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য, সেখানে বিবাহের কোন সম্বন্ধ নেই। *ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্যা মূলং তরিষ্যতঃ*, বলছেন সংসার সাগরকে যে অতিক্রম করে যেতে চায় তারও মূলে হল ভার্যা। স্ত্রী যদি বিদ্যা রূপিণী না হয় তাহলে তার আর জপ ধ্যান করা হবে না। বলছেন যার স্ত্রী আছে সেই একমাত্র যজ্ঞাদি করতে পারে, বেদের যজ্ঞ-যাগে স্বামী স্ত্রীর দুজনেরই দরকার, যার স্ত্রী আছে সেই ঠিক ঠিক গৃহস্থ। ভালো স্ত্রী যখন কেউ লাভ করে তখনই সে ঠিক ঠিক সুখী হয়, তার কারণ সেই কামসুখ পায় আর স্ত্রী হল বাড়ির লক্ষ্মী, যে অর্থ আর কাম এই দুটো পায় সেই পুরুষই সংসারে সুখ পায়। তোমার স্ত্রী না থাকলে যজ্ঞ যাগ করতে পারবে না, যজ্ঞ না করতে পারলে তোমার ধর্ম সাধন হবে না। মানুষ যদি ভালো স্ত্রী পায়, তাহলে সেই মানুষ যখন একা হয়ে পড়ে তখন স্ত্রী তাকে মিষ্টি কথা বলে মনে শান্তি দেয়। যখন ধর্মকার্যের প্রয়োজন হয় তখন স্ত্রী বাবার মত হিতৈষীর ভূমিকা নেয়, বাবা যেমন পুত্রের সব কিছুতে সাহায্য করে স্ত্রীও ঠিক সেইভাবে স্বামীকে প্রকৃত হিতৈষিণীর মত পাশে থেকে সাহায্য করে। যখন আপদ-বিপদ আসে তখন স্ত্রী মায়ের মত তাকে রক্ষা করে আর দুঃখের সময় তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে। মানব জীবনের যাত্রা পথে প্রত্যেক মানুষের তিনজন হিতৈষীর দরকার পড়ে, মা, বাবা আর বন্ধু। মানুষ যখন দুঃখ কষ্টে পড়ে তখন স্ত্রী তাকে মায়ের মত রক্ষা করে, ধর্মকার্যে স্ত্রী বাবার মত তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করে, যখন কেউ পাশে থাকে না তখন বন্ধুদের কাছে এনে সে আনন্দ পায়, সেই রকম স্ত্রী স্বামীর একাকীত্বের সময় পাশে থেকে তাকে আনন্দ দেয়। প্রথমে একদিকে ধর্ম, অর্থ ও কামের ব্যাপারে স্ত্রীর ভূমিকার কথা বলা হল। পরে বলছেন, মানব জীবনের যাত্রা পথে তিনজনের দরকার পড়ে, মা, বাবা ও বন্ধু। স্ত্রী একাই এই তিনজনের সাহচর্য্য দেয়।

পতিব্রতা নারী যদি সে হয়ে থাকে, আর সে যদি স্বামীর আগে মারা গিয়ে থাকে তাহলে সে স্বর্গে গিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর স্বামী যদি আগে মারা যায় তাহলে পতিব্রতা নারী তার পেছনে পেছনে অনুগমন করতে থাকে। মহাভারতে কোথাও সতীদাহের কথা বলা হয়নি। বাল্মীকি রামায়ণেও এই একই জিনিষ পাওয়া যায়, বালী বধ হওয়ার পর তারা এসে অনুতাপ করে বলছে – হে রামচন্দ্র আপনি আমার স্বামীকে বধ করে দিয়েছেন, তিনি আমার জন্য পরলোকে অপেক্ষা করছেন, আমি না গেলে তিনি চলাফেরা করতে পারবেন না, আমাকে ছাড়া তিনি কি করে চলবেন, যে বাণ দিয়ে আপনি আমার স্বামীকে বধ করেছেন সেই বাণ দিয়ে আমাকে এক্ষুণি শেষ করে দিন, যাতে আমি ওনার সঙ্গিনী হতে পারি। এগুলোই হিন্দুদের চিন্তা ভাবনা, সতী যদি মারা যায় তাহলে স্বামী অপেক্ষা করে, স্বামী যদি মারা যায় স্বামী সতীর জন্য বসে থাকে। সে যখন আসবে তখন তাদের যাত্রাটা আবার চলতে থাকবে। এখান থেকেই এই ধারণাটা এসেছে – জন্মজন্মান্তরে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম।

বলছেন – *আত্মাহহত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। তস্মাদ্ ভার্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্।।*১/৭৪/৪৮। যখন স্ত্রী থেকে পুত্রের জন্ম হয়ে গেল তখন বুদ্ধিমান পুরুষ জানেন যে, আমি এই গর্ভ থেকে পুত্র রূপে জন্মেছি। সেইজন্য কি করতে হবে? *তস্মাদ্ ভার্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্*, সন্তানের জন্ম হয়ে গেলে পুত্রের যে মা তাকে মায়ের মত দেখতে হয়, কারণ তুমিই ওখান থেকে জন্মেছ। ঠাকুর বলছেন একটা দুটো সন্তানের পর স্বামী স্ত্রী ভাই বোনের মত থাকবে। মহাভারত বলছে, যেমনি তোমার সন্তান জন্ম নিয়ে নিল মানে তুমি জন্মেছ এই ভাব

যদি তোমার থাকে তাহলে পুত্রের মাকে, মানে তোমার স্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখবে, *তস্মাদ্ ভার্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ*। আমরা জানি মহাভারতে শুধু যুদ্ধ আর মারামারিই হয়েছিল। মহাভারতে ঢুকলে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলব, মহাভারতের দর্শন ও শিক্ষা কত উন্নত এই আলোচনা গুলো না পড়লে কখনই বোঝা যায় না। এত কথা সব শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তকে বলে যাচ্ছে।

শকুন্তলা বলছেন – *সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্যাদপ্রিয়ং নরঃ। রতিং প্রীতিং চ ধর্মং চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি।।*১/৭৪/৪৯। রতি মানে কামভোগ, প্রীতিঞ্চ, ভালোবাসা আর ধর্ম, যা মানুষকে পরপারে সুখ শান্তি দেয়, এই তিনটি জিনিষই রয়েছে নারীর অধীনে। নারী যদি কখন রেগে যায় তাহলে এই তিনটে জিনিষরই হানি হয়ে যায়। তাই, *ন কুর্যাৎ অপ্রিয়ং নরঃ* – স্ত্রীর সঙ্গে কখনই অপ্রিয় আচরণ করবে না। স্ত্রী যদি কোন অন্যায় করে ফেলে তাতে তুমি যদি খুব রেগেও যাও, তাই বলে তুমি স্ত্রীর অপ্রিয় কিছু করতে যাবে না। কারণ এই তিনটে জিনিষ, রতি, প্রীতি আর ধর্ম তার হাতে। এই তিনটে জিনিষ কখনই নিজেদের খেয়াল খুশি মত লাগাতে যাওয়া উচিত নয়, কারণ শাস্ত্রেই এটা নিষেধ করা হচ্ছে।

স্বামী দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার কথোপকথন চলছে, খুব নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে এই সংলাপ চলছে। দুষ্মন্ত কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছে, তাদের থেকে ভরতের জন্ম হয়েছে। এখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে চাইছে না, আর পুত্র ভরতকেও নিজের সন্তান বলে স্বীকার করতে পারছে না। মহাভারতে এই পরিস্থিতিকে খুব সুন্দর ভাবে মীমাংসা করা হয়েছে। কালিদাসের কাছে এই দৃশ্য খুব বেদনাদায়ক মনে হয়েছে, তিনি আবার এই পরিণামের সব দায় দুর্বাসা মুনির উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এই কাহিনী আমাদের কাছে বড় নয় আমাদের কাছে গুরুত্ব ভারতের আধ্যাত্মিক ও ধর্মের দর্শন ও চিন্তা ভাবনা কিভাবে বিবর্তিত হচ্ছে।

মহাভারতের মতে ধর্ম, অর্থ আর কামে স্ত্রীর ভূমিকা

শকুন্তলা একদিকে বিশ্বামিত্রের কন্যা অন্য দিকে সে কণ্বমুনির আশ্রমে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে বড় হয়েছে, তাই ধর্মের কথা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছে। সন্তানকে নিয়ে যখন স্বামীর সামনে দাঁড়িয়েছে আর স্বামী যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে তখন শকুন্তলা তিনটে বিষয়কে রাজা দুষ্মন্তের সামনে হাজির করেছে – স্বামী, স্ত্রী আর সন্তান। এর আগে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি। সেখানে শকুন্তলা বলেছিল – ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটে জিনিষের সিদ্ধি একমাত্র পতিব্রতা নারীকে দিয়েই হয়। সন্ন্যাসী ছাড়া আর যারা মোক্ষমার্গী হন তারাও পতিব্রতা স্ত্রী ছাড়া সিদ্ধি পায় না। স্ত্রী যদি পতিব্রতা না হয় স্বামী কখনই মোক্ষমার্গে যেতে পারবে না, স্ত্রীই তাকে আটকে দেবে। তিনটে জিনিষ, যেটার জন্য পুরুষ একজন নারীকে বিবাহ করে, পুরোপুরি নারীর হাতে। কি কি? রতি, প্রীতি ও ধর্ম। ঠাকুর খুব সুন্দর করে বলছেন – মা বলে ছেলে সংসারের কাজে ঝলসে পুড়ে আসবে, তাই ওর জন্য একটা গাছের ছায়া করে দিতে হবে। গাছের ছায়া হল স্ত্রী। যত রকমের কাম, সুখভোগ হতে পারে এটা স্ত্রীর অধীনে। প্রীতি – মানুষ যখন সব জায়গা থেকে যন্ত্রণা লাঞ্ছনা পেয়ে দগ্ধ হয় তখন ভালোবাসা দিয়ে স্ত্রীই তাকে প্রীতির সাহায্যে শীতলতার সুখ দেয়। ধর্ম – যে কোন ধর্ম কাজে, যজ্ঞ-যাগ করে স্বর্গে যাবে বা পূণ্যার্জন করবে সেটা স্ত্রী ছাড়া করা যাবে না, আর পুত্রের জন্মের দ্বারা যে তার এবং পিতৃপুরুষরা পুত নামক নরক থেকে উদ্ধার পাবে সেই পুত্র স্ত্রী ছাড়া হবে না। আমাদের পরম্পরাতে একটা ধারণা ছিল যে, যার সন্তান হয় না, পিণ্ডদান হয় না, তারা পুত নামে এই নরকে গিয়ে পড়ে, এই নরক থেকে যে উদ্ধার করে তাকে বলা হয় পুত্র। এই পুত্র আসে একমাত্র স্ত্রী থেকে। এগুলো হচ্ছে মহাভারতের দর্শন, মহাভারত জীবনকে কিভাবে দেখছে সেটাই আমরা আলোচনা করছি, এই ব্যাপারে আমি আপনি একমত কিনা তাতে কিছু আসে যায় না। মহাভারত যেমন স্ত্রীকে বলছে জায়া। জায়া মানে যিনি জন্ম দেন। স্ত্রীকে জায়া কেন বলা হয়? যিনি স্বামী, তিনি নিজের স্ত্রীর ভেতরে প্রবেশ করেন, প্রবেশ করে তিনিই আবার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেইজন্য স্ত্রী হলেন জায়া। পুত্র তার পিতারই স্থূল শরীরের সম্প্রসারিত শরীর। তার অর্থ গিয়ে দাঁড়াল, স্ত্রী হলেন নিজের স্বামীর মা। মহাভারত তাই বলছে – *তস্মাদ্ ভার্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্* তোমার সন্তানের যে মা তাকে নিজের মায়ের মত দেখবে কারণ সন্তান তোমার নিজেরই বিস্তার, মহাভারতের এটাই উপদেশ। আজাকাল সংবাদপত্রে, টিভির নিউজে কত ঘটনা সামনে এনে দেখাচ্ছে ভারতে শুধু নারী নির্যাতন, বধু নিপীড়নই হয়, ভারতে কোন দিনই নারীদের সম্মান দেওয়া হত না ইত্যাদি। কিন্তু মহাভারত থেকে সরাসরি শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় ভারত চিরকালই নারীজাতিকে সম্মানের চোখে দেখে আসছে। পুরুষকে বলা হচ্ছে নিজের স্ত্রীকে

মায়ের মত দেখবে। শ্রীমা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন আমাকে তুমি কি দেখ? ঠাকুর বলছেন, মন্দিরে যে মা কালী, নহবতে যে গর্ভধারিণী তিনিই এখন আমার পা টিপছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে নিজের স্ত্রী মা সারদাদেবীকে যে মাতৃরূপে পুজো করেছেন এটা নতুন কিছু নয়, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেই মহাভারতে স্ত্রীকে মাতৃরূপে দেখার কথা বলা আছে। মহাভারতের এটাই মৌলিক ভাব, স্ত্রীকে যখন জায়া বলা হচ্ছে মানে তোমার পুত্রের মা যখন বলা হল তখন সে তোমারও মা, কারণ তুমিই বলছ মম পুত্র মম আত্মা। যে নিজের স্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখে না মহাভারতের দৃষ্টিতে সে একজন প্রতারক।

শকুন্তলা এই সব কথা রাজা দুষ্মন্তকে বলে যাচ্ছে, আর তার ছেলে ভরত নিজের মনে খেলা করে যাচ্ছে। মহাভারতের এটাই বিশেষত্ব, মহাভারত সমাজের পুরো চিত্রটাকে তুলে আনছে আর এর মধ্যে ধর্ম সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করছে সেটাকে নিয়ে আসছে। শকুন্তলা বলে চলেছে – *ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাং। গুরুর্গরীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্পর্শবতাং বরঃ।।*১/৭৪/৪৭। দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, আর চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে গরু শ্রেষ্ঠ প্রাণী, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে গুরু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ – তিনজনকে শ্রেষ্ঠ বলা হল, ব্রাহ্মণ, গরু আর গুরু। বলছেন – ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করবে, গরুকে শ্রদ্ধা করবে আর গুরুকে শ্রদ্ধা করবে। সেইরূপ স্পর্শবান পদার্থের মধ্যে পুত্র হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। ক্ষুদ্র পিপীলিকাও নিজের ডিমকে যত্ন করে রক্ষা করে, আর আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও কি কারণে আপনার শিশুপুত্রের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন। নিজের শিশুপুত্রের স্পর্শ জনিত যে সুখ এই রূপ সুখ আর কোন কিছুর স্পর্শে হয় না। হে রাজন্, আপনি কি করে আমাকে প্রত্যাখ্যান ও নিজের পুত্রকে অস্বীকার করছেন। আপনি যখন আমার হাত ধরেছিলেন, তখন আপনার সত্যবাদিতা, আপনার শীল, আপনার ধর্ম দেখে আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করেছিলাম। ঐ কথাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে আমি আপনার সেবায় নিয়োজিত হতে চাইছি। আপনি আপনার ধর্মকে পরিত্যাগ করে আমাকে পরিত্যাগ করবেন না, আপনি যে আমাকে ভালোবেসেছিলেন এই নিয়ে আমি আপনার উপর কোন অধিকার স্থাপন করতে চাইছি না।

শকুন্তলার প্রতির দুষ্মন্তের দোষারোপ এবং শকুন্তলার প্রত্যুত্তর

দুষ্মন্ত এইবার পুরো উল্টো শকুন্তলাকে দোষারোপ করে বলছেন –তোমার নাম শকুন্তলা, আর তোমার গর্ভে যে আমার সন্তানের জন্ম হয়েছে বলে দাবী করছ এতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। *অসত্যবচনা নার্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্যতে বচঃ* (১/৭৪/৭৩)। মিথ্যে কথা বলাই মেয়েদের স্বভাব, তাই তোমার কথাতে কে শ্রদ্ধা করবে। এই হচ্ছে মহাভারত, সমাজের মধ্যেকার সঙ্ঘাতগুলোকে তুলে আনছে। সেইজন্য মহাভারতের মত গ্রন্থকে খুব মন দিয়ে পড়তে হয়, তা নাহলে অনেক কিছুই ধরতে পারবো না। একদিকে শকুন্তলা বলে যাচ্ছে স্ত্রী হল জায়া, মানে তোমার ধর্মপত্নি তোমার মাতৃবৎ। অন্য দিকে দুষ্মন্ত বলছে স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যে কথা বলে। এই দুটো বক্তব্য একটা সঙ্ঘাত তৈরী করে দিল, দুষ্মন্তের এই মন্তব্যকে মেয়েরা একভাবে নেবে আবার পুরুষ অন্য ভাবে নেবে। ব্যাসদেব কিভাবে জিনিষটাকে দেখছেন? ব্যাসদেব শকুন্তলার পক্ষেই দাঁড়িয়ে আছেন কারণ শকুন্তলার সংলাপকে অনেক দূর নিয়ে গেছেন। কিন্তু দুষ্মন্তের বক্তব্যকেও তিনি নিয়ে আসছেন, কারণ সমাজ তখন কি রকম ছিল সেটাকেই তিনি দুষ্মন্তের মুখ দিয়ে নিয়ে এসে দেখিয়ে দিলেন।

দুষ্মন্ত বলছেন – তোমার বাবা-মার কথা বলছো তো! তোমার মা একজন কুলটা, নির্লজ্জের মত তোমাকে জন্ম দিয়ে হিমালয়ের পাথরের উপর শকুন পাখিদের কাছে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল, শকুন পাখি তোমাকে খাইয়েছিল বলে বেঁচে গেলে। আর তোমার বাবা বিশ্বামিত্র একজন অতি নীচ প্রকৃতির লোক, ক্ষত্রিয় ছিল পরে নিজের ধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য লালায়িত হল। আর যেমনি তুমি মেনকার গর্ভে এলে তোমাকে ছেড়ে চলে গেল। তোমার মা আর তোমার বাবা, দুজনের শুধু ভোগের ইচ্ছা হয়েছে তাই তোমার জন্ম হল। এইতো তোমার বাবা আর মা। এইসব কথা বলে দুষ্মন্ত বলছে তুমি একটা নীচ জাতি, দুষ্ট তাপসী, তুমি এখান থেকে এক্ষুণি চলে যাও।

শকুন্তলা হলেন ঋষিকন্যা, সেও কিসে কম, তার ভেতরটা রাগে গজ্‌গজ্ করছে। শকুন্তলা তখন রাজা দুষ্মন্তকে বলছে – *রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি।।*১/৭৪/৮২। হে রাজন্, অপরের সর্ষপ প্রমাণ দোষ তোমার চোখে পড়ছে আর তোমার যে বেলফল প্রমাণ দোষ সেটা তুমি দেখেও দেখতে পারছো না। আমরা যে পরছিদ্রান্বেষীর কথা বলি এটা এই মহাভারত থেকে এসেছে। অপরের সর্ষের মত ছিদ্র সেটা তুমি

দেখতে পাচ্ছো আর তোমার বেলের মত ছিদ্রকে দেখতে পাচ্ছো না। শকুন্তলা তীব্র কটাক্ষ করে বলছে *অতীবরূপসম্পন্নো ন কংচিদবমন্যতে। অতীব জল্পন দুর্বাচো ভবতীহ বিহেঠকঃ।।*১/৭৪/৮৯। অতীব রূপ সম্পন্ন, যে ঠিক ঠিক দেখতে সুন্দর, সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক, কখন সে কাউকে অপমান করে না। কিন্তু যার কদর্য রূপ সেই কিন্তু নিজের সৌন্দর্যের কথা অপরকে বলে বেড়ায় আর কটূ কথা বলে পরকে কষ্ট দেয়। একটা মজার ঘটনা আছে, হলিউডের এক নামকরা অভিনেত্রী ছিল, তার সময়ে সে নাকি খুব রূপসী ছিল। সেই অভিনেত্রী এক দোকানে গেছে, সেখানে একটি সেলস্ গার্ল ছিল, সেও দেখতে রূপসী ছিল। সেলস্ গার্লের অহঙ্কার ছিল সে নাকি এই অভিনেত্রীর থেকেও দেখতে সুন্দরী। অভিনেত্রীর সাথে ঐ মহিলা খুব তাচ্ছিল্য ব্যবহার করে যাচ্ছে। অভিনেত্রী ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছে, এর রূপের অহঙ্কার আছে। অভিনেত্রী মেয়েটির কাছে গিয়ে মিষ্টি করে বলছে – তোমার কি মনে হয় তুমি আমার মতই রূপসী। সেলস্ গার্ল বলছে – হ্যাঁ। অভিনেত্রী – তাহলে তো আমরা সমান সমান, সমানে সমানে যে ব্যবহার পাওয়ার কথা সেই ব্যবহার আমি কেন তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি না। শকুন্তলা এটাই বলছেন – যারা ঠিক ঠিক সুন্দর, তার যতই কুরূপ থাকুক, সে কখন কারুকে অপমান করে না। কিন্তু যাদের সৌন্দর্য নেই তারা কটূ কথা বলবেই বলবে।

এরপর শকুন্তলা বলছেন *মুর্খো হি জল্পতান্ত পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভঃ। অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব সুকরঃ।।*১/৭৪/৯০।‘এই জগৎ ভালো মন্দ মেশানো, কিন্তু যারা বাজে লোক, নীচ জন্মের হয় তারা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তারা তখন জগতের বাজে টুকুই নেয়, ঠিক যেমন শূকর এত ভালো খাবার থাকতে শুধু নোংরাটা ভক্ষণ করে’। আমরা কি করি? একটা লোকের ভালোও আছে মন্দও আছে, আমরা যখন শুনি তার ভালোটাও শুনি মন্দটাও শুনি। নেওয়ার সময় আমরা কোনটা নিই? মন্দটাই নিই। সকালবেলা খবরের কাগজ এলেই আমরা প্রথমেই দেখি কোথায় কোন মন্ত্রী ঘুষ নিয়েছে, কোথায় ডাকাতি হয়েছে, কোথায় খুন হয়েছে। তারপর কি পড়বে? অমুক সন্ন্যাসী অমুক যুবতী মেয়ের সাথে পালিয়েছে, এগুলো খুব মন দিয়ে পড়বে। আমরা একবার ভাবিনা যে আমাদের অবস্থাও শুয়োরের মতো, খবরের কাগজের যত আবর্জনা খেয়ে বেড়াচ্ছি। শকুন্তলা এই কথা নিজের স্বামী দুষ্মন্তকে বলছেন ‘আমার বাবা বিশ্বামিত্র এত বড় একজন ঋষি সেটা তোমার চোখে পড়ল না। আমার মা স্বর্গের বাসিন্দা, দেবতাদের সঙ্গে সসম্মানে থাকেন সেটা তোমার চোখে পড়ল না, আর তাদের যে কাম সম্পর্ক হয়েছিল সেটাই তোমার নজরে এসেছে। কিন্তু মনে রাখবে যাঁরা প্রাজ্ঞস্তু, প্রাজ্ঞ পুরুষ’, এখানে আবার সেই প্রাজ্ঞ কথা আসছে। প্রাজ্ঞ কে? যিনি শাস্ত্র জানেন এবং শাস্ত্রে নিজের বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন সেই প্রাজ্ঞ, তিনিই প্রজ্ঞাবান পুরুষ। *প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভঃ। গুণবদ্ বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ।।*১/৭৪/৯১। ‘যিনি প্রজ্ঞাবান পুরুষ তিনিও যখন বাক্যালাপাদি করেন, তিনি তখন শুভ ও অশুভ দুটোই শ্রবণ করেন। কিন্তু *গুণবদ্ বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ* – কিন্তু নেওয়ার সময় তাঁরা গুণগ্রাহী হন, হাঁস যেমন জল মিশ্রিত দুধ থেকে দুধটুকু নিয়ে জলটুকুকে ছেড়ে দেয়, যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরা হাঁসের মত শুধু গুণটুকু নেয়। নিকৃষ্ট পুরুষ শুয়োরের মত আবর্জনাটুকু নেয়। প্রত্যেক মানুষই দোষে গুণে মেশান, এখন আমি যদি শুধু দোষটুকু নিই তাহলে আমি হয়ে গেলাম শুয়োর আর গুণটুকু নিলে হাঁস’। অপরের নোংরা না ঘাঁটলে আমাদের মনে শান্তি হয় না। ঠাকুর গুবরে পোকার গল্পে বলছেন – নারদ যখন এসে গুবরে পোকাকে বলছে চল তোকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাই। গুবরে পোকা বলছে, খুব ভালো কথা কিন্তু ঠাকুর মশাই ওখানে ভালো গোবর পাওয়া যাবে তো।

শকুন্তলা বলেই যাচ্ছেন – *অভিবাদ্য যথা বৃদ্ধান্ সন্তো গচ্ছন্তি নির্বৃতিম্। এবং সজ্জনমাকৃশ্য মুর্খো ভবতি নির্বৃতঃ।। সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্খা দোষানুদর্শিনঃ। যত্র বাচ্যাঃ পরৈঃ সন্তঃ পরানাহুস্তথাবিধান্।।* ১/৭৪/৯৩-৯৪। যাঁরা সাধু পুরুষ তাঁরা জ্ঞানী, মানী ও বড়দের প্রণাম করে খুব আনন্দ পান। ছোটবেলাতেই তাই আমাদের শেখানো হয় বড়দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে। কিন্তু যারা দুর্জ্জন, মুর্খ তারা একই আনন্দ পায় অপরের নিন্দা করে। সাধুপুরুষ অপরের দোষ দেখতে পান না তাই তাঁরা সুখেই জীবন কাটিয়ে যান কিন্তু মুর্খরা সব সময় অপরের দোষই দেখতে থাকে। আর দুষ্টাত্মারা যে দোষে দুষ্ট হয়ে সাধুদের নিন্দা করে সেই দোষই তারা সাধুদের উপর আরোপ করে তাঁদের নিন্দা করতে থাকে। মানুষ অপরের নিন্দা করতে আর অপরের নিন্দা শুনতে এতো ভালোবাসে যে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছে, আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো মারা যাবে, তার সামনে যদি কেউ কারুর নামে নিন্দা করতে শুরু করে দেয় সেও তখন সোজা হয়ে উঠে বসে বলবে – এই ব্যাপারে আমারও দুটো কথা আছে। কারুর নিন্দা শুনলে মরা লোকও জেগে যাবে। এইসব বলে শকুন্তলা বলছেন – *অতো হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদ্‌ন্যন্ন বিদ্যতে। যত্র দুর্জনমিত্যাহ দুর্জনঃ সজ্জনং*

*স্বয়ম্।।*১/৭৪/৯৫। ‘জগতে সবচেয়ে হাসির কথা কি জানো, যত দুর্জ্জন লোক আছে তারা সজ্জনদের সব সময় দুর্জ্জন বলে’। এখানে দুষ্মন্তকে কটাক্ষ করা হচ্ছে, দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্র আর মেনকাকে নিন্দা করছে। তুমি এখন সত্যরূপ ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছ, তুমি ভালোবেসে আমার হাত ধরেছিলে, আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, সন্তান হয়ে গেছে, এখন তোমার কাছে এসেছি আর তুমি আমাকে মিথ্যা ভাষণ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করছ তাই তুমি ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছ। বলছেন, *সত্যধর্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব। অনাস্তিকোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ।।*১/৭৪/৯৬। ‘প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ, যে সাপের মধ্যে বিষ পরিপূর্ণ হয়ে আছে তার থেকেও সত্যধর্ম থেকে চ্যুত ব্যক্তিরা ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। যারা নাস্তিক পুরুষ, যারা ধর্মে বিশ্বাস করেনা, যারা ভগবানে বিশ্বাস করেনা, যাদের মধ্যে কোন মূল্যবোধ নেই, তারাও এই ধরণের লোককে ভয় পায়, যারা ধার্মিক পুরুষ তাদের তো কথাই নেই’। এখানে অসত্যাবাদীর কথা বলা হচ্ছে না, এখানে শব্দটা হচ্ছে সত্যধর্মচ্যুত, সত্য ধর্ম থেকে যিনি চ্যুত হয়ে গেছেন, অসত্যবাদী আর সত্যধর্ম থেকে চ্যুত এক নয়। সত্যধর্মাচ্যুতে আমি বেশীর ভাগ সময় সত্যধর্ম পালন করে যাচ্ছি আর আমার শক্তিও আছে কিন্তু যখনই আমার স্বার্থের কিছু হানি হতে যাচ্ছে দেখছি তখনই সত্যকে ছেড়ে দিই। অসত্যবাদীরা সাধারণত দুর্বল প্রকৃতির, যখন তখন, অপ্রয়োজনে, যেখানে সেখানে মিথ্যে কথা বলে বেড়ায়। নাস্তিকরা এই ধরণের সত্যধর্মচ্যুত ব্যক্তিদের ভয় পায়, আর ধার্মিক যারা তারা তো ভয়ে তাদের থেকে পালাবেই। এরপর আরও অনেক মূল্যবান কথা শকুন্তলা নিজের স্বামী রাজা দুষ্মন্তকে বলে যাচ্ছে। আমাদের পক্ষে সব শ্লোককে নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মহাভারতের প্রত্যেকটি শ্লোক মনন করার মত। এই অল্প সময়ের মধ্যে পুরো মহাভারতকে আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে আমাদের সংক্ষেপেই আলোচনা করতে হচ্ছে।

মানুষ যখন ইষ্টাপুর্ত কাজ করে, ইষ্টাপুর্ত হল, সবার সুবিধার্থে কূপ খনন করা, বৃক্ষাদি রোপণ করা, পুষ্করিণী খনন করা ইত্যাদি, শকুন্তলা বলছেন সেই সব ইষ্টাপুর্ত কাজের মধ্যে *বরং কুপশতাদ্ বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ। বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্ বরম্।।*১/৭৪/১০২। একশটি কূপ খনন করে দেওয়ার থেকে ভালো যদি সে একটি পুষ্করিণী খনন করে দেয়, একশটি পুষ্করিণী খনন করা থেকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করা, একশটি যজ্ঞ করার থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া আর একশটি পুত্রকে জন্ম দেওয়ার থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা। যদি আমি সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি তাহলে যত রকমের যজ্ঞ হতে পারে, যত রকমের ইষ্টাপুর্তি যজ্ঞ হতে পারে সব কিছুকে অতিক্রম করে যাব। আর যদি এক হাজারটি অশ্বমেধ যজ্ঞকে দাড়িপাল্লার একদিকে রাখা হয় এবং অন্য দিকে সত্যকে রাখা হয় তাহলে সত্যের পাল্লাটাই ভারী হবে। পুরো বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ যিনি জানেন, সমস্ত তীর্থ যিনি ভ্রমণ করেছেন তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন যিনি সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত। শকুন্তলা বলছেন *নাস্তি সত্যসমো ধর্মো ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্। ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিৎনৃতাদিহ বিদ্যতে।।*১/৭৪/১০৪। সত্যের মত ধর্ম কিছু নেই, জগতে সত্যের থেকে উত্তম কিছু নেই আর মিথ্যা কথা থেকে তীব্রতর পাপ আর কিছুতে হয় না। এগুলো শুনলে মনে হবে এ আর নতুন কি শুনছি, আমরাতো বাচ্চা বয়স থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু মহাভারত একটু পরেই কৌশিকী মুনির এক কাহিনীতে এই সত্যকেই নিন্দা করবে। সেখানে মহাভারত বলবে অপরের প্রাণ রক্ষার জন্য যদি কেউ মিথ্যা কথা না বলে তাহলে মহা নরকে পতিত হয়, এটাই মহাভারতের নান্দনিক শৈলী। একটু পরেই মহাভারত বলছে, পাঁচটি অবস্থায় মিথ্যে কথা অবশ্যই বলবে – যখন নিজের বা অপরের প্রাণ সংশয় হবে তখন অবশ্যই মিথ্যে কথা বলবে, তোমার বা অপর কারুর সর্বস্ব অপহরণ হয়ে যাচ্ছে তখন অবশ্যই মিথ্যে কথা বলবে, বিবাহ কালে অবশ্যই মিথ্যে কথা বলবে, মিথ্যে কথা না বললে তোমার মেয়ের বিয়েই হবে না, তখন বলতে হয় আমার মেয়ের মত মেয়ে হয় না, ভূভারতে এই রকম মেয়ের জন্মই হয়নি, দেখা যাবে সেই মেয়ে হয়তো কানা কিংবা খোড়া। আর শেষে বলছে প্রণয়কালে অবশ্যই মিথ্যে কথা বলা যাবে, কোন পুরুষ যখন কোন নারীকে ভালোবাসছে বা কোন নারী পুরুষকে ভালোবাসছে তখন বলতে হয় তোমার মত মেয়ে আমি কোনদিন দেখিইনি। মহাভারত বলছে এই পাঁচটি অবস্থায় তুমি মিথ্যে কথা বলবে, এই পাঁচটি অবস্থায় যদি মিথ্যে কথা না বলা হয় তাহলে তোমার পাপ লাগবে। এই কারণেই মহাভারতকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র, যদি মিথ্যে কথা বললে তোমার ফাঁসি হয়ে যায় তখন সত্য কথা বলাকে মহাভারত কখনই অনুমতি দেবে না বা আমার একটি সত্য কথাতে অপরের প্রাণ চলে যাবে তখন সত্য কথা বললে অবশ্যই পাপ লাগবে।

ধার্মিকতা আর আধ্যাত্মিকতা

মহাভারতকে সামগ্রিক ভাবে যখন অধ্যয়ণ করা হয় তখনই ধর্মের গতি ঠিক ঠিক বোঝা যায়। একজন বলছে আমি সত্যধর্মেই প্রতিষ্ঠিত থাকবো, আরেকজন বলছে আমি সত্যধর্মের গতিশীলতার ধারণাকে গ্রহণ করবো। গতিশীল সত্যধর্মের ধারণার সব থেকে বড় উদাহরণ হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি যে কত মিথ্যে কথা বলে গেছেন তার হিসেব নেই। অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – রাম দুই রকমের কথা বলে না কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কখনই এক রকমের কথা বলেননি, এমন কোন কাজ নেই, যেটা সমাজের পক্ষে নিন্দনীয় সেটা উনি করেননি। শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেন, পালিয়ে শত্রুকে এমন ভাবে টেনে একটা জায়গায় নিয়ে এমন ফাঁসিয়ে দিলেন সেখানে একটা অভিশাপে তাঁর শত্রু মারা গেল। সেখান থেকে ভগবানের নামই হয়ে গেলে রণছোড়। তারপর ছোটবেলা থেকেই না বলে লোকের বাড়ি থেকে জিনিষ চুরি করাতো আছেই। একজনের সাথে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, সেই মেয়েকে মন্দির থেকে অপহরণ করে পালিয়ে গেলেন। হেন কুকর্ম নেই যে তিনি করেননি কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের ভগবান। কেন তিনি ভগবান সেগুলো আমরা পরে পরে দেখতে থাকবো। আর শ্রীরামকৃষ্ণ? স্বপ্নেও যদি ধাতু স্পর্শ হয়ে যাচ্ছে তাতেও তাঁর হাত বেঁকে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের ছিল ধর্মের গতিশীল ধারণা অন্য দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যের আকর, যাই হয়ে যাক সত্য থেকে তাঁকে কোন ভাবেই বিচ্যুত করা যাবে না। আমাদের অবচেতন অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলনা করতে পারবো না।

শকুন্তলা বলছে – মিথ্যে কথা যে বলে সে বিষধর সাপ। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি বিষধর সাপ? এই জিনিষগুলো আমরা একদিনেই বুঝতে পারবো না। যদি আমরা আদিতে চলে যাই তখন দেখি সচ্চিদানন্দই আছেন তিনিই সত্য, সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদের সবারই এই স্বরূপ, সচ্চিদানন্দই আমাদের একমাত্র স্বরূপ। যাঁর এই শুদ্ধাত্মার বোধ হয়ে গেল, যিনি বুঝে গেলেন যে তাঁর বাস্তবিক স্বরূপ শুদ্ধ আত্মা, তাঁর আত্মকেন্দ্রিক বোধটা একেবারে চলে যায়। এরপর তিনি যা কিছু করেন তিনি নিজের জন্য কিছু করেন না, তাঁর কোন কাজে স্বার্থের গন্ধটুকু থাকে না। যাঁর কোন কাজে স্বার্থের গন্ধ থাকে না তাঁকে পাপ আর স্পর্শ করতে পারেনা। তাহলে কি তাঁকে পূণ্য স্পর্শ করে? না, পূণ্যও তাঁকে স্পর্শ করে না, তিনি পাপা ও পূণ্য দুটোরই উর্দ্ধে চলে যান। শ্রীকৃষ্ণ যে এত ভালো কাজ করেছিলেন তার জন্য কি তাঁর পূণ্য হয়েছিল? কোন দিনই পূণ্য হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী যে এত বড় বড় কাজ করে গেলেন তার জন্য কি তাঁদের পূণ্য হয়েছে? কখনই পূণ্য হবে না। আমি যে এত খেটেখুটে এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসছি এর জন্য কি আমার পূণ্য হবে? অবশ্যই হবে। কেন হবে? কারণ আমি আত্মজ্ঞানী নই। আত্মজ্ঞানী নই বলে এই পূণ্যগুলি আমার হবে। আবার আজেবাজে যত কাজ করব তার পাপও আমার হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা স্বামীজী, এনারা যাই করুন না কেন, তাঁর ভালো কাজের পূণ্যটাও আসবে না আবার খারাপ কাজের পাপটাও আসবে না। শ্রীকৃষ্ণ যদি সারা জীবন শুধু মিথ্যে কথাই বলে যান তাও তাঁর কোন পাপ লাগবে না। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যিশু যতই লোকেদের উদ্ধার করে যান এনাদের কোন পূণ্য হবে না, কারণ এনারা সবাই পাপ-পূণ্যের উর্দ্ধে।

খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুদাইজিম্, শিখ এই ধর্মগুলির সীমাবদ্ধতাটা এই জায়গাতেই। এদের সবার কাছে মুক্তি মানে সত্ত্ব গুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বেদান্ত মতে সত্ত্ব গুণটাও একটা বন্ধন, বেদান্তের মতে সত্ত্ব গুণ হল শেষ ধাপ, সত্ত্ব গুণে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ধর্ম ও অধর্মের পারে যেতে পারবে না। তমো গুণ আমাদের অধর্ম, অসত্য, স্বার্থপরতা দিয়ে বেঁধে ফেলে, সত্ত্ব গুণ এগুলো থেকে মুক্তি দেয় কিন্তু সেও বাঁধে। সত্ত্ব গুণ কি দিয়ে বাঁধে? ভালোবাসা, করুণা, মৈত্রী আর জ্ঞানের স্পৃহা এবং ঈশ্বরের ধ্যান জ্ঞানে যে সুখ হয় সেই সুখ দিয়ে বাঁধে। খুব নিষ্ঠাবান মুসলমান বা খ্রীশ্চানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, জীবনের উদ্দেশ্য কি? এরা বলবে – কারুর ক্ষতি না করা, দুটো মানুষের ভালো করা আর ঈশ্বরের প্রতি মন রাখা। এগুলো করলে কি হবে? যিনি গড্ যিনি আল্লা তিনি বিচারের দিনে আমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু একজন বেদান্তীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তিনি বলবেন, যতক্ষণ না আমি মানুষের ভালো না করছি, কারুর ক্ষতি না করছি আর ঈশ্বরের মনন না করতে পারছি ততক্ষন আমি মুক্তির পথে পা রাখতে পারবো না। মুক্তির পথে শেষ ধাপে অধর্মটাও বন্ধন, তমো গুণটাও বন্ধন আর ধর্মটাও বন্ধন, তুমি যে সচ্চিদানন্দের সাথে অভিন্ন, তুমিই যে সেই শুদ্ধাত্মা এই বোধটাকে ধর্মও হতে দেবে না। গীতায় এই কথাই বলছে – *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*। সত্যগুণ তোমাকে সুখ দিয়ে আর জ্ঞান দিয়ে মানে শাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা, এই দিয়ে বাঁধবে। নিষ্ঠাবান মুসলমান কোরান ছাড়া আর কোন কিছুকে মানবে না। একজন মুসলমান রাজা আলেকজেন্দ্রিয়াতে এক লাইব্রেরিতে গেছে, অনেক বই দেখে জিজ্ঞেস করছে – এই বইয়ের কথাগুলো কি কোরানে আছে? লাইব্রেরির লোকেরা বুঝতে পারছে না রাজা কি বলতে চাইছে। রাজা বলছে, এই বইগুলির কথা যদি কোরানে থাকে তাহলে এই বইগুলির রাখার কোন দরকার নেই আর এই বইয়ের কথা যদি কোরানের সাথে না মেলে

তাহলেও এই বইগুলি রাখার কোন দরকার নেই, তাই এই সব বইগুলিকে পুড়িয়ে দাও। আলেকজেন্দ্রিয়ার লাইব্রেরি ছ'মাস ধরে পুড়ল। রাজার ধর্মে নিষ্ঠা আছে, ধর্মগ্রন্থে নিষ্ঠা আছে কিন্তু এইটাই তাকে বেঁধে নিয়েছে। গ্রামের একজন ব্রাহ্মণকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তখন সেও বলবে ধর্ম মানে সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না, ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা রাখবে, গঙ্গা স্নান করবে, তুলসি পাতা খাবে, মন্দিরে প্রণাম করবে। এরা হল ধার্মিক। ধার্মিক হওয়া আর আধ্যাত্মিক হওয়া এই দুটো পুরো আলাদা। আমরা আধ্যাত্মিক হওয়াকে প্রায়ই ধার্মিক হওয়ার মধ্যে গুলিয়ে ফেলি। ধার্মিক হওয়া মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যেখানে সত্য কথা বলবে, ঈশ্বরে ভক্তি থাকবে, কোন পাপকর্মে লিপ্ত হবে না আর আধ্যাত্মিক হওয়া মানে নিজের স্বরূপের জ্ঞান। নিজের স্বরূপের জ্ঞান ধর্ম অধর্ম, সত্য মিথ্যা, পাপ-পূণ্যের পারে। মহাভারতের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক হওয়া, তার সাথে সাথে দেখিয়ে দিচ্ছে ধর্ম জিনিষটা কি। এক জায়গায় মহাভারত সত্য কথা বলতে বলছে আরেক জায়গায় মিথ্যা কথা বলার জন্য উপদেশ দিচ্ছে। কারণ সত্য কথা বলাটাও বন্ধন আর মিথ্যে কথা বলাটাও বন্ধন। নিজের স্বার্থের জন্য মিথ্যে কথা বলা বড় বন্ধন আর ধার্মিক হওয়ার জন্য সত্য কথা বলা সেটাও বন্ধন। অপরের ভালোর জন্য যখন আমি মিথ্যে কথা বলছি আমি কিন্তু তখন বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়ে গেছি, কারণ সেখানে আমার আর কোন স্বার্থ থাকল না। স্বামীজী বলছেন – They alone live who lives for others, rest are more than they alive যখনই আমরা অপরের জন্য জীবন যাপন করতে শুরু করলাম, অপরের ভালোর জন্য মিথ্যে কথা বলতে শুরু করেছি, তখনই আমাদের জীবন-ধারা ইতিবাচক দিকে চলতে শুরু করল। এটা একটা নতুন পথ নিয়ে নিলাম, কিন্তু তাই বলে আমি আধ্যাত্মিক হয়ে যাবো না, আধ্যাত্মিক আমি সেদিনই হব যেদিন আমার স্বরূপকে স্পষ্ট ভাবে ঠিক ঠিক দেখতে পারবো। এই স্বরূপ অনেক ভাবেই হতে পারে, আমি দেখতে পারি আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি দেখতে পারি আমি ঈশ্বরের দাস বা আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, যার যে রকম সাধনা সে সেই রকম দেখবে, তখনই আমি আধ্যাত্মিক হব। মূল্যবোধ শেখানো মহাভারতের উদ্দেশ্য নয়, মহাভারতের উদ্দেশ্য ধার্মিক হওয়া নয়, মহাভারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মোক্ষ পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া। সবাই মোক্ষ বা মুক্তির যোগ্য নয় তাই বলছে তুমি ধার্মিক হও। ধার্মিক হওয়ার জন্য তোমাকে আগে তোমার স্বার্থকে ছেড়ে স্বার্থ শূন্য হও। এত দিন তুমি শুধু নিজের জন্যই ভেবে আসছ, এই ভাবনাটা এবার বন্ধ করে অপরের জন্য ভাবতে শুরু কর। অপরের জন্য ভাবতে গিয়ে কারুর ভালোর জন্য যদি তোমাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়, চুরি করতে হয় তুমি অবশ্যই করবে। শুধু তাই নয়, অনেকের মঙ্গলের জন্য যদি তোমাকে চারজনের গলা কাটতে হয় তুমি কাট। অহিংসা পরমো ধর্ম, কিন্তু তুমি যখন নিঃস্বার্থ হয়ে পড়ছ তখন কি হবে? *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। তুমিও কাউকে হত্যা করোনি তোমাকেও কেউ হত্যা করেনি। এবার আমি খুব খুশি হয়ে বলছি, আমি তো এটাই চাইছিলাম আমি সবাইকে মেরে দিয়ে সব ভোগ করবো তাতে আমার কোন পাপ লাগবে না। কিন্তু বলছে, সেটি হবে না বাপু, তোমাকেও যদি কেউ মেরে দেয় তখন তুমিও কাঁদতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী কে? হাত কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে কিন্তু বলছে কই আমার তো কিছু হয়নি, শরীরের রক্ত বেরোচ্ছে তাতে আমার কি, আমিতো শরীর নই, আমি সেই শুদ্ধাত্মা। তখন সে হয়ে গেল আধ্যাত্মিক। যখন সে আত্মার সঙ্গে নিজেকে এক বোধ করে নেয় তখন দেখে এই শরীরটা কিছুই নয়। তখন অপরে মরলেও তার কিছু আসে যায় না, নিজে মরলেও কিছু আসে যায় না।

দুষ্মন্তের প্রতি দৈববাণী

শকুন্তলা সত্যধর্মের কথা বলে বলছেন *রাজন্ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যং চ সময়ঃ পরঃ। মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সংগতমস্তু তে।*।১/৭৪/১০৫। হে রাজন্! সত্য হল পরম ব্রহ্ম সত্যই সব থেকে বড় কাল, সেইজন্য হে রাজন্ আপনি সত্যকে ছাড়বেন না, সেদিন নির্জনে আপনি আমার হাত ধরে বলেছিলেন আমি তোমার তুমি আমার। শকুন্তলা এত কথা বলে যাচ্ছেন, সব বলার পরও রাজা দুষ্মন্ত কিন্তু তার অবস্থান থেকে একটুও সরলেন না। শকুন্তলা তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে অভিশাপ দেওয়ার পর শেষে বলছে 'দেবরাজ ইন্দ্র বলে গেছেন, হে শকুন্তলা তোমার সন্তান চক্রবর্তী রাজা হবে। তাই রাজন, আপনি শুনে নিন, আপনার কোন সাহায্যের দরকার নেই, আপনার সাহায্য ব্যতিরেকেই আমার এই সন্তান চক্রবর্তী রাজা হবে, কারণ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এই কথা বলে গেছেন'। এই কথা বলে দিয়ে শকুন্তলা বেরিয়ে যেতে উদ্যোগ নিয়েছেন। তখন হঠাৎ একটা দৈববাণী হল – পিতাই পুত্র রূপে জন্ম পরিগ্রহ করে, মা শুধু আধার মাত্র, অতএব হে দুষ্মন্ত তুমি এই রকম আচরণ না করে নিজের পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করো না।

তখন দুষ্মন্ত বলছেন – আমি চাইছিলাম এই আকাশবাণীটা হোক। দুষ্মন্তও কোন সাধারণ রাজা ছিলেন না। দুষ্মন্ত বলছেন – কারণ তাহলে লোকেরা ভাববে কোথা থেকে একটা মেয়ে এসে রাজাকে নিজের স্ত্রী রূপে পরিচয় দিচ্ছে আর

আমি কাম বশতঃ তাকে ঘরে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। আমি সবাইকে দেখাতে চাইছিলাম এ হচ্ছে আমার ঠিক ঠিক স্ত্রী, আর আমি কামবশে কিছু করতে যাচ্ছি না। এইভাবে রাজা দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার মিলন হয়ে গেল। এরপর ভরত হয়ে গেল রাজা।

এই কাহিনী বলছেন বৈশম্পায়ন। কোথায় বলছেন? জনমেজয় যে সর্পযজ্ঞ করছিল সেখানে বলছেন। ব্যাসদেবও সেখানে বসে আছেন। বৈশম্পায়ন বলছেন – বুঝলে জনমেজয়, এই শকুন্তলা আর দুষ্মন্তের পুত্র ভরত যে ভূখণ্ডে রাজত্ব করেছিলেন তার নাম হল – ভরতাদ্ ভারতী। ভরত এখানকার রাজা ছিলেন, সেখান থেকে এর নাম হয়ে গেল ভারতবর্ষ। তোমার পূর্বপুরুষরা এই ভরতবংশী। দুর্যোধন, অর্জুনদের বংশকে কখন সুর্যবংশী বলা হয় আবার কখন ভরতবংশীও বলা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভরতবংশীই বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে মাঝে মাঝে ভারত বলে সম্বোধন করেছেন। ভারত মানে যিনি ভরতবংশের সন্তান। জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন তার পূর্বপুরুষের কাহিনী শোনালেন। এরপর বৈশম্পায়ন নানা কাহিনী বলে বলে কৌরব ও পাণ্ডব বংশের কাহিনীতে এনে ফেলবেন। এইভাবে মহাভারতের কাহিনী এগিয়ে চলবে। এখানে জনমেজয়কে তার পূর্বপুরুষদের কাহিনী শোনান হল, এমনকি এক জায়গায় জনমেজয় দুর্যোধনের সমালোচনা করতে শুরু করলে বৈশম্পায়ন সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটকে দেবেন, রাজা জনমেজয়, তুমি এরকম করো না, মনে রেখো দুর্যোধন তোমার ঠাকুর্দা হন, তিনি তোমার পূর্বপুরুষ।

ব্রহ্মার সৃষ্টির কল্পনা, কল্প ও মনু

মহাভারতে দেখানো হয় ব্রহ্মা থেকে কিভাবে সৃষ্টি এগিয়ে গেছে। সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে বৈবস্বত মনুর প্রসঙ্গ আসবে। এই যে আমরা এতক্ষণ কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, কর্মকে আলোচনা করতে গিয়ে পুনর্জন্মের কথা এসেছিল। পুনর্জন্মেই এনারা সব কিছুর ইতি করে দিচ্ছেন না, এখান থেকে এনারা চলে যান চক্রাকার সৃষ্টি তত্ত্বে, যার শাস্ত্রীয় পরিভাষা হল কল্প। চক্রাকার সৃষ্টি তত্ত্বে বলা হয় এই পৃথিবী আর যত গ্রহ নক্ষত্র আছে অর্থাৎ পুরো ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমাগত একবার নাশ হচ্ছে আবার জন্ম হচ্ছে আবার নাশ হচ্ছে। এই মুহুর্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম নিচ্ছে আবার কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হয়ে চলেছে। আমরা এখন এই রকম একটা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আছি। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের লয় কবে হবে? বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন চৌদ্দ মিলিয়ন বছর পর এই ব্রহ্মাণ্ডও লয় হয়ে যাবে। ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হল কি নাশ হল এই নিয়ে আমাদের কোন কিছুই যায় আসে না। আমাদের কাছে বড় হলেন ভগবান, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সব সময় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম দিচ্ছেন আর সাথে সাথে সব সময় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লয় করাচ্ছেন। আমাদের পৃথিবী এই রকম একটি ব্রহ্মাণ্ডের একটা ছোট্ট অংশ। পুরানে আবার এই সৃষ্টি, স্থিতি আর লয়ের বিশাল হিসেব দেওয়া হয়েছে, সেখানে কত শূন্য তারই হিসেব রাখা মুশকিল। এগুলো বাস্তবে কি হচ্ছে জানা যায় না, এগুলো আমাদের চিন্তা ভাবনার একটা প্রক্রিয়া মাত্র। বেদেই বলবে, সৃষ্টির আগে কেউ ছিল না, তাই সৃষ্টির আগে আর সৃষ্টির সময় কে দেখেছে যে বলবে সৃষ্টির সময় এই ছিল আর এই হয়েছিল। কোন ঋষিকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন সৃষ্টি কবে হয়েছিল তখন তাঁরা একটা উত্তর দিয়ে দিলেন একের পিঠে পনেরোটা শূন্য দিলে যত হবে তত বছর আগে হয়েছিল। কত দিন থাকবে? তারপর কি হবে? কিছু দিন চলতে থাকবে আবার ধ্বংস হয়ে যাবে, আবার সৃষ্টি হবে। এটাই একমাত্র যুক্তিতে দাঁড়ায়। এখন যদি আপনি বলেন যুক্তিতে অন্য রকমও দাঁড়ায়। তাতে কেউ আপত্তি করবে না। এসব কোন কিছুই কিছু নয়, আসল কথা হল ধর্মে তুমি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারছো কিনা। এখন কোন কল্প যখন শুরু হয় তখন প্রথমেই যিনি সৃষ্টি হন তাঁকে বলা হয় মনু, যিনি মানবজাতিকে জন্ম দেন। প্রত্যেক কল্পের মনুরা সবাই আলাদা আলাদা, তাঁদের নামও আলাদা। এখন আমরা যে কল্পের মধ্যে দিয়ে চলেছি, এই কল্পের মনুর নাম বৈবস্বত। এই কল্পের পরে যিনি মনু হবেন তাঁর নাম সাবর্ণি মনু। অন্য দিকে জুডিও খ্রীশ্চান পরম্পরাতে প্রথম মানুষকে বলা হয় আদম, আমাদের পরম্পরাতে প্রথম পুরুষকে বলা হয় মনু। কিন্তু আমাদের সৃষ্টি একবারের মত নয়, সৃষ্টি, স্থিতি আর সংহার চক্রাকারে হয়ে চলেছে। প্রত্যেক কল্পে একই লোক মনু হবে না, কে মনু হবে তারও আবার নিয়ম আছে, যে এত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছে, এত পূণ্য করেছে সে পরের কল্পে প্রথম পুরুষ হবে, প্রথম পুরুষ মানে সে এই পুরো কল্পের মালিক।

মনু যিনি হলেন, তাঁকে একা হলে হবে না, তাঁর একজন স্ত্রীর দরকার। ব্রহ্মা প্রথমে নিজের মন থেকে সৃষ্টি করতে শুরু করেন। তখন মন থেকে তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে জন্ম দিলেন। প্রজাপতি মানে, যিনি প্রজাবর্গের বৃদ্ধি করেন। দক্ষ প্রজাপতিকেও বলা হল সৃষ্টির কাজে সহায়তা করার জন্য। দক্ষ প্রজাপতি তখন তপস্যার মাধ্যমে কিছু কন্যার জন্ম দিলেন। এইভাবে তিনি প্রথমে ষাট জন কন্যাকে জন্ম দিলেন। ব্রহ্মার সঙ্কল্প থেকে আরও কিছু ঋষির জন্ম হয়েছিল। ব্রহ্মা দেখলেন সঙ্কল্প করে করে সৃষ্টি সেই ভাবে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে না। তখন সৃষ্টিকে তরান্বিত করার ব্যাপারে শারীরিক

প্রক্রিয়াকে কাজে লাগালেন। এই সৃষ্টি প্রকরণের বিশদ বিবরণ পুরানে আরও বিস্তৃত ভাবে দেওয়া আছে। এখন মনুর সাথে এই কন্যাদের মিলন হতে শুরু হল আবার তাদের থেকে নানান ধরণের প্রাণির জন্ম হতে শুরু হল। এইভাবে নানা কাহিনীর মাধ্যমে এগিয়ে একটা জায়গাতে রাজা নহুষকে নিয়ে এলেন।

নহুষ ও যযাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ইন্দ্রের একবার কোন কারণে একটা পাপ লাগাতে তাঁকে ইন্দ্রত্ব পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। স্বর্গতো ইন্দ্রকে ছাড়া চলবে না। তখন খোঁজ নেওয়া হতে থাকল পৃথিবীতে কে সব থেকে পূণ্যবান, বলবান ও প্রতাপবান রাজা আছেন। নহুষের এত পূণ্য আর এত বিশাল প্রতাপ ছিল যে তাঁকে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব পদে বসান হল। এই নহুষের ছটি সন্তান ছিল, তার মধ্যে একজন হলেন যযাতি। যযাতি খুব বিখ্যাত রাজা ছিলেন। মহাভারত যে বংশকে আধার করে তার কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, যযাতি ছিলেন সেই কুরু বংশের এক প্রধান স্তম্ভ।

যযাতির দুই পত্নি, দেবযানি আর শর্মিষ্ঠা। দেবযানি অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের আদরের একমাত্র কন্যা আর অসুরদের রাজা বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা। শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতিকে জরা গ্রাস করেছিল। যযাতির ছিল তুখোড় বুদ্ধি, নিজের শ্বশুরকে গিয়ে বলছেন, আপনার কন্যর মত রূপসী মেয়ে কোথাও হয় না, ওর থেকে এখনও আমার ভোগের শান্তি হয়নি, আপনি আমার কিছু একটা উপায় বার করুন। কায়দা করে শ্বশুরকে তাঁর মেয়ের নাম নিয়ে বাঁচতে চাইছে। শুক্রাচার্য তখন বলে দিলেন, তোমার কোন ছেলে যদি তার যৌবনটা তোমাকে দিয়ে দেয় তাহলে তুমি আবার তোমার যৌবন ফিরে পাবে, তবে তোমার ছেলে জড়াগ্রস্ত হয়ে যাবে। এরপর যযাতি একে একে তিন ছেলেকে প্রস্তাব দিয়েছেন। এই কাহিনীগুলোই পরপর আসতে থাকবে, যযাতির পর কিভাবে বংশ গড়িয়েছে সেটাকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে শান্তনু, পিতামহ ভীষ্মে, সেখান থেকে চলে আসবে যুধিষ্টির পর্যন্ত।

ভোগের শান্তি ও যযাতির বোধদয়

যযাতির পুত্র পুরু তার পিতার আজ্ঞা পালন করে নিজের যৌবন পিতা যযাতিকে দিয়ে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর আগেই রাজা যযাতি দুটো সুন্দরী যুবতী মেয়েকে বিয়ে করলেন, একজন হলেন অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা অন্য জন অসুরদের রাজা বৃষপর্বার কন্যা। একজন ব্রাহ্মণ কন্যা অন্য জন ক্ষত্রিয় কন্যা। আচার্য শঙ্কর অসুর আর দেবতাদের পার্থক্য করতে গিয়ে ব্যাখ্যা করছেন, অসুররা আসলে হল যারা ইন্দ্রিয় শক্তির উপর বেশী বিশ্বাস আর নির্ভর করে চলে, দেবতারা আধ্যাত্মিক শক্তির উপর বেশী জোর দেয়। কিন্তু রাজা যযাতি নহুষের সন্তান, তাঁর মধ্যে বিচার বিবেক ছিল, একটা সময় গিয়ে তাঁরও হুঁশ এলো, ছিঃ কি করছি আমি এটা, আমার ছেলেকে বুড়ো বানিয়ে দিলাম, আমি তার যৌবন নিয়ে ভোগ করেই যাচ্ছি কিন্তু এখনও মন ভরছে না। ভোগ দিয়ে ভোগের নিবৃত্তি কখনই সম্ভব হবে না। রাজা যযাতি এইভাবে ভোগ করে করে দেখছে কিছুতেই ভোগের শান্তি হচ্ছে না, তখন তিনি বিরক্ত হয়ে গেছেন। সেই সময় তাঁর মুখ থেকে বিখ্যাত উক্তি বেরিয়ে এসেছে – *ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয়ঃ এবাভিবর্ধতে।। পৃথিবী রত্নসম্পূর্ণা হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎ সর্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ।।* ১/৭৫/৪০-৪১। কাম দ্বারা কামের ইচ্ছাকে কখনই পূর্ণ করা যায় না। কি রকম – আগুনে যদি তেল বা ঘি ঢালতে থাকা হয় আর যদি ভাবতে থাকি আগুনটা নিভে যাবে, তাহলে এই ভাবে আগুন কোন দিন শান্ত হবে না। কাম-বাসনা হল আগুনের মত, এই কামের মধ্যে ভোগে নামাটা ঘৃতের মত, তখন বাসনাটা আরও জেগে উঠবে। যযাতি তাই বলছেন, আমার কোন পথ নেই। পৃথিবীতে যত সুবর্ণ ধন, শস্য, হরিণ, পশু ও স্ত্রী আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়, তাই বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত। ভোগের একমাত্র শান্তির উপায় হচ্ছে – *যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মন্ন বিভ্যতি। যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।*১/৭৬/৪৩। যখন জগতের কাউকে সে ভয় পায়না, আর তাকেও কেউ ভয় পায়না, *অভয়ং সর্ব ভূতেব্য*। সংস্কৃতে অভয় দুটো অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তুমি কাউকে ভয় পাওনা সেটাকেও অভয় বলে আবার তোমাকেও কেউ ভয় পায়না তাকেও অভয় বলে। এই অভয়ে যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই মানুষ শান্তি পায়। কোন কিছুকে ভয় না পাওয়া মানে, মৃত্যুকে ভয় পাবে না, বৃদ্ধাবস্থাকে ভয় পাবে না, রোগশোককে ভয় পাবে না, কোন মানুষকে ভয় পাবে না। এই অবস্থা কখন হয়? *যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি*, কোন কিছুর প্রতি তার ইচ্ছাও থাকবে না আর কোন কিছুর প্রতি তার দ্বেষও থাকবে না। এটা কখন হয়? *ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা*, যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখনই এই

অবস্থা হয়। অন্যভাবে বলা হয় যখন এই অবস্থা হয় তখন সে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, সম্পদ্যতের অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে। ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি আসবে না। মনে শান্তি কখন আসবে? তার তিনটে শর্ত বলা হচ্ছে। মন থেকে সব ভয় চলে যাবে, তুমি তো কাউকে ভয় পাওনা, কিন্তু তোমাকে দেখেও কেউ যেন ভয় না পায়। কেউ যদি বলে আমি কাউকে ভয় পাইনা, কিন্তু আমি তাকে দেখে ভয় পাচ্ছি তার মানে তার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। যারা জেহাদী তারা কাউকে ভয় পায়না, তাহলে কি তারা মহৎ হয়ে গেছে? আদপেই না। যদি কাউকে বলা হয় তোমার মৃত্যু হবে না, কিন্তু এই করলে তোমাকে বুড়ো জুবুথুবু হয়ে থাকতে হবে, তখন সে ভয় পেয়ে যাবে। তার মানে, তার মনে কিছু একটা আছে যেটাকে সে ভয় করছে। এখানে বলা হচ্ছে তুমিও কোন কিছু থেকে ভয় পাবে না, তোমাকে কেউ ভয় পাবে না। কোন কিছুর প্রতি তোমার ইচ্ছাও থাকবে না আবার কোন কিছু থেকে তুমি পালাবেও না। এই অবস্থা হলে তুমি ব্রহ্মপদ, ঈশ্বর দর্শন লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে। যখন এই অবস্থা হবে তারপরেই ঠিক ঠিক শান্তি হবে। তুমি যদি মনে করে থাক আমার কাম ভোগের ইচ্ছা জাগছে, ঐ ইচ্ছা পুর্তি হয়ে গেলে আমি শান্ত হয়ে যাব তাহলে তুমি কোন দিন শান্ত হতে পারবে না। এই কথা যযাতি বলছে। এই কথা বলে যযাতি ধিক্ বলে সব কিছু ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে, বউদের ছেড়ে নিজের সন্তানকে আশীর্বাদ দিয়ে ঋষি হয়ে তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন। তপস্যার পর কি হলে সেই কাহিনীও পরে আসবে।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য, কচ ও দেবযানীর কাহিনী (কচের প্রতি দেবযানীর আসক্তি – কচের অমৃতের রহস্য বিদ্যা লাভ – দেবযানীর প্রস্তাবকে কচের প্রত্যাখ্যান – দেবযানীর অভিশাপ)

এর আগে আমরা দেখলাম দেবতা আর অসুর এরা দুই আলাদা শ্রেণীর জাতি। আমাদের যে কটি ইন্দ্রিয় কাজ করে চলেছে তার পেছনে যে আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে তার প্রতি দেবতারা বেশী সম্মান দেন। অসুরের অসু মানে প্রাণ শক্তি, এই প্রাণ শক্তির উপর যারা বেশী জোর দেয় তাদেরকে বলা হয় অসুর। এই অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য, তিনি খুব উচ্চকোটির একজন ব্রাহ্মণ ঋষি। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি। শুক্রাচার্য অমৃতের রহস্য জানতেন, কিন্তু দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি জানতেন না। দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যখন মারমারি কাটাকাটি হয় তখন যত অসুর মারা যায় শুক্রাচার্য তাদের অমৃত ছিটিয়ে বাঁচিয়ে দেন। দেবতারা মারা গেলে মরেই থাকতো। আগেকার দিনে দেবতারাও মারা যেতেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, এসবই হল আখ্যায়িকা, এর সব কিছুকে আক্ষরিক নিতে বলা হচ্ছে না। এই নিয়ে বিপরীত বক্তব্য দেখতে পাই, উপনিষদেই দেখতে পাই দেবতারাও আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে অমৃত পেয়ে গিয়েছিলেন। আমি কে, এই জানাটাই অমৃত। এখানে অমৃত এই অর্থে আত্মজ্ঞান পায়নি। এখানে উল্টোটাই পাচ্ছি, অসুররা অমৃত পায়নি, পেয়েছিলেন শুক্রাচার্য, আর শুক্রাচার্যও অসুরদের জ্ঞান দেননি, উনি মৃত অসুরদের বাঁচিয়ে দিতেন। পৌরানিক কাহিনীর এটাই বৈশিষ্ট্য। পুরান একটা সাধারণ ঘটনাকে নিয়ে একটা সুন্দর কাহিনীকে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখানে বৃহস্পতির আগে শুক্রাচার্য অমৃতের রহস্য পেয়ে গিয়েছিলেন, মানে আত্মজ্ঞান পেয়ে গিয়েছিলেন। অথচ বৃহস্পতিকে বলা হয় তিনি দেবতাদের গুরু।

দেবতারা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে, বৃহস্পতিরও খুব চিন্তা হয়ে গেছে, কি করে এই অমৃতের রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বৃহস্পতির একমাত্র ছেলের নাম কচ, তিনি ছেলেকে বললেন তুমি এই রহস্যের সন্ধানের ব্যাপারে কিছু একটা কর। কচকে শুক্রাচার্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। শুক্রাচার্য দেখছেন দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁর ছেলে আমার কাছে শিক্ষার জন্য এসেছে, কচকে তিনি তাঁর গৃহে সাদরে আশ্রয় দিয়েছেন। কচও শুক্রাচার্যের কাছে থেকে গেলেন। এখানে থাকতে থাকতে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সাথে কচের প্রণয় হয়ে যায়। কচের একটাই উদ্দেশ্য কি করে অমৃত বিদ্যাটা শুক্রাচার্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত করা যায়। অসুররা জেনে গেছে কচের কি উদ্দেশ্য। অসুররা একবার কচকে মেরে কেটে টুকরো টুকরো করে কুয়োতে ফেলে দিয়েছে। কচ বাড়ি ফিরছে না দেখে দেবযানী কান্নাকাটি করতে শুরু করে দিয়েছে। দেবযানী হল শুক্রাচার্যের এক মাত্র মেয়ে, বড়ই আদরের। তিনি মেয়ের এই বিলাপ দেখে থাকতে না পেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কচকে ডাকতে শুরু করলেন – কচ তুমি যেখানেই থাকো বেরিয়ে এসো। মন্ত্র ছাড়তেই কচ বেরিয়ে চলে এসেছে। এই রকম অসুররা কয়েকবার কচকে বধ করে দেওয়ার পরও বেঁচে যাচ্ছে, দেবযানীও কচকে ভালোবেসে ফেলেছে, শুক্রাচার্যও প্রত্যেক বার কচকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন।

অসুরর দেখলো এই ভাবে কচকে কিছু করা যাবে না, অন্য কোন উপায় দেখতে হবে। একদিন অসুররা শুক্ররাচার্যকে খুব করে মদ খাইয়ে দিয়েছে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা খুব মদ পান করত। ঐদিন কচকে ছাগলের মত কচ কচ করে কেটে তার মাংসটা মদের মধ্যে মিশিয়ে পুরোটা শুক্রাচার্যকে খাইয়ে দিয়েছে। যথারীতি কচ ফিরে আসছে না দেখে দেবযানী কাঁদতে শুরু করেছে। শুক্রাচার্য ভাবছেন কচ কোথায় যেতে পারে। তারপর তিনি যোগবলে দেখতে পেলেন

কচ তার পেটের ভেতর ঢুকে আছে। শুক্রাচার্য এখন কচকে বার করবেন কি করে? কচকে যদি বেরিয়ে আসতে হয় তাহলে শুক্রাচার্যের পেট চিরে বেরিয়ে আসতে হবে, তাহলে শুক্রচার্য মারা যাবেন। শুক্রাচার্য তখন বলছেন, ছিঃ ছিঃ, আমি মদ খেয়েছিলাম বলেই এই দুরবস্থা হল, তিনি তখন বললেন – *যো ব্রাহ্মণোহদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চি- ন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। অপতধর্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যদস্মিংল্লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ।।*১/৭৭/৬৭। আমি আজ থেকে অভিশাপ দিলাম কোন ব্রাহ্মণ যদি মদ্যপান করে সেই ব্রাহ্মণ পাপী বলে গণ্য হবে। যদি সে অজান্তেও মদ্য পান করে তাহলে তার ধর্ম থেকে পতন হয়ে যাবে, ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে। এই রকম অভিশাপ দিয়ে বলছেন সেই ব্রাহ্মণ ইহলোকে নিন্দিত হবে আর পরলোক থেকে পতিত হবে। এই চারটে অভিশাপ দিলেন, কোন ব্রাহ্মণ যদি অজান্তেও মদ্য পান করে তাহলে সে ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে, ব্রহ্মহত্যার পাপ তার লাগবে, ইহলোকে সেই নিন্দিত হবে আর পরলোক থেকে সেই পতিত হয়ে যাবে। সেই থেকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে মদ খাওয়াটা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এদিকে দেবযানী বাবাকেও হারাতে চাইছে না অন্য দিকে কচকেও সে চিরতরে বিসর্জন দিতে পারছে না। শুক্রাচার্য এখন আর কি করবেন, তখন তিনি কচকে বললেন, আমি তোমাকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি যখন বলব কচ বেরিয়ে এসো, তুমিতো আমার পেট চিরেই বেরিয়ে আসবে, আমি যখন মরে যাবো তুমি তখন এই মন্ত্র দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিও। কচ তো এই সুযোগের অপেক্ষাতেই এতদিন গুরুগৃহে পড়েছিল। কচ তো ওখানে মরে পড়ে রয়েছে, কচকে বাঁচিয়ে দিয়ে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়েছেন, শুক্রাচার্য যেই বললেন কচ তুমি বেরিয়ে এসো, কচ শুক্রাচার্যের পেট চিরে বেরিয়ে এসেছে। শুক্রাচার্য পেটে ফেটে মরে গেল। এদিকে কচ সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়ে গুরুকে বাঁচিয়ে দিলেন। এরপর তো শুক্রাচার্য রেগেমেগে অসুরদের গিয়ে বলছেন, তোমাদের জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি, এমন মুর্খের মত কাণ্ডটা করলে যার জন্য আজ দেবতারা অমৃতের রহস্য জেনে গেল, যেটা কোন দিনই দেবতাদের জানার কথা নয়। অসুরদের আর গালাগাল দিয়ে কি হবে শত্রুপক্ষ তো অমৃতের রহস্য জেনে গেল।

কচের কার্য সিদ্ধি হয়ে গেছে, সে এসে এখন বলছে, আমি তাহলে চললাম। দেবযানী বলছে 'তুমি যাবে কোথায় আমাকে বিয়ে না করে তুমি কোথাও যেতে পারো না'। কচ তখন বলছে 'আমি তোমার বাবার পেট থেকে বেরিয়েছি, সেইজন্য আমি তোমাকে আর বিয়ে করতে পারিনা। একদিকে তুমি আমার গুরুকন্যা ছিলে এখন তুমি আমার বোন হয়ে গেলে'। কচের এই কথা শুনে দেবযানীর মাথা গেছে গরম হয়ে 'আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, তাই তোমাকে এতবার বাঁচালাম, আর আজ কিনা গুরুকন্যা, বোন ইত্যাদি অজুহাত দিয়ে আমাকে উপেক্ষা করে চলে যেতে চাইছো! আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি এই বিদ্যা তুমি কোন দিন কাজে লাগাতে পারবে না'। দেবযানী ঋষিকন্যা, তারও অভিশাপের শক্তি আছে। তখন কচও খুব জোর রেগে গেছে। এইবার ধর্মের খেলা শুরু হয়ে গেল। কচ বলছে 'আমি চিরদিন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি যে, আমি তোমার বাবার পেটে থেকে বেরিয়েছি, তুমি আমার বোন হয়ে গেলে, আমি কি করে এখন তোমাকে বিয়ে করতে পারি, আর তুমি মুর্খের মত আমাকে অভিশাপ দিয়েছ। *ফলিষ্যতি ন তে বিদ্যা যৎ ত্বং মামাত্থ তৎ তথা। অধ্যাপয়িষ্যামি তু যং তস্য বিদ্যা ফলিষ্যতি।।*১/৭৭/২০। তোমার অভিশাপ আমার উপর লাগবেই কারণ তুমি ঋষিকন্যা, ঠিক আছে আমি এটা কোন দিন ব্যবহার করতে পারবো না, কিন্তু আমি আমার দেবতাদের গিয়ে শিখিয়ে দিচ্ছি, তারাই এই বিদ্যা কাজে লাগাবে'। কি মন্ত্র? অহং ব্রহ্মাস্মি, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, অবশ্য মহাভারতে মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই, তবে সঞ্জীবনি বলে কিছু নেই, এই একটাই মন্ত্র তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের সাথে তুমি এক। এটাকেই এখানে আখ্যায়িকা রূপে বলা হল। আমি যদি অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম সবাইকে বলতে শুরু করি তখন আমার কথা কেউ শুনবে না। তখন কচ ও দেবযানীর কাহিনী বানিয়ে এই তত্ত্বটাকেই সামনে নিয়ে এলেন। এবার কচ বলছে, ঠিক আছে আমিও তোমাকে পাল্টা অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ তোমাকে কোন দিন বিয়ে করবে না। অভিশাপ দিয়ে কচ বেরিয়ে চলে গেল। আমাদের শাস্ত্রে প্রায়ই এই অভিশাপ আর পাল্টা অভিশাপ বর্ষণের ঘটনা আসবে। একবার এক রাজা আর ঋষির মধ্যে লড়াই লেগে গিয়েছিল, এবার রাজা ঋষিকে অভিশাপ দিয়েছে, ঋষিও পাল্টা রাজাকে অভিশাপ দিয়েছে। তারপর দেখা গেল দুজনের মধ্যে ভুল কিছু বোঝাবুঝি হয়েছিল। ঋষিরও মন শান্ত হয়ে গেছে। তখন রাজা ঋষিকে বলছে আসুন আমরা আমাদের অভিশাপ ফেরত নিয়েনি। ঋষির মন আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তিনি তাঁর অভিশাপ ফেরত নিয়ে নিলেন। তারপর রাজাকে ফেরত নিতে বলায় রাজা বলছে – দেখুন আপনি ব্রাহ্মণ আর আমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণদের যত রাগ মুখে তাই আপনি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন অভিশাপও

ফেরত নিয়ে নিলেন কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আমার রাগ ভেতর থেকে আসে, আমি কিন্তু আমার অভিশাপ ফেরত নিতে পারবো না। ঋষি তখন পাল্টা রাজাকে আরেকটা অভিশাপ দিয়েছে। এই ধরণের অভিশাপ আমাদের শাস্ত্রে লেগেই আছে।

যযাতি, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কাহিনী

শর্মিষ্ঠা ছিল অসুরদের রাজা বৃষপর্বার কন্যা, আর দেবযানী অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের পুত্রী। বিয়ের আগে থেকেই এদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একদিন স্নান করে ওঠার পর কোন একটা গোলমাল হয়ে গিয়ে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর কাপড় পড়ে নিয়েছে। দেবযানীও এসে দেখে শর্মিষ্ঠার তার শাড়ি পড়ে নিয়েছে, সেও রেগে গেছে 'তোমার বাবা আমার বাবার শিষ্য, তুমি কোন দুঃসাহসে আমার শাড়ি পড়ে নিয়েছ'। শর্মিষ্ঠাও কম যায় না, সেও রাজার মেয়ে। রেগে গিয়ে বলছে 'তুমি একটা কাঙালীর মেয়ে, তোমার বাবা আমার বাবার স্তুতি করে, আমার বাবা কখন দান গ্রহণ করেন না, তিনি দান দেন। তোমার বাবা আমার বাবার দানের উপর বেঁচে আছে, আমি চাইলে তোমাকে এক্ষুণি পিশে দিতে পারি। এর পরেও যদি তুমি কিছু বল আমি তোমাকে এখনই শেষ করে দেব'।

এরপর যা হয়ে থাকে, এ কথা সে কথা হতে হতে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে পিটিয়ে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজা যযাতি শিকার করতে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার জলতেষ্টা পেয়েছে। জল খেতে রাজা একটা কুয়োর কাছে এসেছে। কুয়োটা ছিল শুকনো। রাজা যযাতি দেখে কুয়োর মধ্যে একটি অতি সুন্দরী মেয়ে পড়ে আছে। তখন যযাতি খুব সযত্নে হাত দিয়ে টেনে দেবযানীকে কুয়ো থেকে বার করে এনেছে। ইতিমধ্যে শুক্রাচার্যও মেয়ে ফিরছে না দেখে অসুরদের পাঠালেন খোঁজ নিতে। খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে দেখে দেবযানী কুয়োর পারে বসে আছে আর কাঁদছে। দেবযানী আর বাড়িতে ফিরে যাবে না, দেবযানী বলছে বাবাকে ডেকে পাঠাও। শুক্রাচার্যও এসে গেছেন, বাবাকে দেখে দেবযানী শর্মিষ্ঠা যা যা বলেছিল সব বলে বলছে 'আমি কিনা একটা কাঙালীর মেয়ে, আমার বাবা কিনা ভিক্ষুক, আমি একটা দাসের মেয়ে'!

শুক্রাচার্য তখন মেয়েকে বলছেন – মা তুমি জেনে নাও, তুমি কোন কাঙালীর মেয়ে নও, আমি কারুর মোসায়েবি করিনা, তুমি কোন মোসায়েবের মেয়ে নও। *বৃষপর্ব্বৈব তদ্ বেদ শক্রো রাজা চ নাহুষঃ। অচিন্ত্যং ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বমৈশ্বরং হি বলং মম।।*১/৭৮/৩৮। আমার যে শক্তি তার খবর একমাত্র তিনজনই জানে, তারা কে কে জানো? অসুরদের রাজা বৃষপর্বা, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আর রাজা যযাতি। এখানে শুক্রাচার্য যে কত বড় সেটাকে বোঝাতে তিনি তিন জন রাজার নাম করলেন, অসুরদের রাজা, দেবতাদের রাজা আর মানুষদের রাজা, এরা তিনজন তাঁর শক্তি ও প্রতাপের ব্যাপারে অবহিত। তিনি বলছেন – আমার শক্তি কি জানো – *অচিন্ত্যং ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বমৈশ্বরং হি বলং মম* – যে ব্রহ্মকে মন দিয়ে জানা যায় না, যিনি সমস্ত দ্বন্দ্বের পারে, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর পারে যিনি, যিনি ঐশ্বর্য যুক্ত, এটাই হচ্ছে আমার শক্তি। মানে শুক্রাচার্য বলতে চাইছেন, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে যতদূর পাওয়া যায় শুক্রাচার্যই হলেন প্রথম ব্রহ্মজ্ঞানী। যদিও উপনিষদের ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞানী রূপেই দেখা হয়। কিন্তু মহাভারতে এমন ভাবে দেখানো হচ্ছে, যেখানে দেবতাদের মধ্যে কেউ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন না, অসুরদের মধ্যে তো কোন প্রশ্নই নেই, বৃহস্পতিও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন না কিন্তু এখানে শুক্রাচার্য নিজের মেয়েকে বলছেন, জানো মা, আমার শক্তি কোথায়, আমার ঐশ্বর্য কি? আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। ঠিক এই রকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিনীকে বলবেন – আমার কিছুই শক্তি নেই কিন্তু আমি আত্মজ্ঞানী, আমি নিজেকে জানি এটাই আমার শক্তি, এছাড়া আমার আর কোন শক্তি নেই। কারণ যিনি আত্মজ্ঞানী, তাঁর মত শক্তিমান আর কেউই হয় না। আত্মজ্ঞানী ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যান, ভগবানের সত্তা তাঁর মধ্যে চলে আসে। সে যেই হোন না কেন, যিশু, বুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শুকদেব, যাঁরাই আত্মজ্ঞানী তাঁরা ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান। ঈশ্বরকে ভালোবেসে যতক্ষণ তাঁর সাথে এক হয়ে না যায় ততক্ষণ জ্ঞান হয় না।

শুক্রাচার্য বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী হলে কি হয়? *যশ্চ কিঞ্চিৎ সর্বগতং ভূমো বা যদি বা দিবি। তস্যাহমীশ্বরো নিত্যং তুষ্টেনোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।।*১/৭৮/৩৯। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে চর, অচর, স্থাবর, জঙ্গম এর আমি হলাম *নিত্যং ঈশ্বরং*, যিনি স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তিনি স্বয়ং আমাকে এই বর দিয়েছেন। এইখানে এসে দর্শনে একটা বিপরীত মতের জন্ম দিচ্ছে। এখানে ব্রহ্মা শুক্রাচার্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের বর দিয়েছেন, এই জায়গাতে এসে কোথাও যেন ব্রহ্মা আর ব্রহ্মের মধ্যে বিভাজন রেখাটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পরের দিকে অবশ্য ব্রহ্মাকে অনেক নীচে রাখা হয়েছে। এখনও ভগবান বিষ্ণুর সেই

শক্তি, ভাগবতে যেটাকে বেশী করে দেখানো হয়েছে, মহাভারতের এখানে সেই শক্তিকে দেখানো হচ্ছে না। স্বয়ম্ভূ মানে যিনি প্রথম জাত, যিনি নিজেই হয়েছেন যাঁর স্রষ্টা কেউ নেই। আমাদের পরম্পরাতে স্বয়ম্ভূ কোথাও ব্রহ্মাকে বলছে, কোথাও শিবকে বলছে, কোথাও বিষ্ণুকে বলছে আবার কোথাও মনুকেও বলা হয়। তিনি নিজেই আমাকে বর দিয়েছেন, যা কিছু সৃষ্টিতে আছে, এই সৃষ্টি দিয়েছেন ব্রহ্মা তিনি নিজেই বলছেন তুমি হলে সব কিছুর ঈশ্বর, তুমি সব কিছুর মালিক। এটি একটি খুব কূট শ্লোক। মহাভারতে ৮৮০০টি শ্লোককে কূট শ্লোক বলা হয়। এই শ্লোকগুলোর অর্থ একমাত্র ব্যাসদেব বুঝেছেন, শুকদেব বুঝেছেন আর গণেশ বুঝেছেন, এই তিনজনের বাইরে আর কেউ বুঝতে পারবে না। এর পরের শ্লোকেই বলছেন – *অহং জলং বিমুঞ্চামি প্রজানাং হিতকাম্যয়া। পুষ্ণাম্যোষধয়ঃ সর্বা ইতি সত্যং ব্রবীমি তে।।*১/৭৮/৪০। আমি ইন্দ্র রূপে মেঘ হয়ে বৃষ্টি দিচ্ছি যাতে প্রজারা বেঁচে থাকে, আর এই যত গাছপালা আছে আর যা কিছু আছে এগুলোকে আমিই পোষণ করে রক্ষা করি। আত্মজ্ঞানের জন্য শুক্রাচার্য ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখছেন, ব্রহ্মই হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ। জগতে যা কিছু হয়, যে শক্তিতে হয় সেই শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি। শক্তি আর শক্তিমান এক, সেইজন্য ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। একটা জিনিষকে জানা মানে তার সাথে পুরোপুরি এক হওয়া। শুক্রাচার্য ব্রহ্মজ্ঞানী তাই তিনি ব্রহ্মের সাথে এক, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ তাই শুক্রাচার্য আর শক্তিও অভেদ। সেইজন্য জগতে যা কিছু হচ্ছে সেটা যেন শুক্রাচার্যের ইচ্ছাতেই হচ্ছে।

মহাভারতের এই শ্লোকটি খুব গভীর এক তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করছে। আমার এই শক্তি একমাত্র ইন্দ্র জানেন, বৃষপর্বা জানেন আর রাজা যযাতি জানেন, সাধারণ লোকের পক্ষে এই জিনিষ জানা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। জগতের সব কিছুর নিয়ন্তা আমি, আমি কোন রাজা নই আমি ঈশ্বর। এই যে প্রকৃতির শক্তি, যার জন্য বৃষ্টি হচ্ছে, গাছপালা হচ্ছে, বাতাস চলছে এগুলো আমিই করি, আমার ইচ্ছাতেই হয় না, আমিই করি। তার মানে আমিই ইন্দ্র, আমিই বরুণ, আমিই সব কিছু। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হন তাঁর প্রথম অনুভূতি হয় তিনি দেখেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে, সচ্চিদানন্দের সঙ্গে তিনি এক হয়ে গেছেন। এই জিনিষটা কি রকম হয়, এখন আমার যদি মাথাটা খারাপ হয়ে যায় আর আমি ভাবতে শুরু করলাম আমি এই হাতটুকুই বা আমি এই আঙ্গুলটুকুই, আমি যে সারা শরীর জুড়ে আছে সেটাকে কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এরপর ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, ডাক্তারবাবুর ওষুধ খেয়ে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম, এবার আমি আস্তে আস্তে দেখতে শুরু করলাম যে পুরো শরীরটাই আমার, এই শরীরের যা কিছু সবই আমার, আমার ইচ্ছাতেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, শরীরের ছোট্ট লোমকূপটাও আমার ইচ্ছাতেই কাজ করছে। ব্রহ্মজ্ঞানীদের ঠিক এই জিনিষটাই হয়। একটা গল্প আছে যাতে একটা লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে নিজেকে ইঁদুর ভাবতে শুরু করেছে, আর বেড়াল দেখলেই ভয়ে পালায়। তাকে মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তার তাকে ওষুধ দিয়ে ভালো করে দিয়েছে। এবার তাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি? আমি মানুষ। এবার বন্ধুর সাথে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়েই দেখে একটা বেড়াল, সঙ্গে সঙ্গে একটা আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে গেছে। বন্ধু বলছে, আরে তোমাকে ডাক্তারের এত ফিস্ দিয়ে, দামী ওষুধ খাইয়ে সারিয়ে আনা হল, আর তুমি এখনও নিজেকে ইঁদুর ভাবছো! সে বলছে, আমি তো জানি আমি ইঁদুর নই, কিন্তু ঐ বেড়ালটি কি জানে যে আমি ইঁদুর নই? আমাদের ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা। আমাদের মাথাতেও ঢুকে গেছে আমরা ইঁদুর, আর মাঝে মাঝে যখন স্বামীজীর রচনাবলী পড়ে দেখছি স্বামীজী বলছেন তুমি ইঁদুর নও তুমি সিংহ, তখন আমরাও বলছি, আমিতো জানি আমি সিংহ কিন্তু জগৎ কি জানে আমি সিংহ? গুরুদেব তো মন্ত্রদীক্ষার সময় আমাদের বলে দিলেন – কোন একটা ভাবকে অবলম্বন কর, সেই দাস ভাবই হোক বা সন্তান ভাবই হোক, তুমি দেখবে তোমার গুরুর সাথে তুমি এক, তোমার গুরু তোমার ইষ্টের সাথে এক, তুমি আর তোমার ইষ্ট হয়ে গেলে এক। আবার অনেকে ভাবে ঈশ্বর আমার আত্মা। কিন্তু কার্যত আমরা কি ভাবি? আমি একটা ইঁদুর আর দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। শুক্রাচার্য এই ভাবনাটাকে ভেঙে চুড়মাড় করে দিচ্ছেন। ঠিক একই ঘটনা আমরা পাই বাল্মীকি রামায়ণে হনুমানের কাহিনীতে, যখন হনুমানকে মনে করিয়ে দেওয়া হল তুমি কে। যখন হনুমানের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল তখনই তাঁর মধ্যে শক্তি জাগ্রত হয়ে গেল। সাধারণ লোক তো জানতে পারছে না, জানিয়ে দেওয়া হলেও সে বুঝতে পারছে না, সে নিজেকে ইঁদুর বলেই ভাবতে থাকে।

শুক্রাচার্য নিজের মেয়ে যে কিনা অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে আছে, তাকে বোঝাচ্ছেন। শুক্রাচার্য তো ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানীর তো রাগ-দ্বেষ থাকতে পারেনা, একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী আরেকদিকে একটা বাচ্চা মেয়ে কি বলল আর তিনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে কিছু করতে যাবেন, তাতো হতে পারেনা, তিনি বোঝাচ্ছেন। আমি ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার জন্য আমার মধ্যে রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ এসব কিছু নেই। শুক্রাচার্য যা বলছেন, এটাই আত্মজ্ঞানের ফল। ঈশাবাস্যোপনিষদে আত্মজ্ঞানের ফলের কথা বলতে গিয়ে ঋষি বলছেন যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন *তত্র কো মোহঃ কঃ*

শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। যাঁর একত্ব বোধ হয়ে গেছে সে তখন কাকে নিয়ে মোহ করবে আর কাকে নিয়েই বা শোক করবে। আমার দাঁতের মাঝখানে যদি জিভের কামড় পড়ে রক্ত বেরোয় তখন হাতুড়ি দিয়ে কি আমি দাঁতটাকে ভাঙতে যাব? কখনই তা করতে যাবো না, জিভে না হয় একটু ওষুধ লাগিয়ে দেব। কারণ দাঁতটাও আমার জিভটাও আমার। ঠিক তেমনি পুরো জগৎ সংসারের সাথে যখন একত্ব বোধ হয়ে যায় তখন সে কাকে অপছন্দ করবে, কাকে ঘৃণা করবে, কার উপরই বা রাগ করবে, সেতো জানে আমিই সব। এটাই শুক্রাচার্য এখানে বলছেন, অধর্ম যা কিছু আছে, নিজেকে ছোট মনে করা, কুটিল স্বভাব, মুর্খ আচরণ এগুলো আমার মধ্যে নেই। মা, তুমি মনে রেখো, অপরের ব্যবহারে মানুষ যখন রেগে যায় আর ঐ ক্রোধকে যখন সংযম করে নেয় তখনই সে ঠিক ঠিক জ্ঞানী পুরুষ আর ঠিক ঠিক শক্তিমান পুরুষ রূপে গণ্য হয়। শুক্রাচার্য এখানে উপমা দিচ্ছেন – *যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগ্রিহ্লাতি হয়ং যথা। স যন্ত্যত্যুচ্যতে সদ্ভির্ন যো রশ্মিষু লম্বতে।।*১/৭৯/২। স্বামীজীও এই উপমা বক্তৃতাতে দিচ্ছেন, হয়ম্, মানে ঘোড়া, প্রচণ্ড শক্তিমান ঘোড়া টগবগ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটছে, যেদিক দিয়েই যাচ্ছে সেদিকের সবাই অবাক হয়ে দেখছে ঘোড়ার কি তেজ কি বেগ! কিন্তু ঐ ঘোড়ার পিঠে একজন বসে আছে, সে ঘোড়ার লাগামকে এমন ভাবে টেনে ধরছে ঐ তেজী বেগবান ঘোড়া মুহুর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে শক্তি কার বেশী, ঘোড়ার না তার উপর যে সওয়ার বসে আছে তার? শুক্রাচার্য বলছেন, জানো মা, ক্রোধ হচ্ছে শক্তিরই প্রতীক, আর ঐ ক্রোধকে যদি আটকে দিতে পারো তাহলে তোমার শক্তি আরও বেশী হয়ে গেল, তুমি এই শক্তিটা আগে অর্জন কর। স্বামীজী বেশীর ভাগ সময় ভারতবাসীদের ঘোর তমোগুণী বলে নিন্দা করেছেন, এদের ক্রোধ করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে। তাই বলে কি স্বামীজী ক্রোধ করতে বলছেন। একেবারেই না, স্বামীজী বলছেন আগে ঐ ক্রোধ করার শক্তিকে অর্জন কর, তারপর ঐ ক্রোধকে আটকাও, তবেই গিয়ে তুমি শক্তিমান হবে। শুক্রাচার্যও বলছেন, আমার ক্রোধ করার প্রচণ্ড ক্ষমতাও আছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমিই চালাচ্ছি, আমি যদি কারুর উপর ক্রোধ করি তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু ঐ ক্রোধকে বশে আনার ক্ষমতা আমার আছে। যার মনে যখনই কোন রাগ উঠল আর তৎক্ষণাৎ সেই রাগটাকে যদি সে মন থেকে বার করে দিতে পারে, তাহলে বুঝে নাও সে সমস্ত জগতকে জয় করে নিয়েছে। তার মানে তার মনের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ এসে গেছে। সাপ যেমন নিজের খোলসকে ছেড়ে দেয় ঠিক তেমনি তুমি তোমার ক্রোধটা খোলসের মত ফেলে দাও, ক্রোধকে বেশীক্ষণ মনের মধ্যে পুষে রেখো না। দুজন লোক, একজন একশ বছর ধরে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন যজ্ঞ করে যাচ্ছে, তার একটা পূণ্য আছে। আরেকজন লোক, সে ক্ষমতা থাকলেও ক্রোধ করেনা। এই দুজনের মধ্যে যে ক্রোধকে সংযত করেছে সেই বেশী শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যে যতই ধার্মিক হোক না কেন, যার ভেতরে ক্ষমতা থাকতেও রাগ করে না, ক্রোধ করে না তার পূণ্য বেশী এবং ক্ষমতাও বেশী।

ক্রোধী পুরুষের দান, তপস্যা, যজ্ঞ সব নিষ্ফল হয়ে যায়। যার ভেতরে ক্রোধ, রাগ এই রিপু গুলো থাকে তাদের দ্বারা যজ্ঞ, তপস্যা এগুলো করা সম্ভবই নয়, আর এরা কর্ম রহস্যই বুঝতে পারেনা। তুমি এটা মনে রেখো মা, যে স্বভাবে ক্রোধী ও রাগী কিছু দিন পরেই তার সন্তান, তার চাকর-বাকর, তার সুহৃৎ, তার বন্ধু, তার স্ত্রী/স্বামী, তার ধর্ম আর শেষে তার সত্য, সবাই তাকে ছেড়ে চলে যায়। এটাই গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলবেন – *ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ*, যে মানুষ ক্রোধকে সংযম করতে পারেনা, আজ হোক কাল হোক তার বিনাশ হয়ে যাবে। মহাভারত পুরানধর্মী বলে আরো বিস্তার করে বলা হচ্ছে। ছোট বাচ্চারা অবোধ হয়, অকারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে, তাদের ঝগড়ার কারণকে কেন্দ্র করে বড়দেরকে ঐ ধরণের আচরণ করতে নেই। আমিও তাই তোমার কথা মত বৃষপর্বাকে কিছু বলতে পারবো না।

এত কথা বলার পরও দেবযানী কিন্তু ছাড়ছে না। দেবযানী বলছে *বেদাহং তাত বালাপি ধর্মাণাং যদিহান্তরম্। অক্রোধে চাতিবাদে চ বেদ চাপি বলাবলম্।।*১/৭৯/৮। বাবা, আমার বয়স কম হতে পারে কিন্তু ধর্ম অধর্মের কি পার্থক্য আমি ভালো মতই জানি, আর ক্ষমা, শক্তি, দুর্বলতার সম্বন্ধে আমার ভালোই জ্ঞান আছে। শর্মিষ্ঠা যে শিষ্যার মত আচরণ করেনি এটাকে ক্ষমা করা যায় না। আপনি মনে রাখবেন সাধুদের সঙ্গ করলে মানুষ সাধু হয় আর পাপীদের সঙ্গ করলে পাপী হয়। শর্মিষ্ঠা আর তার বাবাকে যদি ক্ষমা করে দেওয়া হয় তাহলে আমরাও নষ্ট হয়ে যাব, কারণ আমরা পাপকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি বলে আমরাও পাপী হয়ে যাব। যারা আমাদের থেকে নিকৃষ্ট বা নীচ প্রকৃতির তাদের সাথে বেশী সঙ্গ করলে মানুষ ধীরে ধীরে অপমানিত হতে থাকে। দেবযানীর কথা মত দেখা যায় যেখানে বিয়ে থা সমানে সমানে না হয়ে থাকে তাহলে ছোটটা কিছু দিন পর থেকে বড়টাকে অপমান করতে শুরু করে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে কোন ছেলের যদি নীচু শ্রেণীর পরিবারের কোন মেয়ের সাথে বিয়ে হওয়ার পর খুব খাতির হয়, কদিন নীচু পরিবারের মেয়েটিকে ছেলেটি অপমান

করবে না, অপমান করবে নিচু পরিবারের মেয়েটি, এইটাই পরিহাস। মহাভারত দেবযানীর মুখ দিয়ে তার বাবাকে তাই বলছে। নীচ প্রকৃতির লোকের সঙ্গ করলে কয়েক দিন পরেই অপমানিত হতে থাকবে। আর তার মুখ থেকে খালি কটূ কথা বেরোবে। উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ কখনই কটূ কথা বলতে পারেনা। কিন্তু নীচ প্রকৃতির লোকের সঙ্গ করতে করতে যখন কটূ কথাগুলো শুনতে থাকে তখন সে মনে প্রাণে মর্মাহত হতে থাকে আর শস্ত্র, বিষ ও অগ্নি এই তিনটে থেকে যদি আঘাত আসে তার কষ্টটা বুঝতে একটু সময় লাগে কিন্তু কটূ কথা যেটা সেটা যখন শুনতে হয় তখন তার বেদনার ফলটা সঙ্গে সঙ্গে পেতে শুরু করে। যদি কোন জঙ্গলকে কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া যায় তাহলে কিছু দিন পর আবার জঙ্গল হয়ে যেতে পারে কিন্তু কটূ কথা শুনে হৃদয়ে যার ঘা হয়েছে সেটা কোন দিন মিটবে না। বাবা, আপনি যা বলেছেন আমি সব মানছি এবং এগুলো আমিও বুঝি কিন্তু শিষ্যা হয়ে শর্মিষ্ঠা আমাকে কটূ কথা বলে অপমান করে যে ঘা দিয়েছে এটা কোন দিন মিটবে না।

বাবা অনেক করে মেয়েকে বোঝাচ্ছে, দেবযানীও কিছুতেই মানতে চাইছে না। সে জেদ ধরে নিয়েছে, এখান থেকে আমি আর নড়ছি না, যে রাজ্যে শর্মিষ্ঠার বাবা রাজত্ব করছে আমি আর সেই রাজ্যে ঢুকবো না। এই সব বলে সে কুয়োর পাড়েই বসে আছে। শুক্রাচার্য আর কি করেন, মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন। তিনি নিরুপায় হয়ে রাজার কাছে গিয়ে সব বলে বলছেন – আমার আর কোন উপায় নেই আমি এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি কারণ তোমার রাজ্যে আমার মেয়ে আর ঢুকবে না। শুক্রাচার্যের কথা শুনে বৃষপর্বার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে, আপনি আমাকে ছেড়ে গেলে আমি শেষ, আপনি বলুন আমি দেবযানীর জন্য কি করতে পারি, আপনি যা বলবেন আমি সব করে দেব। দেবযানী তখন বলছে, শর্মিষ্ঠা তার একশটি সখীকে নিয়ে সারা জীবন আমার দাসী হয়ে যদি থাকে তাহলে আমি এই রাজ্য ছেড়ে যাবো না। এই সব কথা হয়ে যাওয়ার পর বৃষপর্বা একটা খুব নামকরা কথা বলছেন। আমাদের মহাভারতের দুটো সংস্করণ আছে, একটা উত্তর ভারতের আরেকটা দক্ষিণ ভারতের। এখন উত্তর ভারতের যে সংস্করণ সেখানে দক্ষিণ ভারতের শ্লোকগুলো বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া থাকে। বৃষপর্বা যে শ্লোকটি বলছে এটি দক্ষিণ ভারতের সংস্করণ থেকে আসছে। দক্ষিণ ভারতের মহাভারতে প্রায় ছয় হাজার শ্লোক বেশী দেওয়া আছে। মূল মহাভারতের কিছু জায়গায় দুটো শ্লোকের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যায়, দক্ষিণ ভারতের মহাভারত কিছু শ্লোক দিয়ে এই ফাঁকটাকে পুরণ করে দেয়। এই শ্লোকটি মনুস্মৃতিতেও দেওয়া আছে। এখন বলা মুশকিল মহাভারত থেকে সরাসরি কেউ এই শ্লোকটিকে মনুস্মৃতিতে নিয়েছেন নাকি মনুস্মৃতিকে আধার করে পরে কেউ এক শ্লোকটিকে মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই শ্লোকটি খুব বিখ্যাত একটি শ্লোক – (*ত্যাজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যাজেৎ। গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবী ত্যাজেৎ।।*) নিজের বংশের বা কুলের মঙ্গলের জন্য দরকার পড়লে একজনকে ত্যাজ্য করে দাও আর গ্রামের মঙ্গলের জন্য যদি একটা পরিবারকে গ্রাম থেকে বার করে দিতে হয় তাহলে সেই পরিবারকে বার করে দাও। যদি পুরো একটা এলাকা একটা গ্রামের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে ঐ গ্রামটাকে তুলে ফেলে দাও আর আত্মকল্যাণের জন্য পুরো বিশ্বকে ছেড়ে দাও।

ধরুন আমি একজন রাজা, আমার রাজপরিবার এখন এক ছেলে বা মেয়ের জন্য সঙ্কটে পড়েছে। এখানে রাজপরিবারের মঙ্গলের স্বার্থে কি করতে বলা হচ্ছে? ঐ ছেলে বা মেয়েটিকে বার করে দাও। আমি যদি গ্রামের মুখিয়া হয়ে থাকি, বুঝতে পারছি একটা পরিবারের জন্য পুরো গ্রামের পরিবেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তখন আমার কাজ হবে গ্রামের পরিবেশ রক্ষার জন্য ঐ পরিবারটিকে গ্রাম থেকে বার করে দেওয়া। আবার আমি যদি রাজা হয়ে থাকি, দেখছি একটা গ্রামের বা এলাকার জন্য আমার পুরো রাজ্যের বদনাম হচ্ছে, রাজা হিসাবে আমার কাজ হবে ঐ গ্রামটাকে শেষ করে দেওয়া। অর্থাৎ বৃহৎ কল্যাণের জন্য ছোটটাকে ফেলে দিতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আত্মকল্যাণের জন্য যদি নিজেকে বাঁচাতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ জগতকে ত্যাগ করে দাও, এখানে সদস্য, পরিবার বা গ্রাম অতি সাধারণ। তখন বৃষপর্বা শর্মিষ্ঠাকে বলছেন 'মা! আমার কিছু করার নেই, আমাকে আমার সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে হবে, তোমাকে আমায় ত্যাগ করতেই হবে'। এই হচ্ছে আমাদের ভারতের ধর্মের আদর্শ। শর্মিষ্ঠাও বৃষপর্বার একমাত্র আদরের মেয়ে, ধর্মের জন্য সে তার মেয়েকেও ত্যাগ করে দিল। লড়াইটা কার মধ্যে লেগেছে? শুক্রাচার্য আর বৃষপর্বা। শুক্রাচার্য নিজের মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, বৃষপর্বাও নিজের মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। শুক্রাচার্য বলছেন, আমি কি করব, আমার মেয়ে যদি না এই রাজ্যে থাকে তাহলে আমাকেও এই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন বলে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের কত নিন্দা করি, বৃষপর্বা এখানে ঠিক তাই করছে। নিজের মেয়েকে দেবযানীর দাসী করে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। বৃষপর্বা অসুরদের রাজা, কিন্তু সেও বলছে মেয়ের প্রতি ভালোবাসার জন্য আমি আমার সাম্রাজ্যের অকল্যাণকে ডেকে আনতে পারিনা, সাম্রাজ্যের

কল্যাণের জন্য আমি আমার প্রিয় মেয়েকেও ত্যাগ করে দিতে রাজি। তাই করল, চিরদিনের জন্য তিনি মেয়েকে ত্যাগ করে দিলেন। শর্মিষ্ঠা তখন বলছে ‘বাবা! আমাদের বংশের মঙ্গলের জন্য, অসুরদের রক্ষার জন্য আমি এক্ষুণি দাসী হয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি’। শর্মিষ্ঠা চিরদিনের মত দেবযানীর দাসী হয়ে গেল। প্রথমেই নিয়ম করে দেওয়া হল দেবযানীর যে স্বামী হবে, তার সঙ্গে কোন রকমের সম্পর্ক থাকা চলবে না। তুমি দাসী দাসীর মত থাকবে দেবযানীর বরকে কোন ভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে পারবে না।

এরপর শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলছে – আজ থেকে আমি তোমার দাসী হয়ে এসেছি। দেবযানী কিন্তু এখনও শান্ত হতে পারছে না। ব্যঙ্গ করে বলছে ‘আহা রে, আমি হলাম কাঙালীর মেয়ে, আমি তো যে দান নেয় তার মেয়ে, আমি তো মোসায়েবের মেয়ে, আমি হলাম ভিক্ষুকের মেয়ে তুমি কি করে আমার দাসী হয়ে থাকবে’। শর্মিষ্ঠা খুব মিষ্টি করে বলছে ‘আমার জাতির লোকেরা মহা বিপদে পড়ে গেছে, শুক্রাচার্য যদি আমাদের ছেড়ে দেন পরের দিনই আমাদের সব কিছুর বিনাশ হয়ে যাবে, আমি সেইজন্য নিজের জাতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছি, তুমি যেমনটি আমাকে রাখবে, যেমনটি আমাকে নির্দেশ করবে আমি সেইভাবেই চলব’। এত কিছু হওয়ার পর দেবযানী তার বাবাকে বলছে ‘বাবা গো, এত দিনে আমি বুঝলাম সত্যিই তোমার কি ক্ষমতা’!

এরপর সংক্ষেপে কাহিনী হল, দেবযানীর হাত ধরে কুয়ো থেকে উঠিয়ে আনার পর দেবযানি এবার যযাতিকে ধরেছে, তুমি আমার হাত ধরেছ, আমাকে বিয়ে করতে হবে। যযাতি এখন ফেঁসে গেছে, এদিকে শুক্রাচার্যের থেকেও ভয় আছে, যদি কিছু অভিশাপ দিয়ে দেয়। ভয়ে এখন যযাতির সাথে দেবযানীর বিয়ে হয়ে গেছে। শুক্রাচার্য যযাতিকে বলে দিয়েছে ‘তুমি আর যাই কর বাবা, শর্মিষ্ঠার সঙ্গ তুমি কিন্তু কখনই করতে যাবে না, তুমি যেন কখন শর্মিষ্ঠার ধারে কাছে না যাও’। শর্মিষ্ঠা ছিল ক্ষত্রিয় কুলের, তার রূপের মধ্যে তেজের প্রভাব অনেক বেশী, যযাতিও ক্ষত্রিয়। অন্য দিকে দেবযানী হল ব্রাহ্মণ কন্যা সেও রূপসী কিন্তু সেই তেজ নেই। শর্মিষ্ঠা দেখছে যযাতি কি বিশাল রাজা, তাকে দেখতে কত সুন্দর, কি প্রতাপ ও ক্ষত্রিয় বল, দেবযানীর পক্ষে যযাতি একেবারেই অনুপযুক্ত। একদিন নিরলায় নির্জনে শর্মিষ্ঠা যযাতিকে কাছে পেয়ে বলছে ‘আমিই আপনার উপযুক্ত নারী, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন আর আমারই সাথে থাকুন’। যযাতি শুনেই বলছে ‘ওরে বাবা, তা কি করে হবে, শুক্রাচার্য আমাকে বলে দিয়েছেন তুমি কখনই শর্মিষ্ঠার সঙ্গ করতে যাবে না’। তখন শর্মিষ্ঠা যে কথা গুলো বলছে এগুলো আমাদের শাস্ত্রের খুব নামকরা কথা। এই কথাগুলো মহাভারতে অনেকবারই আসবে আর মনুস্মৃতিতেও এই নিয়ে আলোচনা আছে।

শর্মিষ্ঠা বলছে *ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্ত ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে। প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যহুরপাতকানি।*।১/৮২/১৬। কয়েকটা অবস্থায় মিথ্যে কথাকে মিথ্যে ধরা হয় না। প্রথম হচ্ছে পরিহাস যুক্ত বচন, হাসি ঠাট্টা করার সময় যে মিথ্যে কথা বলা হয় সেটাকে মিথ্যে কথার মধ্যে গণ্য করা হয় না। দ্বিতীয় নিজের স্ত্রীর প্রতি মনোরঞ্জনে যে মিথ্যে কথা বলা হয় সেটাও মিথ্যে কথা হয় না। যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তোমার মত সুন্দরী কেউ নেই, অথচ স্ত্রীর রূপ কিছুই নয়, এটাও মিথ্যে নয়। আমি তোমাকেই ভালোবাসি, এটাও মিথ্যে না। উল্টোটাও স্ত্রী স্বামীকে তার মনোরঞ্জনের জন্য যা বলবে সেটা মিথ্যে না। তৃতীয়, বিবাহের সময় মিথ্যে কথাকে মিথ্যে বলা হয় না। মেয়ের বাবা যদি পাত্রপক্ষকে বলে আমার মেয়ের মত মেয়ে খুঁজে পাবেন না, বিয়ের পর দেখা গেল মেয়েটি অন্য রকমের। কিন্তু বিবাহের সময় যা মিথ্যা কথা বলা হোক না কেন সেটাকে মিথ্যে কথার মধ্যে ধরা হয় না। চতুর্থ নিজের বা অপরের প্রাণ সংশয়ে মিথ্যে কথাকে মিথ্যে বলা যায় না। আর পঞ্চম, নিজের বা অপরের সর্বস্ব অপহরণ কালে মিথ্যা কথাতে কখনই পাপ হয় না। এই কটি অবস্থাতে যে মিথ্যে কথা বলা হয় তাকে মিথ্যে কথা বলা হয় না। মহাভারতে ধর্মের ব্যাপারে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু এগুলো যার যার কাছে ব্যক্তিগত, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু পরিহাস ছলেও মিথ্যা কথা বলছেন না। ঠাকুর শ্রীমায়ের কাছেও কখন মিথ্যে কথা বলছেন না। সেইজন্য ধর্মের ঠিক ঠিক সংজ্ঞা নিরুপন করা খুব কঠিন। শর্মিষ্ঠা ধর্মের এই এই শর্তে সংজ্ঞা নিরুপণ করছে। কোন নির্দোষ লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যদি আপনাকে মিথ্যে কথা বলতে হয় তাতে কোন পাপ হয় না। কিন্তু দুজন, আমার আর অন্য কারুর একই সাথে প্রাণ সংশয় হয়ে গেছে আর আমি শুধু নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যে কথা বললাম অন্যের প্রাণ রক্ষা করলাম না, তখন কিন্তু সেই মিথ্যা কথা বলাতে পাপ হবে। বাঁচাতে যদি হয় তাহলে দুজনকেই বাঁচাতে হবে। এরপরেও শর্মিষ্ঠা অনেক যুক্তি দিয়ে যযাতিকে বশে আনতে চাইছে, শর্মিষ্ঠা রাজার মেয়ে কিনা। বিয়ে হলে স্ত্রীর যা ধন সম্পদ হয় সেটাতে স্বামীর অধিকার থাকে, স্ত্রীর যে সন্তান হয়

সেখানেও স্বামীর অধিকার থাকে, আমি দেবযানীর দাসী তাই আমিও আপনার, আমাকেও ভোগ করার অধিকার আপনার আছে। এই ভাবে নানা যুক্তি দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত শর্মিষ্ঠা যযাতিকে বশে নিয়ে এসেছে। এরপর শর্মিষ্ঠা থেকে যযাতির তিনটি সন্তান হয়েছে। দেবযানী থেকে আগেই যযাতির দুটি সন্তান হয়েছিল।

একদিন যযাতির সাথে দেবযানী উদ্যানের দিকে বেড়াতে গিয়ে তিনটি ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখে দেবযানী অবাক হয়ে ভাবছে এত সুন্দর বাচ্চাগুলো কার। বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করেছে, তোমাদের বাবা কে? ওরা যযাতির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে। ঐ দেখে দেবযানীর মাথা গেছে ঘুরে, কি করে এত কাণ্ড হল! চুপিচুপি এত কিছু হয়ে গেছে! দেবযানীকে আর কে সামলাবে! সোজা আবার বাবার কাছে গিয়ে হাজির। যযাতিও অনেক করে বোঝাতে বোঝাতে দেবাযানীর পেছন পেছন গিয়ে শুক্রাচার্যের কাছে হাজির হয়ে গেছে। শুক্রাচার্যও শুনে খুব রেগে গেছেন 'তোমাকে নিষেধ করেছিলাম শর্মিষ্ঠার সাথে কখন সঙ্গ করবে না, এক্ষুণি তোমাকে দুর্জয় জরা আক্রমণ করুক'। তখন যযাতি খুব কায়দা করে বলছে, আমিতো আপনার মেয়েকে যতটা সুখ দেব বলে ভেবেছিলাম সেটা এখনো পূর্ণ হয়নি, এখন আপনি কোন উপায় আমাকে বলে দিন যাতে আমি আমার যৌবন ফিরে আপনার মেয়েকে সুখী করতে পারি। তখন শুক্রাচার্য বললেন তোমার সন্তানদের মধ্যে যদি কেউ তোমার জরাকে নিয়ে নেয় তাহলে সেই সন্তানের যৌবন তোমার মধ্যে চলে আসবে। দেবযানী থেকে যে দুই পুত্র হয়েছিল তাদের নাম যদু আর তুর্ব্বসু আর শর্মিষ্ঠা থেকে তিন পুত্রের নাম দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। পর পর সবাইর কাছে গিয়ে যযাতি অনুরোধ করেছে যৌবন দিতে, কেউ রাজী হচ্ছে না, সবাই বলছে আপনি এমন কামী আমাদের যৌবন নিয়ে আপনি কামভোগ করতে চাইছেন। শেষে পুরু কিন্তু রাজী হয়ে গেল। পরে যযাতি দেখছেন কামের ভোগে কখনই কামের শান্তি হয় না, *ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্ধতে।।* আগুনে ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় কামকেও যত প্রশ্রয় দেবে ততই কাম বৃদ্ধি পায়। এই বোধ হওয়ার পর যযাতি গিয়ে পুরুকে বললেন, অনেক হয়েছে এই নাও তোমার যৌবন, আমি তপস্যায় চললাম। পুরুকে সাম্রাজ্য দিয়ে যযাতি এখন যোগী হয়ে তপস্যায় চলে গেল।

যদু থেকে হয়েছে যাদব বংশ, এই যাদবরা ক্ষত্রিয়, গোয়ালা যাদব থেকে আরেকটু উঁচু শ্রেনীর। শ্রীকৃষ্ণকে অনেকেই গোয়ালা মনে করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আদপেই গোয়ালা ছিলেন না। তুর্ব্বসুর সন্তানদের বলা হত যবন, দ্রুহ্যু থেকে জন্ম হল ভোজদের, অনু যে সন্তান ছিল তার থেকে ম্লেচ্ছরা জন্ম নিল। আর পুরু থেকে এলো পৌরব বংশ। এগুলোকে আমরা কতটা আক্ষরিক নেব? একেবারেই না। আমরা এর আগেও আলোচনা করেছিলাম, মহাভারতের সময়ে ভারতে বিভিন্ন জাতিরা বাইরে থেকে আসতে শুরু করেছে, ভারতের সীমানাও বাড়ছে। ব্যাসদেব সব জাতিদের নিয়ে একটা সংগঠিত রূপ দিয়ে দিলেন। এখন কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা কার সন্তান, তোমরা হচ্ছ যযাতির নাতি। মানে ভারতের যত জাতি আছে বিশেষ করে যুদ্ধই যাদের পেশা তাদের সবাইকে যযাতির নাতি-পোতা বানিয়ে দেওয়া হল।

মহাভারতে যযাতির কাহিনীকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হল এর পরে পরেই শ্রীকৃষ্ণ, কৌরব, পাণ্ডবদের কাহিনী আসবে। এনাদের পূর্বপুরুষরা কেমন ছিলেন তাঁদের কি ঐতিহ্য ছিল তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই যযাতির কাহিনীকে নিয়ে আসা হয়েছে। মহাভারত হল ইতিহাস মূলক শাস্ত্র, কিন্তু আমাদের মূল গ্রন্থ হল বেদ। বেদের চারটি স্তম্ভ যার উপর ধর্ম দাঁড়িয়ে থাকে, একটা হল ইতিহাস-পুরান, দ্বিতীয় হল উপনিষদ যেখান থেকে দর্শন আসছে, তন্ত্র বলে দিচ্ছে তুমি পূজা অর্চনা কিভাবে করবে, আর স্মৃতি, স্মৃতিতে আমার ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার আচরণ কেমন হবে। ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই চারটের যে কোন একটা কিংবা দুটোকে ধরে সেই শাস্ত্র অনুসারে আচরণ করে চারটি পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এর মধ্যে যেটিকে তুমি চাইছ সেটিকে তুমি পেয়ে যাবে। এর মধ্যে একমাত্র উপনিষদই ধর্ম, অর্থ আর কামের কথা বলবে না, উপনিষদের একটাই উদ্দেশ্য মোক্ষ প্রাপ্তি। কথামৃতও তাই, মোক্ষ ছাড়া কোন কথাই বলবে না। ইতিহাস-পুরানের মধ্যে মূল গ্রন্থ হল বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, আঠারোটি পুরান আর আঠারোটি উপ-পুরান। এর মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণকে অনেকে ইতিহাস-পুরান বলে মানতে চান না কিন্তু আমাদের কাছে এটিও ইতিহাস। এই আটত্রিশটি শাস্ত্র পৌরানিক কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দেয়। যদিও বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতিহাস মূলক শাস্ত্র বলা হয় কিন্তু ঠিক ঠিক ইতিহাস বলতে বোঝায় মহাভারতকেই। বাল্মীকি রামায়ণে মোক্ষ নিয়ে কোন আলোচনা নেই, কিন্তু ধর্ম, অর্থ ও কাম নিয়ে আলোচনা আছে। এই দৃষ্টিতে মহাভারত হল পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র।

ইতিহাস মূলক শাস্ত্রে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তার সাথে দরকার হলে কিছু কাহিনীকে নিয়ে আসা হয়েছে, কিছু জিনিষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আবার কিছু জিনিষকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কাহিনীগুলি থেকে আমার কি সাহায্য হবে, আমার কি কাজে লাগবে, সেটাকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে, এটা জেনে আমার কি লাভ? যদি বলা হয় এই কাহিনী তোমাকে একটু আনন্দ দেবে, যেমন বটতলার উপন্যাসগুলো দেয়। আবার অনেকের এই ধরণের পৌরানিক কাহিনীতে কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু কোন মানুষ কখনই পাওয়া যাবে না, যার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের চারটের কোনটাই দরকার নেই। সেই ধরণেরও কিছু আছে যারা অত্যন্ত নিম্ন প্রকৃতির তারা বলে ধর্মের মাধ্যমে অর্থ আর কামের দরকার নেই আমরা লুটেপুটে খাব। ইতিহাস পুরানে তাও দেখাবে, এরা লুটেপুটে খেয়েছিল আর পরে তাদের কি পরণতি হল তারও বর্ণনা আছে। মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের চরিত্র কিভাবে আচরণ করেন, যেমন ব্যাসদেব দুই সখী, শর্মিষ্ঠা আর দেবযানীর কাহিনীর মাধ্যমে দেখালেন মানুষের চরিত্র কি রকম হয়।

যথার্থবাদ এবং আদর্শবাদ সাহিত্য

সাহিত্য দুই প্রকার, যথার্থবাদ আর আদর্শবাদ। যথার্থবাদে যে রকমটি সাহিত্যিক দেখছেন সেটাকেই ঝাড়পোছ করে একটু মাল-মশলা মিশিয়ে ভাষার ব্যঞ্জনা আর উপস্থাপনার কুশলতার দ্বারা সুন্দর করে আমাদের সামনে রেখে দিলেন। আধুনিক যুগে বেশীর ভাগ সাহিত্যই যথার্থবাদকে অনুসরণ করে তৈরী হচ্ছে। যাঁরা আদর্শবাদকে অনুসরণ করে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন তারা নিজের মনের গভীরে বিচরণ করে বোঝার চেষ্টা করেন একটা মানুষ যাই করুক না কেন সেটা সে কিসের প্রেরণাতে করছে। দুর্যোধন যে এই ধরণের আচরণ করেছিল, সে কেন করেছিল? তখন তারা বুঝে নিলেন মানুষের মনে কোথাও যখন আমি বড় হব এই ভাবটা বেশী মাত্রায় থাকে তখনই তার বহিঃপ্রকাশ এই রকমই হয়। বেশীর ভাগ সময় আমরা একে হিংসা, লোভের অভিব্যাক্তি বলে মনে করি। সব সময় যে হিংসা বা লোভ থেকে এই আচরণের প্রকাশ হবে তা নয়। সবাই চাইছে আমি বড় হব, আমার খুব প্রশংসা হোক, নাম-যশ হোক। এই চাওয়াটা কোন অন্যায় নয় আর খারাপও নয়। দুর্যোধনও চাইছে। কিন্তু এ চাওয়াটাই যখন একটা সীমাকে অতিক্রম করে যায় তখন তার কি পরিণাম হতে পারে, সেটাকেই যখন কোন সাহিত্যিক বা কবি মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে সুন্দর করে সাহিত্যিক প্রতিভা দিয়ে সাজিয়ে কিছু রচনা করে দিচ্ছেন তখনই সেই সাহিত্য আদর্শবাদ রচনা বলে স্বীকৃত হয়। মহাভারতের কাহিনীগুলি পড়লে মনে হয় এগুলো যথার্থবাদ রচনা, সমাজে যা কিছু হচ্ছে সেটাকে তুলে এনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, কিন্তু আদপেই তা নয়। এটাই মহাভারতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যেটা সুপ্তাকারে আছে ব্যাসদেব সেটাকে তুলে এনে ঝাড়াই পোছাই করার পর তার উপর একটা নতুন আবরণ দিয়ে মহাভারতের মধ্যে স্থাপন করে দিলেন। এই ধরণের রচনাই কালজয়ী হয়ে জাতি ও ধর্মকে পরিপুষ্ট করে। শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী যে সত্যি এই রকমই ছিল আমাদের জানা নেই। মহাভারতের অন্য কাহিনীতেও এই ধরণের চরিত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্য থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ ব্যাসদেব এখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য দিচ্ছেন না, তিনি বিচারকের সামনে কোন চরিত্রকে বিশ্লেষণ করছেন না। মানুষের স্বভাব কত বিচিত্র হতে পারে শর্মিষ্ঠা আর দেবযানীর কাহিনীর মাধ্যমে ব্যাসদেব দেখিয়ে দিলেন। এটাই হল আদর্শবাদ, ভারতও আদর্শবাদ সাহিত্য রচনার দেশ। সেক্সপিয়রও আদর্শবাদ সাহিত্যিক ছিলেন। উনি যখন রোমিও-জুলিয়েত প্রেমকথা রচনা করছেন সেখানেও তিনি একটা ছেলে আর মেয়ের মধ্যে আদর্শ প্রেম কেমন হতে পারে, আদর্শ প্রেমের গভীরে গিয়ে সেটাকে আস্তে করে তুলে এনে তাঁর অমর সৃষ্টি রোমিও-জুলিয়েতের চরিত্রের মধ্যে স্থাপন করে সাজিয়ে দিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে মহাভারত হল পুরো আদর্শবাদ সাহিত্য, বাল্মীকি রামায়ণও তাই। যথার্থবাদ সাহিত্য নিজের কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সেই সাহিত্যও খবরের কাগজ হয়ে যায়।

তপস্যার পূণ্যে যযাতির স্বর্গলাভ

যযাতি রাজ্যের ভার পুরুর উপর অর্পণ করে চলে গেলেন তপস্যায়। বনে গিয়ে তিনি এমন ঘোর তপস্যা করতে থাকলেন যে, কিছু দিনের মধ্যে তিনি স্বর্গে স্থান পেয়ে গেলেন। আমরা কয়েকবার বলেছি যে, মহাভারত হল বেদ ও তার পরবর্তি কালের যোগসূত্র। বেদের উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞ-যাগের দ্বারা স্বর্গে নিয়ে যাওয়া। যযাতি কিন্তু কোন যজ্ঞ-যাগ করেননি, শুধু তপস্যার জোরে স্বর্গে চলে গেলেন। এখানে কিন্তু উল্লেখ করা হচ্ছে না, যযাতি সশরীরের স্বর্গে গিয়েছিলেন, না মৃত্যুর পর গিয়েছিলেন। এটা অবশ্য ঠিক যে, আগেকার দিনের সাহিত্যিকদের কাছে মরা বা বাঁচা এই দুটোর কোন গুরুত্বই ছিল না, এনারা বিশ্বাস করতেন কোন না কোন ভাবে তার ব্যক্তি সত্তার অস্তিত্ব স্থূল শরীর নাশের পরেও চলতেই থাকে। যযাতি যিনি স্বর্গে গেছেন তিনি সেই যযাতি যিনি রাজা ছিলেন। আমরা কি করে জানবো যে সেই একই লোক স্বর্গে বা নরকে

যাচ্ছে, এটা বোঝা বা জানার কোন পথ আমাদের কাছে নেই। হিন্দুদের কাছে এর একটাই উত্তর, এরা বলবে যযাতির সূক্ষ্ম শরীর স্বর্গে গেছে। স্থুল শরীর যেমন ঘন ঘন পাল্টায় সূক্ষ্ম শরীর কিন্তু অত পাল্টায় না। ঠিক ঠিক সুখ ভোগ, দুঃখ ভোগ সূক্ষ্ম শরীরেই হয়।

স্বর্গে যাওয়ার পর ইন্দ্র যযাতিকে খুব সম্মান করে অভ্যর্থনা করেছেন, কারণ যযাতি ছিলেন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। এর আগে শুক্রাচার্যও যযাতিকে ইন্দ্র ও বৃষপর্বার সাথে একাসনে স্থান দিয়েছিলেন, ইন্দ্র যেমন স্বর্গে দেবতাদের রাজা, যযাতিও তেমনি পৃথিবীর রাজা। এখানে ব্যাসদেব স্বর্গের কিছু দিব্য প্রাণির উল্লেখ করছেন, দেবগণ, সিদ্ধগণ, মরুৎগণ ও বসুগণ এই চার ধরণের দিব্য প্রাণির উল্লেখ করছেন। বেদে স্বর্গের আরও অনেক দিব্য প্রাণির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বর্গলোকে যাঁরা তপস্যা করেন তাঁদের সিদ্ধ বলা হয়, যদিও ঋষিদের মত কিন্তু ঋষিদের থেকে এঁদের স্থান উঁচুতে। গীতায় ভগবান বলছে, *সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ*, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

ইন্দ্র-যযাতির সংলাপ

এখানে ইন্দ্রের সাথে যযাতির কয়েকটি সংলাপ আছে। এই সংলাপে ইন্দ্র যযাতিকে জিজ্ঞেস করছেন 'আপনি যখন পুরুর উপর রাজ্যভার অর্পণ করলেন তখন আপনি পুত্র পুরুকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন আর আপনি নিজে একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, পৃথিবীতে কি কি কীর্তি স্থাপন করেছেন আমাকে একটু বিস্তারিত বলুন'। যযাতি তখন বলছেন 'আমি পুরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করে বলেছিলাম, মানুষের তিনটে জিনিষ কখনই করতে নেই। একটা হল দীনতা, নিজেকে ছোট করা, দ্বিতীয় হল শঠতা, আর তৃতীয় ক্রোধ। এই তিনটের সাথে মনের মধ্যে কুটিল ভাব, মাৎসর্য্য ভাব আর বৈরী ভাব এই তিনটেকে রাখবে না'। নারীদের মধ্যে দীনতা একটা প্রধান দোষ, একটু কিছু ঝগড়া-বিবাদ হলেই সঙ্গে সঙ্গে দীনতার ভাবকে আশ্রয় করে নেয়। স্বামীজীও বলছেন তোমার সিংহ শক্তিকে জাগ্রত কর। দীনতা হল যখন আমি কারুর কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকি বা মিথ্যে করেও অনেক সময় দেখাই আমি যেন কিছুই না, কিন্তু মনে মনে ভাবছে আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে দেখিয়ে দিতাম, এটাও দীনতা। শঠতা হচ্ছে মুর্খতা, আমি জানি এগুলো করতে নেই তাও করে যাচ্ছি। কুটিলতা হল মুখে এক রকম কিন্তু ভেতরে নানা রকমের প্যাঁচ, কাকে কিভাবে ফাঁসানো যায়, কাকে বশে আনা যায় ইত্যাদি।

যযাতি পুরুকে বলছেন 'মা, বাবা, পণ্ডিত বা বিদ্বান পুরুষ আর ক্ষমাশীল ব্যক্তি, যিনি সব কিছু ক্ষমা করে দেন, এই চারজনকে কখনই অপমান করবে না। ঠিক ঠিক শক্তিমান পুরুষই ক্ষমা করে। তুমি অন্যায় করার পর যদি দেখ কেউ তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছে, তাহলে বুঝে নাও তুমি কিন্তু এবার বিপদে পড়বে, এর শক্তি আছে বলেই তোমাকে ক্ষমা করছে। শক্তিহীন মানুষ সব সময় ক্রোধ করে বেড়ায়, শারীরিক ও মানসিক ভাবে দুর্বল ব্যক্তিরাই সব সময় রাগ দেখায় আর ক্রোধ করে। দুষ্ট লোক সব সময় সাধুপুরুষের আর দুর্বল লোক সব সময় শক্তিমান পুরুষদের হিংসে করে, কুরূপী সব সময় সুন্দর রূপকে দেখে হিংসে করবে, নির্ধন ধনীকে দেখে হিংসে করবে, অকর্মণ্য ব্যক্তি কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি থেকে, অধার্মিক ধার্মিকের থেকে সব সময় হিংসে করবে'। এগুলো স্বাভাবিক, সে নিজে যা তার থেকে যে উল্টো তার প্রতি তার দ্বেষ থাকবে। দ্বেষ থাকলেই ক্রোধ আসবে। আমার আপনার মত লোকদের মনমোহন সিং এর উপর ক্রোধ আসবে না, কারণ ক্রোধ, দ্বেষ এগুলো সব সময় সমানে সমানেই হয়। আমার সমান সমান বা আমার থেকে একটু উঁচু, তার উপর আমার হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ এগুলো হবে। আবার আমার থেকে যে একটু নীচু তার উপর কখনই আমার রাগ হিংসা হবে না। কে কাকে গালাগাল দিচ্ছে সেটা দেখে বোঝা যাবে দুর্বলটা কে।

*অক্রোধনঃ ক্রোধনেভ্যো বিশিষ্টস্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ। অমানুষেভ্যো মানুষাশ্চ প্রধানা বিদ্বাংস্তথৈবাবিদুষঃ প্রধানঃ।।*১/৮৭/৬। যে ক্রোধ করে তার থেকে শ্রেষ্ঠ যিনি ক্রোধ করেন না, ঠিক তেমনি যিনি সহ্য করেন সে তার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ যে সহ্য করে না। যত প্রাণি আছে তাদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ আর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান। নিজের সন্তান পুরুকে যযাতি বলছেন *আক্রুশ্যমানো নাক্রোশেন্মন্যুরেব তিতিক্ষতঃ। আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতং চাস্য বিন্দতি।।*১/৮৭/৭। যদি কখন কেউ তোমাকে নিন্দা করে বা গালাগাল দেয় পাল্টা কখন কারুকে গালাগাল বা নিন্দা করতে যেও না। যে মানুষ এই গালাগাল ও নিন্দাকে সহ্য করে নেয়, সহ্য করা মানে আমাকে কেউ গালাগাল দিলে আমার ভেতরে কি জ্বালা হবে না! অবশ্যই জ্বালা হবে কিন্তু সেটাকে প্রকাশ করলাম না, এই ভাবে সহ্য করে নিলে

কি হবে? *আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতং চাস্য বিন্দতি* – যাকে অপমান করা হল, যার নিন্দা করা হল, যাকে গালাগাল দেওয়া হল, সে যে কষ্ট পাইনি তা নয়, ভেতরে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু প্রকাশ করল না। ঐ কষ্টটাই কিন্তু সামনের লোকটিকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে, ভস্ম হবেই এর থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। এই তত্ত্বটি কতটা সত্য তা আমরা অনেক ঘটনা দিয়েই বুঝতে পারি।

হিমালয়ের এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষার জন্য সকালে এক মিষ্টির দোকানে হাজির হয়েছে। দোকানদার ব্রহ্মচারীকে দেখেই বলছে – এখনো দোকান খুলিনি, আর এই সকালবেলা কাঙালীগুলো পৌঁছে গেছে! বলেই ব্রহ্মচারীকে এক ধাক্কা মেরে বলছে, বেরো এখান থেকে। ব্রহ্মচারী খুব মন খারাপ করে আশ্রমে ফিরে এসেছে, সেদিন আর কোথাও ভিক্ষেতে যায়নি। মহন্ত তাকে দেখেই বলছেন, কি ব্যাপার আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে। ব্রহ্মচারী সব ঘটনা বলল। মহন্ত বললেন, তোমাকে গালাগালি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে দিল আর তুমি তাকে কিছুই বললে না! না, আমিতো সন্ন্যাসী আমি কি করে তাকে কিছু বলতে পারি। মহন্ত তখন বলছেন, তুমি এক্ষুণি গিয়ে লোকটিকে পাল্টা এক ধাক্কা মেরে ফেলে চিৎ করে ফেলে দিয়ে এসো। গুরু বলে দিয়েছে, সে আর না করতে পারেনা। ব্রহ্মচারী দোকানে এসে দেখে সেখানে খুব ভিড় আর খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। ঘটনাটা হল, হালুইকারি জিলিপি বানানোর জন্য কড়াইতে রস গরম করতে দিয়েছে, তার বাচ্চাটা কিভাবে খেলা করতে গিয়ে কোল থেকে ছিটকে ঐ ফুটন্ত রসের কড়াইয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে গেছে। ঐ দেখে ব্রহ্মচারী কি আর তাকে মারবে, আস্তে করে আবার আশ্রমে ফিরে এসে গুরুকে বলছে, আমি কি আর ওকে মারবো, ওরতো এই অবস্থা। গুরু শুনেই বলছেন, আরে এইজন্যই তো তোমাকে পাঠিয়েছিলাম যাতে তাড়াতাড়ি গিয়ে তুমি ওকে এক ঘা মেরে দিতে তাহলে ওর ছেলেটা বেঁচে যেত। অনেক সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে তাঁদের কেউ অপমান করেছে, কটূ কথা বলেছে, কিন্তু তিনি সহ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু তার পাল্টা যা হতে দেখা গেছে সে এক বিভীষিকা। সেইজন্য কাউকে কটূ কথা বলতে নেই, কাউকে কটূ কথা বলার পর সে যদি তার পাল্টা কিছু না ফেরত দেয় তাহলে কিন্তু তার অবস্থা মারাত্মক হতে বাধ্য। এটাই যযাতি এখানে বলছেন, কিন্তু যযাতি বলছেন না যে তোমার ক্রোধটাকে নাশ করে দাও। ক্রোধ থাকবে কিন্তু তুমি নিজেকে সংযত করে নিয়েছে, এটাই তোমার শক্তির পরিচয়।

সব শাস্ত্রে যে বলা হয় মিথ্যে কথা বলবে না, চুরি করবে না, কেন বলা হচ্ছে? স্বামীজী বলছেন গরু কখন মিথ্যে কথা বলে না, দেওয়াল কখন চুরি করে না, কিন্তু গরু গরুই থাকে আর দেওয়াল দেওয়ালই থাকে। এর তাৎপর্য কি? কেউ যদি চুরি না করে, কেউ যদি মিথ্যে কথা না বলে তাহলে কি তার ভগবান লাভ হবে? কিছুই হবে না, ভগবান লাভের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। ভগবান লাভের পথে যারা এগোন তাঁদের জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা আসে। এই ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে অনেক সময় তাঁকে মিথ্যে কথা বলতে হতে পারে, চুরিও করতে হতে পারে বা কিছু মারাত্মক প্রলোভন আসতে পারে, তখন এতেই তাঁদের পতনও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক বছর ধরে যখন সাধনা করে করে নিজেকে এমন ভাবে তৈরী করে নিচ্ছে যে যতই হোক আমি কিন্তু প্রলোভনের ফাঁদে পা দেবো না, আমি কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়বো না। তখন সাধনা করতে করতে কোথাও গিয়ে যদি আটকে যায় সে ঐটাকে কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এর পরে আরও কঠিন সমস্যা আসবে। যখন কেউ হিমালয়ের পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে যায় তখন তার কোমরে দড়ি বাঁধা থাকে, যদি পা একটু হড়কেও যায় একটা অবস্থার পর সে আর পড়ে যাবে না, এমন ভাবে তার বাঁধন দেওয়া থাকে। আধ্যাত্মিক সাধনাতেও ঠিক এই জিনিষই হয়। এক সাধু বাবার কৌপিন ইঁদুরে কেটে দিত, ইঁদুরকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি বেড়াল নিয়ে এলেন, বেড়ালের দুধের দরকার, তখন একটা গরু নিয়ে এলেন, গরুকে দেখাশোনার জন্য আবার মেয়ের দরকার, এইভাবে তার কৌপিন কে বাস্তে তার সংসার পত্তন হয়ে গেল। এটা কি বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখন সম্ভব? কখনই নয়। তাহলে এই কাহিনীকে কেন বলা হল? আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, সাধনার পথে যারা এগোচ্ছে তাদের সাবধান করা হচ্ছে, এ রকমটি হতে পারে। এই যে বিশ্বামিত্র মেনকা এবং আরও যে মুনি ঋষিদের নিয়ে পুরান ইতিহাসে কাহিনীগুলি প্রচলিত হয়ে আছে, এগুলো কি সত্যিই এই রকম হয়েছিল, বিশ্বামিত্রের কি সত্যিই পতন হয়েছিল? কখনই সম্ভব নয়। এগুলো সাধককে সাবধান করার জন্য বলা, বড়দেরই পতন হয়ে গিয়েছিল, সেখানে তুমি কি! তাই সাবধান। বিশ্বামিত্রের ছিল আবার প্রচণ্ড ক্রোধ, এখন যত তপস্যা করে ফল জমালেন সব ওই ক্রোধের পেছনে শেষ করে ফেলতেন।

কিন্তু এটাও জেনে রেখো তোমার মধ্যে যদি কারুর কথাতে উদ্বেগ এসে যায় তাহলে এই উদ্বেগটাই তাকে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভেতরে কোন উদ্বেগই হয় না, তাঁরা হলেন *আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং*। যিশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে তখন তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, ভগবান তুমি এদের ক্ষমা কর এরা জানেনা এর কি

করছে। আজ দু হাজার বছর ধরে জুহুদিদের উপর অত্যাচার চলছে, যিশুকে ক্রুশিফাইড করার পাপ এত দিন ধরেও বইছে। সেইজন্য যযাতি বলছেন, মুখ দিয়ে কখন কাউকে উদ্বেগকর কথা বলবে না। গীতাতেও ভগবান বলছেন *অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ*, বাণী সংযমটা কি রকম সেটা এখানে ভগবান বলছেন, যে কথা গুলো বলবে সেই কথাগুলো সামনের লোকের জন্য যেন উদ্বেগকর না হয়। বলছেন, যারা পাপী তারা উদ্বেগকর বাক্য প্রয়োগ করে সামনের লোকের মর্মস্থানকে বিদ্ধ করে দেয়। এই ধরণের পাপীদের সাথে যাদের সব সময় থাকতে হয় তাদের উদ্বেগকর বাক্য শুনে শুনে ভেতরের মর্মস্থলটা পাথর হয়ে গেছে। মহাভারত যযাতির মুখ দিয়ে বলছে *অরুন্তুদং পুরুষং তীক্ষ্ণবাচং বাক্কণ্টকৈর্বিতুদন্তং মনুষ্যান্। বিদ্যাদলক্ষ্মীকতমং জনানাং মুখে নিবদ্ধাং নির্ঋতিং বহন্তম্।।*১/৮৭/৭। যারা স্বভাব থেকে কঠোর, অপরকে কষ্ট দেয়, কটূ কথা বলে, তীক্ষ্ণ বচন, তুমি বুঝে নাও এই লোকটা আসলে এক দরিদ্র ব্যক্তি, মানে শ্রীহীন, এদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। এই ধরণের লোকের মুখ দেখাও পাপ, এরা নিজেদের মুখের মধ্যে এক পিশাচিনীকে বয়ে বেড়ায়, আর সেই পিশাচিনী বাণীরূপে বেরিয়ে অপরের মর্মে এসে বিষ ঢেলে দেয়। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী নিজের জীবনের একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুব সুন্দর একটা কথা বলতেন। ছোটবেলায় যখন কেরলের গ্রামের বাড়িতে থাকতেন সেই সময়কার ঘটনা। স্কুল থেকে তিনি একটা খারাপ কথা শুনে এসেছেন। বাড়িতে এসে কাউকে সেই খারাপ কথাটা যখন বলেছেন তখন তাঁর মাতৃদেবী কাছেই ছিলেন। উনি শুনলেন, শোনার পর ছেলেকে ডাকলেন, ডেকে বললেন – দ্যাখো বাবা, জিহ্বা হল মা সরস্বতীর স্থান, তাই মুখ থেকে যখন খারাপ কথা বলবে তখন মা সরস্বতীকে অপমান করা হয়, মা সরস্বতীর অপমান হলে তোমার কোন দিন বিদ্যা হবে না। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলতেন, সেইদিন থেকে তিনি মিথ্যা কথা বলা, মজা করেও কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলা, এগুলো আর কোন দিন বলতেন না। সেইজন্য আজ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে দাঁড়ালেন।

যারা কটূ কথা বলে, মিথ্যা কথা বলে তারা যেন জিহ্বার উপর এক পিশাচীনিকে বয়ে বেড়াচ্ছে। দরজা খুললেই যদি দেখি একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে, সেটা দেখে কি আমার ভালো লাগবে! এক মহারাজ একবার মরিশাসে গেছেন। সেখানকার এক ভক্ত তাঁকে গাড়ি করে ঘুরতে নিয়ে গেছেন। ফেরার পথে ভক্তটি মহারাজকে বলছেন, মহারাজ আমরা এখন আশ্রমে ফিরে যাচ্ছি, এক ঘন্টার মত ড্রাইভ, আমার বাড়িতে এক কাপ কফি খেয়ে তারপর আশ্রমে ফিরে যাবো। মহারাজ রাজী হয়ে গেছেন। মহারাজ নিজেই এই কাহিনীটা বলেছিলেন। গাড়ির দরজা বন্ধ করে বাড়ির দরজায় কলিং বেলটা টিপতে যাচ্ছেন সেই সময় মহারাজ দেখতে পাচ্ছেন দরজার বাইরে সামনের দিকে মুখ করে সাত আট ফুট লম্বা কালো একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজ জোর চিৎকার করে বলছেন – দরজা খুলবেন না। ভদ্রলোক চমকে উঠেছেন, মহারাজ কেন দরজা খুলতে বারণ করছেন। ভূতটা লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা মহারাজের কাছে এলো, এসেই মহারাজের মুখের উপর খ্যাঁক করে উঠেছে, তারপর পাঁচিল ডিঙিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। মহারাজ আর কিছুতেই বাড়িতে ঢুকলেন না। সেখান থেকে যতক্ষণে আশ্রমে পৌঁছেছে ততক্ষণে আশ্রম অফিসে ঘন ঘন ফোন বেজেই চলেছে। ভদ্রলোকের বাড়ির পাশেই আখের খামার ছিল, ফোনে খবর এসেছে যে ঐ খামারের ভেতর ট্রাকে লোডিং করার সময় কি করে নিজের ভাইয়ের একটা বিরাট বড় দুর্ঘটনা হয়েছে এক্ষুণি ভদ্রলোককে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ কিন্তু ভদ্রলোককে ভূতের কথা কিছু বললেন না, শুধু বলে দিলেন বাড়িতে একটু রামনাম করাতে। ভূতের গল্প বলার জন্য এই কাহিনী বলা হয়নি। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে যদি দেখি একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে তখন আমি কি করব! কেউ কি ভূত দেখতে চায়? কখনই না। কিন্তু যারা কটূ কথা বলে, মিথ্যে কথা বলে তাদের মুখে তো পিশাচ বাঁধা থাকে। নিজের ঘাড়ে করে যে এক পিশাচিনীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি এখন তাকে দেখতে পছন্দ করব! সেইজন্য বলছেন যারা কটূ কথা বলে তাদের মুখ দর্শনও পাপ। শ্রেষ্ঠ পুরুষের সাধু স্বভাব থাকবে, তাঁরা সব কিছু সহ্য করে যাবেন। মূল কথা হল সব সময় মিষ্টি কথা বলবে আর সামনের লোকের উদ্বেগ হয়ে যাবে এমন কোন কথা বলবে না।

যযাতির অহঙ্কার ও স্বর্গ থেকে পতন

ইন্দ্র সব কিছু শুনে যযাতির কাছে জানতে চাইলেন, আপনি তো অনেক লোক ঘুরেছেন, পৃথিবীতে আজকাল কারা কারা খুব তপস্যা করছে। যযাতি বলছেন *নাহং দেবমনুষ্যেষু গন্ধর্বেষু মহর্ষিষু। আত্মনস্তপসা তুল্যং কঞ্চিৎ পশ্যামি বাসব।।*১/৮৮/২। আমি সব ঘুরেটুরে যা দেখেছি তাতে বুঝেছি আমার মত তপস্যা এখনও পর্যন্ত কেউ করেনি। যযাতির কথা শুনতেই ইন্দ্র প্রচণ্ড রেগে গেছেন। এই যে আপনি বললেন আপনার মত কোন তপস্বী নেই, এই যে অহঙ্কার করলেন, এই মুহুর্তে, এক্ষুণি আপনার স্বর্গ থেকে পতন হয়ে যাক। স্বর্গ থেকে কথায় কথায় পতন হয়ে যাওয়া স্বর্গের এক মহা

সমস্যা। যযাতি নিজের তপস্যার জোরে স্বর্গে গিয়ে বসেছেন, শুধু অহঙ্কারের জন্য, তাও কি অহঙ্কার? ইন্দ্র যযাতিকে জিজ্ঞেস করছে আজকাল পৃথিবীতে কে কেমন তপস্যা করছে। যযাতি বলছেন, মোটামুটি যা দেখেছি আমার মত তপস্বী কাউকে দেখলাম না। যযাতি মিথ্যা কিছু বলেননি, কিন্তু যেহেতু নিজের নামে বলেছন বলে অহঙ্কারের মত হয়ে গেল বলে ইন্দ্র বলে দিলেন এক্ষুণি আপনার স্বর্গ থেকে পতন হয়ে যাক। যযাতি বলছেন, আমি রাজী আছি কিন্তু যেখানে সাধুপুরুষরা আছেন সেখানেই যেন আমার পতন হয়। গীতাতে আমরা এই ভাবটাই পাই, যারা যোগভ্রষ্ট তারা ভালো জায়গায় গিয়ে জন্ম নেন, *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*।

যযাতি যখন নীচে পড়ছেন, তখন অষ্টক নামে একজন রাজর্ষি দেখতে পাচ্ছেন মহাতেজা মার্তণ্ডের ন্যায় একজন তেজস্বী উল্কার মত নেমে আসছেন। অষ্টক ঋষি জিজ্ঞেস করেছেন আপনি কে? যযাতি তখন দুঃখ করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন, আমি হলাম রাজা নহুষের পুত্র, আমার তপস্যার জোরে স্বর্গে ছিলাম। আমি একটা মহা পাপ করে ফেলেছি। আমি যখন বলে দিলাম আমার মত তপস্বী কেউ নেই, তাতে জগতে যত প্রাণি আছে সবাইকে এই এক কথায় আমি অপমান করে দিয়েছি। এই পাপে আমার পতন হয়ে গেছে।

যযাতি ও অষ্টক ঋষির সংলাপ *(দৈব ও প্রারব্ধ – যোনিমুক্তি – স্বর্গের প্রকৃত স্বরূপ – নিজের পূণ্যের খ্যাতি করার পরিণাম – স্বর্গপ্রাপ্তির সাতটি দ্বার – চারটি কর্ম যা মানুষকে ভয়মুক্ত করে –চারটি বর্ণাশ্রমের কর্তব্য – মুনির সংজ্ঞা)*

অষ্টক ঋষি তখন বলছেন, আপনি তো পড়ে যাচ্ছেন, তার আগে আপনার কাছে আমার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। অষ্টক ঋষির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যযাতি বলছেন *অভূদ্ ধনং মে বিপুলং গতং তদ্ বিচেষ্টমানো নাধিগন্তা তদস্মি। এবং প্রধার্যাত্মহিতে নিবিষ্টো যো বর্ততে স বিজানাতি ধীরঃ।।*১/৮৯/৫। দেখুন, আমার পূণ্য রূপী অনেক সম্পদ ছিল, আমার পূণ্যের অভাব নেই, কিন্তু অপরকে যে আমি অপমান করে দিয়েছি এই একটা পাপেই আমার সব কিছু নাশ হয়ে গেছে। সেইজন্য আমার এই দুরবস্থা দেখে মানুষ যেন শিক্ষা পায় যাতে তার আত্মকল্যাণের পথে এই ধরণের কোন বিঘ্ন না আসে। এখানে আত্মকল্যাণ বলতে ঠিক কি বলতে চাইছেন বোঝা যায় না। হয়তো বলতে চাইছেন এমন কিছু যাতে কেউ না করে যাতে তার সমস্ত পূণ্য নাশ হয়ে যেতে পারে। অপরের নিন্দা করবে না, জ্ঞানে সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ধীর থাকবে। যে মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে এগুলোকে সব সময় ধরে রাখবে, তা নাহলে আমার মত পতন হয়ে যাবে। যযাতির বাবা নহুষেরও পতন হয়েছিল, ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর দিকে হাত বাড়িয়েছিল বলে পতন হয়ে গিয়েছিল। ছেলেও দিব্যি স্বর্গে ছিল কিন্তু অহঙ্কার করার জন্য তাঁরও পতন হয়ে গেল। *যযাতি বলছেন ন জাতু হৃষ্যেন্মহতা ধনেন বেদানধীয়ীতানহংকৃতঃ স্যাৎ। নানাভাবা বহবো জীবলোকে দৈবাধীনা নষ্টচেষ্টাধিকারাঃ। তৎ তৎ প্রাপ্য ন বিহন্যেত ধীরো দিষ্টং বলীয় ইতি মত্বাহহত্মবুদ্ধয়া।।*১/৮৯/৭। প্রচুর সম্পদ যদি পেয়ে যাও তাও কখন হর্ষ ও উৎফুল্ল হবে না, প্রচুর দুঃখ যদি পাও তাও আমি শেষ হয়ে গেছি বলে হা হুতাশ করবে না। বেদ অধ্যয়ণ করবে, প্রচুর তপস্যা করবে কিন্তু অহঙ্কার করবে না। যযাতি বলছেন – *সুখং হি জন্তুর্যদি বাপি দুঃখং দৈবাধীনং বিন্দতে নাত্মশক্ত্যা। তস্মাদ্ দিষ্টং বলবন্মন্যমানো ন সংজ্বরেন্নাপি হৃষ্যেৎ কথঞ্চিৎ।।*১/৮৯/৮। এটা ব্যাসদেবের খুব দৃঢ় মত, ভাগবতেও তিনি এই একই মন্তব্য করেছেন। বলছেন – মানুষ যে সুখ বা দুঃখ পায় এটা সে কখন নিজের জোরে পায়না, এটা আসে দৈবের জন্য, কপালের জোরে। ভাগবতে উপমা দিয়ে বলবে, কোন মানুষই তো দুঃখকে পেতে চায় না, কিন্তু তবুও দুঃখ আসে। কেন আসে? তার কপালে আছে তাই। ঠিক তেমনি, তুমি যদি সুখ নাও চাও তাও তোমার সুখ আসবে, তুমি যদি নাম-যশ নাও চাও তবুও আসবে যদি তোমার কপালে থাকে। তাই তুমি সুখ-দুঃখের দিকে মন দিও না। গীতাতেও ভগবান বলছেন – *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ*, দুঃখ যখন আসবে তখন উদ্বিগ্ন হয়ো না, সুখ যখন আসবে তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যেও না। কেন? যখনই বুঝবে এগুলো তোমার জন্য কিছু আসছে না, সব দৈবের জন্য এসেছে, তোমার এর আগের আগের জন্মে কিছু কর্ম করা ছিল, তখন তোমার হর্ষ বিমর্ষ এসব আর কিছুই হবে না। এই যে তোমাকে বিদ্যা দিয়েছে, তোমার সুন্দর চেহারা দিয়েছে, স্বামী/স্ত্রী দিয়েছে, সন্তান দিয়েছে এগুলো সবই দৈবের জন্য এসেছে। কিন্তু তুমি তোমার বিদ্যাকে নিয়ে, নিজের রূপকে নিয়ে, তোমার টাকা পয়সাকে নিয়ে আসক্ত হয়ে পড়ছ। তুমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছ তাতে তোমার কি? তুমি বলবে আমি আগে আগে ভালো কাজ করেছিলাম বলে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছি। এই কথাইতো বলা হচ্ছে, তোমার আগে আগে যা করা আছে আর সেটার জন্য তুমি যা পাচ্ছ সেটাই দৈব। সেইজন্য বলছে, ভালো যা কিছু তোমার আছে সেটাকে নিয়ে অহঙ্কার করবে না। আর বাজে যা কিছু আছে সেটাকে নিয়ে

মন খারাপ করবে না, সব কিছু কপালের জন্যই আসছে। খারাপটাও দৈব ভালো যা কিছু হচ্ছে সেটাও দৈব। সেইজন্য কোন দিকে মন না দিয়ে শুধু ভগবানের দিকে মন দাও।

অষ্টক ঋষিকে যযাতি বলছেন, তাই আমার মনে এখন আর কোন ধরণের ভয় বা দুঃখ কিছু নেই, আমি জানি বিধাতা আমাকে যেমনটি রাখবেন আমাকে তেমনটিই থাকতে হবে। পৃথিবীতে কত রকমের পদার্থ আছে তার কয়েকটি নাম এখানে যযাতি অষ্টক ঋষিকে বলছেন *সংস্বেদজা অণ্ডজাশ্চোদ্ভিদশ্চ সরীসৃপাঃ কৃময়োহথাপ্সু মৎস্যাঃ। তথাশ্মানস্তৃণকাষ্টং চ সর্বে দিষ্টক্ষয়ে স্বাং প্রকৃতিং ভজন্তি।।১/৮৯/১১*। স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, কৃমি, মৎস্য, প্রস্তর, তৃণ, কাষ্ঠ। আমাদের হিন্দুদের একটা ধারণা কিছু প্রাণি শরীরের ঘাম থেকে জন্ম নেয় বা ঘামের মধ্যেই বাস করে, যেমন উকুন, এদেরকে বলা হয় স্বেদজ। বলছেন এদের প্রত্যেকের প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেলে এরা নিজের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত করে। বলছেন প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেলে তার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত করে, তাহলে একটা পাথরের প্রকৃতি কি? পাথরের প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেলে পাথর এখন কোথায় যাবে? স্বেদজের প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেল এখন এর প্রকৃতিটা কি? বলছেন নিজের প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে যায়। একদিকে বলা যেতে পারে এদের মুক্তি হয়ে যায়। ঠিকই বলছেন, সত্যিই মুক্তি হয়, এখানে মুক্তি মানে যোনি মুক্তি। স্বেদজ থেকে সে আরেকটু উচ্চ যোনিতে চলে যাবে, এইভাবে উন্নত যোনিতে উঠতে উঠতে মানুষ হয়ে প্রকৃত মুক্তি পাবে। তাহলে যে স্বেদজ বা কৃমি এটা তার প্রকৃতি নয়, এগুলো তার প্রকৃতি হতে পারেনা। একটা মাছের কখনই প্রকৃতি হতে পারেনা যে তাকে মাছ হতে হবে। শ্রীমায়ের একটা কথা আছে, শ্রীমাকে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা মা, ঠাকুরকে যারাই দর্শন করেছে তাদের সবারই কি মুক্তি হয়ে গেছে? শ্রীমা বলছেন, হ্যাঁ, সবারই মুক্তি হয়ে গেছে, কিন্তু এদের যোনি মুক্তি হয়। এখানে ঠিক এই কথাই বলা হচ্ছে, এদের প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেলে যোনি মুক্তি হয়ে যায়, এটাকেই বলা হচ্ছে এরা এদের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত করে। এই মুক্তি কিন্তু পরম মুক্তি নয়।

যযাতি বলছেন, সুখ আর দুঃখকে আমি অনিত্য জেনে গেছি তাই আমার আর কোন কিছুতে কষ্টও হয় না আনন্দও হয় না। অষ্টক ঋষি আবার যযাতিকে জিজ্ঞেস করছেন, স্বর্গলোকটা কেমন দেখলেন? যযাতি খুব সুন্দর বলছেন, সব ফালতু, বেকার। এটাই হচ্ছে মহাভারতের বাস্তব দিক। যযাতি বলছেন – *জ্ঞাতি সুহৃৎ স্বজনো বা যথেহ ক্ষীণে বিত্তে ত্যজ্যতে মানবৈহি। তথা তত্র ক্ষীণপুণ্যং মনুষ্যং ত্যজন্তি সদ্যঃ সেশ্বরা দেবসঙ্ঘাঃ।।১/৯০/২*। তোমার যত গোষ্টি, তোমার যত হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমার স্ত্রী-পুত্র যেদিন তোমার সব কিছু নাশ হয়ে যাবে সেদিন এরা সবাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। ঠিক তেমনি যে মুহুর্তে তোমার পূণ্যের কোটা শেষ হয়ে যাবে সেই মুহুর্তে ইন্দ্র সহ সব দেবতা তোমাকে ত্যাগ করে দেবে। এটা মহাভারতের কথা, আপনার হাতে যত দিন টাকা পয়সা থাকবে তত দিনই সবাই খাতির করবে, যেদিন কিছু থাকবে না কেউ আর খোঁজও নিতে আসবে না। চণ্ডীতেও ঠিক এই একই কথা বলছে, সমাধি নামে বৈশ্য ছিল, তার নিজের স্ত্রী পুত্র সব সম্পদ কেড়ে নিয়ে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যযাতি স্বর্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঠিক এই জিনিষটাকেই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, তোমার যত দিন পূণ্য থাকবে তত দিনই দেবতারা স্বর্গে খাতির করবে, যেদিন সব পূণ্য ক্ষয় হয়ে যাবে তখন দেবতারাও তোমাকে তাড়িয়ে দিতে স্বর্গ থেকে লাথি মেরে ফেলে দেবে। সেইজন্য ভাই তোমাকে বলছি স্বর্গ-ফর্গের চিন্তা করো না। বিভিন্ন লোকের বর্ণনা করে যযাতি বলছেন *ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি লালপ্যমানা নরদেব সর্বে। তে কঙ্কগোমায়ুবলাশনার্থে ক্ষীণা বিবৃদ্ধিং বহুধা ব্রজন্তি।।১/৯০/৪*। যারা নিজের মুখে নিজের পূণ্যকর্মের ভক্ষণ করে, যেমন অনেক বলে আমি তোমার জন্য এত কিছু করেছি, বাবা-মা নিজের সন্তানকে বলেন আমরা তোর জন্য কত কি করেছি জানিস, যেমনি নিজের পূণ্যকর্মের বখান করল সঙ্গে সঙ্গে তার নরকের টিকিট বুক হয়ে গেল। এই নরকের নাম হল ভৌম, যে নিজের পূণ্যের খ্যাতি মুখে বলতে থাকবে তখনই সে এই ভৌম নামে নরকে গিয়ে পড়ে, ভৌ মানে ভূমি, এই পৃথিবী। স্বর্গ থেকে তারা পতিত হয়ে এই নরকে পড়ে, তখন তাদের কি হয়? খুব খারাপ ভাষায় যযাতি বলছেন – *তে কঙ্কগোমায়ুবলাশনার্থে ক্ষীণা বিবৃদ্ধিং বহুধা ব্রজন্তি* এরা এমন একটা শরীর পায় যে শরীরটাকে শকুন খায়, শেয়াল খায় আর কাক খায়। মানুষ মরে গেলে তার শরীরের মাংস এই তিনটে প্রাণী ভক্ষণ করে। শুধু তাই না, এখানে এসে *বিবৃদ্ধিং বহুধা ব্রজন্তি*, এরা বিস্তার পায়। কিভাবে? নিজের পুত্র পৌত্র রূপে এখানে বিস্তার পেতে থাকে। কি শরীরের বিস্তার হচ্ছে? যে শরীর কুকুর শেয়াল কাক আর শকুনে খায়। এর থেকে দুঃখের কি আর হতে পারে!

পাশ্চাত্যে একটা কাহিনী আছে, একজন একটা কি ক্ষমতা পেয়েছে, তার কাছ থেকে যে কেউ তিনটে বর নিতে পারে। বুড়ো বাপ-মা শুনে হাসাহাসি করছে, এটা কি কখন হতে পারে নাকি! হাসাহাসি করে বলছে যদি এটা সত্যি হয়

তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে আমি যেন এক লাখ টাকা পেয়ে যাই। কিছুক্ষণ পরে কারখানাতে অসময়ে সাইরেন বেজে উঠেছে। তার কিছু পরে কারখানার একজন অফিসার ঐ বুড়ো-বুড়ির দরজার সামনে এসে কড়া নেড়েছে। দরজা খুলে বুড়ো বাপ দেখছে তার ছেলের কারখানার অফিসার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খবর দিচ্ছে কারখানার একটা দুর্ঘটনায় তাদের একমাত্র সন্তানের শরীরটা একেবারে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে। শরীর এমনই বিকৃত হয়ে গেছে যে এটা আপনাদের না দেখানোই ঠিক মনে করে ওকে কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব বলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাদের হাতে এক লাখ টাকার একটা চেক তুলে দিয়েছে। বুড়ো বাবা-মা একমাত্র ছেলের জন্য তীব্র আর্তনাদ করে কাঁদছে, স্ত্রী স্বামীকে বলছে, তুমিই তো চেয়েছিলে এক লাখ টাকা আর তার জন্য আমাদের জীবনের চরম মূল্য দিতে হল, তোমার জন্যই আজ এই দুরবস্থা হল। বাবা চেঁচাচ্ছে আমি টাকা চাইনা আমি আমার ছেলেকে ফেরত চাই। যদি এটা সত্য হয় তাহলে আমার ছেলে যেন ফিরে আসে। হঠাৎ করে ভূমিকম্প হতে শুরু করেছে, সাথে প্রচণ্ড ঝড়। এরমধ্যে হঠাৎ দেখে এক লাখ টাকার চেকটা উধাও হয়ে গেছে। এদিকে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে, তার মধ্যে দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ, দরজা খুলে দেখছে কবর থেকে তাদের ছেলে উঠে এসেছে, সে কি বিভৎস কিম্ভূত কিমাকার ভয়ঙ্কর চেহারা, ছেলের চেহারা বলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, আর এরই মধ্যে কবরের পোকা গুলো তার শরীরের মাংসগুলো খেতে শুরু করেছে। ঐ ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে বাবা-মা দুজনে আতঙ্কিত হয়ে জোর চেঁচাতে শুরু করেছে, আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে চলে যান। আবার সে কবরে ফিরে গেল। এগুলো কাহিনী, কিন্তু এর মূল কথা হল, আজ আমি যাকে প্রচুর ভালোবাসছি আজ যদি সে মারা যায় তাহলে তাকে কবর দেওয়া হবে। তারপর কিছু দিন পর কবর খুড়লে দেখা যাবে যে শরীরটাকে এত ভালোবেসেছিলাম সেই শরীরের সর্বাঙ্গ পোকায় খেয়ে গেছে, হাড় পাঁজরাগুলো বেরিয়ে এসেছে। সেইজন্য বলা হয় এই শরীরের পরিণামের কথা বিচার করলে এই শরীরের থেকে আসক্তি চলে যায়, শরীরের প্রতি ঘেন্না ধরে যায়, ঠাকুরও কথামৃতে অনেক বার বলছে, এই শরীরে আছে কি, পুঁজ, রক্ত, মাংস, মজ্জা, হাড়।

যযাতি অষ্টক ঋষিকে বলছেন *তপশ্চ দানং চ শমো দমশ্চ হ্রীরার্জবং সর্বভূতানুকম্পা। স্বর্গস্য লোকস্য বদন্তি সন্তো দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্। নশ্যন্তি মানেন তমোহভিভূতাঃ পুংসঃ সদৈবেতি বদন্তি সন্তঃ।।*১/৯০/২২। তুমি যদি স্বর্গে যেতে চাও তাহলে তার সাতটি দ্বার আছে, এই সাতটি দ্বারের যে কোন একটা দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করা যায়। প্রথম দ্বার হল তপস্যা, দ্বিতীয় দান, তৃতীয় শম মানে ইন্দ্রিয় সংযম, চতুর্থ দম, কর্মেন্দ্রিয়ের সংযম, পঞ্চম লজ্জা ভাব, কোন খারাপ কাজ করতে যাবার আগেই ভেতরের এই লজ্জা ভাব সেই খারাপ কাজ করাটাকে আটকে দেয়, ছিঃ আমি এই কাজ কি করে করতে পারি, ষষ্ঠ আর্জবম, মানে সরলতা, মন একেবারে পরিষ্কার ভেতরে কোন ধরণের প্যাঁচঘোঁচ থাকবে না এবং সপ্তম সর্বভূতানুকম্পা, স্বামীজী ঠাকুরর নামে স্তবে বলছেন *আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ*, সমস্ত প্রাণির প্রতি প্রেম, ভালোবাসা, অনুকম্পা। এই সাতটা গুণের কোন একটা যদি কারুর মধ্যে পুরোপুরি থাকে তাহলে সে নিশ্চিত, স্বর্গে সে যাবেই।

যযাতি আবার বলছেন *চত্বারি কর্মাণ্যভয়ংকরাণি ভয়ং প্রযচ্ছন্ত্যযথাকৃতানি। মানাগ্নিহোত্রমুত মানমৌনং মানেনাধীতমুত মানযশঃ।।*১/৯০/২৪। চারটে কর্ম মানুষকে ভয় মুক্ত করে, কিন্তু এই কর্মগুলি যদি ঠিক মত না করা হয় তাহলে এই কর্মই কিন্তু ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই চারটে কর্ম হল প্রথম অগ্নিহোত্র, মানে যজ্ঞাদি, যজ্ঞ করলে মানুষ ভয় মুক্ত হয়, যজ্ঞ যদি ঠিক ভাবে না করা হয় তখন এই যজ্ঞই কাল হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় মৌন, মৌনও এক ধরণের তপস্যা, মৌনের সাধনা যদি সঠিক ভাবে করা হয় তাহলে সে বিরাট শক্তিশালী হয়ে উঠবে, উল্টে মৌন যদি ঠিক ভাবে অনুশীলন না করা হয় তাহলে মাথাটি পুরো বিগড়ে যাবে। মৌন মানে শুধু মুখ বন্ধ রাখা নয়, ভেতরটাও মানে মনে মনে কথা বলা, চিন্তা করাটাও বন্ধ রাখতে হয়। নিত্যকর্ম যেটা করা হয় তার বাইরে যে নৈমিত্তিক কর্ম মানে বিশেষ দিনে কোন বিশেষ দেবতা বা দেবীর পূজো করা, এটাও মানুষকে ভয় মুক্ত করে, কিন্তু পূজো যদি ঠিক মত না করা হয় তাহলে এটাও কিন্তু তার কাল হবে। আর চতুর্থ অধ্যয়ণ, অধ্যয়ণ ঠিক মত করে জ্ঞান হলে মানুষ ভয় মুক্ত হয় কিন্তু ঠিক মত অর্থ না বুঝে অধ্যয়ণ করলে ঐ উল্টো পাল্টা অর্থ বোঝার জন্য বিদ্যাই তার সর্বনাশের কারণ হবে। এরপর অষ্টক ঋষি যযাতিকে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কিছু বলতে বলছেন। যযাতিও বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বলছেন। বর্ণাশ্রমের কথা মহাভারতে অনেকবার আসবে, এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নিচ্ছি।

যযাতি-ইন্দ্র বা যযাতি-অষ্টকের সংলাপের মাধ্যমে ব্যাসদেব আমাদের তাঁর নিজস্ব দর্শনকে বলে যাচ্ছেন। যযাতির মাধ্যমে ব্যাসদেব চার রকম আশ্রমের বর্ণনা করছেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ আমরা প্রথম মহাভারতেই পাই, মহাভারতের আগে এতো পরিষ্কার ভাবে বর্ণাশ্রমকে কোথাও বিশ্লেষণ করা হয়নি। বর্ণাশ্রমের প্রথমে আসে ব্রহ্মচারী, এখানে অবশ্য ব্রহ্মচারী না বলে বলছেন অধ্যায়ী, যিনি অধ্যয়ণ করছেন, শিষ্য। এরা গুরুর কাছে যাবে, গুরুর কাছে থাকবে, গুরু শয়নে যাওয়ার পর শয়ন করবে, গুরুর শয়ন ত্যাগের পূর্বে শয়ন ত্যাগ করবে, তাকে বিনম্র, জিতেন্দ্রিয় হতে হবে এছাড়া সে ধৈর্যবান, সাবধানী এবং অধ্যয়ণশীল হবে। এই ধরণের ব্রহ্মচারীরাই সিদ্ধি পায়। গৃহস্থের ব্যাপারে বলছেন, *ধর্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেৎ দদ্যাৎ সদৈবাতিথীন্ ভোজয়েশ্চ। অনাদদানশ্চ পরৈরদত্তং সৈষা গৃহস্থোপনিশৎ পুরাণী*।।১/৯১/৩। ধর্মের মাধ্যমে যে অর্থ আসছে সেই অর্থই গৃহস্থ উপার্জন করবে অধর্মের অর্থকে সে গ্রহণ করবে না। এই অর্থ দ্বারা গৃহস্থ যজ্ঞ করবে, দান করবে আর অতিথি সেবা করবে। গৃহস্থকে অপরিগ্রহ হতে হবে, মানে অপরের দান বা উপহার সহজে গ্রহণ করবে না। তবে খুব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তির থেকে উপহার নেওয়া যেতে পারে। বাণপ্রস্থীকে জঙ্গলে থাকতে হবে, নিজের খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরাকে নিয়মিত ও সন্তুলিত রাখতে হবে, যে কোন পাপকর্ম থেকে দূরে থাকবে, পুরোপুরি নিজের উপর নির্ভর করে চলতে হবে, কারুর মুখাপেক্ষি হবে না। সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যাপারে বলছেন *অশিল্পজীবী গুণবাংশ্চৈব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্বতো বিপ্রযুক্তঃ। অনোকশায়ী লঘুরল্পপ্রচারশ্চরন্ দেশানেকচরঃ স ভিক্ষুঃ।।*১/৯১/৫। সন্ন্যাসীকে অশিল্পজীবি হতে হবে, মানে সন্ন্যাসী কখন কোন অবস্থায় কোন ভাবে কোন শিল্প নিয়ে অর্থ উপার্জন করবে না। যেমন মহারাজরা বিভিন্ন জায়গায় ভাষণ দিতে যান, ভাষণ দেওয়াটা একটা শিল্প, ভাষণ দিয়ে কোন টাকা নিতে নিষেধ করা হচ্ছে, বা কোন লেখালেখি করে, সঙ্গীত পরিবেশন করে জীবন নির্বাহের জন্য কোন অর্থ রোজগার করবে না। শম-দমাদিতে সন্ন্যাসী পুরো প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সন্ন্যাসী কোন গৃহীর বাড়িতে কোন মতেই ঘুমোবে না বা রাত কাটাবে না। সন্ন্যাসী সম্পত্তির পরিমাণ কত হবে? তার সম্পত্তি ততটুকুই হবে যেটুকু সে নিজের কাঁধে বয়ে বেড়াতে পারবে। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) মাঝে মাঝে ওনার সব জিনিষকে একটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে তুলে দেখতেন ব্যাগটা নিয়ে তিনি হাঁটতে পারবেন কিনা। যখন তাঁর শরীর চলে গেল তখন দেখা গেল একটা জামা কাপড় শরীরে পরিধাণ করান আছে আর এক সেট পরিষ্কার জামা কাপড় ভাঁজ করে ব্যাগে রাখা আছে, এই তার পূর্ণ সম্পত্তি। সন্ন্যাসী একস্থানে কখনই থাকবে না, সব সময় পরিব্রাজন করবে। এসব শোনার পর অষ্টক ঋষি জিজ্ঞেস করছেন মুনি কাকে বলে? সন্ন্যাসী আর মুনি আলাদা, কোন গৃহস্থ একজন মুনি হয়ে যেতে পারে, একজন বাণপ্রস্থী সেও মুনি হয়ে যেতে পারে, আবার সন্ন্যাসীও মুনি হতে পারে। মুনি হচ্ছেন যিনি মননশীল সব সময় মনন করেন।

এখানে ব্যাসদেব খুব সুন্দর মুনির সংজ্ঞা দিচ্ছেন *ন গ্রাম্যমুপযুঞ্জীত য আরণ্যো মুনির্ভবেৎ। তথাস্য বসতোহরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্টতঃ।।*১/৯১/১১। জঙ্গলে বাস করার সময় যার কাছে গ্রাম পেছনে হয়ে যায়, গ্রামে বাস করার সময় যার কাছে জঙ্গল পেছন হয়ে যায় এরাই হচ্ছেন মুনি। এইটাই প্রতিভা, কাব্যিক মাধুর্যকে কিভাবে কৌশল করে একটা গভীর ভাবকে হেঁয়ালি করে বলে দিলেন। গ্রামে থাকার সময় তার জঙ্গল পেছনে আর জঙ্গলে থাকার সময় তার গ্রাম পেছনে হয়ে যায়। অষ্টক ঋষি বলছে, আপনি কি বলছেন, এটাতো ঠিক পরিষ্কার হল না। যখন তিনি জঙ্গেলে থাকেন তখন গ্রাম থেকে যে জিনিষগুলো আসতে থাকে সেই জিনিষগুলিকে তিনি কখন উপভোগ করেন না, এই কারণে বলা হয় জঙ্গলে থেকে গ্রামটা তার পেছনে চলে যায়। যখন গ্রামে থাকেন তখন বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করে গ্রামে থেকে যান, সেইজন্য বলা হয় তখন তার কাছে জঙ্গল পেছনে হয়ে যায়। মূল কথা তিনি গ্রামেই থাকুন আর জঙ্গলেই থাকুন সব সময় তিনি অনাসক্ত আর নিস্পৃহ ভাবে জীবন ধারণ করেন, আর কখনই কোন ভোগের দিকে তার দৃষ্টি যায় না, অথচ খুব সামান্য যতটুকু দরকার ততটুকুকে সম্বল করেই তিনি চলতে থাকেন।

মুনিদের কিছু আচারের কথা বলছেন *ধৌতদন্তং কৃত্তনখং সদা স্নাতমলংকৃতম্। অসিতং সিতকর্মাণাং কস্তমর্হতি নার্চিতুম্।। তপসা কর্শিতং ক্ষামঃ ক্ষীণমাংসাস্থিশোষিতঃ। স চ লোকমিমং জিত্বা লোকং বিজয়তে পরম্।।*১/৯১/১৫-১৬। দাঁত রোজ পরিষ্কার করে, মুনির জামা কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য সব শুদ্ধ থাকে, নখ নিয়মিত কাটা থাকে, নিয়মিত স্নান করা চুল কাটা এগুলো সবই করেন। তপস্যা করে করে যাঁর মাংস, রক্ত, হাড় সব ক্ষয় হয়ে শরীর কৃশ হয়ে গেছে, তিনিই ঠিক ঠিক মুনি। শেষ কথা বলছেন, যেটা অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি কিন্তু অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক কথা। *আস্যেন তু যদাহারং গোবন্মৃগয়তে মুনিঃ। অথাস্য লোকঃ সর্বোহয়ং সোহমৃতত্বায়*

কল্পতে। ।১/৯১/১৮। উচ্চতম মুনি আহার্য গ্রহণের জন্য নিজের হাতেরও সাহায্য নেন না, গরু মোষের মত মুখ দিয়েই খান। ত্যাগের এমন অবস্থায় চলে গেছেন যে খাবারটাও অতি সামান্য, মুখ দিয়ে আর কতটা খেতে পারবেন, অল্প একটু খাওয়া। এঁরাই সব লোককে জয় করে নেন আর মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেন। বাল্মীকি রামায়ণে নানান রকমের মুনির খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। এখানে এক ধরণের মুনির কথা বলা হচ্ছে যাঁরা হাত দিয়ে খান না। তাঁর তপস্যা এত হয়ে গেছে যে, খাবার দাবারের প্রতি স্পৃহা একেবারে চলে গেছে, শরীর রক্ষার জন্য একটু মুখ দিয়ে গরু মোষের মত খেয়ে নিল। এরপর অষ্টক ঋষিরা সবাই যযাতিকে বলছেন, আপনার পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেছে তার জন্য কিছু ভাববেন না, আমরা আমাদের পূণ্য থেকে কিছু পূণ্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যযাতি তাতে রাজী হলেন না।

ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শন ও ধর্মীয় রীতি নীতিতে মহাভারত যেটা দিয়ে গেছে সেটাই ভারতে থেকে গেছে, মহাভারত যা দেয়নি সে জিনিষ ভারতের মাটিতে স্থান পায়নি। মহাভারত ভগবান বিষ্ণুকে অবতার বানালো, বাল্মীকি রামায়ণেও বিষ্ণুকে অবতার করা হয়নি, সেখানে বিষ্ণু দেবতার অংশ বলা হয়েছে, কিন্তু অবতারের ধারণা প্রথম আমরা মহাভারতেই পাই, বিষ্ণুকে অবতার দেখানো হল। অথচ মহাভারতে শিবের অবতার নেই, শক্তির অবতার নেই, আজও তাই ভারতে শিবের অবতার ও শক্তির অবতার নেই, অবতার শুধু বিষ্ণুরই হয়ে থাকে। অথচ শিবের অংশ থেকে হচ্ছে, ঠাকুর নিজেই বলছেন বিষ্ণুর অংশ থেকে হলে ভক্তি হয়, শিবের অংশ থেকে হলে জ্ঞান হয়। কিন্তু শিব নিজে অবতার রূপ গ্রহণ করছেন দেখা যায় না, যদিও কখন সখন কাউকে বলা হয় শিব নিজেই হয়েছে, যেমন শঙ্করাচার্যকে শিবের অবতার বলা হয় কিন্তু শিব শঙ্করাচার্য হয়েছেন এটা খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি আর অবতার বলতে আমাদের যে ধারণা সেইভাবে হয়নি। অবতারের এই ধারণা মহাভারত থেকেই এসেছে। ঠিক তেমনি বর্ণাশ্রম ধর্মও মহাভারতের অবদান, মহাভারত যেটা দিয়েছে সেটাই ভারতে থেকে গেছে, মহাভারত যেটা দেয়নি হিন্দুরা সেটা নেয়নি। বাকি যা কিছু আছে সবই মহাভারতের এই কাঠামোর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

যযাতি ও কন্যা মাধবীর সংলাপ

এদিকে যযাতিকে সবাই যে যার পূণ্য দিতে চাইছেন কিন্তু যযাতি রাজী হচ্ছেন না। যেহেতু ইন্দ্রের কাছে যযাতি প্রার্থনা করেছিলেন আমি যেন সাধুদের মধ্যে থাকি। এখন তিনি পড়ছেন, একটা জায়গায় যজ্ঞ হচ্ছিল, তিনি এখন সেইদিকেই পড়তে থাকলেন। এখানে একটা তথ্য দেওয়া হচ্ছে যেটা মহাভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় না। বলছেন যেখান যজ্ঞ হচ্ছে সেখানে একজন তপস্বিনী তাঁর নাম মাধবী, তিনি নাকি যযাতির কন্যা। যযাতির কন্যা ছিল এই তথ্য আমরা এর আগে মহাভারতের কোথাও পাইনা কিন্তু দক্ষিণ ভারতের সংস্করণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মাধবীও এতদিনে বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। ইনি যেখানেই যান সেখানে তাঁর সাথে কয়েকটি হরিণ থাকে। এই মাধবীর সন্তানরাই এখানে বিরাট যজ্ঞ করছে। যযাতি সেখানে অবতরণ করছেন, মাধবী দেখেই যযাতিকে প্রণাম করছেন, মাধবীর সন্তানরা দেখে জিজ্ঞেস করছে, কাকে তুমি প্রণাম করছ মা। মাধবী সন্তানদের বলছেন, উনি হলেন আমার বাবা।

মহা তপস্বিনী মাধবী এখন তাঁর পিতা যযাতিকে বলছেন, আমি তপস্যার দ্বারা বিভিন্ন লোকের উপর আধিপত্য স্থাপিত করেছি। এটি খুব মজার ব্যাপার কিছু কিছু ধারণা যেটা বেদেই ছিল, সেই ধারণাটাই আবার মহাভারতে চলেছে। বেদের একটা ধারণা ছিল তপস্যার দ্বারা লোকের উপর অধিকার অর্জন করা। লোক অর্জন করা মানে, আমি এমন তপস্যা করলাম যার ফলে আমি এখন ঐ স্বর্গে স্থান পাওয়ার অধিকার পেয়ে গেলাম, ওখান থেকে আর কেউ আমাকে নামিয়ে দিতে পারবে না, মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই আমি ঐ স্বর্গে পৌঁছে যাব। মাধবী নিজের বাবাকে বলছেন, আপনি আমার এই পূণ্য সব নিন আর বেদবক্তারা বলেন পুত্র ও পৌত্ররা ধর্মাচরণ করে যে পূণ্য অর্জন করে সেই পূণ্যবলে তাদের পিতৃরা উদ্ধার পেয়ে যান। আমাদের প্রবাদই আছে কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বংশের একজন কেউ যদি ধর্মাচরণ করে, যারা ঠিক ঠিক ধার্মিক পুরুষ হয়ে যান তাঁর কুল পবিত্র হয়ে যায়। এটা অনেক সময় সন্ন্যাসীদের নামে বলা হয় যে, বংশের একজন কেউ যদি সন্ন্যাস হয়ে যায় তাহলে তার পূর্বপুরুষদের উদ্ধার হয়ে যায়। এর সাথে সন্ন্যাসীদের কোন সম্পর্ক নেই, মহাভারত বলছে যদি কেউ ধর্মাচারণ করে তাহলে তার কুল পবিত্র হয়ে যায়। বলছেন পুত্র আর পৌত্র এরাই উদ্ধার করে। মাধবী বলছেন, আমি আপনার কন্যা আর আমার যে সন্তান এরা আপনার দৌহিত্র, এদের দিয়েও আপনাকে পূণ্য দেওয়া যায়, বেদবেত্তারা এই রকমই বলেছেন। সচরাচর আমরা পাই, মহাভারতেও অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে যে পুত্র আর পৌত্রের যে পূণ্য অর্জন করে সেটা পিতৃরাও পেয়ে থাকেন। কিন্তু এখানেই আমরা প্রথম লিপিবদ্ধ ভাবে পাচ্ছি, যেখানে মাধবী বলছেন, বেদবেত্তা ঋষিরা বলেছেন, পুত্রী ও তার সন্তানরা যদি ধর্মাচরণ করে সেই পূণ্য তার মাতামহের কাছে যায়।

তার মানে মাধবী বলতে চাইছেন, আমি আর আমার সন্তানরা যে ধর্মাচরণ করেছি সেই পূণ্য দিয়ে আমরা আপনাকে উদ্ধার করছি।

মাধবীর কথা শুনে যযাতি বলছেন, বেশ বেশ, তোমার কথাতে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। কারণ আমার উদ্ধার আমার মেয়ে আর আমার দৌহিত্র করবে। এখানে কিন্তু আমাদের এই ভুল করলে চলবে না যে যযাতির ছেলেরা বেঁচে থাকতে কেন মাধবী আর তাঁর সন্তানরা যযাতিকে উদ্ধার করতে আসছে। যযাতির সন্তানররা জানেও না এদিকে কি হচ্ছে, যযাতির যে স্বর্গ থেকে পতন হচ্ছে তাও যযাতির নিজের পুত্ররা জানেনা। হঠাৎ যযাতি স্বর্গ থেকে পড়তে শুরু করেছে, অন্য দিকে তাঁর দৌহিত্ররা যজ্ঞ করছে, আর সেখানেই যযাতির পতন হচ্ছে। তখন কন্যা আর তাঁর সন্তানরা বলল, আপনার এই যে পতন হয়ে গেছে এই পতনটাকে আমরা আটকে দিচ্ছি। তখন যযাতি বলছেন – *তস্মাৎ পবিত্রং দৌহিত্রমদ্যপ্রভৃতি পৈতৃকে। ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ পিতৃণাং প্রীতিবর্ধনম্।।* এই যে আমার মেয়ে আর দৌহিত্ররা এত বড় কাজ করেছে, আজ থেকে দৌহিত্রও কুলের পরিত্রাণের ক্ষেত্রে পরম পবিত্র হয়ে যাবে। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এইখানে আমরা তার একটু আভাস পাচ্ছি। এতদিন যাবৎ শ্রাদ্ধাদিতে সন্তানরাই তারণ করে আসছিল, এখনও ছেলেরাই বাবা-মার শ্রাদ্ধাদি করে থাকে। কিন্তু আজ থেকে পিতৃকর্মে দৌহিত্র হল পরং পবিত্রম্। এই শ্লোকটাকে মাথায় নিয়ে যদি আমি চলি তাহলে আমার দৌহিত্রের দরকার হবে, দৌহিত্রের আগে আমার কন্যা সন্তানের দরকার। এইখানেই কন্যা সন্তানের গুরুত্ব বেড়ে গেল। আমরা এটা সবাই জানি, যখন কেই মারা যায় তড়িঘড়ি করে তার মেয়েকে আগে খবর দেওয়া হয় যাতে তার দৌহিত্ররা আসে। দৌহিত্ররা যদিও শ্রাদ্ধাদি কর্মে অংশ নেয় না, কিন্তু শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে দৌহিত্রের উপস্থিতিকে অত্যন্ত শুভ বলে এখনও মানা হয়। আর মৃত্যুর সময় মুখাগ্নি দেওয়ার অধিকার যেমন ছেলেকে দেওয়া হয়েছে, দৌহিত্রকেও সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে, এটা কিন্তু যযাতির অবদান। আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রকে দুটি শ্রেনীতে ভাগ করা হয়, একটা শ্রুতি আরেকটাকে বলা হয় স্মৃতি। বেদ উপনিষদ হল শ্রুতি শাস্ত্র, আর বেদ উপনিষদ বাদে যা কিছু আধ্যাত্মিক শাস্ত্র আছে তাকে স্মৃতি শাস্ত্র বলা হয়। শ্রুতি মানে যিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে আলোচনা করেন। যেমন বলছে সচ্চিদানন্দই সত্য বাকি সব অনিত্য, এই যে বাক্য এটা হয়ে গেছে শ্রুতি কথা, কথামৃত যেমন, কথামৃতের কথাগুলো শ্রুতি কথা। গীতা একদিকে যেমন স্মৃতি অন্য দিকে শ্রুতি, কারণ মহাভারতের অন্তর্গত বলে গীতা স্মৃতি, অথচ গীতার মধ্যে চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো আছে বলে গীতা শ্রুতি শাস্ত্র। এখন এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিরুপণের জন্য যে ধর্মের কথা বলা হয় সেটাই স্মৃতি শাস্ত্র হয়ে যায়। শ্রুতি কখনই পাল্টানো যায় না, শ্রুতি পাল্টালে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু স্মৃতি পাল্টাতে থাকে। স্মৃতি পাল্টায় যিনি ঋষি তাঁর কথার উপরে। কোন একজন ঋষি কোন একটা কথা বলে দিলেন, তখন থেকে সেটাই একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল। যযাতি একজন ঋষি, তিনি একটা বিধান দিয়ে দিলেন, এরপর থেকে দৌহিত্র যদি শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকে সেটা পরম পবিত্র পরম মঙ্গল। সেইদিন থেকে এটাই একটা নিয়ম হয়ে গেল। এখানে স্মৃতি পাল্টে গেল। এরপর আরেক জন বড় ঋষি এসে অন্য কিছু বিধান দিয়ে দেবেন তখন আবার নিয়মটা পাল্টে যাবে। এইভাবে স্মৃতি চলতে থাকে, আর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যও পাল্টাতে থাকে।

যযাতি আরও বলছেন, এর সাথে তিনটে জিনিষকে শ্রাদ্ধে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হবে। এখানে আমাদের একটা জিনিষ জানতে হবে, মানুষ যার দ্বারা নিজের সত্তা বা স্বভাবকে জানে সেই তাকে বলা হয় অধ্যাত্ম। যতক্ষণ আমার প্রকৃত স্বভাব ও সত্তাকে জানতে পারছি না, শুধু ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি, তখন তাকে বলা হয় ধর্ম। ধর্ম আর অধ্যাত্মের এইটাই মূল পার্থক্য। অধ্যাত্ম আমাকে আমার বাস্তবিক স্বরূপকে দেখিয়ে দেয়। ধর্ম আমাকে দেখায়, যতক্ষণ আমার এই বাস্তবিক স্বরূপের সাথে এক না হয়ে যাচ্ছি, এক হয়ে যাওয়ার সাধনা শুরু না করা হচ্ছে, ততক্ষণ আমি কি ভাবে জীবন যাপন করব। ধর্মে আমি ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি, আর অধ্যাত্মতে ঈশ্বর আমাকে ধরে নিয়েছেন। উপনিষদ পুরোপুরি অধ্যাত্ম, কথামৃতও সম্পূর্ণ রূপে অধ্যাত্ম। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই অধ্যাত্মকে ধারণা করতে পারেনা, মুখে যতই বলুক জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরই সত্য, কিন্তু এগুলো কার্যে পরিণত করা যায় না। তখন মানুষকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, এতটা জপ করতে হবে, এতটা দান করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, এত উপবাস করতে হবে ইত্যাদি। এগুলোকেই বলা হয় ধর্ম। মহাভারতে অধ্যাত্ম আর ধর্ম এই দুটোকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছে।

এখানে বলছেন দৌহিত্র যদি শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকে তাহলে সেই শ্রাদ্ধ অত্যন্ত পবিত্র ও শুভ হয়। শ্রাদ্ধ করতে তিনটে জিনিষ লাগবে, দৌহিত্র, কুতপ আর তিল। তার সঙ্গে তিনটে গুণ পবিত্রতা, অক্রোধ আর অস্থির চিত্তের অভাব।

শ্রাদ্ধের সময় কোন ক্রোধ করা যাবে না, পবিত্র ভাবে থাকবে আর কোন ধরণের ছটফটানি থাকবে না। শ্রাদ্ধের সময় তিন ধরণের মানুষকে পবিত্র বলে মনে করা হবে, যারা শ্রাদ্ধের অন্ন গ্রহণ করছে, শ্রাদ্ধে যারা খাওয়াচ্ছে, শ্রাদ্ধের সময় পৌরানিক কাহিনীর পাঠ যারা শ্রবণ করছে। কুতপ হচ্ছে, দিনের শেষে অর্থাৎ পড়ন্ত বেলায় যখন সূর্যের তাপ কমতে শুরু করে সেটাকে বলা হয় কুতপ। এই সময় শ্রাদ্ধ করলে পিতৃদের যেটা অর্পণ করা হয় সেটা অক্ষয় হয়ে যায়। শ্রাদ্ধ তাই সব সময় বারোটার পরে অপরাহ্নে করা হয়। বারোটার পরে যে অন্ন দেওয়া হয় সেই অন্নকে এমনিতেই বলা হয় পিতৃদের অন্ন। সেইজন্য ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া বা বাড়ির খাওয়া-দাওয়া সব বারোটার আগেই করে নিতে হয়, খুব জোর সাড়ে বারোটা, এর পর যেই তাপ কমতে শুরু করল তখনই সেটা পিতৃদের অন্ন হয়ে গেল। পিতৃদের অন্ন্য খেলে পিতৃদের দিকে মন চলে যায়, ঈশ্বরের দিকে মন যেতে চায় না। আড়াইটার পরে পিতৃদের পূজার সব থেকে ভালো সময়। এগুলো কেন বিধান হয়েছে আমাদের জানা নাই, পরম্পরাতে চলে আসছে। একটা ভালো যুক্তি হতে পারে, আগেকার দিনে যে ব্রাহ্মণরা পূজো করতেন তাদের সবারই বাড়িতে সকাল বেলা পূজো পাঠ করতে হত, যতই হোক পিতৃপূজো অন্যান্য পূজো থেকে একটু নগণ্য মনে করা হয়, তাই সকালের দিকে যদি শ্রাদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া হলে অন্যান্য নিত্য পূজোগুলোতে গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। তবে এখানে যেটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্ন গ্রহণ করছে, যারা শ্রাদ্ধ অন্ন পরিবেশন করছে আর যারা পাঠ শুনছে এই তিনজন অত্যন্ত পবিত্র। ঠাকুর এসে শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্ন খেতে নিষেধ করছেন। স্বামী ভূতেশানন্দজীকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত মহারাজ শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্ন খাবো কিনা, তিনি প্রচণ্ড রেগে যেতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতেন, আর কোন প্রশ্ন না এসে তোমার মনে এই প্রশ্নটাই এলো। আসলে ঠাকুর নিষেধ করছেন এই কারণে যে, যে রকমটি অন্ন তুমি খাবে সেই রকমটি তোমার স্বভাব হবে। পিতৃদের অর্পিত অন্ন খেলে মানুষ পিতৃলোকে যায়। শ্রাদ্ধাদির অন্ন পিতৃদের অর্পণ করা হয়, এখন যার অন্ন তুমি খাবে তুমি তার সত্তা পাবে। পিতৃদের অন্ন খেলে পিতৃলোকে যাবে। তোমার উদ্দেশ্যটা কি? যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় বিষ্ণুলোকে যাওয়া, তাহলে বিষ্ণুকে দেওয়া অন্ন খেতে হবে, তখন পিতৃদের দেওয়া অন্ন খেলে বিষ্ণুলোকে যাওয়াটা আটকে যাবে। যদি আপনার উদ্দেশ্য ভক্তি লাভ হয় তাহলে ব্রহ্মার্পণং করে খেতে হবে। শ্রাদ্ধের অন্ন ব্রহ্মার্পণং করে খাওয়া যায় না, কারণ ওটা তখন পিতৃ অন্ন হয়ে গেছে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চাইছেন, আত্মজ্ঞানের পথিক তিনি ঈশ্বরকে দেওয়া অন্ন ছাড়া অন্য কোন অন্ন গ্রহণ করবেন না।

স্বামী তপস্যানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি খুব বড় পণ্ডিত আর উচ্চকোটির সন্ন্যাসী ছিলেন। চেন্নাই মঠের তিনি অধ্যক্ষ থাকাকালীন একবার বেলুড় মঠে এসেছেন। সেই সময় অদ্বৈত মঠের একজন অত্যুৎসাহী ব্রহ্মচারী বেলুড় মঠে মহারাজকে প্রণাম করার পর মহারাজকে বলছেন, মহারাজ একদিন আপনি অদ্বৈত আশ্রমে আসুন। যেখানে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ উপস্থিত আছেন সেখানে ব্রহ্মচারীর কোন অধিকার নেই তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর। উনি কিন্তু এটা বললেন না যে তোমার কি অধিকার আছে আমন্ত্রণ জানানোর। কিন্তু তিনি খুব সুন্দর করে বললেন 'আমি অদ্বৈত আশ্রমে যাবো, কিন্তু তুমি আমাকে ওখানে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াতে পারবে তো'। আমরা জানি সব মঠের অন্নই তো ঠাকুরের প্রসাদ। মহারাজ বলছেন আমি এখন ঠাকুরের নিবেদিত অন্ন ছাড়া আর কিছু খাই না। চেন্নাই মঠ আর বেলুড় মঠ এই দুই জায়গাতেই ঠাকুরের পূজো হয়। অন্য আশ্রমে ভাইস-প্রেসিডেন্ট গেলে সেখানে ঠাকুরকে অন্ন নিবেদন করে ভোগ দেওয়া হয়। অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরের কোন পূজা অর্চনা হয় না, এখানে ঠাকুরের অন্ন হয় না, ব্রহ্মার্পণং করে খাওয়া হয়, ঠাকুরের সরাসরি প্রসাদ হল না। শুদ্ধ অন্ন হল না। ঠাকুরও বলছেন, বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন, কারণ বলরামের বাড়িতে নিত্য পূজাতে জগন্নাথকে অন্ন নিবেদন করা হয়। যারা সন্ন্যাসী তাদের কাছে পিতৃদের দেওয়া অন্ন অশুদ্ধ অন্ন। সন্ন্যাসীদের কাছে গৃহস্থ বাড়ির অন্নও অশুদ্ধ অন্ন। এখন এক যদি বাড়িতে বিরাট কোন নারায়ণ পূজো করে বা ঠাকুরের পূজো করে, আলাদা বাসনে রান্না করে আলাদা থালা বাটিতে করে ঠাকুরকে নিবেদন করা হয় তখন সেই অন্ন সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করতে পারে। এখানে অশুদ্ধ অন্নের ব্যাপারে মহারাজ বলতে চাইছেন, যে পাত্রতে তারা নিজেরা খাচ্ছে, যে উনুনে নিজেদের রান্না করছে, সেই পাত্রে আর সেই উনুনে রান্না করা দ্রব্য ঠাকুরের ভোগ দেওয়া যেতে পারেনা। মঠের যেখানে যেখানে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয় সেখানে ঠাকুরের সব কিছু আলাদা, উনুন আলাদা, পাত্র আলাদা। সন্ন্যাসীদের অশুদ্ধ অন্ন খেতে নেই, খেলেই তাদের বিঘ্ন হবে আর তাদের বুদ্ধিটাও অন্য রকম হয়ে যাবে, হতে বাধ্য। ঠাকুর এই কারণেই পিতৃদের অন্ন খেতে নিষেধ করছেন, তুমি যদি পিতৃদের অন্ন খাও তাহলে তোমার মনটা পিতৃদের মত হয়ে যাবে, যদি তুমি ঈশ্বরের পথে থাকতে চাও তাহলে তা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু তুমি যত রকমের নোংরামি করবে, চুরি করবে, মিথ্যে কথা বলবে সবই করবে আর শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্ন খাওয়ার সময় বলবে ঠাকুর নিষেধ করেছে, এগুলোই হল শঠতা। এগুলোই মানুষকে আরও পতনের দিকে নিয়ে যায়। যারা ঠিক ঠিক হিন্দু তাদের শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্নে কোন আপত্তি থাকে না। কিন্তু যারা পুরো ঈশ্বর পথের পথিক, যাদের মনে এই ভাব এসে গেছে এই জগতে ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কেউ নেই তাদের

আর অশুদ্ধ অন্ন খেতে নেই। সে যেমন অপরের উচ্ছিষ্ট খাবে না, ঠিক তেমনি শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্ন খাবে না বা কোন গৃহস্থ বাড়ির অন্ন খাবে না।

শ্রাদ্ধে যে তিল ব্যবহারকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় তার কারণ তিল পিশাচাদি থেকে রক্ষা করে। শ্রাদ্ধটা করা হচ্ছে পিতৃদের মৃত শরীরের অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্য, এই সময় পিশাচরা শ্রাদ্ধের যজ্ঞে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে আর না হলে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। আমাদের পরম্পারতে একটা বিশ্বাস চলে আসছে যে, তিল থাকলে পিশাচরা যজ্ঞের কোন ক্ষতি বা বিঘ্ন করতে পারেনা। এই জন্য এখনও সব শ্রাদ্ধে তিল একটি বাধ্যতামূলক মঙ্গলকারী দ্রব্য। কাউকে তিল দিয়ে দেওয়া মানে তাকে ত্যাগ করে দেওয়া হল, এখান থেকেই তিলাঞ্জলী এসেছে। কেউ হয়ত খুব সিগারেট খেত কিন্তু ইদানিং ধূমপান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কি হল আপনি আজকাল সিগারেট খাচ্ছেন না? সে তখন বলে আমি সিগারেটকে তিলাঞ্জলী দিয়ে দিয়েছি। তিল দানকে খুব উচ্চ ধরণের দান বলে গণ্য করা হয়। কাউকে আমি হয়তো খুব সম্মান দিতে চাইছি, তখন তাকে তিল অর্পণ করা মানে তাকে আমি আমার সর্বোচ্চ সম্মান জানালাম। এই দিক থেকে তিল অর্পণ আর তিলাঞ্জলী দুটো আলাদা ব্যাপার। আগেকার দিনে কাউকে তিল দান করা হলে বলা হয় সেটা স্বর্ণ দানের সমতুল্য। শ্রাদ্ধের সময় তিল দুই ভাবে কাজ করে, এক তিল পিশাচদের থেকে রক্ষা করছে আর তিল যদি কোন উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের কেউ খায় তাহলে তার পুরো বংশের রক্ষা হবে। শ্রাদ্ধের সময় তুমি যদি কোন ভাবে কোন যতি, ঋষি বা মুনিকে ধরে নিয়ে আসতে পার, আর তিনি যতটুকু গ্রহণ করলেন সেটুকু অক্ষয় হয়ে থাকবে। অন্য দিকে ঋষি মুনিদের বলা হয় তোমরা কিছু শ্রাদ্ধ বাড়ি থেকে দূরে থাকবে। ঋষি মুনিরা নিজেদের পূণ্যকে শ্রাদ্ধের অন্নে নাশ হতে দেবেন না, আবার অন্য দিকে শ্রাদ্ধ বাড়ির লোকেরা চাইছে পূণ্য হোক। মহাভারত হল দরজার মত, মহাভারত একদিকে বৈদিক যুগের আচার প্রথাকে যুগোপযোগি করে নিচ্ছে অন্য দিকে নতুন হিন্দুধর্ম ও তার নতুন চিন্তা ভাবনাকে স্থান দিচ্ছে। মহাভারত সন্ন্যাসীদের জোর করছে না যে তুমি শ্রাদ্ধের অন্ন খাবে না তাহলে তুমি তোমার লক্ষ্য থেকে দূরে চলে যাবে, কারণ মহাভারত জনসাধারণের জন্য এই নতুন চিন্তা ভাবনাকে নিয়ে আসছে। অন্য দিকে মহাভারতের আগে রচিত মুণ্ডোকপনিষদে এই পিতৃকর্ম, শ্রাদ্ধকর্মের যজ্ঞ-যাগের ঘোর নিন্দা করা হয়েছে। সেখানে বলছে এগুলো দিয়ে তোমার পিতৃরা তোমাকে মৃত্যুর পর তাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে যাতে পিতৃলোকের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, কারণ তাদেরও লোকবলের দরকার। মৃত্যুর পর তোমার আত্মাকে তারা তাদের কাছে টানতে থাকবে। পিতৃলোক অনেক নীচে, তোমাকে সব সময় উপরের দিকে যেতে হবে। যেমন সন্ন্যাসীরা যখন ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসে তখন মা-বাবা ভাই বোনেরা কত নিন্দা করে, কত করে বোঝায়, তারা চাইছে সে তাদের কাছেই থাকুক। সন্ন্যাসী বলছে, আমি এই সংসারে আর বাধা হয়ে পড়ে থাকতে চাইছি না, আমি চললাম। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক যাত্রা পথেও এই জিনিষটাই হয়, মৃত্যুর পর তার পিতৃরাও তাকে তাদের কাছে বেঁধে রাখতে চায়, কিন্তু তাকে সন্ন্যাসীর মত সব ফেলে দিয়ে এগোতে হবে। যে হিন্দুরা পারবারিক জীবন যাপন করছেন বা করতে চাইছেন মহাভারত তাদের জন্য এই কথা গুলো এখানে আলোচনা করছে।

এরপর অষ্টক ঋষি বলছেন, আমরা এত তপস্যা করলাম কিন্তু শিবি আমাদের ছেড়ে এত উপরে কি করে চলে গেল? তখন যযাতি বলছেন, ব্রহ্মলোক পাওয়ার জন্য শিবি সর্বস্ব দান করেছেন সেইজন্যই তিনি এগিয়ে গেছেন। এখানে এটাই বলতে চাইছে, যতই যজ্ঞ করা হোক, যতই তপস্যা করা হোক তার থেকে সর্বস্ব দান শ্রেষ্ঠ। যখন কেউ সর্বস্ব দান করে দিল তখন এই কর্মই তাকে ঠেলে সবার থেকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। এর আগে মহাভারত শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কাহিনীতে বলছে, বাড়ির মঙ্গলের জন্য একজনকে ত্যাগ কর, গ্রামের মঙ্গলের জন্য একটা পরিবারকে ত্যাগ কর, জনপদের জন্য একটা গ্রামকে ত্যাগ কর আর নিজের আত্মকল্যাণের জন্য পুরো জগতকে ত্যাগ কর। পুরো জগতকে ত্যাগ মানেই সর্বস্ব ত্যাগ। শিবি রাজা তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়েছেন সেইজন্য তাঁর সঙ্গে আর কেউ টেক্কা দিতে পারবে না।

শান্তনু, গঙ্গা ও সত্যবতীর কাহিনী

(ভীষ্মের জন্ম – মৎস্যগন্ধাকে পরাশর মুনির বরদান – ব্যাসদেবের জন্ম – সত্যবতীকে শান্তনুর বিবাহের প্রস্তাব –নিষাদরাজের শর্ত – ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা – চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম)

এরপর বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে যযাতির থেকে পুরু, পুরু থেকে বিরাট বংশতালিকার বর্ণনা করছেন। এইভাবে বর্ণনা করতে করতে এসে সেইখানে এসে পৌঁছেছেন যেখানে দেখানো হচ্ছে শান্তনু এখন রাজা হয়েছেন। শান্তনু হলেন যযাতির বংশধর। এখান থেকেই ঠিক ঠিক মহাভারতের কাহিনী শুরু হয়। মহাভারতের এই কাহিনীগুলো সেই সময়কার যখন স্বর্গের দেবী দেবতারা সশরীরের ঘুরে বেড়াতেন। এই ব্যাপারে মহাভারতই শেষ গ্রন্থ যেখানে দেবী দেবতারা এই

ভাবে সশরীরের ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এর পরে আমরা আর কোথাও এই জিনিষ পাইনা। এখানে আমরা পাই শান্তনু আর গঙ্গার কাহিনী। এই গঙ্গা কোন নারীর নাম, নাকি গঙ্গা নদীকে মাতৃ রূপে দেখানো হচ্ছে এটা আমাদের জানা নেই। তবে গঙ্গা নদীকে মাতৃরূপে অনেক জায়গাতেই বর্ণনা করা হয়েছে। সব জায়গাতে গঙ্গাকে মা রূপেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে গঙ্গা শান্তনুকে বিয়ে করেছেন। কারণ মহর্ষি বশিষ্ঠ মুনির এক অভিশাপ ছিল যার জন্য গঙ্গাকে অষ্টবসুর সবাইকে নরদেহ ধারণ করাবার জন্য জন্ম দিতে হবে। শান্তনু আর গঙ্গা থেকে দেবব্রত বা ভীষ্মের জন্ম হল। দেবতারা যেমন এক ধরণের দিব্য প্রাণি বসুরাও সেই রকম এক শ্রেনীর দিব্য প্রাণি, তবে দেবতাদের থেকে একটু নীচে।

অন্য দিকে সত্যবতীর কাহিনী আসছে। সত্যবতী ছিলেন এক মৎস্যকন্যা, আগে তাঁর নাম ছিল মৎস্যগন্ধা, তখন তাঁর শরীরে মাছের আঁষটে গন্ধ ছিল। পরাশর মুনি এই মৎস্যগন্ধার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবেসেছেন। মৎস্যগন্ধা খুব কান্নাকাটি করছে আমার বাবা আমাকে কি বলবে ইত্যাদি। পরাশর মুনি তাকে আশ্বস্ত করে বলছেন, তোমার থেকে আমার এক সন্তান হবে ঠিকই, কিন্তু সন্তান হওয়ার পরও তুমি কুমারীই থেকে যাবে। সেখান থেকে ব্যাসদেবের জন্ম। পরাশর মুনি নৌকা করে যমুনা পারাপার করতেন, মৎস্যগন্ধা নৌকা চালাত, এরা দুজনে একাই থাকতো। পরাশর মুনি ছিলেন একজন বড় ঋষি, কিন্তু এক সুন্দরী নারীকে দেখে দুর্বল হয়ে গেছেন। কিন্তু বড় ঋষি বলে তার বিরাট যোগশক্তি ছিল, তিনি মৎস্যগন্ধাকে বললেন আমি তোমাকে কয়েকটি বর দিলাম, এই নাও আমি কুয়াশার সৃষ্টি করে দিলাম, নৌকাতে আমরা কি করছি কেউ দেখতেই পাবে না। দ্বিতীয় বর, তোমার সন্তান হলেও তুমি কুমারীই থেকে যাবে। তৃতীয় বর, তোমার যে সন্তান হবে সে একজন বিরাট বড় ঋষি হবে। চতুর্থ বর, তোমার শরীরে যে মাছের দুর্গন্ধ সেটা দূর হয়ে তোমার শরীরের সুগন্ধ হয়ে যাবে। এরপর মৎস্যগন্ধার নাম হয়ে গেল সত্যবতী।

সত্যবতীর গায়ের সুগন্ধের খবর এমন চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে যে শান্তনুর কাছেও খবর চলে গেছে। শান্তনুও পৌঁছে গেছেন। সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শান্তনু তাকে বিয়ে করতে চাইছে। সত্যবতী আসলে ছিল জেলের কন্যা, আর মাঝিদের মত নৌকা করে লোকেদের পারাপার করাত। শান্তনু সত্যবতীর বাবাকে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সত্যবতীর বাবা ছিল নিষাদরাজ। নিষাদরাজ বলছে আমার এই মেয়েটি খুব উচ্চবংশের মেয়ে। তবে এখানে নিষাদরাজের এই মন্তব্যের কোন বর্ণনা কোথাও দেওয়া হয়নি। সত্যবতীর বাবা শান্তনুকে মেয়ে দিতে রাজী হয়েছেন কিন্তু তার জন্য একটা শর্ত রেখেছেন, আমার মেয়ের যে ছেলে হবে তাকেই রাজা করতে হবে। শান্তনু সেটা কিছুতেই হতে দেবেনা, কারণ গঙ্গাপুত্র দেবব্রত জেষ্ঠ্য সন্তান, তারই রাজা হওয়ার কথা। শান্তনু বাড়ি ফিরে এসেছে। দেবব্রত দেখছে বাবা দিন দিন যেন কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছেন, কোন আমোদ আহ্লাদ করছেন, সব সময় বিমর্ষ দেখাচ্ছে। দেবব্রত সব খোঁজ খবর নিয়ে এর কারণ জানতেই সোজা সত্যবতীর বাবার কাছে পৌঁছে গেছে, আপনার মেয়েকে আমার বাবার জন্য চাই। সত্যবতীর বাবা বলছে, আমার তো পরিষ্কার শর্ত ছিল আমার মেয়ের যে ছেলে হবে তাকেই রাজা করতে হবে। দেবব্রত বলল, ঠিক আছে তাই হবে আমি কথা দিলাম আমি কখন রাজা হব না। বাবা বলছে, সেতো তুমি বলে দিলে, কিন্তু তোমার যখন বিয়ে হবে তার থেকে যে তোমার সন্তানদের জন্ম হবে তাদের সাথে আমার মেয়ের ছেলের সাথে রাজা হওয়া নিয়েতো মারামারি লেগেই থাকবে। দেবব্রত তখন বলল, ঠিক আছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি জীবনে কোন দিন বিয়েই করবো না। তখনকার দিনে এই রকম শক্তিমান যৌবন প্রাপ্ত কেউ প্রতিজ্ঞা করবে আমি বিয়ে করব না ভাবাই যেত না। তখন দেবতারা এসে বললেন, এই রকম প্রতিজ্ঞা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি, আজ থেকে তোমার নাম হল ভীষ্ম। সেই থেকে দেবব্রতের নাম ভীষ্ম হয়ে গেল। ভীষ্ম এখন সত্যবতীকে বলছেন, মা, আপনি এই রথে আরোহণ করুন, আমি এক্ষুণি আপনাকে আমার বাবার কাছে নিয়ে যেতে চাই। শান্তনু যখন শুনলেন দেবব্রত এই রকম কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছে তখন তিনিও ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যুর বরদান দিলেন। তোমাকে কেউ মারতে পারবে না, তুমি যখন নিজে থেকে বলবে আমি শরীর ছাড়ব তখনই তুমি মারা যাবে।

বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যাভিষেক এবং বিবাহ *(চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু – স্বয়ম্বর থেকে বলপূর্বক তিন কন্যাকে ভীষ্ম কর্তৃক হরণ – বিভিন্ন বিবাহ প্রথা – ভীষ্মের প্রতি অম্বার ক্রোধ ও অভিশাপ – বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম)*

এদিকে সত্যবতী থেকে আগেই ব্যাসদেবের জন্ম হয়ে গেছে। জন্ম থেকেই তিনি সব কিছুর জ্ঞাতা। জন্ম নিয়েই ব্যাসদেব সোজা মাকে বলছেন, মা, আমি চললাম, যখনই তোমার আমাকে প্রয়োজন মনে করবে তখনই আমাকে স্মরণ করলে তোমার সেবার জন্য আমি চলে আসব। সত্যবতীর যখন শান্তনুর সঙ্গে বিয়ে হল সেখান থেকে তার দুটি সন্তান জন্ম নিল, একজন চিত্রাঙ্গদ আরেকজন বিচিত্রবীর্য্য। চিত্রাঙ্গদের যখন খুব কম বয়স সেই সময় গন্ধর্বদের সাথে একটা যুদ্ধ

করতে গিয়ে মারা যায়। এরপর বিচিত্রবীর্য্যকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হল। ভীষ্ম আর মা সত্যবতী দুজনের পরামর্শ করে রাজ্য চালাচ্ছেন। বিচিত্রবীর্য্যের তরুণ বয়স প্রাপ্ত হলে সত্যবতী ভীষ্মকে তার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে বললেন। এদিকে কাশীরাজের তিন মেয়ের স্বয়ম্বর চলছিল, ভীষ্ম গিয়ে জোর করে তিন বোনকেই স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান থেকে নিজের ছোট ভাইয়ের জন্য তুলে আনেন। এই তিন বোনের নাম অম্বা, অম্বালিকা আর অম্বিকা। কাশীরাজের ওখানে যখন ভীষ্মের সাথে সব রাজাদের লড়াই হবার উপক্রম হয়েছে তখন ভীষ্ম সেখানে কয়েক রকমের বিয়ের কথা বলছেন। তার মধ্যে একটা বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হয়, এই প্রথায় মেয়েকে খুব সুন্দর করে অলঙ্কারাদির দ্বারা সাজিয়ে আর ছেলেকে কিছু অর্থ দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় ছেলের পক্ষ থেকে একটা গরু বা অন্য কোন সম্পদ মেয়ে পক্ষের হাতে তুলে দিয়ে মেয়েকে চেয়ে নেয়, এই বিবাহকে বলা হয় আর্ষ বিবাহ। এই দুটো প্রথাই আমাদের দেশে চালু আছে, একটাতে ছেলেকে টাকা দেওয়া হয় আরেকটিতে মেয়েকে টাকা দিতে হয়। আবার অনেকে টাকা আদায় করে মেয়েকে বিয়ে দেয়, আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছো, তাহলে আমাকে এক লাখ টাকা দিতে হবে, এটাকে বলা হয় আসুর বিবাহ। গায়ের জোরে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে আসে, একে বলা হয় রাক্ষস বিবাহ। ছেলে আর মেয়ে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করছে এটাক বলছে গান্ধর্ব বিবাহ। অনেক সময় মেয়েকে কিছু খাইয়ে বা অন্য কিছু করে অচেতন করে তুলে নিয়ে গেল, একে বলছে পৈশাচ বিবাহ। এই রকম অনেক রকম বিবাহের কথা বলা হচ্ছে, এই রকম প্রাজাপত্য বিবাহ, দৈব বিবাহ ইত্যাদিও আছে, মনুস্মৃতিতে এগুলোর বিশদ আলোচনা আছে।

ভীষ্মও এসে সবাইকে হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, আমি এসে গেছি, তোমাদের পরাস্ত করে আমি এই তিনটি মেয়েকে নিয়ে যাব। সেই সময় ক্ষত্রিয়দের এই অধিকার ছিল, তারা ইচ্ছে করলে জোর করে দরকার হলে লড়াই করে নিজের জন্য বা তার পরিবারের কারুর জন্য মেয়েকে তুলে আনতে পারত। ব্রাহ্মণদের এই ধরণের অনুমতি ছিল না। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এখানে ভীষ্ম এটাই করেছেন, পরে শ্রীকৃষ্ণও করেছেন আবার অর্জুনও করেছেন। এই তিন বোনের মধ্যে অম্বা বলছে, আমি শাল্ব রাজাকে মনে মনে ভালোবেসেছি, আমি তাকেই বিয়ে করতে চাই। ভীষ্মও সঙ্গে সঙ্গে অম্বাকে বলে দিল, যাও, তোমাকে শাল্বের কাছেই যেতে বলছি। অম্বা এখন শাল্বের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। শাল্ব বলছে, ছিঃ তোমাকে ভীষ্ম অপহরণ করে নিয়েছে আর ভীষ্ম আমাদের পরাস্ত করেছে তুমি এখন ভীষ্মের সম্পদ, আমি আর তোমাকে গ্রহণ করতে পারিনা, তুমি ভীষ্মের কাছেই ফিরে যাও। অম্বা আবার ভীষ্মের কাছে ফিরে এসেছে, ভীষ্ম বলছেন, তোমার মন শাল্বের কাছে পরে আছে, আমি তোমাকে নিতে পারিনা। এদিকে ভীষ্মও অম্বাকে গ্রহণ করতে চাইছে না, কারণ শাল্বকে সে মনে মনে পতি রূপে বরণ করে নিয়েছে। তখন অম্বা প্রচণ্ড রেগে গেছে – আমার জীবনকে ভীষ্ম নষ্ট করে দিয়েছে, আমাকে অপমানিত করেছে, আমিও এর প্রতিশোধ নেব। অম্বা তখন প্রচণ্ড তপস্যা করতে লাগল। তপস্যা করে সে বর পেয়ে গেল, কিন্তু অম্বাকে বলা হল ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু তাই তুমি ওকে কখন বধ করতে পারবে না, কিন্তু ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবে তুমি। এরপর অম্বা দ্রুপদ রাজার ঘরে শিখণ্ডী হয়ে জন্ম নিল, কিন্তু জন্ম থেকেই শিখণ্ডী নপুংসক ছিল। ভীষ্ম অম্বার সব ঘটনা জানতেন, অম্বা তপস্যা করে যে বর পেয়েছে আর সে শিখণ্ডী হয়ে পুরুষ শরীর নিয়ে জন্মেছে সেই খবর ভীষ্ম জানতেন। তিনি জানেন অম্বাই ওখানে জন্মেছে আর তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল কোন মেয়ের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করবেন না।

অন্য দিকে অম্বালিকা আর অম্বিকা বিচিত্রবীর্য্যের স্ত্রী হয়ে গেল। কিছু দিন পর বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সেই মারা গেল। আগেই চিত্রাঙ্গদ মারা গেছে, এখন বিচিত্রবীর্য্যেরও মৃত্যু হয়ে গেল, বংশ রক্ষা আর হল না। সত্যবতী ভীষ্মকে অনেক করে বলছেন বিয়ে করতে, কিন্তু ভীষ্মের ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা। বিয়ের কোন প্রশ্নই নেই, আমার ধর্ম আমি ছাড়বো না। সত্যবতী তখন ভীষ্মকে বললেন, তাহলে তুমি নিয়োগ বিধির ব্যবস্থা করে অম্বালিকা আর অম্বিকার সন্তানের ব্যবস্থা কর। নিয়োগ বিধিতে ভাড়াতে কোন পুরুষকে নিয়ে আসা হয়। এখানেও ভীষ্ম বললেন, আমি এসবের মধ্যে নেই। মহা সঙ্কট উপস্থিত হয়ে গেছে। সত্যবতীর তখন তাঁর সন্তান ব্যাসদেবের কথা মনে পড়ল। সত্যবতী তখন ভীষ্মকে ব্যাসদেবের ইতিহাস বললেন, আমার বিয়ের আগে আমি ব্যাসদেবকে জন্ম দিয়েছিলাম, যদি ব্যাসদেবকে নিয়োগ প্রথাতে লাগানো যায়। ভীষ্ম বললেন, খুব ভালো কথা, এতে আমার কোন আপত্তি নেই। এরপর সত্যবতী ব্যাসদেবকে স্মরণ করা মাত্র তিনি এসে গেছেন। মহাভারতের এখানে ব্যাসদেবকে কুরূপ বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। যিনি সত্যবতীর মত রূপসীর সন্তান আর পরাশরের মত ঋষি যাঁর পিতা, তাঁর এত কুরূপ হবে এটা ঠিক যেন বিশ্বাস হতে মন চায়না। যাই হোক ব্যাসদেবের বিরাট লম্বা লম্বা দাড়ি গায়ের রং কুচকুচে কালো, দেখতে একেবারে কুৎসিত। ব্যাসদেব সত্যবতীকে বললেন – মা, আমি আজকেই সন্তানের জন্ম দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তোমার পুত্রবধুদের আগে শুদ্ধ হতে হবে, কারণ এর আগে ওরা বিচিত্রবীর্য্যের সাথে ছিল কিনা। তোমার বউমাদের সাথে আমি এইভাবে সমাগম করতে পারিনা, অন্তত এক বছর এদের

শুদ্ধ পবিত্র ভাবে থাকতে হবে। ব্যাসদেবের কথাতে আবার সঙ্কট এসে গেছে, সত্যবতী বলছেন, দেখো বাবা, তোমাকে আজকেই কিছু করে দিতে হবে, কারণ এরা এখন বিধবা, বিধবাদের এই ভাবে ফেলে রাখা যায় না। আজকে ওরা বিধবা হয়েছে আর তাদের পাঁচ বছর পর সন্তান হবে কি হবে না তারও কোন ঠিক নেই। নিয়োগ বিধিতে যা করার তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে, স্বামীর মৃত্যুর পর এক মাস কি দু মাসের মধ্যে যা করার করে নিতে হবে। নিয়োগ বিধিতে নিয়ম হচ্ছে, মেয়ে অন্ধকারে যাবে, মেয়ের সারা অঙ্গে তেল বা ঘি মাখানো থাকবে, আর কোন ধরণের কাম-বাসনা থাকবে না। তার বদলে পুরুষকে কিছু অর্থ দিতে হবে। অন্তঃসত্ত্বার খবর হয়ে গেলেই সেই পুরুষকে বিদায় করে দেওয়া হত। অনেক সময় সেই পুরুষকে বলা হয় তুমি একে তোমার পুত্রবধুর মত দেখবে। সেদিন অম্বালিকা আর অম্বিকাকে ডেকে সত্যবতী বলে দিল, দেখো মা, আজ রাতে তোমাদের ভাসুর তোমাদের কাছে যাবে, তোমাদের জন্য তাঁকে নিয়োগ বিধিতে নিয়োগ করা হয়েছে। এরা শুনে খুব উত্তেজিত হয়েছে, এরা মনে করেছে ভীষ্ম সেই পুরুষ, ব্যাসদেবের কথা মাথায় আসেনি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে ব্যাসদেবকে দেখে অম্বিকা ভয়ে তো চোখ বন্ধ করে দিয়েছে, এখন তার সন্তান হল কিন্তু অন্ধ হয়ে জন্মাল, এই হল ধৃতরাষ্ট্র। আর অম্বালিকা তো ব্যাসদেবকে দেখে ভয়ে তার সারা শরীর হলুদ হয়ে গেছে, তার ছেলে হল পাণ্ডু। সত্যবতী পরে জিজ্ঞেস করতে ব্যাসদেব বললেন, তোমার বউমারা তো এই গোলমাল করে ফেলেছে, যার জন্য একজন অন্ধ আরেকজন পাণ্ডুর বর্ণের সন্তানের জন্ম দিয়েছে। সত্যবতী বললেন, তুমি আরেকবার চেষ্টা কর। এবার অম্বালিকা ব্যাসদেবের কাছে গেলই না। অম্বালিকা না গিয়ে নিজের দাসীকে ব্যাসদেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই দাসীটি খুব শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে ব্যাসদেবের কাছে গেছে, তার সন্তান হল বিদুর। দাসী স্বীকার করে দিল, অম্বালিকা নিজে না এসে আমাকে পাঠিয়েছে। ব্যাসদেব সত্যবতীকে বললেন এখন আর কিছু করা যাবে না, আমি তিনটে সন্তান দিয়ে দিয়েছি, এর পর আর নয়। এই দিক থেকে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুর ব্যাসদেবের নিয়োগ সন্তান আর শুকদেব তাঁর নিজের সন্তান। শুকদেবের আবার কোন মা ছিল না, এখানে যেমন এই তিনজনের উপর ব্যাসদেবের বাবার অধিকার নেই অন্য দিকে শুকদেবের আবার মা নেই।

বিদুরের জন্ম রহস্য

বিদুর হলেন ধর্মরাজ, স্বয়ং যম বিদুর হয়ে জন্ম নিয়েছেন। ধর্মরাজকে বিদুর হয়ে জন্ম নেওয়ার পেছনে আবার একটা কাহিনী আছে। মাণ্ডব্য বলে একজন বড় ঋষি ছিলেন। একবার এক চুরির ঘটনায় সেই দেশের রাজা ভুল বশতঃ মাণ্ডব্য ঋষিকে চোর মনে করে ধরে নিয়ে এসেছে। তখনকার দিনে চুরি করলে চোরকে শূলের উপর চড়িয়ে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। শূলে চাপিয়ে প্রাণদণ্ড দেওয়াটা অত্যন্ত কষ্টকর আর অনেক সময় ধরে কষ্ট দিয়ে দিয়ে দোষীকে মারা হত। মাণ্ডব্য ছিলেন বড় ঋষি। তিনি মৃত্যুর পর যমরাজার সামনে এসেছেন, যমরাজের কাছে কৈফেয়ৎ চাইছেন আমার কি দোষের জন্য আমাকে শূলে চড়ানো হয়েছিল। ধর্মরাজ তখন বলছেন, আপনি ছোটবেলায় একবার একটা ফড়িংকে ধরে তার পেছন দিয়ে একটা তৃণ ঢুকিয়েছিলেন। সেই কর্মের জন্যই আপনাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। শুনে মাণ্ডব্য ঋষি খুব রেগে গেছেন, একটা বাচ্চা ছেলে, অবোধ শিশু, ভালো মন্দ কোন জ্ঞান তার হয়নি, সে কি একটা ভুল করেছে তার জন্য এই জঘন্য আর পীড়াদায়ক কঠিন শাস্তি তাকে পেতে হল! তুমিও একটা অবোধের মত কাজ করেছে, ঠিক আছে আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি তুমি মানুষ হয়ে সংসারে গিয়ে দেখ সেখানে কি অবস্থাতে তারা থাকে। এই মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে ধর্মরাজ বিদুর হয়ে জন্ম নিলেন। পরে ধর্মরাজের অংশ থেকে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। মহাভারত কর্মকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, একটা বাচ্চা ছেলে ফড়িংয়ের পেছনে কাঠি ঢুকিয়েছিল বলে ঋষিকে শূলে প্রাণ দিতে হল। এই শাস্তিটা দিয়ে ধর্মরাজ আবার বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন বলে তাকে আবার মনুষ্যলোকে জন্ম নিতে হল। ধর্মরাজকে অভিশাপ দেওয়ার সাথে সাথে মাণ্ডব্য ঋষি একটা বিধান দিয়ে দিলেন, বারো বছর পর্যন্ত বাচ্চারা যা কিছু করবে সেটাকে কখন অধর্ম বলে গ্রহণ করা হবে না, সেটা দোষযুক্ত হতে পারে কিন্তু তাতে তার পাপ লাগবে না, কারণ তখনও তার ধর্মের মর্ম বোঝার ক্ষমতা হয়নি।

পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম ও পাণ্ডুর মৃত্যু

এর পরে পরে প্রচুর কাহিনী আসতে থাকে। এই কাহিনীর মধ্যে আমরা না ঢুকে সোজা চলে আসছি ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুদের সংসারে। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয়েছে গান্ধারীর সাথে আর পাণ্ডুর দুই পত্নী, কুন্তি ও মাদ্রী। পাণ্ডুর উপর এক অভিশাপ ছিল সে যদি তার স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করতে যায় তাহলে তার মৃত্যু হবে। এদিকে কুন্তীকে দুর্বাসা মুনি এক বর দিয়ে রেখেছেন, কুন্তি ইচ্ছে করলেই যে কোন দেবতার অংশ থেকে সন্তান জন্ম দিতে পারবে। পাণ্ডু তখন সন্তানের জন্য

কুন্তীকে দেবতাদের কাছ থেকে সন্তান নিতে বললেন। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তি তিনজন দেবতার থেকে তিনটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। এরপরও পাণ্ডুর মন ভরেনি, তিনি কুন্তিকে চতুর্থ বারের জন্য দেবতাদের কাছ থেকে সন্তান নিতে বললেন। কুন্তি তখন নিজের স্বামীকে ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন – *নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যত। অতঃ পরং স্বৈরিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ।।*(১/১০৭/৮১)। বিপদ কাল হয়ে গেলেও যখন স্বামীর সঙ্গে সন্তান হবে না, তখন অপরের সাথে সমাগম করে তিনটে সন্তান নেওয়া যেতে পারে কিন্তু চতুর্থ সন্তান কখনই নেওয়া যায় না, কারণ তৃতীয়ের পর চতুর্থ বারের জন্য সন্তান নেওয়া মানে পরপুরুষ-সংসর্গ হয়ে যাবে। পরপরুষ-সংসর্গ করলে সেই স্ত্রী স্বৈরিণী এবং পঞ্চম পরপুরুষ-সংসর্গ করলে বন্ধকী বলে গণ্য হয়। এখানে বলা হচ্ছে দুর্বাসা মুনির প্রদত্ত মন্ত্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কুন্তি দেবতাদের সঙ্গে সমাগম করে প্রথমে ধর্মরাজ থেকে যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয়বার বায়ু দেবতার থেকে ভীম আর তৃতীয়বার দেবরাজ ইন্দ্র থেকে অর্জুন। চতুর্থ সন্তান যে চায় তাকে বলা হয় স্বৈরিনী, যার চরিত্র বলে কিছু থাকে না।

এবার মাদ্রী বলছে দিদির তিনটে সন্তান হয়ে গেছে কিন্তু আমার তো কোন সন্তানই হলো না, আপনি কুন্তিকে বলুন যাতে আমারও একটি সন্তান হয়। কুন্তি তখন বললেন তুমি যে কোন একজন দেবতাকে আহ্বান কর তাহলে তুমিও অচিরে অনুরূপ একটি পুত্র লাভ করবে। মাদ্রী এখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ধ্যান করেছে, এখন এঁদের দুজনের থেকে মাদ্রীর দুটি সন্তান নকুল আর সহদেবের জন্ম হল। মাদ্রীর দুটো সন্তান হওয়াতে কুন্তী খুব রেগে গেছে, মাদ্রী খুব চালাকি করে একসঙ্গে দুজনকে আহ্বান করে করেছে, আগে জানলে আমি ওকে সাহায্য করতাম না।

বসন্ত ঋতুতে একদিন বনের মধ্যে পাণ্ডু আর মাদ্রী দুজনে একাকী পরিভ্রমণ করা কালে মাদ্রীর রূপ লাবণ্যে পাণ্ডু দুর্বল হয়ে মাদ্রীকে আলিঙ্গন করতে যান, মাদ্রী বাধা দিয়েও পাণ্ডুকে নিবৃত্ত করতে পারলো না। ঋষিকুমারের অভিশাপ ছিল, তক্ষুনি পাণ্ডুর মৃত্যু হয়ে গেল। পাণ্ডুর সাথে মাদ্রীও সতী হয়ে গেল। কুন্তী এখন পাঁচটি নাবালক সন্তান নিয়ে কোথায় যাবেন, শেষে পাণ্ডুর মৃতদেহকে নিয়ে তিনি হস্তিনাপুরে চলে আসেন। অন্য দিকে গান্ধারীর কিছুতেই সন্তান হচ্ছিল না, ব্যাসদেবের আশীর্বাদে তখন গান্ধারীর থেকে দুর্যোধনাদি একশ পুত্রের জন্ম হল। গান্ধারী বর নিয়েছিল একশটি সন্তানের, কিন্তু তার কাছে খবর এসেছে ঐদিকে কুন্তীর সন্তান হয়ে গেছে। তার ছেলে জেষ্ঠ্য পুত্র না হলে রাজা হতে পারবে না, এই ভেবে নিজের পেটে এমন ঘুশোঘুশি মারতে শুরু করেছে যার ফলে শেষে গর্ভপাত হয়ে একটা মাংস পিণ্ড বেরিয়ে এসেছে। ব্যাসদেবের কথাতে সেই মাংস পিণ্ডকে টুকরো করা হল, সেইখান থেকে দুর্যোধন আর তার ভাইদের জন্ম হল। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঠিক পরেই আর ভীমের কিছু দিন আগে জন্ম নেয়। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ঋষিরা সবাই মিলে কুন্তী আর এই পাঁচ পুত্রকে নিয়ে হস্তিনাপুরে রেখে এসেছেন। এখন এই পাঁচ ভাই আর কৌরবদের একশ ভাই মিলে একসাথে শাস্ত্রবিদ্যা অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা লাভ করে বড় হতে থাকল।

দ্রোণাচার্যের কাহিনী *(দ্রোণাচার্যের জন্ম রহস্য – পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা এবং অস্ত্র লাভ – বন্ধুত্বের সুবাদে রাজা দ্রুপদের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা – দ্রুপদের বন্ধুত্বের অস্বীকৃতি – হস্তিনাপুরে আচার্য রূপে দ্রোণাচার্যের রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদান)*

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর বনে যে ঋষিদের কাছে পাণ্ডুর পুত্ররা লালিত পালিত হচ্ছিল, সেই ঋষিরাই পঞ্চ পাণ্ডব আর কুন্তীকে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন কৌরবদের একশ জন পুত্রের সাথে পঞ্চ পাণ্ডব এই একশ পাঁচ জন রাজকুমার একসাথে বড় হতে লাগল। এখানে আসছে দ্রোণাচার্যের কাহিনী, বলা হয় যে দ্রোণাচার্যের জন্ম একটি কলসীতে হয়েছিল। একদিকে তিনি ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিন্তু অস্ত্র বিদ্যার প্রতি তাঁর চিরদিনই একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। স্বামীজী দ্রোণাচার্যের নামে বলছেন – of questionable birth। যেখানেই এই ধরণের জন্মের ব্যাপার গুলো এসেছে, কেউ কলসীর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে, কেউ কুম্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে, স্বামীজী এই ধরণের সব কটি জন্মকে বলছেন of questionable birth কিভাবে আর কেন যে এই ধরণের জন্ম হয়েছে আমাদের জানা নেই, কিছু একটা রহস্য আছে যার জন্য তাঁদের এই ভাবে জন্ম হয়েছে। কিন্তু এনারা সবাই ছিলেন মহাপুরুষ, এই রহস্যকে আড়াল করার জন্য একটা অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে আসা হত। এটা অবশ্য স্বামীজীর মত, আর আমাদেরও এই একই মত। দ্রোণাচার্যের স্ত্রীর নাম ছিল কৃপী, কৃপী ছিলেন কৃপাচার্যের বোন। পরশুরাম, যিনি তাঁর সময়ের একজন নামকরা যোদ্ধা ছিলেন, তিনি এখন তপস্যায় চলে যাবেন বলে ঠিক করে নিয়েছেন, এরপর আর তিনি অস্ত্রশশস্ত্র স্পর্শ করবেন না। তপস্যায় যাবার আগে তিনি সব কিছু দান করে দিচ্ছেন। দ্রোণাচার্যের বরাবরই অস্ত্রবিদ্যার প্রতি বেশী আকর্ষণ ছিল। খবর পেয়ে তিনিও পরশুরামের কাছে যাবেন বলে ঠিক করেছেন, যাতে পরশুরাম তাঁকেও কিছু অস্ত্রশস্ত্র দান করেন। পরশুরামের কাছে যা কিছু ছিল অস্ত্রশস্ত্র, টাকা-পয়সা যা কিছু ছিল দান করে দিচ্ছেন। দ্রোণাচার্য শুধু অস্ত্রই চাইছেন। পরশুরাম বলছেন, আমার কাছে যা অস্ত্রশস্ত্র আছে আর আমি যা

অস্ত্রবিদ্যা জানি সব তোমাকেই দান করে যাব। সেই থেকে দ্রোণাচার্য হয়ে গেলেন তখনকার দিনের অস্ত্রবিদ্যার সব থেকে বড় পারঙ্গম। দ্রোণাচার্য এমন বরদান পেলেন, তাঁর হাতে যতক্ষণ অস্ত্র থাকবে ততক্ষণ তাঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। এটাই মহাভারতের বিশেষত্ব, কাহিনীটাকে এমন ভাবে দাঁড় করান হয়েছে যে দেখে মনে হবে এনাদের কেউ কোন দিন হারাতে পারবেন না, যেমন ভীষ্মকে কেউ মারতে পারবে না, কারণ তাঁর ছিল ইচ্ছামৃত্যুর বর, দ্রোণাচার্যের হাতে যতক্ষণ অস্ত্র থাকবে তাঁকে কেউ হারাতে পারবে না। তেমনি কর্ণের এমন কবচ তাকেও কেউ হারাতে পারবে না।

আমরা এর আগেও একটু আলোচনা করেছিলাম, দ্রোণাচার্য আর রাজা দ্রুপদ এক সময় একই গুরুগৃহে বিদ্যা লাভ করেছিলেন। সেই সময় তাঁদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। দ্রোণাচার্য একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর রাজা দ্রুপদ ইতিমধ্যে রাজা হয়ে গেছেন। দ্রোণাচার্য শৈশবের বন্ধুত্বের সুবাদে দ্রুপদের কাছে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশা নিয়ে গেছেন। তিনি এতই দরিদ্র ছিলেন যে নিজের সন্তান অশ্বত্থামার জন্য একটু দুধও জোগাড় করতে পারছেন না। অন্য দিকে দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যায় একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য। এত বড় গুণী কিন্তু গুণ দিয়ে আর অর্থ উপার্জন সব সময় করা যায় না। দ্রুপদ দ্রোণাচার্যকে অস্বীকার করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তখন দ্রুপদ কয়েকটি কথা দ্রোণাচার্যকে বলছেন। উপনিষদ হল মোক্ষশাস্ত্র, সাধারণ মানুষের জন্য উপনিষদ নয়, সবার মুখে উপনিষদের কথা মানায় না। আমাদের মত সাধারণ মানুষ যখন কথা বলি তখন ধর্মশাস্ত্র থেকেই কথা বলি। ধর্মশাস্ত্র একটাই, সেটা হল এই মহাভারত। মহাভারতে যেটা বলা হয়েছে সেটাকেই মানা হয়, মহাভারত যেটা বলেনি সেটাকে মানার প্রশ্নই আসেনা। মহাভারতে আমাদের দৈনন্দীন জীবনচর্চার এমন কোন বিষয় নেই যার সম্বন্ধে মহাভারত কিছু বলেনি। দ্রুপদ এখানে বলছেন – *নহি রাজ্ঞামুদীর্ণানামেবম্ভূতৈন রৈঃ ক্বচিৎ। সখ্যৎ ভবতি মন্দাত্মন্! শ্রিয়া হীনৈর্ধনচ্যুতৈঃ।।*১/১২৭/৫। ওহে দ্রোণ তুমি একজন মুর্খ ব্যক্তি, তোমার মত শ্রী হীনের সাথে কখনই বড় বড় রাজাদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। মানুষের যেমন যেমন বয়স বাড়তে থাকে তার বন্ধুত্বও তেমন তেমন শিথিল হতে থাকে, কারণ দুজনের মধ্যে শক্তির তারতম্য এসে যায়। যখন আমরা দুজনের সমান ছিলাম তখন তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল, এখন আমরা সমান নই। এই জগতে কখনই দেখা যায় না যে, দুজন মানুষ চিরদিনই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছে। সময় দুজনকে বন্ধুত্ব করিয়ে দেয় আবার এই সময়ই দুজনকে শত্রু বানিয়ে দেয়। সময়ের সাথে সাথে সেই শত্রুতা আবার বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে যায়। এই মৈত্রী, বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে যায়। সেইজন্য এই বন্ধুত্বের ব্যাপার নিয়ে তুমি আমার কাছে কোন কথা বলতে এসো না। তাই আমাদের মধ্যে যখন বন্ধুত্ব ছিল তখন ছিল, সেই সময় আমাদের খেলা এক সঙ্গে ছিল, গুরুর কাছে বিদ্যার্জন এক সঙ্গে হত, সেই স্বার্থের জন্যই বন্ধুত্ব ছিল, এখন তুমি ওসব ভুলে যাও। তার মানে দ্রুপদ বলতে চাইছেন, বন্ধুত্বের মূল আধার স্বার্থ। উইল ডুরাণ্ডের একটা বই আছে - Story of Phylosophy সেখানে এক বিখ্যাত দার্শনিকের এক নামকরা রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু পরে বিভিন্ন কারণে দুজনের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে যায়। একটা জায়গায় উইল ডুরাণ্ড খুব সুন্দর লিখছেন, repaying the obligation also runs on expectations, আমরা প্রায়ই কিছু হলে বলি, আমি তোমাকে উপকার করেছিলাম তার একটুও কি তোমার মনে নেই! মানুষ কৃতজ্ঞ তত দিনই থাকে যতক্ষণ আশা থাকে ভবিষ্যতে আমি এর কাছে কিছু পাব। যদি বোঝা যায় ভবিষ্যতে এর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা নেই তখন সে তাকে আর চিনতেও চায় না, কৃতজ্ঞ থাকাতো দূরে। এটাই কিন্তু জগতের নিয়ম আর এটাই শাস্ত্রের বিধান।

দ্রুপদের এই কথাটিকে যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে সমাজ থেকে কোন দিন আমাদের কষ্ট বা আঘাত পেতে হবে না। বলছেন – *ন দরিদ্রো বসুমতো নাবিদ্বান বিদূষঃ সখা। ন শূরস্য সখা ক্লীবঃ সখিপূর্বং কিমিষ্যতে।।*১/২৭/৯। এটি একটি খুব নামকরা শ্লোক – যে নির্ধন, দরিদ্র কখনই সে ধনবানের বন্ধু হতে পারে না, মুর্খ কখন বিদ্বানের বন্ধু হতে পারে না আর যে কাপুরুষ সে কখনই বীরপুরুষের বন্ধু হতে পারে না। জগতের বাস্তব ঘটনা হল, বিপরীতে কখনই মিল হয় না, কাপুরুষ বীরের সঙ্গে, দরিদ্র ধনীর সাথে আর মুর্খের বিদ্বানের সাথে কক্ষণ বন্ধুত্ব হতে পারে না। পরের যে শ্লোক এর কথা আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, *যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং বলম্। তয়োরেব সখ্যং বিবাহশ্চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ।।*১/১২৭/১০। যার ধন সম্পদ সমান, বিদ্যা সমান, বন্ধুত্ব আর বিবাহ এদের মধ্যে হয়, বিপরীতে হয় না। আমরা বলি বন্ধুত্ব, বিবাহ আর শত্রুতা এই তিনটে জিনিষ সমানে সমানে হয়। এই কথা প্রথম মহাভারতই বলেছে, এখানে অবশ্য শত্রুতার কথা বলা নেই, শুধু বন্ধুত্ব আর বিবাহের কথাই বলছে।

দ্রোণাচার্য তখনকার দিনের একজন অত্যন্ত শক্তিধর ব্যক্তিত্ব আবার বিরাট বিদ্বান পুরুষ। তিনি কিন্তু রাজা দ্রুপদকে কিছু বললেন না, মনের মধ্যে ক্ষোভ আর অপমান নিয়ে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে তিনি হস্তিনাপুরে চলে এলেন।

এরপরের কাহিনী আমাদের সবারই জানা। হস্তিনাপুরে যাওয়ার পথে দ্রোণাচার্য দেখেন রাজকুমাররা নিজেদের মধ্যে খেলা করছে, খেলা করতে করতে একটা ঘুঁটি কিভাবে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। রাজকুমাররা কোন ভাবেই কুয়ো থেকে সেটাকে তুলতে পারছিল না। দ্রোণাচার্য তখন একটার পর একটা কুশ ঘাসকে মন্ত্র সিদ্ধ করে কুয়োর মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকলেন। প্রথমটা কুশ ঘাসটা গিয়ে ঘুঁটিটাকে বিদ্ধ করল, এরপর এক এক করে কুশ ঘাশ নিক্ষেপ করতে থাকলেন আর একটা আরেকটার উপর চেপে যেতে থাকল। যখন শেষ কুশ ঘাসটা হাতের নাগালে চলে এল, সেটাকে ধরে টেনে তিনি কুয়ো থেকে ঘুঁটিটাকে বার করে আনলেন। রাজকুমাররা সবাই অবাক হয়ে গেল, আপনি কে, আপনি কোথা থেকে আসছেন? ইত্যাদি প্রশ্ন করাতে দ্রোণাচার্য রাজকুমারদের বললেন, তোমরা পিতামহ ভীষ্মকে গিয়ে এই ঘটনার কথা বল। ভীষ্ম শুনেই বুঝেছেন দ্রোণাচার্য ছাড়া এই কাজ কেউ করতে পারে না। ভীষ্ম পিতামহ নিজেই দ্রোণাচার্যের কাছে চলে এসেছেন। এইভাবে দ্রোণাচার্যকে কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের আচার্য রূপে নিয়োগ করা হল। এরপর দ্রোণাচার্যের কাছে সব রাজকুমারদের শিক্ষা চলতে লাগল। মূল মহাভারতে এই জিনিষগুলোর বিস্তৃত বিবরণ নেই, কিন্তু পরের দিকে মহাভারতে অনেক কাহিনী সংযোজিত করে নাটকীয়তা নিয়ে আসা হয়েছে।

একলব্যের কাহিনী

দ্রোণাচার্যের একটা পণ ছিল তিনি ক্ষত্রিয় ও রাজার সন্তান ছাড়া কাউকে অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দেবেন না। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য একদিন দ্রোণাচার্যের কাছে গেছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য। কিন্তু একলব্য ছিল ম্লেচ্ছ জাতির সন্তান, তাই দ্রোণাচার্য তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এরপর একলব্য বনের মধ্যে গিয়ে দ্রোণাচার্যের একটা মুর্তি বানিয়ে সেই মুর্তিকে সাক্ষী রেখে ধনুর্বেদ অভ্যাস করতে শুরু করে দিল। দ্রোণাচার্য একদিন তার শিষ্যদের নিয়ে জঙ্গলে গেছেন, তাদের সঙ্গে একটা কুকুরও ছিল। কুকুরটা এগিয়ে এগিয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় একটা কালো মিশমিশে আদিবাসী ছেলেকে দেখে আর দ্রোণাচার্যের ঐ মুর্তি দেখে খুব চেঁচাতে শুরু করেছে। ছেলেটি পাঁচটি এমন ভোঁতা বাণ কুকুরের মুখে মারতেই কুকুরের মুখটা আটকে গেছে। কুকুরটা ওখান থেকে পালিয়ে ফেরত আসতেই সবাই অবাক হয়ে গেছে, ভাবছে কে এমন ধনুর্ধর ব্যক্তি এখানে আছে যে কুকুরের এই অবস্থা করে দিতে পারে। কুকুরের কোন আঘাত হয়নি, এক বিন্দু রক্তপাত হয়নি কিন্তু কুকুরের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সবাই মিলে এগিয়ে দেখে সেই একলব্য দ্রোণাচার্যের মুর্তিকে সাক্ষী করে এক মনে অস্ত্র চালনার অনুশীলন করে যাচ্ছে। দ্রোণাচার্য দেখেই বুঝলেন আমি যতই অর্জুনকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে থাকি এর সামনে অর্জুন কখনই দাঁড়াতে পারবে না। তখন দ্রোণাচার্য একলব্যের সামনে এসে বললেন, তুমি তো আমাকে গুরু করে এই অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করেছ, এবার আমার গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য বললেন, গুরুদেব আপনি কি গুরুদক্ষিণা নেবেন বলুন, আমি তাই অর্পণ করব। দ্রোণাচার্য বললেন, তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আঙ্গুল ছেদন করে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় অসঙ্কুচিতচিত্তে গুরুদক্ষিণা প্রদান করল। একলব্যের গুরুনিষ্ঠা দেখে দ্রোণাচার্যের মনটা একলব্যের প্রতি করুণায় আপ্লুত হয়ে গেল। তিনি ইশারায় দেখিয়ে দিলেন, যদিও তোমার অঙ্গুষ্ঠ বাদ চলে গেছে কিন্তু তুমি দুটো আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে তীর টেনে চালাতে পারবে। বলা হয় একলব্য ঐভাবে চালাতে থাকল কিন্তু আগের মত সেই ক্ষিপ্রতা ছিল না।

যাদের ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানার আগ্রহ আছে তাদের জন্য দুটো খুব জরুরী কথা এখানে বলা প্রয়োজন। প্রথম কথা হল, একলব্যের ঘটনা যদিও ব্যাসদেব নিজে লিখেছেন বা পরের দিকে ঢোকান হয়েছে কিনা আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু যেটা বক্তব্য তা হল, দ্রোণাচার্যের যে ব্যক্তিত্বের সাথে আমাদের পরিচয় করান হয়েছে সেই ধরণের ব্যক্তিত্বের পুরুষ হয়ে দ্রোণাচার্য কখনই এই ধরণের কুকর্ম করতে পারেন না। আমরা এর আগেও উল্লেখ করেছি যে মহাভারত হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য, পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যে সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো এই ভাবে কখন দেখানো হয় না, এই ধরণের সাহিত্যে সবটাই ধোঁয়াশে থাকে। এখানে দ্রোণাচার্যের চরিত্রের উপর একটু কালি ছিটিয়ে দেওয়া হল, দ্রোণাচার্যকে একেবারে পরিষ্কার করে রাখা হল না। তবে মহাভারতের কোথাও লেখা নেই, যেমন অন্য কেউ যদি সাহিত্য রচনা করতেন তাহলে লিখতেন, দ্রোণাচার্য তুমি একলব্যের প্রতি যে পাপ করেছিলে তোমাকে তাই এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হল, ব্যাসদেব কিন্তু তা করেননি, এটাই হল পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যে কোন চরিত্রকে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্পাপ রাখা হয় না। কারণ একেবারে নিষ্পাপ চরিত্র কখনই হবে না, তা যে কোন চরিত্রকেই নিয়ে আসা হোক না কেন। কারণ এই প্রকৃতির জগতে বা মায়ার রাজ্যে কখনই একেবারে শুধু সাদা চরিত্র হয় না। যে সাহিত্যিকরা এই জিনিষটাকে জানেনে তাঁরা চরিত্রকে কখনই পুরো সাদা রাখবেন না, একটু কালো ঢুকিয়ে দেবেন। দ্বিতীয় কথা হল, যাদের তীর-ধনুক চালানোর

অভ্যাস আছে তার এই ব্যাপারটা ভালো করে জানেন, তীর চালাতে বুড়ো আঙ্গুলের কোন ভূমিকাই নেই। তীর চালাতে হাতের মাঝখানের দুটো আঙ্গুলেরই ব্যবহার হয়, এতে লক্ষ্যটাও ঠিক থাকে। যারা আনাড়ি তারা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ধরে। সেইজন্য দ্রোণাচার্য ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন মাঝখানের দুটো আঙ্গুল দিয়ে তীরটাকে ধর। এতে তীরের বেগ কমে যাবে এগুলো গালগপ্প, কারণ অর্জুনও এভাবেই তীর চালাত। যুদ্ধের একটা জায়গায় বর্ণনা আসবে, দুর্যোধনকে একবার অর্জুন সুচীবাণ দিয়ে তার আঙ্গুলের ডগাগুলিকে ভরিয়ে দিয়েছিল। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে যদি তীর চালাত তাহলে সুচীবাণ দিয়ে আঙ্গুলের ডগাগুলোকে ভর্তি করে দিতে পারতো না। মাঝের আঙ্গুল দিয়ে চালালে আঙ্গুলের ডগাগুলো সামনে খোলা থাকবে। সেইজন্য আমরা যে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার বুড়ো আঙ্গুল ছেদন করে গুরুদক্ষিণা নিয়ে খুব পাপ করেছিলেন, এগুলো সবই আজগুবি গপ্পো। রান্না করার সময় যেমন একটু মশলা, বড়ি, হিং লাগে, এই কাহিনী গুলো হল মহাভারতের মশলা, বড়ি, হিং। তখনকার দিনে ভারতে যত বিভিন্ন ধারা, সংস্কৃতি চলছিল সেগুলোর সব কিছুকে মহাভারতে এনে মেলানো হচ্ছে। এখানে একলব্য একজন আদিবাসী, তার গুরু বানিয়ে দেওয়া হল দ্রোণাচার্যকে, দ্রোণাচার্য তাকে আশীর্বাদও করে দিয়েছেন। একলব্য পরে যুদ্ধ করতেও গিয়েছিল। ব্যাসদেব ভারতের ছড়ানো ছেটানো সংস্কৃতিগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে একটা নতুন সংস্কৃতিকে সামনে নিয়ে এসে পুরো ভারতকে সেই একটি সংস্কৃতির মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করে বর্তমান অখণ্ড ভারতের দিকে নিয়ে যাওয়া শুরু করছেন।

রাজপুত্রদের অস্ত্র পরীক্ষা ও কর্ণের আবির্ভাব

অনেক দিন শিক্ষা হয়ে যাওয়ার পর এবার রাজকুমারদের পরীক্ষা নেওয়া হবে, কে কেমন বিদ্যার্জন করেছে। একটা নকল পাখিকে বৃক্ষের ডালে রাখা হয়েছে, তীর দিয়ে সেই পাখির চোখকে ভেদ করা হবে। এই কাহিনীকে পরের দিকের সাহিত্যকাররা খুব রঙটঙ চড়িয়ে দেখিয়েছেন। একে একে সবাই তীর ধনুক নিয়ে সন্ধান করতে এসেছে, কেউই পারলো না। যখন অর্জুন এসেছে তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তুমি সামনে কি দেখছ। অর্জুন বলছে পাখির চোখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু শুধু চোখ দেখলেই কি লক্ষ্যভেদ হয়ে যাবে? আসলে তা নয়, যুধিষ্ঠির, ভীম, দুর্যোধন এরা কেউই যে পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছিল না তা নয়, তাহলে তো দ্রোণাচার্যের অপমান হয়ে যায়। একবার এক খ্রীশ্চান পাদরী অনেক বছর আগে এক গ্রামে ধর্মান্তরের নামে খুব বাড়াবাড়ি করছিল। সেই গ্রামের মুখিয়া একদিন একটা তীর চালিয়ে পাদরীর গলাটা উড়িয়ে দিয়েছেন। আদালতে বিচার চলছে, মুখিয়ার উকিল বলছে, হুজুর, পাদরি সাহেবের গলা কাটার জন্য মুখিয়া তীরটা চালায়নি, ভয় দেখাবার জন্যই তীরটা চালিয়েছিল কিন্তু ভুলবশতঃ সাহেবের গলাতে এসে লেগে যায়। মুখিয়া তখন আদালতের জজ সাহেবের সামনে চেঁচিয়ে বলছে, হুজুর আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিন, আমাকে এত বড় অপমান করবেন না, আমি তীর চালাব আর তার লাগবে না এটা কখন হতে পারেনা। আমি যদি এই বলে বেঁচে যাই যে, আমি অন্য জায়গায় তীর চালিয়েছিল আর তীরটা অন্য জায়গায় লেগে গেছে তাহলে গ্রামে কেউ আমাকে ঢুকতে দেবে না, আমি গলা দেখেই মেরেছিলাম আর গলাতেই লেগেছে। এই অপমান আমি নিতে পারবো না। দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যা শেখাবেন আর দুর্যোধনের মত যোদ্ধা, যুধিষ্ঠিরের মত পুরুষ পাখি দেখবে গাছ দেখবে আর পাখির চোখ দেখবে না, এই জিনিষ কখনই হয় না। মহাভারত হল ইতিহাস, ইতিহাস তাদেরই হয় যারা জয়ী হয়। এই ইতিহাস কাকে শোনান হচ্ছে? জনমেজয়কে শোনান হচ্ছে। জনমেজয় হল পরীক্ষিতের সন্তান, পরীক্ষিৎ অভিমন্যুর সন্তান, অভিমন্যু অর্জুনের সন্তান। তাই অর্জুনের প্রশংসা করতে হবে, দরকার হয়ে অপরকে ছোট করেও প্রশংসা করা হবে।

এই কারণে এইসব কাহিনীকে খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। কিন্তু মূল জায়গাটাকে কেউ বাদ দিচ্ছে না, তীরন্দাজের ক্ষেত্রে অর্জুন সবার শ্রেষ্ঠ সেখানে কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু বাকিরা হেলফেলা কেউ ছিল না, সবাই বড় যোদ্ধা ছিলেন। রবিনহুডের কাহিনীতেও ঠিক এই ধরণের কাহিনী আছে। একটা জায়গায়তে কে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ এই নিয়ে তীরন্দাজের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। রবিনহুড একটা ছদ্মবেশে গেছে। প্রতিযোগিতা হতে হতে শেষে দুজনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নর্মান্সদের যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সে রবিনহুডকে বলছে, আমি এত একাগ্র হয়ে লক্ষ্যভেদ করছি আর তুমি তো অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ করছ, তুমি তো এখনও তোমার পুরো শক্তি লাগাওনি। কিন্তু এর পরেও দেখা গেল দুজনেই লক্ষ্যভেদ করে চলেছে। রবিনহুড বলছে, এইভাবে আমাদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই মীমাংসা কোন দিনই হবে না। এর চেয়ে বরং একটা খুব সরু ডাণ্ডাকে অনেক দূরে পুতে দেওয়া হোক আর ঐটাকেই লক্ষ্যভেদ করা হোক। এখন নরম্যান যোদ্ধা সরু ডাণ্ডাটাকে পরিষ্কার দেখতেও পাচ্ছে না। রবিনহুড একটু শুকনো ঘাসের টুকরো নিয়ে দেখে নিল বাতাস কোন দিকে বইছে, তারপর তীর ছুড়লো তীরটা সোজা লাঠিটাকে টুকরো করে উড়িয়ে দিল। এটা সত্যি এই রকম হয়েছিল কিনা

আমাদের কারুর জানা নেই, এটা একটা কাহিনী। কিন্তু কাহিনী যাই হোক মূল কথা হল রবিনহুড একজন শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ ছিল। অর্জুনও বড় তীরন্দাজ ও যোদ্ধা ছিলেন এটা ঠিক কিন্তু বাকি কাহিনীগুলো কতটা সত্য বলা মুশকিল।

এবারে সব রাজকুমাররা এত দিন দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রের কি কি কুশলতা ও কৌশল শিখেছে সব দেখানো হচ্ছে। সবাই সবার কেরামতি দেখাচ্ছে। অর্জুনও অনেক কিছু করে দেখালেন। হঠাৎ সেখানে কর্ণ এসে উপস্থিত হয়েছে। এই প্রথম মহাভারতে এখানে কর্ণকে দেখানো হচ্ছে। অর্জুন যা যা করে দেখাল কর্ণও তাই তাই করে দেখাতে পারে বলে সবার সামনে অর্জুনকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ভীমসেনরা কর্ণের এই চ্যালেঞ্জকে আপত্তি জানিয়েছে, এদের আপত্তি হল একজন রাজকুমারকে রাজকুমারই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। পাণ্ডবদের দুর্যোধন ছোটবেলা থেকেই হিংসা করত, তার এই হিংসার অনেক কাহিনীও এর আগে ঘটে গেছে। দুর্যোধন দেখল এত বড় এক যোদ্ধাকে যদি আমার হাতে রাখতে পারি পরে অনেক কাজে দেবে। এই ভেবে দুর্যোধন তক্ষুণি ঘোষণা করল, আমি এই মুহুর্তে কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা বানিয়ে দিলাম। অঙ্গদেশ বর্তমানের ভাগলপুরকে বলা হত। এখন কর্ণ রাজা হয়ে গেল, এবার সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে আপত্তি থাকবে না। কর্ণের জন্ম কাহিনীও আমাদের সবারই জানা আছে, কর্ণ কুন্তীর কুমারী অবস্থার সন্তান বলে লোকলজ্জার ভয়ে তিনি একটা হাড়ির মধ্যে কর্ণকে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অধিরথ নামে একজন সুত শিশুর কান্না শুনে তাকে বাড়িতে নিয়ে লালন পালন করে বড় করেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাহের থেকে যে সন্তান হয় তাদের সুত বলা হয়, সুতদের বেদের অধিকার থাকে না কিন্তু তারা পৌরানিক কথা ও কাহিনীর প্রবচন করতে পারত। সুত আবার দু রকমের হয়, বাংলাতে ঘোষ উপাধিতে কুলিন কায়স্থও হয় আবার ঘোষ উপাধিতে গোয়ালাও হয়, ঘোষ টাইটেল দেখলে আমরা ধরতে পারবো না, এই কায়স্থ না গোয়ালা। ঠিক তেমনি সুতদের কেও বোঝা যাবে না, এই সুত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান সুত না সারথি। সঞ্জয় ছিলেন একদিকে ধৃতরাষ্ট্রের সারথি আবার অন্য দিকে মন্ত্রীও ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের খুব বিশ্বস্ত মন্ত্রী।

অধিরথ ছিলেন কর্ণের পালিত পিতা। এদিকে অধিরথের কাছে খবর চলে গেছে, দ্যাখো তোমার সন্তান রাজপুরীতে গিয়ে কি করছে। অধিরথ বুড়ো মানুষ, খবর পেয়েই লাঠি ভর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। এখানে নাটকীয়তা একটু বেশী করা হয়েছে। অধিরথ কর্ণ, কর্ণ করে ডাক দিচ্ছেন। ব্যাসদেবের খুব সুন্দর শ্লোক – *তমালোক্য ধনুস্ত্যক্ত্বা পিতৃগৌরবযন্ত্রিতঃ। কর্ণোঽভিষেকার্দ্রশিরাঃ শিরসা সমবন্দত।।*(১/১৩২/২) – বাবার যে গৌরব তার সাথে কর্ণ বাঁধা হয়ে আছে। যন্ত্রের মত দৌড়ে গিয়ে বাবার পায়ে মাথা রেখেছে। কর্ণকে যে এক্ষুণি অঙ্গদেশের রাজা করে দেওয়া হয়েছে সেটাকে তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, এখানে বলছেন *অভিষেকাদ্র শিরঃ*, মাথায় মাঙ্গলিক বারি সিঞ্চন করে তাকে রাজা করে দেওয়া হয়েছে, মাথাটা এখনও রাজা কিন্তু বাবার যে গৌরব, বাবার যে প্রতিষ্ঠা তার সাথে কর্ণ যন্ত্রের মত বাঁধা হয়ে আছে। সে যে এখন রাজা হয়ে বাবার কথা মানবে না, কর্ণ তা করছে না। ঠিক এই দিন থেকে কর্ণ তার মৃত্যু পর্যন্ত অঙ্গদেশের রাজা ছিল, কিন্তু অঙ্গদেশে কর্ণ খুব কম যেত, যেতই না বলা যায়। বেশীর ভাগ সময় হস্তিনাপুরে থেকে দুর্যোধনের পাশে পাশে থেকে তাকে নানা রকমের পরামর্শ দিত। সেই থেকে কর্ণকে সম্বোধন করা হত অঙ্গরাজ বলে। অধিরথের কর্ণ কর্ণ ডাক শুনেই কর্ণ দৌড়ে এসে বাবাকে প্রণাম করতেই সবাই কর্ণের পরিচয় জেনে গেল। ভীম দেখেই খুব রেগে গিয়ে বলছে, কর্ণ, তুমি একটা সুতের সন্তান! তুমি তো অর্জুনের হাতে মরার যোগ্যও নও। এগুলো মহাভারতের কাহিনীর প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপট থেকেই আস্তে আস্তে মূল কাহিনী বিস্তার করবে।

পাণ্ডবদের শৌর্য, পরাক্রম ও কীর্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগ ও কণিকের কূট পরামর্শ গ্রহণ

দ্রোণাচার্য দেখলেন আমার শিষ্যরা সবাই অস্ত্রবিদ্যায় উপযুক্ত হয়ে গেছে। দ্রুপদের অপমানকে দ্রোণাচার্য কখনই ভুলতে পারেননি। তিনি শিষ্যদের বললেন, তোমরা দ্রুপদ রাজাকে পরাস্ত করে বন্দী অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে এসো। অর্জুনরা পাঁচ ভাই মিলে এমন আক্রমণ করেছে, দ্রুপদ সেনারা দাঁড়াতেই পারলো না। অর্জুন গুরুর আদেশে দ্রুপদকে বন্দী করে বেঁধে নিয়ে এসে দ্রোণাচার্যের পায়ের কাছে ফেলে দিয়েছে। দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডবরা বলছেন, এটাই আমাদের গুরুদক্ষিণা। দ্রোণাচার্য তখন দ্রুপদকে বলছেন 'যজ্ঞসেন! তুমি বলেছিলে যে রাজা নয় সে কখন রাজার বন্ধু হয় না, আমি কিন্তু এখনও তোমার বন্ধুত্বের প্রত্যাশী। সেইজন্য গঙ্গার দক্ষিণ দিক বরাবর তুমি রাজা থাকবে আর গঙ্গার উত্তর দিকটাতে আমি রাজা থাকব। এরপর আমাদের বন্ধুত্ব থাকতে কোন বাধা রইল না, কারণ এবার আমরা সমান সমান হয়ে গেলাম, তুমিই বলেছিলে বন্ধুত্ব সমানে সমানে হয়। তোমার রাজ্যটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হল'। দ্রুপদ আর কি করবেন, বন্ধুত্বকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করে মাথা নীচু করে চলে গেলেন।

এদিকে অর্জুনরা যৌবনের রক্তে টগবগ করে ফুটছে, আঠারো কুড়ি বছর বয়স। অর্জুন এখন বললেন, আমি একাই সারা ভারত জয় করে আসব। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল কোন রাজা বা যোদ্ধা পুরো সৈন্য নিয়ে বা একা গিয়ে কোন রাজাকে আহ্বাণ করে বলত আমি এসেছি আপনাকে পরাস্ত করতে। ভারতের স্বাধীনতার ঠিক আগে ভারতে পাকিস্থান সমেত মোট ৫৩৬ খানা রাজ্য ছিল। এই ৫৩৬ টি রাজ্যের রাজারা বৃটিশদের হাতে পায়ে ধরে বলছিল আপনারা ভারত ছেড়ে যাবেন না তাহলে আমরা মরে যাবো। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামীরা কেউ জেলে মরছে, কেউ ফাঁসিতে মরছে, কেউ বৃটিশের গুলিতে মরছে আর অন্য দিকে এই রাজারা বৃটিশদের হাতে পায়ে ধরছে, হুজুর আপনারা ভারত ছেড়ে যাবেন না, এদের মধ্যে সব নামকরা রাজা নবাবরা ছিলেন, হায়দ্রাবাদের নিজাম, কাশ্মীরের রাজা, জুনাগড়ের রাজা, বিকানিরের রাজা, নবাব পাতৌদি, পাতিয়ালার রাজা এরা বৃটিশদের হাতে পায়ে ধরত। মাউন্টব্যাটন একা এই ৫৩৬ টা রাজাকে চাপ দিয়ে দিয়ে সব কটাকে বলল তোমরা সই কর যে আমরা ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ আর জুনাগড় সই করেনি। পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলে হায়দ্রাবাদ আর জুনাগড়ে সৈন্য পাঠিয়ে সোজা করে দিলেন অন্য দিকে কাশ্মীরে এমন গোলমাল বাঁধিয়ে দেওয়া হল যার জন্য সেটার আজ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হল না। ৫৩৬টা ছিল স্বাধীনতার আগে, এবার মহাভারতের সময় কটা রাজ্য ছিল চিন্তা করে দেখুন। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল কোন রাজা গিয়ে বলত যুদ্ধ হোক, বিপক্ষ রাজা যদি বলে দিত যুদ্ধ করার দরকার নেই আপনাকে কিছু কর দিয়ে দিচ্ছি। সব সময় যে পরাজয় স্বীকার করে কর দিত তা নয়, অনেক সময় সম্মানার্থেও কিছু উপঢৌকন দিয়ে দেওয়া হত। কোন সময় বলে দিত আমি কোন কর দেব না, তখন যুদ্ধ করে ফয়সালা করা হত। অর্জুন এখন এই ভাবে একা বেরিয়ে পড়েছে। এখানে বলা হচ্ছে তিনি দক্ষিণ দিশাতে গিয়েছিলেন। এইভাবে অর্জুন রথে করে একা পুরো ভারত ঘুরে সব রাজ্যকে জয় করে প্রচুর ধন সম্পদ জয় করে ফিরে এসেছিলেন। অর্জুন একা অনেক ধন জয় করেছিল বলে অর্জুনের নাম হয়ে গেল ধনঞ্জয়।

অর্জুনের এই বীরত্ব, শৌর্য, তেজ আর প্রতিপত্তিতে পাণ্ডবদেরও খুব নাম যশ হয়ে গেল, সবার মুখে পাণ্ডবদের গুণগান চলছে। এইসব দেখে ধৃতরাষ্ট্র ভেতরে ভেতরে খুব ভয় পেয়ে গেছেন। বাইরে থেকে তিনি দেখাচ্ছেন যে তিনিও পাণ্ডবদের বিশেষ করে অর্জুনের এই সব কাণ্ডে খুব খুশি, কিন্তু দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমোতেও পারছেন না। এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি কিভাবে পাওয়া যেতে পারে ভেবে তিনি কণিক নামে তার এক মন্ত্রী, যে খুব ভালো কূট মন্ত্রণা দিতে পারত, তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কণিক ছিল খুব তুখোড় বুদ্ধি সম্পন্ন, কুপরামর্শ দিতে ওস্তাদ। ধৃতরাষ্ট্রের মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকে গেছে পাণ্ডবরা দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে এখন আমার সন্তানদের কি হবে! তখনকার দিনে রাজাদের অনেক ধরণের পরামর্শদাতা থাকতো, কণিকও একজন পরামর্শদাতা।

কণিককে ধৃতরাষ্ট্র একেবারে সরাসরি স্পষ্ট করে বলছেন 'পাণ্ডবরা দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, এতে আমার ভয়ও হচ্ছে অন্য দিকে হিংসেও হচ্ছে, এখন আমি কি করে এই ভয়কে দূর করতে পারি তার একটা উপযুক্ত উপায় বার কর'। কণিক তখন ধৃতরাষ্ট্রকে যা বলছে এটা হল কূটনীতি, কূটনীতিকে অবলম্বন করে কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিচ্ছে শত্রুকে কিভাবে বশে রাখতে হয়। এগুলো সবই রাজাদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য এগুলো কখনই অনুকরণীয়ন নয়। রাজাদের জন্য হলেও এগুলো আমাদের জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে কারণ মহাভারতের কাহিনীতে পরবর্তি কালে যত রকমের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সেটা ঠিক এইখান থেকে শুরু হচ্ছে। কণিক কূটনীতির অনেক কথাই বলছে, এখানে আমরা কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

কণিক বলছে 'রাজাকে সব সময় এতটাই সাবধানে থাকতে হবে যে, শত্রু কখনই রাজার দুর্বলতাকে যেন না জানতে পারে। আমার এতদিনের অভিজ্ঞতাতে দেখেছি শত্রু যদি আপনার দুর্বলতার জায়গা গুলোকে জেনে যায় তাহলে সুযোগ পেলেই শত্রু সেই দুর্বলতাকে আশ্রয় করে আপনাকে মারবেই মারবে। সেইজন্য কখনই রাজাকে তার দুর্বলতা তার শত্রুকে এমনকি তার বন্ধুকেও জানতে দিতে নেই। দুর্বলতা তাকেই জানতে দেওয়া যেতে পারে, যার হাতে আপনার মৃত্যুর জন্য আপনি প্রস্তুত হয়ে গেছেন। নিজের স্ত্রীকেও দুর্বলতার বিষয় গুলিকে জানতে দিতে নেই। উল্টো দিকে রাজা যদি তার শত্রুর দুর্বলতা জেনে যায় তাহলে কখনই সেই দুর্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়বে না, সাথে সাথে তখনই সেই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। কচ্ছপ যেমন নিজের হাত, পা, মাথাকে গুটিয়ে নেয়' ব্যাসদেবের এটা খুব প্রিয় উপমা ছিল, 'ঠিক সেইভাবে রাজা তার নিজের অঙ্গকে রক্ষা করে'। কণিক রাজার সাতটি অঙ্গের কথা বলছে। এই সাতটি অঙ্গের কথা প্রথম আমরা বাল্মীকি রামায়ণে পাই, পরে মহাভারতে পাই পরে মনুস্মৃতিতেও আসবে। কণিক বলছেন যে কোন রাজ্যের সাত খানা অঙ্গ থাকে, আর এই সাত খানা অঙ্গকে যে করেই হোক সব সময় রক্ষা করতে

হবে। এর মধ্যে যে কোন একটা অঙ্গ যদি হানি হয়ে যায় তাহলেই কিন্তু রাজার বিপদ হয়ে যাবে। প্রথম অঙ্গ হল রাজা নিজে, রাজা যদি ধরা পরে গেল তাহলে রাজ্য শেষ। দ্বিতীয় অঙ্গ হল মন্ত্রী, মন্ত্রীর যদি কিছু হয়ে যায় বা ধরা পরে যায় তাহলে সব খেলা শেষ। তৃতীয় অঙ্গ রাষ্ট্র, রাষ্ট্র বলতে এখানে বোঝাচ্ছে রাজ্যের বাস্তবিক সীমানা, সীমানাকে রক্ষা করতে হবে। চতুর্থ অঙ্গ দুর্গ, রাজারা বিভিন্ন জায়গায় কেল্লা বানিয়ে রাখতেন, এই কেল্লা গুলোকে যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে। পঞ্চম অঙ্গ কোষাগার, যেখানে ধন-সম্পদ রাখা থাকে। আবুল ফজলের বই আকবার নামাতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, আকবর কিভাবে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করতেন আর কিভাবে সেগুলোকে সংরক্ষণ করতেন। ষষ্ঠ অঙ্গ হল বল, বল মানে সৈন্যবল, সৈন্যবল কখনই কম রাখতে দেবে না। শেষে সপ্তম অঙ্গ হল সুহৃৎ, সুহৃৎ হল রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী। রাজাকে এই সাতটা অঙ্গকে সব সময় রক্ষা করতে হয়, এই সাতটাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোন রকম অবহেলা করা চলবে না। মানুষের ব্যক্তিগত দৈনন্দীন জীবন যাপনেও এই নীতিকে অনুসরণ করা উচিৎ। রাজা যদি বুঝতে পেরে যায় শত্রু আমার অনিষ্ট করতে যাচ্ছে বা করতে পারে তখন কোন কালক্ষেপ নয়, যত তাড়াতাড়ি পারবে তার গলা কেটে দিতে হবে। যে সহজ শত্রু, অর্থাৎ যে শত্রুর শক্তি দুর্বল, সেই শত্রু যা চাইছে সেটা দিয়ে তাকে কিনে রাখবে। আজকের দিনে এর ভালো উদাহরণ হল আমেরিকা আর পাকিস্থানের সম্পর্ক। আমেরিকা দেখছে পাকিস্থান যদি আমেরিকার হাত থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া চীন পাকিস্থানকে হাত করে উপমহাদেশের উপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করে দেবে। পাকিস্থান স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই পাকিস্থানের উপর আমেরিকা খাপ্পা হয়ে আছে কিন্তু তাও টাকা ঢেলে যাচ্ছে। আমেরিকা জানে আমি যদি পাকিস্থানে টাকা ঢালা বন্ধ করে দিই আগামীকালই রাশিয়া বা চীন পাকিস্থানকে হাতে করে নেবে। আর এখন তালিবান ও সন্ত্রাসবাদীরা যত গোলমাল করছে এই সুযোগে চীনও পাকিস্থানে ঢোকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমেরিকাও সন্ত্রাসের নামে পাকিস্থানকে দিন রাত গালাগাল দিচ্ছে কিন্তু এদিকে টাকা ঢালা কিছুতে বন্ধ করছে না। পাকিস্থান হল আমেরিকার খুব সহজ শত্রু তাই টাকা দিয়ে কিনে রাখছে। কণিক বলছে, আগে ওকে টাকা পয়সা যা দেওয়ার দিয়ে কিনে নাও, তারপর সুযোগ পেলেই একটা সুযোগেই শেষ করে দাও। আগে রাজার শত্রু ছিল পরে রাজার সেবক হয়ে গেছে, যেদিন সুযোগ পাবে সেদিনই তার গলাটা উড়িয়ে দেবে। মানে কেউ রাজার যদি কোন দিন শত্রু ছিল, তাকে তুমি কখনই বিশ্বাস করবে না। কেউ যদি রাজার কোন দিন শত্রু হয়ে থাকে সে শত্রুই, পরে যদি রাজার বন্ধু হয়ে থাকে, সেবক হয়ে থাকে, যাই হয়ে থাকুক, কোন দিন তাকে ক্ষমা করতে নেই। এটাই হল কূটনীতি। যুধিষ্ঠির কিন্তু এগুলো কখনই পালন করত না।

যখন রাজ্য পরিচালিত হয় তার তিনটে পরিভাষা আছে, ত্রিবর্গ, পঞ্চবর্গ আর সপ্তবর্গ। এগুলো প্রথম বাল্মীকিই দেখিয়েছেন। ত্রিবর্গ হচ্ছে ঐশ্বর্য, উৎসাহ আর মন্ত্রণা শক্তি। পঞ্চবর্গ হল, মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ আর সৈন্য। আগে যে রাজার সাতটি অঙ্গ বলা হয়েছিল সেখান থেকে রাজা আর সুহৃৎকে বাদ দিয়ে বাকি পাঁচটাকে নিয়ে পঞ্চবর্গ করা হয়েছে। সপ্তবর্গ হল শত্রুকে নাশ করার সাতটি সাধন – প্রথম হচ্ছে সাম, শত্রুকে বুঝিয়ে বাজিয়ে নিজের দিকে নিয়ে আসা, দ্বিতীয় দান, টাকা পয়সা দিয়ে শত্রুকে কিনে নেওয়া, তৃতীয় ভেদ, শত্রুর দলের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে দেওয়া, চতুর্থ দণ্ড, শত্রুকে পিটুনি দেওয়া, পঞ্চম উদবন্ধন, শত্রুর উপর নানান রকমের বিধি নিষেধ আরোপ করা যাতে কেউ ওকে সাহায্য করতে না পারে, ষষ্ঠ বিষপ্রয়োগ, শত্রুকে বিষ প্রয়োগ করা, শেষে সপ্তম আগুন লাগিয়ে দেওয়া। এই সাতটা উপায়ে শত্রুর ত্রিবর্গ আর পঞ্চবর্গকে ধ্বংস কর। কিভাবে মারবে? আগে শত্রুপক্ষের প্রধান পাণ্ডাটাকে শেষ কর, তারপর তার সাকরেদ গুলোকে মারবে। একসাথে সব কটাকে মারতে যাওয়া উচিৎ হবে না।

এরপর কণিক খুব একটা মজার কথা বলছে ‘যখন শত্রুপক্ষের রাজ্যকে আক্রমণ করবে তখন যারা অগ্নিহোত্রাদি করেন এই ধরণের ব্রাহ্মণ, যারা গেরুয়া কাপড় পরিধান করে আছে, মানে সন্ন্যাসী, যারা জটাধারী ও মৃগচর্ম পরিধান করে, এই ধরণের লোকদের আগে থাকতেই শত্রুপক্ষের রাজ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। এরা আসলে কেউ ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী নয়, এরা সবাই তোমার গুপ্তচর। এই তিন ধরণের গুপ্তচররা আগে শত্রুপক্ষের রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে ওখানকার মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করে নেবে। ওখানকার লোকেদের যখন বিশ্বাস হয়ে যাবে তারপরেই তুমি ঐ রাজ্যের উপর সমস্ত সৈন্যবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর ঐ সময় আগে থেকে যে তোমার গুপ্তচররা ছড়িয়ে আছে তারা তখন তোমাকে নানা ভাবে সাহায্য করতে থাকবে। দরকার হলে গুজব ছড়িয়ে দিয়ে এরা তোমার শত্রুপক্ষের শিবিরে ত্রাস সৃষ্টি করে দেবে’। কয়েক বছর আগে গণেশের দুধ খাওয়ার ঘটনা আমাদের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। এই ঘটনা আজ পর্যন্ত রহস্যে ঢাকা পড়ে আছে, অনেক উঁচু স্তরের বড় বড় পদস্থ কর্তারাও জানে না সেদিন আসলে কি হয়েছিল। তবে অনেকে বলে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছিল একদিনে গুজব কি করে বাড়ি বাড়ি ছড়ান যেতে পারে, এটা খুব সুপরিকল্পিত ভাবে করা হয়েছিল। কণিক বলছে, হে ধৃতরাষ্ট্র শত্রুকে মারার জন্য এগুলো করতে হয়।

কণিক বলছে ‘হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আমরা আমাদের প্রাচীনদের কাছ থেকে শুনে এসেছি, যতক্ষণ তোমার সময় অনুকূল না হয়, তোমার মনের মত সময় যতক্ষণ না পাচ্ছ ততক্ষণ দরকার হলে শত্রুকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে হাটবে। যেদিন তোমার সুযোগ আসবে সেদিনই তাকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর হাঁটু গেড়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দাও’। আমরা বলতে পারি তাহলে তো সবাই এই রকমই করতে পার। না তা হত না, আগেকার দিনে তো এসব ছাপা অক্ষরে কোথাও পাওয়া যেত না। সব বিদ্যা সবাই জানতো না, আর তার থেকে বড় কথা ব্যক্তির মানসিকতা, যেমন যুধিষ্ঠির কখনই এই রকম কাজ করবে না। এখানে তাই বলছে, যেদিন তোমার সুযোগ আসবে সেদিন তোমার শত্রুকে কিভাবে মারবে? কুঁজোকে যেমন পাথরের উপর আছাড় মেরে ফটাস করে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

হে রাজন্, নীতি শাস্ত্রে এই ব্যাপারে একটা খুব জনশ্রুতি কাহিনী আছে। একটা জঙ্গলে চারটে বন্ধু ছিল, এরা হল একটা বাঘ, একটা নেকড়ে, একটা ইঁদুর আর একটা নেউল আর এদের সাথে একটা শেয়াল একসাথে বাস করত। এদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সেখানেই একটা হরিণের সর্দার ছিল বেশ মোটা হৃষ্টপুষ্ট। বাঘ অনেক বার চেষ্টা করেছে কিভাবে হরিণটাকে শিকার করে খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কিছুতে বাগে পাচ্ছে না। এদিকে শেয়ালেরও খুব ইচ্ছে মোটা হরিণটাকে পেলে ভালো হয়। শেয়ালের মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে, হরিণটা যখন ঘুমোবে তখন ইঁদুরটা গিয়ে পায়ের মাংসটা খাবলে দেবে, কাফ্ মাসেলস্ যদি কেটে যায় তাহলে হরিণের দৌড়ানোর শক্তি কমে যাবে আর বাঘ খুব সহজে হরিণকে ধরে নেবে। সবাই মিলে শলা পরামর্শ করে সব ঠিক করে নিয়েছে। এবার হরিণটা রাত্রি বেলা যখন ঘুমিয়েছে তখন ইঁদুরটা গিয়ে হরিণের গোড়ালিটা খুবলে দিয়েছে। পরের দিন সকালবেলা উঠে হরিণটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছে, এবার বাঘটা হরিণটাকে তাড়া করেছে, সেও পালাতে পারেনি, বাঘ গিয়ে সহজেই হরিণটাকে মেরে দিয়েছে। ইতিমধ্যে সবাই এসে গেছে, শেয়াল এসে বলছে, আপনারা সবাই স্নান করে আসুন ততক্ষণ আমি এই মরা হরিণটাকে পাহারা দিতে থাকি, তারপর সবাই মিলে এই হরিণের মাংসটা খাবো। সবাই স্নান করতে গেছে। স্নান সেরে সবার আগে বাঘ এসেছে। বাঘকে দেখে শেয়াল বলছে – দাদা কি লজ্জার কথা, ইঁদুর বলছে বাঘের ক্ষমতা কি যে হরিণকে মারতে পারবে, হরিণকে তো আমিই মেরেছি, আর আমার মারা হরিণকে বাঘ এখন হম্বিতম্বি করে খেতে চাইছে, বাঘের লজ্জাও করে না! বাঘ শুনেই বলছে, ছিঃ পুচকে একটা ইঁদুর আমার নামে এই কথা বলেছে, ইঁদুরের এঁটো আমি খাবই না। এই বলে বাঘ সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ইঁদুর এসে গেছে। ইঁদুরকে দেখেই শেয়াল বলছে, আরে ভাই ইঁদুর তুমি এসে গেছ, এই নেউল তোমার নামে একটা সংবাদ দিয়ে গেছে যে বাঘ এই হরিণকে মেরেছে, তাই এই হরিণটা বিষাক্ত হয়ে গেছে, এর মাংস খেলেই তুমি কিন্তু মারা যাবে, তুমি তো ছোট্ট প্রাণি, দ্যাখো এখন তুমি কি করবে। ইঁদুর বলল, এই হরিণের মাংস খেয়ে আমার প্রান হারিয়ে কাজ নেই। এই বলে ইঁদুর চলে গেছে। এরপর নেকড়ে এসে গেছে। নেকড়েকে শেয়াল বলছে, দ্যাখো, কেন জানিনা বাঘ তোমার উপর খুব রেগে গেছে, বাঘ তার বাঘিনীকে ডাকতে গেছে আর বলে গেছে আমরা দুজনে মিলে এই নেকড়ে ব্যাটাকে শেষ করব। নেকড়ে শুনেই সেখান থেকে প্রাণ ভয়ে পালিয়েছে। সবার শেষে নেউল এসেছে, তখন শেয়াল তাকে বলছে, বাকিগুলোকে আমি পিটিয়েই শেষ করেছি, এসো এবার তোমার পালা। নেউলতো ঐ শুনেই ঐ জায়গা থেকে পালিয়েছে। এরপর শেয়াল নিশ্চিন্তে বসে বসে একা পুরো হরিণের মাংসটা খেয়েছে। কণিক এই গল্প বলে বলছে, যে ভীতু তাকে ভয় দেখাবে, যে সুরবীর তার সামনে হাতজোড় করে তাকে বশে করবে। আসলে যারা খুব বীর তারা ভেতরে ভেতরে খুব অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকে। তাকে যদি একবার বলে দেওয়া হয় আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার বশে এসে যাবে। যে লোভী তাকে টাকা দিয়ে বশে আনতে হয় আর যে আপনার সমানে সমানে বা একটু দুর্বল তাকে পরাক্রম দেখিয় বশে আনতে হয়, যেমন নেউলটাকে শেয়াল করল।

‘হে রাজন্, সন্তান হোক, বন্ধু হোক, ভাই হোক, বাবা হোক বা গুরু হোক, এদের মধ্যে কেউ যদি আপনার শত্রুর স্থান নিয়ে নেয় বা আপনার বৈভব চায় তখন তাকে শেষ করে দিতেই হবে, এখানে কোন ধরণের আপোস বা সমঝোতা করলে চলবে না’। যারা ধর্মাচরণ করছে, জপ-ধ্যান তীর্থাদি করছে তাদের কাছে কাম আর অর্থ এই দুটো হল বাধা। আমরা যদি চাই একটা ভালো জীবন-যাপন করতে, নিয়মিত বেলুড় মঠে যাবো, খুব জপ-ধ্যান করব, শাস্ত্র কথা শুনব, কিন্তু আমরা পারিনা। কারণ হচ্ছে এই কামনা বাসনা, অর্থ উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করতে গিয়ে মন চঞ্চল হচ্ছে, তা নাহলে প্রতিদিন কত কিছুর প্রতি আকর্ষণ আজকে ক্রিকেট ম্যাচ, কালকে সিনেমা, পরশু অমুকে আসছে, এগুলো হচ্ছে বাধা। কণিক বলছে ‘একেই অর্থ আর কাম বাধা দিচ্ছে আবার কেউ যদি বেশী ধর্ম পালন করতে থাকে তাতে ধর্ম আর অর্থে বাধা পড়ে। সেইজন্য রাজাকে ধর্ম, অর্থ আর কামকে সামঞ্জস্য করে চলতে হবে, রাজা যদি এই তিনটেকে সামঞ্জস্য না

করে চলতে পারে তাহলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবে। আর মানুষ যতক্ষণ কষ্ট সহ্য না করে ততক্ষণ তার জীবনে কখন মঙ্গল হবে না। যদি কেউ জীবনে ভালো কিছু করতে চায় তাকে কিন্তু অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। তাই, হে ধৃতরাষ্ট্র যতক্ষণ আপনি এগুলো নিয়ে ভাবছেন সেই সাথে যদি আপনি কষ্ট স্বীকার না করেন তাহলে আপনার মঙ্গল হবে না। যখন প্রাণসঙ্কট উপস্থিত আর সেই সঙ্কট থেকে যখন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে তখন সে নিজের ভালোটাই চায়, তখনই সে ঠিক ঠিক নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরায়, এই প্রাণ আমি যখন অনেক কষ্টে ফিরে পেয়েছি তখন আর অপরের দিকে যাবো না। এই যে আপনি এখন এক সঙ্কটে পড়ে আছেন, আপনার মন এখন শোক সন্তপ্ত, এই অবস্থায় মানুষ যদি ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনার কথা ভাবে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র তিনি কত কষ্ট পেয়ে আবার উত্থান পেয়েছেন, নল-দময়ন্তীর কথা, এগুলোকে চিন্তন করলে শোকটা কমে যায়'। যার বুদ্ধি ভালো নেই, নিরাশা আর হতাশায় বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে, তাকে ভবিষ্যতে তোমার ভালো হবে, মঙ্গল হবে এই সান্ত্বনা বাক্যের টোপ খাইয়ে খাইয়ে বুদ্ধির মোহভ্রষ্টতা থেকে তাকে বার করে আনতে হয়। আপনার এক বন্ধু আছে, সে আপনার খুব প্রিয় কিন্তু কোন কারণে খুব শোকাকুল হয়ে আছে। তাকে তখন বলতে হয় – তুমি শোক করছ! এই দ্যাখো, তোমার থেকেও কত বড় বড় লোকেরা, শ্রীরামচন্দ্রের মত মানুষের জীবনে কত কষ্ট এসেছে, নল-দময়ন্তীকে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে , ইত্যাদি বলে তাকে শান্ত করতে হয়, আর যদি দেখ তার জীবন অন্ধকারময় হয়ে গেছে আর কিছু হচ্ছে না সব শেষ, তখন তাকে ভবিষ্যতের কিছু আশার কথা শুনিয়ে দিতে হয় বা এমন কিছু উপহার দিতে হয় যেগুলো তাকে ঐ অন্ধকার থেকে বার করে আনতে সাহায্য করবে।

'রাজা! মনে রাখবে যে বিত্তবান হয়ে গেছে, যার প্রচুর ধন সম্পদ এসে গেছে সে কখন অন্যের কাছে অর্থার্থি হয়ে যাবে না। যার সব কাজ মিটে গেছে সে কখন বন্ধুত্ব চালানোর চেষ্টা করবে না। সেইজন্য তোমার দেওয়া কাজ কখনই পুরো শেষ করবে না, যদি চাও যে তোমার কাছে মানুষ আনাগোনা করতে থাকুক, তাহলে সবার সব চাহিদা একবারে মিটিয়ে দেবে না। এসব ক্ষেত্রে রাজাকে সবার চাহিদাকে জিইয়ে রাখতে হয়। যদি তুমি কোন শত্রুকে পিটিয়ে বশে এনেছ এরপর তাকে যদি ছেড়ে দাও তাহলে তুমি জেনে নাও তুমি তোমার মৃত্যুকে ডেকে এনেছ, আজ হোক কাল হোক তোমার মৃত্যু হবেই। টাকা দিয়ে কাউকে বশে এনে ছেড়ে দিলে তাও বেঁচে যাবে কিন্তু পিটিয়ে বশে আনার পর ছেড়ে দিলে তুমি আর বাঁচবে না, সেদিন থেকে সে তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। শত্রু সামান্য হোক, দুর্বল হোক, ক্ষুদ্র হোক তাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় সে কিন্তু তালগাছের বীজের মত, তার শেকড়টা শক্ত আর একটা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত, একটা স্ফুলিঙ্গই বিরাট দাবানলের সৃষ্টি করে দিতে পার। এই পাণ্ডবরা আপনার শত্রু, আপনি খুব সাবধান, এরা আপনার বংশকে শেষ করে দেবে, তাই আপনি এখনই এদের শেষ করে দিন'। কণিকের এই কথাগুলোকে বলা হয় কূটশাস্ত্র। শাস্ত্র এই কারণেই বলা হয়, স্বামীজীও বলছেন ভারতে ধর্মের বাইরে কোন কিছুকেই রাখা হয় না। রেনে ডেকার্ড বলে একজন দার্শনিক, যিনি কার্ডোগ্রাফি নিয়ে এসেছিলেন। ডেকার্ড অনেক কিছুকে দুটো ভাগে ভেঙ্গে দিলেন, সেখান থেকে এসে গেল Mind and matter or God and world, এই দুটো আলাদা জিনিষ। এর ফলে সেমেটিক রিলিজিয়ান যখন কিছু দিনের জন্য ভারতে এলো তখন আমরা আমাদের ঐতিহ্যের ধারণাকে গুলিয়ে ফেললাম। স্বামীজী আবার ঐ ধারণাটাকে ফিরিয়ে আনলেন। ভারতে কোন কিছুকেই ধর্মের বাইরে দেখা হয় না, যখন কাউকে খুন করতে যাবে তখনও ধর্মের মনোভাব নিয়ে করা হয়, গুণ্ডারা যে খুন খারাপি করে ওগুলোকে চাণ্ডাল বৃত্তি বলে। এখানে কণিক যে কূটনীতি ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে, এটা রাজার ধর্ম, রাজা যদি এই ধর্ম পালন না করে তাহলে তার সেটা পাপ। যেমন গান্ধীজীর অহিংস ধর্মকে মহাভারত মানবে না, মহাভারতও বলবে অহিংসা পরমো ধর্মঃ, কিন্তু যদি আততায়ী হয় তাকে অবশ্যই বধ করতে হবে। আততায়ী কে? তারও সংজ্ঞা আছে, যে আগুন লাগিয়ে দেয়, নিরস্ত্রকে হত্যা করে ইত্যাদি। কিন্তু গান্ধীজীর ভাব ছিল অন্য রকম, তোমাকে যদি কেউ খুন করতে আসে খুন হয়ে যাবে কোন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে না। হিন্দুধর্মের কিন্তু এই মত নয়, জৈন ধর্মের এই মত। তবে প্রথমে বৌদ্ধ আর জৈন পরের দিকে ইসলাম আর খ্রীশ্চান এই সব ধর্মের এত প্রভাব হিন্দুধর্মের উপর এসেছে যার ফলে হিন্দুধর্মের আসলটা হারিয়ে গেছে। মহাভারত হিন্দু ধর্ম না, হিন্দুধর্মকে সব থেকে বেশী প্রভাবিত করেছে মহাভারত। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বেশী নির্ভর করে মহাভারতের উপর। কূটনীতি, যেটা রাজার ধর্ম এটিও ধর্মের একটি অঙ্গ। যেহেতু আমরা ইতিহাস মূলক শাস্ত্র পড়ছি, তাই তখনকার দিনে রাজার ধর্ম কি ছিল সেগুলোও আমাদের জানা প্রয়োজন।

বারণাবতে জতুগৃহের পর্ব এবং বিদুরের ভূমিকা

কণিক তো সব বলে গেল। এইবার দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন আর শকুনি মিলে পরমার্শ করে ঠিক করে দুর্যোধনের বিশ্বস্ত পুরোচনকে দিয়ে বারণাবতে একটা বিশেষ গৃহ নির্মাণ করেছে যার পুরোটাই লাক্ষা, ঘাস, ঘৃত ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ

দিয়ে তৈরী। এরপর ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে খুব কায়দা করে পাণ্ডবদের বারণাবতে ঘুরে আসার জন্য আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তোমরা অনেকদিন কোথাও ঘুরতে টুরতে যাওনি, সবাই মিলে একটু বেড়িয়ে এসো, একটু আমোদ আহ্লাদ করে এসো।

পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত আর তার জন্য জতুগৃহ নির্মাণ, মহাভারতের এই অংশটাকে কোন ভাবেই সন্দেহ করা যায় না। কারণ এই ঘটনার সাথে পরের দিকে অনেক আনুষাঙ্গিক কাহিনী সংযোগ হয়ে আছে, যার ফলে বারণাবতের ঘটনাকে সন্দেহ করলে মহাভারতের পরের ঘটনাগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। এখানে বিদুরকে একটা বড় ভূমিকা নিতে দেখা যায়, বিদুরের দূরদর্শিতা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা যে কত প্রখর ছিল এখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা জানি বিদুর ছিলেন দাসী পুত্র আর তিনিও ব্যাসদেবের নিয়োগ সন্তান। নিয়োগ সন্তানকে আসল সন্তান বলেই গ্রহণ করা হয়। ধৃতরাষ্ট্রও বিদুরকে ভাইয়ের মতই দেখতেন যদিও তিনি দাসী পুত্র। তিন ভাইয়ের মধ্যে বিদুর অনেক উন্নত ছিলেন এবং পরবর্তি কালে ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভায় তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা। কারুর মধ্যে আমরা যখনই ব্যতিক্রমী ভালো কিছু দেখি তখনই আমরা মনে করি ইনি একজন দেবতা বা ঈশ্বরের অংশের। ঠাকুরও বলছেন বিষ্ণুর অংশ থেকে জন্ম নিলে ভক্তি হয়, শিবের অংশ থেকে জন্ম নিলে জ্ঞান হয়। আমাদের হিন্দুদের দৃঢ় ধারণা যে আমরা সবাই কোন না কোন দেবতার অংশ থেকে জন্ম নিয়েছি। বৌদ্ধদের দালাই লামাদেরও এই ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস যে এর আগে যে লামা ছিলেন তাঁর অংশ থেকে এর জন্ম। বিদুরকেও একজন দেবতার অংশে জন্ম হয়েছে বলা হয়, বিদুর ছিলেন ধর্মাবতার। এটা ঠিকই যে, জীবনে বিদুর ধর্ম থেকে একটুও সরে আসেননি। বিদুরের জন্ম কাহিনী আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে ধর্মরাজকে পৃথিবীতে মানব শরীর ধারণ করতে হয়েছিল, সেই ধর্মরাজই এই বিদুর হয়ে জন্ম নিয়েছেন। বিদুর যে শুধু ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সুনীতিজ্ঞ, মহাভারতের এই একটিই খুঁত বিহীন চরিত্র।

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় পাণ্ডবরা এবার বারণাবতে যাবার প্রস্তুত হয়ে যখন হস্তিনাপুরের রাজসভাতে সবাইকে প্রণাম ও অভিবাদন সেরে রওনা হবেন তখন বিদুর সাঙ্কেতিক ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে কিছু বললেন। এখানে খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে *প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞপ্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞমিদং বচঃ। প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞং প্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচোহব্রবীৎ।* ।১/১৪৯/২০ প্রলা আর প্রাজ্ঞ এই দুটো শব্দকে নিয়ে শ্লোকে খেলা করা হয়েছে। এখানে কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতে বিদুর বলছেন না, বিদুর পণ্ডিতদের ভাষা জানতেন আবার ম্লেচ্ছদের ভাষাও জানতেন, যুধিষ্ঠিরও প্রাজ্ঞ ভাষা জানতেন আর ম্লেচ্ছ ভাষাও জানতেন। স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে একটা ভাষা তৈরী করে নেয়, ওরা ঠিক করে নিল প্রত্যেক শব্দের আগে আর পেছনে একটা করে 'ক' লাগিয়ে দেবে। এখন যদি 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ'। বলতে হয় ওরা বলবে 'কজয়ক কশ্রীক করামকৃষ্ণক', আর এমন দ্রুত বলবে যে কেউ ধরতেই পারবে না কি বলছে। এই নিয়ে অনেক মজার মজার কাহিনী আছে। এটাকেই ওরা সাঙ্কেতিক ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে। সাঙ্কেতিক ভাষাতে কিছু লিখতে গিয়ে বাচ্চারা অনেক সময় যে শব্দটা আছে তার পরের শব্দটা বসিয়ে দেবে যেমন, our লিখতে গিয়ে লিখবে pvs। যারা জানেনা তারা ভাববে কি লিখেছেরে বাবা, কোন অর্থই হয় না! কিন্তু না, এইটাই এদের সাঙ্কেতিক ভাষা। পুলিশ বা গুপ্তচররা এভাবেই কোডেড মেসেজ পাঠায়। যারা যমজ ভাই হয় তারা খেলার ছলে নতুন ভাষা সৃষ্টি করে বড় হয়েও ঐ ভাষাকে ছাড়ে না। যদি মনে করা হয় তখন সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষাই ছিল তাহলে কিন্তু এখানে বিদুরের কথা শুধু যে যুধিষ্ঠিরই বুঝতে পারবে তা নয়, প্রাকৃত ভাষাও অনেকে জানতেন, বিদুর তাই প্রাকৃত ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে কিছু পরামর্শ দিলে অন্যরা বুঝে ফেলতে পারবে বলে তিনি এই ম্লেচ্ছদের সাঙ্কেতিক ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন। অত বড় রাজসভাতে শুধু দজনই স্থানীয় প্রাকৃতিক ভাষা জানবে এটা কখনই সম্ভব হতে পারেনা। অনেক রকম সম্ভবনা থাকতে পারে, আমরা যুক্তি দিয়ে যেটা হতে পারে সেটাকেই বার করবার চেষ্টা করছি। এখানে সাঙ্কেতিক ভাষার থেকে কিছু সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে ইদানিং যত সাহিত্য রচনা হচ্ছে তার মধ্যে কিছু চরিত্রের মুখে স্থানীয় ভাষাকে ব্যবহার করা হয়, যেমন কোন চরিত্র যদি পূর্ববঙ্গের হয় তখন তার মুখে বাঙ্গাল শব্দ বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দীতে এটা একটা বাড়াবাড়িতে চলে গেছে, যে লেখক যেখানকার তিনি সেখানকার স্থানীয় ভাষার প্রয়োগ করছেন। কালিদাস যখন অভিজ্ঞান শকুন্তলা লিখেছেন সেখানেও তিনি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাকে সংমিশ্রণ করে রচনা করেছেন। মহাভারত কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে দৃঢ়, যখন প্রাকৃত ভাষা বা স্থানীয় ভাষা আসছে তখন ব্যাসদেব ঐ ভাষাতে যাচ্ছেন না, সংস্কৃত ভাষাতেই শ্লোক রচনা করেছেন। ইংরাজী সাহিত্যে কয়েকজন স্থানীয় ভাষাকে সাহিত্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য সমাজ এটাকে মেনে নেয়নি। সাহিত্য সাহিত্যই, সাহিত্যের মধ্যে স্থানীয় ভাষাকে ঢোকাতে নেই, মহাভারত এই ব্যাপারে খুব কঠোর।

বিদুর যুধিষ্ঠিরকে খুব কায়দা করে বলতে শুরু করেছেন যাতে বাকিরা কেউ ধরতে না পারে। দ্যাখো, যে মানুষ শত্রুর যে নীতি আর তার পেছনে যে বুদ্ধি কাজ করছে সেটাকে যদি বুঝে নেয় তাহলে কিন্তু সে সব সঙ্কট থেকে বেঁচে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার রাজনৈতিক বিষয়ের উপর যত সাহিত্য আছে তাতে এটার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। একে ভিত্তি করে তখনকার দিনের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ, চার্চিল, রুজভেল্ট, গান্ধীজীর উপর প্রচুর গবেষণা হয়েছে, এর মধ্যে বড় বড় সেনা নায়করাও আছেন। এনারা বসে বসে মাপতেন কার মাথায় কি ঘুরছে। চার্চিল সব সময় বসে বসে ভাবতেন রুজভেল্টের মাথায় কি ঘুরছে, সেই অনুসারে তিনি এক পা এগিয়ে থাকতেন। শত্রুর একটা নীতি আছে সেই নীতির পেছনে তার একটা বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিটাকে যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে এরপর তার বাঁচার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে, তার আর কোন সমস্যা থাকবে না। বিদুর প্রথমে এই সঙ্কেতটা যুধিষ্ঠিরকে দিলেন। যুধিষ্ঠির বুঝে নিল তার কাকা বিদুর তাকে সাবধান করে দিলেন, এই যে বারণাবতে পাঠানো হচ্ছে এটা একটা সুগভীর চক্রান্ত। এরপর বলছেন – *অলোহং নিশিতং শস্ত্রং শরীরপরিকর্তনম্। বিজ্ঞায়েহ তথা কুর্য্যাদাপদং নিস্তরেদ্‌যথা।*।১/১৪৯/২১। এমন একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে যেটা লোহার তৈরী নয় কিন্তু শরীরকে নষ্ট করে দেয়। একবার যদি সে এটা জেনে যায় তাহলে সে এটার থেকে বাঁচার পথও জেনে যায়। যুধিষ্ঠির বুঝে গেলেন, তীক্ষ্ণ অস্ত্র অথচ লোহার তৈরী নয় কিন্তু শরীরকে নাশ করে দেয়, বিদুর আগুনের কথা বলতে চাইছেন। বিদুর তারপর বলছেন, জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন ইঁদুর নিজের গর্তের মধ্যে ঢুকে নিজেকে রক্ষা করে নেয়। এর আগেই বলে দেওয়া হয়েছে বিদুর এই কথাগুলো ম্লেচ্ছ ভাষায় বলছেন, সবাই ভাবছে বিদুর কি আবোল তাবোল বকছে কিন্তু যে বোঝার সে ঠিক বুঝে নিচ্ছে – আমাকে মারা হবে কিন্তু শস্ত্র দিয়ে মারা হবে না আগুন দিয়ে মারা হবে। ইঁদুরের কথা বলতেই যুধিষ্ঠির বুঝে নিলেন তাকে একটা সুরঙ্গ পথ তৈরী করতে বলা হচ্ছে।

বিদুর তারপর বলছেন, যার চোখ নেই সে কখন রাস্তা জানতে পারেনা, যে অন্ধ সে দিশার জ্ঞান পায়না, যে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তার কখন সৎ বুদ্ধি থাকে না, আশা করি তুমি সব বুঝে নিলে। মূল কথা হল, তুমি যেখানে যাবে অন্ধ হয়ে থেকো না, সব কিছুতে ভালো করে নজরে রাখবে, দিনের বেলায় ভালো করে বুঝে নাও পূব কোন দিক পশ্চিম কোন দিক, কোনটা বেরোনোর রাস্তা এগুলো খুব ভালো করে দেখে নাও, তা নাহলে বিপদ যখন আসবে তখন তোমার কোন ইন্দ্রিয় কাজ করবে না। শেষে বিদুর বলছে, পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে যে দমন করে রাখে তাকে শত্রু কখন পীড়া দিতে পারেনা। এখানে বলতে চাইছেন, তোমরা পাঁচ ভাই সব সময় একসাথে থাকবে, আলাদা কেউ ঘোরাফেরা করবে না।

হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়ে আসার পর কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করছে 'বিদুর তোমাকে কি বলল আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না কিন্তু তুমি সব কথার পর 'বুঝেছি' বলছিলে। তুমি স্পষ্ট করে বলতো বিদুর কি বলতে চাইছিলেন'। যুধিষ্ঠির মাকে বললেন 'উনি বললেন আমাদের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হয়েছে, আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে, আমরা যেন সাবধান থাকি ইত্যাদি'। সবাই এবার বারণাবতে এসেছেন। পুরোচন খুব খাতির যত্ন করে পাণ্ডবদের ঘরে নিয়ে এসেছে। ওরা বুঝে গেছে আমাদের পুড়িয়ে মারার সব বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এদিকে বিদুর খুব গোপনে কিছু খনন কার্যে বিশারদ লোককে যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠিয়েছেন। তারা ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরে একটা সুরঙ্গ তৈরী করে দিয়েছে, যাতে বাড়ির ভেতর থেকেই সবাই পালিয়ে যেতে পারে, বাড়ির বাইরে যেতে হবে না। দিনের বেলায় পাঁচ ভাই মিলে সারাটা দিন চারিদিক ঘুরে ঘুরে কোথায় কোন জঙ্গল আছে, রাস্তাঘাট ইত্যাদি কোথায় কি আছে সব বুঝে নিয়েছে। এদিকে এমনই ভবিতব্য, সেদিন কোন ভোজ টোজ ছিল, এক ভিল রমণী তার পাঁচটি সন্তান সেদিন প্রচুর মদ মাংস খেয়ে নাচ-গান করার পর ক্লান্ত হয়ে ঐ জতুগৃহের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। যুধিষ্ঠির তখন সব ভাইদের নিয়ে ঠিক করল আজকেই উপযুক্ত সময় পালানোর। ওরা তখন নিজেরাই আগুন লাগিয়ে সুরঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেছে। ঐদিকে ভিল রমণী আর তার পাঁচ ছেলে মদ-টদ খেয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে, তারা সব ঐ আগুনে পুড়ে মরে গেছে। মহাভারতের কোথাও পাণ্ডবদের এই ধরণের কাজের পক্ষে কোন যুক্তির বিশ্লেষণ করা হয়নি। পরের দিকে সাহিত্যকাররা পাণ্ডবদের এই কাজের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। মূল মহাভারতে কোথাও এর বিশ্লেষণ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে আগুন লাগিয়ে বেরিয়ে গেছে। কারণ নিজের প্রাণ সংশয়ের সামনে কোন যুক্তিই দাঁড়ায় না।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে কিছু দূর আসার পর পাণ্ডবরা দেখছেন গঙ্গার পারে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর বিদুর যে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলেছিলেন, সেই ভাষায় লোকটা বিদুরের কথাটা উদ্ধৃত করেছে। তার অর্থ হল এই লোকটি বিদুরের বিশ্বস্ত। এই লোকটি এবার নৌকা করে সবাইকে তাড়াতাড়ি নদীর অপর পারে নিয়ে গেছে, যাতে দুর্যোধনের গুপ্তচররা এদের খোঁজ না পায়। এদিকে সবাই দেখছে জতুগৃহ পুড়ে গেছে তার মধ্যে পাঁচ জন মরে আছে তার

সঙ্গে একজন মহিলাও আছে। আসলে এরা ঐ ভীল জাতির মহিলা আর তার পাঁচ সন্তান। তখন তো আর ডিএনএ টেস্ট ছিল না, খবর চলে গেছে হস্তিনাপুরে যে পাণ্ডবরা কুন্তী সহ আগুনে পুড়ে মারা গেছে। ধৃতরাষ্ট্র তো নকল কান্নাকাটি করে পঞ্চ পাণ্ডবের নামে জলাঞ্জলী দিয়ে দিল, পাঁচটা পাণ্ডব শেষ, কুন্তিও শেষ, কাহিনীও এখানে শেষ।

হিড়িম্ব বধ, হিড়িম্বার সাথে ভীমের বিবাহ এবং ঘটোৎকচের জন্ম

এরপর কিছু কাহিনী চলছে, ভীম সবাইকে একাই কাউকে কাঁধে নিয়ে, কাউকে মুঠির মধ্যে ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বায়ু বেগে চলেছে আর মনে মনে খুব দুঃখ প্রকাশ করছে, কি থেকে কি হয়ে গেল আমাদের। জঙ্গলের মধ্যে এবার হিড়িম্ব আর হিড়িম্বার কাহিনী আসছে, এরা দুই রাক্ষস ভাই বোন। যদিও এদের রাক্ষস রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে কিন্তু এর বেশী ভাগই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। আসলে হিড়িম্ব আর হিড়িম্বারা জঙ্গলেরই কোন আদিবাসী হবে। আর্যরা তখন ভারতে প্রবেশ করে পূব দিকে বিস্তার করছিল, ভারতের যত আদিবাসীদের আর্যরা রাক্ষস বানিয়ে দিল। হিড়িম্বা এক আদিবাসী মেয়ে ভীমের ঐ বিশাল সুপুরুষ চেহারা দেখে তার প্রেমে পড়ে গেছে। এরপর ভীমের সাথে হিড়িম্বের লড়াই চলল, ভীম হিড়িম্বকে বধ করে দিয়েছে। এবারে হিড়িম্বা ভীমকে বিয়ে করবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করছে, যাই হোক কুন্তী রাজী হয়ে গেলেন। এখানে খুব মজার ব্যাপার হল, যুধিষ্ঠির জেষ্ঠ ভ্রাতা, ভীম যুধিষ্ঠিরের পরে, পরের দিকে বড় ভাইয়ের বিয়ের আগে ছোট ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে অনেক শ্লোক আসবে, কিন্তু এখানে ভীম যুধিষ্ঠিরের আগে বিয়ে করছেন, তাও আবার শুধু অসবর্ণই নয়, ধর্মও এক নয় একেবারেই অন্য জাতের এক আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, যদিও এখানে হিড়িম্বাকে রাক্ষস জাতি বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। অবশ্য তখনকার দিনে অনার্য আদিবাসীদের এরা রাক্ষস নামেই সম্বোধিত করত। বিয়ের পর ভীম আর হিড়িম্বি একসাথে কিছু দিন থাকল, তাদের দুজনের থেকে এক সন্তানের জন্ম হল, তার নাম ঘটোৎকচ। মহাভারত ঘটোৎকচকে আরও বড় অসুর বানিয়ে দিয়েছে। এরপর হিড়িম্বা আর ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ আর হিড়িম্বা মা পুত্র মিলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। বিদায় নেওয়ার আগে ঘটোৎকচ পিতা ভীমকে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, বাবা, আপনারা যখনই আমাকে আপনাদের সেবার জন্য স্মরণ করবেন আমি ভৃত্যবৎ আপনাদের সেবায় এসে হাজির হব। এরপর ঘটোৎকচ দুবার হাজির হবে, একবার যখন পাণ্ডবরা বনবাসে থাকবে আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়। কিন্তু হিড়িম্বার কাহিনী এইখানেই শেষ, এরপর আর হিড়িম্বার নাম মহাভারতে কোথাও আসবে না।

বকাসুর বধ

হিড়িম্বাদের এলাকা থেকে এবার পাণ্ডবরা সরে এসেছেন। এবারে তারা একচক্র নামে একটি গ্রামে ছদ্মবেশে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে অতিথি রূপে আছেন। এই কাহিনীও আমাদের সবারই জানা। একচক্র গ্রামের পাশেই বকাসুর নামে এক রাক্ষস থাকত, সেই রাক্ষস সমস্ত লোকেদের ধরে খেয়ে নিত বলে সবাই মিলে একটা চুক্তি করল যে প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন ব্যক্তি একটা গরুর গাড়িতে এক গাড়ি ভাত, আনাজ, মাংস রান্না করে নিয়ে যাবে, সঙ্গে দুটো মোষ থাকবে, বকাসুর সবটাই খাবে, এক গাড়ি খাবার সাথে মোষটাকে খাবে আর যে নিয়ে গেছে সেই লোকটাকেও খাবে। পাণ্ডবরা যে ব্রাহ্মণ বাড়িতে আছে, একদিন সেই বাড়ির পালা এসেছে। এখন এই ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে জোর আলোচনা চলছে কে খাবার নিয়ে রাক্ষসের কাছে যাবে। এই নিয়ে এখানে একটা লম্বা আলোচনা আছে, বুড়ো ব্রাহ্মণ বলছে আমি যাই, তাঁর স্ত্রী বলছে আমি যাব, তাদের কন্যা বলছে আমি যাব আর তাদের ছেলে বলছে আমিই যাব। এর মধ্যে যে যার নিজের নিজের যুক্তি দিচ্ছে। স্ত্রী বলছে আমি নারী, নারী বধ শাস্ত্রে নিষেধ তাই আমি গেলে আমাকে ছেড়েও দিতে পার। তখন ব্রাহ্মণ খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন *আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি। আত্মানাং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি।* ।১/১৫২/২৭। আপদ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য নিজের ধণ সম্পদের রক্ষা করবে, ধন সম্পত্তি দিয়ে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবে আর সম্পত্তি ও স্ত্রীর দ্বারা নিজের রক্ষা করবে। এটা হল মহাভারতের মত। এরা আগে একটা মত এসেছিল যেখানে দেখানো হয়েছিল অর্থ আর কাম চারটে পুরুষার্থের মধ্যে বিরাট গুরুত্ব। ঠিক এই কারণেই অর্থ আর কামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, অর্থ আর কাম যদি ঠিক ঠিক সাধিত না হয় তাহলে নিজের রক্ষা হয় না। সন্ন্যাসী বাদে কেউ নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা। নিজের রক্ষা সব সময় হয়ে থাকে কামিনী আর কাঞ্চনের দ্বারা। কথামৃত হল মোক্ষশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র কখনই কামিনী-কাঞ্চনকে উৎসাহ করবে না, তাও ঠাকুর বলছেন, দরবেশ আর পঞ্ছী সঞ্চয় করবে না, পাখীও যখন ছানা হয় তখন সঞ্চয় করবে দরবেশ কিন্তু তাও করবে না। কিন্তু মহাভারত সাধারণকে কিসের লক্ষ্য দিচ্ছে? আপদ বিপদ সবার জীবনে আসবে তখন তোমার সম্পত্তিই সেই বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করবে, ঐ সম্পত্তি দিয়ে নিজের স্ত্রীর রক্ষা হবে আর সেই সম্পত্তি আর স্ত্রীর দ্বারা নিজের রক্ষা করবে।

কুন্তী আন্দাজ করেছেন ব্রাহ্মণ পরিবারে কিছু একটা সঙ্কট হয়েছে, এরা সবাই কেমন বিমর্ষ হয়ে আছে। আমরা এদের অতিথি হয়ে আছি, এদের যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে সেখানে আমাদের সাহায্য করা উচিৎ। কুন্তী সব শুনেছেন, ওদের স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের সবার যার যার যুক্তিও শুনেছেন, কুন্তী তখন বলছে, তোমাদের কাউকেই কিছু করতে হবে না আমার ভীমই সব খাবার নিয়ে রাক্ষসের কাছে আজ রাত্রিবেলা যাবে। কুন্তীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ বিব্রত হয়ে গেছে, এনারা আমাদের অতিথি, অতিথিকে কি করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন, তাহলে তো আমার সমস্ত ধর্ম নাশ হয়ে যাবে। কুন্তী বলছেন, আপনাদের কোন চিন্তা নেই আমার ভীম আজই ওই রাক্ষসকে বধ করে আসবে। ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করতে চাইছে না। এখানে কুন্তী খুব মজা করে বলছেন, যদিও এগুলো অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। কুন্তী বলছেন, একবার আমার এই সন্তান ভীম বাচ্চা বয়সে আমার কোল থেকে পাথরের উপরে গিয়ে পরেছিল, পাথরটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

বলা হয় নাকি ভীমের শরীরের এক হাজার হাতির সমান শক্তি ছিল। এর পেছন একটা কাহিনী আছে। ছোটবেলাতে ভীমের প্রচণ্ড শক্তি ও পরাক্রমের জন্য দুর্যোধনরা খুব হিংসা করত, ভীমকে যদি শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে পাণ্ডবদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। এই ভেবে দুর্যোধনরা ভীমকে একদিন লোভ দেখিয়ে খুব খাইয়েছে। সেই খাবারের মধ্যে বিষ মেশানো ছিল। ভীম আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পরলে দুর্যোধনরা হাত পা বেঁধে নদীর জলে ফেলে দিল। ভীমকে নদীর জলে ফেলে দিল ভীম সেখান থেকে নাগেদের দেশে চলে গিয়েছিল। সেখানে নাগেরা এমন করে দিল তাতে তার তার বিষটাও চলে গেল আবার এক হাজার হাতির শক্তিও সে পেয়ে গেল। কিন্তু তারও আগে ভীম মায়ের কোল থেকে পাথরের উপর পরে গিয়েছিল তাতে পাথরটাই ভেঙ্গে গিয়েছিল। এগুলো অতিশয়োক্তি। আমরা মনে করি ভীম প্রচণ্ড শক্তিশালী কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম একবার নয় অনেকবার অনেকের কাছেই মার খেয়েছে, তখন সে কিছুই করতে পারেনি। কর্ণ তো একবার ধনুষ লাগিয়ে আচ্ছা করে পিটিয়ে ভীমকে বলছে, বেশী বকবক করো না। তারপর অভিমন্যু যেদিন মারা গেল সেদিন জয়দ্রথের সামনে ভীমতো দাঁড়াতেই পারলো না। এই রকম অনেকের কাছেই ভীম মার খেয়েছিল। আমরা যে মনে করি ভীমের শরীরে এক হাজার হাতির শক্তি ছিল, তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, আসলে তা নয়, ভীমও অনেকবার পরাস্তও হয়েছিল আর মারও খেয়েছিল। একমাত্র অর্জুনই কখন মার খায়নি। মূল কথা হচ্ছে ভীমের প্রচণ্ড শক্তি তোমাদের চিন্তার কিছু নেই।

যাই হোক, ভীম এক গরু গাড়ি বোঝাই প্রচুর খাবার নিয়ে গেছে। এতদিন ভিক্ষা করে যা জুটত তাই খেত, এখন প্রচুর খাবার পেয়ে গিয়ে ভীম একাই সব খেতে শুরু করেছে। এদিকে বকাসুর দেখছে আমার জন্য যে ব্যাটা খাবার নিয়ে এসেছে সে নিজেই আমার খাবার খেতে শুরু করেছে। বকাসুর খুব রেগে গেছে। এরপর যা হয়, জোর মারামারি শুরু হয়েছে। বকাসুর ভীমের কাছে পরাস্ত হয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেল। বকাসুর মারা যেতেই তার আত্মীয়-স্বজনরা ভয়ে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভীম তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর আজ থেকে আর নরহত্যা করবে না, যে রাক্ষস নরহিংসা করবে তার এই বকাসুরের মত পরিণতি হবে, তোমার গরু, মোষ, হরিণ ও বন্যপ্রাণি মেরে খেতে পার কিন্তু নরহিংসা করা চলবে না।

দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম রহস্য

এরপর কাহিনীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দ্রৌপদী আর ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মের ইতিহাসে। দ্রোণাচার্য দ্রুপদকে বন্দী করে বলে দিয়েছিল গঙ্গার এই পার তোমার আর এই পারটা আমার অধীন। দ্রুপদ তার অপমান ভুলে যায়নি। সে চেষ্টায় আছে এর বদলা কি ভাবে নেওয়া যেতে পারে। দ্রুপদ একজন খুব বড় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলছে, আমার এমন এক সন্তান চাই যে দ্রোণকে বধ করবে এর জন্য যা দৈবকার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন আমি সবই করতে রাজি আছি। তখন সেই ব্রাহ্মণ বললেন, আমি এই নীচ কাজ করিনা। দ্রুপদ তারপরেও অনেকবার করে আকুতি মিনতি করাতে সেই ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি আমার দাদার কাছে যাও সে ফলাকাঙ্খী হয়ে যজ্ঞ করে আপনি যদি প্রচুর ধনরত্ন দেন তাহলে সে এই কাজ করতে রাজী হবে। এরপর দ্রুপদ তার দাদার কাছে গিয়ে যজ্ঞের কথা বলে প্রথমে বলল আমি আপনাকে এক হাজার গরু দান করব, তারপরে বলছে লক্ষ লক্ষ গরু দেব শেষে বলছে আট অর্ব্বুদ গরু দান করব। লোভী ব্রাহ্মণ রাজী হয়ে গেছে। লোভী হলেও দাদা খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যজ্ঞ বেদী রচনা করার পর অগ্নি স্থাপন করেছেন, এরপর হবি তৈরী করেছেন, এই হবি পান করলেই সন্তান হবে। এই কাহিনীর মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এত বড় যজ্ঞ হচ্ছে কিন্তু এর ধারে কাছে রানীকে দেখা যাচ্ছে না। হবি তৈরী করে রানীকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। পুরোহিত রানীকে হবির পাত্র দিয়ে বলছেন, তুমি এখনই এই হবি পান করে নাও আর আজকেই

তোমার পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান হয়ে যাবে। রানী তখন বলছেন – *অবলিপ্তং মুখং ব্রহ্মণ্ দিব্যান্ গন্ধান্ বিভর্মিচ। সুতার্থে নোপলব্ধাস্মি তিষ্ঠ যাজ মম প্রিয়ে।।*১/১৬৬/৩৭। ও পুরোহিত মশাই আমার মুখে এখন পান, শরীরে নানান দিব্যরাগ। পান খাওয়ার প্রচলন ভারতে অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে আর বলে মেয়েদের পান অবশ্যই খেতে হয়। পানের সাথে যে চুন আর খয়ের দেওয়া হয় তাতে চুন শরীরে ক্যালসিয়াম বাড়ায় আর খয়ের নাকি ক্যানসার প্রতিরোধক। যাই হোক, রানী বলছেন আমার মুখে পান আর শরীরে অনেক দিব্যরাগ, এখন মুখ না ধুয়ে আর শরীর পরিষ্কার না করে আমি এই পবিত্র সন্তানোৎপাদক হবি কি করে গ্রহণ করি! এই প্রিয়কার্যের জন্য একটু অপেক্ষা করুন।

পুরোহিত তখন বলছে, এই হবি এখন তৈরী হয়ে গেছে, এর শুভ মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, একে আর রাখা যাবে না। এখন আর কিছুই করার নেই। রানীর বিলম্ব দেখে উনি ঐ হবিকে যজ্ঞের অগ্নিতে ঢেলে দিয়েছেন। আগুনে ঐ হবি ঢালতেই সেই অগ্নি থেকে বেরিয়ে এল এক দিব্যকান্তের সুকুমার কুমার, ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়ে গেল। তার পরেই বেরিয়ে এল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী, দ্রৌপদীর জন্ম হয়ে গেল। দ্রৌপদী কৃষ্ণাবর্ণা ছিল বলে দ্রৌপদীরে আরেকটা নাম কৃষ্ণা। ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অগ্নি থেকে এই তিনজনের জন্ম হয়েছিল, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী আর পরে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব। এর পশ্চাতে কি আছে আমাদের বলা মুশকিল, আর বর্ণনা করছে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদী যখনই জন্ম নিয়েছে তখনই তারা বড়। দ্রৌপদীকে যদি বড় না দেখান হয় বা যদি যজ্ঞের এই কাহিনীটা মহাভারত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একটা বিরাট সমস্যা এসে যাবে। কারণ অর্জুনরা যখন দ্রুপদ রাজ্য আক্রমণ করেছিল তখন অর্জুনের বয়স খুব কম হলেও চৌদ্দ পনেরো হবে, তা নাহলে অত তীর ধনুক চালাবে কি করে। তারপরে যদি দ্রৌপদীর জন্ম হয় তাহলে অর্জুনের সাথে দ্রৌপদীর বয়সের পার্থক্য চৌদ্দ পনেরো বছরের হয়ে যাবে। অথচ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর এর কয়েক দিন পরেই হতে যাচ্ছে। তাহলে দ্রৌপদী একেবারেই বাচ্চা থাকার কথা, এটাকে তো মেলানো যাবে না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এটাকে মেনে নিতে হবে যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদীরা যমজ ভাই-বোন রূপে আগেই জন্ম নিয়েছিল। পরে এটাকে কাহিনী রূপে দাঁড় করাবার জন্য যজ্ঞের কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। মূল ঘটনা হল অগ্নি থেকে এই দুজনের জন্ম হয়েছে।

দ্রৌপদীর রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যাসদেব বলছেন – *শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষি নীলকুঞ্চিতমুর্ধজা। তাম্রতুঙ্গনখি সুভ্রুশ্চারুপীনপয়োধরা।।*১/১৬৬/৪৫। দ্রৌপদীর গাত্রের বর্ণ শ্যামলা, লোচনযুগল পদ্মপলাশের মত সুশোভন আর অতি বিস্তির্ণ, মাথার কেশ নীল ও ঢেউ খেলানো। তারপর বলছেন – *মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী নীলোৎপলসমো গন্ধোযস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রভাবতি।।*১/১৬৬/৪৬। অমরবর্ণিনীকে ভাষ্যকাররা অনুবাদ করছেন দুর্গাদেবী বলে। দ্রৌপদীকে দেখে মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ দুর্গাদেবী যেন মানবী রূপ নিয়ে জন্ম নিয়েছেন। দ্রৌপদীর শরীর থেকে নীলপদ্ম ফুলের গন্ধ এক ক্রোশ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম কি ভাবে হল? *ধৃষ্টত্বাদত্যমর্ষিত্বাদ্ দ্যুম্নাদ্যুৎসম্ভবাদপি। ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কুমারোহয়ং দ্রুপদস্য ভবত্বিতি।।*১/১৬৬/৫৩। ধৃষ্ট মানে প্রগলভ, কাউকে ভয় পাবে না আর দ্যুম্ন মানে দ্যুতিমান, শরীরে এত তেজ যে সব সময় দ্যুতিমান তাই এর নাম হল ধৃষ্টদ্যুম্ন।

দ্রোনাচার্যের কাছে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা

ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়ে গেছে। এদিকে দ্রোণাচার্যও জানেন ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়েছে আমার বধের জন্য। দ্রোণাচার্য বলছেন *অমোক্ষণীয়ং দৈবং হি ভাবি মত্বা মহামতিঃ। তথা তৎ কৃতবান্ দ্রোণ আত্মকীর্ত্যনুরক্ষণাৎ।।* ১/১৬৬/৫৬। দৈব বা ভাগ্য অমোঘ, একে পাল্টানো যায় না। আমি একে শিক্ষা দিই আর নাই দিই, এ আমাকে বধ করবেই। শকুন্তলা ঠিক এই কথা বলেছিলেন রাজা দুষ্মন্তকে নিজের সন্তান ভরতের নামে। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বলেছে একদিন আমার এই সন্তান সমস্ত ভারতের রাজা হবে, আপনি একে আপনার সন্তান বলে গ্রহণ করুন আর নাই করুন। মহাভারতে দৈবকে খুব বেশী মানা হয়। এই যে ধৃষ্টদ্যুম্নের যজ্ঞ থেকে জন্ম হয়েছে কার বধের নিমিত্ত? সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্যের বধের জন। তাই দ্রোণাচার্য বলছেন, আমার বধ যদি এর হাতেই হবে বলে ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আমার ধর্ম কেন আমি ছাড়ব। এখানে খুব সুন্দর বলা হচ্ছে – ভারদ্বাজ প্রতাপবান। জানে এই লোকটা আমাকে মারবে কিন্তু তাই বলে তাঁর মনে একটুও বিকার এলো না, এই হচ্ছে প্রতাপ। দ্রোণাচার্য নিজের বাড়িতে রাখলেন, সমস্ত অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দিলেন, অর্জুনকে যা যা শিখিয়েছেন একেও তাই শেখালেন। এখানে বলা হচ্ছে, *আত্মকীর্ত্যনুরক্ষণাৎ*, নিজের কীর্তিকে রক্ষা করার জন্য এত মহৎ কাজ করলেন। দ্রোণাচার্যের কীর্তি কি? কোন ক্ষত্রিয় রাজকুমার যদি আমার কাছে অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা নিতে চায় আমি তাতে কখনই না করব না। ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজকুমার, সে কোথায় শিক্ষা নেবে? দ্রোণাচার্যের কাছে। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা নিতে গেলে

এখন তার বাড়িতেই থাকতে হবে। দ্রোণাচার্যের বাড়িতে থাকছে, তাঁর কাছে অস্ত্র শিক্ষা নিচ্ছে, দ্রোণাচার্য জানেন যে এর জন্ম হয়েছে আমাকে বধ করবার জন্য। পরে দ্রোণাচার্যের বধের বর্ণনা আসবে। দ্রোণাচার্য নিজের ধর্মকে কখনই ছাড়লেন না। সেইজন্য বলা হয় ধর্ম কখন ছাড়তে নেই। ধর্ম রাখতে গিয়ে যদি কেউ মারও খায়, ঐ মার খাওয়ার পূণ্যেই সে আবার আরও শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে। ছাগল গরু যখন চড়ে বেড়ায় তখন ততটুকুই ঘাসে মুখ দিয়ে চড়ে যতটুকু সে দেখতে পায়, তার বেশী দেখতে পায়না। আমাদেরও গরু ছাগলের বুদ্ধি, যদিও মাথাটা উপরে কিন্তু বুদ্ধিটা সব সময় নীচের দিকে। আমরা ভাবি একটু যদি মিথ্যে কথা বলি একটু যদি কুকর্ম অধর্ম করি নিই তাহলে এই যাত্রায় বেঁচে যাব। আর যদি পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিই তখন মনে করি আমি শেষ হয়ে গেলাম। না, শেষ হয়ে যাবে না। ধর্মে অবস্থিত থেকে যখন ঐ পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিলাম তখন ঐ পূণ্যের জোরে আবার আমি উঠে দাঁড়াব। ধৃষ্টদ্যুম্নের কিভাবে জন্ম হয়েছে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে কেন দ্রোণাচার্য অস্ত্র শিক্ষা দিলেন, দ্রোণাচার্য এটা কি মানতেন কি মানতেন না যে ধৃষ্টদ্যুম্নের যজ্ঞ থেকে জন্ম হয়েছিল, এগুলো আমরা কিছুই জানিনা। কিন্তু মহাভারত নিজের কাজটা করে দিল, মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়ে দিল – তুমি যদি জেনে যাও মৃত্যু তোমার অবশ্যম্ভাবি, তাও ধর্ম তুমি ছেড়ো না, তুমি যে ধর্মাচরণ করে যাচ্ছিলে সেটাকে চালিয়ে যাও।

যখন ভারত পাকিস্থান ভাগ হচ্ছিল, আজ পর্যন্ত কেউ জানেনা ভারত পাকিস্থান বিভাজনের জন্য তখন কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। কেউ বলে দশ লাখ, কেউ বলে কুড়ি লাখ, ইংরেজরা বলছে দুই লাখ, কিন্তু পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না ঠিক কত লোক ঐ কয়েক দিনের মধ্যে মারা গিয়েছিল। কম করে দশ লাখ তো সবাই মেনে নিয়েছে। সেখানে একটা ঘটনা আছে, দাঙ্গার সময় মুসলমান জনতারা একটা শিখ অধ্যুষিত গ্রামকে ঘিরে ফেলেছিল। সেই সময় দেড়শ দুশো শিখ মহিলারা ঠিক করে নিয়েছে আমরা মরে যাবো তবুও আমাদের ইজ্জত হারাতে দেব না। তারা সবাই কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এই খবর পেয়ে নেহরুর বোন ও আরও কয়েকজন সেখানে সরেজমিনে গেছেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত চোখের জলে লিখছেন, আজকে সেই পূণ্যভূমি দর্শন করে এলাম যেখানে মেয়েরা নিজেদের সতীত্ব ধর্মকে রক্ষা করার জন্য কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দিয়েছে।

পরের দিকে একজন ব্রটিশ লেখক এই নিয়ে একটা বইতে বলছেন, এটা কি ধরণের একটা মুর্খ ধারণা যে সতীত্ব রক্ষা যেন নিজের প্রাণ রক্ষার থেকেও বেশী। কোনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সতীত্ব রক্ষা না নিজের জীবনকে রক্ষা করা, এই প্রশ্নের বিচার করা খুব মুশকিল। কিছু দিন ধরে সুপ্রীম কোর্টে একটা শুনানী চলছে, তাতে একজন মহিলা গত তিরিশ বছর ধরে কোমাতে পরে আছে। তারও এই জিনিষ হয়েছিল, তার শ্লীলতাহানি হয়েছিল, তারপর থেকে মহিলা কোমাতে চলে গেছে। ধর্ম জিনিষটা যে কি, মানুষ কোনটাকে মানবে আর কোনটাকে মানবে না পরিষ্কার করে বলা যায় না, আর মহাভারত পড়লে আরও সংশয় এসে যায়। তখন এইটাই হয়, আমার ধর্ম আমার কাছে, তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমি যেটা ঠিক করব সেটা তোমার ক্ষেত্রে চলবে না, তুমি যেটা ঠিক করবে সেটা আমার জন্য চলবে না। আমরা এখানে জানিনা দ্রোণাচার্য যদি ধৃষ্টদ্যুম্নকে শিক্ষা না দিতেন তাহলে কি ধৃষ্টদ্যুম্ন কি দ্রোণাচার্যকে মারতে পারত? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে মারতে পারলো না, মিথ্যা কথা শুনিয়ে দ্রোণাচার্যকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য কর হল, তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন মারল। দ্রোণাচার্যের হাতে অস্ত্র থাকলে তাঁকে কেউই মারতে পারতো না। সেইজন্য ধর্ম খুব জটিল ও সূক্ষ্ম হয়ে দাঁড়ায়। তাই একটা জায়গার পর সবাই হাত তুলে দেয়, কারণ এরপর আর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তখন এনারা কাহিনীর সৃষ্টি করে জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের আয়োজন চলছে। রাজা দ্রুপদ কিন্তু মনে মনে অন্য চিন্তা করছিল। যদিও দ্রোণাচার্য তাঁকে অপমান করেছিল, সেইজন্য দ্রোণাচার্যকে বধ করার জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন অন্য দিকে যে অর্জুন তাঁকে যুদ্ধে হারিয়েছিল সেই অর্জুনের প্রতি তাঁর একটা স্নেহ এসে গিয়েছিল। আর মনে মনে ঠিক করেছিল অর্জুন যদি দ্রৌপদীকে বিয়ে করে, কিন্তু শুনেছেন পাণ্ডবর লাক্ষা গৃহে পুড়ে মারা গেছে। তখন দ্রুপদের যে গুরু ছিলেন তিনি বলছেন – *বৃদ্ধানুশাসনে সক্তাঃ পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ। তাদ্দশা ন বিনশ্যন্তি নৈব যান্তি পরভবম্।।* হে রাজন্ পাণ্ডবরা গুরুজনদের আদেশ চিরদিন মেনে চলেছেন, আর ধর্মের আচরণ করে আসছেন, এই ধরণের মানুষদের কখনই অপঘাতে মৃত্যু হয় না, পরাজিতও হয় না। তাই এটা হতেই পারেনা যে অর্জুন মারা গেছে। এরপর দুটো বড় কাহিনী আসে।

ব্যাসদেবের সাথে যুধিষ্ঠিরের দেখা হয়েছে। সব খবরাখবর নেওয়ার পর ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একটা কাহিনী বলছেন। এক ঋষিকন্যা ছিল। কন্যাটি খুব সুন্দরী ও সুলক্ষণা হওয়া সত্ত্বেও পাত্রস্থ করা যাচ্ছিল না। তখন সেই ঋষিকন্যাকে শিবের আরাধনা করতে বলা হল। শিব হলেন সন্ন্যাসীদেরও আরাধ্য আবার গৃহস্তদেরও আরাধ্য, মেয়েরা শিবচতুর্দশীর দিন উপোস করে ভালো বর পাওয়ার জন্য আর সন্ন্যাসীরা উপোস করে ত্যাগ তপস্যা বাড়ার জন্য। ঋষিকন্যার আরাধনায় খুশি শিব বললেন, বল তুমি কি বর চাও। মেয়েটি বলল আমার যেন সর্বগুণসম্পন্ন স্বামী হয়। সেটা আবার পাঁচবার বলল। শিব তখন বললেন তুমি পাঁচবার বলেছ তাই তোমার পাঁচটি স্বামী হবে। ঋষিকন্যা বলছেন, তা কি করে হয় আমার একটাই স্বামী চাই। শিব বলছেন, এখন আর কিছু করার নেই। তোমার এই জন্মে তো স্বামী হবে না, কিন্তু আগামী জন্মে তোমার পাঁচটি স্বামী হবে।

একচক্রে বকাসুর বধ হয়ে যাওয়ার খবর চারিদিকে চাউড় হয়ে গেছে, বকাসুরকে বধ করতে পারে এমন বীর ভারতে কে থাকতে পারে! পাণ্ডবদের শক্তির খবর জানাজানি হয়ে যেতে পারে বলে এনারা একচক্র গ্রাম থেকে সরে এসেছে। বেরিয়ে এসে এখনও ছদ্মবেশে রয়েছেন। ইতিমধ্যে খবর পেল দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হতে যাচ্ছে। এরাও ব্রাহ্মণ বেশে স্বয়ম্বর সভাতে যাবে বলে ঠিক করল। এদিকে এক গন্ধর্ব পাণ্ডবদের বলল, তোমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্য একজন ব্রাহ্মণকে কুলগুরু রূপে নিয়োগ কর। কোন ব্রাহ্মণকে গুরু রূপে বরণ না করলে তোমাদের অনেক বিপদ হতে পারে। এইভাবে ব্রাহ্মণ্যদের প্রভাব আমাদের দৈনন্দীন জীবনে আস্তে করে প্রবেশ করে যাচ্ছে। এই গন্ধর্বের নাম চিত্ররথ। প্রথমের দিকে চিত্ররথের সাথে অর্জুনের অনেক বিরোধ হয়েছিল, পরে অর্জুনের সাথে চিত্ররথের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এই চিত্ররথ অর্জুনকে অনেক ব্যাপারে সাহায্যও করেছিল। চিত্ররথ বলছে, তোমাদের পূর্বজদের গুরু ছিলে বশিষ্ঠদেব, তোমরাও একজনকে গুরু রূপে বরণ কর। তারপর ধৌম্য ঋষিকে পাণ্ডবরা কুলগুরু রূপে বরণ করেছিল। এইখান থেকে কুলগুরুর প্রথা শুরু হয়। এরপর অর্জুন চিত্ররথকে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যে বৈরীভাব জন্ম নিয়েছিল তার আদ্যপান্ত বিবরণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

বশিষ্টের প্রতি বিশ্বামিত্রের দ্বেষ ও বিবাদ

এরপর বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের বিবাদের কাহিনী আসছে। এর আগে বেদেও এই বিবাদের কিছু বিবরণ এসে গিয়েছিল। বেদের পর বাল্মীকি রামায়ণেও এই বিবাদের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে বশিষ্ঠ ছিলেন দশরথের রাজপরিবারের গুরু আর বিশ্বামিত্র নিজের কার্যোদ্ধারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নিয়ে এসেছিলেন। মহাভারতে এই ঘটনা ইতিহাস রূপে পাই। মূল কাহিনী হল, বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা। একদিন তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। শিকার থেকে ফেরার পথে সবাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে তৃষ্ণার জলের সন্ধান করছিল। কিছু দূর যেতেই পথি মধ্যে একটা সুন্দর আশ্রম দেখতে পান। এই আশ্রমটি ছিল বশিষ্ঠ মুনির। সবাই সেখানে গেলে বশিষ্ঠ চর্ব্য, চষ্য, লেহ্য ও পেয় খাদ্য দিয়ে সৎকার করিয়ে সবার পথশ্রান্তিকে দূর করলেন। বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে বলছেন, জঙ্গলের এই ছোট্ট আশ্রমে এত আয়োজন কি করে সম্ভব করলেন? বশিষ্ঠ মুনি তার উত্তরে বললেন, এগুলো আমি কিছুই করিনি, আমার যে কামধেনু নন্দিনী আছে এ সবই তার কৃপাতে সম্ভব হয়েছে। তখন বিশ্বামিত্র বললেন, এই কামধেনু আমাকে দিয়ে দিন আর তার বদলে আপনাকে আমি আমার অর্ব্বুদ সংখ্যক গরু দিয়ে দিচ্ছি। বশিষ্ঠ বলছেন, তা কি করে সম্ভব, কামধেনুকে তো দেওয়া যাবে না। তখন বিশ্বামিত্র নিজের সৈন্যদের বললেন, তোমরা এই কামধেনুকে জোর করে টেনে নিয়ে চল।

নন্দিনীকে টানাটানি শুরু করেছে, নন্দিনীও যাবে না, আশ্রম থেকে সে কিছুতেই বেরোবে না। তখন সবাই কামধেনু গরুকে ডাণ্ডা দিয়ে মারতে শুরু করেছে। তখন নন্দিনী কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদতে কাঁদতে সে বশিষ্ঠের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে, মানে বলতে চাইছে, আমাকে এইভাবে ডাণ্ডা মেরে মেরে নিয়ে যাচ্ছে আপনি কিছু করুন। তখন বশিষ্ঠ বলছে, মা, আমি কি করব, হে ভদ্রে আমি ব্রাহ্মণ, আমার স্বাভাবিক ধর্ম ক্ষমা, আমি ক্ষমাবান, আমি চাইলেও বিশ্বামিত্রকে মারতে পারবো না। নন্দিনী জানতে চাইল তাহলে এখন আমি কি করব? তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তুমি নিজের রক্ষা নিজেই কর। নন্দিনী তখন বলছে, দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে হয় বিশ্বামিত্রের কাছে অর্পণ করে দিয়েছেন নয়তো আপনি আমাকে উপেক্ষা করছে। বশিষ্ঠ তখন আবার বলছেন, *ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্। ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদ্ গম্যতাং যদি রোচতে।।*১/১৭৪/২৯। হে কল্যাণি, ক্ষত্রিয়দের বল হল তেজ আর ব্রাহ্মণদের বল ক্ষমা। ব্রাহ্মণরা ক্ষমা করেন বলেই তারা শ্রেষ্ঠ, ক্ষমাটাই তাদের বল আর ক্ষত্রিয়রা যে তেজ দেখায়

তাতেই তাদের শক্তি বোঝা যায়। হে সুধানিঃস্বরনী, তুমি যদি যেতে চাও তাহলে যাও আর যদি না যেতে চাও তাহলে তুমি নিজের রক্ষা নিজেই কর।

নন্দিনী শুধু জেনে নিল বশিষ্ঠ কি তাকে বিশ্বামিত্রের কাছে দান করছেন কিনা? বশিষ্ঠ বলে দিলেন না। ব্যস, নন্দিনী তাতেই বুঝে গেছে বশিষ্ঠের কি অভিপ্রায়। নন্দিনী এইবার পায়ের খুর দিয়ে মাটিতে পা ঘষটাতে শুরু করল, নাক দিয়ে ঘন ঘন জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তে শুরু করল। তারপর নন্দিনীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সব দুর্ধর্ষ সৈন্যরা বেরোতে শুরু করল। তার লেজ থেকে পল্লব সৈন্য, স্তন থেকে দ্রাবিড় সৈন্য, যোনি দেশ থেকে যবন, গোবর থেকে কিরাত, এগুলো তখনকার দিনে ভারতের বিভিন্ন জাতির নাম। তার মুত্র থেকে শবর, পার্শ্বভাগ থেকে পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্ব্বর। নন্দিনীর মুখ থেকে যে ফেনা বেরোচ্ছে সেখান থেকে চিন, হুন, কেরল এবং অন্যান্য ম্লেচ্ছ জাতিরা বেরিয়ে এসেছে। আসলে বলতে চাইছে ভারতে যত জাতির উৎপত্তি হয়েছে সব কামধেনু থেকে জন্ম নিয়েছে। আর্যদের বাইরে যত জাতি ছিল, আবার বাইরে থেকে যত জাতি ভারতে ঢুকেছে সবাইকে কামধেনুর মাধ্যমে এক করে দেওয়া হল, গরু আমাদের মা, আর সেখান থেকে তোমাদের সবার জন্ম। নন্দিনীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে যত সৈন্যরা বেরিয়ে এসেছে এরা সব বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের মারতে শুরু করেছে। বিশ্বামিত্র তখন রেগেমেগে বশিষ্টের উপর সব অস্ত্র চালাতে শুরু করেছে। বশিষ্ঠ ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র, তাঁর কাছে ছিল ব্রহ্মদণ্ড, এই ব্রহ্মদণ্ড দিয়ে বিশ্বামিত্রের সব অস্ত্রকে শুষে নিয়েছেন। এদিকে বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা প্রচণ্ড মার খেয়ে যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। এই সব দেখে *বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রভাবান্নির্বিণ্ণো বাক্যমব্রবীৎ*। ব্রহ্মতজের এই মারাত্মক আশ্চর্যজনক চমৎকারিত্ব দেখে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ত্ত্বের উপর ধিক্কার করে বলছেন – *ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।।*১/১৭৪/৪৫। ক্ষত্রিয়ের তেজ বলের উপর ধিক্, এর কোন দাম নেই, ব্রাহ্মণের যে ব্রহ্মতেজ এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক বল। আজ থেকে আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ করে ব্রহ্মতেজকে পাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ ধর্ম গ্রহণ করলাম। সেখান থেকে তিনি সোজা তপস্যায় চলে গেলেন। এরপর তপস্যা করে বিশ্বামিত্র যেমন যেমন শক্তি অর্জন করবেন সেই শক্তি দিয়ে বশিষ্ঠের একেকটি সন্তানকে নাশ করতে থাকবেন।

বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি ও রাজা কল্মপষপাদের কাহিনী

বেদেই আমরা পাই বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠ মুনি যজমান পাওয়ার জন্য সব সময় ঝগড়াই করতেন। এই দুজনের ঝগড়া এমন হয়েছিল একবার এক অপরকে অভিশাপ দিয়েই চলেছে। শেষে ইন্দ্রকে হস্তক্ষেপ করতে হয়ে বলতে হয়েছিল, আপনারা এত বড় ঋষি হয়ে এই সব কি করছেন, বন্ধ করুন এই ছেলেমানুষি। কিন্তু মহাভারতে বশিষ্ঠের চরিত্রকে অনেক নরম করে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র যেখানে এসেছে সেখানে প্রচুর কাহিনী এসে জড়িয়ে গেছে। শক্তি ছিল বশিষ্ঠের জেষ্ঠ সন্তান আর কল্মষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। শক্তি আর কল্মষপাদের মধ্যে একটা বিবাদ হয়ে গিয়েছিল, শক্তি কল্মষপাদকে একটা অভিশাপ দিয়ে দিলেন, যাও, তুমি রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হয়ে যাও। ইতিমধ্যে কল্মষপাদ একজন ব্রাহ্মণকে মানুষের মাংস খাইয়ে দিয়েছে। মহাভারত এই কাহিনীগুলোকে বৈদিক কাহিনী থেকে নিয়েছেন। সব দিক থেকে অভিশাপ হয়ে এমন বিশ্রী অবস্থা হয়ে গেল যার থেকে কল্মষপাদ রাক্ষস হয়ে গেছে। কল্মষপাদ খুব রেগে গিয়ে শক্তিকে বলছে, তোমার অভিশাপেই আমি আজ রাক্ষস হয়েছি, ঠিক আছে আমি তোমাকেই আগে খাবো। প্রথমে শক্তিকেই মেরে শেষ করে দিল। এরমধ্যে আরেকটি মজার ব্যাপার হল, বিশ্বামিত্র তপস্যার জোরে একটা আসুরিক শক্তিকে যেন কল্মষপাদের ঘাড়ে বসিয়ে দিয়েছেন, এই আসুরিক শক্তি বা ভূত কল্মষপাদকে উন্মত্ত বানিয়ে রেখেছে। কল্মষপাদের মাথায় সব সময় হিংসার ভাব। পৌরানিক কাহিনীর এটাই বৈশিষ্ট্য, দেখিয়ে দিচ্ছে মানুষের মন কিভাব চঞ্চল হয়ে থাকে, একটা রাক্ষস যেন বসে তার মাথাটাকে বিগড়ে দিচ্ছে। রাজা কল্মষপাদের মন, ইন্দ্রিয় সব কিছুকে রাক্ষস অধিকার করে নিয়েছে, আর এমন ভাবে চালাচ্ছে যাতে রাজা সব সময় ভুল কাজ করে। এরপর সে ব্রাহ্মণকে নরমাংস খাইয়ে দিয়েছে, ব্রাহ্মণ আবার অভিশাপ দিয়ে দিল তোমার নরমাংসতেই যেন স্পৃহা হয়। ব্যস, এবারে সে বশিষ্ঠের বড় ছেলেকেই মেরে দিল। বিশ্বামিত্র মনে এবার শান্তি হয়েছে।

শক্তির স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল। তারপর তার যে সন্তান হয়েছে সে বশিষ্ঠকেই বাবা বলে জানত, বাবার মতই অনুসরণ করত। বশিষ্ঠকে তাত বলেই ডাকত। পরে তার মা বলে দিয়েছিল, তোমার বাবাকে বনে এক রাক্ষস ভক্ষণ করেছিল তাই পিতামহকে তুমি তাত বলে সম্বোধন করো না। শক্তির এই সন্তানের নাম পরাশর, পরাশরের ছেলের নাম ব্যাসদেব। পরাশর যখন বড় হয়েছে তখন জানতে পারল ইনি আমার বাবা নন, আমার বাবাকে রাক্ষস খেয়ে নিয়েছিল। শক্তির সন্তান খুব রেগে গেছে, রেগে গিয়ে বলছে, আমি এমন তপস্যা করব তাতে পুরো সৃষ্টিকেই আমি সংহার করে দেব।

সবাই তাকে বোঝাচ্ছে এরকম কাজ করতে যেও না। এখান থেকে আবার একটা পুরনো কাহিনীতে নিয়ে গেছে। মহাভারতের এটাই বৈশিষ্ট্য, কাহিনীর ভেতরে কাহিনী, সেই কাহিনীর ভেতরে আরেকটা কাহিনী, তার ভেতরে আবার কাহিনী, এইভাবে চলেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের প্রাচীন যা কিছু পরম্পরা ও ঐতিহ্য ছিল সব কিছুকে লিখিত ভাবে একটা জায়গায়তে জড়ো করে দেওয়া।

ঔর্ব্ব ঋষির উপাখ্যান

এই রকম কাহিনীর মধ্যে কাহিনীতে ঔর্ব্ব বলে এক ঋষি ছিলেন। ঔর্ব্ব ঋষির বাবা-দাদুর সাথে কিভাবে ক্ষত্রিয় রাজাদের বিবাদ হতে ঔর্ব্ব ঋষির মা গর্ভে সন্তানকে নিজের জানুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরে এই জানু থেকেই ঔর্ব্ব ঋষির জন্ম হয়। পরে যখন ঋষি জানলেন যে, আমার যত পূর্বজরা ছিলেন তাদের সবাইকে ক্ষত্রিয়রা মেরে কেটে শেষ করে দিয়েছে। জানার পর ঔর্ব্বের খুব রাগ হয়েছে, রেগে গিয়ে বলছে আমি সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকেই সংহার করে দেব। ভারতে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের লড়াই খুব পুরনো। এই লড়াইয়ের মনোভাব পরে পরশুরামের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। ঔর্ব্ব এবার তপস্যা করতে শুরু করেছে। এমন তপস্যা শুরু করে দিয়েছেন আর এত শক্তি তার মধ্যে আসতে শুরু হল তাতে তিনি বলছেন, পুরো এই সৃষ্টিকে আমার তপস্যার তেজে শেষ করে দেব। এরপর পুরো সৃষ্টি জ্বলতে শুরু হয়েছে, কারুর ক্ষমতাতেই কুলোচ্ছে না সৃষ্টিকে যে রক্ষা করবে। তখন তাঁর পূর্বজরা, যাঁদের জন্য ঋষি বদলা নিচ্ছেন, তাঁরাই এসে ঔর্ব্ব ঋষিকে বলছেন, বাছা, আমরা তোমার পূর্বজরা তোমাকে বলছি, তুমি এইভাবে সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে দিও না, এটাকে এক্ষুণি বন্ধ কর। ঔর্ব্ব তখন বলছেন, ক্রোধবশত রেগে গিয়ে সৃষ্টিকে সংহার করবার জন্য আমি দিব্যি খেয়েছি, এখন আমি এই দিব্যি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো না, আমি মানছি আমি রেগেমেগেই দিব্যি খেয়েছি। এখানে আবার ধর্ম সঙ্কট এসে গেল। একজন মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একটা ভুল কাজ করছে। একদিকে তার রাগ, মনের একটা অস্থায়ী অবস্থা, সেখান থেকে সে বেরোতে পারছে না। ঔর্ব্বের পিতৃরা সূক্ষ্ম শরীরে নেমে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের ঔর্ব্ব বলছেন – *বৃথারোষপ্রতিজ্ঞো বৈ নাহং ভবিতুমুৎসহে। অনিস্তীর্ণো হি মাং রোষো দহেদগ্নিরিবারণিম্।*।১/১৭৯/২। যার ক্রোধ বৃথা হয়ে যায়, যার প্রতিজ্ঞা বৃথা পরিণত হয়, এই ধরণের মানুষ হবার আমার কোন ইচ্ছে নেই। আমি যেটা বলেছি সেটা আমি করার পরই শান্ত হব। দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কাহিনীতেও শুক্রাচার্য তাঁর মেয়ে দেবযানীকে বলছেন, দেখো মা, রাগ কখন করতে নেই, যে ক্ষমা করে দিতে পারে তার মত মানুষ আর হয় না। আর ঔর্ব্ব ঋষি, যাঁকে বহু কষ্টে বংশ রক্ষার জন্য বাঁচানো হয়েছিল, তিনি এখানে বলছেন, যে মানুষ তার ভেতর থেকে উৎপন্ন ক্রোধকে আটকে দেয়, প্রকাশ হতে দেয় না, ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আর থাকে না। কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্যে মহাভারত পুরো পাল্টে গেল। কয়েক পাতা আগে মহাভারত বলছে তোমার ক্রোধকে সংবরণ কর, আর ঔর্ব্বের মত একজন বড় ঋষি বলছেন, যে নিজের ক্রোধকে সংবরণ করে নেবে সে কিন্তু ধর্ম, অর্থ আর কামকে রক্ষা করতে পারবে না, যে ক্রোধকে প্রকাশ করতে পারছে না, তার মানে তার পৌরুষত্বের অভাব রয়েছে। এখন কে ঠিক? এট নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের মানসিক গঠনের উপর। মহাভারত কখন সমাধান দেবে না, কখনই বলবে না যে, তুমি এটাই কর। মহাভারত উপদেশাত্মক শাস্ত্র নয়। মহাভারত সব সময় বলবে, তুমি যেটা করতে যাচ্ছ ঠিক এই জিনিষ আগেও কেউ করেছিল আর সে কোন যা তা লোক ছিল না, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিল। শুক্রাচার্য তার কন্যাকে এক ভাবে বোঝাচ্ছেন আর ঔর্ব্ব নিজের পিতৃদের ঠিক উল্টোটা বোঝাচ্ছেন।

ঔর্ব্ব পিতৃদের বলছে, এই ক্রোধের দ্বারাই শিষ্টের রক্ষণ আর দুষ্টের দমন হয়। পাপীদের পাপকে আটকানোর জন্য যদি কোন শক্তি না থাকে তাহলে পাপীদের পাপকর্ম বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। হে পিতৃগণ আমি আপনাদের কথা কিন্তু মানতে পারছি না। এর আগে আগে ক্ষত্রিয়রা যা কুকর্ম করেছে এগুলোকে কোন ভাবেই ক্ষমা করা যায় না। যে ক্রোধবহ্নি আমার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এই বহ্নি তিনটে লোককেই ভস্ম করে দেবে, এখন আমি যদি এই তিন লোকের নাশ না করি তাহলে এই বহ্নি আমাকেই পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। সেইজন্য এই ক্রোধকে আমি ত্যাগ করতে পারবো না। তখন পিতৃরা বলছেন, জলকে বলা হয় সৃষ্টির আদি, জলই হচ্ছে সৃষ্টি – *য এষ মন্যুজস্তেহগ্নির্লোকানাদতুমিচ্ছতি। অপ্সুং তং মুঞ্চ ভদ্রং তে লোকা হাপ্সু প্রতিষ্ঠিতাঃ।*।১/১৭৯/১৭। জলেই সব লোক প্রতিষ্ঠিত, তুমি যদি তোমার এই ক্রোধাগ্নিকে জলের উপর স্থাপন করে দাও তাহলে তোমার কথাও মিথ্যা হবে না আর তুমিও শান্ত হয়ে যেতে পারবে। এটা আমাদের খুব প্রাচীন ধারণা যে জলই সৃষ্টির আদি। জল খেয়েই প্রাণিজগৎ বেঁচে থাকে তার জন্যই কি বলছেন যে তিনটে লোকের প্রতিষ্ঠা জলে, নাকি সমুদ্রকে আগে দেখেছিলেন সেইজন্য বলছেন? আমাদের জানা নেই। কিন্তু পৌরানিক গাঁথাতে

পাচ্ছি, ভগবান নারায়ণ ক্ষীর সমুদ্রে অনন্ত নাগের উপর শুয়ে আছেন, যেখানে অলধি জলরাশি, সৃষ্টি যখন হয় তখন ঐ জায়গা থেকেই হয়। সেই থেকে জলই হল সৃষ্টির আদি উৎস। সেইজন্য পিতৃগণ বলছেন, তোমার এই অগ্নি রূপী ক্রোধকে বার করে এই জলে প্রতিষ্ঠিত করে দাও। তাহলে তোমার কথা থেকে গেল, তোমার আগুনটা সৃষ্টিকে দিয়ে দিলে অন্য দিকে সৃষ্টিটাও নাশ হয়ে যাবে না, আর তোমার রাগটাও বেরিয়ে যাবে। পিতৃদের কথায় সন্তুষ্ট হয় তখন ঔর্ব্ব ঋষি নিজের যোগশক্তি দিয়ে ক্রোধাগ্নি বার করে সমুদ্রে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। বলা হয় এই আগুন এখনও সমুদ্রে জ্বলছে, এই আগুনকে বলা হয় বাড়বানল। বাড়বা হল ঘোড়া। এই দুটো আগুনের উল্লেখ আমরা পাই, দাবানল আর বাড়বানল, দাবানল জঙ্গলের আগুন আর বাড়বানল সমুদ্রের আগুন। এগুলো কাহিনী, তবে বাড়বানলের ধারণা কোথা এসেছে আমাদের ঠিক জানা নেই। তবে গ্রাম দেশে পুকুরে প্রচুর উদ্ভিদ, শ্যাওলা কচুরপানা হলে ফসফরাসের জন্য পুকুরের মধ্যে আগুন জ্বলতে দেখা যায়, সেখান থেকেও এনারা কল্পনা করে থাকতে পারেন।

এগুলো বড় কথা নয়, ঔর্ব্বের যে উপখ্যান, যে উপখ্যান শুনে পরাশর মুনি শান্ত হয়ে গেলেন। এই উপাখ্যানের বড় কথা হল, আমাদের মধ্যে যখনই যে কোন ধরণের নেগেটিভ ইমোশানের জন্ম হচ্ছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি আর এগুলো সবার মধ্যে আসবেই, কিন্তু এগুলো যদি প্রকাশ না হয়ে ভেতরে জমে থাকে, এটাই কিন্তু আমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। যত বড় বড় মহাত্মারা ছিলেন, যাঁদের আমরা পূজো করি, এদের সবারই মধ্যে এই ধরণের নেগেটিভ ইমোশান ছিল, এঁরাও এই নেগেটিভ ইমোশানে খুব করে পুড়েছেন। সেইজন্য বলা হয় শক্তি অর্জন করে এই নেগেটিভ ইমোশানকে কোথাও না কোথাও বাইরে বার করে দিতে হয়। ঠাকুর বলছেন, কাম তো যাবার নয় তাই ঈশ্বরকে পাওয়ার কাম করতে হয়। তেমনি ক্রোধও আমার ভেতর থেকে যাবে না, তাহলে ক্রোধটা কোথায় প্রকাশ করব? এত বয়স হয়ে গেল এখনও ঈশ্বরের দিকে মন গেল না, ক্রোধটাকে ঐদিকে লাগাতে হয়। মহারাজদের কাছে এসে ভক্তরা প্রায়ই তাদের নানান রকমের সমস্যার কথা বলেন, কিন্তু সমস্যা সবারই আছে। গান্ধীজী এত অহিংসা অহিংসা করে গেছেন, কিন্তু তিনি ভেতর থেকে এত রাগী ছিলেন খুব কম লোকেই জানত। আর তাঁর যত রাগ নিজের প্রিয়জনের উপরই বেরোত। ঐ রাগটাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য তিনি অহিংসার অভ্যাস করতেন। আসল কথা হল আমাদের সবার মধ্যে ক্রোধের সৃষ্টি হবেই, কামের উপদ্রব আসবেই। আর কাম ক্রোধকে কখন জয় করা যায় না। এই আখ্যায়িকা গুলি এই জিনিষগুলিকেই সিদ্ধ করছে। কিন্তু যেটা করা যায় এই কাম, ক্রোধের মত নেগেটিভ ইমোশানগুলিকে এক জায়গা থেকে সরিয়ে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায়, ঠাকুর যেটাকে খুব সুন্দর করে সহজ করে দিলেন, এগুলোর মোর ঘুরিয়ে দাও। একটা খুব নামকরা প্রবাদ আছে, ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া। রাগটা বউয়ের উপর কিন্তু সেটাকে প্রকাশ করল ছেলে বা বাড়ির চাকর-বাকরদের পিটিয়ে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

এইসব কাহিনী গন্ধর্ব চিত্ররথ অর্জুনকে বলছে। এরপর স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদের ঘটনা আসছে। কাহিনীকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, দ্রৌপদীর জন্ম আর দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের মধ্যে খুব একটা বেশী সময় দেওয়া হচ্ছে না। স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হয়েছে। যন্ত্রচালিত চক্রের মাঝখানে একটা মাছ রাখা হয়েছে, চক্রটি ঘুরছে, সেই মাছের প্রতিবিম্ব নীচে জলে পড়েছে, সেই প্রতিবিম্ব দেখে মাছের চোখকে তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। দ্রুপদ জানতেন এই কঠিণ কাজ একমাত্র অর্জুনই করতে পারবে, কেননা আগে থেকেই তার ইচ্ছে ছিল অর্জুনের সাথে দ্রৌপদীর বিবাহ হোক, সেইজন্য তিনি এই কঠিন লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি শুনেছেন পঞ্চ পাণ্ডবদের লাক্ষা গৃহে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তখন তাদের পুরোহিত বলছেন, ধর্ম যারা পালন করে, গুরুর সেবা যারা করে এভাবে অধর্ম পথে তাদের নাশ হয় না, সেইজন্য যা শুনেছেন এটা সত্য নয়। পাণ্ডবরা পাঁচজন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দ্রুপদের দরবারে যেখানে স্বয়ংবর সভা হচ্ছে সেখানে এসেছেন। এই অধ্যায়ে এসে মহাভারতে প্রথম শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। রাজার দরবারে বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ উপস্থিত হয়ে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে বসে আছেন। আর ঐ পাঁচ ভাইকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলছেন – ঐ যে দেখছ স্থূলকায় বিশাল চেহারা নিয়ে বসে আছে এ হচ্ছে ভীম তার পাশে যুধিষ্ঠির, ঐযে অর্জুন। এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হচ্ছে, যেমন ছাইয়ের মধ্যে আগুনকে আলাদা করে সনাক্ত করা যায়, ঠিক তেমনি এই যে পঞ্চ পাণ্ডব ব্রাহ্মণ বেশে গায়ে ছাই মেখে আছে, কিন্তু সেই ছাইয়ের আড়ালে তাদের যে তেজ, শক্তির আগুন সেটাকে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক বুঝতে পেরেছেন। আসলে কুন্তী হলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসি, কুন্তীকে শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনই পিসি বলে সম্বোধন করতেন। সেইজন্য এদের দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রায় সমবয়সী তাই যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনই বড় বলে মানতেন। ভীমের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কি রকম সম্পর্ক ছিল তার বিবরণ আমরা পাইনা, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে

শ্রীকৃষ্ণ সব সময় চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বলরাম বলছেন, তোমার মাথাটা খারাপ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আপনি দেখতে থাকুন।

এরপর এক এক করে রাজারা ধনুক উত্তোলন করতে উঠছে কিন্তু বেশীর ভাগই সন্ধান দূরে থাকুক, ধনুতে জ্যা রোপণ করতেই পারল না। এর মধ্যে কর্ণ উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে প্রথমেই ধনুতে জ্যা রোপণ করে দিয়েছে। জ্যা সংযুক্ত করে শরসন্ধান করতে যাবেন তখনই দ্রৌপদী উঠে বলছে – *দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং বরয়ামি সুতম্। সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্যং তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ।।*১/১৮৬/২৩। আমি সুত পুত্রের গলায় বরমাল্য দেব না। পরের দিকে যারা মহাভারত লিখেছেন তাঁরা এই ঘটনাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন, দ্রৌপদী যে আপত্তি করেছে, এই আপত্তি করার অধিকার দ্রৌপদীর ছিল কি ছিল না। কর্ণ যে জাতিরই হোন না কেন তিনি একজন রাজা, আবার অন্য দিকে রাজাও নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, একজন সামান্য ব্রাহ্মণের বেলায় দ্রৌপদী কি করে রাজী হল! তাঁরা এটাও বলছেন যে, এই অপমান কর্ণ কোন দিন ভুলতে পারেনি। কর্ণকে যখন এভাবে অপমান করেছে, এখানে খুব সুন্দর একটা শ্লোক আসে – *সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্যং তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ* - কর্ণ জানতো না যে সে সূর্য পুত্র। এই কাহিনী আমরা সবাই জানি, কুমারী অবস্থায় কুন্তী সূর্যদেবকে আরাধনা করাতে কর্ণের জন্ম হয়েছিল। কর্ণ যে সূর্য পুত্র এটা জানতো না, কিন্তু কর্ণ ভাবতো কোথাও কোন ভাবে তার সূর্যের সঙ্গে একটা যেন যোগ আছে। দ্রৌপদীর কাছে যখন কর্ণ অপমানিত হল তখন সে একটা অমর্ষ যুক্ত হাসি, মানে একটা দুঃখ, অপমান, ক্ষোভের হাসি দিয়ে সূর্যের দিকে তাকাল তারপর আস্তে করে ধনুকটাকে পাশে রেখে এসে নিজের আসনে বসে পড়ল।

কোন রাজাই যখন ধনুতে জ্যা সংযুক্ত করতে পারলো না, তখন ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছে। অর্জুন উঠে দাঁড়াতেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোলাহল শুরু হয়ে গেছে, বলছে – আমরা হলাম শাস্ত্র পড়া ব্রাহ্মণ, ধনুক নিয়ে খেলা করা আমাদের সাজে না, আর একে তো দেখে মনে হচ্ছে ধনুক তুলতেই পারবে না, তখন সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করবে। অর্জুন তখন উঠে ধনুকের কাছে গিয়ে মনে মনে ভগবান শিবকে প্রণাম করলেন আর শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করলেন। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, অর্জুন কেন শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করতে যাবেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের সখা এর উল্লেখ আগে কোথাও করা হয়নি। সবে কয়েক পাতা আগে শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করেছেন, অর্জুনের সাথে শ্রীকৃষ্ণের কি সম্পর্ক তার একটা কথাও উল্লেখ নেই, কিন্তু হঠাৎ বলে দিল অর্জুন মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করল। এখানে বোঝা যাচ্ছে, পরের দিকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিস্তার হয়েছে, আর তার ইতিহাস যখন লেখা হচ্ছে তখন আবার সেটাকে এখানে সাজিয়ে রাখা হল। ঠিক তেমনি ভগবান শিবকেও একটা মর্যাদা পূর্ণ আকারে এখানে উপস্থাপিত করা হয়ে গেল। এবারে যারা ধনুতে দড়িটাও লাগাতে পারেনি, তাদের সামনেই অর্জুন চোখের নিমেষে জ্যা সংযুক্ত করে দিলেন। এরপর লক্ষ্যভেদও হয়ে গেল। দ্রৌপদীকে জয় করে নিল। এবারে বাকি রাজারা অপমানিত হয় দ্রুপদকে মারার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ভীম আর থাকতে না পেরে বড় বড় গাছ উপড়ে তাই দিয়ে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে।

সব কিছু মিটে যাওয়ার পর এবার পঞ্চ পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে তাদের বাড়িতে এসেছে। দ্বারের কাছে এসে অর্জুন প্রথমে চেঁচিয়ে মাকে বলছে – *ভিক্ষেৎযথাবেদয়তাং নরাগ্র্যৌ।।* দ্রৌপদীকে নিয়ে এসেছে খবরটা মাকে দিতে হবে। তাই মাকে একটু অবাক করার জন্য বলছে – মা আমরা ভিক্ষা নিয়ে এসেছি। সেইজন্য কখন সারপ্রাইজ দিতে নেই, সারপ্রাইজ দিতে গেলে অনেক সমস্যা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, অর্জুন যাকে জয় করে নিয়ে এসেছে, তাকে বলছে আমরা ভিক্ষা নিয়ে এসেছি। দ্রৌপদীকে তো ভিক্ষায় পায়নি, কেন অর্জুন বলতে গেল ভিক্ষায় নিয়ে এসেছে, এটা যুক্তিতে দাঁড়ায় না। ভেতর থেকে কুন্তী বললেন, ভিক্ষায় যা পেয়েছ তোমরা সবাই মিলে মিশে ভাগ করে নাও, এখানে শব্দটা বলছেন ভুঙক্তে, ভুঙক্তে মানে খাওয়াও হয় আবার ভোগ করা অর্থেও হয়। দরজার সামনে দ্রৌপদীকে দেখে কুন্তি বলছেন 'আরে আরে আমি এ কি বলে দিলাম'।

মহাভারতে এই এক বিরাট সমস্যা, এখানে কথায় কথায় বলবে আমার কথা যেন মিথ্যা না হয়। কুন্তী তো বলে দিলেন যা পেয়েছ মিলে মিশে ভোগ কর। কুন্তীও দ্রৌপদীকে দেখে পাঁচ ভাইকে বলছেন, আমার কথা যেন মিথ্যা না হয়। এখন নানা রকমের সংশয় দ্বিধা এসে গেছে। একবার যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলছেন, তুমিই দ্রৌপদীকে বিয়ে করে নাও। আবার মার কথা ভেবে পিছিয়ে আসছেন। কিছু কথা চালাচালি হওয়ার পর যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, না, আমরা পাঁচজনই দ্রৌপদীকে বিয়ে করব। মহাভারতের এই অংশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণও এদের পেছনে পেছনে অনুসরণ করে

পৌঁছে গেছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি করে আমাদের চিনে ফেললেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই বলছেন যেটা বলরামকে বলেছিলেন, ছাই চাপা আগুনকে দেখেই বোঝা যায় যে ভেতরে আগুন আছে। অন্য দিকে রাজা দ্রুপদও ঠিক বুঝতে পারছেন না, এরা কারা যারা দ্রৌপদীকে জয় করে নিয়ে গেল। দ্রুপদ নিজের সন্দেহ ও সংশয়ের অবসানের নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঠিয়েছেন গোপনে খবর নিতে এরা কারা। ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েকজন সহচরকে নিয়ে খোঁজ নিতে গেছে। পাণ্ডবদের বাসস্থানের কাছে শুনছে পাঁচ ভাই মিলে নানা রকম অস্ত্র-শস্ত্রের কথা বলছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন বুঝতে পেরেছে এরা আর যাই হোক, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র নয়, তা নাহলে এরা অস্ত্রের বিষয়ে কেন আলোচনা করবে, নিশ্চয়ই এরা ক্ষত্রিয় হবে। সব খবরা খবর দ্রুপদকে দিয়েছে। কিন্তু এখনও নিশ্চিত হতে পারছেন না যে এরাই পাণ্ডব।

পাঁচ ভাইয়ের দ্রৌপদীকে বিয়েতে দ্রুপদের আপত্তিতে যুধিষ্ঠিরের যুক্তি

পরে সবাই জেনে গেল এরা পাণ্ডব। দ্রুপদও খুব খুশি হয়েছেন। কিন্তু আরেক সমস্যা এসে গেছে, পাঁচজন ভাই দ্রৌপদীকে বিয়ে করবে। দ্রুপদ তখন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – *একস্য বহ্বয়ো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন। নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রুয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ*।।১/১৯৪/২৭। হে কুরুনন্দন, সাধারণত দেখা যায় একজন পুরুষ অনেক মহিলাকে বিয়ে করে কিন্তু একই মেয়ের অনেকগুলো স্বামী এটা কখন দেখা যায় না, আর বেদেও এর কোন বিধান নেই, এই অধর্ম আপনারা কি করে করতে যাচ্ছেন। ইংরাজীতে দুটো শব্দ আসে polygamy মানে যখন একজন পুরুষ একাধিক মেয়েকে বিয়ে করে, আরেকটি শব্দ polyandry বহুপতি, যখন একটি মেয়ে একাধিক স্বামীকে বরণ করে। মহাভারতের এই ঘটনাকে নিয়ে পরবর্তি কালে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে, এখনও হচ্ছে। অনেক আগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এটা খুব প্রচলিত প্রথা ছিল। স্বামীজী যখন হিমালয়ে ভ্রমণ করছিলেন তিনিও সেখানে এই বহুপতি প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করেছেন। এই প্রথার উপর অনেক পর্যবেক্ষণ হয়েছে আর আগে সব জিনিষ সামনে আসত না, এখন অনেক কিছু প্রকাশ হচ্ছে। গুজরাটেও একটা সমীক্ষায় পাওয়া গেছে, সেখানে একটা উপজাতিদের মধ্যে এটা একটা রীতি, এরা তিন ভাই হোক, কি চার ভাই হোক বিয়ে যখন করবে তখন একটি মেয়েকেই বিয়ে করে। এর ফলে সম্পত্তির বিভাজন জনিত সমস্যা থেকে রেহাই পেয়ে যেত। দ্বিতীয়তঃ, সমাজে যখন বিভিন্ন কারণে মেয়ের সংখ্যা কমে যায় তখন ছেলেদের জন্য মেয়ে পাওয়া খুব সমস্যা হয়ে যায়, তখন বাধ্য হয়ে এই প্রথাকে গ্রহণ করতে হয়। রাজস্থান, হরিয়ানাতে, বিশেষ করে রাজস্থানে নারী অপ্রতুলতার সমস্যা এত তীব্র যে ওখনে কোথাও কোথাও স্ত্রী ভাড়াতে পাওয়া যায়। তখন যুধিষ্ঠিরকে দ্রুপদ বলছেন, হে যুধিষ্ঠির তোমার নামে শুনেছি তুমি হচ্ছ ধর্মরাজ, তুমি ধর্মটা ভালো বোঝ।

যুধিষ্ঠিরকে এখানে ধর্মরাজ কেন বলা হচ্ছে আর ধর্ম বলতে কি বোঝচ্ছে আমাদের বোঝা দরকার। এর আগে চারটে পুরুষার্থ বলতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যে ধর্ম তা হল, এমন কর্ম করা যা করে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে। কিন্তু ধর্মরাজ বলতে তা বোঝাচ্ছে না। এখানে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ বলা হচ্ছে মানে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্রের জ্ঞাতা। যদি কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, যে সমস্যাটা আগে কখন ছিল না, তখন সেটাকে কিভাবে শাস্ত্র সম্মত ভাবে সমাধান করা হবে? যেমন মুসলমানদের নিয়ম আছে তিনবার তালাক বলে দিলে তালাক হয়ে যাবে। এখন মোবাইল ফোনে যদি স্ত্রীকে স্বামী তিনবার তালাক বলে দেয় এখন সেই তালাক কি কার্যকর হবে? এইসব ক্ষেত্রে মৌলবীরা একটা ফতোয়া দিয়ে দেন। ফতোয়া হল, ইদানিং কালে যে সমস্যাগুলো উদ্ভব হচ্ছে সেই সমস্যা হয়তো কোরানের সময় ছিল না, যেমন মোবাইল ফোনে তালাক দেওয়া, এখন যারা কোরান, হাদিস এগুলো ভালো জানেন তাদের কাছে চিঠি লেখা হবে, তখন এরা এর উপর বিচার করবে তারপর এই ব্যাপারে একটা বিধান দেবে, যে বিধান দেওয়া হবে একে বলা হয় ফতোয়া। ফতোয়াতে মৌলবীরা বলে দেন আমি যেভাবে ধর্মকে বুঝেছি তাতে এটাই হবে। যুধিষ্ঠির এখানে যেন ফতোয়া দেওয়ার অধিকারি। এখানে এক নারী ও তার বহু স্বামী নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তাই যুধিষ্ঠিরকে দ্রুপদ বলছেন, আপনি ধর্মরাজ, আপনি সব স্মৃতিশাস্ত্র জানেন, নীতিশাস্ত্র সব জানেন, ধর্মশাস্ত্র গুলো জানেন, এই ধরণের বিবাহ করা যায় কি যায় না, এই বিধানটা আপনি দিন। তখনকার দিনে কয়েকজন মুষ্টিমেয় পণ্ডিত এই ব্যাপারগুলো ভাল জানতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হলেই যে তিনি ধর্মরাজ হয়ে যাবেন তা নয়। ভীষ্ম, বিদুর এনারা ছিলেন ধর্মজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারটা আবার অন্য রকম। শ্রীকৃষ্ণ আবার নিজের মনের মত কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে দিতেন, কারণ তিনি ছিলেন স্মৃতিকার। বাকিরা স্মৃতিকে পালন করেন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন স্মৃতির স্রষ্টা, তিনি নতুন নতুন বিধান দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

কিন্তু এখানে দ্রুপদ কি বলছেন? এই বিবাহ – *লোকবেদবিরুদ্ধ ত্বং নাধর্মং ধর্মবিচ্ছুচিঃ। কর্তুমর্হসি কৌন্তেয় কস্মাৎ তে বুদ্ধরীদৃশী।।*১/১৯৪/২৮। এই বিবাহ লোক বিরুদ্ধ আর বেদেরও বিরুদ্ধ। বেদ হল শেষ কথা, সেই বেদেও এই ধরণের বিবাহের অনুমতি নেই। আর লোক বিরুদ্ধ মানে, পরম্পরাতে এই ঘটনা নেই, সবটাই যে বেদে থাকবে তা তো হয় না, কিছু কিছু নিয়ম পরম্পরা থেকে মানা হয়ে আসছে, যেগুলোকে আমরা স্মৃতি বলি। সুতরাং হে যুধিষ্ঠির তুমি যে এই ধরণের বিয়েতে সম্মতি দিচ্ছ এটা তুমি ঠিক করছ না, তুমি তো ধর্মরাজ, এই বুদ্ধি তুমি করো না। যুধিষ্ঠির তখন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে ধর্মের ব্যাখ্যা করছেন *সূক্ষ্মো ধর্মো মহারাজ নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্। পূর্বেষামানুপূর্ব্যেণ যাতং বর্তমানুয়ামহে।।*১/১৯৪/২৯। যুধিষ্ঠিরের নাম ধর্মরাজ, যিনি ধর্মকে ভালো জানেন, সেই ধর্মরাজ নিজের শ্বশুর দ্রুপদের কথার উত্তরে বলছেন – হে মহারাজ, ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ধর্ম যে কি জিনিষ এটা বোঝা খুব কঠিন আর *নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্*, ধর্মের গতি কি রকম সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা। সাধারণ মানুষ মানে আমরা সবাই। যুধিষ্ঠির নিজেকেও বলছেন, আমরাও ধর্মের সূক্ষ্ম গতিকে বুঝতে পারবো না। তাহলে ধর্ম কিভাবে ঠিক হবে? *পূর্বেষামানুপূর্ব্যেণ* আগের আগের মহাপুরুষরা যা যা করে এসেছন, তাকে অনুসরণ করাই ধর্ম। পরে আসবে – *মহাজনাঃ যে গতাঃ স পন্থা*, মহাজনরা এর আগে আগে যে পথ দিয়ে গেছেন সেটাই পথ। বাল্মীকি রামায়ণে যখন শ্রীরামচন্দ্র বালিকে লুকিয়ে বাণ মারলেন তখন বালি মরার সময় শ্রীরামচন্দ্রকে গালাগাল দিচ্ছে, শ্রীরাম, এটাই কি তোমার ধর্ম যে, লুকিয়ে তুমি আমাকে বাণ মারলে। সেখানেও শ্রীরামচন্দ্র এই একই উত্তর বালিকে দিচ্ছেন, বানর, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, তোমার মত বানর এটা বুঝতে পারবে না। এই বলে শ্রীরামচন্দ্র ধর্মের অন্য একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, এটা ধর্ম না অধর্ম তা আমার অন্তর্যামী জানেন। কথামৃতে এটাই ঠাকুর বলছেন, যেটা করতে গেলে মনটা খুঁত খুঁত করে সেটাই অধর্ম। তাই যেটা করলে মন খুঁত খুঁত করবে না সেটাই ধর্ম। ঠাকুর আবার বলছেন, মেথর মাথায় অনেক দিন ময়লা বইতে বইতে তার ঘেন্না চলে যায়। অনেক দিন ধরে আমি বাজে কাজ করে যাচ্ছি তখন সে কাজ করতে মনটা আর খুঁত খুঁত করবে না, তাহলে কি সেটা ধর্ম হবে? না, প্রথম বার কাজটা করতে গিয়ে মনটা খুঁত খুঁত করেছি কি করেনি, যদি করে থাকে তবে সেটা গোলমেলে জিনিষ। অনেক দিন ধরে সেই কাজটা করতে থাকলে সেই কাজে ঘেন্নাটা আমার চলে যাবে। বাল্মীকি রামায়ণে ধর্মকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। মহাভারতে ধর্মকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এখানে ধর্মের শুধু একটা ব্যাখ্যা করা হল। এর আগেও মহাভারত ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছে, আপদ-বিপদ কালে শক্তিমান ও ক্ষমতাবান পুরুষ যা বলে সেটাই ধর্ম। ধর্মের এই সংজ্ঞা দিচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম দ্রৌপদীকে। কিন্তু এখানে এসে ধর্মের অন্য সংজ্ঞা এসে গেল, যুধিষ্ঠির বলছেন, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারেনা। কোন কিছু হলেই আমরা দুম্ করে বলে দিই এটা ঠিক আর এটা ভুল, এইভাবে ধর্মের সংজ্ঞা নিরুপণ করা যায় না।

এর পরের শ্লোকটি বাল্মীকি রামায়ণের ধাঁচে, বলছেন *ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্মে ধীয়তে মতিঃ। এবং চৈব বদত্যস্বা মম চৈতন্মনোগতম্।।*১/১৯৪/৩০। আমার মুখ থেকে কখন মিথ্যা কথা বেরোয় না, আমার মন কখন অধর্ম কাজে যায় না, তা সত্ত্বেও আমার মন যখন এই কাজটা করতে যাচ্ছে আর আমার বাণী পরিষ্কার থাকছে তাহলে এটা ধর্মকার্য। যুধিষ্ঠিরের এটি একটি খুব কঠিন যুক্তি। যুধিষ্ঠির কি কি যুক্তি দেখাচ্ছেন? প্রথম যুক্তি হল, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, তাই ধর্মকে অতি সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয় যুক্তি – এর আগের আগের পরম্পরাতে মহাপুরুষরা যা করে গেছেন সেটাকে ধর্ম বলে মানা হয়। তৃতীয় যুক্তি হল, যেটা বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বলেছেন, সেটাকেই আধার করে বলছেন, অন্তর্যামীই হলেন শেষ বিচারক, যুধিষ্ঠির বলছেন, আমার বাণী আজ পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলেনি আর আমার মন কখন অধর্মের দিকে যায় না, অথচ এই ব্যাপারে আমার মন বলছে, হ্যাঁ বিয়ে করা যেতে পারে আর আমার বাণী বলছে, হ্যাঁ বিয়ে কর। তার মানে আমার অন্তর্যামী পরিষ্কার।

ইতিমধ্যে সেখানে ব্যাসদেব এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে মহাভারতের কাহিনী বলা হচ্ছে জনমেজয়কে, জনমজয়ের বাবা হলেন পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পরম্পরায় যুধিষ্ঠির আসছেন, অর্জুন আসছেন। ইতিহাস কার হয়? যারা জয়ী। মহাভারত কার ইতিহাস? যুধিষ্ঠিরের ইতিহাস। তাই প্রথমত, যুধিষ্ঠির যা বলবেন সেটাকে কখন ভুল বলা যাবে না। পরের দিকে অনেক ঐতিহাসিক এখানে এসে যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর সমালোচনা করেছে। তারা এমনও বলছে যে, দ্রৌপদীর এমন সৌন্দর্য যে, সেই দৌন্দর্যকে দেখে যুধিষ্ঠিরের মাথা এমন ঘুরে গেছে যে, জীবনে এই প্রথম মিথ্যে কথা বলতে রাজী হয়ে গেছে। এবার যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যকে সমর্থন জানানোর জন্য ব্যাসদেবকে নিয়ে আসা হচ্ছে। ব্যাসদেবও নানান কাহিনী বলবেন, যেমন ভগবানের শিবের আরাধনা করেছিল, পাঁচটা ইন্দ্র ছিল এই সব নানা কাহিনী বলছেন। যদিও

যুধিষ্ঠির সব যুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও দ্রুপদ মানতে রাজী হচ্ছেন না। তখন ব্যাসদেব সবাইকে এই বিয়ের ব্যাপারে যার যার মত বলতে বললেন। দ্রুপদ বলছে, এই বিয়ে বেদ ও পরম্পরা এই দুটোরই বিরুদ্ধে, মানে শ্রুতি ও স্মৃতি দুটোরই বিরুদ্ধে এই কারণে এই বিয়ে কখনই ধর্ম সম্মত নয়। আর যুধিষ্ঠির যে বলছেন আগের আগের মহাপুরুষরা যা যা করেছেন সেটাই ধর্ম, আমিও আগের আগের কোন মহাপুরুষকে এই ধরণের কাজ করতে দেখিনি, সেইজন্য আমি কোন মতেই এই বিয়েতে রাজী হতে পারছি না। ধৃষ্টদ্যুম্ন বলছে, ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে বড় ভাই কি করে সমাগম করতে পারে। বাল্মীকি রামায়ণে যেখানে পাপের কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে নিজের মেয়ে, পুত্রবধু, বোন আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করলে তাকে ত্যাজ্য বা বধ করে দেওয়া যেতে পারে। পাপের এই সংজ্ঞাকে আধার করে শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বলছে, এই কারণে আমি তোমাকে বধ করেছি, সুগ্রীব তোমার ছোট ভাই, তার স্ত্রীকে তুমি হরণ করেছ। এই কথাই ধৃষ্টদ্যুম্ন বলছেন, দ্রৌপদী অর্জুনের স্ত্রী সেখানে যুধিষ্ঠির ভীম বড় ভাই হয়ে কি করে ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে এক সঙ্গে থাকবে এটাতো পাপকর্ম।

যুধিষ্ঠির আবার বলছেন, আমার মুখ থেকে কখন মিথ্যা কথা বেরোয় না, আর আমার মন কখনই অধর্ম কাজে যায় না, আমার মন বলছে আমি কোন অধর্ম করতে যাচ্ছি না, এই ব্যাপারে আমি একেবারে পরিষ্কার। এখানে যুধিষ্ঠির আগেকার একটা ঘটনা টেনে আনছেন, জটিলা বলে গৌতমবংশীয় এক মেয়ে ছিল, সেই জটিলা সাতজন ঋষিকে একই সঙ্গে বিবাহ করেছিল, তাই পুরানে পরম্পরাতে এই ধরণের নজির পাওয়া যায়। মহাভারতে পুরান এই শব্দটা আসছে, যদিও অনেকের ধারণা যে পুরান মহাভারতের অনেক পরের রচনা, কিন্তু তা নয়। পুরানের অনেক কাহিনী মহাভারতের সময়েও কথা রূপে প্রচলিত ছিল। যুধিষ্ঠির বলছেন, পুরানে একটি কাহিনী আছে যেখান জটিলা বলে একটি নারী সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেছিল। আরও একটি কাহিনী পুরানে পাওয়া যায় যেখানে বার্ক্ষি নামে এক মুনিকন্যা দশজন প্রচেতাকে বিয়ে করেছিলেন, এই দশজন প্রচেতাই ভাই ছিল। প্রচেতারাও এক ধরণের ঋষি। দ্রুপদ যে বলেছিল পরম্পরাতে এই ধরণের নজির তার জানা নেই, তাই যুধিষ্ঠির দুটো দৃষ্টান্ত এনে দেখালেন পরম্পরাতে এর আগেও এই ধরণের বিবাহ হয়েছে। এবার যুধিষ্ঠির তার শেষ যুক্তি আনছেন, হে রাজন্, আমরা আমাদের মায়ের আজ্ঞা সব সময় পালন করে চলি, মা আমাদের আদেশ করে দিয়েছেন, যা নিয়ে এসেছ তাকে সবাই মিলে ভোগ কর। মায়ের আদেশের সামনে আর কিছুই চলে না। এখনও দ্রুপদের মন মানছে না দেখে এবারে ব্যাসদেব দুটো কাহিনী বলছেন। প্রথম কাহিনী হল, একটি ব্রাহ্মণ কন্যা, তার অনেক গুণ কিন্তু কিছুতেই তার বিয়ে হচ্ছে না। তখন সেই ব্রাহ্মণ কন্যা ভগবান শিবের আরাধনা করতে থাকল। আরাধনাতে ভগবান শিব সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চেয়েছেন, বল মা তোমার কি বর চাই। মেয়েটি বলল, আপনি আমাকে সর্বগুণান্বিত পতি কামনা করি। মেয়েটি এই একই কথা পাঁচবার বলেছে। শিব তথাস্তু করে বলছেন, বেশ তুমি পাঁচটি পতিকে বিয়ে করবে। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলছে, না না, আমার একজন পতিই চাই। ভগবান শিব বললেন, তুমি পাঁচবার বলেছ তোমার পাঁচটা পতিই হবে, তবে এই জন্মে হবে না, পরের জন্মে হবে। ব্যাসদেব আরেকটি পৌরানিক কাহিনী বলছেন। ইন্দ্র নিজেকে বিরাট শক্তিমান বলে মনে করতেন। একবার এক অবলা নারীর কাছে গিয়ে নিজের শক্তি দেখাতে গেছে। সেই নারী ইন্দ্রকে বলল তুমি এই গুহায় প্রবেশ করে দেখাও তাহলে বুঝবো তোমার শক্তির মহিমা। ইন্দ্র গুহায় ঢুকতেই দেখেন এক যুবক নারীর সাথে পাশ ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে আছে, ইন্দ্রকে দেখেও তাঁর কোন সৎকার করল না। তখন ইন্দ্র বলছেন, আমি এই ভুমণ্ডলের মালিক, আমাকে সমুচিত সৎকার না করে এরা পাশক্রীড়ায় মত্ত হয়ে হয়ে আছে। তখন সেই যুবক ইন্দ্রের দিকে তাকাতেই স্তম্ভিত করে দিয়েছে, ইন্দ্র আর নড়তে চড়তে পারছে না। ইন্দ্র দেখছেন সেখানে আগে থাকতেই চারটে ইন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন। ইন্দ্রকে বলা হল উনি হচ্ছেন ভগবান শিব, তিনি নিজের শক্তি পার্বতির সাথে খেলা করছিলেন। আর বললেন এই পাঁচ জন ইন্দ্র একসাথে পরে আসবে এবং একটি মেয়েকেই বিয়ে করবে উদ্ধারের জন্য। এই যে পঞ্চ পাণ্ডব এরা সবাই ইন্দ্র শক্তি সম্পন্ন। কারণ এই পঞ্চ পাণ্ডব পাঁচ জন দেবতার সন্তান। এইসব কাহিনী বলার পর এবার দ্রৌপদীর সাথে পাঁচ জনের বিবাহ হতে আর কারুর কোন আপত্তি থাকল না।

পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য স্থাপন

পাণ্ডবদের বেঁচে থাকার খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনদের কাছেও খবর চলে গেছে। খবর শুনে এদের মাথা গেছে ঘুরে, এদেরকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, শ্রাদ্ধ করে এদের নামে জলাঞ্জলীও দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, এরা সব কোথা থেকে এসে হাজির হয়ে গেল। শুধু হাজির হয়ে যাওয়া নয়, দ্রৌপদীর সাথে বিয়ে হয়ে গেছে, দ্রুপদ রাজার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। কৌরবরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে, তাতে দুর্যোধন এক রকম বুদ্ধি দিচ্ছে, কর্ণ এক রকম বলছে। এসবের মধ্যে পিতামহ ভীষ্ম বললেন, তোমরা অনেক বাঁদরামো করেছ,

এগুলো বন্ধ করে পাণ্ডবদের ডেকে ওদেরকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়ে দাও। বিদুর ছিলেন নীতিজ্ঞ, তিনিও সবাইকে বুঝিয়ে বলছেন পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য যা বলছেন সেটাই কর, ওদেরকে অর্দ্ধকে রাজ্য দিয়ে দাও। পরের দিকে যখন যুদ্ধের সময় আসবে তখন দুর্যোধনরা এটাকে নিয়েই বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যের উপর দোষারোপ করে বলবে, আপনারা প্রথমে থেকে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে আছেন।

এরপর হস্তিনাপুর থেকে বিদুরকে পাঠান হল পাণ্ডবদের নিয়ে আসার জন্য। এবার হস্তিনাপুরকে কৌরব পক্ষ রাজত্ব করার দায়ীত্ব পেল আর পাণ্ডবরা অর্দ্ধেক রাজ্য পেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাস করতে থাকল। এবার বিভিন্ন দেশ বিদেশ থেকে রাজার পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, তাদেরকে খুব করে আদর আপ্যায়ন করা হচ্ছে। এরপর অনেক কাহিনী চলছে। এরমধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আসছে।

নারদের আগমন এবং যুধিষ্ঠিরকে সুন্দ-উপসুন্দের উপাখ্যান বর্ণন

যখন পাণ্ডবরা রাজ্য স্থাপন করে রাজ কার্য পরিচালনা করতে শুরু করেছেন তার মধ্যে একদিন নারদ ঋষি এসেছেন। তিনিও শুনেছেন পাঁচ ভাই মিলে একটি স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। নারদ তখন যুধিষ্ঠিরদের বলছেন, তোমরা তো একজন নারীকে সবাই মিলে বিয়ে করেছে। তোমাদের মধ্যে কিন্তু মনোমালিন্য থেকে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য তোমাদের একটা প্রাচীন কাহিনী শোনাচ্ছি। এই কাহিনীর নাম সুন্দ-উপসুন্দ উপখ্যান। খুব সংক্ষেপে কাহিনীটা হল, হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে এক মহা পরাক্রমী ক্রূর রাক্ষস ছিল; এরই সন্তান হল এই সুন্দ আর উপসুন্দ, এরা দুজনে একবার খুব তপস্যা করেছে। তপস্যা করার পর ব্রহ্মা বর দিতে এসেছেন। এরা দুজন বলছে আমরা অমরত্বের বর চাই। ব্রহ্মা বলছেন, অমরত্বের বর দেওয়া যাবে না, অন্য কোন বর চাও। অমরত্বের বদলে কি বর নেওয়া যেতে পারে? সুন্দ আর উপসুন্দ বলছে, আমরা দুই ভাই একে অপরকে ছাড়া জগতের কাউকে যেন ভয় না পাই, এই জগতে যত প্রাণি আছে তারা যেন আমাদের কিছু না করতে পারে। সুন্দ আর উপসুন্দ দুই ভাই, কিন্তু দুজনের মধ্যে খুব গভীর বন্ধুত্ব। এবার দুজনের মিলে পুরো জগতে নানা রকমের অত্যাচার করতে শুরু করেছে। এদের অত্যাচার এত ক্রূর প্রকৃতির ছিল যে সমস্ত জগতে ত্রাহি ত্রাহি শুরু হয়ে গেছে। গরুড়কে দেখে যেমন সাপ পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি সিদ্ধ, মহাত্মা, ঋষিরা সবাই দুই ভাইয়ের অত্যাচারে পালাতে শুরু করেছে। এবার সবাই ব্রহ্মাকে গিয়ে ধরেছে এর একটা কিছু বিহিত করতে হবে। বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দেওয়া হল একজন নারীর সৃষ্টি করতে। বিশ্বকর্মা তিলোত্তমা নামে এক নারীর সৃষ্টি করলেন। তিলোত্তমা হচ্ছে, জগতের যেখানে যেখানে যা কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল সেই সৌন্দর্যকে তিল তিল করে নিয়ে এই তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করা হল। এখানে বিরাট এক বর্ণনা করা হচ্ছে, কোন জিনিষটা থেকে কি কি নেওয়া হয়েছে। চণ্ডীতে যেমন বর্ণনা করা হয় মা দুর্গাকে কে কি কি জিনিষ দিয়ে সাজিয়েছেন।

এবার তিলোত্তমাকে সুন্দ ও উপসুন্দের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিলোত্তমার সৌন্দর্য দেখে দুই ভাইয়ের মাথা গেছে ঘুরে। দুজনেই তিলোত্তমাকে চাইছে। এর আগে কোন ভালো কিছু পেলেই অন্য ভাইকে বলত এটা তুই নিয়ে নে। কিন্তু এখানে একসাথে দুজনেরই মাথা বিগড়ে গেছে। তিলোত্তমা খুব চালাকি করে বলছে – তোমাদের তো কোন কিছুর ঠিক নেই, তোমরা তো রাক্ষস, কোন দিন যদি আমাকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয় মাঝখান থেকে আমিই হয়তো মারা যাব। ইতিমধ্যে ওদের মাথা এমন ঘুরে গেছে যে তিলোত্তমার কোন কথা শোনার আর ধৈর্য নেই। তিলোত্তমা ছাড়া আর কিছু দেখছে না। তিলোত্তমা তখন বলছে, আগে তোমরা ঠিক করে নাও কে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর আগে কিছু হলে বলতো ও নিয়ে নিক, এ বলত এ নিয়ে নিক। এখন দুজনেই তিলোত্তমাকে চাইছে। দুজনে বলছে আমি তিলোত্তমাকে নেব। এবার দুজনের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেল। যে ভাই একটু জিতছে তিলোত্তমা বাঃ বাঃ করে তাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে, অন্য ভাই যখন জিতছে তখন তার নামেও জয়ধ্বণি দিচ্ছে। এই করে শেষ পর্যন্ত দুই ভাইই মারা গেল। এরপর তিলোত্তমা অপ্সরা হয়ে চলে গেল স্বর্গে। এই কাহিনীটা বলে নারদ বলছেন – সেইজন্য তোমাদের বলছি, দ্রৌপদীকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে এই রকম ঝামেলা যেন না হয়ে যায়, তাহলে পাঁচ ভাই মিলে শেষে কোন দিন মারামারি শুরু করে দেবে। তাই তোমরা কিছ নিয়ম ঠিক করে নাও। তখন পাঁচ ভাই মিলে ঠিক করে নিল আমরা একেক বছর একজন করে দ্রৌপদীকে নিয়ে থাকব। এই সময়ে যদি কেউ তার মহলে ঢুকে পরে দ্রৌপদীকে দেখে নেয় তাহলে কিন্তু তাকে শাস্তি হিসাবে বারো বছর ব্রহ্মচারী ব্রত নিয়ে বনবাসী হয়ে থাকতে হবে।

অর্জুনের শর্ত ভঙ্গ এবং বারো বছর বনবাস

একদিন এক ব্রাহ্মণ রাজদরবারে এসে নালিশ করছে একজন দুষ্কৃতকারি এসে তার গরুগুলিকে জোর পূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন অর্জুনকে ব্রাহ্মণের গরুগুলিকে রক্ষা করতে হবে, তার জন্য তীর ধনুক নিতে হবে। সেই তীর ধনুক আবার রাখা আছে রাজমহলে যেখানে দ্রৌপদী রয়েছেন। তখন যুধিষ্ঠিরের পালা চলছে। অর্জুনকে এখন রাজমহলে গিয়ে তীর ধনুক আনতে হবে, কোন উপায় নেই ব্রাহ্মণের গরু বাঁচাতে হবে তা নাহলে ব্রাহ্মণের অভিশাপ লেগে যেতে পারে। কিছু করার নেই, অর্জুন রাজমহলে ঢুকে গিয়ে তীর ধনুক নিয়ে এসেছে। ভেতরে দাদা আর দ্রৌপদীকে দেখে ফেলেছে। এখন অর্জুনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, বারো বছর বনে ব্রহ্মচারী হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। যুধিষ্ঠির, ভীম সবাই অর্জুনকে বুঝিয়েছে তুমি তো প্রয়োজনে প্রবেশ করেছিলে, এই ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, তুমি চলে গেলে রাজ্যে অনেক অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। অর্জুন কিছুতেই মানবে না, এই নিয়মতো আমরাই ঠিক করেছি, যা নিয়ম হয়ে আছে সেই নিয়মই মেনে আমাকে বারো বছর তপস্যায় চলে যেতে হবে। এই বলে অর্জুন বেরিয়ে গেল। এরপর বিরাট লম্বা কাহিনী আসছে। অর্জুন একবার পূব দিকে যাচ্ছে একবার পশ্চিম দিকে যাচ্ছে কখন উত্তর দিকে আবার কখন দক্ষিণ দিশায় যাচ্ছে। আর যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই কাউকে না কাউকে বিয়ে করে নিচ্ছে। যদিও নিয়ম ছিল ব্রহ্মচারী হয়ে জঙ্গলে থাকবে, কিন্তু মণিপুরে গিয়ে একজনকে বিয়ে করছে, নাগদেশে গিয়ে উলুপিকে বিয়ে করছে। এই রকম নানা কাহিনী আছে। এরপর ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম দিশায় দ্বারকাতে অর্জুন এসেছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তখন যাদবকুলের রাজ্য স্থাপন করে বাস করছেন, তিনিই যাদবকুলশ্রেষ্ঠ।

সুভদ্রা হরণ, অভিমন্যুর জন্ম, অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যাবর্তন

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন একদিন ঘুরছেন। অর্জুন দেখছে শৃঙ্গারযুক্তা একটি নারী মন্দির থেকে পূজো দিয়ে বেরিয়ে আসছে, ঐ অপরূপা লাবন্যময়ী কুমারীকে দেখে অর্জুন মোহিত হয়ে গেছে। অর্জুনের অবস্থা শ্রীকৃষ্ণ বুঝে গেছেন, তিনি অর্জুনকে বলছেন *অব্রবীৎ পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রহসন্নিব ভারত। বনেচরস্য কিমীদং কামেনালোভ্যতে মনঃ।।*১/২১৮/১৬। অর্জুনের মুখের ভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ হেসে বলছেন, কি অর্জুন, যে বনচারী ব্রহ্মচারী তার মুখের এ কি ভাব দেখছি! মেয়েটি শ্রীকৃষ্ণের নিজের বোন সুভদ্রা, সেই দিক থেকে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার ভাই-বোনের সম্পর্ক হয়ে যায়, যদিও সম্পর্কটা একটা দূরত্বের হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বোন। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, তুমি তো এখন ব্রহ্মচারী তোমার মুখে এ কি বিকার দেখছি! ব্যঙ্গ করে বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন জানিয়ে দিলেন মেয়েটি তাঁর বোন, আর অর্জুন তুমি যদি একে বিয়ে করতে চাও তাহলে আমি বাবার সাথে কথা বলি। অর্জুন বলছে, আপনি ঠিকই ধরেছেন, সুভদ্রাকে দেখে আমি খুব মোহিত হয়ে গেছি, আমি কি করি বলুন তো। শ্রীকৃষ্ণ তখন খুব সুন্দর একটি কথা বলছেন – *স্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিবাহঃ পুরুষর্ষভ। স চ সংশিয়তঃ পার্থ স্বভাবস্যানিমিত্ততঃ।।*১/২১৮/২১। ক্ষত্রিয়েদের জন্য বিবাহের একটা প্রথা হল স্বয়ংবর কিন্তু – *স চ সংশিয়তঃ পার্থ স্বভাবস্যানিমিত্ততঃ*, সুভদ্রার যদি স্বয়ংবর হয় তাহলে সে হয়তো তোমার গলাতেই বরমাল্য দিতে পারে। নিজের বোনের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মেয়েদের মাথার কোন ঠিক নেই, স্বয়ংবরে সুভদ্রা কাকে বেছে নেবে কিছু বলা যায় না, হয়তো তোমার সব আশায় জল ঢেলে অন্য কোন বীর ক্ষত্রিয়ের গলায় বরমাল্য তুলে দেবে। স্বয়ংবরের আশায় যদি তুমি বসে থাক তাহলে তুমি ঝামেলায় পরে যেতে পার। সেইজন্য এক কাজ করা যেতে পারে, তুমি সুভদ্রা বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে পালিয়ে যাও। পরে অর্জুন কিভাবে সুভদ্রাকে নিয়ে পালাবে তার সব বন্দোবস্ত শ্রীকৃষ্ণ আগেই করে রেখেছিলেন। অন্য দিকে সবাইকে দেখাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব পরিকল্পনা মত সব সাজান হল। সুভদ্রা মন্দিরে গেছে, বেরিয়ে আসা মাত্র অর্জুন তাকে গায়ের জোরে রথে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ক্ষত্রিয়দের এই ধরণের বিবাহের প্রথা ছিল। কিন্তু বলরাম সুভদ্রাকে এই ভাবে অপহরণ করে নেওয়াতে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবেন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে সব বোঝাতে বলরাম শান্ত হয়ে গেলেন। এইবার বিবাহ হয়ে গেল। অভিমন্যুরও জন্ম হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অর্জুনের বারো বছরের প্রায়শ্চিত্তও শেষ। এইবার সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে চললেন। অর্জুনকে ফিরে পেয়ে সবারই খুব আনন্দ, সবাই এসে অর্জুনকে বুকে জড়িয়ে ধরছে। এরপর অর্জুন গেছেন দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করতে। অর্জুনের সাথে দেখা হতেই দ্রৌপদীর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান জেগে গেছে। দ্রৌপদী বলছেন – *ত্বং দ্রৌপদী প্রত্যুবাচ প্রণয়াৎ কুরুনন্দনম্। তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা। সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে।।*১/২২০/১৭। তুমি আমার কাছে কেন এসেছ, দ্বারকার মেয়ে সুভদ্রার কাছেই যাও। *সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে* – দ্রৌপদী

বলছেন একটা বোচকাকে যদি দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে টেনে বাঁধা হয় তারপর আবার যদি আরেকটা দড়ি দিয়ে আরও শক্ত করে বাঁধা হয় তাহলে পূর্বের বন্ধনটা আলগা হবেই। ঠিক তেমনি আমি যে ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে বেঁধে রেখেছিলাম এখন সুভদ্রা এসে গেছে তার ভালোবাসার বন্ধনে আমার ভালোবাসাটা আলগা হয়ে গেছে, তাই তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও। অর্জুন তখন হাতজোড় করে দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমা চেয়েই যাচ্ছেন। অর্জুন ক্ষমা টমা চেয়ে নিয়ে সুভদ্রার কাছে ফিরে এসে তাকে গোয়ালিনীর বেশে সাজিয়েছেন, রাজার মেয়ে সুভদ্রা তাকে ঐ রকম গোয়ালিনীর সাজে সাজিয়ে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে এসে বলছেন, দ্রৌপদীকে তুমি প্রণাম কর। আগেই অর্জুন সুভদ্রাকে বলে দিয়েছিলেন, দ্রৌপদীর মধ্যে যদি রাগ অভিমান থেকে থাকে তাহলে তুমি শান্তিতে থাকতে পারবে না। শেষে সুভদ্রা তাই করল, একটা গোয়ালার মেয়ের দীন-হীন কাঙালীর বেশে দ্রৌপদীকে প্রণাম করাতে দ্রৌপদীর মনটা নরম হল। কিন্তু যাই হোক, দ্রৌপদী সুভদ্রাকে মনের দিক থেকে কোন দিনই মেনে নেননি।

অভিমন্যুর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, দ্রৌপদীর পাঁচ সন্তানের নাম

অভিমন্যু বেশীর ভাগ সময় মামার বাড়িতেই বড় হয়েছিল। এখানে বলছে অভিমন্যুকে অনেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, একদিকে তার মামা শ্রীকৃষ্ণ যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার বাবা অর্জুনের কাছেও অনেক কিছু শিক্ষা পেয়েছিল। অভিমন্যু কি কি অস্ত্র চালনাতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল তার একটা ছোট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তীর যখন চালান হয় তখন তীর চার রকমের হয়, একটা হচ্ছে মন্ত্রমুক্ত, এই তীর মন্ত্র দ্বারাই চালিত হয় আর এই তীর একবার চালিয়ে দেওয়া হলে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। দ্বিতীয় হল পাণিমুক্ত, এই তীর হাত দিয়ে চালান হয়। তৃতীয় হল মুক্তামুক্ত, এই তীর চালানও যায় আবার ফিরিয়েও আনা যায়, মুক্ত ও অমুক্ত। যেমন ব্রহ্মাস্ত্র, চালানাও যায় আর ফেরতও আনা যায়। শেষে হল অমুক্ত, এই তীর চালান হয় না, কিন্তু এই তীরকে দেখেই মানুষ ভয়ে পালিয়ে যায়। এর উদাহরণ রূপে বলা যায় ধ্বজা, অর্জুনের রথে কপিধ্বজ ছিল, এখন অর্জুনের রথ যখন আসত তখন ঐ ধ্বজা দেখেই কিছু সৈন্য পালিয়ে যেত। ধনুর্বেদের এই চারটে পাদ। ধনুর্বেদের দশটি অঙ্গ হয়। প্রথম হল আদান, তুনীর থেকে যখন তীরকে বার করা হয়। ধনুর মধ্যে যখন তীর সংযোজন করা হয় তখন বলা হয় সন্ধান। লক্ষ্যের দিকে যখন ছাড়া হয় তখন বলা হয় মোক্ষণ। যখন কোন সমাজ ব্যবস্থায় কোন জিনিষ বেশী প্রচলিত থাকে তখন তার আলাদা আলাদা শব্দ থাকে। যেমন আমাদের কলকাতায় বরফ পড়ে না, আমাদের সব বরফই বরফ, কিন্তু বরফের আরেকটা না হিম, হিম আর বরফের কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আইসল্যাণ্ডে যেহেতু সবই বরফ, সেইজন্য আইসল্যাণ্ডে বরফের জন্য তিরিশটি আলাদা শব্দ আছে। ঐ শব্দ দিয়ে বোঝা যাবে এই বরফটা পাথরের মত শক্ত, না বালির মত ঝুরঝুরে, একটু আগে জমেছে, না অনেক আগে জমেছে। বরফের প্রত্যেকটি অবস্থার জন্য আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়। ঠিক তেমনি আমরা মহাভারতে এখানে ধনুর্বেদের কথা বলছি, ধনুর্বেদ তখন সমাজে পুরোদমে চলছে, তাই এর প্রত্যেকটি জিনিষকে আলাদা আলাদা শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে। যখন তীর ছাড়া হল, ছাড়ার পর মনে হল লোকটি দুর্বল বা ভয় পেয়ে গেছে, তখন মন্ত্রশক্তি দিয়ে তীরটাকে ফেরত নিয়ে আসা হয়, এটাকে বলা হয় নিবর্তন। নিবর্তন শব্দটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এই ধনুর্বেদের কথা উত্থাপন করলাম। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র চালাবার বিদ্যাটা জানত কিন্তু ঐ অস্ত্রের নিবর্তনটা তাঁর জানা ছিল না। চালিয়ে দেওয়ার পর ওটাকে ফেরত নিয়ে আসার ক্ষমতাটা অশ্বত্থামার ছিল না। যখন দাঁড়িয়ে তীর চালান হয় তখন তার একটা বিশেষ নাম, আবার রথকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাণ মারা হচ্ছে, এর একটা আলাদা নাম। যখন একটা লক্ষ্যতেই তীর মারা হয় তখন এক রকম বলা হয়, এক সঙ্গে যখন দশটা লক্ষ্যকে তীর ছোঁড়া হয় তখন তার একটা নাম আছে। এগুলো সবই অভিমন্যু জানতেন। অন্য দিকে দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী থেকে পাঁচটি সন্তান হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের থেকে সন্তানের নাম প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের থেকে সন্তানের নাম সুতসোম, অর্জুনের থেকে শ্রুতকর্মা, নকুল থেকে শতানীক আর সহদেব থেকে শ্রুতসেন। এরা সবাই বড় যোদ্ধা ছিল, মহাভারতের যুদ্ধের পরে গভীর রাতে ঘুমের মধ্যে অশ্বত্থামা এদের সব কটাকে বধ করে দিয়েছিল।

খাণ্ডববন দহন কাহিনী

এখান থেকে মহাভারতের কাহিনী আরও গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করে। এরপর আসছে খাণ্ডববন দাহ। ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে একটা বিরাট অরণ্য ছিল, এই অরণ্যের নাম ছিল খাণ্ডব বন। শ্বেতকি বলে একজন রাজা একবার দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী এক বিরাট যজ্ঞ করেছিল, আর সারাটা দিন ধরে যজ্ঞের অগ্নিতে ঘি ঢালা চলছে। অগ্নি দেবতাকে এখন ঐ ঘি পান করে যেতে হচ্ছে। অগ্নি দেবতা এখন বারো বছর যাবৎ শুধু ঘি পান করে করে তাঁর অগ্নিমান্দ্য হয়ে গেছে। এমনই পেটের গোলমাল হয়ে গেছে যে, অগ্নি দেবতার এখন যে কোন খাবারের প্রতি অরুচি এসে গেছে। এত অরুচি এসে গেছে যে অগ্নি দেবতা আর কোন যজ্ঞে অংশ নিতে চাইছেন না। এই অবস্থায় সবাই যাঁর কাছে যায় অগ্নি দেবতাও তাঁর কাছে

মানে ব্রহ্মার কাছে গেছেন। আমার যে এই অরুচি হয়ে গেছে এতেতো সব যজ্ঞ-যাগ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে গেছে, আপনি এর একটা কিছু বিহিত করুন। আর আমি দিনে দিনে তেজহীন হয়ে যাচ্ছি। পৌরানিক একটা কাহিনীতে আছে পার্বতী কি একটা কারণে অগ্নি দেবতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এরপর থেকে তুমি সর্বভক্ষী হয়ে যাবে। ব্রহ্মা তখন বলছেন, বারো বছর ধরে ঘি খেয়ে আসছ এতে তোমার পেটের গোলমাল হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না, কিন্তু তুমি তেজহীন হয়ে যাবে এটা তোমাকে শোভা দেয় না। তার মানে ব্রহ্মা বলতে চাইছেন, একটা সমস্যা এসেছে ঠিকই, আর সমস্যা যখন তখন হতেই পারে কিন্তু তাই বলে তোমার মধ্যে এতো হতাশা কেন এসে যাবে, তুমি তোমার কান্তিকে হারিয়ে ফেলছ কেন! ঠিক আছে এর একটা বিহিত আমরা করছি। এই যে খাণ্ডব বন আছে, এখানে প্রচুর গাছপালা আর জীবজন্তুদের বাস, ঐ বনটাকে তুমি পুড়িয়ে শেষ করে দাও। খাণ্ডব বনটাকে গ্রাস করতে পারলে তোমার শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে। পর পর অনেক দিন বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার পর শরীরটা খারাপ করলে ডাক্তারবাবুরা যেমন বলেন কয়েক দিন একটু হাল্কা ঝোল ভাত খেতে। এখানেও অগ্নি অনেক দিন খুব করে ঘি খেয়েছে সেইজন্য ব্রহ্মা বলছে, এই সমগ্র জঙ্গলে যা কিছু আছে সব তুমি খেয়ে নাও। এই ধরণের কাহিনীর মাধ্যমে কি বলতে চাইছেন বলা মুশকিল, তবে যিনি কবি তিনি হয়তো বিরাট কোন দাবানলের দৃশ্য দেখে থাকবেন বা কারুর কাছে বর্ণনা শুনেছেন, সেই দৃশ্যকেই কবি পৌরানিক কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ব্রহ্মার আজ্ঞা পেয়ে এবার অগ্নি পুরোদমে খাণ্ডব বনকে দহন করতে নেমে গেছে। কিন্তু আগুন লাগতেই বনের যত হাতি ছিল সব শূঁড়ে করে জল দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিয়েছে। এইভাবে অগ্নি দেবতা সাত বার খাণ্ডব বনকে দহন করার চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে। ব্রহ্মাকে গিয়ে সব বলেছে। ব্রহ্মা তখন অগ্নিকে বললেন, এই কাজের জন্য তুমি শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের সাহায্য নাও, এই দুজন এমন ব্যবস্থা করে দেবে যার ফলে খাণ্ডব বনকে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে পারবে। যথারীতি অগ্নি দেবতা শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের কাছে গেছেন। সব শুনে অর্জুন বলছেন, আমাদের এই সাধারণ অস্ত্র দিয়ে এই কাজ সম্ভব নয়, আপনার কাছে যে অক্ষয় তুণ আর অন্যান্য যে দিব্য অস্ত্র রয়েছে সেগুলো আমাদের দিন। অগ্নি দেবতা তখন বরুণ দেবতার থেকে রথ আর তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তুণ দিলেন আর শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর পাঞ্চজন্য শঙ্খ দিলেন।

এবারে অগ্নি দেবতা খাণ্ডব বন দহন করতে নেমে পড়েছেন। অন্য দিকে অর্জুন গাণ্ডীব নিয়ে বনের যে কোন প্রাণি একটু নড়াচড়া করছে, সে পাখি হোক হাতী হোক সঙ্গে সঙ্গে তীর মেরে বধ করে দিচ্ছে। এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া হল এই বনে যত প্রাণি আছে সব এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যাতে অগ্নি দেবতার শান্তি হয়। এদিকে ইন্দ্র দেখছে আগুনে পুরো খাণ্ডব বন পুড়ে যাচ্ছে, তখন ইন্দ্র জোর বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছে। আমরা ভাগবতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ইন্দ্রকে ছোট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাভারতেই আমরা দেখতে পাই পদে পদে ইন্দ্রকে ছোট করা হচ্ছে। এদিকে অর্জুন হলেন ইন্দ্রপুত্র, ইন্দ্র যখন মেঘ নিয়ে এসেছে জল ঢালার জন্য, অর্জুন তখন দিব্য বাণের দ্বারা মেঘকে উড়িয়ে অন্য দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তখন ইন্দ্র খুব রেগে গিয়ে সব দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েছে, অথচ এদিকে শুধু শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ যথারীতি রথ চালনা করছেন আর অর্জুন তীর দিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। মাত্র এই দুজন মিলে দেবতাদের নাস্তানাবুদ করে পিটিয়ে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

মাত্র দুজন মানুষের কাছে হেরে গিয়ে ইন্দ্র খুব ভেঙ্গে পড়েছে। তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন, তুমি ভেঙ্গে পড়োনা, এনারা সামান্য মানুষ নন, এঁরা নর ও নারায়ণ ঋষি, এই দুজন এমন শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন যে ত্রিভুবনে কেউ এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারবে না। ইন্দ্রের বন্ধু ছিল তক্ষক, যাকে আমরা সর্পযজ্ঞের কাহিনীতে দেখেছি। এই তক্ষকের পরিবার থাকত খাণ্ডব বনে। এখন তক্ষকের পরিবারও পুড়তে শুরু করেছে। তক্ষকের কপাল এমন যে, সে তখন বাইরে ছিল। তক্ষকের সন্তানের নাম ছিল অশ্বসেন, আগুনে সেও এখন পুড়ে যাবে। তক্ষকের স্ত্রী তখন তার সন্তান অশ্বসেনকে বলছেন, বাবা তুমি মরে গেলে আমাদের বংশ লোপ পেয়ে যাবে, তোমাকে যে করেই হোক আমাকে বাঁচাতে হবে। তক্ষক সাপের মা তার সন্তানকে পুরো গিলে নিয়েছে। সাপেদের ধর্মই হচ্ছে সর্পিনী ডিম থেকে বাচ্চা বেরোলেই নিজের বাচ্চাদের কপ্‌কপ্ করে গিলে নিতে থাকে। আসলে ডিম থেকে যখন কিলবিল করে বাচ্চা গুলো বেরোতে থাকে তখন সাপের মা বুঝতে পারেনা এটা ওর বাচ্চা না শত্রু, সেই ভয়ে গিলে নেয়। এর মধ্যে যে কটা সাপ পালাতে পারে তার থেকেই পুরো সর্পজাতি চলতে থাকে। সাপেদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা কবিরা জানতেন আর এটাকে আধার করে কাহিনীটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তক্ষকের স্ত্রী সন্তান অশ্বসেনকে গিলে নিয়ে আকাশমার্গে উড়ে পালাবার চেষ্টা করেছে। যেমনি আকাশমার্গে

উড়েছে অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে বাণ মেরে সর্পিণীর গলা কেটে দিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে সে জঙ্গলের এলাকার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, গলা কেটে দিতেই অশ্বসেন মায়ের শরীর থেকে বেরিয়ে ছিটকে জঙ্গলের বাইরে গিয়ে পড়েছে। তারপর একে অপরকে অভিশাপ দিয়েছে, আর পরে এই তক্ষক মহাভারত যুদ্ধের সময় বদলা নিতে আসবে, কর্ণ যখন অর্জুনের উপর সর্পবাণ চালাবে তখন তক্ষক সেই বাণের উপর বসে কর্ণকে বলছে, অর্জুনকে আমার বদলা নেওয়ার আছে, সে আমার বউকে খাণ্ডববনদাহনের সময় পুড়িয়ে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে ইন্দ্রকে খবর দেওয়া হল তোমার বন্ধু তক্ষক অক্ষত আছে, সে পুড়ে যায়নি, সেইজন্য তুমি শান্ত হও।

ইন্দ্র যখন ওখান থেকে চলে গেল, তখন অর্জুনরা দেখে একজন কালো কুচকুচে লোক বন থেকে পালাচ্ছে। অর্জুন যখন তাকে মারতে গেছে সে ছুটে এসে অর্জুনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে। অন্য কোন প্রাণি এইভাবে এসে রক্ষা চাইনি। অর্জুন বলছেন, ঠিক আছে আমি তোমাকে রক্ষা করব কিন্তু তুমি কে বল। সেই লোকটি তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলছে আমি হলাম নমুচির ভাই ময়াসুর। দেবতাদের কারিগর যেমন বিশ্বকর্মা, ময়াসুর ঠিক সেই রকম অসুরদের কারিগর। ময়াসুর রক্ষা পেয়ে গেল, এরপর এই ময়াসুর ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের জন্য এক দারুণ রাজমহল তৈরী করে দেবে।

খাণ্ডববন দহনে শার্ঙ্গক শাবকদের রক্ষা পাওয়ার কাহিনী

খাণ্ডববনের আগুন থেকে সাকুল্যে মাত্র কয়েকটি প্রাণি বেঁচেছিল। নাগ পরিবার থেকে বাঁচল তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, ময়াসুর, অর্জুন যাকে অভয় দান করে রক্ষা করলেন আর চারটি শার্ঙ্গক পাখির ছোট বাচ্চা বেঁচে গিয়েছিল। শার্ঙ্গক হল চড়ুই পাখি জাতীয় ছোট পাখি। জনমেজয় বৈশম্পায়ন ঋষিকে জিজ্ঞেস করছেন এই ছোট চারটে শার্ঙ্গক কি করে বাঁচল। বৈশম্পায়ন ঋষি বলছেন এই চারজনকে অগ্নি দেবতা দগ্ধ করলেন না। কেন করলেন না সেই নিয়ে একটা কাহিনী আছে, বৈশম্পায়ন এখন সেই কাহিনীটা জনমেজয়কে বলছেন।

মন্দপাল নামে একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন। *ধর্মজ্ঞানাং মুখ্যতমস্তপস্বী সংশিতব্রতঃ। আসীন্মহর্ষি শ্রুতবান্ মন্দপাল ইতি শ্রুতঃ।।*১/২২৮/৪। তিনি ছিলেন তখনকার দিনে একজন কঠোর তপস্বী, তিনি বেদের স্বাধ্যায় করতেন, ধর্ম পালন করতেন, ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ নিজের বশে নিয়ে এসেছিলেন। এর থেকে তাঁর যে বড় গুণ সেটা হল তিনি ছিলেন ঊর্দ্ধরেতা। তখনকার দিনে সন্ন্যাসীর ঠিক ধারণা ছিল না, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী বলতে যেটা বোঝায় সেই রকম কোন বিশেষ ধারণা ছিল না কিন্তু সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর ধারণা না থাকলেও সেই সময় ঊর্দ্ধরেতার ধারণাটা পরিষ্কার ভাবে এসে গিয়েছিল। ঊর্দ্ধরেতা তাঁরাই হতেন যাঁরা কোন ধরনের নারীসঙ্গ করতেন না। মন্দপাল ছিলেন ঊর্দ্ধরেতা। তিনি প্রচুর তপস্যা আর কঠোর ভাবে ইন্দ্রিয়কে সংযম করে বশে রেখেছিলেন। সময় হয়ে যাওয়ার পর তিনি দেহ রেখেছেন, মৃত্যুর পর স্বর্গে গেছেন। স্বর্গে যাওয়ার পর মন্দপাল দেখছেন তিনি যে এত তপস্যা করেছেন আর এত যে সৎ কর্ম করেছেন তার কোন ফল পাচ্ছেন না। তিনি দেবতাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে এত তপস্যা করলাম, এত কিছু করলাম, তার ফল কেন পাচ্ছিনা। মহাভারতে এই ধরণের গভীর সমস্যাকে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে অনেক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, আর এটা সত্যিই খুব সমস্যা হয়ে যায়, আমি ভালো কাজ করার পরেও ফল কেন পাবো না। মহাভারতে পরের দিকে বলবে যখন কোন তপস্যাদি করা হয় তখন সেটা নিষ্কাম ভাবে করতে হয়, তপস্যা করা, ধর্মাচরণ করা এগুলো হল চাষবাস করার মত, কোন বার ভালো ফসল হল না, কোন বার ফসল ভালো হল, কখন মন খারাপ হবে, কখন মন তৃপ্ত হয়ে যাবে। মন্দপাল বলছেন *কিমর্থমাবৃতা লোকা মমৈতে তপসার্জিতাঃ। কিং ময়া ন কৃতং তত্র যস্যৈতৎ কর্মণঃ ফলম্।।*১/২২৮/৯। আমার সব সৎকর্ম যেন ঢাকা পড়ে গেছে, আমার কোন্ এমন কর্ম বাকি থেকে গেছে যার জন্য আমার এই তপস্যার সব ফল ঢাকা পড়ে আছে? আমি জানতে পারলে সেটা করে মিটিয় দেব, আমি চাই আমার তপস্যার ফলটা যেন পাই। আমাদের বেদের যে যজ্ঞ-যাগ, ইসলামের যে কর্ম করা, জহুদিদের যে কাজ করা সবার লক্ষ্য এক, স্বর্গ প্রাপ্তি। কিন্তু স্বর্গের পরিভাষার ক্ষেত্রে কিছু তফাৎ আছে। বৈদিক যুগে বা তার পরের দিকে বেশীর ভাগ মানুষই চাইতেন আমি যে তপস্যা করেছি, যা যা কর্ম করেছি তার জোরে আমি স্বর্গে যাব, সেখান থেকে আরও উচ্চ স্বর্গে যাবো, সেখানে অনেক দিন ধরে ফলের ভোগ করতে থাকব। কিন্তু সবাই একটা জিনিষকে মানতেন যে স্বর্গে আমরা কেউ চিরদিন থাকতে পারবো না, ওখান থেকে সবাইকে যেমনটি কর্ম করেছিল সেই অনুসারে কর্মের ফল ভোগ করা শেষ হলে নেমে আসতে হবে। কিন্তু সেই ফলটাও মন্দপাল পাচ্ছেন না। মন্দপাল জানতে চাইছেন এর কারণ কি, কোথায় গোলমাল হয়েছে?

তখন দেবতারা মন্দপালকে ফল না পাওয়ার কারণ বলছেন। এই ধারণা গুলো পরের দিকে পাল্টে গেছে, কিন্তু তখনও মহাভারতে এই ধারণা গুলো যেমন যেমন ছিল সেটাকে দেখানো হয়েছে; দেবতারা বলছেন, যখন কেউ মানবদেহ ধারণ করে তখন সে কিছু কিছু ঋণ নিয়ে দেহ ধারণ করে, এই ঋণগুলো থেকে তাকে মুক্ত হতে হয়। মনুস্মৃতিতে এই ব্যাপারে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ যখন যজ্ঞ করে, তপস্যা করে, বেদাদি অধ্যয়ণ করে তখন তার ঐ ঋণগুলো থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই ঋণের বাইরে তার আরেকটা ঋণ থেকে যায়, সেটা হল পিতৃঋণ। সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরই সে এই পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে। পুত্র শব্দটা এসেছে পুত নামক নরক থেকে পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করে বলে তাকে পুত্র বলা হয়। পরের দিকে শঙ্করাচার্য যে যজ্ঞের বিধান দিলেন তাতে তিনি পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়ে দিলেন। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পিতৃযজ্ঞ একটি অন্যতম যজ্ঞ, বাকি চারটে হল ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ হল, যখন কেউ শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছে, জপ-ধ্যান করছে। দেবযজ্ঞ হল, যখন কেউ পূজা অর্চনা করছে, তীর্থে যাচ্ছে। পিতৃযজ্ঞ, পিতৃদের উদ্দেশ্যে যখন কিছু করা হয়, যেমন শ্রাদ্ধাদি কর্ম, পিণ্ডদান, খাওয়ার সময় পিতৃদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দেওয়া। নৃযজ্ঞ, নৃ মানে নর, যখন কোন অচেনা অপরিচিত কাউকে আহ্বাণ করে কিছু খাওয়ান হচ্ছে তখন সেটা হয়ে গেল নৃযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞ হল, নিজের খাবার-দাবার থেকে কিছু অংশ পশু-পাখিদের নিয়মিত খাওয়ান। নিজের পোষা গরু, ছাগল, বেড়াল বা পাখিকে খাওয়ানোর কথা এখানে বলা হচ্ছে না, রাস্তার গরু, কাক, চড়ুই শালিখ এদেরকে রোজ কিছু খাওয়ানো। দেবতারা মন্দপালকে বলছেন, ভাই তুমি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের চারটে যজ্ঞের সবটাই করেছ কিন্তু তুমি সন্তানোৎপাদন করোনি, সন্তানের জন্ম দাওনি বলে একটা ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারোনি আর তাই তোমার সব তপস্যার ফল ঢাকা দিয়ে রাখা আছে, সেইজন্য তুমি ফিরে যাও, গিয়ে সন্তান উৎপত্তি কর।

মহাভারতে এখানে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে এই ধারণা পরের দিকে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। মনুস্মৃতিতে এসে গিয়েছিল একজন মানুষ কত রকম ভাবে সন্তান পেতে পারে। কিন্তু আগে মোটামুটি দু ভাবেই সন্তান লাভ করার সুযোগ দেওয়া ছিল, ঔরসজাত সন্তান আর ক্ষেত্রজ সন্তান। মহাভারতের সময়ে তখনও স্বর্গ, সন্তান এগুলোর খুব গুরুত্ব ছিল, পরের দিকে গুরুত্ব অনেক কমে যায়। দেবতারদের কথা শুনে এখন মন্দপাল খুব চিন্তায় পরে গেলেন, কি করে অল্প সময়ের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করবেন। ভেবে চিন্তে দেখলেন শার্ঙ্গক পাখি, মানে চড়ুই পাখি খুব অল্প দিনের মধ্যে বাচ্চা দেয়, এদের একটাকে বিয়ে করে খুব অল্প দিনে বাচ্চা করে দিলেই আমি ঋণমুক্ত হয়ে যাব। এই ভেবে তিনি জয়িতা নামে একটা শার্ঙ্গক পাখিকে বিয়ে করলেন। এদের কাছে যোনির কোন গুরুত্ব নেই, এখন সে মানুষ যোনিতে জন্ম নিল কি অন্য কোন যোনিতে জন্ম নিল, এর কোন দাম নেই। মন্দপালকে বলা হল তুমি সন্তানের জন্ম দাওনি বলে তোমার তপস্যার ফল পাচ্ছ না। মন্দপাল বললেন, ঠিক আছে সন্তান আমি দেব। কোথা থেকে দেব? পাখি হয়ে সন্তানের জন্ম দেব। মানুষ যোনিতে গেলে কবে সে বড় হবে, তারপর বিয়ে করবে, কবে বাচ্চা হবে কোন ঠিক নেই তার থেকে বরং পাখি হয়ে দ্রুত পদ্ধতিতে সব চুকিয়ে দিলেই হল। কি দ্রুত পদ্ধতি? চড়ুই পাখি হয়ে কালকে সন্তানের জন্ম দিয়ে দেব।

মন্দপাল ছিলেন বিরাট তপস্বী, তাঁর সন্তানও তো সেই রকম তেজস্বী হবে। তিনি চারজন ব্রহ্মবাদীকে জন্ম দিয়ে দেখলেন চারটে বাচ্চার জন্ম হয়ে গেছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেলেন। উড়ে গিয়ে লপিতা নামে আরেকটা পাখির কাছে চলে গেলেন, সেখানে মন্দপাল কি করলেন পরিষ্কার করে উল্লেখ করা নেই। মন্দপালের আর কোন ব্যাপারে আগ্রহ নেই, বাচ্চা দিয়ে দিয়েছেন তিনি বেরিয়ে চলে গেছেন। মন্দপাল ছিলেন বড় ঋষি, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এই জঙ্গলে একদিন আগুন লাগবে, আমিতো বাচ্চা আর বউকে সেই জঙ্গলে ছেড়ে এসেছি। তখন তিনি অগ্নির স্তুতি করতে শুরু করেছেন। দেবতাদের স্তুতি করলে এমনিতেই খুশি হয়ে যান, আর এত বড় ঋষি অগ্নি দেবতার স্তুতি করাতে অগ্নিও খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করছেন তোমার কি অভিলাষ আমাকে পূর্ণ করতে হবে বল। মন্দপাল তখন বলছেন ***তমব্রবীন্মন্দপালঃ প্রাঞ্জলির্হব্যবাহনম্। প্রদহন্ খাণ্ডবং দাবং মম পুত্রান্ বিসর্জয়।।***১/২২৮/৩৩। হে ভগবান হব্যবাহনে! আমার চারটে বাচ্চা ওখানে থেকে গেছে, আপনি যখন খাণ্ডববন দহন করবেন তখন দয়া করে আপনি ওদের ছেড়ে দেবেন, কারণ ওদের জন্মই হয়েছে আমাকে উদ্ধার করার জন্য। অগ্নি দেবতাও আশ্বাস দিয়ে ঋষিকে আশ্বস্ত করলেন।

এবার অগ্নি দেবতা খাণ্ডববনকে দাহ করতে শুরু করেছেন, সমস্ত বন পুড়তে শুরু হয়েছে। চারিদিকে আগুন দেখে জরিতা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কি করবে, কোথায় যাবে এই ভেবে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে। আগুন দেখে মনে হচ্ছে যেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে দেবে আর এদের এখন ডানাই গজায়নি, এদের কোন ক্ষমতাই নেই ওড়ার, এদের কি হবে! আমি আর কি করব, এখন আমার ডানা দিয়ে এদের ঢেকে রাখি, আমি পুড়ে গেলেও এরা বেঁচে যাবে। এই হল সন্তানের প্রতি মায়ের

ভালোবাসা। জরিতা তখন বাচ্চাদের বলছে, তোমাদের বাবা অত্যন্ত নির্দয়, ক্রূর, তোমাদের এই ভাবে ফেলে রেখে চলে গেছেন। তিনি যাবার সময় তোমাদের সবার নাম দিয়ে গেছেন, তোমাদের মধ্যে যে জেষ্ঠ্য তার নাম জরিতারি আর এর থেকে বংশের প্রতিষ্ঠা হবে। দ্বিতীয় সন্তানের নাম হবে সারিসৃক্ক, এই সন্তান আমাদের বংশ বৃদ্ধি করবে, মানে একজন বংশকে পার করবে আরেকজন বংশকে বৃদ্ধি করবে। তৃতীয় সন্তান স্তম্বমিত্র, এই সন্তান খুব তপস্যা করবে আর চতুর্থ সন্তান দ্রোণ ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। কিন্তু চারজনই ব্রহ্মবাদী, চারজনই জ্ঞানী। তোমাদের বাবা তো এত কথা বলে গেছেন, কিন্তু বলে নিজে তো পালিয়ে গেছেন আর তোমরা সবাই পুড়ে যাবে, এখন কি হবে। জরিতা এই সব বলে কাঁদছে। তখন চারটে বাচ্চা বলছে, মা তুমি তোমার পুত্র স্নেহ ত্যাগ কর আর উড়ে গিয়ে আগে নিজের প্রাণ বাঁচাও। পাখির বাচ্চারা কেন এই ভাবে বলতে পারছে? কারণ এরা সবাই ওদের বাবার আশীর্বাদে ব্রহ্মবীৎ, এদের শরীরটা পাখির কিন্তু ভেতরের চৈতন্য পুরো জাগ্রত, শরীরটা অক্ষম। ঠাকুরের যেমন, গলায় ক্যান্সার, শরীর চলছে না, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান। ঠিক তেমনি শরীরটা শিশু পাখি, এক্ষুণি পুড়ে যেতে পারে কিন্তু পূর্ণজ্ঞানী। এই কারণে হিন্দুদের মধ্যে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, অযথা কাউকে হিংসা করতে নেই, অযথা কোন প্রাণির প্রাননাশ করতে নেই। বাইরে একটা পাখি ক্রমাগত আওয়াজ করে যাচ্ছে, আমরা কি করে জানব এই পাখিটা আসলে কি। এই পাখিটা কোন সাধারণ পাখি হতে পারে, আবার এই সব কাহিনী পড়ার পর মনে হতে পারে পাখিটা কোন শাপভ্রষ্ট ঋষি হতে পারে। এখন যদি পাখিটাকে ধরে খেয়ে নেওয়া হয় তাহলে আমার অজান্তায় একজন ঋষির বধ হয়ে যাবে। পাণ্ডুর ক্ষেত্রে ঠিক এই কাণ্ডটাই হয়েছিল। একজন ঋষির ইচ্ছে হয়েছে নিজের পত্নির সাথে সমাগম করবেন। কিন্তু ঋষির বেশে এই ধরণের কাজ করতে নেই বলে তাঁরা একটা পশুর শরীর ধারণ করতে চাইলেন। হরিণের শরীর নিয়ে তাঁরা এই কাজ করবেন। পাণ্ডু বুঝতে পারেনি, না বুঝে তিনি হরিণের উপর বাণ চালিয়ে দিয়েছেন। তখন মৃত্যুর সময় সেই ঋষি পাণ্ডুকে অভিশাপ দিলেন আমাদের এই অবস্থায় তুমি বাণ মেরে বধ করলে, তুমিও কখন যদি এই রকম কর তাহলে তখন তুমিও মারা যাবে।

বাচ্চারা মাকে উড়ে চলে যেতে বলে বলছেন, আমরা যদি মারা যাই তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ তুমি যদি বেঁচে যাও তাহলে তোমার থেকে আরও কিছু বাচ্চা হয়ে যাবে, তার ফলে আমাদের বংশ পরম্পরাটা থেকে যাবে। আমাদের এই তো ছোট্ট শরীর, এই শরীরকে আমাদের কে রক্ষা করবে! তুমি বেঁচে গেলে আবার একটা বিয়ে করে সন্তানাদির জন্ম দিতে পারবে। তোমার বয়সও এখন অল্প তাই তোমার এই অপত্য স্নেহকে ত্যাগ করে উড়ে যাও। জরিতা তখন বলছে, বাবা, তোমরা এক কাজ কর, এর নীচে একটা গর্ত আছে, সবাই মিলে ঐ গর্তের মধ্যে ঢুকে যাও আর আমি বাইরে থেকে ধুলো দিয়ে গর্তের মুখ ঢেকে দেব, তাহলে আগুন আর ভেতরে যেতে পারবে না। আগুন নিবে গেলে ধুলো সরিয়ে তোমাদের বার করে নেব। বাচ্চাগুলো তখন বলছে, *অবর্হান্ মাংসভূতান্ নঃ ক্রব্যাদাখুর্বিনাশয়েৎ। পশ্যমানা ভয়মিদং প্রবেষ্টুং নাত্র শক্নুমঃ।।*১/২২৯/১৯। মা আমাদের কোন ডানা গজায়নি আমরা একটা ছোট্ট মাংস পিণ্ড, এই গর্তে যে ইঁদুরটা বাস করে সে আমাদের খেয়ে নেবে। আমরা ভাবছি, আগুন যাতে আমাদের না পোড়ায়, ইঁদুর যাতে আমাদের না খেয়ে নিতে পারে আর বাবার কাজটাও যেন হয়ে যায়। যদি আমরা গর্তে প্রবেশ করি তাহলে ইঁদুর আমাদের মেরে ফেলবে, তোমার সাথে যদি উড়ে যাবার চেষ্টা করি তাহলে আগুনের তাপে মরে যাব। *গর্হিতং মরণং নঃ স্যাদাখুনা ভক্ষিতে বিলে। শিষ্টাদিষ্টঃ পরিত্যাগঃ শরীরস্য হুতাশনাৎ।।*১/২২৯/২২। ইঁদুরের কাছে মরার থেকে শ্রেয় হবে আগুনে দগ্ধ হয়ে মরা। কারণ ইঁদুরের কাছে মরা গর্হিত মৃত্যু, আগুনে পুড়ে মরা সম্মানের মৃত্যু তাতে আমাদের সদ্গতি হবে। গর্হিত মৃত্যু থেকে সম্মানিত মৃত্যু সব সময় শ্রেয়। মা তখন বলছে, আমি একটা বাজ পাখিকে ঐ ইঁদুরটাকে ধরে নিয়ে উড়ে যেতে দেখেছি, তাই ইঁদুরের থেকে তোমাদের শঙ্কা করার কোন কারণ দেখছি না। কিন্তু বাচ্চাগুলো মার কথা মানবে না। বাচ্চারা মাকে বলছে *নিঃসংশয়াৎ সংশয়িতো মৃত্যুর্মাতর্বিশিষ্যতে। চর খে ত্বং যথান্যায়ং পুত্রানাপ্স্যসি শোভনান্।।*১/২৩০/৪। নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে অনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোন অনেক ভালো। পাখির বাচ্চারা বলতে চাইছে, আমাদের জন্ম হয়েছে যাতে আমরা বাবার বংশকে উদ্ধার করি, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ এখন হবার নয়। এরপর আমরা এমন একটা পথ বেছে নিচ্ছি যেখানে আমাদের মৃত্যুটা নিশ্চিত, ইঁদুরের হাতে মৃত্যু। কিন্তু আমাদের এমন একটা পথ বেছে নিতে হবে যেটাতে আমাদের মৃত্যুটা অনিশ্চিত, হয়তো আমরা বেঁচে যেতেও পারি। তাহলে আমাদের কাজটাও হবে যার জন্য আমাদের জন্ম। মা তবুও বলে যাচ্ছে, আমি দেখেছি বাজ পাখি ইঁদুরটাকে নিয়ে চলে গেছে। পাখির বাচ্চারা বলছে, মা তুমি মিথ্যে কথা বলে আমাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করো না, সন্দিগ্ধ কার্যে কখন প্রবৃত্ত হতে নেই। মা, তুমি এখনও তরুণী, দেখতে সুন্দরী, তুমি চাইলে একটা নতুন স্বামীও জুটিয়ে নিতে পারবে, সেখান থেকে তোমার সন্তানও হয়ে যেতে পারে। আমরা মরে যাচ্ছি তার জন্য তুমি চিন্তা করো না, আমাদের মরতে দাও, তুমি এখান থেকে উড়ে যাও।

জরিতা তখন বোঝাচ্ছে, আপদ-বিপদ সবার জীবনেই আসতে পারে, কিন্তু যে বুদ্ধিমান সে যদি আপদ-বিপদ আসার আগে সাবধান হয়ে যায় তাহলে বিপদ এসে গেলেও সে ব্যাথিত হয় না। যারা মুর্খ তারা আগে থাকতে সাবধান হয় না, তাই বিপদ এলে এরা ঝামেলাতে পড়বেই পড়বে।

ভগবান বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন নাগসেন। রাজা মিলিন্দ একবার নাগসেনকে জিজ্ঞেস করেছেন যে জেনে শুনে ভুল কাজ করে তার পাপ বেশী হয়, না অজান্তায় যে ভুল কাজ করে তার পাপ বেশী হয়? নাগসেন বলছেন, যে অজান্তায় ভুল কাজ করে তার পাপ বেশী হয়, যে জেনেশুনে ভুল কাজ করছে তার পাপটা সব সময় কম হয়। নাগসেন উপমা দিয়ে বলছেন, একটা তপ্ত লৌহ দণ্ড আছে, একজন জানে যে এটি তপ্ত লৌহ দণ্ড সে যখন দণ্ডটিকে ধরতে যাবে তখন সে সাবধান হয়ে ধরবে, আর যে জানেনা সে ঝাঁপিয়ে ধরে। এখন হাতটা কার বেশী পুড়বে? যে জানে না তার হাতটা বেশী পুড়বে। এখানে ঠিক এই কথাই বলা হচ্ছে। যে জানে যে আমার আপদ-বিপদ আসতে পারে, সে প্রস্তুতি নিয়ে রাখে।

এদিকে বাচ্চাগুলো বলছে, এসো আমরা সবাই অগ্নি দেবতার স্তুতি করতে থাকি। বাবা যে আগেই অগ্নির স্তুতি করে রেখেছে তাতো এরা জানেনা। আগুন ক্রমশ এগিয়ে আসছে, সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সবাই একাগ্র চিত্তে অগ্নির উপাসনা করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে জরিতারি বলছে *আত্মাসি বায়োর্জ্বলন শরীরমসি বীরুধাম্। যোনিরাপশ্চ তে শুক্রং যোনিস্ত্বমসি চাম্ভসঃ।।*১/২৩১/৭। হে অগ্নিদেব, আপনি হচ্ছেন বায়ুর আত্মস্বরূপ, আপনি বনস্পতির শরীর, পৃথিবী ও জল আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ইত্যাদি। ঋকবেদের প্রথম মন্ত্রই শুরু হচ্ছে অগ্নি দেবতাকে স্তুতি করে, অগ্নিমীডে পুরোহিতং। এগুলো সবই বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্র যদি ঠিক মত উচ্চারিত হয় তখন সেই মন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে ফল দিতে শুরু করে। সবাই এক এক করে অগ্নি দেবতারা নানা উপাসনা করছে। সারিসৃক্ক বলছে, আমাদের মা চলে গেছেন বাবা আগেই ছেড়ে গেছেন, এখন হে অগ্নিদেবতা আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, আমরা আপনার শরণাগত, আপনি আপনার কল্যাণমুর্তি ও সপ্তশিখা দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। স্তম্বমিত্র স্তব করে বলছে, হে অগ্নিদেব, আপনি এক হয়েও বহু, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আপনার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। আপনি একাধারে প্রাণিদিগকে পালন ও ধারণ করেন। ঠিক এই ধরণের বক্তব্যকে আমরা এর আগে দেবযানি-শর্মিষ্ঠার কাহিনীতে শুক্রাচার্যকে বলতে দেখেছি, সেখানেও শুক্রাচার্য বলছেন, আমিই মেঘ হয়ে বৃষ্টি দিই, আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পোষন করি, শুক্রাচার্যের ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম ভাব। অগ্নিকে এখানে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম ভাব করা হচ্ছে। বেদে ভগবান যিনি, সচ্চিদানন্দ যিনি তিনি এক, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু যখনই তার ওপরে একটা মুখোশ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখনই তাকে কখন ইন্দ্র বলা হচ্ছে, কখন অগ্নি বলা হচ্ছে, কখন বায়ু বলা হচ্ছে। স্তম্বমিত্র বলছে মনীষিরা আপনাকে অনেক রূপে আবার এক রূপে জানেন, আপনিই সেই অগ্নি আবার আপনিই অনেক অনেক রূপে বিরাজ করে আছেন। এরপর দ্রোণ, যাকে বলা হয়েছিল ব্রহ্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে, সে তখন বলতে শুরু করেছে *ত্বমন্নং প্রাণিভির্ভুক্তমন্তর্ভূতো জগৎপতে। নিত্যপ্রবৃদ্ধঃ পচসি ত্বয়ি সর্বে প্রতিষ্ঠিতম্।।*১/২৩১/১৫। আপনি বৈশ্বানর হয়ে সমস্ত প্রাণির ভুক্ত খাদ্যকে হজম করেন আবার অন্য দিকে নিখিল জগৎ আপনার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অহং বৈশ্বানর ভুত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতাঃ*, যিনি ভগবান তিনিই বৈশ্বানর মানে পেটের অগ্নি। এখানেও দ্রোণ একই কথা বলছে, আপনি বৈশ্বানর আবার আপনার মধ্যেই পুরো জগৎ প্রতিষ্ঠিত। মানে যিনি ঈশ্বর তিনিই অন্তর্যামী হয়ে আছেন আর বিরাট রূপে যিনি তাঁর মধ্যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত, তার মানে যিনি ভেতরে আছেন তিনিই বাইরেও আছেন। এখানে অগ্নিকে সেই রূপে স্তুতি করা হচ্ছে। দ্রোণ শেষে বলছেন হে হুতাশন, সমুদ্রের সৈকতে যে ঘরবাড়ি থাকে তাকে আপনি কখন দহন করেন না, কারণ সমুদ্রের জল আছে বলে অগ্নি তাদের স্পর্শ করেন না, ঠিক সেই রকম আপনি আমাদের পরিত্যাগ করে রক্ষা করুন।

অগ্নি খুব আশ্চর্য হয়ে বলছেন *ঋষিদ্রোণস্তবমসি বৈ ব্রহ্ম তদ্ ব্যাহৃতং ত্বয়া। ঈপ্সিতং তে করিষ্যামি ন চ তে বিদ্যতে ভয়ম্।।*১/২৩১/২১। তুমি যে ভাবে ব্রহ্মের প্রতিপাদন করেছ, এই রকম কেউ প্রতিপাদন করতে পারেনা। এটাই হচ্ছে ব্রহ্মের উপাসনা, এখানে দ্রোণ বলছেন – *ত্বমন্নং প্রাণিভির্ভুক্তমন্তর্ভূতো জগৎপতে,* হে অগ্নি, আপনি জগৎপতি, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, আপনিই আবার প্রাণিদের শরীরে বৈশ্বানর হয়ে জঠরাগ্নি হয়েছেন। এটাই ব্রহ্ম তত্ত্ব। এগুলো আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা একেবারেই সম্ভব নয়। মাত্র চারটে শ্লোকে ব্রহ্ম তত্ত্বের পুরো প্রতিপাদন করা হচ্ছে, হে অগ্নি আপনার রূপটা জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু সবুজ বনস্পতির জন্ম আপনার থেকেই হচ্ছে, আমি অগ্নি সব কিছুকে পুড়িয়ে দিচ্ছেন অথচ সমুদ্র, পুষ্করিণী, নদী যে পরিপূর্ণ হচ্ছে সেটা আপনাকে দিয়েই হচ্ছে। কারণ

ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, যেখানে যা শক্তি, ইন্দ্র যে কাজ করছে, বরুণ যে কাজ করছে সব ব্রহ্মের শক্তিতেই কাজ করছে। অগ্নিদেব তখন বলছেন, তুমি যেভাবে ব্রহ্মের প্রতিপাদন করছে শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া এই ধরণের প্রতিপাদন কেউ করতে পারেনা। নিশ্চয়ই তুমি দ্রোণ ঋষি, তোমাদের বাবা আগেই আমার স্তব করে আমাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন আমিও তাঁকে কথা দিয়েছি আমি এই চারজনকে দগ্ধ করব না। তোমরা সবাই নিশ্চিন্তে শান্তিতে এখানেই অবস্থান করতে থাক। এখানে এটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মাত্র চারটে শ্লোকের মাধ্যমে এত সুন্দর ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হয়েছে।

অগ্নিদেব বলছেন তোমরা সবাই এত সুন্দর স্তুতি করেছ সেইজন্য আমি তোমাদের একটা ভালো কোন কাজ করে দেব, বল কি কাজ করে দেব। দ্রোণ তখন বলছে *ইমে মার্জারকাঃ শুক্র নিত্যমুদ্বেজয়ন্তি নঃ। এতান্ কুরুষ্ব দংষ্ট্রাংস্তং হুতাশন সবান্ধবান্।*।১/২৩১/২৪। হে শুক্রস্বরূপ অগ্নে, এই গাছের নীচে একটা বেড়াল আছে, এই বেড়ালটাকে আমরা বড্ড ভয় পাই, বেড়ালটা আমাদের উদ্বেগের কারণ। আপনি যদি পারেন তো এর বন্ধু-বান্ধব সহ সবাইকে পুড়িয়ে দিন তাহলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব। অগ্নি সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছে, অবশ্য এমনিতেই পুড়ত। মহাভারতের এটি একটি উল্লেখযোগ্য উপাখ্যান, দ্রোণ একদিকে হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানী, শুধু তাই নয় ব্রহ্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাকেও শরীর ধারণের জন্য তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। অগ্নি যখন বলছেন তোমাদের আর কি চাই, তখন বলছেন, ঐ বেড়ালগুলোকে বড্ড বেশী ভয় পাই, ওগুলোকে পুড়িয়ে দিনতো। ঠাকুর হাজরার নামে মার কাছে নালিশ করছেন, মা হাজরা এখানকার মত উল্টে দিতে চায়, ওকে এখান থেকে সরিয়ে দাওতো। ব্রহ্মজ্ঞানী হলেও যারা তাঁদের অশান্তির কারণ হবে তাদের সহ্য করা হয় না। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী হন তাঁরাও কিন্তু অশান্তিকে কখনই সহ্য করবেন না।

মন্দপাল ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন দেখার জন্য বাচ্চা গুলো বেঁচে আছে কিনা। ফিরে আসতেই তাঁর স্ত্রী জরিতা রেগেমেগে খুব গালাগাল দিতে শুরু করেছে, তোমার লজ্জা করেনা আমি দেখতে সুন্দরী নই, আমি হীন, তাই আমাকে ছেড়ে তুমি লপিতার কাছে চলে গিয়েছিলে। তখন মন্দপাল বলছেন, দেখো জরিতা, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, তোমার থেকে আমার সন্তান হয়েছে, যারা আমার কুলকে রক্ষা করবে। তুমি আমার স্ত্রী বলেই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্ত্রীদের পরমার্থের হানি দুটো জিনিষ থেকেই হয়, প্রথমটা হল পরপুরুষ সম্পর্ক। দ্বিতীয়টা হল সপত্নীর সাথে বিবাদ করা মানে সতীনের প্রতি ঈর্ষার ভাব থাকে, এই দুটো যদি কোন স্ত্রীর মধ্যে থাকে তাহলে তার পরমার্থের হানি হবে। মহাভারতে যে গায়ের জোরে পুরষতন্ত্রকে মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এই শ্লোকটাই তার প্রমাণ। স্ত্রীরা যদি পরপুরুষের কাছে যায় তাহলে ক্ষতি হবে আর যদি সতীনের নিন্দা করে তাহলে ক্ষতি হবে, পুরুষদের জন্য রাস্থা খুলে রাখা হল, পুরুষ ইচ্ছে করলে চারটে বউকে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু স্ত্রীকে বলা হল পরপুরুষের কাছে গেলে তোমার ক্ষতি হবে, মেয়েদের বেঁধে দেওয়া হল। এগুলোর জন্য মহাভারতের মত ধর্মগ্রন্থের প্রচুর সমালোচনা করা হয়। এখানে মেয়েদের একটা জায়গাতে বেঁধে দেওয়া হল। কিন্তু অন্য দিকে খুলেও দেওয়া হয়ছে, কিছু আগেই দেখলাম দ্রৌপদী পাঁচজনকে বিয়ে করছে। হিন্দু ধর্মের এটাই একটা সমস্যা, যেটাতেই একটা নিয়ম পাওয়া যাবে তার ঠিক উল্টোটাও আবার পাওয়া যাবে। সেইজন্য হিন্দুধর্মকে বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন।

মন্দপাল খুব দুঃখ করে বলছেন, আমি আমার সন্তানদের সাথে দেখা করতে এসেছি আর তুমি আমাকে এই রকম গালমন্দ করছ। এইসব বলে তিনি একটা কথা বলছেন, কোন পুরুষেরই নিজের স্ত্রীর প্রতি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি উচিৎ নয়, কারণ যেদিন তার স্ত্রীর সন্তান হয়ে যাবে সেদিন থেকে সেই স্ত্রী আর স্বামীর প্রতি অনুরক্তা থাকবে না। মহাভারত হল সব কিছুর চিন্তাধারার একটা মিলন ভূমি, তখনকার দিনের মানুষের যে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আর তার অভিব্যক্তি হতে পারে সব গুলোকে মহাভারত বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছে।

এইসব কাহিনী হল খাণ্ডববন দহনের সময়কার। এখন খাণ্ডববন দাহ করা হয়ে গেছে, ইন্দ্রও সব মিটমাট করে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের সঙ্গে দেখা করে তাদের আশীর্বাদ দিতে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই আশীর্বাদ করুন অর্জুনের প্রতি ভালোবাসা আমার যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইখানে এসে মহাভারতের আদিপর্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরপর শুরু হবে সভাপর্ব। সভাপর্বে যুধিষ্ঠির এখন রাজা হয়ে গেছেন, তারপর আসবে দ্যুতক্রীড়া, দ্যুতক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় তারপর পাণ্ডবদের বনবাস।

সভাপর্ব

আদিপর্বে প্রথম দিকের বেশীর ভাগ কাহিনীই প্রাচীন কালের পৌরানিক কথা, পৌরানিক কথা থেকে আস্তে আস্তে নিয়ে এসেছে পাণ্ডব আর কৌরবদের জন্মের ইতিহাস, সেখান থেকে পাণ্ডবদের সাথে দ্রৌপদীর বিবাহ এবং হস্তিনাপুর রাজ্যের বিভাজন হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজ্য স্থাপন। আদিপর্বে দর্শনের দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল যখন পঞ্চ পাণ্ডবদের সাথে দ্রৌপদীর বিবাহ হতে যাচ্ছে তখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন এটা যেন অধর্ম হতে চলেছে। এই বিতর্কের জবাবে যুধিষ্ঠির বলছেন – আমি আমার হৃদয়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার আর আমার মুখ থেকে কখন মিথ্যা কথা বেরোয় না, এই বিবাহে আমার পুরো সম্মতি আছে সেইজন্য এতে কোন দোষ নেই। এর সাথে তিনি আরও বলছেন, এর আগের আগের মহাপুরুষরা যেটা করে গেছেন সেটাই ধর্ম, কারণ মহাপুরুষরা কখন ভুল কাজ করবেন না। সেদিনের আলোচনায় এই প্রসঙ্গও এসেছিল যে, যখনই কোন কিছুর ব্যাপারে পাপ-পূণ্যকে নিয়ে সংশয় হয় তখন আমরা সচরাচর শাস্ত্রকেই অবলম্বন করি। মুসলমানরা দেখবে কোরান বা হাদিসে কি আছে, খ্রীশ্চানরা দেখবে ওল্ড টেস্টামেন্টে কি আছে, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থকেই আশ্রয় করে এই সংশয়কে দূর করেন। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে এমন অনেক নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার সমাধান সব সময় সব ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। হিন্দুদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটা সমস্যা যেটা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে হয় না, হিন্দুদের এত বেশী ধর্মগ্রন্থ যে কোন একটা শাস্ত্র বলবে এটা ঠিক আবার অন্য এক শাস্ত্র বলবে এটা ঠিক নয়। তখন কোনটাকে তারা অনুসরণ করবে? গোঁড়া হিন্দুদের কাছে এটি এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এইসব ক্ষেত্রে মহাভারতে ধর্মের পরিভাষা একেক জায়গায় একেক ভাবে দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের একটা যেটা আমরা আদিপর্বে পেয়েছিলাম, যেখানে বলা হচ্ছে কোন কাজ করতে গিয়ে মন যদি আমার খুঁত খুঁত করে তাহলে সেটা কখনই করা উচিত হবে না। কিন্তু যারা দুষ্কৃতকারী তারাও যখন কোন অন্যায় কাজ করে তাদেরও মন তখন খুঁত খুঁত করে এবং তা সত্ত্বেও সেটাই করছে, তাহলে কি তারা ঠিক করছে? আদপেই নয়। কারণ তার হৃদয় পবিত্র নয়। সেখানে যুধিষ্ঠির বলছে, আমার হৃদয় পরিষ্কার আর আমার মুখে এটা আটকাছে না। তাছাড়া এর আগে আগে এই রকম নজির আছে।

এরপর দ্রৌপদীর বিবাহ হয়ে গেছে। খাণ্ডববন দহন হয়ে গেছে। সেখানে একজন দানবকে অর্জুন অভয় দান করেছিলেন। সেই দানব এখন প্রতিদানে পাণ্ডবদের জন্য কিছু করতে চাইছে। আপনি যে আমাকে প্রাণ দান করলেন এর প্রতিদানে আমি কিছু সেবা করতে চাই। এই দানবের নাম ময়, বিশ্বকর্মা যেমন দেবতাদের কারিগর ঠিক তেমনি ময়দানব হলেন অসুরদের কারিগর। আজকের দিনে ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি, মহাভারত কিন্তু সেই অর্থে ইতিহাস নয়। আমাদের শাস্ত্র মতে ইতিহাসের যে সংজ্ঞা নিরুপণ করা হয়, কিছু কিছু তথ্যকে আধার করে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের শিক্ষা দেওয়া হয় সেটাই ইতিহাস মূলক শাস্ত্র। ছোটবেলায় আমরা অনেকেই অরণ্যদেব, বেতাল, টিনটিনের কাহিনী পড়েছি। অরণ্যদেব একজন বিশাল শক্তিশালী পুরুষ, সে অনেক অলৌকিক কাণ্ড করছে, বা টিনটিন অনেক কিছু রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে দিচ্ছে, তাতে আমার হলটা কি! মনের মধ্যে ক্ষণিক একটা মজা হচ্ছে, কিন্তু আমার জীবনের ক্ষেত্রে এগুলো কোন কাজে আসছে না। বাল্মীকি রামায়ণের হনুমান বিরাট শক্তিমান, তাতে আমার কি হল। সেইজন্য বাল্মীকির মহাবীর হনুমান আমার কোন কাজে লাগলো না। কিন্তু পরের দিকের কবিরা বাল্মীকির হনুমানকে অন্য দিকে নিয়ে একটু পাল্টে দিয়ে হনুমানের মধ্যে নিয়ে এলেন দাস্য ভক্তি, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি একেবারে অনুগত সেবক। তুমিও যদি এই দাস্য ভক্তিকে নিজের জীবনে নিয়ে আসতে পার তাহলে তোমার জীবনের উত্থান হবে। পৌরানিক কাহিনী এইভাবেই বিবর্তিত হতে থাকে, কারণ জিনিষটা যেমনটি আছে তেমনটি রেখে দিলে সেটা সাধারণের কোন কাজে আসে না। পুরান সব সময় কাহিনীর মাধ্যমে আমার মন বুদ্ধি, চিন্তা ভাবনাকে বিস্তার করতে থাকবে। মহাভারতে এই যে খাণ্ডববন দহন কাহিনী, ময়দানবের কাহিনী এগুলো সবই পৌরানিক কাহিনী। এই কাহিনীগুলোকে নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই, এই কাহিনীর মধ্যে যে সারটুকু আছে সেটাকে নিজের জীবনের কাজে লাগিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশেল আছে, চিনিটুকু নিয়ে বালিটুকু ছেড়ে দিতে হয়। খাণ্ডব বনে চারটে শার্ঙ্গকের ছোট বাচ্চা পাখি গুলোকে তাদের মা বলছে গর্তে লুকিয়ে পড়তে, বাচ্চাগুলো বলছে, ঐ গর্তে একটা ইঁদুর আছে সে আমাদের মেরে ফেলবে, ঐ রকম একটা ইঁদুরের হাতে মরার থেকে আগুনে পুড়ে মরা অনেক ভালো। একটা ছিঁচকে লোকের কাছে ঠকা আর একজন ওস্তাদের হাতে মার খাওয়া দুটোতে অনেক তফাৎ, মারও যদি খেতে হয় ওস্তাদের হাতে খাওয়া অনেক ভালো। এগুলোই হচ্ছে জীবনে শেখার জিনিষ, এই শিক্ষা থেকেই জীবন ধন্য হয়। গালগপ্পো পড়ে কোন কাজে আসে না। সেইজন্য ময়াসুর

যে রাতারাতি একটা রাজমহল দাঁড় করিয়ে দিল, এগুলোকে নিয়ে বেশী বিশ্লেষণ করতে যেতে নেই। বড় বড় পণ্ডিতরা এগুলোকেই বেশী বিশ্লেষণ করে এর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হন।

সব ধর্মেই কিছু অলৌকিক ও অবাস্তব কাহিনী আছে, কিন্তু কারুকে যদি বলা হয় আপনার ধর্মে অবাস্তব অনেক কিছু আছে তখন সে রেগে যাবে, অন্য দিকে সে কিন্তু অপরের ধর্মের অবাস্তব দিক গুলি নিয়ে চেঁচামেচি করে যাচ্ছে, নিজের ধর্মের অবাস্তবকে বলবে বাস্তব। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জীবনে অলৌকিক ও অবাস্তব চিন্তা ভাবনা থাকবেই। কার্ল জুঙ বলে একজন বিখ্যাত মনস্তাত্বিক ছিলেন, প্রথমের দিকে ফ্রয়েডের অনুরাগী ছিলেন কিন্তু পরে ফ্রয়েডের মতবাদ থেকে সরে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, মানুষ সব সময় মিথ্‌কে নিয়ে বেঁচে থাকে। যার জীবনে মিথ্‌ নেই সেই বেঁচে থেকেও মরে আছে। নানান রকমের মিথ্‌, যেমন মুক্তির ইচ্ছা এটাও যেন একটা মিথ্‌। এই মিথ্‌ আছে বলে মানুষ একটা দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি মরার পর আবার জন্ম নেব বা আমি মরার পর স্বর্গে যাব এটাও একটা কল্পনা। এই কল্পনার সাহায্যেই মানুষ বেঁচে থাকে। কার্ল জুঙের এটা তাঁর নিজস্ব একটা মত। আমাদের যত নেতা ছিলেন, নেতাজী, গান্ধীজী, নেহরু, সবার নামে আমরা একটা মিথ্‌ দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। যেমন অনেকে বিশ্বাস করেন নেতাজী এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু হিসেব করে দেখলে নেতাজীর এখন বেঁচে থাকলে বয়স হত একশ কুড়ি বছরের মত। এটাও একটা মিথ্‌। এই মিথ্‌ নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। আমরা যখন রামায়ণ মহাভারতকে পৌরাণিক গালগপ্পো বলে উড়িয়ে দিই তখনও কিন্তু আমরা এই ভুলটা করে বসি, সবারই জীবন এই মিথ্‌ নিয়েই চলছে আর সবাই মিথ্‌ নিয়েই বেঁচে আছে। যার জীবনে কোন মিথ্‌ নেই তার জীবন পাথরের মত জড়। কিন্তু এই মিথ্‌ দিয়ে যখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের যে কোন একটাকে বা একের অধিককে আমাদের জীবনে নিয়ে আসতে পারি তখন সেই মিথ্‌ হয়ে যায় শাস্ত্র। আর এমনি সাধারণ জীবনে যে মিথ্‌ নিয়ে মানুষ বেঁচে আছে সেটা সাধারণ মিথ্‌।

যুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদের রাজধর্মের শিক্ষা

ময়দানব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি নিজেকে এত কৃতজ্ঞ মনে করছে যে, সে পাণ্ডবদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে একটা বিশাল রাজমহল বানিয়ে দিল আর উপহার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে অনেক কিছু দিল, যেমন অর্জুনকে দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমের যে গদা সেটাও ময়দানব দিয়েছিল। যুধিষ্ঠির এখন রাজা হয়েছেন, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরে কাছে এসেছেন। নারদ সম্বন্ধে আমাদের ছোটবেলা থেকেই অনেক আজগুবি ধারণা মাথার মধ্যে ঢুকে আছে, শুধু ঝগড়া লাগিয়ে বেড়ানোই নাকি নারদের কাজ। কিন্তু তা নয়, নারদ ছিলেন একজন মহান ঋষি আর দেবর্ষি বলতে একমাত্র নারদকেই বলা হয়, বাকিদের ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি বলা হয়। দেবতাদের ঋষি একমাত্র নারদ। তিনি সব সময় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে হরিনাম করে যান আর তিনি ত্রিকালদর্শি, জগতের সব কিছুই তিনি জানেন। মানবজাতির যাতে মঙ্গল হয়, সবার মন যাতে ভগবানের দিকে যায়, সব সময় তিনি সেই চেষ্টা করে যান। নারদ কি কি বিষয়ের জ্ঞাতা ও অভিজ্ঞ বারোটি শ্লোকে তার এক বিরাট বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে সব কিছু উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তার মধ্যে একটা হল *বেদোপনিষদাং বেত্তা ঋষিঃ সুরগণার্চিতঃ। ইতিহাসপুরাণজ্ঞঃ পুরাকল্পবিশেষবিৎ।।২/৫/২*। তিনি পুরো বেদ জানেন, উপনিষদ জানেন, তিনি ঋষিদের ও দেবতাদের পূজিত, ইতিহাস ও পুরানের মর্মজ্ঞ আর পূর্ব পূর্ব কল্পে কি কি হয়েছে সেটাও তিনি জানেন। এখানে এসে আমাদের একটা জিনিষ বুঝতে হবে। ব্যাসদেব পুরানের রচনা করেছিলেন মহাভারতের পরে, পুরানেই এই তথ্য আমরা পাই যে, তিনি আগে ইতিহাস রচনা করেছিলেন পরে পুরান রচনা করেছেন। তাহলে এখানে নারদকে কেন ইতিহাস ও পুরানের মর্মজ্ঞ বলা হচ্ছে? যারা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ইতিহাস ঠিক ঠিক জানেন না, তাঁরা এই শ্লোক গুলো দেখেই ভুল বুঝে অন্য রকম ব্যাখ্যা দেন। এরা বলবে এই শ্লোকটা পরে মহাভারতে ঢোকান হয়েছে। কিন্তু তা নয়, এখানে এই শ্লোক মহাভারতে প্রথম থেকেই এসেছে। তাহলে ইতিহাস ও পুরান এই শব্দ কেন মহাভারতে এসেছে? এখন তো মহাভারত সবে শুরু হয়েছে, পুরো মহাভারত লেখা এখনও শেষ হয়নি। আসল ব্যাপার হল ইতিহাস ও পুরানের যে কাহিনী পাই সেগুলো ভারতে চিরন্তন কাল থেকে চলে আসছে। বেদ, উপনিষদের তত্ত্ব, ইতিহাসের কাহিনী, পৌরানিক কথা আর তন্ত্রের অনুশীলন, এই কটি জিনিষ ভারতে আদিম কাল থেকে চলে আসছে। কবে থেকে চলে আসছে, এর পরম্পরা কত পুরানো কেউ বলতে পারবে না। বেদকে আমরা সব থেকে প্রাচীন গ্রন্থ কেন বলছি? কারণ বেদকে একটা সুনির্দিষ্ট ভাবে সুসংগঠিত রূপ দেওয়া হয়েছিল সবার আগে, তাই বেদকে সব থেকে প্রাচীন গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু ইতিহাস, পুরান, তন্ত্র, স্মৃতি যেটাকে কল্প শাস্ত্র বলে এসেছে, এগুলো সব একসঙ্গেই চলে আসছে, এদের কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে কেউ বলতে পারবে না, জানার কোন উপায়ও নেই। ব্যসদেব ছিলেন একজন ঋষি আর অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি। প্রথমে তিনি বেদের যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সব কটাকে একসাথে সংগ্রহ করে চারটে বেদে নিয়ে আসলেন।

ঐতিহাসিক যত কাহিনী সমাজে লোকের মুখে ঘুরছিল সেগুলোকে সংগ্রহ করে কৌরব পাণ্ডবদের কাহিনীর মাধ্যমে পুরো ইতিহাসকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল এর চরিত্রগুলো বেশী বাস্তব, পুরানেও এই একই জিনিষ কিন্তু ইতিহাসের সাথে পুরানের তফাৎ হল পুরানে কাল্পনিক চরিত্রগুলো অনেক বেশী করে আনা হয়। কেউ যদি ভাগবত পুরান আর মহাভারত একসাথে অধ্যয়ণ করে সে ইতিহাস আর পুরানের তফাৎটা ধরতেই পারবে না। ধরাটা পড়ে চরিত্রে এসে, পুরানে কাল্পনিক চরিত্র বেশী থাকে ইতিহাসে বাস্তব চরিত্র বেশী থাকে। এখন ব্যাসদেব পাঁচজন লোক না একজন লোক আমরা জানিনা, কিন্তু আমরা জানি তিনি এই তিনটেকে আলাদা করে নির্ধারিত করে দিলেন। বেদে তিনি কিছুই লেখেননি, বেদ যেমন ছিল তেমনটি তিনি রেখে দিলেন, শুধু বেদের বিভাজন করে দিলে বলে দিলেন এটা ঋক, এটা সাম ইত্যাদি। অন্য দিকে ইতিহাস নতুন করে লিখলেন, ইতিহাস লেখার পর তিনি নতুন করে পুরান লিখলেন। অন্য দিকে বাল্মীকি রামায়ণকেও ইতিহাস বলে গ্রহণ করা হয়। ইতিহাস আর পুরানের কাহিনী গুলো আদপেই ব্যাসদেবের অবদান নয়, এগুলো আগে থাকতেই সমাজে সবার মুখে মুখে চলে আসছিল। সেইজন্য মহাভারতকে কখনই মৌলিক গ্রন্থ রূপে গণ্য করা যায় না, এগুলো আগে থেকেই সমাজে প্রচলিত ছিল।

ইতিহাস পুরান ছাড়া নারদ ধর্মতত্ত্ব জানতেন, বেদাঙ্গ পুরোটাই জানতেন, বেদাঙ্গ মানে, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দিতে পারতেন, বাক্যের গুণ-দোষ বিচার করতে জানতেন, এছাড়া তিনি সঙ্গীত, রাজনীতি জানতেন। শত্রুপক্ষকে কিভাবে পর্যুদস্ত করতে হয় আবার শত্রুর সাথে কিভাবে মিলিয়ে দিতে হয় জানতেন। সেই নারদ এবার এসেছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির একজন ধর্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ আর নতুন রাজত্ব করতে শুরু করতে যাচ্ছেন দেখে নারদ প্রশ্নের মাধ্যমে উপদেশ দিতে শুরু করেছেন। এই ধরণের শৈলী আমরা বাল্মীকি রামায়ণেও পাই, মহাভারতে এটা অনেকবার আসছে, উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেই উপদেশ প্রশ্নের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। যেমন কাউকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আপনি ভালো আছেন তো? কিন্তু এই প্রশ্নেই উত্তরটা অন্তর্নিহিত আছে। ভালো আছেন তো? মানে আপনি ভালো আছেন।

নারদ এখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশাসন ব্যবস্থা কিভাবে চালাতে হবে সেই ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন। একজন কর্মচারী যখন কারো অধীনে কাজ করছে তখন তাকে তার উপরওয়ালার সাথে এক ধরণের ব্যবহার করতে হয়, আবার সেই লোকই যখন উচ্চ পদে থাকে তখন তাকে আরেক ধরণের আচরণ করতে হয়। সেই রকম রাজাকেও কিছু অতিরিক্ত দায়ীত্ব পালন করতে হয়। নারদ এখানে রাজধর্মের কথা বলছেন। ধর্মের যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন তার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কর্তব্য। আমি যে কর্মের দায়ীত্বে আছি সেখানে আমি যে কর্তব্যটা করব এটাও ধর্মের মধ্যে অন্তর্গত। মানুষ যখন তার কাজটাকে ঠিক ঠিক ভাবে করে তখনই সে ধর্ম পথে এগোয়। আর সেই কাজকে যখন ঠিক ঠিক অনাসক্ত ভাবে করে তখন সে আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যায়। বাড়ির মায়েরা যখন ঘর সংসারের সব কাজ, রান্নাবান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, সন্তানদের দেখাশোনা, শ্বশুর-শাশুড়ির যত্ন করেন তখন মায়ের ধর্ম পালন করছেন, যখন এই ধর্ম পালনটাই অনাসক্ত হয়ে করবে তখন মায়েরা হয়ে গেল আধ্যাত্মিক সম্পন্ন। আমি যখন কোন ধর্মের কাজ করি তখন আমি যদি সেই ধর্ম পালনের কোন ফল আশা করি এতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু এখানে আমি হলাম ধার্মিক পুরুষ। কিন্তু এই ধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি আমি কোন ফলের আশা না করি তখন আমি হয়ে গেলাম আধ্যাত্মিক পুরুষ, এবার আমার ভগবানের দিকে এগোনর রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তার আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম পাপ-পূণ্যের রাজ্যে, ভগবান আর পাপ-পূণ্য এই দুটো আলাদা। পাপ-পূণ্য আসে ধর্মের ক্ষেত্রে, ভগবানের পথ আলাদা। কিন্তু যারা নিজের ধর্ম পালনই করছে না, তাদের ধর্মও হবে না, অধ্যাত্মও হবে না। ভারতে বেশীর ভাগই লোক কাজই করতে চায় না, আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের লোকেরা এদের থেকে অনেক ভালো কারণ তারা কাজ করছে ফলও চাইছে, এরা অনেক ভালো। ভারতে সব সময় বলা হয় তুমি অনাসক্ত হও, ফলের আশা করো না, কিন্তু এরা কাজকেই অনাসক্ত করে দেয়।

তুমি এখন রাজা হয়েছে, তার মানে তোমাকে রাজ্যের এতগুলো লোকের দেখাশোনা করতে হবে, তাদের সবার খবরা খবর রাখতে হবে। কিভাবে করবে? সেটাই নারদ যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন, কারণ যুধিষ্ঠিরের বয়স এখন কম। নারদ বলছেন, তোমার রাজ্যে যত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রজা আছে এদের সাথে তোমার পিতা, ঠাকুর্দারা যেভাবে আচরণ করে এসেছেন তুমিও তাদের সাথে সেইভাবে আচরণ করছ কি? মানে হঠাৎ তুমি নিজে কায়দা করে অন্য কিছু করতে যেও না। বৈশ্যকে তুমি ব্রাহ্মণের মত সম্মান দিলে, ব্রাহ্মণকে বৈশ্যের মত সম্মান দিলে, এই ধরণের কিছু আচরণ তুমি কখন করতে যেও না, তোমার বাপ-ঠাকুর্দা যে রকমটি করে এসেছেন সেইভাবেই কর। আমাদের জাতিপ্রথাকে সবাই এত

নিন্দাবাদ করে, কিন্তু পুরো বিশ্বে এমন কোন সামাজিক প্রথা বা নিয়ম নেই যেটা বেশী দিন টিকে আছে অথচ জাতিপ্রথা এই ভারতে সাত আট হাজার বছর ধরে আরামসে চলছে কেউ এতে হাত দিতে পারছে না।

আমরা একটা কথা অনেকবার বলছি তা হল ধর্ম, অর্থ আর কাম, এখনও মোক্ষের প্রশ্ন এখানে আসছে না কারণ যুধিষ্ঠিরকে মোক্ষের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। নারদ বলছেন, তুমি টাকা-পয়সার লোভে ধর্মকে আর ধর্মের জন্য টাকা-পয়সাকে সরিয়ে দিচ্ছ না তো? ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেকে সামঞ্জস্য করে তুমি সব কিছু ভোগ করছ তো? নারদ এখানে আমাদের সবার জন্যই একটা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়কে নিয়ে এসেছেন। ইদানিং কালে সমাজে সবাই টাকার পেছনে ছুটে চলেছে, এরা কিন্তু অর্থ বা কামের পেছনে দৌড়াচ্ছে না। ঠাকুর যে কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছেন, এরা সবাই এর পেছনেই ছুটছে। কিন্তু শাস্ত্রে যেটাকে অর্থ আর কাম বলছে, সেটার পেছনে দৌড়াচ্ছে না। অর্থ আর কাম হল ন্যায় ও শাস্ত্র সম্মত ভাবে যখন অর্থের দিকে এগোচ্ছে, শাস্ত্র সম্মত ভাবে যখন ভোগের দিকে এগোচ্ছে, সেটাই হচ্ছে অর্থ আর কাম। তার বাইরে সব অনর্থ, এখানে এই অনর্থকে ধরা হচ্ছে না। তাতেও নারদ বলছেন ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেকে সব সময় সামঞ্জস্য করে চলতে হবে। কি রকম সামঞ্জস্য? সকালের সময়টা দেবে ধর্মে, দিনের সময়টা দেবে অর্থে আর সন্ধ্যের পর সময়টা দেবে কামে। শুধু যদি ধর্ম কর আর অর্থ আর কামকে সরিয়ে রাখ তাহলে তুমি বিপদে পড়বে। ঠিক সেই রকম যে কোন একটার পেছনে যদি সব সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখ তাহলেই বিপদে পড়বে। সবটাই সমান ভাবে আর শাস্ত্র সম্মত ভাবে। সকালের দিকে ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে তুমি ধর্মকর্ম করবে। কি ধর্মকর্ম? যেটা দিয়ে তোমার অর্থ ও কামের বৃদ্ধি হবে আর মৃত্যুর পর তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি সকালে উঠে পূজো অর্চনা, জপ-ধ্যান করছ আর সারাটা দিন ধরে শুধু ঐটাই করে যাবে, সকালে এই মন্দির, বিকেলে এই মন্দির ঘুরে বেড়াচ্ছ, এগুলো বন্ধ করতে হবে। দিনের বেলাটা তোমাকে কাজ করতে হবে। এই কথা কিন্তু গৃহস্থকে বলা হচ্ছে, বাণপ্রস্থি আর সন্ন্যাসীদের বলা হচ্ছে না। এরপর যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল তখন একটু আড্ডা মারলাম, একটু টিভি দেখলাম, এইভাবে এগোতে হয়। কিন্তু যারা মোক্ষ পথে আছে তাদের সারাটা দিনই শুধু ঈশ্বর চিন্তা করে যেতে হয়। সন্ন্যাসীর যখন হাতে কাজ থাকবে তখন সেই কাজের মাধ্যমে সে মুক্তির চেষ্টা করে যাবে আর যখন হাতে কোন কাজ থাকবে না তখন সরাসরি মুক্তির চেষ্টা করে যাবে। এটাই সন্ন্যাসীর জীবন। যুধিষ্ঠির রাজা, তাই নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করছেন, এই তিনটেকে তুমি সমান ভাবে সাধন করে যাচ্ছ তো। দক্ষস্মৃতি নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থ আছে, সেখানেও বলা হচ্ছে *পূর্বাহ্নে ত্বাচরেদ্ ধর্মং মধ্যাহ্নেহর্থমুপার্জয়েৎ। সায়াহ্নে চাচরেৎ কামমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।।* পূর্বাহ্নে তুমি ধর্ম আচরণ করবে, দিবাভাগে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং সন্ধ্যের পর থেকে কামের দিকে এগোবে, বেদের এইটাই মত। এইভাবে না এগোলে একটা অবস্থার পর মানুষের মধ্যে তীব্র হতাশার ভাব এসে পড়ে।

নারদ এরপর যুধিষ্ঠিরকে বলছেন *কচ্চিদ্ রাজগুণৈঃ ষড়ভিঃ সপ্তোপায়াংস্তাথানধ। বলাবলং তথা সম্যক চতুর্দশ পরীক্ষসে।।২/৫/২২*। রাজার ছটি গুণ, সাতটি উপায় আর চৌদ্দ রকমের লোক সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে, তুমি এগুলো ভালো করে পালন করছ তো? ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করছিলেন, অর্থাৎ সেই সাড়ে তিন হাজার কি চার হাজার বছর আগে তখন সমাজে এই জিনিষগুলি পুরোদস্তুর অনুসরণ করা হত। রাজার ছটি গুণ হল ব্যাখ্যানশক্তি, প্রগলভতা, তর্ককুশলতা, ভূতকালের স্মৃতি, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি এবং ন্যায়নীতি। এর মধ্যে একটি হল সে যে কোন বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম, দ্বিতীয় প্রগলভতা, যখন কিছু বলবে তখন তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, তর্ককুশলতা, যে কোন যুক্তিকে প্রখর বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে দিতে পারবে, আর ভূত-কাল-স্মৃতি, আগে আগে কি হয়েছে সব কিছু পরিষ্কার মনে থাকবে। এটা দেখা যায় যাঁরা দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ হন তাঁদের তুখোড় স্মৃতি শক্তি থাকে। যদি কখন স্মৃতি কাজ করে না তখন তাঁরা সেটা একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে সামলে নেন। তারপর ভবিষ্যতে কি হতে পারে তার সঠিক আন্দাজ করতে পারা, আমি কোন দিকে এগোচ্ছি। আর নীতি নিপুণতা। নীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকবে।

সাতটি উপায় এখানে যেটা বলা হচ্ছে চাণক্য নীতিশাস্ত্রে এর খুব ভালো বর্ণনা আছে। যে কোন রাজাকে এই সাতটি উপায়ের উপর আধিপত্য থাকতে হবে – মন্ত্র, ঔষধ, ইন্দ্রজাল, সাম, দান, দণ্ড এবং ভেদ। প্রথম হল মন্ত্র, মন্ত্রের এখানে দুটো অর্থ হতে পারে, একটা হল মন্ত্রণা, আলোচনার মাধ্যমে নিজের শত্রু-মিত্র এদের বশে রাখা। দ্বিতীয় হল এমন শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের সাথে রাখতে হবে যাঁরা মন্ত্রের দ্বারা সবাইকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। ঔষধ, কাকে কি বিষ প্রয়োগ করতে হবে, কাকে কি পান করিয়ে নেশাগ্রস্ত করে রাখতে হবে রাজাকে এগুলো জানতে হয়। মুঘোল আমলে কোন বাদশা

যদি দেখত তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে গেছে তখন তাকে জেলে বন্দী করে রাখত আর জলের মধ্যে আফিং মিশিয়ে তাকে খাওয়ানো হত। যাকে বন্দী করেছে সেও তো রাজকুমার সেও জানে আমাকে কি জলের সাথে কি পান করান হচ্ছে। এখন সে যদি জল না খেতে চাইত তাহলে তাকে কোন জলই দেওয়া হত না। জল না খেলে বাঁচবে কি করে, বাধ্য হয়ে সেই আফিং মেশানো জল খেতেই হত। আর দশ বছর পর যখন তাকে জেল থেকে ছাড়া হত তখন তার মস্তিস্ক বলে কিছুই থাকতো না। চাণক্য নীতিতে যে বিষকন্যা তৈরী করে শত্রুর কাছে পাঠানো হত, এটা বিষপ্রয়োগের মধ্যেই পড়ে। এরপর বলছেন ইন্দ্রজাল, যাদুবিদ্যার সাহায্যে শত্রুকে সম্মোহিত করা। আর সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ। মোট এই সাতটি হল উপায়। সাম হল, বুঝিয়ে টুঝিয়ে শত্রুকে বশে নিয়ে আনা। দান, টাকা পয়সা দিয়ে শত্রুর লোককে কিনে নেওয়া। দণ্ড, সরাসরি আক্রমণে যাওয়া। আর ভেদ, শত্রুদের মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে দুর্বল করে দেওয়া। এই সাতটা উপায় প্রত্যেকটি রাজাকে প্রয়োগ করতে হয়। এরপর বলছেন চৌদ্দ রকম লোকের খবরাখবর রাখা (দেশ, দুর্গ, রথ, হাতি, ঘোড়া, সৈন্য, অধিকারী, অন্তঃপুর, অন্ন, গণনা, শাস্ত্র, লেখ্য, ধন আর বল) আর সেখানে নিজের বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ করা, যে দেশের রক্ষা করছে, যে হাতির রক্ষা করছে, যে রথের রক্ষা করছে এই রকম বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের কথা বলা হচ্ছে।

নারদ প্রশ্নের মাধ্যমে রাজধর্মের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। হে যুধিষ্ঠির তুমি অসময়ে নিদ্রার বশীভূত হয়ে যাও নাতো? ঠিক সময়ে তোমার জাগরণ হয় তো? অর্থশাস্ত্রতে তোমার দখল নিশ্চয়ই আছে? ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তোমার নিজের মঙ্গল কিভাবে হবে এটা তুমি চিন্তন করো কি করো না? এইভাবে প্রচুর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। বলছেন *কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্। পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্যান্নিঃশ্রেয়সং পরম্।।২/৫/৩৫*। হে যুধিষ্ঠির তুমি হাজারটা মুর্খের বদলে একটি পণ্ডিতকে তোমার কাছে রাখছ কিনা? এই ব্যাপারেই পরের দিকে দেখা যাবে বিদুর দুর্যোধন আর ধৃতরাষ্ট্রকে এই নিয়ে কঠোর ভাবে বলবেন। বলা হচ্ছে, তুমি রাজা তোমার প্রশংসা আর তোষামোদ করার জন্য তুমি হাজারটি মুর্খকে তোমার কাছে রাখতে পারবে কিন্তু এরাই তোমার ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনবে তার বদলে তুমি মাত্র একটি বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে তোমার কাছে রাখবে। এই নীতি শুধু মাত্র রাজাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করি সারাদিন আমরা কাদের সঙ্গে মেলামেশা করি তাহলেই দেখতে পাব যেখানে আমরা নিজেদের ক্ষমতা দেখাতে পারি, নিজেকে জাহির করতে পারি তাদের সাথেই আমাদের বন্ধুত্বটা তৈরী হয়। একজন বিদ্বান, বিবেকসম্পন্ন মানুষের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয় না, কারণ আমরা তার কাছে নিজকে জাহির করতে পারিনা, আমাদের দুর্বলতা গুলো সেখানে ধরা পড়ে যায়, আমাকে ভালোর জন্য কিছু বললে সহ্য হয় না। যখন আমরা টিভি দেখি তখন সেটাও একটা মুর্খের সঙ্গ, সেই সময় তাকে যদি কেউ ধর্মোপদেশ দিতে যায় তখন তাকে শত্রুর মত মনে হবে।

নারদ জিজ্ঞেস করছেন, তোমার যাঁরা মন্ত্রীরা, তোমার বাপ-ঠাকুর্দারা যে পদ্ধতিতে এঁদের এই সব পদে নির্বাচিত করতেন সেই পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা যাঁদের নিযুক্ত করেছ তাঁদের উপর ভরসা করতে পারছ তো? তোমার যত সহকারী, সৈন্য, কর্মচারী আছে এদের ঠিক সময়ে পারিশ্রমিক ও নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া দেওয়া হচ্ছে তো? এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *কালাতিক্রমণাদেতে ভক্তবেতনয়োর্ভৃতাঃ। ভর্তুঃ কুপ্যন্তি দৌর্গত্যাৎ সোঽনর্থঃ সুমহান্ স্মৃতঃ।।২/৫/৫০*।– খাওয়া আর বেতন এই দুটোতে যদি দেরী হয়ে যায় তখন কিন্তু ভৃত্যগণ স্বামীর উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। যারা তোমার জন্যে আনন্দের সাথে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে, তাদের পরিবারের সবার দায়ীত্ব রাজাকে নিতে হয়। অনেক কোম্পানীতে এমনকি অনেক সরকারী সংস্থাতে কর্মরত অবস্থায় কেউ মারা গেল তার পরিবারের একজনকে চাকরী দেওয়া হয়। রাজার এটা দায়ীত্ব, তোমার জন্য যে প্রাণ দিয়েছে তার পরিবারে দেখাশোনা তোমাকে করতে হবে। এটি আমাদের খুব প্রাচীন নীতি। যতই মানুষ প্রগতির কথা, আদর্শের কথা বলুক সমাজে সব সময় বৈষম্য থাকবেই। একজন রাজা থাকবেই, তার দেহরক্ষীও থাকবে তার ড্রাইভারও থাকবে, এই বৈষম্য কোন দিন যাবে না। আমাদের দেশে অশান্তি না করে সবাই মেনে নিয়েছিল তুমি পরম্পরাগত ভাবে রাজা আমি পরম্পরাগত ভাবে ভৃত্য। কিন্তু আমারও সম্মান আছে, আমারও ঠিক সময় বেতন চাই, আমারও ঠিক সময়ে খাওয়া চাই। আমি তোমার জন্য প্রাণ দেব ঠিকই কিন্তু বদলে আমার যারা আশ্রিত তাদের ভালো-মন্দ সব তোমায় দেখতে হবে। ভারতীয় সৈন্য যদি কোন encounter এ মারা যায়, যে করেই হোক তার মৃতদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠান হবে, অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেহের সৎকার করা হবে আর সমস্ত রকমের আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করে দেওয়া হবে। এই প্রথা আমাদের অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

তুমি রাজা, তাই তোমার খাদ্য সামগ্রী, তোমার পোষাক-আশাক, তোমার ব্যবহারের জন্য সুগন্ধ দ্রব্যাদি এগুলোর রক্ষণা-বেক্ষণ ও দেখাশোনার দায়ীত্ব তোমার বিশ্বস্ত লোকের উপর ন্যস্ত আছে কিনা? এখানে বোঝা যায়, মহাভারতের সময় রাজাকে হত্যা করার তিনটে খুব ভালো পথ ছিল – খাবারে বিষ, পোষাকে বিষ আর সেন্টে বিষ। যারা রাজা বা ক্ষমতাবান লোক তাদের সব সময় সুযোগ সন্ধানী লোকেরা ঘিরে থাকে, সেইজন্য নারদ বলছেন, হে যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্নে মদ্যপান করাতে, দ্যুত ক্রীড়াতে বা অন্যান্য খেলাধূলাতে বা যুবতী স্ত্রীর সঙ্গ করতে তোমার সঙ্গী সাথীরা উৎসাহিত করে না তো? তার মানে বলতে চাইছেন রাজাদের সকালে এইসব কাম বাসনাতে লিপ্ত হতে নেই। মানুষের মনে দুই রকমের কষ্ট হয়, শারীরিক আর মানসিক কষ্ট। যুধিষ্ঠিরকে নারদ প্রশ্ন করছেন, ঠিক সময়ে, ঠিক পরিমাণে খাওয়া ও ঠিক ওষুধ সেবন, এই তিনটে করে তুমি তোমার শরীরকে সুস্থ রাখছো তো? এটা শুধু যে রাজাদের জন্যই প্রযোজ্য তা নয়, যারাই ধর্মপথে যেতে চাইছেন তাদের সবার খাবার সময় আর খাবার পরিমাণ একেবারে সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে বলে একসঙ্গে প্রচুর খেয়ে নিলাম এই জিনিষ কখনই করতে নেই। *কচ্চিচ্ছারীরমাবাধমৌষধৈর্নিয়মেন বা। মানসং বৃদ্ধসেবাভিঃ সদা পার্থাপকর্ষসি।।২/৫/৯০*। আর মানসিক সন্তাপের জন্য, যে কারণে রাত্রে ঘুম ঠিক মত না হওয়া, খাওয়া-দাওয়াতে অরুচী হওয়া এগুলোর জন্য দরকার – *মানসং বৃদ্ধসেবাভিঃ* – মনের সন্তাপ যায় একমাত্র বৃদ্ধজনের সেবাতে। বৃদ্ধ মানে, যারা জ্ঞানী, গুণী, বাড়ির ও সমাজের বয়স্ক যারা একমাত্র তাদের সেবাতেই মানসিক সন্তাপ দূর হয়। একজন প্রাচীন মহারাজ বলতেন, সাধুসেবার থেকে বড় পূণ্য আর কিছুতে হয় না। মঠের সন্ন্যাসীদের চেহারা এত সতেজ কেন? এর একমাত্র কারণ সবাই ঠিক সময়ে আর মাপা খাওয়া-দাওয়া করছে বলে।

এরপর আরও রাজার গুণের কথা বলা হচ্ছে, যে রাজা নাস্তিক হয় না, মানে ভগবানে বিশ্বাস রাখে, মিথ্যে কথা বলে না, ক্রোধ করে না, প্রমাদ করে না, দীর্ঘসূত্রতা করে না, আলস্য করে না, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, মুর্খদের সাথে বেশী মেলামেশা করে না আর জ্ঞানীদের সঙ্গই করে, এই ধরণের রাজা কখনই বিপদে পড়ে না। এর একটাও দুর্গুণ যদি রাজার মধ্যে থাকে তাহলে সে যে কোন দিন বিপদে পড়ে যেতে পারে। এইভাবে নারদ রাজার রাজধর্ম ও রাজার গুণের ব্যাপারে বিরাট বর্ণনা দিচ্ছেন, এখানে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করে তখনকার দিনে সমাজের কি আদর্শ ও ভাব ছিল তার একটা রূপরেখা দেওয়া হল।

সব শুনে রাজা যুধিষ্ঠির নারদকে চারটি প্রশ্ন করছেন। প্রথম প্রশ্ন বেদের সার্থকতা কিভাবে হয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ধনের সার্থকতা কোথায়? তৃতীয় প্রশ্ন, স্ত্রীর সাফল্য কোথায়? আর চতুর্থ প্রশ্ন, শাস্ত্রজ্ঞানের সাফল্যতা কোথায়? নারদ এবার উত্তর দিচ্ছেন। *অগ্নিহোত্রফলা বেদা দত্তভুক্তফলং ধনম্। রতিপুত্রফলা দারাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্।।২/৫/১১৩*। বেদের সার্থকতা আসে অগ্নিহোত্র থেকে। ব্রাহ্মণদের উপনয়ন হয়ে গেলে তাঁরা সকালবেলা আর সন্ধ্যেবেলা অগ্নিহোত্র করতেন, অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে তার সামনে বসে উপাসনাদি করতেন। এই উপাসনাদিই পরের দিকে গায়ত্রীজপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এখন সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বেদ ও অগ্নিহোত্র ক্রিয়া হারিয়ে গেছে তাই এখন ধর্মের সার্থকতার কথা বলতে গিয়ে বলা হয় সকাল বিকেল দুই বেলা যে জপ-ধ্যান উপাসনাদি করা এটাই ধর্মের সার্থকতা। এগুলো না করে মুখে ধর্ম ধর্ম করে কোন লাভ নেই। আমি দীক্ষা নিলাম আর জপ করছি না তাতে দীক্ষা নেওয়ার যেমন কোন সার্থকতা হয় না, এখানেও ঠিক তাই। ধনের অর্থাৎ টাকা-পয়সার সার্থকতা হয় দান আর ভোগের দ্বারা। মানুষ যদি ভোগই না করতে পারে তাহলে অর্থ উপার্জন করে কি লাভ। নারী বা স্ত্রীর সার্থকতা হল রতি আর পুত্রপ্রাপ্তিতে। মহাভারত হল প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র, এখানে কোন লুকোচুরির কিছু নেই, নারীর দুটো কাজ – আনন্দ দেওয়া আর পুত্র দেওয়া। স্ত্রী যদি তোমাকে আনন্দ না দিতে পারে আরে পুত্র না দিতে পারে তাহলে তুমি আরেকটি বিয়ে করতে পার। শাস্ত্রজ্ঞানের সার্থকতা হল শীল আর সাদাচার। যদি দেখা যায় শাস্ত্রের সব জ্ঞান আছে কিন্তু চরিত্রের ঠিক নেই, আচারের ঠিক নেই তাহলে এই শাস্ত্রজ্ঞানের কোন মূল্য নেই। ব্যাসদেব কাহিনীর মধ্য দিয়ে মূল কথা যেটা বলতে চাইছেন, রাজা হিসাবে তুমি ঠিক পথে আছ কিনা।

শেষে নারদ বলছেন, হে যুধিষ্ঠির তুমি যদি রাজা হিসাবে জীবনে সফল হতে চাও তাহলে এই ছয়টি দোষকে সব সময় পরিহার করে চলবে, নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, অমার্দবম্ মানে নিষ্ঠুর হওয়া আর দীর্ঘসূত্রতা। আলস্য আর দীর্ঘসূত্রতার পার্থক্য হল, আলস্যে সে কিছুই করছে না, কিন্তু দীর্ঘসূত্রতাতে করছে কিন্তু আজ থাক কাল করব এই ভাবে কাজটাকে পিছিয়ে দিচ্ছে, যেটা সকালে করার কথা সেটা দুপুরে করছে, যেটা দুপুরে করার কথা সেটা বিকেলে করছে।

এরপর ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব যে রাজমহল তৈরী করেছে তার সাথে তুলনা করে অন্যান্য রাজ্যে রাজা আর দেবতাদের রাজমহলের বিশাল বর্ণনা করা হয়েছে। যুধিষ্ঠির এখন পুরো রাজা হয়ে গেছেন, এখন তাঁর রাজ্য চালনা ছাড়া আর কোন কাজ নেই, আর তাঁর এই মনোভাবও ছিল না যে চারিদিকে খালি রাজ্য জয় করে বেড়াবেন। যুধিষ্ঠিরের মনে মনে ঠিক করলেন আমি একটা রাজসূয় যজ্ঞ করব। ভারতীয় পরম্পরাতে অনেক ধরণের যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটা ছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। এই রকমই ছিল রাজসূয় যজ্ঞ। এই সব যজ্ঞ করার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকতো। অশ্বমেধ যজ্ঞে একটা হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হত আর তার পেছনে পেছনে সৈন্যরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এগোতে থাকত। যে রাজ্যে ঘোড়াকে বেঁধে নেওয়া হত সেই রাজ্যের সাথে তখন যুদ্ধ হত। রাজসূয় যজ্ঞ যে রাজা করবেন তাঁকে চারিদিকের সব রাজ্যকে জয় করে বেড়াতে হবে। রাজসূয় আর অশ্বমেধ যজ্ঞ একই ধরণের কিন্তু দুটো ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ধরণের সৈন্যদের পাঠানো হত।

জরাসন্ধের কাহিনী

এখন যুধিষ্ঠির ঠিক করে নিলেন যে তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করবেন। এখানে আবার কিছু পৌরানিক উপখ্যানের মত কিছু বিষয়ের অবতারণ করা হয়েছে। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব চার দিকে রাজ্য জয় করতে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম দিকে পাণ্ডবদের কাছে এক বিরাট সমস্যা। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ মানে দিল্লীর কাছ থেকে রাজসূয় যজ্ঞের যাত্রা শুরু করছেন, আর অন্য দিকে বিহারে রাজগীরের কাছে জরাসন্ধের রাজ্য। জরাসন্ধের মাথায় কি করে আর কিভাবে যে একটা ইচ্ছে জেগে গিয়েছিল বলা মুশকিল, জরাসন্ধ ঠিক করেছিল আমি একশটি রাজাকে মায়ের সামনে বলি দেব। এই উদ্দেশ্য সে বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজাদের ধরে এনে বন্দী করে রেখেছিল, যেদিন একশটি রাজা বন্দী হবে সেদিন সে সব কটি রাজাকে বলি দিয়ে দেবে। তখনকার সময় জরাসন্ধ ছিলেন প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাজা। যুধিষ্ঠির দেখছেন যে এই জরাসন্ধকে যদি না হারান যায় তাহলে রাজসূয় যজ্ঞ করাই যাবে না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে জরাসন্ধের কাহিনী শুনে যজ্ঞ করা থেকে পিছিয়ে এলেন। জরাসন্ধের কাহিনী সংক্ষেপে হল, জরাসন্ধের বাবার নাম বৃহদ্রথ, তাঁর দুই মহিষী ছিল কিন্তু তাদের কোন সন্তান ছিল না। এক মুনির আশীর্বাদে দুই রানীই গর্ভবতী হয়। প্রসব হতেই দেখে একটা বাচ্চা দুটো আলাদা টুকরো দুই নারীর থেকে জন্ম নিয়েছে, ঐ দেখেই সবাই আঁতকে উঠেছে। রানীরা ঐ দুটো টুকরোকে দুটো আলাদা বস্ত্রে মুড়ে চারমাথার মোরে ফেলে দিয়েছে। ঐখানে জরা নামে এক রাক্ষসী ছিল। এখানে যদিও রাক্ষসি বলছে, কিন্তু আসল শব্দটা হল কৃত্যা। যেমন ভিখারীনি গুলি ঘুরে বেড়ায়, যাদের অনেকে ডাইনী বলে, জরা এই ধরণের কিছু একটা ছিল। জরার পরিচয় হল, ঐ নগরীতে একজন রাক্ষসী ঘুরে বেড়াত আর সে বাচ্চার মাংসই খেয়ে বেড়াত। যেমনি জরা দেখেছে একটা বাচ্চার দুটো টুকরো পড়ে আছে, সেও আনন্দে খাবে বলে পুটলীতে একসাথে রাখতেই দেখে বাচ্চার টুকরো দুটো জুড়ে গেছে। জুড়ে গিয়েই বাচ্চাটা বিকট কাঁদতে শুরু করেছে। জরা তখন বাচ্চাটাকে নিয়ে রাজার কাছে এসেছে। জরা রাক্ষসী জুড়ে দিয়েছিল বলে তার নাম হয়ে গেল জরাসন্ধ। রাজাকে জরা নিজের পরিচয় দিয়ে বলছে, আমার নাম জরা, আমি রাক্ষসী। তোমার বাড়িতে আমার পূজো হয় বলে এখানে আনন্দে আছি। আমি প্রত্যেক মানুষের বাড়িতে থাকি। নামে আমি রাক্ষসী কিন্তু ব্রহ্মা আমাকে গৃহদেবী বলে সৃষ্টি করেছেন। তাই যে বাড়িতে আমার চিত্র অঙ্কিত করে আমার পূজো করা হয় সেই বাড়িতে সব সময় সমৃদ্ধি থাকবে। যে বাড়িতে আমার এইভাবে পূজো করা হবে না সেই পরিবারের হানি হবে। এই জিনিষ এখনও আমাদের দেশে পালিত হয়ে আসছে, বিশেষ করে বিবাহের সময় বা বাড়ির কোন শুভ অনুষ্ঠানে, উপনয়ন, দীক্ষার সময় দেওয়ালে সিন্দুরের একটা চিত্র অঙ্কিত করা হয়, অনেকটা স্বস্তিক চিহ্নের মত কিন্তু স্বস্তিক চিহ্ন নয়, ওর উপরের দিকে একটা মুণ্ডু আঁকা হয়, আসলে এটি একটি রাক্ষসীর চিহ্ন। মহাভারত যেটা প্রচলিত করে গেছে সেটাই ভারতে হিন্দুদের মধ্যে থেকে গেছে, যেটা করেনি সেটা মুছে গেছে।

মহাভারত হল ইতিহাস আর পুরানধর্মী শাস্ত্র। যখন একটা সমাজ প্রগতির দিকে প্রসার লাভ করে তখন অনেক কিছুই একসঙ্গে চলতে থাকে। যেমন বর্তমান সমাজ এখন বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি করেছে কিন্তু তার সাথে অনেক কুসংস্কার ও অজ্ঞতাও অনেক ভাবে চলছে। ঠিক তেমনি তখন বেদ ও উপনিষদের মত উচ্চ আদর্শের অনুশীলন যেমন একদিকে চলছিল সাথে সাথে অতি সাধারণ স্থানীয় স্থুল আচার নীতি গুলিও অনুশীলিত হচ্ছিল। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই খুব ভীতু, তাকে যেটাই তার মঙ্গলের জন্য করতে বলা হবে আর না করলে ক্ষতি হবে তখন সেটাই সে করতে আকৃষ্ট হবে। তবে এগুলো সাধারণত নিম্ন সাংস্কৃতিক সম্পন্ন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। দেশ বিভাগের আগে হিন্দু মুসলমানরা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকত। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় কারুর বসন্ত রোগ হলে দেখা যেত মুসলমানরাও শীতলা মন্দিরে গিয়ে পূজো দিচ্ছে। আমরা এর আগেও বলেছি যে মহাভারত হল সমন্বয় শাস্ত্র, সমস্ত রকমের আচার, রীতিনীতিকে সমন্বয় করে

দেওয়া হচ্ছে। একদিকে যেমন উপনিষদের তত্ত্বকে নিয়ে আসছে আবার অতি সাধারণ একটা কৃত্যার ছবি যদি বাড়ির দেওয়ালে সিঁদুর লাগিয়ে ঘি ঢেলে দেওয়া হয় তাহলে বাড়িতে কোন অশান্তি হবে না, সেটাকেও অনুমোদিত করে দিচ্ছে। এইভাবে জরাসন্ধকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল আর ব্যাসদেবও সুন্দর করে ঢুকিয়ে দিলেন কৃত্যার ব্যাপারটা।

জরাসন্ধ বধ

এরপরের মূল কাহিনী সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন জরাসন্ধের মত খুব প্রতাপশালী আর শক্তিমানকে পরাস্ত করা অসম্ভব মনে হচ্ছে তাই রাজসূয় যজ্ঞ করাটা অনুচিত কাজ হবে। শ্রীকৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করে বললেন চিন্তার কিছু নেই আমি এর একটা কৌশল ঠিক বার করে নিতে পারব। শ্রীকৃষ্ণ সাথে ভীম আর অর্জুনকে নিয়ে ব্রাহ্মণ বেশে জরাসন্ধের কাছে পৌঁছে গেছেন। মাঝ রাতে গিয়ে জরাসন্ধকে যুদ্ধের জন্য হুঙ্কার দিতেই জরাসন্ধ বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলছে – তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী কিন্তু তোমাদের চেহারার কাঠামো অন্য ধরণের। ভীম বলছেন, আমরা যাই হই না কেন তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ কর। জরাসন্ধ বলছেন, তোমরা যদি সৈন্য নিয়ে এসে যুদ্ধ করতে চাও তাও করতে পার, আর একা একা কিংবা এক এক করে যুদ্ধ করতে চাও তাও করতে পার। এনারা বললেন, আপনি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নিন। তখন জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলছে – তোমাদের মধ্যে আর কাকে বাছব, তোমাদের তো দেখছি ঘাটের মরা। শেষে ভীমকেই বেছে নিয়েছে, একে তবুও একটু পালোয়ানের মত লাগছে। তখন ভীমের সঙ্গে লড়াই শুরু হল। এদিকে জরাসন্ধের স্ত্রীর মনে একটা আশঙ্কা হয়েছে, স্ত্রী এসে জরাসন্ধকে বলছে – আপনি মল্ল যুদ্ধ করার আগে আপনার ছেলেকে আগে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিন। জরাসন্ধ তাই করল, ছেলেকে রাজা করে দিয়ে ভীমের সাথে লড়াই করতে নেমে গেল।

জরাসন্ধ ভীমকে বেছে নেওয়ার আগে একটা খুব সুন্দর কথা বলছে – *ভীম! যোৎস্যে ত্বয়া সার্দ্ধং শ্রেয়সা নির্জ্জিতং পরম্।।*২/২২/৭। যদি আমাকে মরতে হয়, যদি আমাকে পরাজিতও হতে হয় তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষের কাছেই পরাজিত হতে চাই। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন ছিল রোগা প্যাটকা, এদের কাছে যদি আমি হেরে যাই তাহলে আমার অসম্মান হবে তাই যদি হারতে কিংবা মরতে হয় তাহলে আমি শক্তিমানের হাতেই মরব। শার্ঙ্গকের বাচ্চা দ্রোণও এই কথাই বলেছিল, ইঁদুরের হাতে মরার চেয়ে আগুনে মরা অনেক সম্মানের হবে। এরপর ভীমের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে। অনেক দিন হয়ে গেলে লড়াই চলছে কিন্তু কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারছে না দেখে ভীমকে অর্জুন বলছেন – *যত্তে দৈবং পরং সত্ত্বং যৎ সত্ত্বং মাতরিশ্বাঃ। বলং ভীম! জরাসন্ধে দর্শয়াশু তদদ্য বৈ।।*২/২৩/৭। ভীম, তোমার সেই দৈবী শক্তিকে স্মরণ কর, আর তুমি বায়ু দেবতা থেকে যে শক্তি পেয়েছ, সেই শক্তিকে তুমি স্মরণ কর আর জরাসন্ধের উপর আক্রমণ কর। এটাই করতে হয়, মানুষ যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন তার যে স্বরূপ সেটাকে তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়। মানুষের মনে যখন লোভ, হিংসা, ক্রোধ এসে তাকে মোহ আর বিষাদে আচ্ছন্ন করে দেয় তখন তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়, তুমি এর আগে কত বড় বড় কাজ করেছিলে। তখন তার মধ্যে শক্তি জাগ্রত হয়ে যায়। স্বামীজী যখন ভারত পরিক্রমায় হিমালয়ে ভ্রমণ করছিলেন তখন পথে দেখছেন এক বৃদ্ধা আর চলতে পারছেন না, ভাবছে ওখান থেকেই ফিরে আসবে। স্বামীজী তখন ঐ বৃদ্ধাকে বলছেন – মা, তুমি পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখ কতটা পথ তুমি পেরিয়ে এসেছে। ব্যস, সেই বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পেয়ে আবার চলতে শুরু করল। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাই করলেন, ভীমকে মনে করিয়ে দিলেন তুমি তো বায়ু দেবতার সন্তান। ভীমেরও বায়ু দেবতার কথা মনে করতেই তাঁর প্রচণ্ড শক্তি এসে গেল। এবারে জরাসন্ধকে সব দিক দিয়ে পর্যুদস্ত করেও ভীম জরাসন্ধকে কিছুতেই বধ করতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন একটা ছোট্ট কাঠের টুকরো নিয়ে মাঝখান দিয়ে চিড়ে দিয়ে দুটো টুকরোকে বিপরীত দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেখালেন, দ্যাখো ভীম তুমি যদি জরাসন্ধকে এভাবে চিড়ে না দিতে পার তাহলে তুমি কোন দিন এভাবে জরাসন্ধকে মারতে পারবে না। ভীম বুঝে নিতেই, জরাসন্ধকে কায়দা করে মাটিতে ফেলে তার পায়ে একটা পা দিয় চেপে আরেকটা পা ধরে মাঝখান দিয়ে চিড়ে দিলেন। শুধু চিড়ে দিলেই হবে না, দুটোকে বিপরীত দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, তা নাহলে আবার এসে দুটো টুকরো জুড়ে যাবে।

এবারে আর জরাসন্ধ বধের কোন বাধা রইল না। জরাসন্ধ বধ হয়ে যাওয়ার পর কেল্লার ফটক ভেঙে সব বন্দী রাজাদের মুক্ত করা হল। রাজাদের মুক্ত করার পর সবাইকে বলা হল, আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় বেরিয়েছি, তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে যাচ্ছেন, আপনারা সকলে মিলে তাঁর এই যজ্ঞে সহযোগিতা করুন। রাজসূয় যজ্ঞ সফল হলে সেই রাজাকে সম্রাট উপাধিতে অভিষিক্ত করা হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজাকে চক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। একশটি

অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে সে ইন্দ্রত্ব পদ লাভ করে। সমস্ত রাজারা বন্দীমুক্ত হবার পর বলল, রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রচেষ্টায় আমরা জীবন ফিরে পেয়েছি আমরা অবশ্যই এই রাজসূয়ে যজ্ঞে তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। এরপর ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন

রাজসূয় যজ্ঞে প্রচুর অর্থ ব্যায় হয়। যজ্ঞে যাঁরা অতিথি হয়ে আসবেন তাদের প্রচুর উপহার দিতে হয়, পুরোহিত যাঁরা হবেন তাঁদেরকেও অনেক পারিশ্রমিক ও দান দিতে হয়। ব্রাহ্মণ, কাঙালী, প্রজাদের প্রচুর দান করতে হয়, এই কারণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। চার ভাইরা যে বিভিন্ন রাজ্য জয় করতে বেরিয়েছেন, এনারা যেখানেই যাবেন সেখানকার রাজাদের বলবেন তোমরা কর দাও। ঐ অর্থ, সম্পদ যা নিয়ে আসা হত সব একটা জায়গায় জমিয়ে রাখা হত। সব যা জমা হবে দানের সময় সবটাই তখন খরচ করে দেওয়া হত। ধন-রত্নের পাহাড় হয়ে যেত। এছাড়া ভালো ভালো ঘোড়া, হাতি, গরু এগুলো তো থাকতই। সবই দানে ব্যয় হয়ে যেত, দেখানো যে আমার মত আর কেউ নেই। এরপর সব ভাইরা প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে ফিরে এসেছে। এবার যজ্ঞ শুরু হবে। ভারতের সমস্ত জায়গা থেকে রাজার আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, দুর্যোধনরাও এসেছে।

ভারতের বিভিন্ন দিক থেকে সমস্ত রাজারা এসেছেন, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সবাই এসেছেন। সবার থাকা খাওয়ার জন্য নতুন নতুন অতিথিশালা নির্মাণ করে সব রকমের আতিথেয়তার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। যখন যজ্ঞ শুরু করা হয় প্রথমেই যেটা করা হয় সেই অনুষ্ঠানের নাম অভিশেচনীয়। অর্ঘ্য দিয়ে সমস্ত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোনই অভিশেচনীয়, এখানে এটি কোন সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, এটি যজ্ঞের একটা অঙ্গ বলে একে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলেই গণ্য করা হয়। যত অতিথি এসেছেন সবাইকে অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করা হবে। এর আগে আরেকটি অনুষ্ঠান আছে যাকে বলা হয় পদপ্রক্ষালন, এখানে তার উল্লেখ না করে পরের দিকে উল্লেখ করা হচ্ছে। এত রাজারা এসেছেন এখন সবার পা কে প্রক্ষালন করবেন? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমি প্রক্ষালন করব। সমস্ত রাজাদের পা ধুয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এসব হয়ে যাওয়ার পর সবাই যার যার নিজের আসনে এসে বসেছেন। এবার শুরু হবে অর্ঘ্য দেওয়া। এখানে আবার প্রশ্ন উঠল প্রথম অর্ঘ্যটা কাকে দেওয়া হবে। এই সমস্যা ইদানিং কালেও হয়, একই মঞ্চে সন্ন্যাসী আছেন আবার কোন মন্ত্রীও আছেন, মন্ত্রীকে প্রথম অর্ঘ্য দিতে গিলে তিনি হয়তো ঘোরতর আপত্তি করে বলবেন, দেখছেন সন্ন্যাসী মহারাজ বসে আছেন আগে তাঁকে অর্ঘ্যটা নিবেদন করুন।

চার রকমের বাক্যালাপ

এই যজ্ঞ সভায় ব্রাহ্মণ, মহর্ষি, ঋষি, মুনি, রাজারা সবাই আছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে বড় পণ্ডিতও ছিলেন। অবসর সময়ে এনারা সবাই নিজেদের মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন। এই কথাবার্তা চার রকমের হত – বাদ, বিবাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। বাদ সব সময় এক পক্ষীয় হয়ে যায়, এখানে আচার্য বলে যাচ্ছেন আর ছাত্র-ছাত্রীরা শুনে যাচ্ছেন। বিবাদের ক্ষেত্রে আচার্যও বলবেন শিষ্যরাও বলবে, এই বিবাদ কিভাবে এগোবে তার আবার কিছু নিয়ম আছে। এর মধ্যে একটি নিয়ম হল প্রতিজ্ঞা, মানে আমরা কি জিনিষ জানতে চাইছি, এখানে যেমন আমরা মহাভারত জানতে চাইছি, এটা জেনে কি লাভ হবে, এই ধরণের কয়েকটি নিয়ম আছে। বাদে একজনই বলে যাচ্ছেন কিন্তু বিবাদের ক্ষেত্রে একজন একটা কিছু মত দিলেন অন্য একজন তার পাল্টা একটা মত দিলেন, কিন্তু নিয়ম একই থাকবে। আমারও কিছু বক্তব্য থাকবে আপনারও কিছু বক্তব্য থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে প্রতিজ্ঞা, কি নিয়ে আলোচনা হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিবাদে একটা সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়। আমরা আলোচনার মাধ্যমে একটা তত্ত্বে পৌঁছাতে চাইছি, কিন্তু নিষ্কর্ষে যখন পৌঁছাতে চাইব তখন আমাদের একটা সীমা বেঁধে দিতে হবে। সীমা বাঁধা না থাকলে আলোচনা ছড়াতে ছড়াতে কোথায় চলে যাবে কোন ঠিক থাকবে না। এক মজার কাহিনী এই আছে, একজন মায়ের শ্রাদ্ধ করবে। পুরোহিত মশায় এসে জায়গা ঠিক করে দিয়েছেন কোথায় বসে শ্রাদ্ধ করবেন। বাড়ির বৌমাকে বলে দিলেন এতটুকু জায়গা গোবর দিয়ে লেপে রাখতে। যজ্ঞের দিন ব্রাহ্মণ যজমানকে নিয়ে বসেছেন শ্রাদ্ধাদি কর্মের জন্য। ব্রাহ্মণ যজমানকে বলছেন, আমি যেমনটি বলব আপনিও তেমনটি বলবেন নিজের বুদ্ধি খাটাতে যাবেন না। এবারে ব্রাহ্মণ বলছেন, বলুন ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। যজমানও বলছে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এইভাবে মন্ত্র চলছে। মাঝখানে ওঁ পরমাত্মনে নমঃ বলে শেষে ব্রাহ্মণ অঁ অঁ করেছে, ওঁ পরমাত্মনে নমঃ অঁ অঁ । যজমানও বলছে ওঁ পরমাত্মনে নমঃ অঁ অঁ। ব্রাহ্মণ বলছেন অঁ অঁ বলতে হবে না। যজমানও বলছে অঁ অঁ বলতে হবে না। ব্রাহ্মণ আবার বলছেন, আমি বলছি ওটা বলার দরকার নেই। যজমানও বলছে আমি বলছি ওটা বলার দরকার নেই।

কারণ যজমানকে ব্রাহ্মণ বলে দিয়েছে যে রকমটি বলব সেই রকমটি বলবে। ব্রাহ্মণ রেগেমেগে বলছেন চুপ কর ব্যাটা। সেও বলছে চুপ কর ব্যাটা। ব্রাহ্মণ বলছেন এক চড় মারব। এও বলছে এক চড় মারব। ব্রাহ্মণ আর থাকতে না পেরে উঠে গিয়ে যজমানকে এক চড় মেরেছে। যজমানও উল্টে এক চড় মেরেছে, ওকে বলে দিয়েছে আমি যে রকমটি করব তুমিও সেই রকমটি করবে। ব্যস্ এবার ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেছে। এখন ধস্তাধস্তি করতে করতে যতটুকু গোবর লেপে দেওয়া ছিল তার বাইরে চলে গেছে। তখন বৌমা এসে বলছে, বাবা আগে যদি বলতেন শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াবে তাহলে আরেকটু বেশী জায়গা গোবর দিয়ে লেপে রাখতাম। বিবাদেও এই রকম সীমা দিয়ে ঘেরা থাকে, যে কোন আলোচনাতে এই সীমার বাইরে যেতে পারবে না, নিজের মত ডান দিক বাঁ দিক ছিটকে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনবে তা করা চলবে না।

জল্পতে ছল, জাতি, নিগ্রহ ইত্যাদি নানা রকমের যুক্তির প্রয়োগ করা হয়। জল্পে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করে বিপক্ষের মতকে খণ্ডন করে দেওয়া হয়। বিপক্ষের মতকে খণ্ডন করতে গিয়ে সে ছল মানে চালাকি, নানা রকমের কথার মারপ্যাঁচ করতে পারবে। যেমন কেউ একজন বললেন নবকম্বল, নবকম্বল মানে নতুন কম্বল। এখন তার বিপক্ষের লোক উঠে বলল, আপনিই তো বললেন নটি কম্বল, একজন লোক কি করে নটি কম্বল গায়ে চাপাবে, এখানে চালাকি করা হল। জল্পে খুব কায়দা করে নিজের পক্ষকে স্থাপন করে দেওয়া হয় আর অপরের মতকে কেটে উড়িয়ে দেওয়া হয়। দেশে আগে ব্রাহ্মণদের বেশীর ভাগই এই জল্পতে নেমে যেতেন। সারা দেশের যত পণ্ডিত আর তাদের পাণ্ডিত্য সব জল্পের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। চতুর্থ হল বিতণ্ডা – এখানে নিজেরও কিছু বলার নেই আর অপর পক্ষেরও কিছু বলার নেই, শুধু মাত্র বক্ বক্ করে করে এক পক্ষকে অতিষ্ঠ করে দেবে। স্কুলের এইট নাইনের ছেলে মেয়ে গুলো যখন নিজেদের মধ্যে তর্ক করে তখন এদের কোন বিষয় নেই তাই এতে কোন বাদ নেই, বিবাদ নেই, জল্প নেই শুধু তর্ক করে যাচ্ছে, এটা হল বিতণ্ডা।

পণ্ডিতরা ফাঁকা সময়ে শুধু নিজেদের মধ্যে এই রকম তর্ক বিতণ্ডা করতেন। যাঁরা একটু বড় ধরণের পণ্ডিত তাঁরা আবার দুর্বল পক্ষকে বড় করে দিতেন আর সবল পক্ষকে দুর্বল করে দিতেন। এই ধরণের বাক চাতুরি করছে। কোথায় করছে? যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সভায়। ব্যাসদেব দেখাচ্ছেন তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ কি রকম ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞের প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন

এখানে যাঁরাই সমবেতে হয়েছেন সবাই যজ্ঞের জন্য ব্রত নিয়েছেন। দেবর্ষি নারদও উপস্থিত আছেন। যজ্ঞের সব কিছু দেখে আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখে হঠাৎ নারদের মনে পড়ল, অনেক দিন আগে ব্রহ্মলোকে আলোচনা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অবতার হয়ে আসবেন আর ক্ষত্রিয়দের কিভাবে বিনাশ করবেন। তখন সব দেখে তিনি বুঝে গেলেন এবার এদের বিনাশের সময় হয়ে এসেছে। দেখছেন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে গেছেন, ভীষ্মের কাছে গিয়ে বলছেন – এবারে পূজা করে অর্ঘ্য নিবেদন করা হবে, কিন্তু প্রথম অর্ঘ্যটা কাকে নিবেদন করা হবে? ভীষ্ম তখন বলছেন *আচার্যমৃত্বিজং চৈব সংযুজং চ যুধিষ্ঠির। স্নাতকং চ প্রিয়ং প্রাহুঃ ষডধ্যহিনি নৃপং তথা।।২/৩৬/২৩*। আচার্য – যিনি অধ্যয়ণ করান, ঋত্বিক – যেসব ব্রাহ্মণরা এই যজ্ঞে নিযুক্ত আছেন, সম্বন্ধী – যত আত্মীয়-স্বজন, স্নাতক – ব্রহ্মচারী যাঁরা পড়াশুনা করেছে, প্রিয়-মিত্র – বন্ধু আর রাজা, এই ছয় জনকে তোমার অর্ঘ্য দিতে হবে। এখানে যে হাজার হাজার লোক বসে আছেন তাদের সবাইকে দেওয়ার দরকার নেই, শুধু এই ছয় জনকে অর্ঘ্য দিতে হবে। এদের মধ্যে রাজাই বেশী, প্রিয়-মিত্রও প্রচুর, আর আচার্য, ঋত্বিক, স্নাতক এনারাতো আছেনই। যুধিষ্ঠির বলছেন – আমি সবাইকেই অর্ঘ্য দেব কিন্তু প্রথম অর্ঘ্যটা কাকে দেওয়া হবে?

ভীষ্ম তখন – *ততো ভীষ্মঃ শান্তনবো বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বীর্য্যবান্। অমন্যত তদা কৃষ্ণমর্হণীয়মং ভুবি।।২/৩৫/২৭*। অনেক চিন্তা ভাবনা করে বলছেন – এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অগ্র পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণই, তাঁকেই অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রথম পূজো করতে হবে। কেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম অর্ঘ্য দেওয়া হবে সেই ব্যাপারে ভীষ্ম বলছেন, এইখানে এসে মহাভারতে প্রথম শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানেরই রূপ এই ধারণাটাকে একটু ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রথমের দিকে যখন মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন তখন যেন মনে হচ্ছিল ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক ভগবান রূপে গ্রহণ করতে পারছেন না। কিন্তু যেমন যেমন তাঁর রচনা এগিয়েছে তেমন তেমন তাঁর ধারণাটা জন্মাতে শুরু হচ্ছে। আর যখন তিনি ভাগবত রচনা করলেন তখন পুরোটাই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে বর্ণনা করে গেছেন। যদিও এখানে মহাভারতের শ্লোকের অনুবাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে কিন্তু মূল শ্লোকের মধ্যে কোথাও তাঁকে ভগবান বলে উল্লেখ করা হয়নি। ভীষ্ম বলছেন – এখানে যত রাজা বসে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তেজ, পরাক্রম, শক্তিতে এত দীপ্যমান হয়ে আছেন যেন মনে হচ্ছে লক্ষ তারার মাঝে সূর্য যেন জ্বলজ্বল করছে। যেখানে যেখানে বায়ুর অস্তিত্ব সেখানে সেখানে যেমন জীবনের স্পন্দন দেখা যায় ঠিক

তেমনি এখানে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি যেন এখানে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি এই সভা থেকে চলে যান তাহলে এই সভা সেই মুহূর্তে নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রভা আর তাঁর প্রাণশক্তি যেন সবাইকে এখানে ধরে রেখেছে। ভীষ্মের এই কথা শোনার পর যুধিষ্ঠির প্রথম অর্ঘ্যটা তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করে তাঁকে অর্ঘ্যটা নিবেদন করছেন। শ্রীকৃষ্ণও অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। অর্ঘ্য গ্রহণ করতেই শিশুপাল প্রচণ্ড রেগে গেছেন। মহাভারতের এই অংশটি খুব উল্লেখনীয় একটি অংশ। শিশুপালের যে নানান রকমের যুক্তি আর অন্যানদের যা বক্তব্য সেটা দিয়ে বোঝা যায় যাঁদের পুরানের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে তাঁরা একটা জিনিষকে কিভাবে দেখেন, আর যাঁরা পুরানকে মানে না তাঁরা জিনিষটাকে কিভাবে দেখেন। আমরা সবাই জানি শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেছিলেন, কিন্তু কেন এই বধ হল, আর আসলে কি হয়েছিল সেটাই এখন আমরা এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের কূটুক্তি

শিশুপাল সোজা উঠে সরাসরি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – হে যুধিষ্ঠির তোমার মত একজন ব্যক্তি কি করে এই অন্যায় কাজ করছ, কৃষ্ণকে কি করে তুমি অগ্রপূজা দিচ্ছ! তোমাদের না হয় এখন অল্প বয়স, তোমরা ধর্মের অতি সূক্ষ্ম জিনিষ বুঝতে পারো না, তোমাদের ভুল হতে পারে মানছি, কিন্তু যাকে তুমি জিজ্ঞেস করলে, সেই ভীষ্ম হয়ে গেছে একটা বুড়ো তাঁর স্মৃতিশক্তি সব লোপ পেয়ে গেছে। তুমি আমাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছ কিন্তু আমরাতো এই ধরণের অন্যায় সহ্য করতে পারবো না। কারণ কৃষ্ণকে অগ্রপূজা দেওয়া যায় না। আমাদের সবাই জানে এই যদুবংশীয় কৃষ্ণ কোন রাজা নয় আর পূর্বেও কোন দিন রাজা ছিল না। এত রাজারা এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁদের সবাইকে উপেক্ষা করে কি করে তুমি কৃষ্ণকে অগ্রপূজা দিচ্ছ। যদি তুমি মনে করে কৃষ্ণ এখানে সবার শ্রেষ্ঠ, তাহলে কৃষ্ণের বাবা বসুদেবতো এখানে উপস্থিত আছেন, তুমি বাবাকে ছেড়ে কি করে ছেলেকে অর্ঘ্য দিতে গেলে। তুমি যদি মনে কর কৃষ্ণ তোমার বড় সুহৃৎ তাহলে রাজা দ্রুপদ তো তোমার আর বড় সুহৃৎ, কারণ তিনি তোমার শ্বশুর, ভালোবেসে তোমাদের নিজের মেয়েকে সম্প্রদান করেছেন। তুমি যদি মনে কর কৃষ্ণ তোমার আচার্য, তাহলে তুমি দ্রোণাচার্যকে তুমি কোথায় স্থান দেবে, যে দ্রোণাচার্যের কাছে তুমি সব কিছুর শিক্ষ-দীক্ষা পেয়েছ সেই উত্তম আচার্য তোমার সামনে উপস্থিত। এবার তুমি বল তুমি কোন্ পদমর্যাদায় আর কিসের ভিত্তিতে কৃষ্ণকে অগ্রপূজা দিলে? কোন দিক দিয়ে সে অগ্রপূজা পাবার অধিকারী নয়। কি করে তুমি এই কৃষ্ণকে বেছে নিলে! শুধু তাই নয়, তুমি যদি কৃষ্ণকে বড় ঋত্বিজ মনে করে থাক তাহলে ব্যাসদেব কি করতে এখানে আছেন? ব্যাসদেবের থেকে বড় এত বড় ঋত্বিজ কি এখানে কেউ আছেন?

এইভাবে শিশুপাল এক বিরাট লম্বা বিবরণ দিচ্ছেন তুমি যদি কৃষ্ণকে এই দেখ তাহলে ইনি আছেন, তুমি যদি যোদ্ধা রূপে দেখ তাহলে অমুক আছেন ইত্যাদি। শিশুপাল দেখাচ্ছেন কোন দিক দিয়েই শ্রীকৃষ্ণ অগ্রপূজা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। শিশুপাল এরপর বলছেন – তুমি যদি মনে কর কৃষ্ণই তোমাদের একমাত্র পূজনীয় দেবতা তাহলে তোমরা আমাদের অপমানিত করার জন্য কেন এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছ। আমরা তো এখানে অপমানিত হওয়ার জন্য আসিনি। এই রকম বোকামো কেন তুমি করছ আমার জানা নেই। এখানে শিশুপাল খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – আমরা মনে করেছিলাম যুধিষ্ঠির খুব ভালো লোক, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, এখন সম্রাট হতে চাইছে, আর আমরা মনে করলাম আমাদের জ্ঞাতি ভাইদের মধ্যে একজন সম্রাট হচ্ছে খুব ভালো কথা। এই মনে করে আমরা এখানে এসে পড়েছি, কিন্তু তাই বলে তুমি আমাদের এইভাবে অপমান করবে! *অস্য ধর্মপ্রবৃত্তস্য পার্শ্ববত্বং চিকীর্ষতঃ। করানস্মৈ প্রয়চ্ছামঃ সোহয়মস্মান্ন মন্যতে।।২/৩৬/২০*। আমাদেরই বংশের লোক ক্ষত্রিয়, সে সম্রাট হতে চায় রাজসূয় যজ্ঞ করতে চায়, খুব ভালো। তোমার আমন্ত্রণে আমরাও আনন্দে অংশ নিতে এলাম আর তাই বলে তুমি এভাবে আমাদের অপমান করবে! *কিমন্যদবমানাদ্ধি যদেনং রাজসংসদি। অপ্রাপ্তলক্ষণং কৃষ্ণমধ্যেণার্চিতবানসি।।২/৩৬/২১*। যুধিষ্ঠির তুমি এর থেকে বড় আমাদের কি অপমান করতে পার – *যদেনং রাজসংসদি* – যার রাজসংসদ নেই, ছত্র নেই, আর চামর নেই। রাজার দুটো চিহ্ন থাকত, একজন রাজার মাথায় ছাতা ধরে থাকত আরেকজন চামর দিয়ে ব্যজন করে হাওয়া করতে থাকত। শিশুপাল বলছেন এই দুটোই শ্রীকৃষ্ণের নেই। শিশুপাল বলছেন আমার যেটা মনে হয় *অকস্মাদ্ধর্মপুত্রস্য ধর্মাত্মেতি যশো গতম্। কো হি ধর্মচ্যুতে পূজামেবং যুক্তাং প্রযোজয়েৎ।।২/৩৬/২২*। এই যুধিষ্ঠির হঠাৎ যেন ধর্মপুত্রের ধর্মাত্মা এই যশ পেয়ে গেছে, যদি যুধিষ্ঠির ঠিক ঠিক ধর্মাত্মা হত তাহলে এই রকম অধর্মরূপ বালসুলভ কাজ করত না। কোন্ ধর্মাত্মা ধর্মচ্যুত লোককে এইরূপ পূজা করে থাকে। শিশুপাল বলতে চাইছেন যুধিষ্ঠির যেন উঠতি বড়লোক হয়ে গেছে, হঠাৎ ধর্মাত্মা হয়ে গেছে।

শিশুপালের শ্রীকৃষ্ণ নিন্দার প্রত্যুত্তরে ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি *(আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন – সাংখ্য দর্শন – শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম অবতার রূপে দেখা)*

শিশুপাল যুধিষ্ঠিরকে এত কথা বলার পর এবার শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – হে মুর্খ মাধব, এই কুন্তি পুত্ররা হল ভীতু, এরা জঙ্গলে বড় হয়েছে, এরা তপস্বী, এইসব রাজধর্ম এরা এখনও বোঝে না, কিন্তু তুমি তো সব বোঝ তাই তুমি নিজে কি করে এই অগ্রপূজাটা গ্রহণ করতে পারলে! পাণ্ডবরা আসলে কাপুরুষ, এরা ভয় বশতঃ আর লোভে পড়ে তোমাকে একটা অগ্রপূজা করে দিল আর তুমি সেটা দিব্যি মেনে নিলে! আমরা আমাদের অপমানটা না হয় সহ্য করে নিতে পারি, কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে পারছ না যুধিষ্ঠির যে এইভাবে তোমাকে অগ্রপূজা করল এতে সে তোমাকেই বিদ্রূপ করছে। শিশুপাল বলছেন – *ক্লীবে দারক্রিয়া যাদৃগন্ধে বা রূপদর্শনম্। অরাজ্ঞো রাজবৎ পূজা তথা তে মধুসূদন।।*২/৩৬/২৯। কৃষ্ণ! তুমি অতি মুর্খ, এই ধরণের কাজটা কি রকম জান? একটা ক্লীব মানে নপুংসককে যদি সুন্দরী নারীর সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, এটা হবে তাকে সব থেকে বড় উপহাস করা আর যদি এক অন্ধকে বলা হয় দেখো কি দারুণ এই দৃশ্যটা, তাহলে তার থেকে আর কি বেশী অপমান হতে পারে তার। ঠিক তেমনি তুমি এই সম্মানের যোগ্য নয়, তা সত্ত্বেও তোমাকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে এটাতে কিন্তু তোমাকেই উপহাস করা হয়েছে, রাজ্যহীনের রাজসম্মান অত্যন্ত লজ্জাকর, এটা তুমি বুঝতে পারছ না।

যুধিষ্ঠির তখন দাঁড়িয়ে শিশুপালকে মিষ্টি কথা দিয়ে বোঝাচ্ছেন – যেখানে ব্যাসদেব, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যদের মত ব্যক্তিত্বরা উপস্থিতে আছেন আর এনারা যখন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজাকে মেনে নিয়েছেন সেখানে আপনি কেন এইভাবে মিছিমিছি রেগে গিয়ে আপত্তি করছেন। আপনার কথাগুলো অধর্মযুক্ত, কারণ ধর্মের জ্ঞান থাকলে আপনি কখনই ভীষ্মকে অপমান করতে পারতেন না। যুধিষ্ঠির এই সব বলার পর ভীষ্মও তখন শিশুপালকে বলছেন – হে শিশুপাল, এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের থেকে বড় কেউ নেই। এমন কেউ নেই যে যাকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে পরাজিত করেননি। এখানে কোন রাজা নেই যে শ্রীকৃষ্ণের তেজের সামনে তাঁদের পরাভব স্বীকার করেননি। তুমি ঠিকই বলেছ শ্রীকৃষ্ণ রাজা নন কিন্তু তাঁর তেজের সামনে কোন রাজাই দাঁড়াতে পারবে না। তুমি বলছ শ্রীকৃষ্ণ পূজনীয় নন, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না যে, অচ্যুত শুধু আমাদেরই অর্চনীয় নন, তিনি সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। ভীষ্ম এখানে ঘুরিয়ে বলতে চাইছেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তুমি যে কথাগুলো শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বলেছ এগুলো সবই ভ্রান্ত, কারণ *জগৎ সর্বঞ্চ বার্ষ্ণেয়ে নিখিলেন প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাৎ সৎস্বপি বৃদ্ধেষু কৃষ্ণমর্চ্চামি নেতরান্।।*২/৩৭/১০। সমস্ত জগৎ শ্রীকৃষ্ণেই প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সবারই পূজনীয়, তুমি আর এই ধরণের কথা বলো না। এখানে এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে উল্লেখ করা হল। ভাগবতে পরে শ্রীকৃষ্ণকে সব সময় পুরো ভগবান রূপেই দেখান হয়েছে। ভীষ্ম বলছেন – শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে গুণের সমাবেশ সেটাকে মাথায় রেখেই তাঁকে অগ্রপূজা নিবেদন করা হয়েছে। পরের দিকে মনুস্মৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে সম্মান কাকে দিতে হয়। এখানে ভীষ্মও বলছেন কাকে বৃদ্ধ বলা হবে আর কাকে সম্মান দিতে হবে *জ্ঞানবৃদ্ধো দ্বিজাতীনাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকঃ। বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ।।*২/৩৭/১৬। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁর জ্ঞান বেশী তাঁকেই বৃদ্ধ বলে মনে করা হয় আর তাঁকেই সম্মান দেওয়া হয়, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যাঁর শক্তি বেশী তিনিই বৃদ্ধ আর তাঁকেই সম্মান দেওয়া হয়, বৈশ্যের মধ্যে যাঁর অর্থ বেশী তিনি বৃদ্ধ আর তাঁকেই সম্মান দেওয়া হয় আর শূদ্রে মধ্যে যিনি বয়োঃজেষ্ঠ্য তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণ গুননিধাণ, গুণের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণকেই সম্মান দিতে হবে। এখানে মূল কথা হল, পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে বয়স দেখা হয় না, যাঁর পাণ্ডিত্য বেশী তাঁকেই সম্মান দিতে হবে, কম বয়সীও যদি পাণ্ডিত্যে অগ্রগণ্য হয় তখন তাঁরই কথা শোনা হবে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও তাই, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখা হয় না কার বয়স বেশী বা কম, বৈশ্যদের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ, বয়স কোন ব্যাপার নয়, যার টাকা বেশী তাঁর কথাই শোনা হয়। আমরা এখন ধনবান লোকদেরই বেশী সম্মান দেখাই, তার কারণ আমরা এখন বৈশ্য মানসিকতায় আছি। আবার যখন শুধু মাত্র বয়স্কদেরই সম্মান দেখাতে যাই তখন বুঝতে হবে আমাদের শূদ্র মানিসকতাই বেশী।

ভীষ্ম বলছেন – শ্রীকৃষ্ণ সকল গুণ সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ, পিতা, গুরু ও ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের এতগুলো গুণ রয়েছে, সেইজন্য যুধিষ্ঠির যে শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রপূজা নিবেদন করে সম্মান জানিয়েছে এতে আমরা কোন দোষ করিনি। *কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ। কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্।।*২/৩৭/২১। শ্রীকৃষ্ণ থেকে জগতের উৎপত্তি, শ্রীকৃষ্ণতেই জগতের লয়। এই জগতে যা কিছু আছে, চর অচর সব শ্রীকৃষ্ণের জন্যই আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত আছে, তা নাহলে এগুলো কিছুই প্রকাশিত হত না। হে শিশুপাল তুমি বালকের মত শ্রীকৃষ্ণকে ভুল বুঝতে যেও না। ভীষ্ম এখানে শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা যদি বেদ, বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত আর পুরান এই কটিকে

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সিরিজে সাজাই তাহলে এই শ্লোকটিই হল প্রথম যেখানে অবতারবাদকে নিয়ে আসা হয়েছে। যিনি ভগবান তিনিই সাক্ষাৎ মানব শরীর ধারণ করে জন্ম নিয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু ভগবানের অবতার নন তিনি হলেন বিষ্ণু দেবতার অংশ, এই বিষ্ণু একজন দেবতা, বিষ্ণু এখানে ভগবান নন। দেবতা বিষ্ণু আর ভগবান বিষ্ণুকে আলাদা ভাবে বোঝানোর জন্য পরে বলা হত বিষ্ণু আর মহাবিষ্ণু। কিন্তু পরের দিকে বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করে যত রামায়ণ লেখা হয়েছে সেখানে শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার রূপে দেখানো হয়েছে। হিন্দু ধর্মের পরম্পরাতে সঠিক অর্থে অবতার বলতে যা বোঝায় সেটা প্রথম মহাভারতে এই শ্লোকে আসে – ভগবান যিনি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, আর এই শ্রীকৃষ্ণ থেকেই জগতের উৎপত্তি আর জগতের লয় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই, আর জগতের যা কিছু বিরাজমান সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের জন্যই। আর কি বলা হচ্ছে *এষ প্রকৃতিরব্যক্তা কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ। পরশ্চ সর্ব্বভূতেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যতমোঽচ্যুতঃ।।* ২/৩৭/২২। এই অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ পূজনীয় কেউ নয়, তার কারণ *এষ প্রকৃতিরব্যক্তা কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ* সনাতন কর্তা শ্রীকৃষ্ণ তিনিই আবার অব্যক্ত প্রকৃতি। এখন আমরা বেদান্ত বলতে যা বুঝি বা ন্যায়, বৈশাষিক, এই দর্শনগুলি মহাভারতের সময় তখনও স্পষ্ট ভাবে দাঁড়ায়নি, তখনও এগুলো ভাসা ভাসা চলছে।

ভারতবর্ষে যত দর্শন আছে সব কটি দর্শনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় – আস্তিক দর্শন আর নাস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শনে ছটি দর্শন। আর নাস্তিক দর্শনে তিনটি দর্শন। ভারতে মোট এই নটি দর্শন। এখানে নাস্তিক মানে যে বেদে বিশ্বাস করে বা বেদের কথাকেই শেষ কথা বলে মানে না। তিনটি নাস্তিক দর্শনের মধ্যে প্রথমে আসে চার্বাক দর্শন, চার্বাক দর্শনের লোকদের বলা হয় জড়বাদী, দ্বিতীয় জৈনধর্ম আর তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের আবার চারটে ভাগ, সেইজন্য বলে সব মিলিয়ে ভারতে বারোটি দর্শন আছে। তবে অনেক সময় বৌদ্ধধর্মকে চারটে ভাগে দেখা হয় আবার অনেক সময় একটি দর্শন হিসাবেও দেখা হয়। আস্তিক দর্শন বলছে, বেদে যা কিছু তার সবটাই সত্য। আস্তিক দর্শন আবার ছয়টি ভাগে বিভক্ত – সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা আর বেদান্ত। মীমাংসা আর বেদান্তকে অনেকে বলে পূর্বমীমাংসা আর উত্তরমীমাংসা। এই কটি হল ভারতের মূল দর্শন। কিন্তু মূল বলা হলেও এর বাইরেও ভারতে অনেক দর্শন পাওয়া যায়। বিদেশী পণ্ডিতরা যখন ভারতের দর্শন নিয়ে লিখতে শুরু করলেন তখন তাঁরা এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন কিন্তু সর্বদর্শন সংগ্রহ বলে একটি বই আছে, সেখানে আরও অনেক ধরণের দর্শনের কথা বলা হয়েছে। যেমন, পাশুপত, শাক্ত ইত্যাদি এই ধরণের অনেক দর্শন আছে। পরের দিকে এই সব দর্শনের অনুগামীর সংখ্যা এতো কমে গেছে যে, যার জন্য আর এগুলোকে সেইভাবে দর্শন রূপে ধরা হয় না। আর পাশুপত বা শাক্তের মত যত দর্শন আছে এগুলোকেও ঐ ছটি আস্তিক দর্শনের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। আজকে যে দর্শন আমাদের দেশে ঠিক মত চলছে তার মধ্যে মোটামুটি কয়েকটা ছাড়া বাকি গুলো উঠে গেছে। যেমন চার্বাক দর্শন বর্তমানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যুক্তিবাদীদের কাছে। যুক্তিবাদের মত হল, আমাদের চোখের সামনে যে জীবনটা আছে এটাই সব, এর পরে কি হবে, কি হবে না এগুলো আমরা জানিনা, বিশ্বাসও করিনা আর মানতেও চাইনা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যতটুকু জানা যাচ্ছে ততটুকুই আছে এর বাইরে কিছু নেই। মীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা হল ঠিক ঠিক কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ডীদের মতে জীব আছে আর জীবের একটি আত্মা আছে। মানুষ যদি ভালো কাজ করে, যজ্ঞাদি করে পূণ্য সঞ্চয় করে তাহলে মৃত্যুর পর সে স্বর্গে যাবে। সেখানে বেশ কিছু দিন থাকবে, তারপর পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে স্বর্গ থেকে নেমে তাকে আরেকটি শরীর ধারণ করতে হবে। সেই শরীর ধারণ করে আবার কিছু পাপ-পূণ্য করবে, আবার মৃত্যুর পর সে সেই অনুসারে আবার কোন একটা লোকে যাবে। পূর্ব মীমাংসকদের মত অনেকটা ইসলাম আর খ্রীশ্চান ধর্মের মত, শুধু তফাৎ এইটুকু ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে একবার কেউ স্বর্গে চলে গেলে আর তাকে সেখান থেকে আসতে হবে না বা যে নরকে যাবে তাকে নরকেই পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু পূর্ব মীমাংসকদের মতে আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে। পূর্ব মীমাংসকদের দর্শন খুব শক্তিশালী, আর বেদের ব্যাখ্যা এঁরাই সঠিক ভাবে করে গেছেন। বর্তমান যুগে যে কর্মযোগের কথা বলা হয় সেখানে কোথাও না কোথাও এই কর্মকাণ্ডকে অনুসরণ করা হচ্ছে, এই কর্মকাণ্ডকে ব্যাসদেবও নিয়েছিলেন, শঙ্করাচার্যও নিয়েছেন আর স্বামীজীও কর্মকাণ্ডকে নিয়েছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য ও স্বামীজী কর্মকাণ্ডের মধ্যে কিছু সংশোধন করে পূর্বমীমাংসা আর বেদান্তকে সমন্বয় করে একটা নতুন দর্শন দাঁড় করিয়ে দিলেন। এইভাবে মূল পূর্বমীমাংসা এখন ভারত থেকে উঠেই গেল। আর বৈশাষিক আর ন্যায়ের মধ্যে অনেক মিল, বৈশাষিক পরে ন্যায়ের মধ্যে মিশে গেল। ন্যায় এখনও অনেকে অধ্যয়ণ করেন কিন্তু সেই রকম ব্যপক ভাবে ন্যায় দর্শনের অনুগামীদের আর দেখা যায় না, শুধু শাস্ত্রের বিচার করার ক্ষেত্রে অনেক সময় পণ্ডিতরা ন্যায় শাস্ত্রের নিয়মগুলিকে দেখে নেন। এইভাবে ন্যায়ও গেলে উঠে। এখন থেকে গেল সাংখ্য, যোগ আর বেদান্ত। সাংখ্যের ক্ষেত্রে আবার এর কিছু কিছু তত্ত্ব এতো দুর্বল আর যুক্তিতে ঠিক মত দাঁড় করানও যায় না। শঙ্করাচার্যই সাংখ্যকে যুক্তি দিয়ে এমন আক্রমণ করলেন যে সাংখ্যও আর সেই যুক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না। অন্য দিকে স্বামীজী আবার সাংখ্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, বিশেষ

করে সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা কপিল মুনিকে বললেন ভারতের সমস্ত দর্শনের পিতা Father of Indian philosophy। সাংখ্য এমন কিছু কিছু তত্ত্ব দিয়ে গেছে ভারত কিছুতেই সেখান থেকে বেরোতে পারবে না। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে কিছু গোলমাল থেকে গিয়েছিল, আর আদপেই গোলমাল কিনা সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা বলা যেতে পারে এই গোলমাল গুলিকে নিয়ে শঙ্করাচার্য সাংখ্য দর্শনকে একেবারে তুলোধুনো করে ছেড়েছেন। সাংখ্য দর্শনেরই পরিমার্জিত উন্নত দর্শন হল যোগ দর্শন। এখন তাই সাংখ্য দর্শনও আর পাওয়া যায় না, থেকে গেল বেদান্ত আর যোগ। কোন কোন বিষয়ে গিয়ে বেদান্ত আর যোগে এত বেশী মিল যে বোঝা যায় না কোনটা যোগ আর কোনটা বেদান্ত। কারণ বেদান্ত যোগের এত কিছু নিজের ভেতরে নিয়ে নিয়েছে আবার যোগও বেদান্তের এত কিছু জিনিষ নিয়ে নিয়েছে যে যতক্ষণ না উপযুক্ত আচার্যের কাছে একটা সুনির্দিষ্ট পন্থায় অধ্যয়ণ না করা হয় বোঝা যাবে না কোনটা বেদান্ত আর কোনটা যোগ।

সাংখ্য দর্শনে মূল দুটো – পুরুষ ও প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব আমাদের সমস্ত শাস্ত্রেই ঘুরে ঘুরে নানান ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাংখ্য মনে করে পুরুষ আর প্রকৃতি হল দুটো আলাদা স্বাধীন সত্তা, পুরুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, প্রকৃতি পুরুষের উপর নির্ভর করে না। এখানে কিন্তু পুরুষ বলতে পুরুষ মানুষ আর প্রকৃতি মানে নারীকে বলা হচ্ছে না, সাংখ্যের পুরুষ আর প্রকৃতির সঙ্গে নারী আর পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই, এখানে পুরুষ আর প্রকৃতি মানে চৈতন্য সত্তা আর জড় সত্তা। সাংখ্যে পুরুষ মানে চৈতন্য আর প্রকৃতি মানে জড়/শক্তি। এই দুটোকে সংক্ষেপে বলে চিৎ আর জড়, দুটোর মিলন হলে বলা হয় চিজ্জড়গ্রন্থি। নারী আর পুরুষের সংযোগ হলে যেমন সৃষ্টি হয় ঠিক তেমন চিৎ আর জড়ের মিলন হলে সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এটা হল সাংখ্যের মত, সাংখ্য থেকে এই মত নিয়েছে যোগ, আর সাংখ্য আর যোগ থেকে নিয়েছে বেদান্ত। বেদান্ত এখন পুরোপুরি এই মতেই চলে। এই প্রকৃতি আবার তিন ধরণের পার্টিকেলস্ দিয়ে তৈরী, সত্ত্ব, রজ ও তম। এই সত্ত্ব, রজ ও তম যখন পরস্পরের সাথে সংমিশ্রণ হতে থাকে সৃষ্টি এগোতে আরম্ভ করে। প্রথম দিকে এই তিনটে সাম্য অবস্থায় থাকে, কিন্তু যখনই এই সাম্য ভাব নষ্ট হয়ে যায় তখনই এদের সংমিশ্রণ হতে থাকে। যখন সাম্য অবস্থায় চলে যায় তখন সৃষ্টির লয় হয়ে যায় আর যখনই বৈষম্য এসে যায় তখনই সৃষ্টি এগোতে শুরু করে, বৈষম্য মানেই সৃষ্টি। কম্যুনিস্টরা এখন সাম্যবাদের কথা বলে, আমাদের মুনি ঋষিরা এই সাম্যের কথা অনেক আগেই বলে গেছেন, কিন্তু সাম্য মানেই সৃষ্টির নাশ আর সাম্য ভঙ্গ হয়ে গেলেই সৃষ্টি চলবে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে সাম্য অবস্থায় আছে, এখন এই সাম্যটা ভঙ্গ হবে কি করে? সাংখ্যবাদীরা বলেন এই যে পুরুষ মানে চৈতন্য যখন প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখন প্রকৃতি নড়ে ওঠে। প্রকৃতি যখন নড়ে ওঠে তখন এই তিনটের বৈষম্য অবস্থায় চলে যায়। এখানে এসে বেদান্ত সাংখ্যবাদীদের আক্রমণ করে, পুরুষকে কে প্রকৃতির কাছে নিয়ে আসে? পুরুষ হল চৈতন্য সত্তা, সে নিজের আনন্দে মত্ত হয়ে আছে, সে কেন যাবে প্রকৃতির কাছে? জেনেশুনে পুরুষ প্রকৃতির বন্ধনে কেন আবদ্ধ হতে যাবে? আর প্রকৃতির তো সাহসই হবে না পুরুষের কাছে আসার। এগুলোই হল বেদান্তের খুব ক্ষুরধার যুক্তি। বেদান্ত সাংখ্যবাদীদের এইভাবে আক্রমণ করলেও সাংখ্যের কিছু কিছু জিনিষকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয়। বেদান্ত সাংখ্যের প্রকৃতিকে বানিয়ে দিল মায়া। বেদান্ত বলছে, এই চৈতন্যই সব কিছু হয়েছে, কিন্তু এই মায়ার আবরণের ভেতর দিয়ে যখন দেখি তখন এই জগতটাকে দেখছি, কিন্তু বাস্তবে এই জগত বলে কিছু নেই, চৈতন্য সত্তা ছাড়া কিছু নেই। যারা শক্তির আরাধণা করে তার সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়াকে বলবে শক্তি, মা কালী, মা দুর্গা। তাহলে প্রকৃতি, মায়া ও শক্তি এই তিনটে হয়ে গেল এক। কিন্তু তিনটে দর্শনের পরিভাষার ব্যাখাতে একটু একটু পার্থক্য এসে যায়। কিন্তু মূল ভাব পুরুষ মানে চৈতন্য সত্তা আর প্রকৃতি সত্তা থাকবেই। সাংখ্যে যেটা গোলমাল করে তা হল, এরা বলবে পুরুষ যেটা রয়েছে এটা অনন্ত, গঙ্গা নদী বয়ে যাচ্ছে তার অনন্ত জলরাশি বয়ে যাচ্ছে আর তার পাশেই প্রকৃতি নদী বয়ে যাচ্ছে তারও অনন্ত জলরাশি। মাঝে মাঝে কোথাও এসে এই দুটো নদী মিশে যায় তখন সৃষ্টি চলতে থাকল। সৃষ্টি কিছু দিন চলার পর আবার কোথাও এসে এদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তখন সৃষ্টির লয় হয়ে গেল। এইভাবে একবার মিশছে আর কখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কখন সৃষ্টি হচ্ছে কখন আবার সৃষ্টি লয় হয়ে যাচ্ছে। ইংরাজী eightকে বা বাংলা চারকে আড়াআড়ি ভাবে লিখলে যেমন দেখাবে এই পুরুষ প্রকৃতির সৃষ্টি ও লয়ও অনেকটা সেই রকম দেখাবে। এই লীলা খেলা চলছে। কবে থেকে চলছে? অনন্ত কাল ধরে। কত দিন ধরে চলবে? অনন্ত কাল ধরে চলবে, এইটাই চলছে।

বেদান্ত কিন্তু এই লীলাখেলাকে মানবে না। বেদান্ত বলবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আছেন, আর প্রকৃতি বা মায়া এসে মাঝে মাঝে সচ্চিদানন্দকে ঢেকে ফেলে। তখন যেন মনে হয় সৃষ্টি হল। আবার যখন এই আবরণটা সরে যায় তখন যেমন ছিল তেমনই থাকল। কিন্তু মূল জিনিশ একটাই থাকছে, চৈতন্য। চৈতন্য আর তার আবরণ, মায়া যখন ঢেকে দেয়। এই চৈতন্যেকে অনেক নামে সম্বোধন করা হয়। তার মধ্যে একটি নাম কর্তা, যেখান থেকে কর্তাভজা সম্প্রদায় এসেছে।

সেইজন্য ভগবানকে বলা হয় কর্তা। আমাদের যত আস্তিক দর্শন আছে সবাই যেভাবেই আলোচনা করুক সবাই এই চৈতন্য সত্তাকে আনবে আর জড় সত্তাকে আনবে। এখন জড় সত্তাকে যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, প্রকৃতিই বলুক, মায়া কিংবা শক্তি বলুক, কালী, দূর্গা যাই আনা হোক না কেন এই দুটো জিনিষকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমার সামনে টেবিল রয়েছে, গ্লাশ রয়েছে, আমি বুঝতে পারছি এগুলো জড় আর আমি চৈতন্য। কিন্তু আমি চৈতন্য আর এগুলো জড় এই চৈতন্য আর জড় হল কি করে? আমার ভেতরে দুটি সত্তা আছে আর এদের ভেতরে একটি সত্তা আছে। এই দুটো হল শুধু প্রকৃতি আর আমি হলাম পুরুষ আর প্রকৃতির সংমিশ্রণ। এটা আমি আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলছি। কিন্তু ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে কিছু একটা দর্শন করেছিলেন, সেখান থেকে তাঁরা এটাকে জানলেন। আর এগুলো দুই একজন ঋষিরাই চিন্তা করেননি। আজ থেকে আট হাজার বছর আগে আর তারপর থেকে হাজার হাজার ঋষিরা নিজেদের চিন্তার জগতে হারিয়ে আছেন, ধ্যান ধারণা করছেন, পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছেন। তার ফলে স্বাভাবিক ভাবে আমাদের দর্শনের শেষ নেই। এখনও আমরা জানিনা আমাদের ভারতবর্ষে কত লক্ষ লক্ষ পাণ্ডুলিপি আকারে ছাপা না হয়ে পড়ে আছে। তবে মূল জিনিষ গুলো আমাদের কাছে ছাপার অক্ষরে এসে গেছে, কিন্তু কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ হাজার হাজার তত্ত্ব এখনো সামনেই আসেনি। কিন্তু মূল জিনিষ গুলো দেখেই আমাদের চিন্তার জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যায়, কত সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক একেকটি তত্ত্বের সাথে জড়িয়ে আছে।

যেমন আমি দেখছি এখানে এই জড় আছে আর আমি হলাম জড় আর চৈতন্যের সংমিশ্রণ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানের গভীরে গিয়ে সমাধির অবস্থায় দেখছেন শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই। তাহলে তিনটে সত্তা এসে গেল, একটা শুদ্ধ চৈতন্য অবস্থা, শুদ্ধ জড় অবস্থা এবং আরেকটা চৈতন্যের আর জড়ের সংমিশ্রণ। এই তিনটের যোগ কোথায় আর এই তিনটের কি সম্পর্ক? শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই ব্যাখ্যা করেবেন না এই তিনটে সত্তার সম্পর্ক কি। ব্যাখ্যা সব সময় করে পরের প্রজন্ম। সমাধিবান পুরুষ কখনই এই আলোচনা করতে যাবেন না। কিন্তু যাঁরা ব্যাখ্যা করতে আসেন তাঁদের বুদ্ধিকে লাগাতে হয়। বুদ্ধি যখনই লাগানো হয় তখনই কিন্তু তাতে গোলমাল দেখা দেবে। কারণ বুদ্ধির এলাকায় যখনই ঢুকে গেলেন তখন পুরো জিনিষটা তছনছ হয়ে গেল, কারণ বুদ্ধি নিজেই হল জড় আর সে নিজেই প্রকৃতির এলাকার লোক। তাহলে জড় চৈতন্যকে জানবে কি করে! বুদ্ধির পক্ষে চৈতন্যকে জানার কোন উপায় নেই। ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই, যিশুও এই একই কথা বলছেন অন্য ভাবে, মহম্মদও বলছেন তিনি এক। তাহলে এই শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ জড় আর চৈতন্য ও জড়ের সংমিশ্রণে যত জীব আছে, এই তিনটে সত্তাকে মেলানো যাবে কি করে। যিনি আল্লা, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনিই একমাত্র যদি হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর থেকে এই জড়টা এলো কোত্থেকে? আসলে এর উত্তর কেউই দিতে পারেন না। ঋষিদের পরম্পরার শিষ্যরা যুক্তি তর্ক দিয়ে এইটাকে দাঁড় করান। এই যুক্তি তর্কের মধ্যে যেটা সব থেকে যুক্তি সম্মত সেটা হল কপিল মুনি যে সাংখ্য দর্শন দিয়ে গেছেন। সাংখ্য বলছে পুরুষ আর প্রকৃতি দুটো আলাদা সত্তা। এখানে আবার অনেক গুলি প্রশ্ন এসে যায়। এদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা কি? প্রকৃতিটা কোথা থেকে এসেছে, তাকে কি পুরুষ জন্ম দিয়েছে? যদি পুরুষের থেকে জন্ম হয়ে থাকে তাহলে পুরুষ আর প্রকৃতির বিভেদ থাকল না। আর এই দুটো সত্তা যদি প্রথম থেকেই থাকে তাহলে এদের দুজনের মালিক আরেকজন কাউকে থাকতে হবে, এদের দুজনকে কে কাছে নিয়ে আসছে? পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনের জন্য একজন ভগবানের প্রয়োজন হবে। তখন আবার ভগবান হয়ে গেল, আত্মা হয়ে গেল, পুরুষ এসে গেল আর জড় চারটে সত্তা এসে গেল। সেমেটিক ধর্ম মোটামুটি এই ব্যাপারটাকেই নেয়। ভগবান আছেন, আত্মা আছেন আরে এদিকে জড় আছে, ভগবানের ইচ্ছাতেই এই দুটো মিলে যাচ্ছে। এখানে এসে তিনটে সত্তা হয়ে গেল। তিনটে সত্তা হয়ে গেলে আবার এটা মাধ্বাচার্যের মত হয়ে যায়। দ্বৈতবাদে অনেক গণ্ডগোল হয়ে যায়। বেদান্ত যেমন এদের সবাইকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দেয় অন্য দিকে বেদান্তকেও দ্বৈতবাদীরা বেদান্তের মায়ার উপর আক্রমণ করে। বেদান্তের এই একটা জায়গাতেই আক্রমণ করা হয় কিন্তু বাকি যত দর্শন আছে তাদের অনেক ফাঁক থাকাতে আক্রমণটাও অনেক বেশী দিক দিয়ে হয়।

জড়, চৈতন্য আর চিজ্জড়ের সম্পর্কের ব্যাপারে বেদান্ত যে মায়ার কথা বলছে এটাকে যতই দুর্বল হোক কিন্তু সম্পর্কের এই ব্যাপারটাকে কেউ কোনদিন সরাতে পারবে না। আমরা যেটাই বলিনা কেন সেটা আমরা বুদ্ধির শক্তিতে বলছি কিন্তু বুদ্ধি নিজে হচ্ছে জড়, জড় দিয়ে চৈতন্যকে মাপার চেষ্টা কোন দিনই সম্ভব নয়। আমরা বলতে পারি ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা বললে যুক্তিতে দুর্বল থেকে গেল, ভগবানের হঠাৎ কেন ইচ্ছা হল! আপনি বলতে পারেন এটা মিথ্যা, মিথ্যা কি করে বলছেন, আমি তো চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। যেদিক দিয়েই এই জড় আর চৈতন্যের

মিলনকে আর জড় আর শুদ্ধ চৈতন্যকে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন একটা কিছু গোলমাল থেকে যাবে। এটাকে কিছুতেই পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা যাবে না।

এখানে ভীষ্ম বলছেন - *এষ প্রকৃতিরব্যক্তা কর্তা চৈব সনাতনঃ* – শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন অব্যক্ত প্রকৃত, তিনিই সনাতন কর্তা। কর্তা সবাই হতে পারে কিন্তু সনাতন কর্তা একজনই, তিনি ভগবান, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছেন। বেদান্ত মতে ভগবান নিজে কিছু রচনা করেন না, তিনি প্রকৃতিকে আশ্রয় নিয়ে রচনা করেন। প্রকৃতির আরেকটি না অব্যক্ত। অব্যক্ত মানে, যেটা ব্যক্ত হয় না বা যাকে জানা যায় না। শ্রীকৃষ্ণই হলেন প্রকৃতি তিনিই আবার পুরুষ। এই মতটাকেই গীতাতে পাওয়া যাবে, যেখানে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন আমার দুটি প্রকৃতি, পরা ও অপরা প্রকৃতি। আমিই দুই হই, আমার যে নিকৃষ্ট রূপ সেটা হল প্রকৃতি আমার যে প্রকৃষ্ট রূপ সেটাই পুরুষ। এইভাবে এই দুটোকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে যখন এই দিক থেকে দেখবে আমি হলাম চৈতন্য অন্য দিক থেকে যখন দেখবে আমি হলাম জড়। কারণ জড় আর চৈতন্যের কোন ভেদ নেই। গীতার মতে যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। যিনি শিব তিনিই শক্তি, তিনিই কালী। আমাদের সিদ্ধ পুরুষরা চৈতন্য আর জড়কে এই ভাবে মিলিয়েছেন। ধ্যানের গভীরে গিয়ে তাঁরা এই তত্ত্বকে দর্শন করেছেন, সমাধি থেকে উঠে এসে তাঁরা মুখে সেই উপলব্ধিকে মুখে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর শিষ্যরা গুরুর মুখের কথাকে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। ব্যাসদেবের এটাই খুব দৃঢ় মত, যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই কালী, কালী হলেন আদ্যাশক্তি আবার কালীই হলেন পরব্রহ্ম। শিশুপাল তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে বুঝতে পারছো না, এই যে শ্রীকৃষ্ণ তিনিই পরমপুরুষ তিনিই আবার পরমাপ্রকৃতি। এটাই সাংখ্যের মত, এই সাংখ্যের মত পরে যোগ দর্শন নিয়েছে এবং বেদান্তও এই মত নিয়েছে।

প্রকৃতি যখন পুরুষের কাছে আসে তখন প্রকৃতি নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করে। আর সেখান থেকেই নানা রকমের প্রাণীর উৎপত্তি হতে থাকে। ভীষ্ম বলছেন, এই যে এখানে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান ইনিই মধুকৈটভের বধ করছিলেন। এই মধুকৈটভ বধের কাহিনী আমরা পাই চণ্ডীতে। ভীষ্ম বলছেন, শ্রীকৃষ্ণই এর আগে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অবতার রূপ ধারণ করেছিলেন, শিশুপাল আমি তার কয়েকটি বিবরণ সংক্ষেপে তোমাকে বলছি। শ্রীকৃষ্ণের অবতারের বর্ণনা আমরা ভাগবতে আরও বিস্তৃত ও সুন্দর ভাবে পাব। তারপর ভীষ্ম বলছেন, শ্রীকৃষ্ণই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুর সৃষ্টি তাঁর থেকেই হয়েছে, তুমি এই রকম ভুল বুঝে শ্রীকৃষ্ণের নামে কিছু বলতে যেও না, তিনিই ভগবান, তিনিই অবতার হয়ে অসংখ্য লীলা করেছেন।

এরপরে মধুকৈটভ উপাখ্যান, যেখানে ভগবান বিষ্ণু মধুকৈটভকে বধ করেছিলেন। যখনই ভগবানের অবতারের কথা আসে তখন প্রায়ই আমরা বিষ্ণু এই নামটা পাই। বেদে বিষ্ণুকে দেখানো হয় বারোজন আদিত্যের মধ্যে একজন আদিত্য রূপে। পরে এই বিষ্ণুকেই রূপান্তরিত করে নিয়ে আসা হল মহাবিষ্ণুতে। যিনি ভগবান, অনন্ত, উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম বা আত্মা তাঁরই একটা মুখোশ দিয়ে দেওয়া হল, যে মুখোশটা বিষ্ণুর। যিনি অনন্ত, যিনি নির্গুণ নিরাকার তাঁর ধারণা করা যায় না, তখন তাঁর একটা মুখোশ দিতে হয়। মানুষ সাধনার পথে যে সগুণ সাকার রূপকে অবলম্বন করে এগোয়, যখন তিনি সিদ্ধি লাভ করেন, অর্থাৎ তিনি যখন দেখে নিলেন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ হলেন নিরাকার নির্গুণ তারপর তিনি যখন তাঁর মনকে বাহ্য জগতে নামিয়ে আনেন তখন সেই নির্গুণ নিরাকার শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকে দেখেন সগুণ সাকারের একটা মুখ। সেই মুখটা সব সময় অবশ্যই হবে, যে মুখকে অবলম্বন করে তাঁর সাধনার যাত্রা শুরু হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধির অবস্থায় দেখছেন সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, সেই শুদ্ধ চৈতন্যই সব কিছু হয়েছেন। তাঁর সাধনা শুরু হয়েছিল মা ভবতারিণীকে অবলম্বন করে, সমাধি অবস্থায় দেখছেন সেই মা কালী হলেন শুদ্ধ চৈতন্য সচ্চিদানন্দময়ী। মহম্মদ সাধনা শুরু করার পর নির্গুণ নিরাকারের অনুভব করছেন, তারপর সেই নির্গুণ নিরাকারই সগুণ সাকার হলেন আল্লা রূপে। তার আগে এই আল্লাই ছিলেন মক্কাতে অনেক ছোট বড় দেবতাদের মধ্যে একজন দেবতা। মহম্মদের সিদ্ধির পর আল্লা হয়ে গেলেন সর্বোচ্চ দেবতা। বিষ্ণুও বেদের অনেক দেবী দেবতাদের মধ্যে একজন দেবতা ছিলেন। তারপর একজন শিবকে অবলম্বন করে সিদ্ধি লাভের পর শিব হয়ে গেলেন মহা দেবতা। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক দর্শন করেছেন তিনি দেখছেন বিষ্ণু, শিব, আল্লা সবই এক। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা এটা বুঝতে পারেনা। শিষ্যরা নাম আর রূপ নিয়ে বিবাদ করে। কিন্তু যাঁরা আধিকারিক পুরুষ তিনি নাম ও রূপের পারে অনন্ত সত্তাকেই দেখেন।

এখানে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখনো হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ আসলে কে? এই আদর্শটাই পরে হিন্দুধর্মে অবতার তত্ত্ব রূপে খুব প্রচলিত হয়ে গেল। ভগবান যিনি, তিনি ব্যক্ত নন অব্যক্তও নন। ব্যক্ত হল সেটাই যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যায়

আর অব্যক্ত মানে যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। দিনের আকাশে তারা আছে কিন্তু অব্যক্ত কারণ চোখ ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন যদি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়ে যায় তখন ভালো টেলিস্কোপ দিয়ে তারাগুলো দেখা যায়, তারা গুলো পুরোপুরি অব্যক্ত নয়। কিন্তু ভগবান পুরোপুরি অব্যক্ত। কারণ ভগবানকে ইন্দ্রিয় দ্বারা কখনই জানা যাবে না। ভগবানের এই অব্যক্ত ভাবে এসে দুটো আলাদা পথ বেরিয়ে আসে। যারা আস্তিক তারা বলবে ভগবানকে এই চোখ দিয়ে দেখা যাবে না, এই কান দিয়ে তাঁকে শোনা যাবে না ইত্যাদি আর এই মন বুদ্ধি ভগবানকে কখন ধরতে পারবে না। যারা নাস্তিক তার এই যুক্তিকেই হাতিয়ার করবে। ভগবানকে যখন কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, তাহলে ভগবান বলে কিছু নেই, ভগবান নাস্তি, ন অস্তি। আবার বলছেন, যিনি অব্যক্ত তিনিই আবার রূপ ধারণ করেন – ব্যক্ত লিঙ্গস্তো, লিঙ্গ মানে চিহ্নিত করা, যাকে চিহ্নিত করা যায়। আমাদের শাস্ত্রে লিঙ্গ খুব প্রাচীন শব্দ, লিঙ্গ মানে যেটা দিয়ে তাঁকে জানা যায়। যিনি অব্যক্ত তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু লিঙ্গদেহ বললে বোঝাচ্ছে তাঁকে এবার জানা যাচ্ছে। শিবলিঙ্গ শব্দটা এইখান থেকে এসেছে, এই শিবলিঙ্গ, যা শিবের চিহ্ন, তাকে অবলম্বন করে তুমি সেই পরমাত্মাতেই পৌঁছে যাবে। কিন্তু বিদেশীরা এর অর্থ খারাপ অর্থে নিলেন। কামাখ্যাতে যেমন মাতৃযোনির পূজো করা হয়, মানে প্রকৃতি থেকেই সব কিছু বেরিয়ে এসেছে, যাকে প্রকৃতির লিঙ্গ রূপে দেখা হচ্ছে।

এই শ্রীকৃষ্ণ পুরাকালের নারায়ণ রূপে অবস্থান করেছিলেন। এখানে আবার বোঝার আছে, নারায়ণ আর বিষ্ণু আলাদা। নারায়ণ হলেন স্বয়ং ভগবান, নারায়ণের আবার দেবতার রূপ নেই কিন্তু বিষ্ণুর দুটো রূপ, একটা দেবতা রূপ বিষ্ণু আরেকটি মহাবিষ্ণু রূপী ভগবান। বিষ্ণু হলে বারোজন আদিত্যের একজন আদিত্য আর মহাবিষ্ণুকে নারায়ণের সঙ্গে এক করা হয়। এখানে বলা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ হলেন পুরাকালের নারায়ণ, ঠিক তেমনি বিষ্ণু যিনি তিনি সেই নারায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণকেও বলা হয় নারায়ণ, নারায়ণ শব্দটা যখন যাঁর সাথে যুক্ত হয়ে যায় তখন দেখাচ্ছে ভগবানকে। তিনিই আদিপুরুষ, এই আদিপুরুষকেই বলা হয় সহস্রশীরসঃ পুরুষঃ। সেই আদিপুরুষের সহস্র মাথা, সহস্র চোখ, সহস্র হাত পা ইত্যাদি। সহস্র মানে অনন্ত, সেই ভগবানের সব জায়গায় মাথা, সেই ভগবানের সব জায়গায় চোখ। তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাই সব জায়গাতেই তিনি বিরাজ করছেন, সব কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন। এই অনন্তের ভাবটাকে বোঝানোর জন্য আমাদের শাস্ত্রে বিভিন্ন রকমের উপমাকে নিয়ে আসা হয়। বেদে যেমন বলছে, বরুণ দেবতার চর সব জায়গায় আছে, যে যা কাজ করছে, যত একান্তেই লুকিয়ে করুক বরুণ দেবতা নিজের চরের মাধ্যমে সব জানতে পারেন, সব দেখতে পান, সব শুনতে পান। এটাই বলতে চাইছে যে ভগবান অনন্ত, তিনি সব জায়গায় বিদ্যমান, সব জায়াগায় তিনি আছেন।

সেই সর্বব্যাপী চৈতন্য স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাজার হাজার অবতার রূপ ধারণ করেছিলেন। এই অবতারের ধারণা আমাদের হিন্দুধর্মের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। মহাভারত আর ভাগবত রচনার আগে হিন্দুধর্মে অবতারের ধারণা আসেনি। বেদ, উপনিষদ আর বাল্মীকি রামায়ণে অবতারের ধারণা নেই। মহাভারত আর ভাগবতে অবতারের ধারণা আসার পর মানুষ এই ধারণাকে খুব গভীর ভাবে মনের মধ্যে বসিয়ে নিয়ছে। এখানে যে হাজার হাজার অবতারের কথা বলা হচ্ছে, ভগবানের অবতার হওয়াতে এতে কোন আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু ভাগবতে আমরা চব্বিশ অবতারের বর্ণনা পাই, পরে সেখান থেকে এসে যায় দশ অবতারের কথা। এই দশ অবতারই পরে জনপ্রিয় হয়ে মানুষের মনের মধ্যে বসে গেছে। গীতাতে আবার বলা হচ্ছে যেখানেই ভগবানের বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় সেখানেই ভগবানের অবতার এসে যান। সেই থেকে ভাগবতে এসেছে অংশ অবতার, কলা অবতার ইত্যাদি। অবতারের শক্তির তারতম্য আছে, যাঁর মধ্যে ভগবানের পূর্ণ শক্তির আবির্ভাব হয়েছে তাঁকে বলা হবে পূর্ণাবতার। শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন বলা হয় পূর্ণাবতার। আবার অনেক সময় বলা হয় – বাকিরা সবাই অবতার আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন অবতারি, যেখান থেকে অবতাররা আসেন। এগুলো সবই শব্দজাল ছাড়া কিছু না। কিন্তু শক্তির তারতম্য হয়। বিদ্যাসাগর ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন – ভগবান কি কাউকে কম শক্তি কাউকে বেশী শক্তি দিয়েছেন। ঠাকুর উত্তরে বলছেন, অবশ্যই, তা নাহলে একজন লোক দশ জনকে হারিয়ে দিচ্ছে কি করে, শক্তির তো তফাৎ আছেই। যেখানেই একটা শক্তির বিকাশ বেশী দেখা যায় তখন বুঝতে হবে সেখানে ঈশ্বরীয় শক্তির বিকাশ বেশী।

ভীষ্ম এত কথা বলার পর এবার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কাহিনী বলছেন, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারে জন্ম নিয়েছিলেন, কিভাবে তিনি গোকুলে বড় হলেন আর কিভাবে তিনি কংসকে বধ করলেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এত কিছু বলার পরও যুধিষ্ঠির কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেছেন, কারণ শিশুপাল রেগে রয়েছেন। আর শিশুপালও ভীষ্মের এই শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি শুনে আরও প্রচণ্ড রেগে গেছে। মহাভারতের এই অধ্যায়টি খুব মজার। এখানে একজন ব্যক্তিকে যারা শ্রদ্ধা ভক্তি করে

অতিমানব রূপে দেখছে আর সেই ব্যক্তিকে যারা পছন্দ করে না তারা সেই ব্যক্তিকে কিভাবে দেখে, তার একটা বিশদ বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে। শিশুপাল ভীষ্মের মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা শুনে ভীষ্মকে গালাগাল দিয়ে বলছেন – কুলপাংসন্। কুলপাংসন শব্দের অর্থ যে নিজের কুলকে কলঙ্কিত করেছে। *বিভীষিকাভির্বহ্বীভির্ভীশয়ন্ সর্ব্বপার্থিবান্। ন ব্যপত্রপসে কস্মাদ্বৃদ্ধঃ সন্ কুলপাংসন্।।*২/৪০/১। কুলকুলঙ্ক ভীষ্ম! তুমি বৃদ্ধ হয়েও এই রকম বিভীষিকাময় নানান অলীক বাক্য দিয়ে সবাইকে ভয় দেখাতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? *যুক্তমেতত্তৃতীয়ায়াং প্রকৃতৌ তিষ্ঠতা ত্বয়া। বক্তুং ধর্ম্মাদপেতার্থং ত্বং হি সর্ব্বকুরূত্তমঃ।।*২/৪০/২। তুমি তৃতীয় প্রকৃতিতে অবস্থিত, এটা একটা ভীষ্মের প্রতি গালাগাল। প্রকৃতি দুটো, নারী আর পুরুষ। কিন্তু তুমি নারীও নও পুরুষ নও মানে তুমি নপুংসক। নপুংসক কি না, তাই এই ধরণের ধর্মহীন কথা বলা তোমার পক্ষেই সম্ভব। তোমার মধ্যে যদি পৌরুষ থাকত বা নারীসুলভ ভাব থাকত তাহলে কিন্তু তুমি এই অধর্মীয় বাক্য বলতে না। কিন্তু কি আশ্চর্যের, তথাপি কুরু বংশের সবাই তোমাকে কি করে যে কুরুকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। শিশুপাল খুব করে গালাগাল দিচ্ছে। মানুষ যখন রেগে যায় তখন কাকে কিভাবে কি কথা বলবে সেই হিতাহিত জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। তুমি যে বললে শ্রীকৃষ্ণ হেন করেছে তেন করেছে, পুতনা নামে একটি নারীকে বধ করেছে। ঠিক আছে তাহলে শোন, আমারও কিছু বলার আছে। কৃষ্ণ একটা গোয়ালা, গোয়ালাকে একটা সাধারণ মানুষও সম্মান দেয় না, আর তুমি একজন জ্ঞানী হয়ে এই গোয়ালাকে সম্মান দিতে গিয়ে তোমার এতটুকু লজ্জাবোধ হচ্ছে না!

শিশুপালের মত অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে গোয়ালা বলে ভুল করে। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন যদুবংশীয়, আর যদুবংশীয়রা ছিল ক্ষত্রিয়। আরও মজার ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের পিসি হলেন কুন্তী, শ্রীকৃষ্ণ যদি গোয়ালা হন তাহলে তাঁর পিসি ক্ষত্রিয় হলেন কি করে! নন্দবাবা আর শ্রীকৃষ্ণের বাবা বসুদেব দুজনে ছিলেন বন্ধু, নন্দবাবা ছিলেন গোয়ালা আর শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালাদের মধ্যে শুধু বড়ই হয়েছিলেন, তাদের সাথে রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। এখনও বহু লোক শ্রীকৃষ্ণ আর গোয়ালাকে মিশিয়ে ফেলে। আরও মজার ব্যাপার যে, যে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে গোয়ালা বলে তাচ্ছিল্য করে গালাগাল দিচ্ছে সেও কিন্তু একই বংশের লোক।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের ব্যঙ্গোক্তি

কৃষ্ণ ছোটবেলাতে একটা পাখীকে মেরে দিয়েছিল আর যুদ্ধ জানে না এই রকম একটা ঘোড়াকে মেরেছিল, সেই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি করছ। শিশুপাল এখানে পাখী বলতে বোঝাচ্ছে বকাসুরকে। বক পাখীর রূপ ধরে একটা অসুর গোকুল থেকে সব কিছু নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। আর কেশি নামে এক দানব ছিল সে একবার ঘোড়ার রূপ ধরে এসেছিল। এখনও বৃন্দাবনে কেশিঘাট আছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ কেশি দানবকে বধ করেছিলেন। অরিষ্টাসুর নামে এক অসুর ষাঁড়ের রূপ নিয়ে এসেছিল, তাকেও শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন। সেটাই শিশুপাল অর্থ করছে কৃষ্ণ একটা পাখী মেরেছে, একটা ঘোড়া মেরেছে আর একটা বলদ মেরেছে। এই নিয়ে এত লাফালাফির কি আছে! কৃষ্ণ নাকি বাচ্চা বয়সে একটা লাথি মেরে একটা গাড়িকে উল্টে ফেলে দিয়েছিল। গাড়ি একটা জড় পদার্থ, তার ব্যালেন্স থাকে না, তাতে পা লাগাতে সেটা ব্যালেন্স হারিয়ে উল্টে গেল তাতে কি বাহাদুরি আছে! কৃষ্ণ আখ গাছের মত লিকলিকে দুটো বাচ্চা অর্জুন গাছকে ভেঙ্গে দিয়েছিল আর তাই নিয়ে কি মাতামাতি! কাহিনী হল, দুজন যক্ষ অভিশপ্ত হয়ে যমলা আর অর্জুন নামে দুটো অর্জুন বৃক্ষ হয়ে গিয়েছিল। এদের বলা হয়েছিল তোমাদের মুক্তি শ্রীকৃষ্ণের হাতেই হবে। একদিন কৃষ্ণকে যশোদা উদখুলের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ উদখুলকে টানতে টানতে ঐ দুটো অর্জুন গাছের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে এমন জোর টান মেরেছেন যে গাছ দুটো ভেঙ্গে গেছে। ভেঙ্গে যেতেই দুজন যক্ষ মুক্তি পেয়ে গেছে। সেইটাই শিশুপাল এখানে বলছেন, দুটো আখ গাছের মত অর্জুন গাছকে ভেঙে দিয়েছে এতে কি হল! শিশুপাল বলছেন – তুমি বলছ গোবর্ধন পর্বতকে নাকি কৃষ্ণ সাতদিন আঙুলে তুলে রেখেছিল। এতে আশ্চর্যের কি আছে! কারণ গোবর্ধন পাহাড়টা একটা উঁইয়ে খাওয়া মাটির ঢিপি। এইভাবে শিশুপাল একটার পর একটা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকে খণ্ডন করে যাচ্ছে।

আমরা এর আগে আলোচনা করেছি পুরান কিভাবে সৃষ্টি হয়। কোন ঘটনা বা কাহিনী এক মুখ থেকে যখন আরেক মুখে যায় তখন সেই কাহিনীটা বাড়তে থাকে, বিশেষ করে যাকে খুব নিন্দা করি বা খুব ভালোবাসি সেই সব ক্ষেত্রে যদি সঠিক অনুসন্ধানের সুযোগ না থাকে তখন এগুলো বাড়তে থাকে। পুরানের ক্ষেত্রে যাকে আমরা ভগবানের অবতার বলে মনে করছি তাঁর লীলা কাহিনীর গপ্পো কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার হিসেব করা যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা হলেন এই

যুগের ভগবান, এখনও তাঁদের অন্তর্ধান দেড়শ বছর অতিক্রান হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁদেরকে নিয়ে গালগপ্পো ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে আসছে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। একটা লেখাতে বেরিয়েছিল গিরিশ ঘোষ এক জায়গায় মদের বোতল নিয়ে মদ খেতে গেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি সেই মদের বোতলকে ডি গুপ্তের ফীভার মিকশ্চারে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। তখন স্বামীজী খুব ধমক দিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কি কাজ মদের বোতলকে ডি গুপ্তের ফীভার মিকশ্চারে পাল্টানো। স্বামীজী খুব কড়া ভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন এই ধরণের গালগপ্পো যেন কখনই না ছাপা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় বড় সাহিত্যিকরা এই সবই লিখে যাচ্ছেন। এখানেও শিশুপাল যা বলছে, যারা এখনকার দিনে কৃষ্ণ নিন্দুক তার এইভাবেই বর্ণনা করবে। কৃষ্ণ একটা পাখীকে বধ করেছে তো কি হয়েছে এমন, কিন্তু যারা কৃষ্ণভক্ত তারা বলবেন, না, ওটা একটা অসুর ছিল। এখন কোনটা ঠিক? আমরা কেউ বলতে পারবো না। আমাদের উদ্দেশ্য হল শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ও ভাবকে আমাদের জীবনে নিয়ে আসা, এগুলোর দিকে মন দিলে এই আদর্শ আর ভাবের হানি হয়ে যায়, তাই এদিকে বেশী যেতে নেই। মহাভারত দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে পুরানের কাহিনী দুভাবে তৈরী হয়। এরপরও শিশুপাল ছাড়ছে না, ভীষ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অপকীর্তিকে নিয়ে বিরাট লম্বা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন।

শিশুপাল বলছেন – ***গোঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নশ্চ সন্ ভীষ্ম! ত্বদ্বাক্যাদ্যদি পূজ্যতে। এবম্ভূতশ্চ যো ভীষ্ম! কথং সস্তবমর্হতি।*** ।২।৪০/১৬। তোমার কথা যদি মেনেও নিই যে কৃষ্ণ বিরাট অনেক কিছু করেছিল, কিন্তু পুতনা তো একটা নারী, আর এই লোকটা তো স্ত্রী হন্তা, আর গোঘ্নঃ, তোমাদের এই কৃষ্ণ গোহত্যা করেছে। ব্রাহ্মণ হত্যা, স্ত্রী হত্যা, গোহত্যা আর ভ্রুণহত্যা হিন্দুদের কাছে বিরাট বড় পাপ। ভ্রুণহত্যা পাপ বলে আগে হিন্দুরা ডিমও খেতো না। এই পাপ হয়ে গেলে এর প্রায়শ্চিত্ত করা খুব কঠিন। এই চারটের সঙ্গে লাগানো থাকতো মদ্যপান। মদ খাওয়া যা আর নারীবধ, গোহত্যা একই। শিশুপাল বলছেন, তোমরা যে তখন থেকে যেভাবে একে ঈশ্বর বলতে শুরু করেছ এতে ওর মাথাটা গেছে আর নিজেও সে ঐভাবে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। কথামৃতে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, তিনিও ঠাকুরের নামে ঠিক এই কথাই বলছেন – তোমরা অবতার অবতার করে করে লোকটির মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ। কারুর বেশী প্রশংসা করে হলে তার মাথাটা ঘুরে যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণের উপর শিশুপালের প্রথম থেকেই জাত ক্রোধ, ভীষ্ম যা যা প্রশংসা করেছিলেন ঠিক তাই তাই বলে সেই প্রশংসাকে নিন্দাতে নামিয়ে দিচ্ছেন। শিশুপাল বলছেন – ***ন গাথাগাথিনং শাস্তি বহু চেদপি গায়তি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি কুলিঙ্গশকুনির্যথা।*** ।২/৪০/১৮। যে গায়ক একটা গান ভুল সুরে অনেক দিন ধরে গাইতে অভ্যেস করে নেয় তাকে যদি এখন শোধরানোর চেষ্টা করা হয় তখন সে নিজেকে শোধারতে চাইবে না। আর বলছেন, কুলিঙ্গ পাখি, যে পাখী সাধারণত হিমালয়ের দিকে থাকে, এই পাখী যখন ডাকে তখন মনে হয় সংস্কৃতে যেন বলছে 'মাসাহস ' মানে বেশী দুঃসাহস করো না। কিন্তু পাখীটা নিজে কি করে, সিংহ মাংস খাওয়ার পর তার দাঁতে অনেক মাংস লেগে থাকে, সিংহতো আর নিজে পরিষ্কার করতে পারেনা, এই পাখীটা গিয়ে লম্বা চঞ্চু দিয়ে সিংহের দাঁত থেকে মাংস টেনে টেনে খায়। একদিকে পাখীটা বলছে 'মাসাহসম্' বেশী দুঃসাহস করো না কিন্তু সে নিজে সিংহের মুখে ঢুকছে। এই পাখীকে আধার করে পরে জাতক কথাতে খুব সুন্দর একটা কাহিনী আসে। ভগবান বুদ্ধ একবার এই কুলিঙ্গ পাখী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। একবার এক সিংহের মুখে একটা হাড় আটকে গিয়েছিল, সিংহের প্রায় দম বন্ধ অবস্থা আর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গর্জন করছে। তখন এই কুলিঙ্গ পাখীটা গিয়ে সিংহকে মুখটা বড় করে হাঁ করতে বলেছে। সিংহ হাঁ করার পর পাখীটা সিংহের মুখে গিয়ে হাড়টা বার করে এনেছে। একদিন পাখীটার কোন খাবার জুটছে না, পাখীটা মাংসাহারী। খিদের জ্বালায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। এদিকে সিংহটা কি একটা শিকার করে তার মাংস খাচ্ছে। পাখীটা গিয়ে সিংহের কাছে ঘুর্ ঘুর্ করছে। সিংহ পাখীটাকে পাত্তা দিচ্ছে না। পাখীটা খিদের জ্বালায় থাকতে না পেরে সিংহকে বলছে – সিংহ ভাই আমি সেদিন গলা থেকে হাড়টাকে বার করে দিয়ে তোমার তো ভালোই করেছিলাম, আমাকে একটু মাংস খেতে দাও। সিংহ তখন বলছে – তুমি আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করে যে জীবন্ত বেরিয়ে আসতে পেরেছিলে এটাই তোমার পরম সৌভাগ্য। ওখানেই তোমার ঋণ শোধ হয়ে গেছে, এর বেশী কিছু আশা করতে যেও না। পাখীটার মনে খুব দুঃখ হয়েছে। এর সঙ্গী পাখীরা তাকে বলছে, তোমার চঞ্চুটাতো খুব ধারালো, তুমি গিয়ে এই ধারালো চঞ্চুটাকে দিয়ে সিংহের চোখে একটা জোর ঠুকরে এসো, ব্যাটা অন্ধ হয়ে যাক। পাখীটা বলছে এই কাজটা কখনই ঠিক হবে না, আমি পারবো না এই নোংরা কাজ করতে। জাতক কাহিনীতে দেখাচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট প্রাণীর মধ্যেও একটা চেতনা থাকে, এই শুভ চেতনা থেকেই সে বিবর্তিত হতে হতে উন্নত প্রাণীতে পরিণত হচ্ছে।

শিশুপালের ভীষ্ম নিন্দা

শিশুপাল প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নামে নিন্দাবাদ করতে থাকলেন। পরে ভীষ্মকেই আবার গালাগাল দিতে শুরু করেছেন। বলছেন – তোমাকে সবাই ধর্মজ্ঞ, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলে সাধুবাদ দেয়। তুমি যদি ঠিক ঠিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক তাহলে কাশীরাজের কন্যা অম্বাকে কেন বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে এলে, অম্বা একজনকে ভালোবেসেছিল, সে তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। যে মেয়ে কোন পুরুষকে ভালোবেসে ফেলে, তার প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছে তখন সেই মেয়েকে আর জোর করে অপহরণ করতে নেই, কারণ ধরেই নেওয়া হয় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। তোমার ভাই বিচিত্রবীর্য্যের জন্য তুমি অম্বিকা আর অম্বালিকাকে নিয়ে এলে, সেই ভাই তাদের সন্তান দিতে পারলো না। আর তোমারই সামনে অন্য একজন এসে তাদের গর্ভে গর্ভ স্থাপন করলে, যেখান থেকে ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু জন্ম নিল। প্রকাশ্য সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে যেখান ব্যাসদেব, যুধিষ্টারাদি সবাই দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে শিশুপাল এই ধরণের কথা বলছে। শিশুপাল কাদের নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন? ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুকে নিয়ে। *দারয়োর্যস্য চান্যেন মিষতঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ। তব জাতান্যপত্যানি সজ্জনাচরিতে পথি।।*২/৪০/২৪। তুমি নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে কর কিনা তাই তোমার চোখের সামনে আরেকজন এসে বিধবার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করল। শিশুপাল যে আপত্তি করছে সেটা তখনকার সমাজে অনুমোদিত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজের একাংশের কাছে এটা গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ বলে মন করা হত আর তারাও অত সহজে কুরুবংশকে ছেড়ে দেয়নি। এই দুর্যোধনও একবার যুধিষ্ঠিরকে বলছে – যার বাপের ঠিক নেই সে আবার বড় বড় ধর্ম কথা বলতে আসছে। অথচ দুর্যোধন ভুলে গিয়েছিল যে তার বাবারও জন্ম এইভাবেই হয়েছিল আর দুর্যোধনের জন্মেও অনেক গণ্ডগোল ছিল। সমাজে একদিকে ঔরস পুত্রের অনুমোদন ছিল আবার অন্য দিকে সমাজের আরেক অংশ এর নিন্দা করে এসেছে। কিন্তু যেহেতু এনারা ছিলেন শাসকগোষ্টি, রাজ্য চালাতেন বলে ইতিহাস এদেরই হয়ে গেছে। পরের দিকের সাহিত্যে এই জিনিষগুলিকে কোথাও বেশী উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু মহাভারতেই শিশুপালের মাধ্যমে এর নিন্দা করা হচ্ছে। তুমি এত বড় একজন বিদ্বান, ধর্মজ্ঞ, বীর হয়ে একটা মেয়ে যে একজন পুরুষের প্রতি অনুরক্ত তাকে তুমি অপহরণ করে নিয়ে এলে আর তার বাকি দুই বোন বিধবা হয়ে গেল আর তোমার চোখের সামনে আরেকজন এসে এই বিধবাদের থেকে জন্ম দিয়ে গেল ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুকে, তুমি নিজে চুপ করে থাকলে। এরপরেও তুমি নিজেকে ধর্মজ্ঞ মনে করছ! *কো হি ধর্ম্মোহস্তি তে ভীষ্ম! ব্রহ্মচর্য্যমিদং বৃথা। যদ্ধারয়সি মোহাত্মা ক্লীবত্বাদ্বা ন সংশয়ঃ।।*২/৪০/২৫। ভীষ্ম! তুমি যে এত ধর্ম ধর্ম করছ, তোমার আবার কিসের ধর্ম! তোমার এই ব্রহ্মচর্য্য, তুমি যে বল আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করছি, এগুলো পুরো ঠগবাজী, কারণ তুমি হচ্ছ ক্লীব, এই ক্লীবত্বকে ঢাকা দেওয়ার জন্য এই ব্রহ্মচর্যের মুখোশ রেখেছ। শিশুপাল আরও বলছেন – *ইষ্টং দত্তমধীতঞ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ। সর্ব্বমেতদপত্যস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।।*২/৪/২৭। কেউ যদি প্রচুর দান করে, স্বাধ্যায় করে, যজ্ঞ করে আর সেই যজ্ঞে প্রচুর দক্ষিণা যদি দেয় তাও তা সন্তানোৎপাদনের ষোল ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হয় না। এই শ্লোকটিতে এটাই দেখাচ্ছে যে আমাদের পরম্পরাতে সন্তানের জন্ম দেওয়াকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হত। এখানে ধর্ম কার্য বলতে যা বোঝায় তার তালিকা দেওয়া হল, যজ্ঞ করা, দান করা, স্বাধ্যায় করা আর প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করা হল ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু সন্তানোৎপন্নের তুলনায় এগুলো ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। পরের দিকে যত শাস্ত্র রচিত হয়েছে সেখানে গিয়ে এই ধারণাটা পাল্টে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাতে এসে এই ধারণাটাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সবার জন্য নয়, যে সংসার করতে চাইছে তার জন্য অন্য পথ। প্রথম আলাপের পর মাস্টার মশাইকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন – তোমার বিয়ে হয়েছে? মাস্টার মশাই বলছেন হ্যাঁ। শুনেই ঠাকুর রামলালকে বলছেন, ওরে রামনেলো বলছে কি! বলে বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর জিজ্ঞেস করছেন – তোমার ছেলে হয়েছে? মাস্টার মশাই বলছেন হ্যাঁ, শনে ঠাকুর বলছেন, যাঃ! এর মধ্যে ছেলেও হয়ে গেছে! আসলে ঠাকুর মাস্টার মশাইকে বলছেন – তোমার শরীরের লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল তুমি ঈশ্বরের পথের পথিক। সেইজন্য ঠাকুর মাস্টার মশাইকে এইভাবে বলেছিলেন। সবার জন্য এই কথা নয়। কথামৃত পড়ে মনে হয় ঠাকুর বুঝি চাইতেন না লোকেরা বিয়ে করুক, তিনি চাইতেন না যেন কারুর সন্তান হোক। আদপেই তাই নয়, একেকটা আধার আছে যারা ঈশ্বরের জন্য নিবেদিত হয়ে আছে। চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয়, যারা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক মার্গের লোক তাঁরা ঠাকুরের কাছে আকর্ষণে চলে আসতেন। ঠাকুরও বুঝতে পারতেন তাঁরা ঈশ্বর মার্গের পথিক। তখনও যদি দেখতেন এঁরা কোন ভোগ বাসনার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তখন তিনি তাঁদের আটকাতে চেষ্টা করতেন, এঁদের জন্যই সম্পূর্ণ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলতেন। সাধারণ লোকের বিয়ে থা করা সন্তানের জন্ম দেওয়াতে ঠাকুর কখনই আপত্তি করছেন না। কিন্তু যে করেই হোক সাধারণ লোকের মাথায় একটা ভুল ধারণা হয়ে গেছে যে ঠাকুর সবার জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন। মহাভারতে আবার সন্তানের জন্ম দেওয়া ধর্মের ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা রূপে দেখান হচ্ছে। শিশুপাল বলছেন *ব্রতোপবাসৈর্বহুভিঃ কৃতং ভবতি ভীষ্ম যৎ।*

সর্বং তদনপত্যস্য মোঘং ভবতি নিশ্চয়াৎ।।২/৪০/২৮। অনেক ব্রত, উপবাস করা সন্তানহীন লোকের কাছে বৃথা। এগুলো হল তখনকার দিনের একটা মত। শেষে শিশুপাল ভীষ্মকে গালাগাল দিয়ে বলছেন – ভীষ্ম তুমি নিঃসন্তান, তোমার বয়স হয়ে গেছে আর মিথ্যা ধর্মের তুমি অনুসরণ করছ, আজ হোক কাল হোক তোমার এই মিথ্যা ধর্মাচরণের জন্য নিজেদের লোকের হাতেই তুমি মারা যাবে।

শিশুপালের জন্ম রহস্য

শিশুপালের এই ধরণের কুটূক্তি শুনে ভীম প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়ে কিছু একটা করতে চাইছেন। তখন ভীষ্ম আবার ভীমকে নিবৃত্ত করে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন। ভীষ্ম বুঝতে পারছেন, পরিস্থিতি যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তাতে কিছু একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। কিন্তু কি হতে চলেছে এখন বুঝতে পারছেন না। ভীষ্ম তখন ভীমকে শিশুপালের জন্মের সময়কার কিছু ঘটনা বলছেন – এই শিশুপাল জন্মেই গাধার মত বিকট ভাবে আওয়াজ করেছিল, আর তার অনেকগুলি হাত আর চোখ ছিল। শিশুপালের বাবা ও মা খুব ভয় পেয়ে তখনই সন্তানকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা দৈববাণী হওয়ার পর বাবা-মা আশ্বস্ত হলেন। দৈববাণীতে এটাও বলা হয়েছিল যার কোলে বসলেই এই সন্তানের অতিরিক্ত হাত আর চোখ গুলো খসে যাবে তার হাতেই এই সন্তানের মৃত্যু হবে। শিশুপালের মা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসি। পিসির সাথে দেখা করতে এসেছেন। পিসিও তাঁর সন্তান শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণের কোলে দিয়েছেন, কোলে দিতেই শিশুপালের সব হাত আর চোখ খসে গেছে। পিসি এখন খুব ভয় পেয়ে গেছে, আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছে – হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে কথা দাও কোন দিন তুমি শিশুপালকে বধ করবে না। শ্রীকৃষ্ণ কি করে কথা দেবেন যে তিনি কোন দিন শিশুপালকে বধ করবেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন – ঠিক আছে, আপনি কোন ভয় করবেন না, আমার প্রতি আপনার সন্তানের বধযোগ্য একশটি অপরাধ ক্ষমা করে দেব। তবে জেনে রাখুন, এটা নিয়তির বিধান, একে আটকানো যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যে এখানে নিয়তির কথা বললেন, হিন্দুধর্মের শাস্ত্র এই নিয়তিকে খুব বেশী মানে, এনারা জানেন যে জিনিষটাকে নিয়তি বিধান দিয়ে দিয়েছে সেখানে কারুর কিছু করার নেই। যখন দুই পক্ষের কোন লড়াই হয় তখনও বলবে – দ্যাখো ভাই, নিয়তিতে এই রকম আছে সেখানে কিছু করতে পারবো না, কিন্তু কাজ কি করতে হবে বল। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, নিয়তিতে শিশুপালের বধ আমার হাতে হবে, কিন্তু আমি এটা করতে পারি যে, শিশুপালের একশটি অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিতে পারি। তখন মা ভাবছে, একশটি অপরাধ যদি ক্ষমা হয়ে যায় তাহলে আমার সন্তান বেঁচে যাবে। আরব্য রজনীর কাহিনীগুলিতেও এই নিয়তিকে খুব মানা হয়েছে। একটা কাহিনীতে আছে একজন লোক কিভাবে একটা দ্বীপে চলে গিয়েছিল। একদিন সে লুকিয়ে দেখছে সমুদ্রের উপর দিয়ে একটা জাহাজে করে এক রাজকুমার আসছে। সেই রাজকুমারকে দ্বীপে এনে প্রচুর জিনিষপত্র সহ একটা গুহার মধ্যে রাখা হয়েছে। সব লোকেরা রাজকুমারকে ছেড়ে দিয়ে জাহাজে করে আবার ফিরে গেছে। তখন এই লোকটি খুব ভয়ে ভয়ে গুহায় তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে – তুমি কে? তখন রাজকুমার বলছে – আমাকে এক জ্যোতিষী বলছেন তিরিশ দিন পরে অমুক একটা লোকের হাতে আমার মৃত্যু হবে। সেটা থেকে বাঁচানোর জন্য আমার বাবা আমাকে এই নির্জন দ্বীপে রেখে গেছেন যাতে ঐ ধরণের লোকের সঙ্গে দেখা না হয়। এখন এই লোকটা বলছে আমিই সেই লোক। রাজকুমারের তো মাথায় হাত। লোকটি বলছে, আমি ভাবতেই পারিনা যে আমি কাউকে বধ করব, আমি নিজেই খুব দুঃখ-কষ্টে পড়ে আছি। আমি তোমার দেখাশোনা করব। এইভাবে ঊনত্রিশ দিন কেটে গেলে, তিরিশ দিন হয়ে গেল। একত্রিশ দিন হয়ে গেলে রাজার লোকরা জাহাজে করে এসে রাজকুমারকে নিয়ে যাবে। একত্রিশ দিনের দিন রাজকুমার খুব খুশি, লোকটিকে বলছে – আর কি! সব মিটে গেল, বিকেলের মধ্যে জাহাজ চলে আসবে, চল আমরা সেলিব্রেট করি। কিভাবে সেলিব্রেট করবে? অনেক ফল-টল ছিল সেগুলো খাওয়া যাক। রাজকুমার লোকটিকে বলছে ঐ ছুরিটা আমাকে দাও ফলগুলো কাটি। লোকটি ছুরিটা নিয়ে রাজকুমারের দিকে এগোতে গিয়ে এমন ভাবে পা পিছলে রাজকুমারের উপর ছুরি শুদ্ধু গিয়ে পড়েছে, ছুরিটাও রাজকুমারের পেটের মধ্যে ঢুকে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে রাজকুমার ঐখানে মারা গেল। মহাভারতও নিয়তিকে মেনে নিচ্ছে, কিন্তু নিয়তি আছে আর নিয়তিকে মেনেও নেব কিন্তু আমাকে লড়াই করে যেতে হবে। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতেও সাবিত্রী জানে সত্যবান মারা যাবে, তবু সাবিত্রী একবার লড়াই করে দেখছে। শ্রীকৃষ্ণও তাই বলছেন, শিশুপালের নিয়তি বলছে আমার হাতে সে মরবে, কিন্তু তুমি বল আমার থেকে আমি কিভাবে ওকে রক্ষা করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উপায় বলে দিলেন, এর একশটি অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব। এই বর্ণনা ভীষ্ম দিচ্ছেন পুরো সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। শ্রীকৃষ্ণের হাতেই এই শিশুপালের মৃত্যু আর এর একশটি অপরাধ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করবেন এই রকমই আমরা শুনে এসেছি।

ভীষ্মের প্রতি শিশুপালের পুনর্বার কূটুক্তি

ভীষ্মের এই সব কথা শুনে শিশুপালও খুব রেগে গিয়ে বলছে *আত্মনিন্দাহহত্মপূজা চ পরনিন্দা পরস্তবঃ। অনাচরিতমার্যাণাং বৃতোমতেচ্চতুর্বিধম্।।২/৪৪/২৪*। যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁরা কখনই এই চারটে কাজ করেন না – ১) আত্মনিন্দা, মানে নিজের নিন্দা করা। অনেক সময় আমরা বলি, আমি আর কি আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। অনেকে রেগে গেলেও আত্মনিন্দা করতে থাকে। ২) আত্মপূজা, শ্রেষ্ঠ পুরুষরা নিজের প্রশংসা কখনই করবেন না। ৩) পরনিন্দা আর ৪) পরস্তুতি, দেবযানী আর শর্মিষ্ঠার মধ্যে যখন ঝগড়া লেগেছিল তখন শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে ঠিক এই কথাই বলেছিল – তোমার বাবা আমার বাবার স্তুতি করে মাইনে পায়। ভীষ্ম! তুমি তখন থেকে কৃষ্ণের স্তুতি করে যাচ্ছ, এই কৃষ্ণ একেবারেই স্তুতির যোগ্য নয় তাও তুমি করে যাচ্ছ, এই কাজ আগে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ করেননি। আমি তোমাদের যা বলার বলে দিলাম, কৃষ্ণটা একটা বেকার, ভীষ্মটা একটা ফালতু। এরপর তোমাদের ভেতরে যদি সাহস থাকে, শক্তি থাকে তাহলে তোমাদের আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমাকে তোমরা পরাস্ত কর। শিশুপালের এই কথা শুনে সমস্ত রাজারাও খুব উৎসাহ পেয়ে সবাই মিলে বলছে এই ভীষ্মটাকে পশুর মত হত্যা কর বা একে মাদুরে জড়িয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেল। পিতামহ ভীষ্ম এই কথা শুনতেই তিনিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বলছেন – *উক্তস্যোক্তস্য নেহান্তমহং সমুপলক্ষয়ে। যত্তু বক্ষ্যামি তৎ সর্বং শৃণুধ্বং বসুধাধিপাঃ।।২/৪৪/৩৯*। হে রাজগণ! এত কথা কাটাকাটির কি আছে, আর এই কথা চালাচালি কোন দিন শেষ হবে না, তাই আমি বলছি তোমরা সবাই শোন – *পশুবদ্ ঘাতনং বা মে দহনং বা কটাগ্নিনা। ক্রিয়তাং মূর্ধ্নি বো ন্যস্তং ময়েদং সকলং পদম্।।২/৪৪/৪০*। পিতামহ ভীষ্ম বলছেন, তোমরা আমাকে পশুর মতই হত্যা কর আর মাদুর জড়িয়ে পুড়িয়ে মার, আমি কিন্তু তোমাদের সবার মস্তকে এই সম্পূর্ণ পদাঘাত করলাম, আমরা শ্রীকৃষ্ণের পূজো করেছি, তিনিও এখানে রয়েছেন, এখন যার বুদ্ধি মৃত্যুকে বরণ করতে চাইছে সে চক্র ও গদাধারী শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করুক এবং শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়ে তাঁরই শরীরের প্রবেশ করুক। এই আমি তোমাদের সবার মাথায় পা রাখলাম।

এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে, যুদ্ধ হবেই। তখন শিশুপাল সরাসরি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করে বলছেন তুমি আমার সাথে এসে যুদ্ধ কর। আজ আমি সব কটা পাণ্ডবদের সাথে তোমাকেও বধ করে দেব। তুমি রাজা নও, তুমি আসলে কংসের দাস ছিলে, সুতরাং তুমি পূজার অযোগ্য। এই যে তুমি কলঙ্কের সৃষ্টি করেছ তাই তুমি এখন আমার বধ্য, তুমি নিজেকে প্রস্তুত করে নাও মৃত্যুর জন্য। তখন শ্রীকৃষ্ণ সভার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছেন 'এই শিশুপাল হল যদুবংশের কন্যার পুত্র। যাদবরা কখনই চেদিরাজদের কোন ক্ষতি করেনি কিন্তু প্রথম থেকেই শিশুপাল আমাদের পিস্তাত ভাই হয়েও নৃশংসের মত আমাদের ক্ষতি করাতে লেগে আছে। আমরা যখন প্রাগ্জ্যোতিষপুরে ছিলাম তখন এই শিশুপাল আমাদের দ্বারকানগরীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল'। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এক এক করে শিশুপাল কি করেছিল সব বলে যাচ্ছেন। 'শুধু তাই না, এই শিশুপাল নিজের মামার মেয়েকে অপহরণ করেছিল। আমি আমার পিসির কথা ভেবে শিশুপালের সব অপকর্মকে সহ্য করে এসেছি। আরও কি, এই শিশুপাল রুক্মিণীকে পাওয়ার জন্য কত হীন প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু রুক্মিণীকে পেল না বলে তাতে আমার উপর আরও তার রাগ'। কাহিনীটা হল, রুক্মিণী দেখতে খুব রূপসী ছিলেন, শিশুপাল তাকে পছন্দ করেছিল। শিশুপাল রুক্মিণীর বাবা ও ভাইকে গিয়ে নিজের পছন্দের কথা জানিয়ে তাদের দিয়ে রাজী করিয়েছিল যে শিশুপালের সাথে রুক্মিণীর বিয়ে হবে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীকে ভালোবেসেছিলেন, রুক্মিণীও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন বেশী কায়দা করতে গেলে কোথা থেকে কি হয়ে যাবে তাই তিনি সোজা গিয়ে রুক্মিণীকে তুলে নিয়ে এসে বিয়ে করে নিয়েছিলেন। এর আগে নিজের বোন সুভদ্রাকেও অর্জুনকে দিয়ে অপহরণ করিয়েছিলেন। রুক্মিণীকে না পাওয়ার রাগটা শিশুপাল চিরদিন পুষে রেখেছিল, আমার সাথে রুক্মিণীর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে আর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির থেকে রুক্মিণীকে তুলে নিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে রুক্মিণীর কথা শুনতেই শিশুপাল জোর হাসতে শুরু করেছে, হেসে হেসে শিশুপাল বলছেন 'কৃষ্ণ তোমার মত নির্লজ্জ ছাড়া আর কেউ কি বলতে পারবে তোমার যে বউ সে আমার মনোনীত স্ত্রী ছিল, আমি রুক্মিণীকে স্ত্রী রূপে মন থেকে বেছে নিয়েছিলাম আর তুমি সেখানে বেহায়ার মত গিয়ে তাকে অপহরণ করে বিয়ে করেছ, এটা বলতে তোমার লজ্জা করছে না! তুমি আবার নিজেকে ক্ষত্রিয় বল! তোমার আত্মসম্মানের সব জলাঞ্জলী দিয়েছ। তোমার মত একটা নিকৃষ্ট লোক ছাড়া কেউ পুরো সভার মাঝখানে নিজের স্ত্রীর নামে বলতে পারবে যে আমার স্ত্রী অপরের বাগদত্তা'! বাগদত্তা মানে বিয়ে হয়ে যাওয়ার মতই। মেয়ের বাবা যখন বলে দিল আমার মেয়েকে অমুককে দিয়ে দিলাম তখন বিয়ে হয়ে গেল। মহাভারতের সময় তখনও সব কিছু নিয়ম ঠিক ঠিক ভাবে সমাজে নির্ধারতি ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তখন এই নিয়ম ছিল আমি আমার মেয়েকে তোমার হাতে দিয়ে দিলাম, তার মানে তার বিয়ে হয়ে গেল বা কেউ মনে মনে নির্বাচিত করে নিয়েছে আমি একে বিয়ে করব তখন আর সেই

মেয়েকে কেউ কিছু করতে যাবে না। এই ধরণের অনেক জটিলতা মহাভারতের সময় তখনও ছিল। শিশুপাল শেষে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন 'তুমি যতই বল তুমি পিসির কথা ভেবে এই করছ সেই করছ তবে তুমি ক্রুদ্ধ হলেও আমার কিছু যায় আসে না আর তুমি প্রসন্ন হলেও আমার কিছু আসে যায় না'।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধ

শিশুপাল এই কথা বলতেই শ্রীকৃষ্ণ নিজের সুদর্শন চক্রের আহ্বান করলেন। সুদর্শন চক্রটা আসলে একটা বড় চাকা, গরুর গাড়ীর চাকার মত, চাকার বাইরের অংশে বড় বড় ধারালো ছুরি লাগানো থাকত, বলে প্রায় একশ দেড়শটা ছুরি লাগানো থাকত। চাকাটা ছিল খুব ভারী। শ্রীকৃষ্ণ যখন চক্রটা চালাতেন তখন চক্রটা লক্ষ্যকে তছনছ করে দিয়ে আবার ঘুরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে চলে আসত, অনেকটা ফ্রিসভী বা অস্ট্রেলিয়ার ব্যুমেরাং খেলার মত। এই সুদর্শন চক্র খুব ভারী ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া যে কেউ এই চক্রকে তুলতেই পারবে না। মহাভারতে একটা কাহিনী আছে, একবার অশ্বত্থামা শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছেন – আমি শুনেছি আপনার এই সুদর্শন চক্র খুব শক্তিশালী অস্ত্র, যদি আমাকে এটা দিয়ে দেন তো খুব ভালো হয়। শ্রীকৃষ্ণ হেসে অশ্বত্থামাকে বলছেন – ঐতো ওখানে কোণায় রাখা আছে নিয়ে নাওনা। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র জানতেন, তিনিও শক্তিশালী ছিলেন, তিনি গিয়ে প্রথমে সুদর্শন চক্রকে এক হাত দিয়ে তুলতে গেছেন, তুলতে পারলেন না, তারপর দু হাত দিয়ে তুলতে গেলেন, তাও পারলেন না। তারপর হাঁটু গেড়ে তুলতে গেছেন তাও তুলতে পারলেন না। এটা একটু অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। কিন্তু আরও মজার যে, শ্রীকৃষ্ণ একটা আঙুলের ডগায় রেখে সুদর্শন চক্রটা চালাতেন, তার মানে শ্রীকৃষ্ণের কি শক্তি ছিল সেটাকে বোঝাবার জন্য এইভাবে কাহিনীকে দাঁড় করান হয়েছে। এই সুদর্শন চক্রকে যদি রথের উপর চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে চাকার চাপেই রথ দুমড়ে মুচড়ে যাবে। আর কোন মানুষের উপর চালিয়ে দিলে চাকার রীমের বাইরে যে ধারালো ছুরি লাগানো থাকে তাই দিয়ে গলা কেটে বেরিয়ে যেত। বরাবরই এই ধরণের চক্র অনেক যোদ্ধার কাছে খুব প্রিয় অস্ত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণও অনেক অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন কিন্তু চক্রটা তার খুব প্রিয় অস্ত্র ছিল আর চালাতেও খুব দক্ষ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইবারে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করতেই সেটা তাঁর আঙুলের ডগায় চলে এসেছে।

সুদর্শন চক্রটাকে এবার ঘুরিয়ে চালাবেন তার আগে শ্রীকৃষ্ণ সভার উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বলছেন *শৃণ্বন্তু মে মহীপালা যেনৈতৎ ক্ষমিতং ময়া। অপরাধশতং ক্ষাম্যং মাতুরস্যৈব যাচনে।। দত্তং ময়া যাচিতং চ তানি পূর্ণানি পার্থিবাঃ। অধুনা বধয়িষ্যামি পশ্যতাং বো মহীক্ষিতাম্।।*২/৪৫/২৩-২৪। আপনাদের সবাইকে বলছি, আমি শিশুপালের মা, আমার পিসির কাছে কথা দিয়েছিলাম আমি শিশুপালের একশটি অপরাধ ক্ষমা করব। একশটি অপরাধ শিশুপাল পূর্ণ করে দিয়েছে, এই নিন আমি শিশুপালকে বধ করে দিলাম। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে সুদর্শন চক্রটা চালাতেই শিশুপালের গলাটা কেটে বেরিয়ে গেল। গলাটা কেটে যেতেই সবাই দেখতে পেলেন শিশুপালের শরীরের থেকে একটা তেজ বেরিয়ে এল, সেই তেজটা বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করে শ্রীকৃষ্ণের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে গেল।

ব্যাসদেবের ভবিষ্যত বাণী ও যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা

শিশুপাল বধ হয়ে যাওয়ার পর ঐসব দৃশ্য দেখার পর কোন রাজা শিশুপালের হয়ে দাঁড়াতে সাহস করল না। এইবার রাজসূয় যজ্ঞ ভালো ভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। তখন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলছেন 'আমি এখন নক্ষত্রের যে অবস্থান দেখছি তাতে দেখাচ্ছে আগামী তেরো বছরের পর সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশের বিরাট ক্ষতি হতে যাচ্ছে। এদের নিজেদের মধ্যেই মারামারি হবে, এ সবই নিয়তি, নিয়তিকে অতিক্রম করা যায় না, *কালো হি দুরতিক্রমঃ*'। ব্যাসদেবের কথা শুনে যুধিষ্ঠির খুব বিচলিত হয়ে পরেছেন, যুধিষ্ঠির বলছেন 'আমি কখনই চাইব না ক্ষত্রিয়রা নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি করে মারা যাক। আমি আজকেই প্রতিজ্ঞা করছি আমি আজ থেকে কোন দিন আমার ভাইদের সঙ্গে, কোন রাজার সঙ্গে কটূ কথা বলব না। এনারা যে যা চাইবে আমি সব সময় তাই দিতে থাকব'। তার মানে যুধিষ্ঠির কক্ষণ কারুর মন ভাঙবে না। রাজাদের মধ্যে যত লড়াই হয় কটূ কথা থেকেই শুরু হয়, তাই যুধিষ্ঠির বলছেন আমি কোন মতেই কটূ কথা বলব না। *এবং মে বর্তমানস্য স্বসুতেষ্বিতরেষু চ। ভেদো ন ভবিতা লোকে ভেদমূলো হি বিগ্রহঃ।।*২/৪৬/২৮। 'এমন কি আমার নিজের সন্তান আর অপর ক্ষত্রিয়ের সন্তানদের মধ্যে কোথাও কোন ভেদ ভাব রাখব না। *ভেদোমূল হি বিগ্রহঃ*, অশান্তির কারণ হয় ভেদ, ভেদ দৃষ্টিই অশান্তির মূল'। ভেদ দৃষ্টি কথাটা আমাদের ভাষায় হয়ে যায় পক্ষপাতিত্ব। ভেদ দৃষ্টিটাই সংসারের ক্ষেত্রে হয়ে যায় দ্বৈত, আমি আপনাকে আলাদা দেখছি, আপনি আমাকে আলাদা দেখছেন। এই দৃষ্টিটাই যখন

অভেদ হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যায় অদ্বৈত। সংসারের সমস্ত অশান্তির মূল হল ভেদ দৃষ্টি, যুধিষ্ঠির এখন সব দিব্যি করে নিয়েছেন।

দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ

কিন্তু অন্য দিকে আবার আরেকজনের মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে ঈর্ষার স্ফুলিঙ্গ। এর আগে ময়দানব নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের রাজমহলের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়ে গেছে। দুর্যোধন, শকুনি এরা সবাই রাজাসূয় যজ্ঞের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছে। রাজসূয় যজ্ঞের সব কিছু মিটে যাবার পরও দুর্যোধনরা কিছু দিনের জন্য সেখানে অবস্থান করছে। কৌরবরা পাণ্ডবদের রাজমহল সব ঘুরে ঘুরে দেখছে। রাজমহলের এক জায়গায় একটা জলাশয় এমন ভাবে নির্মিত হয়েছে জলটাকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, পদ্মগুলিও স্ফটিক নির্মিত মনে হচ্ছ। জলাশয়কে স্থল ভেবে দুর্যোধন ওখান দিয়ে হাঁটতে গিয়েই জলের মধ্যে পড়ে গেছে। জলাশয়ের মধ্যে পড়ে গেছে দেখে ভীম হাসতে শুরু করেছে। পরের কাহিনীতে দেখানো হয়েছে যে দ্রৌপদী নাকি হেসেছিল, আরে হেসে বলেছিল অন্ধের পুত্র অন্ধ। কিন্তু মূল মহাভারতে কোথাও দ্রৌপদীর এই উক্তি পাওয়া যায় না, সেখানে ভীম হাসতে শুরু করেছিল। ভীমকে হাসতে দেখে অর্জুন, নকুল ও সহদেবও এসে গেছে, এরাও হাসতে শুরু করেছে। কাপড় জামা ভিজে গেছে বলে যুধিষ্ঠির উৎকৃষ্ট বস্ত্র এনে দিয়েছেন। দুর্যোধন ওদের দিকে না তাকিয়ে মনের মধ্যে রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে হাঁটতে গিয়ে অন্য দিকে আরেকটি স্ফটিকের জলাশয়কে সত্যিকারের জলাশয় মনে করে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় তুলে হাঁটতে শুরু করেছে। কিন্তু আসলে সেটা ছিল স্থলভূমি। তখনও ঐ কাণ্ড দেখে সবাই হাসতে শুরু করেছে। আবার একটা জায়গায় দেখাচ্ছে যেন একটা দরজা আসলে ওটা দরজা নয়, আবার যেখানে দরজা নেই মনে হচ্ছে সেখানে কিন্তু সত্যিই দরজা লাগানো হচ্ছে। দুর্যোধন যেখান দিয়েই যাচ্ছে আর মাথায় ঠোক্কর খাচ্ছে। ভীম অর্জুনরা এতদিনে থেকে থেকে জেনে গেছে কোথায় কি আছে। বারবার এই ভাবে হেনস্থা হওয়াতে দুর্যোধন নিজকে খুব অপমানিত বোধ করেছে।

কিছু দিন ইন্দ্রপ্রস্থে কাটিয়ে দুর্যোধন এইবার হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু দুর্যোধনের মনের মধ্যে আর শান্তি নেই। ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়ে শকুনি বলছে – আপনি আপনার ছেলের কোন খোঁজ নেন না, দুর্যোধন চিন্তায় দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ পাণ্ডুর বর্ণের হয়ে যাচ্ছে। শুনে ধৃতরাষ্ট্র খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে, কি হল দুর্যোধনের! ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের কাছে জানতে চাইলেন তুমি কি কারণে মনের মধ্যে দুঃখ পাচ্ছ আমাকে বল। তখন দুর্যোধন বলছে – যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধ রাজলক্ষ্মী দর্শনের পর থেকে আমি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছি, ঐ অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য দেখার পর থেকে কোন ভোগই আমাকে পরিতৃপ্ত করতে পারছে না। যাই হোক, শকুনি, দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন মিলে ঠিক করল যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোক। দ্যুতক্রীড়ায় শকুনি ছিলেন ওস্তাদ, যুধিষ্ঠির অত ভালো জানতো না।

দ্যুতক্রীড়ার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বিদুর এসে দ্যুতক্রীড়ার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছেন এর পেছনে বিরাট এক ষড়যন্ত্র আছে। শুনেই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে খুব তিরস্কার করতে শুরু করেছেন – আপনি কলির প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে যাচ্ছেন এবং ক্ষত্রিয়ের বিনাশের প্রথম কারণ ঘটাতে যাচ্ছেন, এই সব জুয়া খেলাতে আপনি একেবারে সম্মত হবেন না আর আপনার সন্তানদের সাথে পাণ্ডুর পুত্রদের যাতে ভেদ না জন্মায় তাই করুন। ধৃতরাষ্ট্র কোন কথা শুনবেন না, বিদুরকে বললেন, তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এসো।

বিদুর দ্যুতক্রীড়ার আমন্ত্রণ নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছেন। যুধিষ্ঠির শুনে বলছেন *মহাভয়াঃ কিতবাঃ সংনিবিষ্টা মায়োপধা দেবিতারোঽত্র সন্তি। ধাত্রা তু দিষ্টস্য বশো কিলেদং সর্বং জগৎ তিষ্টতি ন স্বতন্ত্রম্।।২/৫৮/১৪।* বাবাঃ! ওখানে শকুনিদের মত লোকেরা সব বসে আছে, ওখানে দ্যুতক্রীড়ায় কে জিতবে! কিন্তু যুধিষ্ঠির বলছেন – ভগবান এই যে এক যন্ত্র করেছেন জগৎ নামে, এখানে সব কিছুই দৈবের অধীন, কেউ এখানে স্বাধীন নয়, বাঁচতে চাইলেও কেউই বাঁচতে পারবে না। যুধিষ্ঠির সারা মহাভারতে শুধু দৈব দৈব করে গেছেন, দৈব মানে কপাল, কপালে যা আছে সেটা হবেই, এখানে কারুর কিছু করার নেই। এরপর যুধিষ্ঠির বলছেন, আমার তো খেলার ইচ্ছে নেই, কিন্তু আমি ঠিক করে রেখেছি কেউ যদি দ্যুতক্রীড়ায় আমাকে আহ্বাণ করে আমি নিশ্চয়ই তার আহ্বাণে সারা দেব। *দৈবং হি প্রজ্ঞাং মুষ্ণাতি চক্ষুস্তেজ ইবাপতৎ। ধাতুশ্চ বশমন্যেতি পাশৈরিব নরঃ সিতঃ।।২/৫৮/১৮।* হঠাৎ যদি চোখের সামনে আলোর জ্যোতি খুব বেশী হয়ে যায় তখন সেই বেশী আলোটা চোখের জ্যোতিটাকে ঢেকে দেয়, মানুষ তখন কিছুই দেখতে পায়না। ঠিক তেমনি

দৈব মানুষের বুদ্ধিকে হরণ করে নেয় আর মানুষ পাশবদ্ধ হয়ে বিধাতার বশীভূত হয়, এর থেকে বাঁচা যায় না। এখানে মূল মহাভারতে দেখাচ্ছে যুধিষ্ঠির নিজে জুয়া খেলতে রাজী হননি কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল কেউ যদি তাঁকে জুয়া খেলাতে আহ্বাণ করত তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। কিন্তু পরের দিকে এটাকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে আসলে জুয়াতে যুধিষ্ঠিরের বরাবরই আসক্তি ছিল, অথচ তিনি নিজে আবার জুয়া খেলাটা ভালো খেলতে পারতেন না। মূল মহাভারতে কিন্তু যুধিষ্ঠির এও বলছেন – ক্ষত্রিয়দের জন্য যুদ্ধই প্রকৃত ক্ষেত্র, জুয়া খেলাটা একেবারেই ভালো নয়, যদি কিছু পেতে হয় যুদ্ধ করেই পেতে হয়।

যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে সবাইকে নিয়ে এসেছেন। দুর্যোধনের হয়ে শকুনি চাল দেবে। খেলার আরম্ভ হওয়ার আগেও যুধিষ্ঠির শকুনিকে বলছেন *নিকৃতির্দেবনং পাপং ন ক্ষাত্রোঽত্র পরাক্রমঃ। ন চ নীতির্ধ্রুবা রাজন্ কিং দ্যুতং প্রশংসসি।।২/৫৯/৫*। জুয়া খেলাটা একেবারেই ভালো নয়, এটা এক প্রকার ছল মাত্র আর পাপকর্ম। যদি কিছু পেতে হয় ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করে পরাক্রম করেই পেতে হয়। শকুনি তখন উত্তর দিচ্ছে *অক্ষৈর্হি শিক্ষিতোঽভ্যেতি নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির। বিদ্বানবিদুষোঽভ্যেতি নাহুস্তাং নিকৃতিং জনাঃ।।২/৫৯/১৫*। বিদ্বান পুরুষ যখন মুর্খকে জয় করে তখনও সেটা একটা শক্তি দিয়ে জয় করা হয়, কিন্তু তাকে তো মানুষ কখন ছল বলে না। যে দ্যুতক্রীড়ার বিদ্যাটাকে ভালো ভাবে আয়ত্ত করেছে সে যদি দ্যুত বিদ্যাতে অশিক্ষিত কাউকে হারিয়ে দেয় তখন সেটাকে তুমি ছল বলবে কেন?

জেমস জয়েস নামে একজন নামকরা ইংরেজ লেখক জুয়া খেলা নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন। সেই উপন্যাসে একজন Accountant এর কাহিনী আছে। সে কিভাবে একটা জুয়ার আড্ডায় পৌঁছে গেছে, সঙ্গে তার বউও ছিল। বউকে বলছে 'আমি এখানে জুয়া খেলব'। বউ বলছে 'সবাই বলে এখানে এসে সবাই হেরেই যায়'। তখন সে বলছে 'তফাৎ হচ্ছে সবাই এখানে গণিতজ্ঞ নয়, কিন্তু আমি একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ'। তারপর খেলা শুরু হলো, আর শুরুতেই সে হারতে থাকল। বউ বলছে 'সবইতো হেরে যাচ্ছ, বাড়ি ফেরার পয়সাটাও তো থাকছেনা'। আর সে কেবলই বলে যাচ্ছে 'আরে তুমি দম্ ধরে বসে থাকো, I know the probability theory'। তারপরে ঠিক তাই হল, সে যেমন যেমন হিসেব করেছিল, তারপর দেখা যাচ্ছে সে ক্রমাগত জিতেই চলেছে। জেতার মধ্যেও হারার একটা হিসেব আছে। এখন এরা যখন দেখছে লোকটা জুয়াতে জিতে চলেছে তখন অন্যরাও এর সাথে জুয়াতে নেমে পড়ছে। লোকটি জানত আমি চারটেতে যদি জিতে যাই তাহলে এর পরের দুটোতে আমি হারব, তখন এই হারটাকে পোষাবার জন্য জেতার জায়গাতে সে বেশী টাকা ঢালছে। অন্যরাতো এর হিসেব বুঝছে না, তারাও টাকা ঢেলে ডুবে যাচ্ছে। ওরা মনে করছে লোকটা বাই চান্স জিতছে, কিন্তু আদপেই না, সে পুরো গাণিতিক নিয়মানুসারেই জিতে চলেছে। একদিন দুদিন পর দেখে ক্যাসাইনোতে যত টাকা ছিল সব টাকা এই লোকটা জিতে নিয়েছে। শকুনি তাই যুধিষ্ঠিরকে বলছে – তুমি যে বলছ জুয়াতে ছল করে জেতা হয় তা নয়। যেমন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ মুর্খের উপর জয় পায়, ঠিক তেমনি আমি দ্যুতবিদ্যা জানি আর সেই বিদ্যার জোরেই আমি জিতি। যুধিষ্ঠির বলছেন – ঠিক আছে তাই হবে, আমিতো প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি আমাকে যে দ্যুতক্রীড়ায় আহ্বাণ করে আমি কখন না করব না।

এরপর খেলা শুরু হল। এই কাহিনী আমদের সবারই জানা। যুধিষ্ঠির পর পর হারতেই থাকলেন। সব সম্পত্তি হারার পর নিজেকে বাজি রেখে হেরেছেন, তারপর ভাইদের বাজিতে লাগিয়েছেন আর শেষে দ্রৌপদীকে লাগিয়েছেন।

কাহিনীতে বলা হচ্ছে শকুনি প্রথম থেকেই ছল করে দ্যুতক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে হারাতে থাকে। এখানে ছলের কি আছে ঠিক বোঝা যায় না। ক্রিকেট খেলায় যে টস হয় সেখানেও ঠিক এই জিনিষই হয়। কোন ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন যদি প্রতিবার টসে জেতে তাহলে কেউ বলবে না যে উনি ছল করে টসে জিতেছেন। যদি ঘরে বসে দশ বার হাতের মধ্যে কোন মুদ্রাকে নিয়ে টস করি তার মধ্যে যদি পাঁচবার জিতি তাহলে এটা স্বাভাবিক, যদি ছয়বার জিতি তাহলেও কিছুই নয়, এগুলো Law of Probability তে চলছে। চারবার যদি জিতি তাও probability বলব। যদি একবার ঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার মনটা চঞ্চল আছে, দুবার যদি জিতি তাতেও মন চঞ্চল বলতে হবে, তিনবারেও চঞ্চল মন। যদি আটবার জিতি তাহলে বুঝতে হবে মনটা স্থির আছে, যদি নয় থেকে দশবার ঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার মনটা এখন খুব শক্তিশালী। কারণ মনের বাইরে কোন কিছুই হয় না। আমেরিকার এক স্কুলে কড়ি দিয়ে বাচ্চারা খেলা করত, একজনের হাতের মধ্যে এক কিংবা দুটি কড়ি থাকত, যে বলে দেবে এক না দুই সে কড়িটা জিতে নেবে। এই স্কুলে ক্লাশ ফাইভের একটা ছেলের খুব নাম হয়েছিল। ছেলেটি স্কুলের যত ছেলের কাছে যত কড়ি ছিল সে সব কড়ি জিতে নিয়েছিল।

কখন একটাও বাজী ছেলেটি হারেনি। একটা সংস্থা থেকে ছেলেটিকে ইন্টারভিউ করতে এসেছিল, ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তুমি কি করে বুঝে নাও যে তোমার বন্ধুর হাতে কটি কড়ি আছে। ছেলেটি খুব অদ্ভুত কথা বলল, আমার সামনের ছেলেটি হাতে কড়ি নিয়ে যখন জিজ্ঞেস করে তখন আমি ছেলেটির মনের ভেতরে ঢুকে যাই। বাইরের লোক না জানতে পারে কিন্তু তার মনতো জানে আমার হাতে কটি কড়ি আছে। এখন তার মনের মধ্যে যদি ঢুকে যাওয়া যায় তাহলে আমার পক্ষে জানাটা কোন অসম্ভব হয় না। এই ঘটনাটা শুনে আমাদের অযৌক্তিক মনে হতে পারে, কিন্তু এটা কোন ভাবেই অযৌক্তিক নয়। ভারতে প্রচলিত ধারণাই আছে যে সাধু সন্ন্যাসীরা মানুষের মন পড়তে পারেন, এটা একশো ভাগ সত্য। টসের ব্যাপারেও মন যদি পুরো শান্ত থাকে তাহলে যত বার টস করা হোক না কেন তত বারই সে ঠিক বলে দিতে পারবে। শকুনির এই ব্যাপারে কিছু একটা ক্ষমতা ছিল। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – যে ওস্তাদ খেলোয়াড় পাঁচ বললে পাঁচ, ছয় বললে ছয় পড়বেই। এখানে কোন সিদ্ধাইয়েরও কিছু নেই, সবটাই স্বাভাবিক। কাহিনীতে যতই বলা হোক শকুনি ছল করে জিতেছিল, এখানে ছলের কিছুই নেই, আর শকুনি আসলে ছিল পাকা খেলোয়াড়, সে ধরতে পারতো কি হতে যাচ্ছে। যুধিষ্ঠির যখন দান চালছে শকুনি তখন আগেই বলে দিচ্ছে এটাই পড়বে। শকুনির দান যখন চলছে যুধিষ্ঠির তখন ধরতে পারছে না। এক আধবার যুধিষ্ঠির জিতেও থাকতে পারে, তার অবশ্য এখানে কোন উল্লেখ নেই। জুয়া খেলার আরও ভালো বর্ণনা পাওয়া যাবে নল-দময়ন্তীর কাহিনীতে। রাজা নলও জুয়া খেলাতে সব কিছু হারিয়ে ছিলেন। পরে নল এক রাজার কাছে জুয়া খেলার রহস্যটা শিখে নিয়েছিল। শিখে নিয়ে এবার সে যার কাছে হেরে সব কিছু হারিয়েছিল তার কাছে গেছে জুয়া খেলতে। এবারে নল এক দানেই জিতে নিয়ে সব ফেরত পেয়ে গেছে।

দ্যুতক্রীড়া বন্ধে বিদুরের উপদেশে বিদুরের প্রতি দুর্যোধনের কূটুক্তি

যাই হোক, একের পর যুধিষ্ঠির হেরে চলেছে, তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে বলছেন *মহারাজ বিজানীহি যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি ভারত। মুমূর্ষোরৌষধমিব ন রোচেতাপি তে শ্রুতম্।।২/৬২/২*। হে ধৃতরাষ্ট্র! মরণাপন্ন রুগীর ওষুধ আর ভালো লাগেনা, আপনারাও মরতে যাচ্ছেন সেইজন্য আমার কথা আর ভালো লাগবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে কিছু শাস্ত্রসম্মত কথা বলছি, ভালো করে শুনুন। বিদুরের এই কথাটা সত্যিই একেবারে সত্য। যাদের বাড়িতে মুমুর্ষু রোগী আছে সে যদি আর ওষুধ না খেতে চায় তাহলে বুঝে নিতে হবে তার শেষ অবস্থা এসে গেছে। শ্রীমাও দেহত্যাগের আগে ডাক্তার, নার্স, ওষুধ সব কিছু নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। যতক্ষণ রোগী ওষুধ নিতে চাইবে ততক্ষণ কিন্তু সে মরবে না। ঠিক তেমনি যে বিনাশের দিকে যাচ্ছে সে যদি উপদেশ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তখন বুঝতে হবে তার বিনাশ হল বলে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এখানে বিদুর শুক্রনীতির কথা উল্লেখ করছেন, শুক্রনীতি খুব নামকরা নীতি। শুক্রনীতিতে বলছে, মানুষ যখন প্রচুর সুরাপান করে নেয় তখন সে উঁচু নীচু বুঝতে না পেরে উল্টে পরে বা জলের মধ্যে গিয়ে পতিত হয়, আপনার ছেলেরাও মোহের বশে চলে গেছে, সেও এক্ষুণি পড়বে আর সর্বনাশ হবে। হে মহারাজ! আপনার যদি মনে হয় আপনি দুর্যোধনকে কিছু করতে পারবেন না, তাহলে অর্জুনকে বলুন এক্ষুণি দুর্যোধনকে বন্দী করে নিক। বিদুর ঘোর বিরোধিতা করে জুয়া খেলাটাকে বন্ধ করতে চাইছেন, কারণ এতে কুরু বংশ পুরো বিনাশের দিকে চলে যাচ্ছে। তোমরা এই আগুন নিয়ে খেলা করো না, এই খেলা এক্ষুণি বন্ধ কর। বিদুরের এই উপদেশে দুর্যোধন খুব রেগে গেছে। বিদুর যদিও দাসীপুত্র কিন্তু সম্পর্কে কৌরব ও পাণ্ডবদের কাকা হন।

দুর্যোধন রেগে গিয়ে বিদুরকে দাসীপুত্র সম্বোধন করে ঠিক এইভাবে বলছে – *অহং কর্তেতি বিদুর! মাবমংস্থা মা নো নিত্যং পরুষাণীহ বোচঃ। ন ত্বাং পৃচ্ছামি বিদুর! যদ্ধিতং মে স্বস্তি ক্ষত্তর্মা তিতিক্ষূন্ ক্ষিণু ত্বম্।।২/৬৪/৭*। দাসীপুত্র বিদুর! তুমি নিজেকে কর্তা ভোক্তা মনে করো না। নিজেকে কর্তা ভোক্তা মনে করে সর্বদা যে আমাদের অবজ্ঞা কর আর সর সময় নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করছ, এগুলো তুমি বন্ধ কর। তোমাকে কেউ কিছু বলতে আজ্ঞা করেনি, এত উপদেশ কেন দিতে আসছ। নেহাত আমরা খুব ক্ষমাবান্ পুরুষ তাই তোমার এই কটূ কথাগুলো সহ্য করে নিচ্ছি। দুর্যোধন এখানে যে বিদুরকে বলল, অহং কর্তা, আমাদের শাস্ত্রে এটি খুব উচ্চ কথা, ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই কর্তা, যার মধ্যে কর্তা বোধ থাকে সে খুব নিকৃষ্ট। দুর্যোধন বলছেন, বিদুর তুমি মনে করো না যে তুমি কর্তা। কেন বলছে সেটা পরে বলবে। আমি তো তোমাকে কখন জিজ্ঞেস করিনি কিসে আমার ভালো হবে, অযাচিত ভাবে তুমি আমাকে এত উপদেশ কেন দিতে আস। আসলে দুর্যোধন এখানে নিজেকে রাজা মনে করছে। দুর্যোধন এরপর বলছেন – *একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োঽস্তি শাস্তা গর্ভে শয়ানং পুরুষং শাস্তি যো বৈ। তেনানুশিষ্টঃ প্রবনাদিবাম্ভো যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা*

ভবামি। ।২/৬৪/৮। এই জগতে শাস্তা মানে শাসনকর্তা একজন, যিনি জগতটাকে চালাচ্ছেন, মায়ের গর্ভে যে শিশু ঘুমিয়ে আছে তাকেও তিনিই শাসন করছেন। যেভাবে জল স্বাভাবিক ভাবে নীচের দিকে যায় ঠিক তেমনি এই জগতনিয়ন্তা ভগবান যেভাবে আমাকে যেদিকে কাজে লাগান আমিও সেই ভাবে আমার মনকে সেইদিকে লাগাই। বিদুরকে বলছে তুমি নিজেকে মনে করছ কর্তা, মানে তুমি নিকৃষ্ট আর আমি শ্রেষ্ঠ কারণ ভগবান আমাকে যেদিকে লাগাচ্ছে আমি সেটাই করছি। যার এই বোধ হয়ে গেছে যে ঈশ্বরই আমাকে চালাচ্ছেন, ঈশ্বরই আমাকে সব দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেতো জীবনমুক্ত হয়ে গেল। উর্দুতে একটা শব্দ আছে ইনসাল্লাহা, আল্লার ইচ্ছা। যার ঠিক ঠিক বোধ হয়ে গেছে সব তাঁর ইচ্ছাতে সব কিছ হচ্ছে সে হয়ে গেল জীবনমুক্ত। দুর্যোধন এখানে ঠিক উল্টো বলছে, যিনি জ্ঞানী সেই বিদুরকে বলছে তোমার মধ্যে আমির অহঙ্কার আছে আর নিজের ব্যাপারে বলছে আমার মধ্যে কোন অহঙ্কার নেই, ঈশ্বর আমাকে যেদিকে লাগাচ্ছে আমি তাই করছি। এই হচ্ছে শঠদের ভাষা। যারাই কথায় কথায় বলে সব ঈশ্বরের ইচ্ছা তারাই দুর্যোধনের মত শঠ, ধাপ্পাবাজ। দুর্যোধন কেন জুয়া খেলতে যুধিষ্ঠিরকে ডেকে এনেছে? যাতে যুধিষ্ঠিরের সব কিছু কেড়ে নিতে পারে। দুর্যোধন বিদুরকে বলছে, ভগবানের শক্তিতেই সব কিছু চলছে। বিদুর তুমি সাবধান, গায়ের জোরে যে নিজের উপদেশ অপরের ঘাড়ে ফেলে সে অজান্তেই তাকে শত্রু বানিয়ে নেয়। আমি তোমার উপদেশ চাইনি কিন্তু গায়ের জোরে তুমি আমাকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছ এতে তুমি কিন্তু আমাকে শত্রু বানিয়ে নিচ্ছ, খুব সাবধান। আমার হিতৈষী যদি তুমি নাই হও আর আমার কথা মত যদি তুমি নাই চলতে পার তাহলে এই ধরণের মানুষের এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। অসতী নারীর সাথে তুমি যতই ভালো ব্যবহার কর, যতই মিষ্টি কথা বল, যতই তাকে জিনিষপত্র দাও সে কিন্তু সময় হলে নিজের স্বামীকে পরিত্যাগ করে বেরিয়ে চলে যাবেই। তুমিও ঠিক এই অসতী নারীর মত, তোমাকে আমরা সম্মান দিয়ে রেখেছি অথচ তুমি এখানে পাণ্ডবদের হয়ে কথা বলছ।

দুর্যোধনের এই সব কথা শুনে বিদুর নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করেছেন। বিদুর তখন বলছেন – *অতঃ প্রিয়ঞ্চেদনুমাঙ্ক্ষসে ত্বং সর্বেষু কার্য্যেষু হিতাহিতেষ। স্ত্রিয়শ্চ রাজন্! জড়পঙ্গুকাংশ্চ পৃচ্ছ ত্বং বৈ তাদৃশাংশ্চৈব মূঢ়ান্।* ।২/৬৪/১৫। রাজা শোন! তুমি যদি মিষ্টি মিষ্টি তোষামুদে কথা শুনতে চাও, নিজের মনের মত কথা শুনতে চাও তাহলে আমাদের মত মন্ত্রী আর রেখো না। আমাদের ছেড়ে দিয়ে তুমি কয়েকটা মেয়েকে রাখ, কয়েকটা মুর্খকে পাশে রাখ আর কয়েকটা পঙ্গুকে তোমার কাছে রাখ, এরাই তোমার হিতাহিতে তোমার কথা মতই কার্য করবে। একনায়কতন্ত্রে যে শাসক হয় সেখানে এই সমস্যাটাই প্রধান সমস্যা, যারাই নীতির কথা বলতে যাবে তাদেরকে এরা হয় মেরে ফেলবে, না হয় সরিয়ে দেবে। এই শাসকদের আস্তে আস্তে কতকগুলো মোসায়েবরা ঘিরে নেয়, প্রথমে জী হুজুর করে করে শেষে এরাই রাজাকে চালাতে থাকবে। বিদুরতো এই রকম নয়, তিনি একজন ঋষি, এইসব শুনে তাই বলছেন তুমি কয়েকটা মেয়ে, কয়েকটা মুর্খ আর পঙ্গুকে নিয়ে এস, এরা সব সময় তোমার জয় জয় করতে থাকবে। বিদুর বলছেন – *লভ্যতে খলু পাপীয়ান্ নরঃ সুপ্রিয়বাগিহ। অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।* ।২/৬১/১৬। এই জগতে অত্যন্ত প্রিয়ভাষী পাপিষ্ঠ লোক সর্বত্র প্রচুর পাওয়া যাবে কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর এমন বাক্যের বক্তাও দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ। বিদুর বলতে চাইছেন, আমি যে তোমাকে কথাগুলো বলছি এগুলো অপ্রিয় কিন্তু তোমার হিতের জন্যই বলা হচ্ছে, শুনতেও ভালো লাগবে না, কিন্তু শুনলে তোমার মঙ্গলই হবে, আবার আমার মত লোকও তুমি কোথাও পাবে না। তুমি যে আমার কথাগুলো সহ্য করতে পারছো না এটা স্বাভাবিক, এই কথা শুনে সহ্য করে নেওয়া সম্ভব নয়।

দুর্যোধন বলছে আপনার কাছ থেকে আমি উপদেশ চাইনি তাও আপনি কেন আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। আর বিদুর বলছেন অপ্রিয় হিতের কথা বলতে পারে আর শুনতে পারে এই রকম লোক দুর্লভ। এখানে কোনটা ঠিক? এখানে দুর্যোধন ঠিকই বলছে, এই নিয়েই পঞ্চতন্ত্রে কাহিনী আছে, যাদের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই তাদেরকে অপ্রিয় হিতের কথা বলতে নেই কিন্তু নিজের বাড়ির লোক, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলতে হয়। কিন্তু তাও মানুষ বলতে চায় না, কারণ দুর্যোধন আগে যেটা বলল, অপ্রিয় উপদেশ দিতে গেলে মানুষ শত্রু হয়ে যায়। অবশ্য বিদুর বলছেন, অপ্রিয় হিতের কথা বলতে ও শুনতে পারে এই রকম লোক খুব কম।

বাজীতে দ্রৌপদীর হার, রাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি

এরপর জুয়া খেলা চলতে লাগল, যুধিষ্ঠির যথারীতি হেরেই চলেছেন। সব সম্পত্তি হারিয়ে নিজের চার ভাইকে হারলেন, শেষে নিজেকেও বাজী রেখে হারলেন। তারপর আবার চাল দিতে বলা হল। যুধিষ্ঠিরের তখন আর কিছুই নেই,

কি নিয়ে বাজী রাখবে! যুধিষ্ঠিরকে তখন দুর্যোধন বলছেন কেন দ্রৌপদীকে লাগাও। তারপর দ্রৌপদীকেও হারালেন। বিদুর তখন প্রচণ্ড রেগে গেছেন, দুর্যোধনকে অনেক করে বলছেন, তুমি কুকুরের তুল্য আচরণ করছ, তোমার সব কিছু নাশ হয়ে যাবে, এগুলো তুমি বন্ধ কর। দুর্যোধন এখন আর কি কোন কথা কানে দিতে পারবে! সে এখন জয়ের নেশায় মত্ত হয়ে আছে। দুর্যোধন একজন প্রতিকামীকে ডেকে বলছেন তুমি এক্ষুণি দ্রৌপদীকে টেনে এই সভাতে নিয়ে এসো। প্রতিকামী ভয়ে ভয়ে দ্রৌপদীর ঘরের দিকে চলেছে।

দ্রৌপদী এসব ঘটনা কিছুই জানতেন না, প্রতিকামীর কাছে শুনে বলছেন – তুমি আগে যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো আগে তিনি নিজেকে বাজী রেখে হেরেছিলেন না আমাকে আগে বাজী রেখে হেরেছিলেন। দ্রৌপদীর বক্তব্য হল আপনি যদি আগে হেরে গিয়ে থাকেন তাহলে আমাকে আর কি করে বাজীতে লাগাতে পারবেন। প্রতিকামী ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – দ্রৌপদী জানতে চাইছেন আমাকে বাজীতে হারাবার সময় আপনার কাছে কোন কোন জিনিষ অবশিষ্ঠ ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই যুধিষ্ঠির একেবারে ভেঙে পড়েছে। তিনি এই কথার কোন উত্তর দিচ্ছেন না। এদিকে দুর্যোধন তখন বলছেন 'ওসব কোন কথা জানার অধিকার আর দ্রৌপদীর নেই, ওকে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এসো, যা জিজ্ঞেস করার সব এখানে এসে করুক'। প্রতিকামী আবার এসে দ্রৌপদীকে সব বলেছে। দ্রৌপদী বলছেন 'আমি এখন একবস্ত্রা, এই সময় আমি বড়দের সামনে যেতে পারিনা'। প্রতিকামী ফিরে এসেছে। এবারে দুঃশাসনকে পাঠানো হল, দুঃশাসন কোন কথা গ্রাহ্য না করে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে সভার দিকে নিয়ে যেতে লাগল। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন বলছে, তুমি এখন কি অবস্থায় আছ ওসব জানার আমার দরকার নেই, তোমাকে আমরা জুয়াতে জিতছি, এখন তুমি একবস্ত্রাই থাক আর রজস্বলাই থাক ওসব জেনে আমার দরকার নেই, আমরা যেভাবে চাইব তোমাকে সেইভাবে থাকতে হবে। এখন আমরা বলছি তোমাকে এখন আমাদের দাসীদের সঙ্গে থাকতে হবে। দ্রৌপদী বলছেন – তুমি যত যাই বল দুঃশাসন আমার স্বামী যুধিষ্ঠির ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তোমরা যাই বল আমি তাঁর মধ্যে কোন দোষ দেখতে পারবো না।

দ্রৌপদীকে চুল ধরে টেনে লাঞ্ছনা করে রাজসভার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। দ্রৌপদী কম্পিত কলেবরে সভায় উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছেন 'এই যে দুঃশাসন আমি রজস্বলা সত্ত্বেও আমাকে সভার মধ্যে লাঞ্ছনা করতে সাহস করছে তার জন্য কেউ নিন্দাবাদ পর্যন্ত করছেন না, মনে হচ্ছে সবাই দুঃশাসনের এই কার্যকে সমর্থন করছে। ধিক, ক্ষত্রিয়কুল, ধিক্ কৌরববংশ। ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রদের দেখে মনে হচ্ছে এনাদের শরীরে কোন প্রাণ নেই, কারণ এই বৃদ্ধগণ এই ভয়ঙ্কর অধর্মের কার্য দেখেও দেখছেন না। পিতামহ ভীষ্ম আপনি বলুন এই যে যুধিষ্ঠির আগে নিজে হেরেছেন তারপর আমাকে কি তিনি বাজী রাখতে পারেন'? তখন ভীষ্ম বলছেন – *ন ধর্ম্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে!* ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমি সেইজন্য তোমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবো না। একদিকে যে জিনিষটার সে স্বামী নয়, সেটাকে সে জুয়াতে বাজী লাগাতে পারেনা আবার অন্য দিকে বলা হয় স্বামী যেখানে যায় স্ত্রী স্বামীকে সেইদিকেই অনুসরণ করে, যুধিষ্ঠির যদি দাস হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দ্রৌপদীও দাসী হয়ে গেছে। এইটাই মহাভারতের বৈশিষ্ট্য। আমরা যখন দেখছি তখন পরিষ্কার দেখছি এদিকটা সাদা ঐদিকটা কালো, কিন্তু এইখানে আবার সাদা আর কালোর সংমিশ্রমণ নিয়ে আসা হল। ভীষ্ম প্রথমে বলছেন যুধিষ্ঠির আগে নিজে হেরে গেছেন সে তোমাকে বাজীতে লাগাতে পারেনা। তারপরেই ভীষ্ম বলছেন, অন্য দিকে দেখা যায় স্বামী যেখানে যায় স্ত্রীও সেখানেই যায়, তোমার স্বামী হেরে গিয়ে কৌরবদের দাস হয়ে গেছে সেইজন্য তুমিও দাসী। তাই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। একদিক থেকে দেখলে ঠিক মনে হবে, অন্য দিক থেকে দেখলে ভুল মনে হবে।

দ্রৌপদী কিন্তু ছাড়ছে না। দ্রৌপদী বলছেন – যুধিষ্ঠির জুয়া খেলাতে অনভিজ্ঞ, তিনি খেলতেও চাননি কিন্তু এই অসভ্য ও শঠতাপরায়ণ লোকগুলো নির্মল স্বভাব রাজার মনে জুয়া খেলার ইচ্ছাকে জাগিয়েছে। আর তাঁর মনেও কখন এই চিন্তা আসেনি যে আমাকে বাজীতে লাগাতে যেতে পারে, এরাই নির্লজ্জের মত আমাকে বাজীতে রাখার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করেছে। দ্রৌপদী এখানে একটা কথা বলছেন – যে সভাতে বৃদ্ধ পুরুষ নেই সেই সভা সভা নয়। যাঁরা ধর্মের কথা ঠিক ঠিক না বলতে পারেন তাঁরা কিন্তু বৃদ্ধ পুরুষ নন। আর যে ধর্ম সত্য নয় সে ধর্ম ধর্ম নয় এবং যে সত্যে ছল মেশান সেই সত্য সত্য নয়। এখনকার দিনে গ্রামের যে পঞ্চায়েত আছে সেখানে গ্রামের অনেক সমস্যার উপর বিচার করে রায় দেওয়া হয়। গ্রামের কোন স্ত্রী হয়তো কিছু অন্যায় করেছে এখন পঞ্চায়েতের সদস্যরা বিচার করে রায় দিল। তখন চারটে জিনিষ দেখতে হবে, যে সভাতে রায় দেওয়া হয়েছে সেখানে কোন বৃদ্ধ পুরুষ আছে কিনা। দ্বিতীয়, যদি বৃদ্ধ পুরুষ থাকে তাহলে তিনি ধর্মের কথা বলছেন কিনা। তৃতীয়, যেটা ধর্মের কথা বলে বলা হচ্ছে সেটা সত্য কথা কিনা। আর চতুর্থ,

যে সত্য কথা বলা হচ্ছে তাতে কোন ধরণের চালাকি মেশানো আছে কিনা। এই চারটে শর্তকে পূরণ করলে তবেই সেটা সভা, তা নাহলে সেটা সভা নয়। এদিকে ভীম, অর্জুন এরাও প্রচণ্ড রেগে গেছে, কিন্তু কিছু করার নেই, এখন পাণ্ডবরা অসহায় হয়ে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা সহ্য করে যাচ্ছে।

এদিকে দ্রৌপদীকে ঐভাবে টানাটানি করছে দেখে দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ আর থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। বিকর্ণ খুব রেগে বলছে – এই যে এখানে জুয়া খেলা হচ্ছে এটা ঘোরতর অধর্ম আর শকুনিই খুব কায়দা করে কথাটা তুলেছিলেন দ্রৌপদীকে বাজীতে লাগানোর জন্য। সেইজন্য আমি মনে করিনা যে দ্রৌপদীকে কৌরবরা জয় করেছে। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সভায় খুব হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে। তখন আবার দুর্যোধন পাল্টা বক্তব্য রাখছে। কর্ণ দুর্যোধনের বিরাট বন্ধু, কর্ণ তখন দুর্যোধনের সমর্থনে বলছেন – বেদে দেবতারা এক স্ত্রীর জন্য এক স্বামীর বিধান করেছিলেন, আর দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামী, সেইজন্য এই দ্রৌপদীর কোন সম্মানেরই যোগ্য নয়, এর বস্ত্র যে কোন পুরুষই হরণ করে নিতে পারে, সে এখন দাসী। দাসীরও সম্মান আছে কিন্তু এর পাঁচটা স্বামী, যার কোন বিধানই শাস্ত্রে নেই, তাই সভাতে দ্রৌপদীর বস্ত্র খুলে দেওয়া হোক।

দুঃশাসনকে আদেশ দেওয়া হল দ্রৌপদীর বস্ত্র সরিয়ে দেওয়ার জন্য। তখন দ্রৌপদীর মনে পড়ল, অনেক দিন আগে বশিষ্ঠ মুনি বলেছিলেন – যখন আপদে বিপদে পড়বে তখন হরির কথা স্মরণ করলে তিনি রক্ষা করেন। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ রূপে ভগবান মনে করে প্রার্থনা করতে শুরু করেছেন – *গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্! কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।। প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ! কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।। হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন্। কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দনগোবিন্দ।*।২/৬৮/৪১-৪২-৪৩। এই তিনটি শ্লোকে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছেন, কেউ যদি এমন কোন বিপদে পড়ে যেখানে আত্মসম্মান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে তখন এই স্তুতি মনে মনে পাঠ করতে থাকলে বিপদটা কেটে যায় ও আত্মসম্মান রক্ষা হয়। গোবিন্দ যিনি দ্বারকাতে থাকেন, তিনি কৃষ্ণ গোপীদের প্রিয়। হে কৃষ্ণ তুমি বিশ্বাত্মা, বিশ্বভাবন। হে গোবিন্দ আমায় রক্ষা কর। হে কেশব! কৌববরা আমাকে অপমান করছে। হে নাথ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ তুমি আর্তের দুঃখ নাশ কর। হে জনার্দন! হে গোবিন্দ! কৌরবদের পঙ্কিল সমুদ্রে আমি ডুবে যাচ্ছি তুমি আমাকে উদ্ধার কর। গুরু বা মহারাজরা যে আমাদের বলেন জীবনে যাই হয়ে থাকুক ঠাকুরের নাম করে যাও, আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। খুবই ঠিক বলেন, শাস্ত্রে কিছু কিছু বিশেষ মন্ত্র আছে, যেমন দ্রৌপদীর চীরহরণের সময় যে কৃষ্ণস্তুতি, এগুলো প্রার্থনা করলে বিরাট কিছু বিপদ হওয়ার থাকলে কেটে যায়। চণ্ডীতেও কিছু কিছু মন্ত্র আছে যে মন্ত্রগুলি প্রার্থনা করলে বিশেষ বিশেষ বিপদ কেটে যায়। যারা মনে করেন ইষ্টনাম করলেই সব কেটে যায়, সেটাও ঠিক আছে, এতে কোন ভুল নেই।

ভীমসেনের ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা, দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মের ধর্মের সংজ্ঞা নিরুপণ

দ্রৌপদী যখন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন তখন সভার সকলে অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে দেখছনে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বস্ত্রহীন করার জন্য যতই কাপড় টানছে ততই কোথা থেকে কাপড় এসে দ্রৌপদীকে ঢেকে দিচ্ছে। ঐ দৃশ্য দেখে ভীম আর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বলছেন 'আমি এই রাজসভার সবার সামনে এমন এক প্রতিজ্ঞা করছি যে প্রতিজ্ঞা করতে আজ পর্যন্ত কেউ দুঃসাহস করেনি ভবিষ্যতেও কেউ কোনদিন করবে না। আমি এখন সেই প্রতিজ্ঞা করছি যুদ্ধে এই পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, ভরতকুলঙ্ক দুঃশাসনের বুক চিরে আমি রক্তপান করব'। অন্য দিকে দুর্যোধন নিজের জঙ্ঘা দেখিয়ে দ্রৌপদীকে কু ইঙ্গিত করেছিল বলে ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমি তোমার ঊরু ভঙ্গ করব। এই জুয়াখেলার আসরে আমন্ত্রিত অনেক রাজারাও ছিলেন। সভাস্থ সবাইকে লক্ষ্য করে বিদুর বলছেন 'দ্রৌপদী যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন আপনারা কেউই তার উত্তর দিচ্ছেন না, এতে ধর্মে মহাহানি হচ্ছে। কোন আর্ত ব্যক্তি বিপদের মধ্যে সভার সমস্ত মানুষের শরণাপন্ন হয় তখন সেই আর্তকে যদি ধর্মের আশ্রয় দিয়ে ঠিক ঠিক সাহায্য না করা হয়, তাহলে কিন্তু তার দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার জ্বালা পুরো সভাকে দগ্ধ করে দেয়। দ্রৌপদী যে আপনাদের কাছে বার বার প্রশ্ন করে যাচ্ছে, এইভাবে তার বস্ত্র হরণ, তাকে দাসী বানান, তাকে জুয়াতে লাগানো এগুলো ঠিক হয়েছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা কেউ দিচ্ছেন না, দ্রৌপদীর এই দুঃখের অগ্নি এই সভার সবাইকে ভস্মীভূত করে দেবে'। বিদুর যা বলছে এটা সত্যিই এই রকমই হয়। যদি কোন আর্ত ধর্মমতে কারুর কাছে সাহায্য নিতে যায়, ক্ষমতা থাকতেও যদি তাকে সাহায্য না করা হয়, ধর্মও যখন বলছে সাহায্য করা যেতে পারে, তখন আর্তের ঐ দুঃখ-যন্ত্রণার জ্বালাটা তাকে পুড়িয়ে দেয়।

দ্রৌপদীও ছাড়ছে না, সেও সবাইকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে এটা কি হচ্ছে? তখন ভীষ্ম বলছেন, তোমাকে আগেই বলেছি ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এত সূক্ষ্ম যে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। ধর্মসঙ্কটে বলা মুশকিল কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, তবে সেই সঙ্কটকালীন অবস্থায় মহাপুরুষরা যেটা বিধান দিয়ে দেন সেটাই পরে ধর্ম বলে মনে করা হয়। তবে কি জান – *বলবাংশ্চ যথা ধর্মং লোকে পশ্যতি পুরুষঃ। স ধর্মো ধর্মবেলায়াং ভবত্যভিহতঃ পরঃ।।*২/৬৯/১৫। যারা শক্তিমান পুরুষ, ক্ষমতা যাদের হাতের মুঠোয় তারা একটি অবস্থায় যেটাকে ধর্ম বলে মনে করে, ধর্ম বিচারের সময় সেটাকেই ধর্ম বলে মনে করে। কিন্তু দুর্বল লোক যদি ধর্মের কথাও বলে তখন সেটা তখন চাপা পড়ে যায়। এখানে এখন দুর্যোধন, কর্ণ এরা হল সব শক্তিমান, ক্ষমতাবান এরা এখন যেটা বলবে তাতে অন্যরা যেটা বলবে সেটা চাপা পড়ে যাবে। ভীষ্ম ধর্মকে এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন – এখন একটা সঙ্কটের পরিস্থিতি তৈরী হয়ে গেছে, এই পরিস্থিতিতে আগে আগে কি হয়েছে সেটাকে আর দেখা হয় না, এখন শক্তিমান পুরুষ যা বলবে সেটাই ধর্ম হয়ে যাবে। ভীষ্ম বলতে চাইছেন যে, আমি, বিদুর এই দুর্যোধন কর্ণের তুলনায় এখন দুর্বল আমরা যদিও বা ধর্মের কথা বলি সেটা এদের দাপটের সামনে চাপা পড়ে যাবে।

ভীষ্ম বলছেন – *ন বিবেক্তুঞ্চ তে প্রশ্নমিমং শক্নোমি নিশ্চয়াৎ। সূক্ষ্মত্বাদ্গহনত্বাচ্চ কার্য্যস্যাস্য চ গৌরবাৎ।।*২/৬৯/১৬। ধর্মের কথা গুলো এত সূক্ষ্ম, আর এত দুর্বোধ্য আর এই পরিস্থিতিতে আমি বিবেচনা করে নিশ্চয় হতে পারছি না বলে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারছি না। তবে একটা কথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এই কৌরববংশের বিনাশ খুব শীঘ্রই হতে চলেছে কারণ এই কুরুবংশীয়ের সকলেই লোভপরায়ণ ও মোহপরায়ণ হয়ে পড়েছে। যারা লোভমোহপরায়ণাঃ, লোভ আর মোহের আশ্রয়ে চলে গেছে তাদের বিনাশ কিন্তু নিশ্চিৎ। লোভ মোহপরায়ণ লোকেরা যে সব সময় ভুল কাজই করে তা নয়, কিছু ঠিক করছে, কিছু নিজের মত ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্রের বরদান

ভীষ্ম যা বলার সব বলে হাত গুটিয়ে বসে পড়েছেন। সভায় তখন প্রচণ্ড হৈচৈ পড়ে গেছে। দ্রৌপদী তখনও সেইভাবে বার বার বিলাপ করে যাচ্ছেন দেখেও রাজারা দুর্যোধনাদির ভয়ে ভাল বা মন্দ কোন কথাই বলতে পারছে না। এদিকে তখন ধৃতরাষ্ট্রের হোমগৃহ থেকে উচ্চস্বরে দিনের বেলায় হঠাৎ করে শেয়াল ডেকে উঠল, শেয়ালের ডাক শুনে গর্দভ আর ভয়ঙ্কর পাখীরাও চারদিক থেকে ডাকতে আরম্ভ করেছে। তখন বিদুর, গান্ধারী, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সবাই স্বস্তি বাক্যাদি উচ্চারণ করতে থাকলেন। এইসব কাণ্ড দেখে ধৃতরাষ্ট্রও প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি দ্রৌপদীকে ডেকে এনে তাঁর কাছ থেকে বর নিতে বললেন। দ্রৌপদীও বর চাইতেই ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সব কিছু যা জুয়াতে হারিয়েছিল সব ফেরত দিয়ে দিলেন। ফেরত দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন – তুমি হচ্ছ সাধুপুরুষ, ধর্মজ্ঞ, যাদের সাধুজনোচিত স্বভাব তারা পুরনো কলহ-বিবাদকে মনে রাখে না। নীচ পুরুষ সাধারণ কথা বলার সময়ও কটূ কথা ব্যবহার করে, মধ্যম পুরুষ প্রত্যুত্তর করার সময়ই কটূ কথা বলে আর উত্তম পুরুষ কোন অবস্থাতেই কটূ কথা বলে না। এখানে যা কিছু হয়েছে সব তুমি ক্ষমা করে দিয়ে ভুলে যাও আর শান্তি মনে রাজ্য শাসন কর।

দ্বিতীয়বার দ্যুতক্রীড়া এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে সব ফেরত পেয়ে এবার পাণ্ডবরা সবাই মন খারাপ করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসছে। এদিকে সব কিছু হাতছাড়া হতেই দুর্যোধন গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রেকে বলছে – হে রাজা! ইন্দ্রকে বৃহস্পতি কিভাবে রাজ্য চালাতে হবে সেই ব্যাপারে নীতির উপদেশ দিয়েছিল, তাতে বৃহস্পতি বলেছিলেন শত্রুকে যুদ্ধে হোক বা বিনা যুদ্ধে হোক যে করেই হোক নাশ করতে হয়। এখন পাণ্ডবরা আমাদের শত্রু হয়ে গেছে এদেরকেও আমাদের যে করেই হোক নাশ করতে হবে। ক্রুদ্ধ হয়ে যাওয়া বিষধর সর্পকে কি কেউ গলায় ঝুলিয়ে বা পিঠে চাপিয়ে চলতে পারবে! এখন যা কাণ্ড হয়ে গেছে এতে পাণ্ডবরা এখন ক্রোধযুক্ত বিষধর সর্প হয়ে গেছে, এদের নাশ করতেই হবে, যদি নাশ না করা হয় তাহলে আমরাই নাশ হয়ে যাব, আমরা কেউ বাঁচব না। জুয়া খেলা না হত তাহলে ঠিকই ছিল কিন্তু জুয়া খেলার পর যা হয়েছে এরপর সব ফেরত দিয়ে আপনি আরও সমস্যা সৃষ্টি করে দিলেন। আমরা এদের যে বিদ্রুপ করেছি আর দ্রৌপদীর সাথে যে আচরণ করা হয়েছে এরা এগুলো কিছুতেই সহ্য করবে না, আর তাতে আমাদের বিপদ অনেক বেড়ে গেল। এরজন্য এক কাজ করা হোক, পাণ্ডবদের সবাইকে আবার এখানে ডেকে আনা হোক এবং আবার জুয়া খেলা হোক। এবার জুয়া খেলাতে একটাই বাজী থাকবে, যে পক্ষ হেরে যাবে তারা বারো বছরের বনবাস আর এক বছরের অজ্ঞাত বাসে চলে যাবে। সব

কিছুই তুমি ফেরত পাবে কিন্তু তোমাকে এই বাজীটা জিততে হবে, যদি তোমরা হেরে যাও তাহলে তোমাদের দাস বানিয়ে রাখা হবে না আর দ্রৌপদীকেও দাসী করা হবে না। ধৃতরাষ্ট্র আগে নিঃশর্ত ভাবে ফেরত দিয়েছিলেন কিন্তু এখন শর্ত লাগিয়ে দেওয়া হল।

দুর্যোধনের কথাতে ধৃতরাষ্ট্র সায় দেওয়াতে বিদুর আবার প্রচণ্ড রেগে গেছেন, তিনি যথারীতি আবার অনেক কথা বলতে শুরু করেছেন। এদিকে গান্ধারীও এবার খুব রেগে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন – প্রথম দিন থেকে পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে দুর্যোধনকে কোন শাসন না করে আজকে আপনার এই দুরবস্থা, সাথে সাথে পুরো কৌরববংশকে আপনি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এখনও কঠোর হস্তে দুর্যোধনকে সামাল দিন তা নাহলে আমাদের সবারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবি। ধৃতরাষ্ট্র তখন স্পষ্ট করে বলে দিলেন – দুর্যোধনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারবো না। পুত্রস্নেহে আমি সত্যিই অন্ধ হয়ে আছি, ও যা বলছে আমাকে তাই করতে হবে।

আবার লোক পাঠান হল যুধিষ্ঠিরদের ডেকে আনার জন্য। ততক্ষণে যুধিষ্ঠিররা হস্তিনাপুর থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে অনেকটা চলে গেছে। পথের মাঝখানেই যুধিষ্ঠিরকে খবর দেওয়া হল ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে এক্ষুণি তোমাদের হস্তিনাপুরে ফিরে আসতে হবে। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের দূতকে দেখেই বুঝতে পেরে গেছেন আমি আবার জুয়া খেলাতে ফেঁসে গেছি। আমাদের মনে থাকার কথা এই কাহিনীটা বলছেন বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে। এবার বৈশম্পায়ন মন্তব্য করছেন – *অসম্ভবো হেমময়স্য জন্তোস্তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়। প্রায়ঃ সমাসন্নপরাভবানাং ধিয়ো বিপর্য্যস্ততরা ভবন্তি।।২/৭৬/৫*। হে জনমেজয়, শ্রীরামচন্দ্রও জানতেন সোনার হরিণ বলে কিছু হয় না, কিন্তু যার বিপদের খড়্গ মাথার উপর ঝুলতে থাকে তার বুদ্ধি আর কাজ করে না, বিনাশকালে তার বুদ্ধি পুরো বিপরীত হয়ে যায়। বৈশম্পায়ন যেটা বলছেন এর পেছনে প্রচণ্ড যুক্তি আছে – শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা আজকে ভগবানের অবতার বানিয়ে বলছি লীলাখেলা, কিন্তু যুক্তি দিয়ে দেখলে জিনিষটা অন্য রকম হয়ে যায়, শ্রীরামচন্দ্রের সামনে এক বিনাশকাল এসে গিয়েছিল বলেই তাঁরও বুদ্ধি বিপরীত ভাবে খেলা করল।

যুধিষ্ঠির যখন আবার ফিরে এসেছে তখন সবাই দেখছেন সে যেন প্রারব্ধবশতঃ এসে গেছে, তাকে কেউ জুয়া খেলা থেকে বিরত করতে পারছেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপাচার্য, সঞ্জয়, অশ্বত্থামা, গান্ধারী, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সোমদত্ত কৌরবদের মধ্যে দুই ভাই যুযুৎস ও বিকর্ণ সবাই যুধিষ্ঠিরকে আটকাচ্ছে – তুমি জুয়া খেলতে রাজী হও না। যুধিষ্ঠিরের খালি ঐ এক কথা – আমি পণ করেছি আমাকে যে জুয়া খেলতে ডাকবে আমি কখন না করব না।

যথারীতি যুধিষ্ঠির এক চালেই হেরে গেছে। এরপর সব ভাই মৃগচর্ম পরিধান করে হেঁটে চলেছে। ভীম হলেন একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, তাঁর হাঁটাও বুক ফুলিয়ে বীরদর্পের মত। ভীমের ঐ হাঁটাকে নকল করে দুঃশাসন আবার খুব ব্যঙ্গ করছে। এখনতো আর পাণ্ডবদের কিছু করার নেই, সবাইকে বারো বছরের জন্য বনে যেতে হচ্ছে। তখন এরা সবাই এক এক করে প্রতিজ্ঞা করতে শুরু করেছে। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে বলছেন – এই বারো বছর আর এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে চৌদ্দ বৎসরে প্রারম্ভেই সবাই দেখবে এই অর্জুন কর্ণ ও তার অনুচরদের কিভাবে বধ করবে, আমার প্রতিজ্ঞা যদি না রক্ষিত হয় তাহলে *চলেদ্ধি হিমবান্ স্থানান্নিষ্প্রভঃ স্যাদ্ দিবাকরঃ। শৈত্যং সোমাৎ প্রণশ্যতে মৎসত্যং বিচলেদ্ যদি।।২/৮৮/৩৫*। হিমালয় স্থানচ্যুত হয়ে যাবে, সূর্য্য প্রভাশূন্য হয়ে যাবে, চন্দ্রমার শৈত্যগুণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এরপর যুধিষ্ঠির মাকে আর কোথায় জঙ্গলে জঙ্গলে নিয়ে ঘুরবে তাই কুন্তিকে বিদুরের কাছে রেখে দিলেন। সমস্ত গুরুজনদের প্রণাম করে পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী বারো বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাসের দিকে এগিয়ে গেল। অজ্ঞাতবাসের শর্ত হচ্ছে, এই এক বছরের মধ্যে দুর্যোধনের লোক যদি পাণ্ডবদের কাউকে ধরে ফেলে তাহলে আবার তাদের বারো বছরের জন্য বনবাসে চলে যেতে হবে।

সভাপর্বের শেষ দৃশ্যে দেখাচ্ছে, সবাই এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা করাতে ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়ে গেছে। সঞ্জয় ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ও সারথী, সঞ্জয় তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাচ্ছেন – তখন আপনাকে এত করে বোঝান হল আপনি এই কাজ করতে দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দেবেন না। কিন্তু আপনি কারুর আপত্তিকে গ্রাহ্য করলেন না, এটা আপনি জেনে নিন এই বংশের শেষ সময় এসে গেছে। আপনি রাজা হয়ে খবর রাখেন না, যেদিন প্রকাশ্য রাজসভাতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হয়েছিল

সেদিন আমাদের রাজ্যের সমস্ত নারীরা শোক পালন করেছিল আর সমস্ত ব্রাহ্মণরা সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কোন অগ্নিহোত্র করেননি। আপনি বুঝতে পারছেন না আমরা কি বিপদ ডেকে এনেছি, আমাদের বিনাশের আর দেরী নেই। এইখানে এসে সভাপর্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরপর শুরু হবে বনপর্ব।

বনপর্ব

পাণ্ডবদের বনবাসে হস্তিনাপুরবাসীরা সঙ্গী

জুয়া খেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবরা বারো বছরের বনবাস আর এক বছরের অজ্ঞাতবাসের জন্য জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এক বছরের অজ্ঞাত বাস একটা চালাকি। দুর্যোধনরা নিশ্চিত ছিল যে এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবদের কেউ না কেউ আমাদের চরেদের নজরে ধরা পড়ে যাবে। তার ফলে আবার তাদের বারো বছরের জন্য জঙ্গলে থাকতে হবে। তুমি যত জঙ্গলে থাকবে ততই আমরা গদি দখল করে রাখতে পারবো, আর গদি ফেরত পাওয়ারও প্রশ্ন আসবে না। পাণ্ডবরা বনে চলে যাচ্ছে খবর পেয়ে হস্তিনাপুরের যত পুরবাসী ছিল সবারই মন বিষন্ন হয়ে গেছে। পুরবাসীরা এসে যুধিষ্ঠিরদের বলছেন – আপনারা যখন জঙ্গলে চলে যাচ্ছেন আমরাও আপনাদের সাথে জঙ্গলে চলে যাব। এই জায়গাতে এসে মহাভারতে বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব চোখে পড়ে। যুধিষ্ঠির রাজা ছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের আর এই ঘটনার স্থান হল হস্তিনাপুর, তাই হস্তিনাপুরের নগরবাসীদের এতটা আবেগতাড়িত হওয়ার কথা নয়। শ্রীরামচন্দ্র যখন চৌদ্দ বছরের জন্য বনে চলে যাচ্ছিলেন তখন অযোধ্যাবাসীরা বলেছিলেন আমরাও সবাই আপনার সাথে জঙ্গলে চলে যাব, শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাতেই থাকতেন আর তাঁরই যুবরাজ হওয়ার কথা ছিল। হস্তিনাপুরের নগরবাসীরা যুক্তি দেখাচ্ছেন – এই কৌরবরা হল নিষ্ঠুর প্রকৃতির, এই ধরণের লোকেদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমাদেরও মন নিষ্ঠুর হয়ে যাবে, এতে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল তিনি অযোধ্যাতেই থাকতেন কিন্তু পাণ্ডবরা অনেকদিন থেকেই হস্তিনাপুর থেকে অনেকটা দূরে ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাস করতেন।

কিন্তু এখানে মূল কথা হল – দুষ্ট রাজার রাজ্যে থাকলে প্রজার নাশ হয়ে যায়। মুঘল আমলে ঠিক এই ধরণের একটা ঘটনা আছে। ঔরঙ্গজেবের সময় ভারতে তখন চারিদিকে মুসলমানদের আধিপত্য চলছে। গুজরাতের দিকে ঔরঙ্গজেবের এক মুসলমান অফিসার একজন বৈশ্যকে জোর করে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে দিয়েছিল। এই ঘটনার পর ঐ শহরের যত বৈশ্য ছিল সব ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বৈশ্যরা চলে যাওয়াতে ঐ অঞ্চলে আর্থিক লেনদেন সব বন্ধ হয়ে গিয়ে পুরো অর্থ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন ওপর মহল থেকে কড়া নির্দেশ দিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করতে হল এই ভাবে জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত করা হবে না। রাজা যখন দুষ্ট হয় তখন প্রজারাও ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকে রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। ভারতে এখন যদিও এই সমস্যা এখন নেই কিন্তু এখনও ব্যবসায়ীরা যদি দেখে তার ব্যবসায়ের কেন্দ্রে প্রচুর লুটপাট চলে, চাঁদার জুলুম চলে, প্রতারণা চলতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। হস্তিনাপুরের লোকেরাও ঠিক এই কারণে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, আমরা দুর্যোধনের রাজ্যে থাকবো না, আমরা সবাই আপনার সাথেই চলে যাব।

যদি জল, বস্ত্র, তিল, ভূমি এই ধরণের বস্তুগুলি স্বতন্ত্র কিন্তু যখন ফুলের সংসর্গে থাকে এদের মধ্যেও একটা সুগন্ধ চলে আসে। ঠিক তেমনি আমাদের সবাইকে অপরের সঙ্গ করার ক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হয়। ইংরাজীতে একটা কথা আছে a man is known by his company he keeps, আপনি কি ধরণের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, তাতে বোঝা যাবে আপনি কি ধরণের লোক। ইংরাজী এই প্রবাদের দ্বারা বোঝা যাবে আমার আপনার মানসিক গঠন কি রকম, কিন্তু আমাদের এখানে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছে আপনি যার সঙ্গে মেলামেশা করছেন সেই লোক ভালো হোক বা মন্দ হোক, তার জোর প্রভাব আমার আপনার চরিত্রের উপর পড়ে। এই প্রভাব আমরা চট করে বুঝতে পারিনা কিন্তু প্রভাব পড়বেই। প্রত্যেক জিনিষের একটা বিশেষ তন্মাত্রা থাকে। ঠাকুর বলছেন কলম হাতে নিলেই ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে কিছু লিখতে ইচ্ছে করে, বিশেষ করে নিজের নাম। বুট জুতো পড়লে শিস্ দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে সে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। এখানে বস্তুর তন্মাত্রা আমাদের প্রভাবিত করছে। বহু দিন আগের কথা, স্বামীজীর শতবার্ষিকীতে মঠের বিভিন্ন অফিসে তখন অনেক কাজকর্ম হতে চলেছে। সেই সময় ফোনের এত ব্যবহার ছিল না। মঠের এক সেন্টারে একটা টেলিফোনের কানেকশন নেওয়ার কথা চলছে। ওখানকার মহারাজ কিছুতেই ফোন লাগাতে রাজী হচ্ছেন না। অন্যান্য মহারাজরা বোঝাচ্ছেন এখন অনেক কাজ, প্রেসের কাজ চলছে, তাদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে এই সব কারণে একটা ফোন থাকা খুব জরুরী। উনি বলছেন, তুমি যেমনি টেবিলে ফোন রাখবে তেমনি ফোনের তন্মাত্রাগুলো তোমাকে ধরে ফেলবে, তখন 'আমি

সাধু' এই বোধ তোমার থাকবে না, 'আমি একজন অফিসার' এই বোধ হবে। এরপর অনেক জেদাজেদি চলল, ফোন আনতেই হবে, তা নাহলে সময় মত কিছু করা হয়ে উঠবে না। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেন, তোমরা ফোন আন কিন্তু ফোনটাকে টেবিলের তলায় রাখতে হবে। প্রথমের দিকে মঠের বিভিন্ন অফিসে ফোনগুলো টেবিলের তলায় রাখা হত তা নাহলে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে টেবিলে রাখা হত। ফোন বাজলে চাবি দিয়ে বাক্স খুলে ফোন ধরা হত, কথা বলে ফোনটাকে আবার বাক্সের মধ্যে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হত। তৃতীয় যেটা আরও মারাত্মক ব্যাপার, যেটা সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না তা হল, একটা জিনিষকে যখন কেউ ব্যবহার করেছে সেই জিনিষের মধ্যে তার তন্মাত্রা চলে আসে। আমাদের মনে হয় এগুলো সব আগেকার দিনের সব কুসংস্কার। কিন্তু এগুলো একেবারেই কুসংস্কার নয়। ঠাকুরের জীবনেও এই রকম অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। তিনি কোথাও গেলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে তারপর বসতেন। কি রকম লোক গ্লাশে করে জল নিয়ে এসেছে সেটা দেখে তিনি ঠিক করতেন গ্লাশের জল খাবেন কি খাবেন না। আমরা এগুলো বুঝিনা বলেই মানিনা, কিন্তু তন্মাত্রার এই প্রভাব সত্যি সত্যিই আছে। একটা লোকের তন্মাত্রা তার সামনের লোককে প্রভাবিত করে। সেইজন্য মেলামেশার ব্যাপারে, কারুর জিনিষ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হয়। তবে পরিচিত লোকের ব্যবহৃত পোষাক, কলম, জুতো এগুলো কখনই ব্যবহার করতে নেই। আসল কথা আমাদের সবারই মন এত বেশী কালো যে তাতে আরও দু-এক ফোঁটা কালো দাগ পড়লে বোঝাও যায় না আর তাতে কিছু যায় আসেও না। সেইজন্য তফাৎটা ধরা যায় না। কিন্তু যারা সত্ত্বগুণী লোক, ভালো লোক এবং আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছে, তাদের এই ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হয়। তবে সব ক্ষেত্রে এগুলোকে উপেক্ষা করা যায় না, কিন্তু যতটা পারা যায় একটু সামলে চলতে হয়।

সেইজন্য এখানে বলছেন যেগুলো স্বতন্ত্র জিনিষ যেমন জল, তিল, বস্ত্র ও ভূমি এগুলো ফুলের সংসর্গে থাকলে এতে ফুলের গন্ধ চলে আসে, এখানে বলছেন সংসর্গের দ্বারা যে গুণগুলো আসে, সংসর্গ হল প্রত্যক্ষ সংযোগ। আমরা এখানে সবাই মিলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে শাস্ত্র আলোচনা করছি, কলকাতা শহরে কত লোক আছে এই বেলুড়েই কত লোক থাকতে মুষ্টিমেয় এই কজনই কেন এখানে শাস্ত্র কথা শুনতে আসছে। কোথাও একটা সংসর্গ ভেতরে আগে থাকতেই হয়ে আছে, যে তন্মাত্রার প্রভাব আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এখন যদি আমাদের মধ্যে কেউ প্রতিদিন সাংসারিক লোক বা বিষয়ী লোকের সাথে দিনরাত ওঠাবসা করতে থাকে তাহলে কিন্তু তার ঐ তন্মাত্রাগুলোকে সরে গিয়ে অন্য তন্মাত্রা এসে যাবে। এইজন্য বলা হয় বিষয়ী লোকদের সাথে বেশী মেলামেশা করতে নেই।

শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গের প্রশংসা

বলছেন – *মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ। অহন্যহানি ধর্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ।*।৩/১/২৫। আমাদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে এটি একটি খুব সুন্দর শ্লোক। মূঢ় শব্দের অর্থ দুই ভাবে হয়, একটা হয় মুর্খ আর দ্বিতীয়টা হয় মোহগ্রস্ত। এই সংসারে সবাই মোহগ্রস্ত, যারা ক্রিকেট খেলা নিয়ে মাতামাতি করছে তারাও মোহগ্রস্ত, যারা টাকার পেছনে দৌড়াচ্ছে তারাও মোহগ্রস্ত, কামের পেছনে দৌড়াচ্ছে সেও মোহগ্রস্ত, সৎকাজের জন্য টাকা চাইছে সেও মোহগ্রস্ত। একজন মন্ত্রী পঞ্চাশ কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে যাবার সময় ধরা পড়েছে, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কি করবে তুমি এত টাকা নিয়ে, কিছুই বলতে পারবে না, কারণ সে মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। এদের সঙ্গে যারাই বেশী মেলামেশা করবে তারাই নষ্ট হয়ে যাবে। এটাই এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, যারা এই মোহগ্রস্ত তাদের সাথে মেলামেশা করলে সেও মোহজালে পড়ে যাবে, *মোহজালস্য যোনির্হি*, একেবারে মোহজালের গর্ভে গিয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু যখন সাধুসঙ্গ হয়, সাধুদের সাথে বেশী মেলামেশা হয় তখন সেটাই হয়ে যায় *ধর্মস্য যোনির্হি*, সে তখন ধর্মের গর্ভে গিয়ে পড়ে। তার মানে দুটো গর্ভ আছে, একটা মোহজালের গর্ভ আরেকটি ধর্মের গর্ভ। বিবেকহীন ব্যক্তি দুই রকমের হয় একটা মুর্খ আর আরেকট মোহগ্রস্ত। সেইজন্য যারা বিদ্বান, বৃদ্ধ, উত্তম স্বভাব, শান্তি পরায়ণ ও তপস্বী এদের সঙ্গ করতে হয়। এরমধ্যে একটা শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ, বৃদ্ধ পুরুষ। এখন ভারতের খুব দুর্ভাগ্য যে আগেকার দিনে পঞ্চাশ বছর আগেও বাড়িতে বয়ঃজেষ্ঠ্যকে সম্মান দেওয়া হত, বাড়িতে একজন সিনিয়র সিটিজেন থাকা মানে সবাই নিশ্চিন্ত থাকত, তাঁরাই সব বুদ্ধি দিতেন। এখন এটা উঠে গেছে, এখন ছোট ছোট পরিবার, স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকছে, ধর্মের বাইরে ভোগ করে চলেছে, ভোগ কেটে গেলে নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ শুরু হয় যাচ্ছে। ভারতের চারিদিকে আজ বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় হয়ে চলেছে। আমাদের আগে এটাই ছিল ঐতিহ্য ও সম্পদ, বাড়িতে সব সময় বৃদ্ধদের রাখতে হবে আর তাঁদের সম্মান দিতে হবে, তাঁদের বুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে। এর ফলে সংসার ও সমাজের পারস্পরিক বাঁধনটা খুব দৃঢ় ছিল, যার জন্য সব কিছুতে একটা সুসামঞ্জস্য ছিল।

বলছেন – যে পুরুষের বিদ্যা, জাতি ও কর্ম এই তিনটে জিনিষ খুব উজ্জ্বল, সেই রকম পুরুষের সঙ্গ করা স্বাধ্যায় বা শাস্ত্র পাঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ। এটাই ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গ। মহাভারত তাহলে সাধুসঙ্গ কাকে বলছে? যার বিদ্যা, কর্ম ও জাতি এই তিনটে খুব উজ্জ্বল, এখানে জাতি মানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নয়, জাতি বলতে বোঝাচ্ছে উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন। দুষ্ট ও অসৎ প্রকৃতি মানুষেরর সাথে যদি দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণ এই তিনটের যে কোন একটি হলেই নিজের ভেতরে যে ধর্মের সংস্কার আছে, সেটার হানি হয়ে যায়। নীচ মানুষের সঙ্গ করলে বুদ্ধি নীচ, মধ্যম পুরুষের সঙ্গ করলে বুদ্ধি মধ্যম আর উত্তম পুরুষের সঙ্গ করলে ধীরে ধীরে সেও উত্তম পুরুষ হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। ধর্ম, অর্থ ও কামের কথা বেদে বলা হয়েছে আবার লোকাচারেও ধর্ম, অর্থ ও কামের আচরণ করা হয় কিন্তু কোনটা শ্রেষ্ঠ? মহাভারত বলছে, শ্রেষ্ঠ পুরুষ যেভাবে ধর্ম, অর্থ ও কামের আচরণ করেন সেটাই শ্রেষ্ঠ এবং সেটাই সবার অনুকরণীয়। বেদেও বলছে ধর্ম, অর্থ ও কাম চাই, কিন্তু কোন ধর্ম করব, অর্থ সঞ্চয় কি উপায়ে করব এবং কামভোগ কিভাবে করব? বেলুড় মঠে ইয়ং ছেলে-মেয়েরা হাত ধরাধরি করে ঘুরছে, এরাও তো কামভোগ করছে, তাহলে কি আমরাও এইভাবে কামভোগ করব? না করা যাবে না। কেন করা যাবে না? এটা বেদে আছে, নিজের ভাবাবেগ, নিজের কামজনিত আবেগকে জন সমক্ষে প্রদর্শন করতে নেই। এটা বুঝবো কি করে? যারা সুসংস্কৃত পরিবারের লোক তারা কখনই এই ধরণের আচরণ করবেন না। টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করতে হয়, আমার কাছে কি রকম টাকা-পয়সা আছে সেটা সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতে নেই। ধর্ম, অর্থ ও কাম কিভাবে পালন হবে এটা শ্রেষ্ঠ পুরুষরা দেখিয়ে দেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষরা কার কাছ থেকে জেনেছেন? আচার্যদের কাছ থেকে জেনেছেন। আচার্যরা কোথা থেকে জেনেছেন? শাস্ত্র থেকে জেনেছেন। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গ করতে হয়। বিপ্রগণ এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে অনেক ধরণের কথা বলে বোঝাতে চাইছেন আমরা আপনাদের সঙ্গেই যাব। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাবাসীদের চোখে ধুলো দেবার জন্য ভোররাত্রে রথটাকে শহরের দিকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে নদী পেরিয়ে অন্য দিকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু মহাভারতে এখানে অন্য ছবি দেখাচ্ছে। বিপ্রদের এই ভালোবাসা দেখে যুধিষ্ঠেরের চোখে জল ভরে গেছে 'আপনারা হলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের উচিত ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা কিন্তু আমাদেরই এখন কোন বাসস্থান নেই, আহারের কোন ব্যবস্থা নেই, এখন আমি আপনাদের কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করব, কিভাবে আপনাদের সেবা করব চিন্তাই করতে পারছি না। আমাকে ভালোবেসে আপনারা এত কষ্ট সহ্য করতে স্বীকার হচ্ছেন, এটা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, আপনার সবাই ফিরে যান'।

সাংখ্য ও যোগের ব্যাখ্যা

বৈশম্পায়নের গুরু ও ব্যাসদেবের শিষ্য শৌনক মুনিও ঐ বিপ্রদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। শৌনক মুনির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বৈশম্পায়ন ঋষি বলছেন – *তমধ্যাত্মরতো বিদ্বান শৌনকো নাম বৈ দ্বিজঃ। যোগে সাংখ্যে চ কুশলো রাজানমিদমব্রবীৎ।।*৩/২/১৪। সাংখ্য ও যোগ এই দুটোতেই শৌনক মুনি তত্ত্ববিৎ ও কুশল ছিলেন, সেই শৌনক মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলছেন। গীতাতে সাংখ্য ও যোগ শব্দ দুটি বার বার আসে। সাংখ্য হল ব্রহ্ম বুদ্ধি, নিত্যানিত্য বিবেক মানে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য এই বোধটা যাঁর আছে, এটাকে বলা হয় সাংখ্য আর যোগ হল এর অনুশীলন। সেইজন্য কর্মযোগও যোগ। আবার পুরুষ ও প্রকৃতি যখন বিভেদ করা হচ্ছে আর বুদ্ধি দিয়ে যেটাকে বিচার করা হচ্ছে এবং বিচার করে যেটা মিথ্যা সেটাকে ত্যাগ করে যেটা সত্য সেটাকে ধরে রাখা হচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে সাংখ্য। এই জিনিষটাকেই যখন বিভিন্ন ভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে, যেমন আমি নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজসেবা করছি, ধ্যান করছি এইগুলো যখন করা হয় তখন যোগ বলা হচ্ছে। যখন চিন্তন করা হয় তখন সাংখ্য আর সেটা যখন কার্যে অনুশীলন করা হয় তখন বলা হয় যোগ। শৌনক মুনি একাধারে সাংখ্যে অভিজ্ঞ আবার যোগেও অভিজ্ঞ, ইদানিং কালে এর একমাত্র উদাহরণ হলেন স্বামীজী। স্বামীজী যেমন নিত্য ও অনিত্যের বিচার করতেন আবার কর্মেও তাঁর কুশলতা ছিল। ঠাকুর সেই অর্থে যোগী ছিলেন না, যে অর্থে স্বামীজী যোগী ছিলেন। ঠাকুর যখন সাধনা করেছিলেন তখন অনেক কিছুই অনুশীলন করেছিলেন কিন্তু পরে তিনি স্বামীজীর মত কাজ করতে পারতেন না। ঠাকুরের শারীরিক গঠন এমনই ছিল যে ঐ শরীর দিয়ে তিনি কর্মযোগ করতে পারতেন না, আর ঠাকুর এমন অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন যে তিনি যোগীর ঐ অবস্থাটাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট

এখান থেকে মহাভারত আস্তে আস্তে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রে এই দুটি শব্দ বার বার আসবে – শোক আর মোহ। শোক হচ্ছে যেটা চলে গেছে সেটার জন্য চোখের জল ফেলা আর মোহ হল যেটা আছে সেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখা, সেটা চলে যেতে পারে ভেবে আবার তার জন্য আসে ভয়। শৌনক মুনি যুধিষ্ঠিরকে

বলছেন – 'শোক আর ভয়ের পেছনে মানুষের হাজারটা কারণ থাকে। শোক আর ভয় মূঢ় মানুষকেই বেশী আক্রমণ করে, যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের কিছু হয় না। যে কোন জ্ঞান বিরোধী কথা আর অশ্রেয়স্কর কর্মে যুধিষ্ঠিরের মত জ্ঞানীরা কখন আসক্ত হন না। হে যুধিষ্ঠির! আমি আপনার মনের প্রসন্নতা ও অভিজ্ঞতার জন্য রাজা জনক কিছু কিছু শ্লোক বলেছিলেন সেগুলো আপনাকে বলছি শ্রবণ করুন'। যদিও আমরা রাজা জনক বলতেই মনে করি সীতার বাবা ও শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর মশাই। কিন্তু মিথিলাতে যিনিই রাজা হতেন তাঁকে রাজা জনক নামে অভিহিত করা হত। মিথিলার রাজার উপর একটা আশীর্বাদ ছিল, যিনি মিথিলার রাজা হবেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন। সেই থেকে রাজা জনক একটা পরম্পরা চলে আসছে, যাজ্ঞবল্ক্যের সময় রাজা জনক ছিলেন, রাজা দশরথের সময় রাজা জনক আছেন, মহাভারতেও রাজা জনকের অনেক কাহিনী আসে, ভাগবতেও রাজা জনককে দেখা যায়। এখানে একজনই রাজা জনক নয়, রাজা জনক একটা পদের নাম আর মিথিলার যিনি রাজা হতেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হতেন আর তাঁকে রাজা জনক বলা হত। জনক শব্দটার সাথে রাজা আর ব্রহ্মজ্ঞানী ওতপ্রোত হয়ে আছে। এখানে শৌনক মুনি কিছু শ্লোক বলছেন যেগুলো রাজা জনক বলেছিলেন, তবে কোথায় ও কাকে বলেছিলেন সেই ব্যাপারে কোন উল্লেখ করা নেই। শৌনক মুনির কাছে কোন এক পরম্পরাতে এই শ্লোক গুলি এসেছিল, তিনি আবার সেগুলো বৈশম্পায়নকে বলেছিলেন, এখন সেটাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন।

বলছেন 'মানুষের জীবনে দু রকমের কষ্ট এসে থাকে, শারীরিক ও মানসিক। আর এই দুটি কষ্ট থেকেই মানুষের জীবন অশান্ত হয়ে ওঠে। শারীরিক দুঃখের কারণ চারটি ১) রোগ। ২) অপ্রিয় ঘটনা যেমন ভূমিকম্প হল বাড়িটা ভেঙে গেল এটা হল অপ্রিয় ঘটনা। ৩) অত্যধিক পরিশ্রম আর ৪) প্রিয় বস্তুর বিয়োগ, একটা প্রিয় বস্তু কিছু ছিল সেটা হারিয়ে গেছে। শারীরিক দুঃখের এই চারটি কারণকে আটকানোর দুটো পথ। ১) ঠিক সময়ে প্রতিকার আর ২) যদি অঘটন কিছু ঘটে যায় পরে কক্ষণ ঐ নিয়ে চিন্তন না করা। দুটো পথ – ঠিক সময় প্রতিকার নেওয়া আর পরে পশ্চাৎতাপ না করা। যাঁরা বিদ্বান পুরুষ তাঁরা প্রথমে মানসিক অশান্তির নিরাময় করে। কিভাবে নিরাময় করেন? প্রিয় কথা বলে আর হিতকর ভোগপ্রাপ্তি করিয়ে। আমি যদি কারুর ভালো করতে চাই তাহলে তার শারীরিক কষ্টের জন্য আমি কিছু করতে পারবো না কিন্তু তার যে কোন ধরণের মানসিক কষ্টে সাহায্য করতে পারি। কিভাবে? প্রথম, মিষ্টি কথা বলে আর দ্বিতীয় একজন মানুষ যে জিনিষটা ভোগ করতে চাইছে, যদি সেটা তার পক্ষে হিতকর হয় সেটাকে পেতে তাকে সাহায্য করা। যেমন অর্জুনের মন সুভদ্রার উপর এমন পড়ে গেছে যে তাঁর মন অশান্ত হয়ে গেছে, শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের বোনকেই অপহরণ করার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। এটা হিতকর, অর্জুনের সাথে যদি সুভদ্রার বিয়ে হয় তাতে অহিতকর কিছু নেই, অন্য দিকে দুটো রাজশক্তির মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে। এই দুটো করলে তার মানসিক কষ্টটা লাঘব হয়ে যাবে।

এখানে মহাভারতে খুব সুন্দর একটি শ্লোক বলছে – *মানসেন তু দুঃখেন শরীরমুপতপ্যতে। অয়ঃপিণ্ডেন তপ্তেন কুম্ভসংস্থমিবোদকম্।।৩/২/২৪*। মনের মধ্যে কোন কষ্ট হলে শরীরের প্রচণ্ড ক্ষতি করে দেয়। শরীরের কষ্ট কিন্তু মনকে সেই রকম খারাপ করে না কিন্তু মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হবে। এখানে উপমা দিচ্ছেন ঠিক যেমন তপ্ত লৌহ পিণ্ডকে জলের মধ্যে রাখলে জল গরম হয়ে যায়। শৌনক মুনি বলছেন – যে ভাবে আগুনকে জল দিয়ে শান্ত করা হয় ঠিক সেইভাবে সঠিক জ্ঞান বিচারের দ্বারা মনের দুঃখকে সরাতে হয়। মনের দুঃখ দূর হয়ে গেলে মানুষের শরীরের দুঃখটাও দূর হয়ে যায়। সেইজন্য যদি কারুর শরীর সব সময় নানা ব্যাধিতে জর্জরিত থাকে বুঝতে হবে তাদের মনে অনেক দুঃখ বেদনা জমে আছে।

এই যে বলা হল যদি কারুর মনে দুঃখ থাকে তাহলে তাকে প্রিয় কথা বলে মনে শান্তি দিতে হয়। এর আবার কয়েকটি ধাপ আছে। শারীরিক ব্যাধি যদি থাকে তাহলে ওষুধ-পত্র ও পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া করে ব্যাধিকে সারাতে হয়। আমার পা ভেঙে গেছে, হাটা-চলা করতে পারছি না, তখন নিজেকে বলতে হয় আমাকে তো ডাক্তার দেখছেই, আমার প্রিয়জনরাতো আমার কাছেই আছে আমার তো দুঃখ করার কিছু নেই। মার যখন শরীর খারাপ হয় তখন মা ভাবে – আমার শরীর খারাপ হলে আমার বাচ্চাকে কে দেখবে! এর জোরেই মা কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ে। যদি দেখা যায় শারীরিক কষ্টে বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদছে, বুঝতে হবে এর ভালোবাসার কেউ নেই, সেও কাউকে ভালোবাসে না। ভালোবাসার লোক যদি থাকে তাহলে শরীরের যতই কষ্ট হোক সে কাঁদবে না। শারীরিক ব্যাধির ক্ষেত্রে মানসিক সহায়তার দ্বারা রোগ সারানো যায়। ছোট বাচ্চার জ্বর হয়েছে, খুব কাঁদছে, মা যেমনি বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলে – বাবা কোন ভয় নেই এই তো আমি আছি, তখন সে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যায়। শরীরে কোন কষ্ট নেই অথচ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না, কখন বলছে

আমার কোমরে ব্যাথা, কখন বলছে আমার হাঁটুতে ব্যাথা, কখন বলছে মাথা যন্ত্রণা করছে। এগুলো সব মনের থেকে উঠছে, বুঝতে হবে এর মাথায় গোলমাল হয়েছে। তার মানে, এর ভালোবাসার লোক নেই। তখন তাকে বোঝাতে হয় – দেখো, তোমার কোন অসুখ টসুখ নেই, তোমার মনেই যত কষ্ট। তোমার প্রিয় বস্তু কি, কোন জিনিষটা তোমার ভালো লাগে আমাকে বল, আমি জোগাড় করার চেষ্টা করছি। তাকে এও বোঝাতে হয় যে তুমি অনৈতিক কিছুতো করোনি, অধর্ম কাজ তোমার দ্বারা কখনই হয় না, তাহলে কেন তুমি মিছিমিছি মন খারাপ করে পড়ে আছ।

একটি যুবতী মেয়ে হঠাৎ করে বিধবা হয়ে গেল, এখন সে এমনিতেই ভেঙে পড়বে। ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতে হবে তার শরীরটা যাতে ভেঙে না যায়, তাই ওষুধ-পত্র আর ঠিক সময় খাওয়া-দাওয়া দিয়ে তাকে সুস্থ রাখতে হবে। এতে শোক তার যাবে না, তিন-চার দিন তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতে হবে শোক করার জন্য। এরপর ধীরে ধীরে তাকে বোঝাতে হবে তোমার স্বামী তো অধর্ম কিছু করেনি, তুমিও কোন অধর্ম কিছু করোনি তাই এতো শোক করার কিছু নেই। এইভাবে তাকে নৈতিক বল দিলে সেও আস্তে আস্তে শোকটা কাটিয়ে ওঠে। মানুষ যদি অনৈতিক বা পাপাচরণ কিছু করে থাকে তখন ঐ আচরণটাই পরে মনের মধ্যে খুঁত খুঁত করে মনের সাম্য ভাবটাকে নষ্ট করে দেয়। মনের সাম্য ভাবে গোলমাল করতে শুরু করলে সেটা শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। তখন কিন্তু ঠাকুরের শরণাপন্ন হতে হয় – হে ঠাকুর, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে তুমি আমাকে এবারের মত ক্ষমা করে দাও। আমাদের মধ্যে চার ধরণের শক্তি কাজ করে, শারীরিক বল, মানসিক বল, নৈতিক বল ও আধ্যাত্মিক বল। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বল সব থেকে ক্ষমতাশালী। আধ্যাত্মিক বল নৈতিক দুর্বলতাকে নাশ করে দেয়, আমি ঠাকুরের নাম করেছি আমার আবার কিসের পাপ, এই ভাবটাই নৈতিক দুর্বলতাকে দূর করে দেয়। আমি যদি নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে মনে করি, যেমন গান্ধীজী বলতেন আমি নৈতিক বলে পরিপূর্ণ তুমি আমাকে লাঠি মারবে মারো আমার কিছু আসে যায় না, এই নৈতিক বল যখন কারুর মধ্যে আসে তখন কেউ তাকে কিছু করতে পারবে না। ঠিক তেমনি মানসিক বল যখন থাকে তখনও তার কোন কিছুতে ভয় থাকে না, আমাকে সবাই ভালোবাসছে, সবাই আমার পাশে আছে আমাকে যদি মরতে হয় তো মরবো। শারীরিক বল থাকলে সে সব কিছু সহ্য করে নিতে পারে। এই চারটে বলের ঘাটতি যাদের মধ্যে থাকে তারাই দুঃখ-কষ্ট পায়। কারুর যদি সব সময় শরীরে ব্যাধি লেগে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার মানসিক বলের ঘাটতি আছে, মানসিক বলের ঘাটতি থাকলে বুঝতে হবে তার নৈতিক বল নেই, নৈতিক বল না থাকলে বুঝতে হবে ভগবানে তার আস্থা বা বিশ্বাস নেই। যখন কারুর ঈশ্বরের সাথে যোগ হয়ে যাবে, হাতজোড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকে তখন তার নৈতিক বলটা জেগে ওঠে।

এতক্ষণ বললেন শারীরিক বলের ঘাটতির পেছনে কারণ হল তার মানসিক বলের অভাব। মানসিক বলের অভাব কেন হয় বলতে গিয়ে বলছেন এর পেছনে তিনটে কারণ – মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। আর এই তিনটেই খারাপ হওয়ার কারণ - *মনসো দুঃখমূলন্তু স্নেহ ইত্যুপলক্ষতে। স্নেহাত্তু সজ্জতে জন্তুর্দুঃখযোগমুপৈতি চ।।*৩/২/২৬। মনের দুঃখের কারণ একটিই, সেটা হল সাংসারিক বস্তুতে অত্যাধিক স্নেহ। মানসিক সন্তাপের একমাত্র কারণ হল সংসারে আসক্তি, এই আসক্তির কারণেই মানুষ দুঃখ পায়। আসক্তি হেতু আসে ভয়, একজনকে ভালোবাসছি সে মরে যেতে পারে তাই ভয় হয় কারণ তার প্রতি আমার আসক্তি আছে। শুধু তাই নয়, শোক, হর্ষ, আনন্দ, ক্লেশ এই সব কিছুর মূলে হল আসক্তি। সাংসারিক কোন বিষয়ের প্রতি যদি একটুও আসক্তি থাকে তাহলে এই আসক্তিই আমার ধর্ম ও অর্থকে নাশ করে দেবে। এখানে আসক্তি কামেরই একটা রূপ।

প্রকৃত ত্যাগীর লক্ষণ

ঠিক ঠিক ত্যাগী কে? বলছেন যারা বিষয় থেকে পালিয়ে আছে তারা কিন্তু আসল ত্যাগী নয়। যারা বিষয়ে দোষ দর্শন করে বিষয়কে ত্যাগ করে তারাই ত্যাগী। ঠাকুর পুরুষ ভক্তদের বলছেন – এই নারী শরীরের প্রতি এত আকর্ষণ, ভালো করে বিচার করে দেখো তো এই শরীরের মধ্যে কি আছে! এটাই হচ্ছে দোষ দর্শন। গীতাতেও এই একই কথা বলছেন ভগবান – *জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্*। ঠিক তেমনি অর্থ উপার্জন করতে কত পরিশ্রম, অর্থকে ধরে রাখলে চিন্তার কারণ, অর্থ চলে গেলে শোক। তাই এত অর্থ আয় করে কি হবে। শরীর চালাতে গেলে অর্থের দরকার, তার জন্য অর্থ উপার্জনের জন্য শাস্ত্র কোথাও নিষেধ করছে না, শুধু আসক্তিটাকে বারণ করা হচ্ছে। তাহলে ঠিক ঠিক ত্যাগী কে? যে বিষয়ের মধ্যে দোষ দর্শন করে তারপর দোষ দেখার পর তৎক্ষণাৎ সেটাকে ত্যাগ করে। তাই বলছেন – *তস্মাৎ স্নেহং ন লিপ্সেত মিত্রেভ্যো ধনসঞ্চয়াৎ। স্বশরীরসমুত্থঞ্চ জ্ঞানেন বিনির্বত্তয়েৎ।।*৩/২/৩১। প্রাপ্ত ধন সম্পত্তি ও

মিত্রেও বেশী আসক্তি রাখতে নেই। আমি যদি বিরাট বড়লোক বাড়ির লোক হই, আমার প্রচুর ধন সম্পদ আছে। এখন আমি ঠিক করলাম আমি আর বেশী টাকা পয়সা আয় করতে যাবো না, এখানে তা বলা হচ্ছে না, তোমার যা ধন সম্পদ আছে তাতেও তুমি বেশী আসক্তি রাখবে না। আর মিত্র, একজন পুরুষের সব থেকে বড় মিত্র হল তার স্ত্রী। যদি স্ত্রীর প্রতি বেশী আসক্তি থাকে তাহলে তাকেও কাঁদতে হবে, স্ত্রী মরে যেতে পারে, স্ত্রী আমার কথা না মানতে পারে, স্ত্রী স্বৈরাচারিণী হয়ে যেতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। শুধু স্ত্রী নয়, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব কারুর প্রতি আসক্তি থাকলেই তাকে কষ্ট পেতেই হবে, আজ হোক কাল হোক এই আসক্তির জন্য তাকে চোখের জল ফেলতেই হবে। সাধারণ বুদ্ধির মানুষের পক্ষে তৃষ্ণার ত্যাগ সম্ভব হয় না, এদের শরীর জীর্ণ হয়ে গেলেও তৃষ্ণা কখনই জীর্ণ হবে না। বৃদ্ধ অবস্থায় এদের খুব করুণ পরিস্থিতি হয়, ভালো-মন্দ কিছু খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও খেতে পারেনা শরীরের জন্য, শরীরই নিতে পারেনা, কোথাও বেড়াতে যেতে খুব ইচ্ছে হয় কিন্তু চলার শক্তি থাকে না। তৃষ্ণার মজার ব্যাপার হল, তৃষ্ণা এই শরীরটাকে আগে আশ্রয় করে, তারপর এই শরীরকে নিজের ইচ্ছা মত ব্যবহার করতে থাকে। ব্যবহার করে করে শরীরটাকে জীর্ণ করে দেয় আর নিজে দিনে দিনে বড় হতে থাকে। এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। যোহসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্।।৩/২/৩৫*। আমার শরীরকে জীর্ণ করে দেবে কিন্তু সে কখনই জীর্ণ হবে না। তাই বলা হচ্ছে এই প্রাণ নাশক তৃষ্ণাকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত কখনই শান্তি হবে না। এই তৃষ্ণা মানুষের মধ্যেই থাকে কিন্তু এর কোন আদি অন্ত নেই। এইটাই হল কাম, কাম আদি অন্তহীন অথচ থাকে মানুষের ভেতরে। কাম এই শরীরকে ব্যবহার করে, ব্যবহার করে যখন শরীরটা ছিবড়ে হয়ে গেল তখন এই শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা শরীর নিয়ে এগিয়ে যাবে। যেমন কাঠে কাঠ ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলে আর সেই কাঠকেই আগুন পুড়িয়ে দেয়। ঠিক তেমনি মানুষের ভেতর থেকেই লোভ সৃষ্টি হয় আর এই লোভই মানুষকে শেষ করে দেয়। ক্যান্সার রোগও ঠিক তাই করে, শরীরকে আশ্রয় করে বড় হয় আর শরীরটাকেই শেষ করে দেয়।

অর্থ থেকে কত রকমের ভয়, সন্তোষেই পরম সুখ

তৃষ্ণার পর বলছেন অর্থ নিয়ে। যাদের কাছে প্রচুর অর্থ আছে তারা রাজা, জল, অগ্নি, চোর আর স্বজন থেকে ঠিক সেই রকম ভয় পায় যেভাবে মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। যাদের কাছে প্রচুর টাকা আছে তারা রাজা, মানে ইনকাম ট্যাক্স, ওয়েলথ ট্যাক্সওয়ালাদের খুব ভয় পায়, ভারতে আয়কর দপ্তর এতটা কড়াকড়ি না হলেও বিদেশে একটু এদিক সেদিক হলে খুব বিপদ হয়ে যায়। জল বলতে বোঝাচ্ছে, আগেকার দিনে লোকেদের প্রচুর জমি-জায়গা থাকত, অনেক পয়সা খরচ করে চাষবাশ করেছে এখন বন্যা হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে, তাই জলকে খুব ভয় পায়। অগ্নি, প্রচুর সম্পত্তি আছে কিন্তু যদি আগুন লেগে যায় সব পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তাই আগুনকে খুব ভয় পায়। আর চোরের ভয় তো সব সময় থাকে। তবে সব থেকে মজার হল স্বজন। অনেক টাকা-পয়সা থাকলে আত্মীয় স্বজন কাউকে দেখলেই মৃত্যুকে যেমন ভয় পায় সেই রকম ভয় পায়, এই বুঝি টাকা-পয়সা কিছু চাইতে এসেছে। জল আর অগ্নির থেকে বেশী ভয় হয় রাজা মানে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, চোর আর স্বজন থেকে। সেইজন্য শেষে বলছেন – *অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্। তস্মাৎ সন্তোষমেবেহ পরং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।।৩/২/৪৪*। এই শ্লোকটিও খুব বিখ্যাত একটি শ্লোক, তৃষ্ণার কোন শেষ নেই সেইজন্য সন্তোষই পরম সুখ, যেটা পেয়েছ সেটাকে নিয়েই তৃপ্ত থাক। সেইজন্য জ্ঞানীরা সন্তোষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁদের কাছে যা থাকে তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে শান্ত থাকেন।

অনিত্য বস্তু সমূহ

বলছেন *অনিত্যং যৌবন রূপং জীবিতং রত্নসঞ্চয়ঃ। ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ।।* ৩/২/৪৫। কয়েকটি জিনিষ অনিত্য যেমন যৌবন, রূপ, জীবন, অর্থ ও ঐশ্বর্যের সঞ্চয় আর প্রিয় লোকের একত্র বাস, এই সব কটিই অনিত্য। আমরা চারজন বন্ধু একত্রে থাকি বলে ভাবছি আমাদের এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী। কিন্ত না, কয়েকদিন পরে দেখা যাবে একজন সরে গেছে। সেই ছোটবেলা থেকে কত পরিচিত লোক দেখে এসেছি কিন্তু এখন তাদের অনেকেই নেই, কারণ তারা সবাই মারা গেছে। সারা জীবন টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে এসেছি কিন্তু একটা সময় দেখছি সব হাতের থেকে বেরিয়ে গেছে। আর যৌবন ও রূপ, একটা সময়ের পর যৌবনও চলে যায় আর রূপের কোন চিহ্নই থাকে না। এগুলো সবই অনিত্য। এখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – ধর্ম কাজের জন্যও যদি কেউ অর্থ উপার্জন করছে বলে সেটাও অন্যায়, কারণ নোংরা লাগিয়ে নোংরাকে ধোয়ার থেকে ভালো নোংরা না লাগানো। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বর যদি সামনে এসে বলেন তুমি কি চাও বল, তাহলে কি তুমি তার কাছে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি আর স্কুল চাইবে!

মানুষ যদি কিছু ধর্মকাজের জন্য টাকা চায়, আমি সাধুসেবা করব, তীর্থ করব, মন্দির বানাব, মহাভারত বলছে এসবের জন্যও টাকা পয়সা রোজগার করতে যেও না, এগুলো হল আগে গায়ে নোংরা লাগিয়ে নিয়ে নোংরাটাকে ধোওয়া। মহাভারত বলছে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর তোমার কর্মফলের জন্য যা আসবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

সৎ পুরুষের গৃহের লক্ষণ, পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণা

এইসব শুনে যুধিষ্ঠির বলছেন – আপনি ঠিকই বলছেন, গৃহস্থের ধর্ম হল সংসারে সব কাজ করবে, রান্নাবান্না করবে সবার দেখাশোনা করবে। যুধিষ্ঠির বলছেন – *তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা। সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।*৩/২/৫২। সৎ পুরুষের গৃহে চারটে জিনিষের কখনই অভাব হয় না – আসন, বসার স্থান, জল আর মিষ্টি কথা। গৃহস্থ যতই দরিদ্র হয়ে থাকুক বাড়িতে কেউ এলে তাকে বসার জন্য কিছু না কিছু আসন বা দু আঁটি ঘাসও দেওয়া যেতে পারে, বাড়িতে যে কোন জায়গাতে বসাতে পার, খাওয়ার জন্য জলের অভাব হবে না, এক গ্লাশ জল অন্তত দেওয়া যেতে পারে আর মিষ্টি কথা বলতেই পার। যতই তুমি দরিদ্র হয়ে থাকো না কেন এই চারটে জিনিষ দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে কোন অসুবিধা হয় না। রান্নাবান্না যখন গৃহস্থ করবে তখন সে শুধু নিজের জন্যই করবে না। এইখান থেকেই পরের দিকের পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণা শুরু হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের পর অর্থাৎ পশুদের খাওয়ানো, অতিথিদের খাওয়ানো, পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদন, দেবতাদের অর্পণ করার পর যে অবশিষ্ঠ অন্নটা খাওয়া হয় এই অন্নটাই অমৃত। এই অন্ন অতি পবিত্র আর এই পবিত্র অন্ন ভক্ষণ করলে মানুষের কখন কোন পাপ লাগে না।

ধর্ম পথের আটটি মার্গ

শৌনক মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – *ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা দমঃ। অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্মশ্চাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।।*৩/২/৭৩। জীবন-যাপন করে ধর্ম পথে যাবার জন্য আটটি মার্গ বা ধাপের কথা বলা হয়েছে। এই আটটি মার্গ হল – যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, সংযম ও অলোলুপ মানে লোভের পরিত্যাগ। প্রথম চারটি, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান ও তপঃ হল পিতৃযানের মার্গ। এই চারটি করা থাকলে মানুষ পিতৃলোকে যায় আর শেষ চারটি সত্য, ক্ষমা, সংযম ও লোভের পরিত্যাগ হল দেবযানের মার্গ। প্রথম চারটি করে আগে মনটা পরিষ্কার করে নিতে হয়, এই চারটিই কর্মযোগের মধ্যে পড়ছে আর এই চারটি হল বহিরঙ্গ সাধনা। কিন্তু পরের চারটিকে জ্ঞানযোগের মধ্যে বা অন্তরঙ্গ সাধন বলে। বহিরঙ্গ সাধনা ঠিক ভাবে করলে তাতে সে পিতৃলোকে চলে যায়। যতক্ষণ বহিরঙ্গ সাধনা না করা থাকে ততক্ষণ কেউ অন্তরঙ্গ সাধনা করতে পারবে না। যদি কেউ বলে আমি যজ্ঞ, দান, তপস্যায় বিশ্বাস করিনা কিন্তু সত্যে বিশ্বাস আছে, বুঝতে হবে সে পাটোয়ারি করছে বা ধাপ্পা মারছে। এটা মনে রাখতে হবে যতক্ষণ কেউ যজ্ঞ না করে থাকে, শাস্ত্র অধ্যয়ণ না করে থাকে, দান না করে থাকে আর তপস্যা যদি না করে থাকে তাহলে কখনই সত্য, ক্ষমা, সংযম ও অলোলুপত্বের সাধনা করতে পারবে না। প্রথম চারটে দিয়ে মানে কর্মযোগের মাধ্যমে নিজের শরীরকে শুদ্ধ করা হয় আর শেষের চারটির সাহায্যে মনকে শুদ্ধ করে মনকে উপরের দিকে নিয়ে যায়। আমরা যা কিছু কর্ম করছি তার মধ্যে কিছু কর্ম শরীরের দ্বারা করা হয় আর কিছু কর্ম মনের মাধ্যমে করা হয়। শরীরের দ্বারা যে কর্ম করা হয় সেই কর্ম আমাদের পিতৃলোকে নিয়ে যায়। মনের কর্ম দ্বারা মানুষ দেবলোকে যায়। কিন্তু যতক্ষণ শরীরের কর্ম না করা হবে ততক্ষণ এই মনের কর্ম করতে সক্ষম হবে না। সত্যে প্রতির্ষ্ঠিত হওয়ার জন্য আগে চারটে কর্ম করা থাকতে হবে।

সূর্যদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে অক্ষয়পাত্র দান

যুধিষ্ঠিরের বনে এসে আরেক দুশ্চিন্তা হয়েছে। এত ব্রাহ্মণ, ঋষিরা সবাই পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। এখন এত ব্রাহ্মণদের খাওয়ানো, সেবা করা জঙ্গলের মধ্যে কি করে সম্ভব! পাণ্ডবদের পুরোহিত ছিলেন ধৌম্য ঋষি, তিনি যুধিষ্ঠিরকে সূর্যের উপাসনা করার পরামর্শ দিলেন। কারণ সূর্যই এই বিশ্ব চরাচরের সব কিছুর পোষণ করছেন, সূর্যের রশ্মি থেকেই জল বাষ্প হয়ে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির ফলে এই গাছপালার জন্ম হচ্ছে, সেই গাছপালা খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। আমাদের এই জীবন পুরোটাই সূর্যের উপরই নির্ভর করে চলছে। মুনি ঋষিরা কত যুগ আগে বলে গেছেন এই গাছপালা সব সূর্যের রশ্মিতে ফটো সিন্থেসিসের মাধ্যমে বড় হচ্ছে, এই গাছপালা খেয়েই জীব জগতের জীবন দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্য না থাকলে জীবনের স্পন্দনই হতো না। এমনকি পাশ্চাত্যে আগে কেউ এই ধারণা করতেই পারতো না যে সূর্যের জন্যই সব হচ্ছে, এরা ভগবানের উপর সব কিছু চালিয়ে দিত। যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন কিভাবে সূর্যের উপাসনা করতে হয়। ধৌম্য ঋষি তখন সূর্যের একশ আটটি নামের একটা স্তোত্র বলে দিয়ে বললেন তুমি এটাকে পাঠ কর আর মনকে সূর্যের উপর

একাগ্র কর। যুধিষ্ঠির খুব নিষ্ঠা ভরে সূর্যের প্রার্থনা করাতে সূর্য খুব সন্তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠিরকে অক্ষয় পাত্র দিলেন। অক্ষয় পাত্র দিয়ে সূর্য যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই অক্ষয় পাত্র তোমার কোন চেষ্টা ছাড়াই বারো বছর পর্যন্ত তোমাকে সমস্ত অন্ন প্রদান করে যাবে। বারো বছর শেষ হয়ে গেলে এই অক্ষয় পাত্র আমার কাছে ফেরত চলে আসবে। এই অক্ষয় পাত্রটি তাম্রপাত্র ছিল। এরমধ্যে – *ফলমূলামিষং শাকং সংস্কৃতং যন্মহানসে। চতুর্বিধং তদন্নাদ্যমক্ষয্যং তে ভবিষ্যতি।।৩/৪/৪২।* এই অক্ষয় পাত্রে পাকশালায় পক্ক ফল, মূল, আমিষ ও শাক প্রভৃতি যা কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখবে সেগুলো সব অক্ষয় থাকবে, তুমি সমস্ত লোককে পরিবেশন করে পরিতুষ্টি সহকারে খাওয়ার পরও চতুর্বিধ দ্রব্য অক্ষয় থাকবে, কোন খাদ্য দ্রব্যই শেষ হবে না। কিন্তু দ্রৌপদীর আহারের পর তখনকার মত এটা শেষ হয়ে যাবে। বারো বছর শেষ হয়ে যখন তেরো বছরে পড়বে তখন এই অক্ষয় পাত্র আমার কাছে ফেরত চলে আসবে, তবে তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি চৌদ্দ বছর পর তুমি তোমার সব কিছু আবার ফেরত পেয়ে যাবে। এই সব বলে সূর্য বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বিদুরকে অপমান এবং বিদুরের পাণ্ডবদের কাছে গমন

এদিকে বিদুর পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে ধৃতরাষ্ট্রকে খুব গালমন্দ করে বলছেন 'আপনি এই যা করলেন এতে কুরুবংশের নাশ হতে আর বেশী দেরী নেই, আপনি কিন্তু ঠিক করেননি'। বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র খুব রেগে অনেক গালমন্দ করার পর বলছেন 'বিদুর! তুমি সব সময় পাণ্ডবদের পক্ষই অবলম্বন করে কথা বল'। ধৃতরাষ্ট্রের গালমন্দ শুনে বিদুর খুব অপমানিত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে এসেছেন। এখানে এসে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন।

বিদুর পাণ্ডবদের কাছে ফিরে এসে খুব দুঃখ করে বলছেন – *পরং শ্রেয়ঃ পাণ্ডবেয়া ময়োক্তং ন মে তচ্চ শ্রুতবানাম্বিকেয়ঃ। যথাতুরস্যেব হি পথ্যমন্নং ন রোচতে স্মাস্য তদুচ্যমানম্।।৩/৬/১৪।*রুগীর যেমন হিতকর পথ্য কিছুতেই পছন্দ হয় না, ঠিক তেমনি যাদের বিনাশের সময় এসে যায় তারাও কোন হিত কথা গ্রহণ করতে পারেনা, ধৃতরাষ্ট্রেরও তেমন আমার কথায় রুচি হয়নি। *ন শ্রেয়সে নীয়তেহজাতশত্রো! স্ত্রী শ্রোত্রিয়স্যেব গৃহে প্রদুষ্টা। ধ্রুবং ন রোচেদ্ভরতর্ষভস্য পতিঃ কুমার্য্যা ইব ষষ্টিবর্ষঃ।।৩/৬/১৫।* হে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির! শ্রোত্রিয়ের বাড়ির স্ত্রী, মানে যারা খুব উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ, তাদের বাড়ির কুলস্ত্রী যদি দুষ্টা হয়ে যায়, বাজে পথে চলে যায় ঐ নারীকে আর ঠিক পথে কোন মতেই ফিরিয়ে আনা যায় না। ঠিক তেমনি ধৃতরাষ্ট্রকে আর কোন দিন ধর্মমার্গে ফিরিয়ে আনা যাবে না। এখানে যেটা লক্ষণীয় তা হল *শ্রোত্রিয়স্য স্ত্রী*, শ্রোত্রিয়ের বাড়ির কুলবধু, এমনি কুলবধু বলে দিলেই তো পারতেন। মহাভারত খুব মনযোগ দিয়ে না পড়লে অনেক কিছু হারিয়ে যাবে। এখানে তা না বলে বলছেন উচ্চবংশের ব্রাহ্মণের স্ত্রী। এই শব্দগুলোর প্রচণ্ড গুরুত্ব আছে, এমনি মামুলি কিছু বলে দিচ্ছেন না। এখানে শুধু উচ্চবংশের কথা বলা হচ্ছে না, উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ পরিবার। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বংশ, যেখানে বেদের প্রচুর যজ্ঞ-যাগ হচ্ছে সেই ধরণের বংশের বধুদের প্রতিটি পদক্ষেপ শাস্ত্রীয় বিধি, আচার ও অনুষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আজকে তুমি চুল আঁচড়াতে পারবে না, আজকে তুমি এই ধরণের খাবার খেতে পারবে না, আজকে তুমি অমুক করতে পারবে না। এখনকার দিনে বাড়ির কোন বউ যদি বেগড়বাই করে তখন তাকে স্বামীর সঙ্গে কোথায় ঘুরতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, বাইরে থেকে একটু আমোদ-আহ্লাদ করে আসার পর তখন তার মনটাও শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু শ্রোত্রিয় পরিবারের বউদের ঐ রকম কিছু করতেই দেবে না, বাড়ির স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের ধর্মকে কখনই তাঁরা ত্যাগ করতে পারবেন না। আর যদি সাধারণ বড়লোক বাড়ির বউ হয় তারা তাকে ভোগ বিলাস দিয়ে মন ঘুরিয়ে দেবে। যদি নিম্ন বংশের হয় তারা দরকার পড়লে বউকে পিটিয়ে পথে নিয়ে আসবে। শ্রোত্রিয়ের বাড়ির লোকেরা এর কোনটাই পারবে না, সেইজন্য বলছেন শ্রোত্রিয় বাড়ি কুলস্ত্রী নষ্টা হলে তাকে পথে আনা যায় না। বিদুর বলছেন – কুমারী মেয়েকে যদি ষাট বছরের বরের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় সে ঐ বরকে কোন দিন সেই কুমারী পছন্দ করবে না। ঠিক তেমনি ধৃতরাষ্ট্র ভালো কথা কোন দিন পছন্দ করবে না।

বিদুরের উপর ধৃতরাষ্ট্র এতই রেগে গিয়েছিলেন যে বিদুরকে বলেছিলেন – *ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রোহব্রবীন্মাং যস্মিন্ শ্রদ্ধা ভারত! যাহি তত্র। নাহং ভূয়ঃ কাময়ে ত্বাং সহায়ং মহীমিমাং পালয়িতুং পুরং বা।।৩/৬/১৭।* তোমার যেখানে শ্রদ্ধা আছে, যেখানে তোমার মন লাগে সেখানেই তুমি চলে যেতে পার। আমার এই হস্তিনাপুরের রাজ্যকে চালানোর জন্য তোমার আর সাহায্যের দরকার নেই। এইসব বলে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – *ক্লেশৈস্তীব্রৈর্যুজ্যমানঃ সপত্নৈঃ ক্ষমাং কুর্ব্বন্ কালমুপাসতে যঃ। সংবর্দ্ধয়ন্ স্তোকমিবাগ্নিমাত্মবান্ স বৈ ভুঙ্ক্তে পৃথিবীমেক*

এব। ।৩/৬/১৯। হে যুধিষ্ঠির! তুমি এটা মাথায় রেখো, শত্রু যখন তোমাকে দুঃসহ পীড়ন দিচ্ছে তখন এই পীড়নকে যদি তুমি সহ্য করতে থাক আর তোমার সময়ের অপেক্ষা যদি করতে থাক, তাহলে এতেই সামান্য কিছুতেই তোমার শত্রু একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। তুমি যদি দুঃখ রূপ শুকনো ঘাস জমিয়ে যেতে থাক, জমতে জমতে শুকনো ঘাসের স্তুপাকার হয়ে গেছে, এখন একটি স্ফুলিঙ্গ ঐ ঘাসের স্তুপকে নিমেষে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। তুমি যে সহ্য করে যাচ্ছ এটা কিন্তু দুর্যোধনের পক্ষে ইন্ধন জমা হচ্ছে। হে যুধিষ্ঠির তুমি একজন শ্রেষ্ঠ রাজা, তুমি কয়েকটি জিনিষকে পালন করতে থাকবে, তাহলে তোমার কখনই নাশ হবে না। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে যেটা করতে বলছেন এটা হল রাজা বা গৃহস্থের উন্নতির মূলে যে গুলো দরকার – *সত্যং শ্রেয়ঃ পাণ্ডব! বিপ্রলাপং তুল্যঞ্চান্নং সহ ভোজ্যং সহায়ৈঃ। আত্মা চৈষামগ্রতো ন স্ম পূজ্য এবংবৃত্তির্বর্দ্ধতে ভূমিপালঃ।* ।৩/৬/২১। প্রথম হল, বৃথা বক্‌বক্ না করে অল্প কথায় সত্যি কথা বলা, যারা বেশী কথা বলে তাদের কথার মধ্যে সত্য কথা কমই থাকে। যারা আমাকে সাহায্য করছে তাদের সাথে সমান অন্ন ভোজন করবে। যেমন স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান, এরা একে অপরকে সাহায্য করছে তাই এদের মধ্যে কোন ধরণের পার্থক্য রাখবে না। এটা বাড়ির কর্তাকে বলা হচ্ছে, তুমি বাড়ির কর্তা বলে তুমি ভালোটা খাবে আর অন্যরা মন্দ খাবার খাবে তা করবে না। একই পরিবারে আপনার একজন ভাই আছে, সে বাড়ির সব কাজ সামলে দিয়ে আপনাকে সাহায্য করছে এখন আপনার খাওয়া-দাওয়ার সাথে সেই ভাইয়ের যেন কোন বৈষম্য না থাকে। আরেকজন ভাই আছে, যে কোন কাজই করে না, অকম্মার ঢেঁকি, তার কথা এখানে ধরা হচ্ছে না। বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও যে আপনার জীবন-যাত্রায় সাহায্য করছে তার সাথেও কখন বৈষম্য ভাব রাখতে নেই। পাঁচ ভাই এখন জঙ্গলে গেছেন, যুধিষ্ঠির এদের মধ্যে জেষ্ঠ্য, তাই যুধিষ্ঠিরকে বলা হচ্ছে তুমি কিন্তু কখন কারুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। আমাদের বেলুড় মঠের সমস্ত সেন্টারের সেক্রেটারী মহারাজরা সবার সাথে বসে একই খাবার খাচ্ছেন, কোন বৈষম্য নেই। এই কারণে সেক্রেটারী মহারাজদের সবাই খুব সম্মান করে। সেন্টার তো আর সেক্রেটারী মহারাজের জোরে চলছে না, সবাই মিলেই চালাচ্ছে। চাকর-বাকরদের সাথে খাওয়ার সমান করতে বলা হচ্ছে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র গুলিতে ওখানকার যে ক্লাশ ফাইভের ছাত্র, যে মেথর, মুচি, ধোপা সবাই এক খাবার খাচ্ছে। এটাই সবাইকে এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করাতে বাধ্য করছে, এর ফলে প্রচণ্ড একতা ভাব তৈরী হয়। তৃতীয় হল, অপরের সামনে নিজের প্রশংসা না করা। বেশী কথা না বলা, সমান খাওয়া-দাওয়া আর তৃতীয় নিজের প্রশংসা না করা, এই তিনটে জিনিষ যদি হেড অফ দা ফ্যামিলি করে তাহলে সেই পরিবারে কখনই কোন অশান্তি হবে না।

ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাসদেবের উপদেশ ও সুরভির উপখ্যান

বিদুর এদিকে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিচ্ছেন, অন্য দিকে হস্তিনাপুরে বিদুরকে ঐভাবে অপমানিত করে বের করে দেওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভয় ঢুকে গেছে। তিনি আবার বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। নিজের ভাই বলে কথা, বিদুরকে ডেকে আবার সব মিটমাট করে নিয়েছেন। অন্য দিকে দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন এরা সব দুষ্ট লোক ছিল, এরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে ঠিক করল, পাণ্ডবরা এখন অসহায় হয়ে জঙ্গলে পড়ে আছে এই সময় এদের সব কটাকে বধ করে দিলে সমস্ত ল্যাটা চুকে যায়। এই চক্রান্তের ব্যাপারটা ব্যাসদেব বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। তিনি এসে দুর্যোধনকে সাবধান করে বলছেন, এই ধরণের অতি জঘন্য ঘৃণ্য কাজ করতে যেও না। ফিরে যাওয়ার সময় ব্যাসদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক কথা বলে গেলেন, তার মধ্যে একটি কথা বললেন – জন্মের সময় যে জিনিষটার যেমন প্রকৃতি হয়ে যায়, সেই প্রকৃতিকে ভবিষ্যতে কোন ভাবেই দূর করা যায় না। এমন কি অমৃত দিলেও তার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হবে না। বস্তুর স্বভাব জন্মের সময় যেটা থাকে সেটা কখনই পাল্টায় না। আসলে ব্যাসদেব এখানে দুর্যোধনের কথাই বলতে চাইছেন। দুর্যোধন জন্ম থেকেই দুষ্ট স্বভাবের, একে যত উপদেশই দেওয়া হোক, যত ভালো লোকের সঙ্গ দেওয়া হোক না কেন দুর্যোধনের স্বভাব কখনই পাল্টাবার নয়। আমরা যা কিছু কাজ করছি, চিন্তা ভাবনা করছি, কথা বলছি এর সব কিছু আমাদের ভেতরে একটা ছাপ রেখে যায়, এটাকে বলা হয় সংস্কার। এই সংস্কারের পোটলা আমরা জন্ম জন্ম ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি। মানুষ যখন মারা যায় তখন সূক্ষ্ম শরীরটা এই সংস্কারের পোটলা নিয়ে স্থুল শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। মৃত্যুর সময় মানুষের যেমন চিন্তা ভাবনা থাকে মৃত্যুর পর ঐ চিন্তা ভাবনা অনুসারে তার একটা নতুন জন্ম হয়। নতুন জন্মের সময় ঐ সংস্কারগুলি যে রকম শরীরের মাধ্যমে বেরোতে পারে, সেই সংস্কারগুলিকে টেনে সংস্কারের উপযোগী একটা শরীর সে ধারণ করে নেয়, এখন তার এই শরীরটা এই সংস্কারের মধ্যেই ঘুরপাক খাবে। একেই বলা হয় প্রারব্ধ। মানুষ যখন জন্ম নেয় তখন তার একটা প্রারব্ধ আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। মানুষের মধ্যে ঘোর হিংসা হওয়ার কথা নয়, ঘোর হিংসা যদি থাকত তাহলে সে মানুষ যোনিতে জন্ম নিত না। যদিও মানুষ হয়ে জন্ম নেয় তাহলে এমন পরিবারেই সে জন্ম

নেবে যে পরিবারের লোকেরা চুরি, ডাকাতি, খুন খারাপি করে বেড়াচ্ছে। একজন মানুষ জন্ম থেকেই কাঙালী সেতো আর কাউকে তেজ দেখাবে না এটা জানা কথা, কিন্তু তার মধ্যেও বোঝা যায় সুযোগ পেলে সেও ছেড়ে দেবে না। ভিখারীরা নিজেদের মধ্যে কিছু ঝামেলা হলে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। ভিখারীকেও যদি ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয় সেও দেখিয়ে দেবে তার দাপট। আসলে মানুষ কখনই পাল্টায় না, এখন সে হয়তো মিষ্টি ব্যবহার করছে, আমরা ভাবছি এর স্বভাবটা কি সুন্দর। কিন্তু যেই ক্ষমতা পেয়ে যাবে তার আসল রূপ বেরিয়ে আসবে। তখন আমরা বলবো ক্ষমতা পেয়ে লোকটা পাল্টে গেছে। এক বিন্দুও পাল্টায়নি, ওর এই স্বভাবটা আগে থেকেই আছে কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিল না বেরিয়ে আসার তাই অন্য রকম মনে হচ্ছিল। ব্যাসদেব এই কথাই বলছেন, জন্মের সময় মানুষ যে স্বভাব নিয়ে জন্মায় সেই স্বভাব কখনই পাল্টায় না। ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাসদেব বলছেন – হে ধৃতরাষ্ট্র! পাণ্ডু যেমন আমার পুত্র ঠিক তেমনি তুমিও আমার পুত্র, তোমরা দুজনেই আমার কাছে সমান। তোমার যে সন্তান আর পাণ্ডুর যে সন্তান সবাই আমার কাছে সমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও তফাৎ আছে। কোথায় তফাৎ আছে? ব্যাসদেব তখন ধৃতরাষ্ট্রকে সুরভি উপাখ্যানের মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন। সুরভি হল স্বর্গের কামধেনু গাই। বলা হয় পৃথিবীতে যত গরু, বাছুর, ষাঁড়, বলদ আছে সব সুরভির সন্তান। সুরভি একদিন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে খুব হাউ হাউ করা কাঁদতে শুরু করেছে। সুরভির কান্না দেখে ইন্দ্র চমকে উঠেছে। ইন্দ্র সুরভিকে জিজ্ঞেস করছেন কি হয়েছে, কিসের কষ্ট তোমার বল। তখন সুরভি ইন্দ্রকে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে – ঐ দেখুন দেবরাজ ইন্দ্র, পৃথিবীর নীচ কৃষকরা আমার সন্তানকে কিভাবে পিটিয় পিটিয়ে এই রোদ জলের মধ্যে কাজ করাচ্ছে। ইন্দ্র দেখছেন, একটা লোক দুটো বলদকে লাঙলের সাথে জুড়ে নিয়ে মোটা ডাণ্ডা দিয়ে মারতে মারতে কাজ করাচ্ছে। আমি আমার সন্তানের এই কষ্ট সহ্য করতে পারছি না বলে কাঁদছি, আপনি যদি এর কিছু একটা বিহিত করে দেন। দুটো বলদই দুর্বল কিন্তু তার মধ্যেও একটার একটু জোর বেশী আরেকটা একেবারেই রুগ্ন। তখন ইন্দ্র সুরভিকে বলছেন – আমি যা দেখছি পৃথিবীতে তোমার যে হাজার হাজার সন্তান আছে এরা সবাই শুধু মারই খেয়ে যাচ্ছে, তোমার সন্তানরা শুধু মার খাওয়ার জন্যই পৃথিবীতে জন্মেছে কিন্তু হঠাৎ এর জন্য তুমি এত কাঁদছ কেন? তখন সুরভি বলছে – হে দেবরাজ! পৃথিবী যত গরু আছে সবাই আমার সন্তান, সবারই প্রতি আমার সমদৃষ্টি, সবার প্রতি আমার একই ভাব কিন্তু যে আমার খুব দীন দুখী সন্তান তার প্রতি আমার দয়া বেশী। পৃথিবীর সব গরুকেই ডাণ্ডা মারছে সুরভি স্বর্গ থেকে কিছু করতে পারছে না, কিন্তু যে গরুগুলো দুর্বল তাদেরকে যখন মারা হচ্ছে তখন সুরভির মনটা করুণায় ভরে উঠছে। এই করুণার ভাব আধ্যাত্মিক পুরুষের মধ্যে বেশী থাকে। কাদের প্রতি করুণা? দীন দুখীর প্রতি যখন করুণা আসে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত হয়েছে। ভারতের দীন দুখী কাঙালী মানুষের প্রতি স্বামীজীর কি প্রচণ্ড করুণা ছিল। ঠাকুর দেওঘরে কাঙালীদের দেখে করুণায় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। সুরভিও বলছে, পৃথিবীর সব গরু আমারই সন্তান সবার জন্যই আমার কষ্ট হয় কিন্তু তাদের মধ্যে যে বেশী দুর্বল, শীর্ণ তাদের জন্য বেশী কষ্ট হয়। মায়ের তিনটি কন্যা সন্তান, দুটি মেয়ের ভালো জায়গায় বিয়ে হয়েছে, একটির অবস্থা ভালো নয় স্বামী ভালো রোজগার নেই, সেই মেয়েকে দেখে মায়ের বেশী কষ্ট হয়। সুরভির কষ্টের কারণ শোনার পর ইন্দ্র এমন বৃষ্টি দিতে লাগলেন যে চাষী বলদ দুটোকে মাঠে ফেলে রেখে পালিয়েছে। এইভাবে বলদ দুটোকে ডাণ্ডার মার থেকে রক্ষা করলেন। এই উপখ্যান বলে ব্যাসদেব বলছেন – তোমরা সবাই আমার সন্তান, তুমি, বিদুর ও পাণ্ডু আমারই সন্তান কিন্তু এই পাণ্ডুর পুত্ররা নিতান্ত দুঃখভারে আক্রান্ত ও হীনবল আর এরা খুব সরল, ছল কপটতা এরা বোঝে না, এদের এই কষ্ট দেখে আমার খুব করুণা হচ্ছে। তুমি রাজা তাই তুমি সবাইকে ডেকে নিয়ে একটা মিটমাট করে পাণ্ডু পুত্রদের এই কষ্ট দূর করার চেষ্টা কর। এইসব কথা বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন।

মৈত্রেয় ঋষিকে দুর্যোধনের অপমান ও দুর্যোধনের প্রতি ঋষির অভিশাপ

ইতিমধ্যে মৈত্রেয় বলে একজন ঋষি ছিলেন, তিনিও হস্তিনাপুরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসেছেন। তিনিও দুর্যোধনকে খুব কড়া ভাষায় বোঝাচ্ছেন – তুমি যা করছ এগুলো খুবই নিন্দনীয়, পাণ্ডবরা যখন রেগে যাবে তখন তুমি এদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, এরপর যুদ্ধ হবেই আর সেই যুদ্ধে তুমি কোন ভাবেই এদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না, তাই তুমি এখনই পাণ্ডবদের সাথে বন্ধুত্ব করে নাও। মৈত্রয় মুনির কথা শুনে দুর্যোধন খুব রেগে গেছে। দুর্যোধন এমনিতে প্রচণ্ড শক্তিমান পুরুষ ছিল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু ওকে যদি বলে দেওয়া হত তুমি এদের সঙ্গে যুদ্ধে পারবে না তখনই রেগে যেত। দুর্যোধন তখন মৈত্রয় মুনির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। দুর্যোধনের জঙ্ঘা দুটো ছিল খুব শক্তিশালী, বলা হত হাতির শুড়ের মত জঙ্ঘা। দুর্যোধন কাপড় সরিয়ে মৈত্রয় মুনিকে জঙ্ঘা প্রদর্শন করে তার ওপর হাতের তালু দিয়ে তাল ঠুকছে আর বলছে – ও ঠিক আছে যুদ্ধ হলে দেখা যাবে কে জেতে কে হারে। প্রথমে মৈত্রয় মুনি কিছু বললেন না। কিন্তু এরপরও জঙ্ঘাতে তাল ঠুকছে আর পায়ের আঙুলের নখ দিয়ে মাটি খুটতে থাকল। মৈত্রয় মুনি

তিনি এত বড় একজন ঋষি তাঁর বাক্যকে এইভাবে তাচ্ছিল্য করাতে – *স কোপবশমাপন্নো মৈত্রেয়ো মুনিসত্তমঃ। বিধিনা সম্প্রণুদিতঃ শাপায়াস্য মনো দধে।*।৩/৯/৩১। মুনিদের মধ্যে এত উত্তম তিনি, দুর্যোধনের এই আস্পর্ধা দেখে তিনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন, বলছেন – তুমি আমাকে জঙ্ঘা দেখিয়ে আওয়াজ করছ! ঠিক আছে আমি অভিশাপ দিচ্ছি যুদ্ধে গদার আঘাতে তোমার এই জঙ্ঘাটা ভেঙে যাবে। এই অভিশাপ শুনতেই ধৃতরাষ্ট্র খুব বিচলিত হয়ে মৈত্রেয় মুনির কাছে ক্ষমা চাইতে শুরু করেছেন। মৈত্রয় মুনি তখন বলছেন – তোমার সন্তানরা যদি পাণ্ডবদের সাথে শান্তি করে নেয় তাহলে আমার অভিশাপ লাগবে না, শান্তি যদি না করে তাহলে এই অভিশাপ লাগবেই লাগবে। কাহিনীর পরিণতি যদি একবার জানা হয়ে যায় তাহলে এই অভিশাপ, সেই অভিশাপ ইত্যাদি অনেক কিছু সংযোজিত করে দেওয়া যায়।

পাণ্ডব সমীপে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি

কাহিনী একবার জঙ্গলে যাচ্ছে একবার হস্তিনাপুর আসছে, এইভাবে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। জঙ্গলের মধ্যে পাণ্ডবরা এখন রয়েছে, জঙ্গলে অনেক ধরণের আদিবাসীরাও থাকত, এদেরকে এরা অসুর বলে মনে করত। এখন ভীমের সাথে এই ধরণের অসুরদের লড়াই চলছে। ইতিমধ্যে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে যে, পাণ্ডবদের রাতারাতি জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজসভাতে রাজবধূ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হয়েছিল। সব খবর ছড়িয়ে যেতেই বিভিন্ন দিক থেকে রাজারা জঙলে পাণ্ডবদের কাছে পৌঁছে গেছে দেখা করবার জন্য। দ্যুতক্রীড়ার সময় শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন না, তিনি তখন শাল্বের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ করে দ্বারকাতে ফিরে সব খবর পেয়ে তিনিও পাণ্ডবদের কাছে ছুটে এসেছেন।

যুধিষ্ঠিরদের এই অবস্থা দেখার পর শ্রীকৃষ্ণও খুব রেগে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন আর শকুনির রক্ত এই পৃথিবী শীঘ্রই পান করবে। শ্রীকৃষ্ণ এমন রেগে গেছেন, রাগের তেজে তিনি কাঁপতে শুরু করেছেন, বলছেন, যারা অপরের সঙ্গে ছল করে, ধোকা দেয় এদেরকে বধ করে দেওয়াই কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে আমরা যেভাবে পাই সেখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে কখনই এইভাবে রেগে যেতে দেখা যায় না, তিনি যা কিছু করতেন খুব ঠাণ্ডা মাথায় আর হাসি মুখে করতেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা কোথাও রাগতে দেখিনা। শ্রীকৃষ্ণ এত রেগে গেছেন যে অর্জুনই শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত হতে বলছেন, আপনি এত রেগে যাবেন না। অর্জুন এখন শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করছেন। কাউকে যদি শান্ত করতে হয় তখন কি করতে হয়? তার গুণগান করতে হয়। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করছেন – *পুরুষস্যাপ্রমেয়স্য সত্যস্যামিততেজসঃ। প্রজাপতিপতের্বিষ্ণোর্লোকনাথস্য ধীমতঃ।*।৩/১১/১০। আপনি হলেন সবার অন্তর্যামী। অন্তর্যামীর দুটো অর্থ হয়, একটা অর্থ হয় সবার ভেতরে যিনি থাকেন তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়, আর চৈতন্য সত্তা আমাদের সবার মধ্যে যেটা আছে তিনিই কিন্তু সব কিছু চালাচ্ছেন, তিনিই সব কিছুর খবর জানেন। আমি সৎ না অসৎ এটা অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানবে না। এই ব্যাপারটা বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর দেখান হয়েছে, শ্রীরামচন্দ্র বালীকে তীর মারার পর বলছেন, আমি তোমাকে বধ করে পাপ করেছি না পূণ্য করেছি সেটা তুমি কি করে বুঝবে, এটা ঠিক ঠিক জানেন আমার অন্তর্যামী। অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারবে না, এই যে বলা হয় আমি পাপ করেছি না পূণ্য করেছি চিত্রগুপ্ত বিচার করছে এগুলো সব গল্প। বিচার একজনই করেন, আমার অন্তর্যামী। অন্তর্যামী কি দিয়ে বিচার করেন? একটা কাজের পেছনে আমার রাগ আর দ্বেষ আছে কিনা, শোক আর মোহ আছে কিনা। যদি আমি রাগ ও দ্বেষ বশতঃ কাজ করে থাকি তাহলে কিন্তু অন্তর্যামী ঐটাকে লক্ষ্য রাখবেন, শোক মোহের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ হবে। অন্তর্যামীর কাছে যেটা ঠিক ঠিক প্রার্থনা করা হয়, দেখা যায় সে যদি প্যাঁচালো না হয়, তার মধ্যে যদি বড্ড বেশী কামনা-বাসনা না থাকে তাহলে সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়ে যায়। সব প্রার্থনাই পূর্ণ হবে না, একটা জায়গায় কর্মের একটা খেলা চলে, যেখানে মনে হবে এই জায়গাটায় আমার এটা পাওয়ার কথা কিন্তু কোন একটা অদৃশ্য কারণে পাচ্ছিনা, ঐ জায়গাতে যদি অন্তর্যামীর কাছে ঠিক ঠিক প্রার্থনা করা হয়, নিজের জীবন যদি সেইভাবে পরিষ্কার থাকে তাহলে প্রার্থনার ফল দেবেই দেবে।

দ্বিতীয় কথা হল অপ্রমেয়। যে জিনিষটাকে মাপা যায় তাকে বলা হয় প্রমেয়, আর যেটাকে মাপা যায় না তাকে বলা হয় অপ্রমেয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জিনিষটাকে জানা যায় সেটাক প্রমেয় বলা হয়, যেটাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যেতে পারেনা তাকে অপ্রমেয় বলা হয়। ভগবান হলেন অপ্রমেয় কারণ তাঁকে এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। ভগবান হলেন সত্যস্বরূপ, তিনি সত্যবাদী নন, গান্ধীজী ছিলেন সত্যবাদী কারণ তাঁর সত্য ও মিথ্যার বোধ ছিল। ভগবান সত্য মিথ্যার উর্দ্ধে থাকেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে বলছে – দিন ও রাত পৃথিবীতে হয় কিন্তু সূর্যে দিন আর রাত বলা যায় না। যেটা আছে সেটাই আছে, সেইজন্য ভগবানকে সত্যস্বরূপ বলা হয়। *অমিত তেজসঃ*, তাঁর তেজকে পরিমাপ করা যায় না। ভগবান

প্রজাপতিরও পতি। আমাদের যা কিছু প্রাণি আছে সবই প্রজাপতি জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু ভগবান প্রজাপতিরও পতি, ভগবানই প্রজাপতির জন্ম দিয়েছেন। *লোকনাথস্য*, তিনি সম্পূর্ণ লোকের নাথ, প্রভু, অধ্যক্ষ। *ধীমতঃ* হল পরম বুদ্ধিমান।

অর্জুন হলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা আর দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বন্ধু রূপেই দেখে এসেছেন। স্তুতি করতে গিয়ে অর্জুন একটা কথা বলছেন – *যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ*। বাল্মীকি রামায়ণে অনেক রকম মুনি ঋষিদের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এক ধরণের ঋষির বর্ণনা করতে গিয়ে এই *যত্রসায়ংগৃহো মুনির* কথাও বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যিনি কোথাও নির্দিষ্ট ভাবে বসবাস করেন না। সারাদিন ধরে হাঁটতে থাকেন, যেখানে সূর্যাস্ত হয়ে যাবে সেখানে সেদিনকার মত থেমে যাবেন আর ঐখানেই রাত্রিবাস করবেন। আবার সকাল হলেই সেখান থেকে চলতে থাকবেন। কখন দেখবেন না যে আমি কোথায় আছি, রাজমহলের কাছে আছি কিংবা কোন গ্রামে বা শহরে আছি, যেখানেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে সেখানেই থেমে যাবেন। *যত্রসায়ংগৃহো* এটা এক ধরণের তপস্যা। অর্জুন স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – আপনি নারায়ণ ঋষি। এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। মহাভারতের আগে কোথাও অবতার তত্ত্বের কথা পরিষ্কার করে বলা নেই। তবে বিষ্ণুর কথা অনেক জায়গায় আসে, যেখানে দেখানো হয় যে, ভগবান বিষ্ণু যিনি দ্বাদশ আদিত্যের একজন আদিত্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। কিন্তু নর ও নারায়ণ ঋষির কথা অনেক জায়গাতেই পাওয়া যাবে। এনারা কিন্তু ভগবান নন, নারায়ণকে যে অর্থে ভগবান বলে দেখানো হয় সেই অর্থে এই নারায়ণ ভগবান নন, ইনি একজন ঋষি। কিন্তু প্রচণ্ড তপস্যায় তিনি সবার থেকে এগিয়ে। এই নারায়ণ ঋষি ও নর ঋষি সৃষ্টির শুরু থেকেই বিভিন্ন ভাবে তপস্যা করেই যাচ্ছেন। বলা হয় এনাদের দুজনের তপস্যার জোরেই নাকি পৃথিবী চলছে। এখানে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন আর নর ঋষি অর্জুন হয়ে জন্ম নিয়েছেন। আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারাতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের সামনে হাতজোড় করে বলছেন – আমি জানি আপনি সেই নর ঋষি। আমরা এখানে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে এসেছি। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের চিন্তাধারা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে এখানে এসে বোঝা যায়। মহাভারত যখন রচনা হচ্ছে তখনও একটা দোদুল্যমানতা চলছিল, মহাভারতে অবতার তত্ত্বও আসতে শুরু হয়েছে আবার ভগবানই নারায়ণ ঋষি রূপে তপস্যা করছে এটাও আসছে। সেই ঋষিই আবার অবতার হয়ে আসছেন এটাও দেখান হচ্ছে। এই চিন্তা ভাবনাগুলিই মিলেমিশে পরের দিকে একটা সুস্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। স্বামীজীও বলছেন মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তনেরও বিবর্তন হয়। এই বিবর্তনকেই এখানে পরিষ্কার রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

নর ও নারায়ণ ঋষির কথা

নারায়ণ ও নর ঋষির অনেক মজার মজার কাহিনী পুরানাদিতেও পাওয়া যায়। এই রকম একটা কাহিনী আছে যে, একবার এক খুব বিখ্যাত রাজা সবাইকে হারিয়ে দিয়ে ভাবছে কার সঙ্গে এখন যুদ্ধ করা যায়, কারণ সবাইকেই তিনি হারিয়ে দিয়েছেন। এদের মধ্যে এক রাজা তাকে বলল, আমাদের সবাইকে তো হারিয়ে দিয়েছ আমাদের সঙ্গে আর কি যুদ্ধ করবে, তার থেকে বরং তুমি নর ও নারায়ণ ঋষি তপস্যা করছেন ওদের সাথে গিয়ে যুদ্ধ কর। রাজা গিয়েছেন নর ও নারায়ণ ঋষির খোঁজ করে। গিয়ে দেখেন অস্তিচর্মসার দুজন ঋষি ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। রাজা গিয়ে দুজন ঋষিকে বার বার আহ্বাণ করে যাচ্ছেন – ধ্যান পরে করবেন, আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন আপনারা। বহু কষ্টে দুজন ঋষি চোখ খুলেছেন। চোখ খুলে হাতজোড় করে রাজাকে বলছেন – আমরা হলাম ত্যাগী তপস্বী, আমাদের কি আছে যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তোমার সাথে আমরা কি আর যুদ্ধ করব, তুমি বরং ফিরে যাও। কিন্তু এই রাজা কিছুতেই যুদ্ধ না করে ফিরবে না। অনেকক্ষণ ধরে বিরক্ত করে যাচ্ছে। তখন নর ঋষি মাটি থেকে একটা ঘাসের টুকরো হাতে নিয়ে মন্ত্র সিদ্ধ করে সেই ঘাসের টুকরোটাকে রাজার সৈন্যদের দিকে ছুড়ে দিয়েছেন। ঐ ঘাসের টুকরোটা মন্ত্রসিদ্ধ করতেই ব্রহ্মাস্ত্রের থেকেও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ঐ একটি ঘাসের টুকরো থেকে এখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ঘাসের টুকরো বেরিয়ে এসে যত সৈন্য ছিল, যত হাতি ঘোড়া ছিল তাদের সবার শরীরে যত লোমকূপ ছিল সব ঘাসের টুকরো গিয়ে সমস্ত লোমকূপের মধ্যে ঢুকে গেছে। শরীরের যেখানেই ছিদ্র আছে সব ছিদ্রে ঘাসের টুকরো ঢুকে গেছে। সমস্ত সৈন্য সামন্ত যত যা কিছু ছিল সব যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। কিছুই করতে পারছে না। তারপর রাজা ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রাণ ছেড়ে পালিয়ে কোন রকমে বাঁচল। এই নর ও নারায়ণ ঋষিদের বলা হয়, শরীর ধারণ করে সব থেকে যে উচ্চতম অবস্থায় যেতে পারে সেই অবস্থা হল এই নর ও নারায়ণ ঋষিদের। আর কেউ তপস্যা করে কোন দিন নর ও নারায়ণ ঋষি হতে পারবে না, এটাই এনাদের সত্তা। তখনকার দিনে, যখন মহাভারত রচিত হচ্ছিল, সেই সময় নর ও নারায়ণ ঋষি হলেন উচ্চতম ঋষি। অর্জুন এটাই শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – আপনি সেই নারায়ণ ঋষির অবতার। তখন আপনি দশ হাজার বছর *যত্রসায়ংগৃহো* তপস্যা করেছিলেন। আসলে দশ হাজার বলতে বোঝাচ্ছেন এনারা অমর কিনা, শুধু তপস্যাই করে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দেহ ধারণ

করে জগতের কল্যাণের জন্য নেমে আসেন, কিছু দিন জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করে আবার তপস্যায় চলে যাচ্ছেন। অর্জুন বলছেন – এগারো হাজার বছর আপনি শুধু জল পান করে তপস্যা করেছিলেন। বদ্রিকাশ্রমে আপনি একশ বছর দু হাত তুলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু বাতাস সেবন করে তপস্যা করেছিলেন। ইদানিং অনেক কমে গেলেও আগে অনেক সাধুদের এইভাবে হিমালয়ে ও অন্যান্য অনেক জায়গায় তপস্যা করতে দেখা যেত। এই ধরণের শারীরিক তপস্যা করলে অনেক রকমের সিদ্ধাই হয়।

সিদ্ধাইয়ের ব্যাপারে কিছু প্রয়োজনীয় কথা

সিদ্ধাই এক ধরণের শক্তি, যেটা সাধারণ মানুষ করতে পারেনা সেটাই হয়ত কেউ করে দিচ্ছে এটাই সিদ্ধাই। সিদ্ধাই লাভ করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। আগে নিজে ঠিক করে নিতে হবে আমি কি সিদ্ধাই চাই। এরপর সকালবেলায় কিংবা সন্ধ্যা বেলায় একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিতে হবে। উল্কাপাত হোক, বজ্রপাত হোক যাই হয়ে যাক, ঠিক ঐ সময়টাতে একটা আসনে বসে নিজের ইষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকুন বা ইষ্ট নাম জপ করুন। একটি দিনও বাদ দেওয়া চলবে না। এক বছর পূর্ণ না হতেই দেখবেন ঐ সিদ্ধাইটা আপনার মধ্যে এসে গেছে। মুসলমানদের যে এত শক্তি তার একমাত্র কারণ তারা দিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ বার নমাজ পড়ে বলে আর ঐ একমাস ধরে রোজা রাখে। রোজার সময় থুতু পর্যন্ত গলার নীচে যাবে না। একমাস ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যে না খেয়ে থাকছে আর ঠিক সময়ে দিনে পাঁচ বার নমাজ পড়ছে, পুরো একটা সম্প্রদায় একসাথে করছে, এতেই এদের সব শক্তি আসছে। আমরা সবাই একটা জায়গায় ভুল করে থাকি, আমরা মনে করি আমাদের যত কাজ শরীর দিয়ে হয়, আমরা মনে করছি আমাদের জগতটাও ঠিক এইভাবেই চলছে। কিন্তু আমাদের জগতটা আসলে মন দিয়ে চলে, আর এই মনের পেছনে রয়েছে চৈতন্য সত্তা। যখনই আমি ঠিক করে নিলাম আমার বাড়িতে আগুন লাগুক, ভূমিকম্প হোক সন্ধ্যে ছটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত আমি আসনে বসব আর ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকব, আর একটি মাস আমি এইভাবে আসনে বসব। আমার ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস নেই তাই আমি দেওয়ালে একটা বিন্দু এঁকে ঐ বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকব। যদি মনের একাগ্র বাড়াতে হয় তাহলে ঠাকুরের দিকে তাকানও যা দেওয়ালের ওই বিন্দুর দিকে তাকান একই ব্যাপার। আমরা যখন ঠাকুরের ধ্যান চিন্তন করি তখন আমরা ঠাকুরের গুণ, তাঁর সত্তাটাকে আমরা চাই, কিন্তু মনের একাগ্রতা বাড়াবার জন্য সবটাই সমান। কিন্তু দেখা যাবে সাত দিনের মধ্যে আপনার সামনে নানা রকমের যোগ বিঘ্ন এসে আপনাকে ছিটকে ফেলে দেবে, হয় শরীর ম্যাজম্যাজ করবে বা ঠিক ঐ সময় আপনার কেউ পরিচিত এসে কথা বলতে চাইবে। মনের এটা ধর্ম, মন আপনাকে প্রথমে এই ধরণের যোগ সাধনা করতে দেবে না। কিন্তু আপনি যদি ঠিক করে নেনে যত বিঘ্নই আসুক ঐ সময়টাতে আমি করবই করব, তখন আস্তে আস্তে বিঘ্নগুলো কাটতে শুরু করবে। যখন এই ক্ষমতা এসে যাবে, আমার কেউ মরে যাক আমি আসন থেকে ঐ সময় উঠব না, আমি উঠে গেলেও তো তাকে বাঁচাতে পারবো না। এইভাবে একমাস করলেই দেখা যাবে আপনার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন এসে গেছে। এক বছর যদি করতে পারেন তাহলে যেটা ভেবেছেন সেই সিদ্ধাই আপনার মধ্যে এসে যাবে।

পূর্ণকামের লক্ষণ

এখানে অর্জুন সেই কথাই বলছেন, আপনি এই এই তপস্যা করেছেন। সেইজন্য এত শক্তি, একটা ঘাসের টুকরো নিক্ষেপ করতেই সমস্ত সৈন্য প্রাণ ছেড়ে পালাল। অর্জুন বলছেন – হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি প্রভাস তীর্থে এক হাজার বছর শৌচ ও সন্তোষাদি নিয়মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুদের মত স্নানের বাই সারা বিশ্বে আর কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যাবে না। আমি স্নান না করে কিছু মুখে দেব না, এটাও একটা তপস্যা হয়ে গেল। শৌচে যদি আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তখন নিজের শরীরের প্রতি আসক্তিটা চলে যাবে আর অপরের শরীরের প্রতি আকর্ষণ এটাও চলে যাবে। এটা যোগ সিদ্ধাই। সত্যে যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, কাজ না করেই ক্রিয়াফল তার কাছে এসে যাবে। এই জগৎ চলছে মনের শক্তিতে, যার মন পুরো নিয়ন্ত্রণে তারও ক্ষমতা এসে যাবে এই জগতে চালাবার, সে যা বলবে সেটা জগতকে শুনতে হবে। অর্জুন বলছেন, আপনি হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে আরও বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাণির যে আত্মা, চৈতন্য সত্তা সেটা আপনি। আপনি একদিকে নারায়ণ হয়ে জন্ম নিয়েছেন, আবার দেবতাদি হয়ে জন্ম নিয়েছেন, আবার অন্য দিকে আপনি অজন্মা, আপনার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। সাধারণ মানুষের পুনর্জন্ম আর ভগবানের অবতার রূপে জন্মের মধ্যে তফাৎ আছে। আমরা জন্ম-মৃত্যুর অধীন কিন্তু ভগবানের জন্ম নেই মৃত্যু নেই। অর্জুন বলছেন – *অদিতেরপি পুত্র ত্বমেত্য যাদবনন্দন। ত্বং বিষ্ণুরিতি বিখ্যাত ইন্দ্রাদবরজো বিভুঃ।।*৩/১১/২৫। হে যদুনন্দন! আপনি হলেন অদিতির পুত্র ও ইন্দ্রের ছোট ভাই আবার আপনিই সেই সর্বব্যাপী বিষ্ণু।

এখানে এসে দেখানো হল বিষ্ণু দেবতা যিনি অদিতির সন্তান ইন্দ্রের ছোট ভাই, কনিষ্ঠ দেবতা, একদিকে আপনি যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণু দেবতা আবার আপনিই সর্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি অনেক কিছুই করছেন, যুদ্ধ করছেন, অসুর নিধন করছেন কিন্তু আপনার মধ্যে অনেক গুণ – *ন ক্রোধ ন চ মাৎসর্যং নানৃতং মধুসূদন। ত্বয়ি তিষ্ঠতি দাশার্হ! ন নৃশংস্যং কুতোহনৃজু।।৩/১১/৩৫*। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার মধ্যে ক্রোধ নেই, বিদ্বেষ নেই এবং আপনার মধ্যে নৃশংসতাও নেই তাই আপনার মধ্যে কুটিলতা থাকার কোন অবকাশই নেই। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছে আমার মধ্যে আলাদা কি দেখ। আপনার মধ্যে ক্রোধ নেই। ঠাকুর বলছেন, কেন, সেদিন গাড়িওয়ালা ঠিক সময় আসেনি বলে তার উপর খুব রাগ হয়েছিল। তখন মাস্টারমশাই বলছেন – সেটা আপনার লোকশিক্ষার জন্য। আমরা যে ক্রোধ করি সেই ক্রোধের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের পুরোটাই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, এখানে আমি আর আমার ক্রোধ দুটো মিলে এক হয়ে যায়। কুকুর যখন খায় তখন কুকুর আর তার খাওয়াটা এক হয়ে যায়। কুকুরের খাওয়া লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যায়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাগ আর তিনি পরিষ্কার আলাদা। এর ফলে ঐ রাগ বা ক্রোধের কোন প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বে পড়ে না। প্রফেট মহম্মদের জীবনেও দেখা যায়, তিনি এত যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু রাগ কখনই করতেন না, যেটাই করতেন ঠিক মনে করেই করতেন। শ্রীকৃষ্ণও প্রচুর লড়াই সংগ্রাম করেছেন কিন্তু এনাদের রাগ আর এনারা আলাদা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মাৎসর্যও নেই। আমার একটাই গাড়ি আছে ওদের দুটো গাড়ি কেন, এটাকে বলে মাৎসর্য, মানে ঈর্ষা। স্বামীজীর মধ্যেও ঈর্ষা ভাবের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। মানুষের মধ্যে যে মাৎসর্য ভাবের জন্ম নেয় এটা সব সময় অপূর্ণতা ও অভাববোধ থেকে আসে। অপূর্ণতা ও অভাব বোধ থেকেই মনের মধ্যে চাহিদা আসে, এই চাহিদা আমার মিটল না কিন্তু আরেকজনের মিটে গেল তখনই মাৎসর্যটা আসে। কিন্তু যখন মন পূর্ণকাম হয়ে যাবে তখন এই ভাব আসবে না। অর্জুন এটাই বলছেন, আপনার মধ্যে রাগ নেই, আপনার মধ্যে মাৎসর্য নেই, আপনি হলেন পূর্ণকাম, আপনার মধ্যে কোন বাসনা নেই আপনি তো আপ্তকাম। আপনার মধ্যে আর কি নেই? *নানৃতং*, আপনার মধ্যে অসত্য বলে কিছু নেই তার সাথে আপনার মধ্যে নির্দয়তা নেই। অর্জুনের এই স্তুতির মধ্যে উচ্চতম সন্ন্যাসীর যে গুণ সেগুলোকে বর্ণনা করা হচ্ছে। অক্রোধ, ঈর্ষাশূন্য, সত্য, দয়াবান এই গুণ গুলো কার মধ্যে হবে? যিনি পূর্ণকাম, পূর্ণকাম ছাড়া এই গুণ কখনই হবে না। সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভাব সেটা এই রকমই হয়, মা কখনই নিজের সন্তানের প্রতি ক্রোধ করে না অথচ মা সন্তানকে চড় মারছে, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চড় মারছে না, সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মারা হচ্ছে। সন্তানের যদি ভালো কিছু হয় তখন মায়ের কি ঈর্ষা হয়? পরীক্ষায় ছেলে ৮০% নম্বর পেয়েছে, মা কি ভাবে আমি তো কখন এত নম্বর পাইনি। মায়ের কি ঈর্ষা হবে? কখনই হবে না। মা ছেলের কাছে কখন কোন অসত্য কথা বলে না। মা ছেলের উপর কোন কারণেই নির্দয় হয় না, ক্রোধ আর নির্দয়টা কাছাকাছি। নির্দয় থেকেই ক্রোধ হয় আবার ক্রোধ হয়ে গেলে নির্দয় ভাবে আঘাত করে। সন্তানের ব্যাপারে মার এই জিনিষগুলো কখনই হয়, আর ঠিক তেমনি যাঁরা পূর্ণকাম তাঁদের মধ্যেও এই জিনিষগুলো দেখা যাবে না।

সংহারের পর সৃষ্টি কোথায় যায়

যুগান্তে সর্ব্বভূতানি সংক্ষিপ্যে মধুসূদন। আত্মনৈবাত্মসাৎ কৃত্বা জগদাসী পরন্তপ।।৩/১১/৩৭। আপনি ব্রহ্মার মাধ্যমে এই পুরো জগৎকে সৃষ্টি করেন আবার জগতের যখন নাশ করেন তখন সব কিছুকে সংহার করে আপনি নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেন। *সর্বভূতানি সংক্ষিপ্যে* – এর উপমা দেওয়া হয়, মাকড়সা যেমন নিজের পেট থেকে জাল বার করে ছড়িয়ে দেয়, আবার ঐ জালটাকে টেনে পরে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়, ভগবান ঠিক এই ভাবেই সৃষ্টিটাকে সামনে নিয়ে আসেন আর এইভাবেই গুটিয়ে নেন। পদার্থ বিজ্ঞানে বলে এই ব্রহ্মাণ্ড সব সময় সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। যেমন যেমন ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার হচ্ছে তেমন তেমন স্পেসও বিস্তার করছে। এইখানে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, স্পেস যখন বিস্তার করছে তাহলে স্পেসের বাইরে কি আছে? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যখন বিস্তার হচ্ছে তখন সে কিসে বিস্তার হচ্ছে? স্পেস কি তাহলে মেটা স্পেসে বিস্তার হচ্ছে? বিজ্ঞানের কাছে এর কোন উত্তর নেই। গণিতের সূত্র দিয়ে বিজ্ঞান বলে দিচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বেড়েই চলেছে, কিন্তু কোথায় বাড়ছে এর কোন উত্তর নেই। কারণ গণিত এখানে এসে থেমে যায়। এই সমস্যা হিন্দুদের কাছেও ছিল। শ্যামাসঙ্গীতেও সাধক এই প্রশ্ন করছেন – ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি। এইখানে বিপরীত তত্ত্বকে নিয়ে আসা হল। কেন বিপরীত তত্ত্বকে আনা হল? কারণ পদার্থ বিজ্ঞানে গাণিতিক সমীকরণ একটা জায়গায় গিয়ে হারিয়ে যায়, ঐ গাণিতিক সূত্র আর কোন কাজ করতে পারেনা। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক সত্য আর জাগতিক সত্য একটা বিন্দুতে গিয়ে আর দাঁড়াতে পারেনা, এই দুটোকে আর মেলানো যায় না। যখন বলা হয় সৃষ্টির সংহার হয়ে যাবে তখন আমরা ভাবি যে মানুষ, জীব, জন্তু, গাছপালা সব মরে গেল। সব প্রাণি মরে গেলে পৃথিবীতো থেকেই গেল, পৃথিবী যদি থেকে যায় তাহলে সৃষ্টি নাশ হল কি করে! সৃষ্টির সংহারে বলা হচ্ছে পৃথিবী থাকবে না, চন্দ্র থাকবে না, সূর্য থাকবে না, তারাও থাকবে না।

তখন সমস্ত স্পেস ও টাইম চলে যায়। কোথায় চলে যায়? হিন্দু পরম্পরাতে বলা হয় সময় হল কাল, ঐ সংহারে কালকে মহাকাল খেয়ে নেয়, কালী কালকে খেয়ে নেনে। সময় সময়কে খেয়ে নেয়, এটার কি কোন অর্থ হয়? একশ বছর আগেও এই জিনিষটাকে কেউ বুঝতে পারতো না। সেইজন্য সবাই মনে করত হিন্দুদের যত গল্প সব গালগপ্প আর আজগুবি। কিন্তু এখন এ্যাস্ট্রো ফিজিক্স ঠিক এই কথা বলছে। যখন বিগব্যাং হয় তখন একটা নির্দিষ্ট মাইক্রো সেকেণ্ডের পরে সময়ের জন্ম হয়, স্পেসের ঐ পয়েন্ট থেকে জন্ম হয়। অথচ এই জিনিষটাকে আমাদের ঋষিরা কত হাজার বছর আগে বলে গেছেন। যদিও গাণিতিক সূত্র দিয়ে বলছেন না। স্বামীজী বলছেন, একটা সরল রেখাকে যদি আমার কাছ থেকে ছেড়ে দিই, ঐ সরল রেখা অনন্ত কাল ঘুরে ঘুরে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। তার মানে স্পেস হল গোলাকার। যখন স্বামীজী এই কথা বলছেন তখনও আইনস্টাইন আসেননি। আইনস্টাইন এসে পরে গণিতের সাহায্যে দেখালেন এটাকে এই রকমই হতে হবে। এখন হার্বাল টেলিস্কোপে দেখছে এটা এই রকমই। এখন স্পেস যখন সঙ্কুচিত হয়ে যায় তখন এই স্পেসের বাইরে কি আছে? স্পেসের বাইরে কি আছে এটা মুখে বলা যাবে না। যদি আমরা সবাই ভাবতে থাকি এই সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে, কিন্তু এর বাইরে কি আছে যখনই চিন্তা করতে যাব তখনই আমাদের মস্তিষ্ক কিছুই ধারণা করতে পারবে না। এই বোতলটাকে যদি ছোট করে দেওয়া হয় তাহলে এই বোতলটা কোথায় ছোট হবে? স্পেসের মধ্যেই ছোট হবে। কিন্তু স্পেসটাই ছোট হচ্ছে এটাকে ধারণাই করা যায় না। এটাকেই ঋষিরা সহজ করে বলছেন, পুরো ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তাঁর মধ্যেই ঢুকে যায়, তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই। তখন স্পেসের বাইরে একটা মেটা স্পেস এসে যায়, তিনিই আছেন, তাঁর নাশও নেই তাঁর উৎপত্তিও নেই।

অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেকার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করার পর শ্রীকৃষ্ণ শান্ত হয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – *মমবে ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে। যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু।।*৩/১১/৪৫। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণই যে নর ও নারায়ণ ঋষি সেটাকে মনে করেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – তুমি আমার আমি তোমার, যে আমার সে তোমার, যে তোমাকে দ্বেষ করে সে আমাকেও দ্বেষ করে। যে তোমার সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে আমার সাথেও বন্ধুত্ব রাখে। কারণ আমি আর তুমি এক। আধুনিক যুগে একটি ছেলে একটি মেয়ে পরস্পরকে ভালোবেসে বলে তুমি আমার আমি তোমার কিন্তু বিয়ের পর কিছু দিন না যেতেই একজন একজনের থেকে ডিভোর্স চাইতে শুরু করে। তাহলে অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসার সাথে এই ভালোবাসার কি পার্থক্য? কারণ পার্থিব জগতে দুটো জিনিষ কখনই এক হতে পারেনা। একমাত্র আধ্যাত্মিক স্তরে গিয়ে দুটো সত্তা এক হয় এবং দুজনেরই এই বোধটা আছে যে আমরা একই সত্তা। মনের স্তরেও পাল্টাতে পারে, আমার আপনার মন আজকে এক থাকতে পারে কিন্তু আগামীকাল আলাদা হয়েও যেতে পারে। শরীরের দিক থেকে কখনই এক হতে পারেনা। যদিও এগুলো খুব উচ্চস্তরের কথা কিন্তু শুনতে শুনতে ও চিন্তা করতে করতে এই ভাবগুলো হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই আধ্যাত্মিক স্তর থেকে বলছেন, অর্জুন আমি আর তুমি একেবারেই এক, একটুও আমরা আলাদা নই। আর আমার আর তোমার ভেদ সত্যিকারে কখনই জানা যাবে না। আমি আর তুমি অভেদ, এক আত্মা তার দুটো শরীর। আত্মার দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণ আর যুধিষ্ঠিরও তো এক। কিন্তু না, এটা হচ্ছে বোঝার ক্ষমতা থেকে। আত্মার দৃষ্টিতে আমি আপনি এক কিন্তু মনের দৃষ্টিতে ও শরীরের দৃষ্টিতে আমি আপনি আলাদা। আমার কি বোধ হচ্ছে আমি আর আপনি এক? হচ্ছে না। এক বোধ হবে যদি সাধনা করা থাকে। সাধনার একটা উচ্চ অবস্থায় যখন চলে যাবো তখন আমি যার সঙ্গে এক বোধ করব তখন সে আমার সঙ্গে এক। কিন্তু তাকেও সেই সাধনার সেই স্তরে যেতে হবে, তা নাহলে এক বোধ হবে না। দুজনকে সাধনার সেই স্তরে যেতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ নর ও নারায়ণ ঋষি হয়ে সাধনার এমন এক স্তরে চলে গিয়েছেন যেখানে এনারা দুজনে এক হয়ে গেছেন। ঠাকুর আর শ্রীমাকে যে আমরা এক বলি, এই কারণেই বলা হয়। কিন্তু স্বামী স্ত্রী নিজেদের এক বলছে, কিন্তু আদপেই তারা এক নয়। ঠাকুর আর স্বামীজীকেও আমরা এক বলি, এখানেও দুজনই সাধনার স্তরে গিয়ে এক হয়ে গেছেন। এনারা দেখছেন তাঁদের শরীর আলাদা কিন্তু এক এই বোধটা আছে। ঠাকুর তো আমারও অন্তর্যামী, তাই বলে আমি আর ঠাকুর কি এক? হ্যাঁ এক নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার ঐ বোধটা নেই। এখানে এই বোধটা করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি

এরপর দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কিছু দিন আগেই হয়ে গেছে, রাজসভায় তাঁকে যে লাঞ্ছনা করা হয়েছে সেই দুঃখ এখনও দগদগে হয়ে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর বন্ধু, কিন্তু এখানে অন্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে

তিনি স্তুতি করছেন। *ঋষয়াস্ত্বাং ক্ষমামাহুঃ সত্যঞ্চ পুরুষোত্তম। সত্যাদ্‌যজ্ঞোহসি সম্ভূতঃ কশ্যপস্ত্বাং যথাহব্রবীৎ।* ।৩/১১/৫৩। হে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! মহর্ষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপ বলে বর্ণনা করেন, কশ্যপ মুনি বলেছেন তুমি সত্য থেকে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। *ব্রহ্মাশঙ্করশক্রাদ্যৈর্দেববৃন্দৈঃ পুনঃ পুনঃ। ক্রীড়সে ত্বং নরব্যাঘ্র! বালঃ ক্রীড়নকৈরিব।* ।৩/১১/৫৫। হে নরশ্রেষ্ঠ! বাচ্চারা যেমন পুতুল নিয়ে খেলা করে তুমি ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র এই তিন দেবতাদের সাথে সেই ভাবেই খেলা কর। এখানে মহাভারতে নতুন নতুন শব্দ আসতে শুরু করেছে। বেদে ব্রহ্মা বলে কোন কিছুর উল্লেখ আমরা পাইনা, তবে প্রজাপতি রূপে একটা ধারণাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিব বা শঙ্করের যে ধারণা আজকে আমরা পাচ্ছি বেদে সেইভাবে কোন উল্লেখ নেই তবে রুদ্র রূপে আছে। আর ইন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের রাজা। এখানে এসে মহাভারত দুজন দেবতাকে প্রাধান্য দিচ্ছে, একজন হলেন শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রূপে আর শিব। শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে ব্রহ্মাকে অনেকখানি পেছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে আর ইন্দ্রকে তো একেবারে জোকার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাভারত ধর্মকে যেভাবে সামনে নিয়ে এসেছে আজকে ভারতে ধর্ম ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ধর্মকে জানার জন্য সেইজন্য সবাইকে জীবনে একবার অন্তত মহাভারত পড়া দরকার। বেদে পুরুষসূক্তমে পুরুষকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেই কথাগুলোই এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে। যেমন যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তোমার শরীরে অবস্থিত, তুমি প্রভু, তুমি বিভু ও ভূতাত্মা, সমস্ত লোক তোমাকেই অবলম্বন করে চলছে, কি দিব্য, কি মানুষ সকল ভূতেরই তুমি ঈশ্বর। এই সব বলে দ্রৌপদী খুব দুঃখ করে বলছেন – তুমি আমার বন্ধু, আমার এই রকম সব বীর স্বামী, আমার এই রকম সব সন্তান, আমি ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তা সত্ত্বেও আমাকে ঐ অবস্থায় রাজসভার মাঝখানে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসা হয়েছিল, সভার মধ্যে আমাকে বিবস্ত্র করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। যে স্ত্রীর দুর্বল স্বামী, সেই স্বামীরও ধর্ম নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করা কিন্তু আমার এই পাঁচজন বীরপুঙ্গব স্বামী থাকার পরও আমার এই দুরবস্থা হয়েছিল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে দ্রৌপদী অনেক কথাই বলে যাচ্ছেন। এক জায়গায় এসে বলছেন – *নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ। ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন।* ।৩/১১/১২৬। দ্রৌপদীর ভেতরে এত দুঃখ জমে ছিল আর তিনি এতই কষ্ট পেয়েছিলেন যে, মাঝে মাঝেই দ্রৌপদী নিজের এই দুঃখের কথা বলতে গিয়ে ফেটে পড়েছেন। দ্রৌপদীর মাধ্যমে একজন সাধারণ মানবের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্রৌপদী খুব দুঃখ করে বলছেন – আমার জন্ম যজ্ঞ থেকে হয়েছে, আমি রাজরানী ছিলাম তবুও আমার দুরবস্থাটা একবার দেখো। আমার জন্য কোন স্বামী নেই, আমার কোন সন্তান নেই, আমার কোন ভাই নেই, আমার কোন বাবা নেই, আমার কোন বন্ধু নেই আর তুমিও আমার নেই। আমাকে এই অপমান থেকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসেনি, তুমিও এলেনা। শুধু তাই না এখনও তোমরা আমার এই অপমানকে উপেক্ষা করছ, তুমি ইচ্ছা করলে এক্ষুণি দুর্যোধনকে শেষ করে দিয়ে আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারো, তুমিও আমার অপমানকে উপেক্ষা করছ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বিশেষ দায়ীত্ব যে তুমি আমার রক্ষা করবে – *চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণঃ! ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ। সম্বন্ধাদ্‌গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব।* ।৩/১১/১২৮। চারটি কারণে আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ আর দ্রৌপদীর মধ্যেকার এটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক – প্রথম কারণ হল তুমি আমার সম্বন্ধী, দ্বিতীয় কারণ অগ্নিকুণ্ডে আমার জন্ম তাই আমি গৌরবশালিনী, তৃতীয় কারণ আমি তোমার ঠিক ঠিক সখী আর চতুর্থ কারণ তুমি আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম। চতুর্থ কারণটি খুব উল্লেখনীয়, কোন মানুষ যদি কষ্টের মধ্যে পড়ে থাকে আর আমার যদি ক্ষমতা থাকে তার এই কষ্টকে দূর করার তাহলে আমাকে তাকে রক্ষা করতে হবে। দ্রৌপদী তাই বলছেন, তোমার এত শক্তি, এত ক্ষমতা আর এতো কষ্টের মধ্যে রয়েছি আমার এই কষ্টকে দূর করা তোমার কর্তব্য, তার সাথে আমি তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আর আমি কোন হেলাফেলা নারী নই, যজ্ঞ থেকে আমার জন্ম হয়ছে আর অর্জুনের সম্পর্কে তুমি আমার সম্বন্ধী।

দ্রৌপদীর দুঃখের কথা শোনার পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – তুমি দুঃখ করো না, এই সময়টাকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে দাও, কেননা কথা যেটা দেওয়া হয়ে গেছে সেটাকে পালন করতে হবে। তারপর তুমি দেখবে তোমাকে যারা যারা অপমান করেছে, তোমাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের সবাইকে শেষ করে দেওয়া হবে, এই ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এরপর শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তা চলছে। যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আপনি কেন এই জুয়া খেলা খেলতে গেলেন, আমি যদি তখন থাকতাম তাহলে কিছুতেই আমি এই জুয়া খেলা হতে দিতাম না। যুধিষ্ঠিরও অনেক কথা বলছেন। তারপর যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করছে আপনি সেই সময় কোথায় ছিলেন আর কেনই বা সেখানে আপনাকে যেতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অনেক যুদ্ধের কাহিনী বলছেন, যে কারণে তিনি সেই সময় হস্তিনাপুরে আসতে পারেননি। এরপর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে ফিরে গেলেন। এখন পাণ্ডবরা বনের মধ্যে রয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর ক্ষোভ ও প্রহ্লাদ-বলি সংলাপ

পাণ্ডবদের এখন সারাদিন বনে কোন কাজ নেই, এদিক সেদিক ঘুরছেন, আর কোন মুনি ঋষিরা এলে তাঁদের কাছ থেকে নানা কাহিনী ও উপদেশ শুনছেন। কিন্তু দ্রৌপদী ঐ অপমান আর কষ্টকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। এত রেগে আছেন যে, থেকে থেকে পঞ্চ পাণ্ডবদের তাঁতিয়েই যাচ্ছেন, কোন রকমে একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দুর্যোধনদের সবাইকে শেষ করে দিলে যেন সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলছেন 'আপনি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে এই কষ্ট পাওয়ার একেবারেই যোগ্য নন। আর ঐ ভীমসেন! তিনি নিজের হাতে এত কাজ করে যাচ্ছেন তাতে আমি মর্মে মর্মে ব্যাথায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। অর্জুনের মত শ্রেষ্ঠ বীরের কখনই এই দুর্গতি হওয়ার কথা নয়, সমস্ত সুখ ভোগই তার হওয়ার কথা কিন্তু অর্জুনের এই দুরবস্থা দেখে আপনার মনে কি করে রাগ হচ্ছে না ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মধ্যে পৌরুষ নেই, আপনার মধ্যে ক্রোধ নেই, তা নাহলে আপনি আমার আর আপনার ভাইদের এই অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট দেখে চুপ করে থাকছেন কি করে! *ন নির্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তি লোকে নির্ব্বচনং স্মৃতম্। তদদ্য ত্বয়ি পশ্যামি ক্ষত্রিয়ে বিপরীতবৎ।* ।৩/২৪/৩৬। ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তি হল যে শত্রুকে ক্ষরণ করে মানে শত্রুকে নাশ করে তাকেই ক্ষত্রিয় বলা হয়, কিন্তু আপনার মধ্যে ক্ষত্রিয়ের বিপরতী ধর্ম বিরাজ করছে, আপনি আপনার শত্রুদের নাশ করছেন না, যে ক্ষত্রিয়ের রাগ নেই সে কিসের ক্ষত্রিয়'! মহাভারতে এর আগে একটা কাহিনী এসেছিল যেখানে একবার এক রাজা আর মুনির মধ্যে খুব রাগারাগি হয়ে গিয়েছিল। রাগারাগিতে মুনি রাজাকে একটা অভিশাপ দিয়েছেন, রাজাও তখন পাল্টা অভিশাপ দিয়েছে। অভিশাপ দেওয়ার পর দুজনেই বুঝলো যে নিজেদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তখন দুজনে ঠিক করল আমরা দুজনে দুজনের অভিশাপটা ফিরিয়ে নিই। মুনি ব্রাহ্মণ, তিনি অভিশাপ ফেরত নিয়ে রাজাকে বলছেন তুমিও এবার তোমার অভিশাপ ফেরত নিয়ে নাও। তখন রাজা বলছে, দেখুন আপনি হলেন ব্রাহ্মণ আপনার রাগ মুখে হৃদয়ে আপনার কিছু নেই কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় আমার মুখে রাগ আসেনা আমার রাগ সব সময় হৃদয়ে, আপনি যে তখন আমাকে রাগিয়ে দিয়ছিলেন সেই রাগ আমার এখনও যায়নি, সেইজন্য আমার অভিশাপ আমি এখন ফেরত নিতে পারছিনা।

দ্রৌপদী বলছেন 'যে ক্ষত্রিয় শক্তি থাকা সত্ত্বেও কাজে লাগায় না তাকে সবাই তিরস্কার করে'। দ্রৌপদী ছিলেন বিদূষী মহিলা, তিনি জানেন এইভাবে আমি একটার পর একটা কথা বলে গেলে যুধিষ্ঠিরের কিছুই হবে না। সেইজন্য নিজের কথার উপর জোর দেবার জন্য অনেক আগেকার একটা কাহিনীকে নিয়ে আসছেন। ভারতের পরম্পরাতে একেবারে আদিতে দুটো বংশের উল্লেখ পাই, একটা হল দেবতাদের বংশ আর আরেকটি হল দৈত্যদের বংশ। এরা দুজনেই হলেন একই বাবার সন্তান আবার তাদের মায়েরা হলেন সবাই আপন বোন। দৈত্য বংশের খুব নামকরা ব্যক্তিত্বরা হলেন প্রহ্লাদ, বলি ইত্যাদি। এনারা আবার সবাই ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। রাজা বলির ঠাকুর্দা ছিলেন প্রহ্লাদ। বলি একবার শিক্ষা নেওয়ার জন্য প্রহ্লাদের কাছে গিয়েছে। বলি গিয়ে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করছে 'হে তাত! ক্ষমা আর তেজ এই দুটোর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ'? প্রহ্লাদ ছিলেন খুব শান্ত মনের পুরুষ বলিও শান্ত মনের কিন্তু দুজনেই ছিলেন শক্তিমান, দৈত্যবংশ মানেই তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় তেজেরই প্রাধান্য। এখানে মনে রাখতে হবে ক্ষমা ও তেজের এই সব প্রশ্ন একমাত্র হয় শক্তিমান পুরুষদের মধ্যেই, অর্জুন, ভীম এদের মত শক্তিমান পুরুষের মধ্যে প্রচণ্ড তেজ, সেখানে তেজ ও ক্ষমার মধ্যে কোনটা শ্রেয় সেই নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে। দুর্বলের ক্ষমা করা না করা কোন কথাই এখানে হচ্ছে না। বলি নিজের দাদুকে এই প্রশ্ন করছেন।

প্রহ্লাদ বলছেন 'তোমার এটা ভুল ধারণা তেজ ভালো না ক্ষমা ভালো, একটা জিনিষকে দিয়ে কখনই বিচার করা যায় না। কখন তেজ ভালো কখন ক্ষমা ভালো'। মহাভারতও কখনই বলে দেবে না যে তুমি এটাই কর, উপনিষদ বলে দেবে তুমি এই কর, তুমি তপস্যা কর, তুমি সত্য বল। কিন্তু মহাভারত এই দায়িত্ব পাঠকের উপরে ছেড়ে দেয়, সে কি করবে সেই ঠিক করবে। কারণ মহাভারত হল সমন্বয় শাস্ত্র, সমন্বয় শাস্ত্রে কখন পরিষ্কার করে বলবে না যে তুমি এটাই করবে। এখানে প্রহ্লাদ যেটা বলছেন সেটা রাজাকে বলা হচ্ছে, প্রহ্লাদ বলছেন 'যে সব সময় ক্ষমা করে যায় তার মধ্যে অনেক রকম দোষ এসে যায়'। কি দোষ এসে যায়? প্রহ্লাদ বলছেন 'তার ভৃত্য, শত্রু ও নিরপেক্ষ লোকেরা তাকে সব সময় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। যারা সব সময় ক্ষমা করে যায় তাদের আর কি হয় – *সর্ব্বভূতানি চাপ্যস্য ন নমন্তি কদাচন। তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত! পণ্ডিতৈরপবাদিতা।* ।৩/২৪/৪৭। যারা সব সময় ক্ষমা করেই যায় তাদের কাছে কোন লোক অবনত হয় না, এমনকি পণ্ডিত ও বিদ্বানদেরকেও বারণ করা আছে যে সব সময় ক্ষমা না করতে'। ঠাকুর অন্য ভাষায় আমাদের খুব সহজ করে বলছেন – ফোঁস করবি কিন্তু বিষ ঢালিস না। যোগী তাঁর শিষ্য সাপকে বলে

গিয়েছিল কাউকে হিংসা করতে না। সাপ এখন হিংসা বন্ধ করে দিয়েছে। সবাই এখন খুব বিরক্ত করছে, লাঠি দিয়ে আঘাত করছে। সাপ বেচারা তাই আর গর্ত থেকে বেরোয় না, গাছের পাতা খেয়ে থাকে। সেই সময় যোগী এসে সাপকে এই কথা বলছেন, তোকে তো আমি ফোঁস করতে বারণ করিনি, ফোঁস করবি কিন্তু বিষ ঢালিস না। ঠিক এই কথাই এখানে বলা হচ্ছে, যাঁরা বিদ্বান পুরুষ তাঁরাও যদি সব সময় ক্ষমা করে যান তাহলে তাদের জীবন-যাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য। সাধারণ মানুষও তাঁকে পেয়ে বসবে।

প্রহ্লাদ বলছেন 'যারা সব সময় শুধু ক্ষমাই করে যায়, এই ধরণের লোকেদের কর্মচারীরা অনেক ধরণের দুষ্কর্ম করতে থাকে, এরা মালিকের টাকা-পয়সা, দরকারি জিনিষ-পত্রও চুরি করতে শুরু করে দেয়। শুধু তাই নয়, তার যে পোষাক-আশাক, গাড়ি, শয্যা, প্রসাধন নিজেও ব্যবহার করতে থাকে আর একে তাকেও দিতে শুরু করে। একজন পুরুষের সব থেকে সম্মানের জিনিষ হল তার স্ত্রী, এই ধরণের সব সময় ক্ষমাবান লোকেদের ভৃত্যরা তাদের স্ত্রীকেও বশ করতে শুরু করে দেয়। এই ধরণের ক্ষমাশীল পুরুষের স্ত্রীরাও কিছু দিন পর স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। শুধু স্বেচ্ছাচারী হয়েই থেমে যায় না, এরা দুষ্টা হয়ে গিয়ে নিজের স্বামীর নানা ভাবে ক্ষতি সাধন করতে থাকবে'।

এবার বলছেন যে কখন ক্ষমা না করে শুধু তেজ দেখিয়ে যাচ্ছে তাদের কি হয়। যে মানুষ সব সময় তেজ দেখিয়ে চলে, ক্ষমা করতে জানে না, সে সর্বদা রজোগুণের বশে এসে যায়। রজোগুণের বশে আসার ফলে প্রতি নিয়ত অন্য সবাইকে পীড়ন দিতে থাকে, অকারণে নানা রকমের দণ্ড দেয়। এইভাবে তেজ দেখানোর ফলে সে চারিদিকে তার অনেক শত্রুর জন্ম দেয় আর তার স্বজনরাও তার থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। এইভাবে শুধু তেজ দেখিয়ে লোকেদের অপমান করার ফলে তার অর্থেরও হানি হয়, তার ব্যবসার ক্ষতি হয়, কর্মস্থলে সবাই তাকে এড়িয়ে চলে আর নিত্য নতুন শত্রু বানাতে থাকে। ক্ষমা ভাবের যদি একান্তই অভাব হয়ে থাকে তাহলে তার প্রাণ পর্যন্ত সংশয় হতে পারে। কিছু একটা নিয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি হলেই লড়াইতে নেমে গিয়ে নিজের প্রাণ সংশয়কে ডেকে নিয়ে আসবে। এমন কি যারা প্রচণ্ড রাগ পুষে রাখে সে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। প্রহ্লাদ বলছেন কোন কোন অবস্থায় ক্ষমা করতে হয়। ১) কোন এক সময়ে যে আপনার উপকার করেছে সে বড় কোন অপরাধ করলেও তাকে একবারের মত ক্ষমা করে দিতে হয়। ২) অজান্তায় যদি কেউ অপরাধ করে ফেলে তাকে ক্ষমা করতেই হবে। কিন্তু এখানে একটা শর্ত আছে, যে বার বার অপরাধ করার পরেও বলছে আমার অজান্তায় এই অপরাধ হয়ে গেছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে জেনেশুনেই সে এই অপরাধ করে যাচ্ছে তখন কিন্তু তাকে ক্ষমা করা যাবে না, তাকে দণ্ড দিতে হবে। ৩) প্রত্যেক প্রাণির একটি অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করতে হবে।

যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুত্তর

দ্রৌপদী এতক্ষণ বলি ও প্রহ্লাদের কথা বলছিলেন। এই সব বলে বলে দ্রৌপদী বলছেন 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা লোভী আর সব সময় আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করে আসছে। এরা এই তিনটে অবস্থাকে অতিক্রম করে গেছে সেইজন্য আপনি এখানে ক্ষমা না দেখিয়ে আপনার তেজকে কাজে লাগান'। দ্রৌপদীর কথা শোনার পর যুধিষ্ঠির বলছেন 'মানুষের জীবনের উন্নতি ও অবনতি এই দুটোর মূলে হল ক্রোধ। যে ক্রোধকে জয় করে তার জীবনে সাফল্য আসে, ক্রোধকে যে জয় করতে পারেনা সে বিনাশের দিকে যায়'। যুধিষ্ঠির বলছেন – *তৎ কথং মাদৃশঃ ক্রোধং বিসৃজেল্লোকনাশনম্। ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্গুরূনপি।। ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোঽপ্যবমন্যতে। বাচ্যাবাচ্যে হি কুপিতো ন প্রাজান্তি কর্হিচিৎ।* ।৩/২৫/৪-৫। মানুষ যখন ক্রোধে বশীভূত হয়ে যায় তখন হেন জিনিষ নেই যেটা সে করতে পারেনা। সে সব রকমের পাপ করতে পারে, গুরুজনের হত্যা পর্যন্ত করতে পারে আর কটূ ও কঠোর কথা বলে গুরুজনদের অপমান করতে পারে, যে কোন পাপ সে করতে পারে। তাই আমার মত লোক কি করে এই লোকনাশক ক্রোধ প্রয়োগ করবে? যুধিষ্ঠির পর পর অনেক শ্লোকে বলে যাচ্ছেন কেন ক্রোধ করতে নেই। মানুষ যখন ক্রোধের কবলে চলে যায় তখন সে অবধ্যকেও বধ করে দিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে কয়েকজনকে বধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন স্ত্রী বধ করা নিষেধ আছে, তেমনি ব্রাহ্মণ, গুরুজনদের বধ করা নিষেধ আছে। এমনকি নিজের আত্মহত্যা পর্যন্ত করে দিতে পারে। তোমার প্রতি যদি কেউ ক্রোধ করে সেই ক্রোধকেও যদি তুমি হজম করে নিতে পার তাহলে জানবে তুমি নিজের দোষ থেকে তোমাকে রক্ষা করলে আর অপরকেও একটা বড় দোষ থেকে তুমি বাঁচিয়ে দিলে।

প্রথমে শুরু হয়েছিল তেজ ও ক্ষমা দিয়ে, এতক্ষণ তেজ তেজ করেই আলোচনা এগিয়েছে, কিন্তু এই তেজকে যুধিষ্ঠির ক্রোধের সঙ্গে তুলনা করে টেনে নিয়ে গেছেন। পণ্ডিতরা যাঁকে তেজস্বী বলেন, যার মধ্যে তেজ আছে তার ভেতরে কখনই ক্রোধ থাকে না। এখানে তেজকে ইতিবাচকে নিয়ে আসা হল। আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি হল তেজ। মানুষ তেজ আর ক্রোধকে ভুল করে এক করে ফেলে। কিন্তু মৌলিক নিয়ম হল যার মধ্যে তেজ আছে সে কখনই ক্রোধী হবে না। স্বামীজীর যেমন, তাঁর ভেতরে কি প্রচণ্ড তেজ ছিল, কিন্তু ক্রোধ বলে তাঁর কিছু ছিল না। আর অবতার যিনি তিনি জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য আর তেজে সদা সম্পন্ন। অবতারের তেজ সব সময় থাকে। অবতার পুরুষের ভেতরে যদি তেজ থাকে তাহলে তাঁর ক্রোধ থাকবে না। এই কথাই প্রথম থেকে শ্রীকৃষ্ণের নামে বলা হয়ে থাকে, আপনার ভেতরে ক্রোধ নেই। আমাদের সবারই ভেতরে ক্রোধ সব সময় ফোঁস ফোঁস করছে। কিন্তু বেরোতে পারেনা কেন? কারণ ভয় আছে। আমাদের এই ক্রোধটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা সাপ থেকে কেঁচো হয়ে যাব। কেঁচো হতে বলা হচ্ছে না, শক্তি তোমার মধ্যে থাকতে হবে, শক্তি থাকার পরও তুমি ক্রোধটাকে সংবরণ করতে পারছো কিনা। আমাদের শক্তি নেই, তেজ নেই কিন্তু ক্রোধ পুরো মাত্রায় আছে। সারা ভারতে কারুর শক্তি নেই কিন্তু রক্তে তেজ আছে সেটা থেকেই ক্রোধ হয়। রোগা প্যটকা লোকেদেরই ক্রোধটা বেশী হয়। ক্রোধকে সংবরণ করতে গেলে যে শক্তির দরকার সেই শক্তিটাই আমাদের মধ্যে নেই। প্রথমে থাকতে হবে শক্তি, তারপর ঐ ক্রোধকে আটকানোর শক্তি দরকার।

শক্তি আর ক্রোধের সংযমের মিলনে আসে তেজ। তেজস্বীর চেহারা দূর থেকে দেখলেই বোঝা যাবে। তেজস্বী দেখলেই বুঝতে হবে এর মধ্যে কোন ক্রোধ নেই। এই ক্রোধ যখন জন্ম নেয়, তখন বুদ্ধি দিয়ে সেই ক্রোধকে যখন দাবিয়ে দেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় তেজস্বী। ক্রোধটা উঠল, সেটাকে দাবিয়ে দেওয়া হল। কি দিয়ে আটকানো হল? বুদ্ধি দিয়ে। বুদ্ধি মানে, বিবেক-বিচার, আমার এটা করা উচিৎ নয়। ক্রোধী মানুষ কখনই বুঝতে পারেনা মর্যাদার সীমারেখাটা কি, ক্রোধী মানুষ কর্তব্য অকর্তব্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। মুর্খ যারা তারা ক্রোধকেই তেজ মনে করে। কিন্তু ক্রোধ সব সময় রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয় আর তেজ সব সময় হয় সত্ত্বগুণ থেকে। ক্ষমাশীল মানুষ যদি পৃথিবীতে না থাকে তাহলে মানবজাতি বলে কিছু থাকবে না, তখন কখনই কোন সন্ধি হবে না। কিছু কিছু ক্ষমাশীল মানুষ আছে বলেই পৃথিবীতে এখনও শান্তি, সন্ধি এগুলো সম্ভব হচ্ছে। ঠিক ঠিক বিদ্বান ও পণ্ডিত কে? যাকে নিন্দা করা হচ্ছে, গালাগাল দেওয়া হচ্ছে তা সত্ত্বেও যে নিজের ক্রোধকে বশে রাখতে পারে সেই হল ঠিক ঠিক পণ্ডিত। যুধিষ্ঠির বলছেন – *ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্। যস্তামেষং বিজানীতে স সর্বং ক্ষন্তুমর্হতি।।৩/২৫/৩৭*। ক্ষমা ধর্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ এবং ক্ষমা শাস্ত্রজ্ঞান। যে মানুষ ক্ষমাকে এই রূপে জানেন সে সমস্তই ক্ষমা করতে পারে। তখন সে কোন অপরাধ নেয় না। এখানে কিন্তু শক্তির অভাবের কথা বলা হচ্ছে না, শক্তি থাকতে হবে। শক্তি যদি না থাকে তাহলে এই আলোচনা করা হবে না, এখানে মেনেই নেওয়া হয়েছে যে তোমার ভেতরে শক্তি আছে। শক্তিও আছে আর ক্রোধও আছে, এই ক্রোধটাকে তেজে রূপান্তরিত করতে হবে। *ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতঞ্চ ভাবি চ। ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচং ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ।।৩/২৫/৩৮*। ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষমা ব্রহ্ম, ক্ষমার ফল অতীতে দেখা গেছে ভবিষ্যতেও দেখা যাবে, ক্ষমা তপস্যা এবং ক্ষমা শৌচ, সুতরাং ক্ষমাই এই জগতকে ধারণ করে আছে। ক্ষমা ধর্মে যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাবে, কারণ ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। এই পৃথিবীলোকে ভোগ করতে পারে যারা ক্ষমা করে আর পরলোক মানে স্বর্গলোক ভোগ করে যারা ক্ষমা করে।

দ্রৌপদী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের সমালোচনা

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল, প্রহ্লাদ বলছেন যারা শুধু ক্ষমাই করতে থাকে তাদের ভৃত্যরা এই রকম করে, তার স্ত্রী, বন্ধুরা এই রকম হয় আর যুধিষ্ঠির ঠিক তার উল্টো কথা বলছেন। এর মধ্যে কোনটা ঠিক মনে হচ্ছে? এটাই মহাভারতের বৈশিষ্ট্য, দুটো দিকই রেখে দেওয়া হল, ভালো খারাপ দুটো দিকই দেখিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কোনটা আমি গ্রহণ করবে মহাভারত সেই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলে দিচ্ছে না। যুধিষ্ঠিরের ক্ষমার প্রশংসা শুনে দ্রৌপদী বলছেন ‘ধন্য ধন্য সেই ঈশ্বর, সেই বিধাতা, আমার প্রণাম জানাই সেই ঈশ্বরকে যে আপনাকে এই দুর্বুদ্ধি দিয়েছেন। আপনার পিতা পিতামহের যে ধর্ম তার বিপরীত আচরণ আপনি করছেন। দ্রৌপদী যুক্তি দিয়ে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যকে খণ্ডন করছেন। বলছেন *রাজানং ধর্মগোপ্তারং ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। ইতি মে শ্রুতমার্য্যাণাং ত্বান্তু মন্যে ন রক্ষতি।।৩/২৬/৮*। আমি গুরুজনদের কাছ থেকে শুনে এসেছি রাজা ধর্মকে রক্ষা করলে, রাজা রাজার ধর্ম পালন করলে ধর্মও রাজাকে রক্ষা করে। আপনার ধর্ম হল তেজ দেখান, ক্রোধ দেখান, আপনার ধর্ম হল যুদ্ধ করা। আপনি আপনার ধর্ম পালন করছেন না

তাই এই ধর্ম আপনাকে কখনই রক্ষা করবে না। দ্রৌপদী এখানে ধর্মের খুব বিখ্যাত একটা সংজ্ঞা দিচ্ছেন – *ধর্মো রক্ষতি রক্ষতঃ*। যে ধর্মের রক্ষা করে তার রক্ষা ধর্ম করে। আমি যেটাকে ধর্ম মনে করেছি, আমার নিজের জন্য যেটা ধর্ম, সেই ধর্ম যাই হয়ে থাকুক না কেন, সেই ধর্মকে আমি যদি ঠিক ঠিক পালন করতে থাকি তাহলে যখনই আমার কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতি আসবে তখন এই ধর্মই সেই সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করবে। আমরা বেশীর ভাগই সাধারণ মনের অধিকারী, আমাদের মন সব সময় এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। মানুষকে তাই বলা হয় তোমার ধর্ম হল ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া। আমি যদি ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে যাই তখন এটাই আমার ধর্ম। আমি সব কিছুতে ঈশ্বরকেই দেখবো। আমার ভালো মন্দ যাই হোক সব ঈশ্বরই করছেন। তখন আমাকে রক্ষাটা কে করে? ঈশ্বর কখনই আমাকে রক্ষা করেন না, আমার এই ধর্মই আমাকে রক্ষা করে। আমি নিজেকে খুব ঈশ্বরপরায়ণ মনে করছি। এখন আমার এক খুব প্রাণের বন্ধুর উপর খুব বিপদ এসেছে, আমি যদি বলি 'আমার ঈশ্বরের উপর এত বিশ্বাস! তিনি তোমাকে রক্ষা করলেন না'! ঈশ্বর কখনই রক্ষা করেন না। কিন্তু আমি যদি বলি 'আমি তো ঈশ্বরের শরণাগত, এই বিপদ যেটা এসেছে এটাও তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে'। এবার কিন্তু বিপদে সে মার খাবে না। এখানে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করছেন না, তার ধর্মই তাকে রক্ষা করছে। অনেক দিন আগে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল পার্ক সার্কাস এলাকায় দুটো বাচ্চা খেলা করছিল, কিভাবে একটা আচমকা দুর্ঘটনায় একটা বাচ্চা মারা যায়। অন্য বাচ্চাটি খুব ভয় পেয়ে গেছে। বাচ্চার বাবা খুব গরীব মুসলমান, বাবা বলছেন 'আল্লা দিয়েছিলেন আল্লাই ফেরত নিয়ে নিয়েছেন'। এই যে নিজের মধ্যে ভাবটাকে ধরে রেখেছে আমার জন্য আল্লাই সব কিছু। এই সন্তান কে দিয়েছেন? আল্লা দিয়েছেন। এই কথা বলছে না যে তুমি আমার সন্তানকে কেন নিয়ে নিলে। আপনি আমার কাছে একশ টাকা রাখতে দিয়েছেন। কিছু দিন পর আপনি সেই টাকাটা ফেরত চাইলেন, আমি দিয়ে দিলাম, এতে আমার মন খারাপ করার কি আছে! এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক *ধর্মো রক্ষতি রক্ষতঃ*। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে মহাভারতে এটাই পার্থক্য, এটাই মহাভারতের মাহাত্ম। আপনি আমি কি ধর্ম পালন করছি সেটার কোন গুরুত্ব নেই, যে ধর্মই হোক না কেন সেটাকে ঠিক ঠিক পালন করে যাচ্ছি কিনা, তখন এই ধর্মই আমাকে সব কিছুতে রক্ষা করবে। একজন ব্রাহ্মণ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করে তুলসীপাতা খেয়ে গঙ্গাজল পান করে একশ আট বার গায়ত্রী জপ করছে, এটাই তার ধর্ম, এটাই তাকে রক্ষা করবে। একজন মুসলমান বলছে আমার পক্ষে দিনে পাঁচবার নমাজ পড়া হবে না, আমি সকালে একবারই নমাজ পড়ব, তাই করুক, এটাই তাকে রক্ষা করবে। একজন সাধারণ নারী, তার কোন বিশেষত্বও নেই, কিন্তু সে বলছে আমি আমার স্বামীকেই সব কিছু মনে করে তার সেবা করে যাচ্ছি, এছাড়া আমি আর কিছু পারবও না। এখন যদি স্বামী কোন কারণে মারা যায় এখন কি সেই স্ত্রী বসে বসে কাঁদবে? কিছু দিনের জন্য তার শোক একটা হবে কিন্তু এই ধর্মই তাকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা ধর্মের নামে আমাদের কামনা বাসনা গুলিকে মেটাতে তৎপর হই। আমি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে একশ আটবার জপ করছি তাও ঠাকুর আমার ছেলেকে পরীক্ষায় ভালো ভাবে পাশ করাতে পারলো না! আমরা একটু জপ করে ভাবি ঠাকুর আমার চাকরের মত সব জুটিয়ে দেবেন। ঠাকুরের এগুলো কাজ নয়, ভক্তরা এই ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে চায় না। ধর্ম আমার মেয়ের জন্য পাত্র জোগাড় করে দেবে না, ধর্ম আমার ছেলের চাকরি করে দেবে না। ধর্ম তাহলে কি করবে? রক্ষা করবে। কিসের থেকে রক্ষা করবে? অশান্তি থেকে। সাফল্য অসাফল্য যা কিছু হয় সব জগতের নিয়মে হয়, আমার আপনার নিয়েমে এটা চলে না আর এটাকে আমরা আটকাতেও পারবো না। ধর্মটা কি? আমার ভেতর থেকে যে ভাবটা আমি তৈরী করেছি। এরপর দ্রৌপদী একটা বিষয়ের উপর বিরাট আলোচনা করছেন, কর্ম করলে আমাদের সব কিছু ঠিক হয়, না আমাদের সব কিছু ভাগ্যের অধীন। সাফল্য অসাফল্য যাই হোক এটা কিসের জোরে হয় কপালের জোরে, না কর্মের জোরে। এই নিয়ে দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এখন আলোচনা হচ্ছে। দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠিরের মাধ্যমে মহাভারত কিভাবে দেখছে সেটাই আমরা দেখব।

ঈশ্বরের ইচ্ছা, কর্মফল, কপাল বা দৈব সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা

প্রত্যেক ধর্ম আর প্রত্যেকটি শাস্ত্রের কাছে এটা এক গভীর সমস্যা, মানুষ যে ফল ভোগ করে সেটা কি সে তার কর্মানুসারে পায় নাকি কপালে ছিল বলে পাচ্ছে। এই কপালের অনেকগুলো পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। কপাল বলতে বোঝান হয় unseen factor অদৃশ্য কারণ বা অজ্ঞাত কারণ। আমি যখন 'ক' পরিমাণ কর্ম প্রচেষ্টা লাগাচ্ছি সেখান থেকে আমি 'খ' পরিমাণ ফল প্রত্যাশা করছি। আগেকার দিনের কয়লা ইঞ্জিনগুলোর ক্ষমতা ছিল ২০% এর কাছাকাছি সেখানে আজকে ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষমতা হল ৮০%। ১০০% বলে কোন কিছু হয় না। আমাদের জীবনে 'ক' পরিমাণ কর্ম করলে 'খ' পরিমান ফল পাওয়ার কথা কিন্তু কখনই সেটা 'খ' পরিমাণ হয় না। আমি এক কিলো ধানের বীজ নিয়ে চাষ করলাম আর আমি আশা করছি এই এক কিলো বীজ থেকে কুড়ি কিলোর মত ধান পাব। কিন্তু দেখা যায় এই কুড়ি কিলো কখনই হয় না। আরও মজার ব্যাপার, দুই ভাই মিলে চাষ করবে, একই জমিকে সমান দু ভাগ করে বলে দেওয়া হল

এদিকটা তুমি চাষ করবে আর ঐদিকটা আরেক ভাই চাষ করবে। এরপর বাকি সব কিছু সমান ভাবে দেওয়া হল। একই বীজ, একই সার, একই জল আর সবই একই পরিমাণ। যখন ফসল হবে দুজনের সমান ফসল কিছুতেই হবে না। যেখানে কুড়ি কিলো হওয়ার কথা কিছুতেই সেটা হবে না, হয় একুশ কিলো হবে নয়তো পনেরো কিলো। আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, একটা গরু একজনের কাছে আছে সে যা খাওয়া-দাওয়া দিচ্ছে তাতে দিনে পাঁচ কিলো দুধ দিচ্ছে। এবার এই গরুকে অন্য লোকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ একই খাবার দিচ্ছে কিন্তু দুধ দেওয়ার সময় পাঁচ কিলো দেবে না, হয় ছয় দেবে নয়তো চার দেবে। এটাই হল অদৃশ্য কারণ। এই অদৃশ্য বা অজ্ঞাত কারণকে কেউ বলে দৈব, কেউ বলে কপাল, কেউ বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা, কেউ বলে ভাগ্য। নানা রকমের শব্দ ব্যবহার করে আসলে বলতে চাইছে ভাই আমি জানিনা কেন এই রকম হচ্ছে। আমি এক কিলো বীজ দিয়েছি কুড়ি কিলো ধান হওয়ার কথা কিন্তু পেয়েছি বাইশ কিলো আর আমার ভাই ষোল কিলো কেন পেল আমি কি করে জানব! এটাই হল অদৃশ্য কারণ। কিন্তু এই অদৃশ্য কারণ কোথা থেকে হচ্ছে? কেউ বলবে আপনার কপালে ছিল, কেউ বলবে আপনার আগের জন্মে ভালো কিছু করা ছিল, কেউ বলবে ঠাকুরের কৃপা। যত যাই বলা হোক না কেন, মূল কথা হল এটা একটা অদৃশ্য কারণ। এই নিয়ে এখন দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠিরের মধ্যে আলোচনা চলছে।

এই ধরণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে কোন ধর্মশাস্ত্রে প্রচুর আলোচনা পাওয়া যাবে। ধর্মদর্শন থেকে যখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় তখন দুটো মত এসে যায় – একটা দ্বৈত মত আরেকটি আধ্যাত্মিক কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া মত। দ্বৈত মতে বলছে ঈশ্বর আছেন, তার মানে মুসলমানদের আল্লা আছেন, খ্রীশ্চানদের গড্ আছেন আর হিন্দুদের নারায়ণ আছেন, শ্রীকৃষ্ণ আছেন শ্রীরাম আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন। দ্বৈত মতে আমি যা কিছু পাচ্ছি, ঈশ্বর বলে একজন আছেন তিনি একটা সুপার কম্প্যুটারে বসে টেপাটেপি করছেন সেখান থেকে আমি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু হিন্দু ধর্মের লোকেরা দেখলেন এতে ঈশ্বরের উপর পক্ষপাত দোষ এসে যায়। খ্রীশ্চান, মুসলমান আর জিউস মানে সেমেটিক ধর্মের ক্ষেত্রে আরও বড় সমস্যা হয়ে যায়। এদের মতে জীবন একবারই এসেছে, আল্লা বা গড্ আমাদের একবারের মত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি তো সৃষ্টি করে দিলেন কিন্তু একে বড়লোক ওকে গরীব লোক কেন করলেন? এর স্বাস্থ্য ভালো এর স্বাস্থ্য কেন খারাপ করলেন? তাহলে ঈশ্বরের মধ্যে পক্ষপাত দোষ এসে যাচ্ছে। এখন সবাইকে যে স্বর্গ বা নরকে পাঠাবেন সেটাও তার বুদ্ধির মত, এই বুদ্ধিটাও তো ভগবানেরই দেওয়া। তাহলে ভালো মন্দ যা করবে তার সব দায় আল্লার উপরই যাবে। এই সমস্যাগুলো হিন্দুরা অনেক আগেই ধরতে পেরেছিলেন। এখান থেকে আস্তে করে হিন্দুরা তাদের দর্শনটাকে পাল্টে দিল। পাল্টে দিয়ে ওনারা একটা শব্দ নিয়ে এলেন, যাঁর নাম বিধাতা। ভগবান ও বিধাতা এই দুটো ভাব আলাদা। ভগবান হলেন তিনিই সব কিছু করছেন ও করাচ্ছেন, এই ভাবে দেখলে ভগবানের উপর পক্ষপাত দোষ এসে যাচ্ছে। বিধাতা হলেন সুপারিন্টেনডেন্টের মত। বিধাতা না থাকলে সব বিশৃঙ্খলা হয়ে যাবে। রেলের যখন কোন দুর্ঘটনা হয় তখন সবাই রেলমন্ত্রীকে দোষ দেয়, নাহলে জেনারেল ম্যানেজারকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু দুর্ঘটনাটা কে করিয়েছে? সিগন্যাল ম্যান হয়তো করিয়েছে। রেলমন্ত্রী আছেন বলে, জেনারেল ম্যানেজার আছেন বলে রেলের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সবাই নিজের নিজের কাজ করছে। এটাই হয়ে গেল বিধাতা। হিন্দু ধর্মে ভগবান যিনি তার ভাবটা হল বিধাতার। বিধাতা আছেন বলে সবাই নিজের নিজের কাজ করছে। বাতাস কেন প্রবাহিত হচ্ছে? বিধাতা আছেন বলে বাতাস বইছে। বিধাতা আছেন বলে বিভিন্ন দেবতারা তার ভয়ে কাজ করছে, কঠোপনিষদে এই কথাই বলা হচ্ছে – *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।*(২/৩/৩)। ব্রহ্ম আছেন বলে বিধাতা সব কিছুকে নিয়মে চালাচ্ছেন। এখান থেকেই ঋতমের ধারণা এসেছে। ঋতমের এই ধারণাটাই পরিবর্তন হয়ে কর্মে চলে এসেছে। এখানে ভগবান বা বিধাতা কিছু করছেন না, রেলমন্ত্রী নিজে গাড়ী চালাচ্ছেন না, রেলমন্ত্রী আছেন বলে রেলের সবাই ঠিক ঠাক কাজ করে চলেছে। কিন্তু যে কোন সেমেটিক ধর্মে গিয়ে বা দ্বৈতবাদে গিয়ে, যেখানে ভগবান আলাদা আর জীব আলাদা, সেখানে সমস্যা হয়ে যায়, সব কিছু ভগবানের উপর চেপে যায় আর ফলের ভোগটা জীবের উপর এসে পড়ে। তখন দোষটা পুরোপুরি ভগবানের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। কিন্তু হিন্দুদের বেদান্তে ভগবান বলছেন তুমি করেছ আমি কিছুই করিনি, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্,* আমি অধ্যক্ষ আমি আছি বলে প্রকৃতি সব কিছু করছে কিন্তু আমি কিছুতে আবদ্ধ নই আমি উদাসীন। তার মানে লঙ্কা যদি আমি খাই ঝালটা আমার লাগবে। ভগবান আমাকে ঝাল লাগাননি, আমি লঙ্কা খেয়েছি বলেই ঝালটা আমার লেগেছে। এইটাই হল কর্মের বিধান। লঙ্কার মধ্যে ঝালটা কে দিয়েছেন? প্রকৃতি দিয়েছেন। প্রকৃতি কেন দিয়েছেন? ভগবান, যিনি অধ্যক্ষ তিনি বিধান করে দিয়েছেন লঙ্কায় ঝাল থাকবে। এরপর তুমি লঙ্কা খাবে কি খাবে না সেটা তোমার ব্যাপার, এখানে এসে ভগবান তোমাকে লঙ্কা খাইয়ে ঝাল লাগাতে যাবেন না। তুমি নিজে লঙ্কা খেলে তোমার ঝাল লাগবে। এইটাই বিধান। এগুলোকে নিয়ে খুব বেশী ভাবতে নেই। কারণ আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে,

আমি কেন গরীব হলাম, সে কেন বড়লোক হল। দুই ভাই একসাথে লেখাপড়া করে বড় হল, কিন্তু একজন হয়ে গেল বিরাট আইএএস অফিসার আরেকজন হল স্কুলের সামান্য একজন কেরানী। এই রকম কেন হয়? এগুলোকে বোঝানর জন্য আমাদের মনকে শান্ত করার জন্য একটা উত্তর দিয়ে দেওয়া – এইটাই দৈব বা কপাল বা ভাগ্য বা কর্মফল, যেটাকে বলা হচ্ছে unseen factors অদৃশ্য কারণ বা এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, আল্লার মর্জি। কিন্তু যখন কর্ম বিধানের মধ্যে নিয়ে আসা হয় তখন ব্যাপারটা যুক্তির দিক দিয়ে জোরালো হয়ে যায়। এইজন্য আচার্য শঙ্কর বলছেন, এগুলো ঋষিরা বলে গেছেন তাই মেনে নিতে হয়, বেশী প্রশ্ন করতে নেই। ঠাকুরকে যখন জন্মান্তর নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে তখন ঠাকুরও ঠিক এই উত্তরই দিচ্ছেন। অনেকে যখন বলে গেছেন তখন এটা মেনে নিতে হয়। কারণ আপনি যখন প্রশ্ন করতে থাকবেন তখন একটা সীমার পর এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। এটা আল্লার মর্জি কিনা বা কর্মফল কিনা এর কোনটারই উত্তর পাওয়া যাবে না, সেইজন্য একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হয়।

দ্রৌপদী বলছেন – *অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। ঈশ্বরস্য বশে লোকাস্তিষ্ঠন্তে নাত্মনো যথা।* ।৩/২৬/২১। এই বিষয়ে মনস্বীরা এই পুরাতন ইতিহাসের উল্লেখ করে থাকেন। ইতিহাস আর পুরান এই শব্দ দুটো মহাভারতে আগেই এসে যাচ্ছে। যদিও আমরা মহাভারতকে ইতিহাস মূলক ও পুরান শাস্ত্র বলছি কিন্তু মহাভারতের অনেক আগে থেকেই এই শব্দগুলো চলে আসছে। দ্রৌপদী বলছেন – সবাই ঈশ্বরের বশে স্বাধীন কেউ নেই। *ধাতৈব খলু ভূতানাং সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে। দদাতি সর্বমীশানঃ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরন্।* ।৩/২৬/২২। এখানে আবার বিধাতা শব্দটা এসে গেছে। বলছেন বিধাতাই সমস্ত প্রাণির পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মানুসারে তাদের সুখ, দুঃখ, প্রিয়, অপ্রিয় সমস্ত অবস্তারই বিধান করেন। দুটো শ্লোকে দুই রকমের কথা বলছেন। প্রথমে বলছেন কেউ স্বাধীন নয় সবাই ঈশ্বরের অধীন। কিন্তু তার পরের শ্লোকেই বলছেন বিধাতা সমস্ত প্রাণির কর্মানুসারে তাকে ভালো মন্দ দেন। তার মানে আমি যেটা আশা করছি সেটা কোন দিনই পাবো না। তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কেন নিয়ে আসা হল? তার সাথে আরেকটাও মতও নিয়ে আসা হচ্ছে, এই যে বলা হল ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর নিজের খেয়াল খুশী মত সবাইকে ভালো মন্দ দিচ্ছেন, তাহলে তো ঈশ্বরের পক্ষপাত দোষ এসে যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কোন পক্ষপাত নেই। আমি যে রকমটি করেছি সেই অনুসারেই জিনিষটা আসছে। আগে আমি গোলমাল করেছি বলেই এখন দুঃখ কষ্ট আসছে, কিন্তু আজকে যদি আমি ভালো কিছু করে থাকে আগামী দিনে ভালোই আসবে। হিন্দু ধর্মের বেদান্ত যে ধর্ম দিচ্ছে এটা খুবই ইতিবাচক ধর্ম, এই ধর্মে দায়ীত্বটা নিজের কাঁধে আসছে। আজকে অমুকের সমাজে এত সম্মান কেন? তিনি ভালো কাজ করেছিলেন। আর আমার এই দুরবস্থা কেন? এর আগে খারাপ কিছু করেছিলাম বলে। এটাকে পাল্টানো যাবে কি করে? এখন থেকে তুমি ভালো কাজ করতে থাক পরে ভালো হবে। এই কারণে এই মতটি খুবই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত, সব সময় আমাদের ভালো পথের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যারা অলস, কুঁড়ে এরা বলে তাঁর ইচ্ছা হলে হবে, না হলে হবে না। এদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় – কি ব্যাপার! অনেক দিন মঠে আসছেন না? তখন বলবে, ঠাকুরের ইচ্ছে নেই আমি আর কি করব বা বলবে ঠাকুর টানছেন না। দ্রৌপদী বলছেন 'সূত্রধর যেমন পুতুলগুলিকে দড়ি দিয়ে নাচায় ঠিক তেমনি ঈশ্বর সব প্রাণিকে নাচাচ্ছেন'। এখানে বিভিন্ন মত নিয়ে আসা হচ্ছে। যে দড়ি দিয়ে পুতুলকে বাঁধা হচ্ছে এই দড়িটাই হল কর্ম। কর্মের মাধ্যমে মানুষের সাথে ঈশ্বরের যোগ। আবার বলছেন, মানুষ ভালো কাজ করুক আর খারাপ কাজ করুক, ঈশ্বর সমস্ত প্রাণির হৃদয়ে থেকে সব কিছু করাচ্ছেন। মূলতঃ দ্রৌপদী বলতে চাইছেন মানুষ ভালো মন্দ যাই করুক, কর্মের মাধ্যমেই করুক আর যার মাধ্যমেই করুক কিন্তু কর্ম যে করছে ঈশ্বরই মানুষের হৃদয়ে থেকে তার ফল সব দিচ্ছেন। এরপর দ্রৌপদী নিজের শেষ মন্তব্য করে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন 'আপনার মত লোকের এই দুরবস্থা দেখে আর দুর্যোধনের মত বদমাইস লোকের সমৃদ্ধি দেখে আমি সেই ভগবান ও বিধাতার নিন্দা করছি যিনি এই বিষম দৃষ্টিতে দুষ্টকে সুখ আর শিষ্টকে সুখ দিচ্ছেন'। আমরাও দ্রৌপদীর মত চারিদিকে এত দুর্নীতির কেলেঙ্কারি দেখে বলি হে ভগবান এগুলোর তোমার কি কোন বিচার নেই! 'আপনার মত ভালো লোকের এই যে এত দুর্গতি আর বদমাইস লোকেদের এত সুখ দিচ্ছে এর যে পাপ এই পাপ ভগবানেরও লাগবে'। দ্রৌপদী যেটা বলছেন, এটা যে কোন দ্বৈতবাদ ধর্মের বিরাট বড় সমস্যা। ইসলামে যখন এক সময় আল গাজালিদের মত বড় বড় দার্শনিকরা ছিলেন তাঁরা খুব উচ্চ মানের ছিলেন। তাঁদেরকে এই প্রশ্ন করলে তাঁরা বলছেন এগুলো ভগবানের কার্য এগুলো বোঝা যায় না তাই এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা যায় না, এই বলে একটা লাইন টেনে দিচ্ছেন। আমাদের যারা বৈষ্ণব এদেরও এই একই সমস্যা। আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান মনে করে আমাদের আলাদা মনে করি তাহলে এই একই সমস্যা আসবে। ভগবানের তাহলে বৈষম্য দোষ এসে যায় আর জগতের যত পাপ ভগবানের কাঁধে এসে যাবে কারণ ভগবানই একমাত্র কর্তা, আর ভগবানই একমাত্র স্বাধীন। গ্রামে যদি কোন গরু

ক্ষেতে ফসল খেয়ে নেয় তখন শুধু গরুকেই ডাণ্ডা মারা হয় না, গরুর যে মালিক তাকেও দণ্ড দেওয়া হয়। এখানে আমি যদি কিছু গোলমাল করি আর আমি যদি পরতন্ত্র হই আর ভগবান যদি কর্তা হন তাহলে ভগবানেরও পাপ লাগবে। এই কথা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলছেন। যে পাপ কর্ম করেছে অথচ তার পাপ লাগছে না তাহলে কিন্তু দুর্বল লোকেদের জন্য আমার শোক হচ্ছে। মানে, ঈশ্বর খুব শক্তিমান কিনা, কিন্তু তিনি পাপ করে যাচ্ছেন, দুর্যোধনকে সমৃদ্ধি দিচ্ছেন আর আপনাকে কষ্ট দিচ্ছেন অথচ ঈশ্বরের পাপ লাগছে না, তাহলে দুর্বলের প্রতিই আমার শোক হবে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে চাইছেন 'হে যুধিষ্ঠির আপনি চেষ্টা করুন যাতে আপনার আরও শক্তি হয় কারণ শক্তিমান পুরুষের কোন পাপ লাগে না। ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি পাপ কর্ম করে যাচ্ছেন তাও তাঁর পাপ লাগছে না'।

দ্রৌপদীর এই সব কথা শুনে যুধিষ্ঠির খুব হতচকিত হয়ে গেছেন। তিনি দ্রৌপদীকে বলছেন 'এগুলো তুমি কি বলছ! এই ধরণের কথা তো নাস্তিকেরা বলে থাকে, তুমি এসব কথা বলো না। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দ্রৌপদী খুব সুন্দর কথা বলছেন 'আমি ভগবানের উপর কোন ধরণের অবহেলার ভাব আনছি না, ভগবানের উপর কোন শঙ্কা ও সংশয় করছি না, ভগবানকে কোন দোষ দিচ্ছি না। আমি শুধু কি করছি – *আর্তাহং প্রলুপামীদমিতি মাং বিদ্ধি ভারত। ভূয়শ্চ বিলপিষ্যামি সুমনাস্তং নিবোধ মে।*।৩/২৮/২। আমি আর্ত, আমি দুঃখে আছি তাই এই প্রলাপ করছি। আমি ঈশ্বরের নিন্দা করছি না, আমি আরও বিলাপ করব'। এটা ঠিক ঈশ্বরের নিন্দা নয়, কারণ ঈশ্বরের নিন্দা করলে পাপ হয়ে যাবে। আমি দুখী, আমি আর্ত তাই আমি এই প্রলাপ করছি, এর বেশী কিছু করছি না। এর আগে আগে দ্রৌপদী যা কিছু বলেছেন তার জবাবে যুধিষ্ঠিরও খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন '*নাহং ধর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি! চরাম্যুত। দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত।*।৩/২৭/২। হে রাজপুত্রি! আমি ফলের আশা করে কোন ধর্ম করি না। আমি যে দান করেছি, যজ্ঞ করেছি আমি এইজন্যই করে এসেছে যে এটা আমার কর্তব্য'। দ্রৌপদীর বক্তব্য ছিল আপনি এত দান করেছেন, আপনি ধর্মপ্রান পুরুষ তাহলে আজ আপনার এত দুরবস্থা কেন, তাহলে আপনার কর্মের কোন ফল আসেনি কেন। এই প্রশ্নের জবাবে যুধিষ্ঠির বলছেন, আমি এই আশায় দান, যজ্ঞ করিনি যে আগামীকাল আমার ভালো হবে, আমার এটা কর্তব্য তাই করেছি।

জাতক কথাতে খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে, ভগবান বুদ্ধ কোন এক জন্মে খুব সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী অতিথিদের খুব সেবা যত্ন করতেন। এদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য দেবতারা এসেছেন। একজন দেবতা অতিথি রূপে এসে কিছু খাবার চেয়েছেন। আর ঐ সময় আরেকজন দেবতা এসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বলছেন, তুমি যদি এগোও তাহলে তুমি এই নরকের আগুনে গিয়ে পড়বে। তখন সেই গৃহস্থ বলছেন, আমার নরক হোক তাতে কিছু আসে যায় না, আমি সেবা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। এই কথা বলে তিনি আগুনের মাঝখান দিয়ে ঢুকতে শুরু করেছেন। তারপর দেখা গেল ওটা কোন আগুনই নয়, একটা মায়ার মত সৃষ্টি করা হয়ছিলে তাকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। এই ব্যাপারটাই যুধিষ্ঠির এখানে বলছেন, আমি যা কিছু কর্ম করছি সেটা কোন প্রত্যাশা নিয়ে করছি না, আমি করছি কারণ এটাই আমার কর্তব্য। কিন্তু আমরা যা কিছু করি একটা ফলের আশা নিয়েই করি। এই যে এখানে যারা দূর দূর থেকে দুপুরের বিশ্রামকে উপেক্ষা করে শাস্ত্র কথা শুনতে আসছেন এনারা কেউই কোন ফলের আশা করে এখানে আসছেন না। শাস্ত্রের কথা শুনতে ভালো লাগে, শাস্ত্র কি বলছে একটু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, এইটাই ঠিক ঠিক কর্মযোগ। মা যখন নিজের সন্তানকে ভালোবাসে তখনও সেই ভালোবাসের মধ্যে একটু না একটু আশা-প্রত্যাশা মিশে থাকে, ছেলে বড় হয়ে আমাকে দেখবে। যুধিষ্ঠির বলছেন আমি কোন আশা ও ফলের আকাঙ্খা করে, কোন লোভে বা ভয়ে ধর্ম কার্য করি না। আগে আগে যাঁরা মহাপুরুষ ছিলেন তাঁরা এই রকম করেছিলেন বলে আমি করছি।

যুধিষ্ঠিরের মতে কারা ধর্মের ফল পায় না

যুধিষ্ঠির বলছেন তিন ধরণের লোক ধর্মের ফল পায় না – ১) যারা নাস্তিক, ভগবানে যাদের আস্থা নেই তারা কখনই ধর্মের ফল পায় না। গুরুজনরা বলেছে করতে তাই করে দিলাম, এতে আমার এক পয়সার বিশ্বাস নেই। ২) ধর্ম কার্য করে সেই কাজে সংশয় থাকা, কাজ তো করলাম কিন্তু কে জানে বাপু কি হবে জানিনা, এই ধরণের সংশয় যারা করে তারা ধর্ম কার্যের ফল পায় না। যেমন আমি আমার বাবা বা মার শ্রাদ্ধাদি কর্ম করলাম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সংশয় আছে কে জানে পরলোক বলে কিছু আছে কিনা। শুধু ধর্ম কাজ করলেই হবে না, সেই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকতে হবে। ৩) ধর্ম কাজের মাধ্যমে যারা নিজেদের কোন স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায় তারা ধর্মের ফল পায় না। যুধিষ্ঠির খুব জোর দিয়ে বলছেন 'ধর্মের ব্যাপারে যারা সন্দেহ করে তারা কিন্তু আর মানুষ জন্ম পাবেনা, মৃত্যুর পর তির্যকগতি প্রাপ্ত হয়। তাই

দ্রৌপদী তুমি যে কথা গুলো বলছ এতে কিন্তু তুমি ধর্মের প্রতি সন্দেহ করছ, এটা ঠিক করছো না। দ্রৌপদী তুমি তোমার মনে মোহ এনে মুর্খের মত ঈশ্বর, ধর্ম, বিধাতা এগুলোর উপর আক্ষেপ করছ, আশঙ্কা করছ, এটা কিন্তু তুমি ভালো করছো না, এতে তুমি তোমার নিজের জীবনের বিনাশকে ডেকে আনছ। যদি ধর্মের ফল নিষ্ফল হত তাহলে মানুষ মোক্ষ লাভের কোন চেষ্টাই করত না এবং সবাই পশুর মত জীবন যাপন করত'। যুধিষ্ঠির খুব বাস্তব কথা বলছেন, যে সমাজে ধর্ম নেই, ইসলাম হোক, খ্রীশ্চান হোক বা হিন্দু হোক, তারা কিন্তু পশুর মত বর্বর জীবন যাপন করে। স্বামীজীর সময় বা তাঁর কিছু আগে জন স্টুয়ার্ট, স্পেনসরের মত কিছু বড় বড় দার্শনিক ছিলেন, এনারা ভগবানে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু ভালো কাজে বিশ্বাস করতেন। ইদানিং কালে অনেক বুদ্ধিজীবি বলে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা আমি মানবজাতিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু এরা জানেনা মানুষ আর পশুর মধ্যে কি পার্থক্য। মানুষের মধ্যে যা যা গুণ আছে সেই প্রত্যেকটি গুণ পশুর মধ্যেও পাওয়া যাবে কিন্ত মানুষ ঈশ্বর চিন্তন করতে পারে পশু তা পারে না। ঈশ্বর চিন্তন করা ছাড়া মানুষের মধ্যে হেন কিছু নেই যেটা পশুর মধ্যে নেই। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – দেখো ভাই, হাতি এত বড় পশু কিন্তু সে ঈশ্বর চিন্তন করতে পারেনা। মানুষের মধ্য থেকে যদি ঈশ্বর চিন্তনকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মানুষ আর পশুতে কোন তফাৎ থাকবে না। যে মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সেতো পশুর থেকে আর আলাদা কিছু রইল না। আজকের দিনে মানব সমাজ এখনও যে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও যে পশুর পর্যায়ে যাচ্ছে না তার একমাত্র কারণ কিছু কিছু লোক ঈশ্বর চিন্তন করছে বলে। সমাজে যতই চোর বদমাইসে ভরে যাক কিন্তু কিছু কিছু লোক ঈশ্বর চিন্তন করছে বলে ঐটার জোরে সমাজ এখনও দাঁড়িয়ে থাকবে। মানব সমাজ যে এত উন্নত করেছে, মানুষ যে এখনও পশুর মত হয়ে যাচ্ছে না তার কারণ লোকে বিশ্বাস করে যে ধর্মই সত্য। কিছু দিন আগে একটি পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে গত একশ বছরে ধর্মের নামে দশ লক্ষ লোক মারা গেছে আর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ঐ সময়ে এক কোটি লোক মারা গেছে। চীন রাশিয়া আর হিটলারের সময়কার জার্মানে রাজনৈতিক কারণে কত লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে তার হিসেব নেই। মানুষ সব পশু হয়ে গিয়েছিল, ধর্মের নামে গেলে মানুষ পশু হয় না।

ঋষিরা যাঁরা ধর্মের কথা বলে গেছেন এনারা তো কেউ বোকা মুর্খ ছিলেন না, তাঁরা জানতেন কিসে মানবজাতি তথা বিশ্বের মঙ্গল হবে। সেইভাবে তাঁরা এই ধর্মের কথা বলে গেছেন। স্বামীজী তো মুর্খ ছিলেন না। আধুনিক যুগের নাস্তিকরা বলছে ধর্ম হল আফিং, মানে ধর্ম হল ভ্রষ্টাচার, মিথ্যা। তাহলে বলতে হয় সাত হাজার বছর আগে আমাদের যত ঋষি মুনিরা ছিলেন আর পরের দিকে যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁরা এসেছেন এঁরা সবাই মিথ্যাবাদী আর রাজনৈতীক নেতারা সবাই সত্যবাদী। এনারা সাত হাজার বছর ধরে ধর্মের নামে এত বড় একটা ধাপ্পা সারা বিশ্বকে দিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে আমাকে বোকা হতে গেলে এদের কাছেই বোকা হব, হেঁদিপেঁচিদের কাছে কেন বোকা হতে যাব। এর আগে খাণ্ডব বন দহনের সময় শার্ঙ্গক পাখির বাচ্চারা তাদের মাকে বলছিল ইঁদুরের কাছে মরার চেয়ে আগুনে পুড়ে মরা ভালো। আমাকে যদি বোকা হতে হয় তাহলে একটা ছিঁচকে চোরের কাছে বোকা হওয়ার থেকে একজন বড় মেগা ফ্রডের কাছে বোকা হওয়া অনেক ভালো। আর আমাদের ঋষি মুনিরা, আর পরের সব মহাত্মারা এত বড় মেগা ফ্রড যে এনারা নিজেকেও ঠকিয়েছে। নিজেকে ঠকিয়ে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মহম্মদের মহম্মদের শরীর চলে যাবার পর স্ত্রীরা এক পয়সা পেলেন না। ভগবান বুদ্ধ নিজের সাম্রাজ্য, রাজসুখ ছেড়ে ভিখারি হয়ে গেলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা সবাই ভগবান বলি কিন্তু শেষ জীবনে গলায় ক্যান্সার নিয়ে যন্ত্রণায় দেহ ছাড়লেন, তাঁর দেহ চলে যাবার পর তাঁর সন্তানদের খাবার পয়সাও জুটলো না। এনারা ধর্মের নামে যে সবাইকে চিট করছে তা নয়, নিজেকেও চিট করছেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কেশবচন্দ্র সেনরা কি এতই বোকা, একটা অশিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণ, যে নিজের ধুতিও সামলাতে পারতো না সে কিনা এতগুলো লোককে বোকা বানিয়ে দিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এদের সবাইকে বোকা বানিয়ে দিল আর আমাদের নেতাদের বুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ দত্তের থেকে বেশী বলে তাদের বোকা বানাতে পারলো না।

এখানে যুধিষ্ঠির এই কথাই বলছেন, ঋষিরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের তুখোড় বুদ্ধি ছিল, তাঁরাই ধর্মের আচরণ দেখিয়ে গেছেন আর ধর্মের ফল পাওয়া যায় বলেই তাঁরা ঐ আচরণ করে গেছেন। কিন্তু আমরা এতই মূঢ় আর কিছুই চিন্তা ভাবনা করি না বলে আমাদের এই দুর্গতি। যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁরা অধ্যাত্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁরা কেন সব কিছু ছেড়ে এতেই লেগে আছেন। উপনিষদ খুব সুন্দর বলছে – *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি* – মানুষ যেটাকে পাওয়ার জন্য বলে আমি সারা জীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকব, মানুষ যেটাকে পাওয়ার জন্য বলে আমি ভিক্ষা করে গ্রাসাচ্ছদন করব। কিছুতো একটা আছে, তা নাহলে ভগবান বুদ্ধ, যিনি রাজা, তিনি কেন বলছেন আমি ভিক্ষা করে খাবো। কিছু একটা পাওয়ার আশা, আর কিছু একটা পেয়েছেন বলেই না তাঁরা আজ সবার কাছে পূজ্য।

দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির বলছেন 'দেখো ধর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না, সময় লাগে। যেমন কিছু বীজ আজকে রোপণ করলে সাত দিন পরেই তার অঙ্কুর দেখা যায় আবার কিছু বীজের অঙ্কুর হতে সময় লাগে। ধর্মের বীজ বোঝা যায় না কত দিনে ফল দেবে। সেইজন্য যজ্ঞ, দান, তপঃ এগুলো করে যেতে হয়, এর ফল কবে দেবে বোঝা যায় না কিন্তু বোঝা না গেলেও এগুলো করে যেতে হবে। হে দ্রৌপদী, তুমি আজকে ধর্মের ব্যাপারে, ঈশ্বরের ব্যাপারে যে বুদ্ধি রেখেছ এটা কখনই তোমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়'। দ্রৌপদীও সব শুনে কর্মের বিশ্লেষণ করে বলছেন কর্মের মাধ্যমে কি ভাবে সাফল্য আসবে, টাকা-পয়সা, মান-যশ যেভাবেই হোক সাফল্যটা কিভাবে পাওয়া যাবে – *এবং হঠাচ্চ দৈবাচ্চ স্বভাবাৎ কর্মণস্তথা। যানি প্রাপ্নোতি পুরুষস্তৎ ফলং পূর্বকর্মণাম্।*।৩/২৮/২০। প্রথম হচ্ছে অকস্মাৎ, আশা করিনি কিন্তু হঠাৎ কিভাবে সাফল্য এসে গেল, এই সাফল্যের জন্য কোন চেষ্টা করা হয়নি কিন্তু বিনা চেষ্টাতেই একটা সাফল্য এসে গেছে, এই সাফল্য আবার হঠাৎই বেরিয়ে যাবে। দ্বিতীয় সাফল্য দৈব ভাবে আসে, যতটা পাওয়ার কথা তার থেকে একটু বেশী পাওয়া গেছে। তৃতীয় হল, পুরুষার্থ, আমি যেমনটি চেষ্টা করছি তেমনটি সাফল্য পাচ্ছি। চতুর্থ হল স্বাভাবিক, যেমন অফিসে কাজ করছি মাসের শেষে আমার বাঁধা মাইনে আছে, স্বাভাবিক কর্মে স্বাভাবিক ফল দেবে। যখন বিশেষ চেষ্টা করে পেলাম সেটা হল পুরুষার্থ। চেষ্টা করে যা পাওয়ার কথা তার থেকে বেশী পেলাম সেটা হল দৈব। একটা লটারি লেগে গিয়ে আমি এক লাখ টাকা পেয়ে গেলাম এটা হয়ে গেল অকস্মাৎ। এই কথা বলার পর দ্রৌপদী বলছেন এই চার রকমের যা সাফল্য মানুষ পায় এটা পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলে পায়। যদিও এখানে দ্রৌপদী বলছেন, আসলে এটাই মহাভারতের মত। আমি যদি হঠাৎ কিছু পেয়ে যাই সেটা আমি পূর্বজন্মের কর্মের জন্য পাচ্ছি, আমি যদি দৈবে কিছু পেয়ে যাই, যতটা পাওয়ার কথা তার থেকে বেশী পেলাম এটাও পূর্বজন্মের ফলে, যেটা আমি পুরুষার্থের জন্য মানে বিশেষ চেষ্টা করে পাচ্ছি সেটাও পূর্বজন্মের কর্মানুসারে পাচ্ছি আর স্বাভাবিক যেটা সেটাও পূর্বজন্মানুসারেই পাচ্ছি।

এখানে কিন্তু সেই প্রশ্নই আসবে, পূর্বজন্মের পেছনে আরেকটা পূর্বজন্ম ছিল, সেই পূর্বজন্মের পেছনে আরেকটা পূর্বজন্ম ছিল, এইভাবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, এখানেও সেই একই সমস্যা এসে যায়। আসলে এগুলো নানা রকমের দার্শনিক মত, মহাভারতে এই মতগুলোকে কিভাবে দেখানো হয়েছে তাই আলোচনা করা হল। এই মতের সিদ্ধান্ত হল এখন আমাদের ভালো মন্দ যা কিছু হচ্ছে সেটা পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্যই হচ্ছে। কিন্তু দ্রৌপদী এখানে বেঁধে দিচ্ছেন। হিন্দু ধর্মে এইভাবে কোন জিনিষকে বাঁধা হয় না, বলা হয় এখন যেটা তুমি করছ এর ফল তুমি পরে পাবে। দ্রৌপদী বলছেন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কেউ আবার নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে ভাবে আমার হঠাৎ কিছু হয়ে যাবে, কেউ ভাবে আমার দৈব থেকে সব হবে। তবে ফল যেটা পাচ্ছে তাতে নিজের চেষ্টাতো থাকেই কিন্তু তার মধ্যে আরো দুটো ব্যাপার আসে – একটা হল প্রারব্ধ আর দ্বিতীয়টি হল ঈশ্বর কৃপা। এখন হিন্দু ধর্মের কর্মের তত্ত্ব যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এই শ্লোকটাই হল আজকের ঠিক ঠিক কর্ম দর্শন – *ত্রিদ্বারামর্থসিদ্ধিন্তু নানুপশ্যন্তি যে নরাঃ। তথৈবানর্থসিদ্ধিঞ্চ যথা লোকাস্তথৈব তে।*।৩/২৮/৩৮। ইষ্ট বা অনিষ্ট সমস্ত ফলের কারণ হল তিনটি পুরুষার্থ, দৈব ও ঈশ্বর কৃপা। পুরুষার্থ+দৈব+ঈশ্বর কৃপা= ফল। বাড়িতে আপনার ছেলের একটা অসুখ হয়ে গেল, এই রোগটা যে হয়েছে এটা তার দৈবের জন্য হয়েছে, রোগের আরোগ্য হবে কি হবে না সেটাও দৈবের উপরে নির্ভর করছে, পুরুষার্থ হল আমার চেষ্টা, ডাক্তার আনলাম, ওষুধ খাওয়ালাম তাতেও আরোগ্য হতে পারে। তৃতীয় আরেকটা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে দৈব যেটা আছে, আগে থেকে যেটা রয়েছে মানে প্রারব্ধটাকে কাটাতে হবে। কিভাবে কাটাতে হবে? ঈশ্বর কৃপার দ্বারা। কিভাবে ঈশ্বরের কৃপা হবে? যদি ঈশ্বরের নামে প্রচুর পূজো পাঠ করা হয়, ঠাকুরের প্রচুর নাম করা হয় তখন ঐ প্রারব্ধটা কেটে যায় এবং এই ব্যাপারটা প্রমাণিত।

কাশী সেবাশ্রমে বনবিহারী মহারাজ নামে একজন খুব সিনিয়র সন্ন্যাসী ছিলেন। সারাটা জীবন তিনি সেবাশ্রমে রোগীদের ড্রেসিং করে গেছেন। নারী পুরুষের কোন ভেদ তাঁর মধ্যে ছিল না। শেষ জীবনে যখন তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি চলাফেরা করতে পারতেন না। কিন্তু রোজ হুইল চেয়ারে করে তাঁকে ড্রেসিং রুমে নিয়ে যাওয়া হত। রোগীদের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, সেই রোগী পুরুষই হোক আর নারীই হোক, বনবাবা যদি ড্রেসিং করে দেন তাহলে সেই রোগ সারবেই সারবে। একবার একজন পেটের যন্ত্রণা নিয়ে সেবাশ্রমে ভর্তি হয়েছে। ডাক্তাররা অপারেশন করে দেখেন তার পাকস্থলীতে সম্পূর্ণ পচন ধরে গেছে। ডাক্তাররা বনবাবাকে বলে দিলেন এই রোগী সাত দিনের বেশী বাঁচবে না। বনবাবাও রোগীকে দেখলেন। যাই হোক অপারেশন করে পাকস্থলীতে একটা গ্লাশ টিউব লাগিয়ে দেওয়া

হয়েছে। বনবাবা রোগীর কাছে গিয়ে বলছেন – দেখো বাবা, তুমি আর বাঁচবে না, কিন্তু আমি দেখি একটা শেষ চেষ্টা করে। তুমি এখন সারা দিন 'ওঁ নমঃ শিবায়' খালি জপ করতে থাক, মনে মনে না সারাদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাক। রোগী এখন সারাদিন 'ওঁ নমঃ শিবায়' করে যাচ্ছে আর বনবাবা রোজ সকালে ওর মুখে একটু করে দুধ ঢেলে দিতেন। সাত দিন পর দেখা গেল রোগীটা মরেনি। সেও ঘুম থেকে উঠলেই সারাটা দিন 'ওঁ নমঃ শিবায়' করে যাচ্ছে। তারপর বনবাবা আস্তে আস্তে তার মুখে দুধ ঢালাটা একটু একটু বাড়াতে থাকলেন। তারপর তরকারীর জুস দেওয়া হতে থাকল। এই করে ছয় মাস কেটে গেল। বনবাবা তখন ডাক্তারকে দেখে বললেন – ডাক্তারবাবু একে এক্সরে করে দেখুন তো এর অবস্থা কেমন। সব পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, এই রোগীতো এখন বেশ ভালো আছে, একে এখন রিলিজ করে দেওয়া যায়। তখন বনবাবা ডাক্তারকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এই রোগীকে আপনি বলেছিলেন সাত দিনের বেশী বাঁচবে না, এর পেট একেবারে পচে গেছে। ডাক্তারবাবু শুনে অবাক হয়ে গেছেন। তারপর তিনি আরও ভালো করে পরীক্ষা করে দেখছেন পেটে যেখানে গ্লাশ টিউব লাগানো হয়েছিল সেখানে নতুন টিস্যুস তৈরী হয়ে স্টোমাকের উপর নতুন একটা লাইনিং হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু তখন হাতজোড় করে বনবাবাকে বলছেন, এটা আপনিই একমাত্র সম্ভব করতে পারেন, আমাদের ডাক্তারি বিদ্যায় এই ধরণের রোগ ভালো হওয়া অসম্ভব। এই রোগীর রোগের উপশম পুরোপুরি দৈব থেকে হয়েছে। ডাক্তাররা হাত গুটিয়ে নিয়েছেন, বনবাবা পুরোপুরি ছেড়ে দিলেন 'ওঁ নমঃ শিবায়'এর উপর। যখন খুব ঠাকুরের নাম নেওয়া হয় তখন ঈশ্বরের কৃপা বাকি দুটোকে পুরুষার্থ ও দৈবকে দাবিয়ে দেয়।

দ্রৌপদীর মূল কথা হল আপনাকে পুরুষার্থের কথা ভেবে যুদ্ধ করতে হবে, এই জঙ্গলে থাকার কথা ছেড়ে যুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ুন, দুর্যোধনদের আক্রমণ করে আপনার প্রাপ্য রাজ্যকে জয় করে নিজের অধিকার স্থাপন করুন।

সত্য ও অহিংসা ধর্মের দ্বন্দ্ব

দ্রৌপদী একজন রাজকুমারী, তিনি শারীরিক ও মানসিক দুই ভাবেই খুব কষ্ট অনুভব করছে। যুধিষ্ঠির জুয়া খেলায় হেরে যাওয়াটা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাকীদের যুক্তি হল, আপনি হেরেছেন ঠিকই কিন্তু আপনাকে ছল করে হারানো হয়েছে। তাই এই অন্যায় ভাবে হারানোর জন্য আপনাকে লড়াই করতে হবে। এদিকে ভীম, যিনি নিজে বিরাট শক্তিমান পুরুষ, তিনিও দ্রৌপদীর কথাতে সায় দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করতে শুরু করেছেন। এখানে এঁদের মধ্যে পুরুষার্থ আর দৈবকে নিয়েই যুক্তি তর্ক চলছে। যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য হচ্ছে যা কিছু আমাদের উপর হয়েছে এটা দৈব, এই দৈবকে যুদ্ধ দিয়ে অতিক্রম করা যায় না। কিন্তু দ্রৌপদী আর ভীমের বক্তব্য হল পুরুষার্থ দিয়ে আপনি লড়াই করলে এই দৈবকে অতিক্রম করা যাবে, আর সেই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। জীবনের সব ধরণের ধর্মের উপর মহাভারত চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেবে কিন্তু সমাধান কোথাও দেবে না। সমাধানটা অন্য ভাবে দেওয়া হয়, একটা মানুষের জীবনে দুটো জিনিষ একই সাথে এসেছিল, দুটোই পরস্পর বিরোধী, একটা জিনিষ একদিকে নিয়ে যাচ্ছে আরেকটা জিনিষ তার বিপরীত দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এখন সে কোনটা করবে। যেমন সত্য আর অহিংসা, যে চাইছে সত্যকে আমি পালন করব তার পক্ষে ঠিক ঠিক অহিংসা পালন করা খুব কঠিন হয়ে যায়। একজন সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আছেন। ডাকাত এক পথিককে তাড়া করেছে, সেই পথিক পালিয়ে গিয়ে সেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কাছে আশ্রয় নিয়েছে। ডাকাত এসে তাকে জিজ্ঞেস করছে এখানে কোন লোক লুকিয়েছে কিনা। এখন যদি সত্য রক্ষা করতে যায় তাহলে সে একটা হিংসার কাজ করে বসবে। ডাকাতরা সেই পথিককে হত্যা করে দেবে। এখন কোনটাকে সে রক্ষা করবে সত্যকে না অহিংসাকে। এগুলো নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়ে আসছে।

কাঁচা আমি ও পাকা আমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জহুদিদের একটা গ্রুপ নাৎসি ক্যাম্প থেকে লুকিয়ে পালাচ্ছিল। সেই সময় ওদের একটা নয় দশ মাসের বাচ্চা কাঁদতে শুরু করেছে। বাচ্চার কান্নার আওয়াজ জার্মান সৈন্যদের কানে গেলে পুরো এই গ্রুপটাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। বাচ্চাকে কিছুতেই চুপ করান যাচ্ছে না। একটাই পথ বাচ্চাটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হল, অনেকের জীবন রক্ষার্থে একজনের জীবনকে বলিদান দিতে হল। গ্রুপটা তারপর বেঁচে গিয়েছিল। অনেক বছর পর মনস্তাত্ত্বিকরা এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখে ঐ গ্রুপে যে কজন ছিল সবারই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আমার প্রাণের জন্য একটা ছোট্ট দুধের শিশুকে বলি দিতে হয়েছিল। এর বিপরীতও হয়েছিল, যখন তারা এইভাবে একজনকে মেরে নিজেদের জীবন রক্ষা করতে অস্বীকার করেছিল। মহাভারত কখনই বলে

দেবে না যে তুমি এটাই কর। যখন উপনিষদে যাই তখন সেখানে দেখতে পাই উপনিষদ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে তুমি এটি করবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতেও তাই, এটা সাদা এটা কালো, এটা করবে এটা করবে না। কিন্তু জীবন সব সময় এইভাবে শুধু সাদা কালো দিয়ে চলে না। যারা শুধুই মূল্যবোধকে নিয়ে চলেন, সেই মূল্যবোধ ধর্মেরই হোক বা সামাজিক মূল্যবোধই হোক, একটা জায়গায় গিয়ে ব্যাপারটা আর সেভাবে থাকে না, কিছু না কিছু সমস্যা এসে যায়। সেইজন্য মহাভারত কখনই বলে দিচ্ছে না যে তুমি এটা কর আর এটা করবে না। মহাভারত দেখিয়ে দিচ্ছে আগের আগের মহান ব্যক্তিত্বের সামনে এই সমস্যা এসেছিল, তাঁরা তখন একটা পথ নিয়ে এগিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু মূল ব্যাপার যেটা এর মধ্যে রয়েছে তা হল, যাঁরাই সমস্যাটাকে নিঃস্বার্থ ভাবে নিয়েছেন তাঁরাই মহৎ হয়ে গেছেন। যেমন যুধিষ্ঠির এখানে যে ভূমিকাটা নিয়েছেন তিনি সেটা নিঃস্বার্থ ভাবেই নিয়েছেন। যুধিষ্ঠির বলছেন আমার কাছে রাজ্য পাওয়াটাই গুরুত্ব নয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দ্রৌপদী বার বার বলছেন আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধের ইচ্ছা যখনই এসে যাবে তখনই সেখানে স্বার্থও এসে যাবে, ঠাকুরের ভাষায় কাঁচা আমি আর পাকা আমির কথা। প্রতিশোধে কাঁচা আমির খেলা চলে। আমার গদি চাই, আমার টাকা চাই, আমার সুখ সুবিধা চাই আর আমাকে বদলা নিতে হবে, এই ভাব নিয়ে যখনই কোন কাজ করা হয় তখনই সেখানে কাঁচা আমির খেলা চলে। কাঁচা আমির মুখোশের আড়ালে তখন ধর্মের দোহাই দিতে থাকে, তখনই দৈব, পুরুষার্থের কথা এসে যায়। শাস্ত্র সব সময় বলছে সব রকম ধর্ম কাজ তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে করে যাও। দ্রৌপদী আরেকটি যুক্তি আনছেন, আপনাকে ছল করে হারানো হয়েছে, এটা অধর্ম তাই আপনিও অধর্ম করুন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ধর্মের ব্যাপারে একেবারে দৃঢ় হয়ে আছেন, ধর্ম থেকে তিনি কোন ভাবেই বিচ্যুত হবেন না।

মহাভারত, বাল্মীকি রামায়ণের মত শাস্ত্র প্রথমে ধর্মটা কি সেটা ব্যাখ্যা করে দেবে। কিন্তু যখন ধর্ম সঙ্কট আসবে তখন বলবে তুমি কোন ধর্মটাকে আশ্রয় করেছে সেটাই তোমার কাছে মূল্যবান এর বাইরে আর কোন কিছুর মূল্য নেই। যেমন শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, বাবা আদেশ করেছেন আমি সেটাকেই পালন করব। এরপর শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যে মাতৃধর্ম ছিল, মায়ের প্রতি যে ভক্তি, তার আর কোন মূল্য নেই। শ্রীরামচন্দ্র শুধু দশরথেরই সন্তান নয়, তিনি কৌশল্যারাও সন্তান। বাবা বলছেন চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে আর মা বলছেন তুমি এখানেই থেকে মাতৃধর্ম পালন কর, কারণ তুমি আমারও পুত্র। কিন্তু প্রথমে বাবাকে শ্রীরামচন্দ্র বলে দিয়েছেন আমি বনবাসে যাব এরপর মা যেটা বলছেন তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। তিনি আবার সীতারও স্বামী, সীতার চোখে জল, তাতেও শ্রীরামচন্দ্রের কিছু আসে যায় না। তাই বলে কি শ্রীরামচন্দ্র কোন ভুল করেছিলেন? কোন ভুলই তিনি করেননি, কারণ আমাদের জীবনে সবাইকে এটাই করতে হচ্ছে। আমাদের জীবনে চলার পথে অনেক রকম দ্বন্দ্ব আসে, সেই দ্বন্দ্ব ভাবের হতে পারে আদর্শের হতে পারে আবার ধর্মেরও হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে একটাকে ধরে নিয়ে বাকি গুলো কে ফেলে দিতে হয়। এই দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে আসে, আমাকে একজন একটা কাজ করতে বলেছে, আমি সেই কাজ করতে গিয়ে দেখছি বাকি তিন জন আমাকে সেই কাজ করতে নিষেধ করছেন। এরাও ধর্ম পথেই আমাকে নিষেধ করছেন। আমি এখন কোনটা করব? তখন আমি দেখব বিভিন্ন মহাপুরুষরা বিভিন্ন ভাবে করেছেন, কিন্তু যেভাবেই করে থাকুন কিন্তু যিনি নিঃস্বার্থ ভাব নিয়ে করেছেন পরে তাঁকেই সম্মান দেওয়া হয়েছে। তখন যদি শ্রীরামচন্দ্র বলতেন আমাকে মা বনে যেতে নিষেধ করেছেন, আমি কিন্তু মায়ের কথাকে অমান্য করতে পারব না। তাহলে কি শ্রীরামচন্দ্রের ভুল হত? কখনই ভুল হত না, শুধু কাহিনীটা অন্য রকম হয়ে যেত। ধর্মে পথে চলতে গিয়ে এটাই এক মহা সমস্যা। যখনই আমি একটা পথকে ঠিক করে নেব তখনই নানা রকমের সমস্যা ও সজ্ঘাত আসতে শুরু করবে।

ভীমের মতে ক্ষত্রিয় ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচনা

এখন ভীম দ্রৌপদীর কথায় খুব উৎসাহিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – *ভবান্ ধর্মো ধর্ম ইতি সততং ব্রতকর্ষিতঃ। কচ্চিদ্রাজন্! ন নির্ব্বেদাদাপন্নঃ ক্লীবজীবিকাম্।*।৩/২৯/১৩। হে রাজন্! আপনি যে তখন থেকে ধর্ম ধর্ম করে যাচ্ছেন আর অন্য দিকে কষ্ট ভোগ করছেন, এমন তো নয় যে এই কষ্টের ফলে আপনাকে হতাশা এসে গ্রাস করে নিয়েছে আর *ক্লীবজীবিকাম্*, মানে নপুংসকদের মত জীবন-যাপন করে যাচ্ছেন? মানুষের মনে যখন বিভিন্ন কারণে প্রচণ্ড হতাশা এসে যায় তখন তার জীবনটা ক্লীবের মত হয়ে যায়। আপনার এই ক্লীবতাকে লুকোচ্ছেন কোথায়? ধর্মের পেছনে নিয়ে। আপনি মুখে বলছেন আমি ধর্ম পালন করছি কিন্তু আসলে আপনি হয়ে গেছেন একটা নপুংসক। আমরা আমাদের শত্রুদের অপরাধ গুলো ক্ষমাই করে যাচ্ছি, সেইজন্য দুর্যোধনরা আমাদের দুর্বল মনে করছে। শুধু এই কারণে আমার মনটা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। যদি আমি যুদ্ধে মারা যাই তাতে আমার একটুও দুঃখ হবে না। ক্ষত্রিয়দের ধর্মই

হচ্ছে যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা। ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধে মারাও যায় সেটা তার কাছে অত্যন্ত গৌরবের কথা। ক্ষত্রিয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা একটা লজ্জার ব্যাপার। আধুনিক যুদ্ধে অবশ্য আত্মসমর্পণটাও একটা যুদ্ধের কৌশল হয়ে গেছে, দরকার পড়লে পরিস্থিতি বুঝে এখন আত্মসমর্পণ করা হয়। কিন্তু ভারতের পরম্পরাতে ভারতীয় যোদ্ধারা শত্রু পক্ষের কাছে কখনই আত্মসমর্পণ করত না, যুদ্ধ ক্ষেত্রে মরে যাওয়টা অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। এই কথাই ভীম বলছেন, যুদ্ধে যদি মারা যাই তাহলে দুঃখের কিছু নেই। কিন্তু এরা যা কাণ্ড করে চলেছে, প্রতি পদে পদে আমরা অপমানিত হচ্ছি এটাই আমার দুঃখের কারণ। ভীম বলছেন, শত্রুরা যেভাবে আমাদের রাজ্য ছল করে কেড়ে নিয়েছে এরপর আমরা যদি যুদ্ধও করি এতে আমাদের কেউ নিন্দা করবে না।

ভীম বলছেন 'মরা মানুষ যেমন সুখ আর দুঃখের পারে চলে যায় ঠিক তেমনি মানুষ শুধু ধর্ম ধর্ম করে দুর্বল হয়ে যায়। যখন সে দুর্বল হয়ে যায় তখন প্রথমে অর্থ, কাম আর পরে ধর্ম এই তিনটেই তাকে ত্যাগ করে চলে যায়'। এটা হল ভীমের মত, মহাভারতের কিন্তু এই মত নয়। এখানে মনে রাখতে হবে শাস্ত্রে যখন কিছু বলা হয় তখন সব সময় তা শাস্ত্রের নিজস্ব মত নাও হতে পারে, যেমন এটা ভীমের মত। এখানে শুধু যে তর্ক চলছে তা নয়, এক এক জন একেকটি নিজের মত দিচ্ছেন আর সবারই মত খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হবে, তর্কেরও জোর আছে। ঠাকুর যেমন বলছেন, অবিদ্যা স্ত্রী স্বামীকে বলে – কি সকাল থেকে খালি চোখ বন্ধ করে ঠাকুর ঠাকুর করে যাচ্ছে, রাখো তোমার ঠাকুর। ভীমও ঠিক সেই রকম বলছেন, যে ধর্ম ধর্ম বেশী করে সে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বামীজী ভারতবাসীকে গালাগাল দিয়ে বলছেন এখানে সব ধর্ম ধর্ম করে তামসিক হয়ে গেছে। ভীম বলছেন, দুর্বল হয়ে গেলে শুধু কামই ত্যাগ করে যায় না, তাকে অর্থও ত্যাগ করে দেয় আর পরে ধর্মও তাকে ত্যাগ করে দেয়।

ভীম আরও বলছেন – *যস্য ধর্মো হি ধর্মার্থং ক্লেশভাঙ্ ন স পণ্ডিতঃ। ন স ধর্মস্য বেদার্থং সূর্য্যস্যান্ধঃ প্রভামিব চ।*।৩/২৯/২৩। যে ধর্মের অনুশীলন শুধু ধর্মের জন্যই করে, তার ধর্মটা বৃথা। যেমন অন্ধ যতই সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকুক তাতে তার কোন লাভ হয় না। তার মানে ধর্ম তুমি কেন অনুশীলন করবে? যাতে তোমার অর্থ আর কাম হয়, অর্থ আর কাম যদি নাই হল তাহলে ধর্মের অনুশীলন করে কি লাভ! আপনি রাজা, আপনি বলছেন আমি ধর্ম করছি কিন্তু আপনার কামও গেছে অর্থও গেছে এখন ধর্ম করে আপনার লাভটা কি। যে লোক অর্থ উপার্জন করে শুধু সঞ্চয় করে যাচ্ছে সেই অর্থ দিয়ে ধর্ম আর কামের চরিতার্থ করছে না, এই ধরণের লোক অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র। ব্রহ্মহত্যা করলে যে পাপ লাগে এই ধরণের লোকের একই পাপ লাগে। অর্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্ম আর কামের পরিপোষণ করা। ঠিক তেমনি যে শুধু কামের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে, ধর্ম পালন করছে না, অর্থ আয় করছে না, এদেরকেও সব কিছু ত্যাগ করে চলে যায়। বক্তব্য হচ্ছে, যদি কেউ একটা জিনিষকেই নিয়ে শুধু চলে বাকি দুটো তাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। মোক্ষমার্গের যারা পথিক তাদের ধর্ম, অর্থ আর কাম নিজে থেকেই খসে পড়ে। সেইজন্য প্রশ্ন করা হয়, সংসারে থাকলে কি ঈশ্বর দর্শন হয় না? কি করে হবে। সংসার মানেই হল ধর্ম, অর্থ আর কাম আর মোক্ষ হচ্ছে এই তিনটেরই বিরোধী। সংসারে আমি ত্যাগের অনুশীলন করতে পারি, জপ-ধ্যান করতে পারি আর ধর্মের অনুশীলন করতে পারি। কিন্তু ধর্ম আর ঈশ্বর দর্শন দুটো আলাদা। ধর্ম মানে পাপ পূণ্যের ব্যাপারে সজাগ, যখন আমি তীর্থে যাচ্ছি, যখন আমি পূজো করছি, যখন যজ্ঞ-যাগ করছি তখন এগুলো হয়ে গেল ধর্ম। ঈশ্বর দর্শনের চেষ্টাটা ধর্মের মধ্যে পড়ে না, এটা মোক্ষের মধ্যে পড়ে। ভীম তাই বলছেন, ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেকে আপনার একই সাথে অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু তা না করে শুধু ধর্ম ধর্ম করে আপনি সবারই সর্বনাশ করছেন। এরপর ভীম এখানে একটা খুব প্রাচীন শ্লোক উল্লেখ করে বলছেন, আমাদের রাজ্যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা এবং মেয়েরাও এই শ্লোকটা জানে – *শ্বদৃতৌ ক্ষীরমাসক্তং ব্রহ্ম বা বৃষলে যথা। সত্যং স্তেন বলং নার্য্যাং রাজ্যং দুর্যোধনে তথা।*।৩/২৯/৮১। কুকুরের চামড়াতে তৈরী কোন পাত্রতে দুধ রাখলে সেই দুধ অশুদ্ধ হয়ে যায়, শূদ্রের মধ্যে বেদ, চোরের মধ্যে সত্য আর নারীর মধ্যে বল এই চারটেই বিপরীত, কোনটাই ন্যায় সম্মত নয়, ঠিক তেমনি দুর্যোধনের সাম্রাজ্যও ন্যায় সঙ্গত নয়। সেইজন্য আমাদের উচিৎ এখনই দুর্যোধনকে যুদ্ধে বধ করে আমাদের ন্যায় সঙ্গত রাজ্যকে উদ্ধার করা।

যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে অমরত্বের থেকে ধর্ম শ্রেষ্ঠ

ভীম আরও অনেক কথা বলেছেন কিন্তু এখানে আমরা খুব সামান্য কয়েকটি কথাই উল্লেখ করেছি। যুধিষ্ঠির ভীমের কথা শুনে বলছেন – ভাই, তুমি যে সব কটূ কথা বলেছ এই কথাগুলি আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু

আমি এর কোন প্রতিবাদ করছি না, কারণ আজ তোমাদের যে দুরবস্থা সেটা আমার জন্যই হয়েছে। তাই বলে তুমি যে সব কথা ঠিক বলছ তাই নয়, আমি একটা অন্যায় করেছি তার জন্য তোমরা বিপদে পড়ে গেছ এখন তোমরা যদি উল্টোপাল্টা কথা বল তাহলে আমি আর কি বলতে পারি, বাধ্য হয়ে আমাকে এখন সব শুনে যেতে হবে। যুধিষ্ঠির এটাই বলছেন। যুধিষ্ঠিরও অনেক কথা বলার পর শেষে বলছেন – *মম প্রতিজ্ঞাঞ্চ নিবোধ সত্যাং বৃণে ধর্মমমৃতাজ্জীবিতাচ্চ। রাজ্যঞ্চ পুত্রাশ্চ যশো ধনঞ্চ সর্বং ন সত্যস্য কলামুপৈতি।* ।১/৩০/২২। ভীম! তুমি যত যাই বল আমার কাছে জীবন আর অমরত্বের থেকে ধর্ম শ্রেষ্ঠ কারণ আমার প্রতিজ্ঞাটাও সত্য বলে তুমি ধারণা কর। আর রাজ্য, পুত্র, যশ ও ধন এগুলো সত্য ধর্মের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। তার মানে যুধিষ্ঠির বলতে চাইছেন, যদি আমাকে বলা হয় তুমি যদি তোমার ধর্মকে ত্যাগ না কর তাহলে তোমার মৃত্যু হবে, তাহলে আমি মৃত্যুকেই বরণ করে নেব। আমাকে যদি বলা হয় তুমি ধর্ম ত্যাগ কর তাহলে তোমাকে অমরত্ব দেওয়া হবে, তাও আমি আমার সত্য ধর্মকে ছাড়ব না। আসলে ধর্ম আর সত্য দুটো পরস্পর জড়িয়ে থাকে। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছে *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*, কারণ ধর্মের সরাসরি সম্পর্ক সত্যের সাথে। জীবনে যা কিছু প্রিয় বস্তু আছে, রাজ্য, সন্তান, নাম যশ, সম্পত্তি কোনটাই সত্য ধর্মের কাছে গিয়ে এক শতাংশও দাঁড়ায় না। যদিও আজকে আমি দ্যুতক্রীড়ায় অংশ নিয়েছিলাম বলে তোমরা আজ এই কষ্টে পড়েছ, আমি এগুলো সবই স্বীকার করছি কিন্তু তাই বলে তুমি যে বলছ আপনি আপনার ধর্মকে ছেড়ে দুর্যোধনকে আক্রমণ করে সব অধিকার করে নিতে, এটা কিছুতেই আমি করতে পারব না, কারণ আমিতো মেনে নিয়েছি যে আমি বারো বছরের জন্য বনবাসে আর এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে যাব। কোন কিছুতেই আমি আমার এই প্রতিজ্ঞার সাথ আপোশ করতে পারব না। যুধিষ্ঠিরের কাছে এটাই সত্য ধর্ম, তুমি জুয়া খেলেছ, সেখানে ছল করেই হোক বা যে করেই হোক তুমি হেরেছ আর সেটা সবার সামনেই হারা হয়েছে। এবার তুমি এই কটি বছরের জন্য জঙ্গলে থাক। দ্রৌপদী ও ভীম বলছেন আমাদের শক্তি আছে আমরা দুর্যোধনকে আক্রমণ করে সব অধিকার করে নেব। কিন্তু যুধিষ্ঠির বলছেন, আমি তা করতে পারব না, আমি আমার সত্য ধর্মকে কখনই ছাড়তে পারব না।

ভীমের যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের সমালোচনা

ভীম কিন্তু তবুও ছাড়ছে না, আসলে ভেতরে তেজ রয়েছে কিনা। ভীম বলছেন 'দেখুন মানুষের মৃত্যুর কোন ঠিক নেই, তাই মৃত্যুর আগেই রাজ্য ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যার ক্ষমতার প্রভাব আর শক্তি ভেতরে সুপ্ত রয়েছে, ক্ষমতা আর শক্তিকে প্রকাশ করতে পারছে না, তখন এই ক্ষমতা আর শক্তির বিদ্যাটা ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে'। তার মানে ভীম বলতে চাইছেন, আমার মধ্যে একটা বিরাট গুণ আছে, কিন্তু বাইরের কেউ সেই গুণের কথা জানে না আর আমিও কারুর কাছে সেই গুণকে প্রকাশ করছি না তখন সেই গুণটা কোন কাজের নয়, গুণটাই তার কাছে ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। নিজেই আমি ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাব, আমার ভেতরে এত গুণ এত ক্ষমতা কিন্তু কোন কাজে লাগতে পারছি না। একবার এক খুব বরিষ্ঠ মহারাজকে একজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করছিলেন, আমাদের মহারাজদের অনেকে ভালো গান করতে পারেন, সন্ন্যাসীদের কি গান করা উচিৎ হবে? তিনি তখন বলছেন – অবশ্যই গান করবে, ভগবান একটা বিদ্যা তাকে দিয়েছেন সেই বিদ্যাকে কাজে লাগাতে হবে। আমার ভেতরে সঙ্গীত বিদ্যা আছে, এখন সন্ন্যাসী হওয়ার পর ভাবছি আমি এত ভালো গান গাইতে পারতাম এখন কিছুই করতে পারছি না, এই ধরণের চিন্তা এসে গেলে আমার ভেতরে একটা হতাশার ভাব আসবে। সেইজন্য যে কোন লোকের ভেতরে যে বিদ্যাটা প্রবল সেটাকে কখনই লুকিয়ে রাখতে নেই।

ভীম বলছেন – *শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্! মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ। অনুবাকহতা বুদ্ধির্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী।* ।৩/৩১/১৯। হে রাজন্! ঋষিদের দুই ধরণের শিষ্য হয়, এক ধরণের শিষ্যরা বেদের শব্দগুলিকে মুখস্ত করে যায় আর সেগুলোকে আবৃত্তি করতে থাকে, আরেক ধরণের শিষ্যরা বেদের শব্দের অর্থগুলিকে বুঝে নিয়ে কাজে লাগায়। আপনার বিদ্যাটা হয়ে গেছে এই মুখস্ত করা বিদ্যার মত। সেই কারণে আপনার বিনাশ অবশ্যম্ভাবি। একবার এক সাধুবাবা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখেন এক পাল টিয়া পাখি শিকারীর জালে আটকা পড়ে গেছে। পাখিদের ঐ অবস্থা দেখে সাধুবাবার মনে খুব করুণা উদয় হয়েছে। শিকারীরা এই ভাবে প্রত্যেক সময় পাখি গুলিকে জালের মধ্যে ফাঁসিয়ে নিয়ে চলে যায়। সাধুবাবা গিয়ে টিয়া পাখিদের বাঁচবার একটা রাস্তা শিখিয়ে দিলেন 'দেখো শিকারীরা আসবে, ফাঁদ পাতবে, খাবারের দানা দেওয়া হবে। তোমরা ঐ দানা খেতে গিয়ে ফেঁসে যেও না'। টিয়া পাখিরা সব শুনে মুখস্ত করে নিয়েছে। এরপর যখন শিকারীরা আসছে দেখে টিয়া পাখি গুলো বলছে 'শিকারী আসবে'। শিকারী শুনেই ভাবছে টিয়া পাখিগুলো কি

করে জেনে গেল আমি আসছি! তারপর পাখিরা বলছে ‘ফাঁদ পাতবে’। শুনেই শিকারীর বুক ধড়মড় করে উঠেছে। পাখিগুলি সব কি করে বুঝে যাচ্ছে! তারপর পাখি বলছে ‘এবার দানা দেবে ওর মধ্যে কিন্তু ফেঁসো না’। বলেই সব টিয়া পাখিগুলো ঝাঁপ মেরে ঐ দানাগুলো খেতে নেমে পড়েছে। টিয়া পাখিদের সাধুবাবা মুখস্ত করিয়ে দিয়ে গেছে। পাখিরাও খুব সুন্দর মুখস্ত করে নিয়েছে মুখে বলছে এটি করো না, আর করার সময় ঐটাই করছে। তারপর সাধুবাবা যখন আবার যাচ্ছে তখন দেখে এক পাল টিয়া পাখি জালের মধ্যে ফেঁসে রয়েছে আর ঐ অবস্থাতেই মুখস্ত বলে যাচ্ছে – শিকারী আসবে, জাল পাতবে, দানা ছড়াবে, ওর মধ্যে ফেঁসো না। ভীম বলছেন আপনার এই দুরবস্থা হয়েছে। আপনি যত সব বিদ্যা শিখে নিয়েছেন কিন্তু এর যে কি তত্ত্ব কি অর্থ এর কোনটাই আপনি বোঝেন না, আর তার ফলে আপনি নিজেও বিনাশের দিকে যাচ্ছেন সাথে আমাদেরও বিনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যাসদেবের যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দান

ইতিমধ্যে ব্যাসদেব পাণ্ডবদের মাঝখানে এসেছেন। হে যুধিষ্ঠির তুমিও এক অর্থে আমারই সন্তান। তোমার মনের সন্তাপ আমি সবই জানি। আমি তোমাকে একটা বিদ্যা শিখিয়ে দেব। এই বিদ্যার নাম প্রতিস্মৃতি। এই বিদ্যা যে লাভ করবে সে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারবে। আগেকার দিনের দার্শনিকরা একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, যে তত্ত্বে বলা হয় প্রত্যেক বস্তুর দুটো রূপ হয় একটা তার অন্তঃরূপ আরেকটি তার বহিঃরূপ, তার ভেতরে একটা সত্তা আছে আর তার বাইরেও একটা সত্তা আছে। যেমন একটা রসগোল্লা এর অন্তঃ সত্তা হল এর মিষ্টত্ব। একটা বাচ্চা ছেলে রসগোল্লা দেখলেই আনন্দে লাফাবে কিন্তু একজন ডায়বেটিসের রোগীর কাছে সেই রসগোল্লা বিষতুল্য অথচ বাচ্চার কাছে অমৃত। রসগোল্লার নিজের সত্তা হল মিষ্টত্ব। রসগোল্লা নিজে কল্পনাই করতে পারবে না যে কেউ তাকে বিষ বলবে আবার কেউ তাকে অমৃত বলবে। প্রতিস্মৃতি বিদ্যায় বস্তুটি ঠিক ঠিক যেমনটি তেমনটি জানা যাবে। প্রতিস্মৃতি বিদ্যা যদি আমি জেনে যেতে পারি তাহলে এই জগতটা যেমন আমি ঠিক তেমনটিই জানব। কিন্তু এখন আমি জগতকে কিভাবে দেখছি? আমার বন্ধু আছে তাকে আমি খুব ভালোবাসি, কিন্তু আমার বন্ধুর তো কোন সত্তা নেই, সেতো চিজ্জড়্গ্রন্থি। জড় পদার্থ দিয়ে তার শরীর। খাওয়া-দাওয়া করছে বলে এই শরীর দাঁড়িয়ে আছে, খাওয়া-দাওয়া না করলে শরীর রোগা হয়ে যাবে। আর তার মধ্যে চৈতন্য সত্তা আছে এই চৈতন্য সত্তা আর জড় মিলে আমার বন্ধু। এই চৈতন্য সত্তাটাই আসল বস্তু। প্রতিস্মৃতি বিদ্যা জেনে গেলে আমি বন্ধুকে দেখব না, তখন সেই চৈতন্য সত্তাকেই দেখব। সত্তাকে দেখা মানেই হল ঈশ্বরকে দেখা। তখন এ খারাপ লোক, এ ভালো লোক, একে দেখতে সুন্দর এই দেখাটা বন্ধ হয়ে যাবে। যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব বলছেন, তুমি এই প্রতিস্মৃতি বিদ্যাকে গ্রহণ করলে তোমার বিশেষ লাভ হবে। যুধিষ্ঠির খুব শ্রদ্ধা সহকারে সেই বিদ্যাকে গ্রহণ করলেন। তখন তিনি জগৎ যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি স্পষ্ট রূপে দেখতে পেলেন। জগতের প্রকৃত স্বরূপকে দেখে নিলে মনের যে শোক, দুঃখ, তাপ এগুলো সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

দিব্যাস্ত্র জন্য অর্জুনের দেবলোকে গমন ও অর্জুনকে ইন্দ্রের পরীক্ষা

এরপর ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি দেবতাদের খুশি করার চেষ্টা কর আর দেবতাদের খুশি করতে পারলে তোমার বিশেষ মঙ্গল হবে। অর্জুনকে তিনি পরামর্শ দিলেন তুমি এখান থেকে আলাদা ভাবে দেবতাদের বাসস্থানের দিকে এগিয়ে যাও, সেখানে দেবতাদের খুশি করে দিব্য অস্ত্র সকল সংগ্রহ করে নিয়ে এস। এখন যুধিষ্ঠিরের মনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, মন পরিষ্কার হতেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে দুর্যোধনদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, আর দুর্যোধনদের যদি পরাস্ত করতে হয় তাহলে দেবতাদের থেকে দিব্য অস্ত্র আনতে হবে। তাই এখন অর্জুনকে দিব্য অস্ত্র আনার দায়ীত্ব দিয়ে পাঠান হল। ব্যাসদেব এখানে বলছেন – আসলে অর্জুনই হল নারায়ণের সহচর এবং নারায়ণেরই সনাতন অংশ নর ঋষি। অর্জুন তাঁর নিজের তপস্যা ও বিক্রমের প্রভাবে দেবতাদের সাক্ষাৎকার করতে সমর্থ। তাই অর্জুনকেই এই দায়ীত্ব দেওয়া হল।

অর্জুন এইবার অগ্রসর হয়েছে। প্রথমের দিকে দেবতারা অর্জুনকে ফাঁদে ফেলার জন্য অনেক রকম পরীক্ষা নিতে শুরু করেছেন। অর্জুন স্বর্গের দিকে অগ্রসর হয়ে কিছু দূর আসার পর ইন্দ্র এসে অর্জুনকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন ‘অর্জুন, তুমি তো স্বর্গে পৌঁছেই গেলে, জীবনের উদ্দেশ্য হল স্বর্গ পাওয়া, সেই উদ্দেশ্য তো তোমার পূর্ণ হয়ে গেল, এখন এই দিব্যাস্ত্র পাওয়ার আশা ছেড়ে দাও’। অর্জুন কিন্তু এখনও স্বর্গে পৌঁছায়নি তার আগেই ইন্দ্র এসে অর্জুনকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন। হে অর্জুন! তুমি তো পরম গতি লাভ করে ফেলেছ এখন তুমি আমার কাছে অভীষ্ট স্বর্গ কামনা কর। তখন অর্জুন ইন্দ্রকে বলছেন – *ন লোকান্ ন পুনঃ কামান্ ন দেবত্বং কুতঃ সুখম্। ন চ সর্বামরৈশ্বর্য্যং কাময়ে ত্রিদশাধিপ।।*

ভ্রাতৃংস্তান্ বিপিনে ত্যক্ত্বা বৈরমপ্রতিযাত্য চ। অকীর্তিং সর্বলোকেষু গচ্ছেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ।।৩/৩৩/৫৪-৫৫। হে দেবরাজ! আমি কোন লোভে পরে স্বর্গ, অন্য কোন অভীষ্ট বিষয়, দেবত্ব কিংবা সুখ প্রার্থনা করিনা, এমন কি সমস্ত দেবতাদের আধিপত্যও কামনা করি না। বনের মধ্যে আমার ভাইদের আমি ছেড়ে এসেছি শুধু আমাদের প্রতি এই শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়ে যুদ্ধে জয় পেতে, এর বিপরীত কিছু করলে জগতে আমি সব সময় নিন্দাভাজনই হব। অর্জুন বলতে চাইছেন, আমি একটা উদ্দেশ্য পুর্তির জন্য এখানে এসেছি, সেই উদ্দেশ্য হল আমার ভাইদের মঙ্গল করা। এই উদ্দেশ্য থেকে আমাকে সরাবার জন্য যদি আমাকে সাক্ষাৎ দেবত্বও দেওয়া হয় আমি কিন্তু সেই দেবত্বও নেব না, আমার এই উদ্দেশ্য থেকে এক চুলও সরে আসব না। আমাদের মত সাধারণ মানুষরা একটুতেই আমাদের পথ থেকে সরে যাই। আমাদের বেশীর ভাগ লোকেদের পথ বলেও কিছু নেই তাই পথ থেকে সরে আসারও কোন কিছু থাকে না। আমরা নিজেরাই জানিনা আমরা জীবনে কি চাই। শুধু দিনগত পাপ ক্ষয় করা ছাড়া কিছুই করি না। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করতে হবে, রান্না করতে হবে, বাজার করতে হবে, খেতে হবে, আড্ডা দিতে হবে, অফিসে যেতে হবে আবার বাড়ি ফিরে টিভি দেখতে হবে, খেতে হবে খেয়ে ঘুমোতে হবে। আবার সকালবেলা উঠে এইটাই চলবে, বছরের পর বছর এইভাবে চলছে। অন্য দিকে আবার যা কাজ করি সেটাও ধর্ম রূপে করিনা বোঝা মনে করে করি।

কিন্তু অর্জুন এখানে একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ভাই ও দ্রৌপদীকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। তার উদ্দেশ্য হল হৃত সাম্রাজ্যকে উদ্ধার করতে হবে, ভাইদের দুর্গতির অবসান করতে হবে। তারও পেছনে একটা দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য হল ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই ছোট ছোট লক্ষ্য গুলো তৈরী হয়। একটা ছেলে যখন স্কুলে ভর্তি হয় তখন তার লক্ষ্য হল মাধ্যমিক পাশ করা। এখন সে ক্লাশ ফাইভ পাশ করছে, সিক্স পাশ করছে, এইভাবে পাশ করার মাধ্যমে তার চেষ্টা চলছে মাধ্যমিক পাশের দিকে এগোন। ঠিক তেমনি আমাদের যা কাজ, সকালে ওঠা, ঠাকুরের নামজপ করা, রান্না করা, এগুলো কেন করা হচ্ছে? সবটাই সেই মূল লক্ষ্যের দিকে যাওয়া। আমাদের এই মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি থাকে না, যখনই দৃষ্টিটা মূল লক্ষ্য থেকে হারিয়ে যায় তখনই এই ছোট ছোট কাজগুলির আর কোন মূল্য থাকে না আমাদের কাছে, এই কাজগুলিই দিনগত পাপ ক্ষয়ের দিকে চলে যায়। অর্জুন কিন্তু উদ্দেশ্য থেকে সরে আসছেন না, তিনি একটা উদ্দেশ্যকে নিয়ে বেরিয়েছেন। ইন্দ্রকে বলছেন, আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছি, আপনি যদি মনে করেন লোভে পরে, কামনায় বশীভূত হয়ে দেবত্ব নিয়ে উদ্দেশ্য থেকে সরে আসব, সেটা কখনই আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। ধর্মের দিক থেকে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হল স্বর্গপ্রাপ্তি, স্বর্গপ্রাপ্তি মানে দেবতার শরীর সে পেয়ে গেল, অর্জুন সেটাকেও প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন।

তখন ইন্দ্র বলছেন 'আমি জানি তুমি এগুলো কিছুই নেবে না। আমি তোমাকে শুধু পরীক্ষা নিচ্ছিলাম, আমি তোমাকে পুরো সান্নিধ্য দেব কিন্তু সবার আগে তুমি শিবকে প্রসন্ন কর'। বেদে একাদশ রুদ্রের একজনকে মহাভারতে শিব রূপে খুব বড় করে দেখানো হয়েছে। পরের দিকে পুরানে এসে ভগবান শিবকে নিয়েই অনেক পুরান রচিত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক বিশেষ করে কম্যুনিষ্টরা শিবের এই উত্থানকে শ্রেনী সংগ্রামের পরিণতি বলে মনে করে। কি কারণে শ্রেনী সংগ্রাম? শিব হচ্ছেন ট্রাইবাল দেবতা, আর ট্রাইবালরা হচ্ছে সর্বহারা অন্য দিকে ব্রাক্ষ্মণরা হল বুর্জোয়া। বুর্জোয়া আর সর্বহারাদের লড়াইয়ের পরিণামে শিব হয়ে গেলেন দেবাদিদেব মহাদেব। কিন্তু এরা ভুলে গেছে এই পুরান মহাভারত ব্রাক্ষ্মণদের দ্বারা রচিত হয়েছে। অরুণাচলের আলংয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা স্কুল আছে, যেখানে পাহাড়ি ছেলেরা পড়াশোনা করে। অরুণাচলে একটা খুব মজার লোককথা প্রচলিত আছে, সেটাই একদিন স্কুলের ছেলেরা একজন মহারাজকে বলছিল 'জানেন মহারাজ আপনারা সমতল ভূমির লোকেরা পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেদের থেকে কেন এগিয়ে গেছেন? প্রথমে আমাদের পূর্বজ আর আপনাদের পূর্বজরা ভাই ভাই ছিলেন আর একই সঙ্গে লেখাপড়া শিখেছিল। কিন্তু আপনাদের পূর্বজরা পাথরের লিখে পড়াশোনা করত। কিন্তু আমাদের পূর্বজরা হরিণের চামড়াতে লিখে রাখত। তারপর কোন এক সময় সারা দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল। এমন দুর্ভিক্ষ হল যে যার যেদিকে ছিটকে চলে গেল। আপনাদের পূর্বজরা তো পাথর খেতে পারবে না, পাথর যেমন থাকার তেমনই থেকে গেল। আমাদের পূর্বজরা যখন দেখলে খাবার দাবার কিছু নেই তখন তাঁর হরিণের চামড়াকে জলে সেদ্ধ করে খেয়ে নিল, তাতেই আমাদের সব লেখা বিদ্যা চলে গেল। সব বিদ্যা এইভাবে হারিয়ে গেছে কিন্তু আপনাদের পাথরে লেখা ছিল বলে সব বিদ্যা থেকে গেল। সেইজন্য আপনারা এগিয়ে গেছেন'। এটা অরুণাচলের লোককথা। তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায় অরুণাচলে প্রথমের দিকে কেউ পাথরের উপরে লিখে করত কেউ আবার চামড়ার উপর লিখে পড়াশোনা করত। এটা যে একেবারে গালগপ্পো হবে তা নয়। ব্রাক্ষ্মণদের একটা অংশ পরম্পরাতে বেদকে ধরে রেখেছিল, অন্য একটা অংশ তন্ত্রকে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল আবার কেউ কেউ পুরান,

ইতিহাস নিয়েই চর্চা করত। কিন্তু বেদের ক্ষেত্রে লেখালেখি, একটা পরিকল্পিত ভাবে বেদের সব কিছুকে ধরের রাখার ব্যাপারে তাদের ব্রাহ্মণরা যতটা উন্নত ছিলেন তন্ত্র বা পুরান ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাদের ব্রাহ্মণরা ততটা উন্নত ছিলেন না। এর ফলে সমাজে বেদের সম্মানটা অনেই উঁচু জায়গায় চলে গিয়েছিল। বেদের ব্রাহ্মণরা বেদকে নিজের সন্তানের মত যত্ন করে খুব সুন্দর ভাবে সামলে রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্য ব্রাহ্মণরা সেটা করতে পারলেন না। কিন্তু তন্ত্র বা পুরান ও ইতিহাস হারিয়ে যায়নি তখনও সমাজে এগুলোর অনুশীলন হত। ঠিক সেই রকম শিবের পূজা তখনও সমাজে কিছু অংশের মধ্যে হয়ে আসছিল। কিন্তু বেদের সময় বেদের সাহিত্য তখন পাঠ্য হিসাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে খুব সম্মানের ছিল। বেদের বাইরে আর কোন সাহিত্যের খবর তখনও পর্যন্ত ছিল না, কিন্তু সমাজে তখনও সেগুলোর প্রচলন ছিল। মহাভারত করল কি সব কিছুকে সাহিত্যের মধ্যে নিয়ে এসে মিশিয়ে দিল। ক্লাশ স্ট্রাগেলের কথা যে বলছে এগুলো শুধু কল্পনা।

অর্জুনের শিবের তপস্যা, নিষাদরূপী শিবের সাথে অর্জুনের যুদ্ধ এবং অর্জুনের পাশুপত অস্ত্র লাভ

অর্জুন তখন হিমালয়ের কাছে শিবকে খুশি করার জন্য বিরাট তপস্যা শুরু করলেন। অর্জুনের তপস্যাতে ভগবান শিব খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। আর শিব জানতেন অর্জুন মনে মনে কি চাইছে। কিন্তু অর্জুনের ক্ষমতা ও শক্তির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য শিব মায়া দিয়ে একট বুনো শুয়োরকে সৃষ্টি করলেন। অর্জুন যেখানে তপস্যা করছিল সেখানে গিয়ে জংলী শুয়োরটা বিকট আওয়াজ করতে করতে অর্জুনকে বধ করতে এগিয়ে এসেছে। অর্জুনের তখন ধ্যান ভঙ্গ হতেই গাণ্ডীব থেকে একটা তীর শূকরের দিকে ছুড়লো। এদিকে ভগবান শিব নিষাদের বেশ ধারণ করে তিনিও একটা তীর শূকরের দিকে চালিয়েছেন। দুটো তীরই মোটামুটি একই সাথে শূকরকে বিদ্ধ করেছে। অর্জুন তখন নিষাদকে বলছেন 'মৃগয়ার নিয়ম হল যে প্রথম শিকারের বস্তুকে দেখবে সেটা তারই হয়। আমি প্রথম এই শূকরকে দেখেছিলাম, আমি তীর মারার পর কেন তুমি এর উপর তীর চালালে, তুমি এটা অন্যায় করেছ'। এই নিয়ে নিষাদ রূপী ভগবান শিবের সাথে অর্জুনের ঘোরতর তর্ক যুদ্ধ লেগেছে। তখন নিষাদ বলছে, তর্ক করে কি হবে যুদ্ধ করে এর মীমাংসা করে নেওয়া যাক। এরপর যুদ্ধ শুরু হল। কিরাত চুপচাপ দাঁড়িয়ে বলছে 'তোমার যত অস্ত্র আছে আমার উপর চালাও'। অর্জুনের যত তীর ও অস্ত্র সব চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাতে কিরাতের কিছুই হচ্ছেন, একটা একটা করে তীর ছুড়ছে আর সে অনায়াসে সব তীরগুলোকে হাতের মধ্যে ধরে নিয়ে দুমড়ে ফেলে দিচ্ছে। কিরাতের এই কাণ্ড দেখে অর্জুন একটু ঘাবড়ে গেছেন। অর্জুন ভাবছেন, আমি এখন যে স্থানে অবস্থান করছি এই জায়গাতে দেবতারা আসা-যাওয়া করেন, অন্য কোন প্রাণির এখানে আসা সম্ভব নয়। এই একটা ধারণা মহাভারত ও বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় যে, দেবতারা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকেন। যেমন অহল্যা যেখানে তপস্যাদি করছিলেন সেখান দেবরাজ ইন্দ্র পৌঁছে গিয়েছিলেন বা যেখান যজ্ঞ-যাগ হত সেখানেও দেবতারা হাজির হতেন। আবার কিছু কিছু স্থান আছে যেমন কৈলাসের মানস সরোবরে সাক্ষাৎ ভগবান শিব পার্বতীর সঙ্গে বাস করেন। ঠিক তেমনি উজ্জয়িনীকে বলা হয় শিবের নগরী, এখানকার রাজা হলেন মহাকালেশ্বর। যদিও বলা হয় বিক্রমাদিত্য ওখানকার রাজা কিন্তু তিনি শিবের প্রতিনিধিত্ব করছেন, কিন্তু উজ্জয়িনীতে কোন রাজা থাকতে পারবে না। ওখানকার আশেপাশে ইন্দৌর প্রভৃতি অঞ্চলের এখনও যারা রাজবংশের লোক তারা রাত্রে ওখানে থাকতে পারে না। মহাকালেশ্বর আর বিক্রমাদিত্য ছাড়া ওখানে কোন রাজা থাকতে পারবে না। মহাকালেশ্বর ওখানে সাক্ষাৎ বিরাজমান। এই যে বলছে দেবতারা কিছু কিছু জায়গায় আনাগোনা করেন সেখানে অন্য কোন প্রাণি থাকতে পারবে না। এইটা ভেবে অর্জুন একটু ঘাবড়ে গেছেন। এদিকে অর্জুনের সব তীরও নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন অর্জুন তাড়াতাড়ি করে একটা শিবের মুর্তি তৈরী করে কিছু ফুল এনে মালা গেঁথে শিবের গলায় মালাটা পরিয়ে দিলো আর শিবের পায়ে কিছু ফুল পুষ্পাঞ্জলী দিল যাতে এই যুদ্ধে জয় পায়। অর্জুন দেখছেন যা কিছু ফুল শিবের চরণে দিচ্ছেন সেই ফুল গিয়ে ঐ কিরাতের পায়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে। এইখান থেকে পরের দিকে ঠিক এই রকম অনেক কাহিনী তৈরী হয়েছে। এই ব্যাপার দেখে অর্জুন বুঝে গেছে এই কিরাত সাক্ষাৎ ভগবান শিব। অর্জুন বুঝতে পারতেই তাঁর খুব চিন্তা হয়ে গেছে, এতক্ষণ আমি আমার ইষ্টের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিলাম, ইষ্টের প্রতি আমি তীর মেরেছি।

ভগবান শিব তখন অর্জুনকে আশ্বস্ত করে বললেন 'আমি তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। আমি যাকে আমার অস্ত্র প্রদান করব তার ভেতরে সেই অস্ত্রকে ধারণ করার ক্ষমতা আছে কিনা। আমি বুঝে গেছি তুমি তা পারবে। এই নাও আমি তোমাকে আমার এই পাশুপত অস্ত্র দিচ্ছি। এই অস্ত্রের তিনটে জিনিষ আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি, ধারণ, প্রয়োগ আর উপসংহার'। এই ধরণের দিব্যাস্ত্র মন্ত্রশক্তির উপর চলে, সাধারণ ছোড়ার উপর চলে না। ধারণ হল, যে মন্ত্রের সাহায্যে এই অস্ত্রকে আহ্বাণ করা হয়। প্রয়োগ, এবার এই অস্ত্রকে নিক্ষেপ করবে কিভাব। ছোড়ার পর যদি মনে কর এই অস্ত্র ভুল লক্ষ্যে প্রয়োগ হয়েছে তখন তাকে কিভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে তার জন্য উপসংহার মন্ত্রের দ্বারা তাকে ফিরিয়ে আনতে হয়।

অশ্বত্থামা যেমন ব্রহ্মাস্ত্রের ধারণ জানত, প্রয়োগ জানত কিন্তু উপসংহারটা জানত না। আসলে শক্তি যদি কম থাকে তাহলে ঐ দিব্যাস্ত্রকে টেনে ফেরত আনতে পারবে না। ভগবান শিব অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্রের ব্যাপারে সাবধান করে বলছেন 'অর্জুন! তুমি কোন দিন তোমার থেকে দুর্বল লোকের উপর এই পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করবে না। যদি প্রয়োগ করে থাক তাহলে সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে এই পাশুপত অস্ত্র নাশ করে দেবে। তোমার যখন প্রাণ সংশয় উপস্থিত হবে আর তোমার থেকে শত্রু যদি বেশী শক্তিশালি হয় তখনই তুমি এর প্রয়োগ করতে পারবে'। ভগবান শিব কখনই পাশুপত অস্ত্র চালান না, কারণ জগতে কেউই ভগবান শিবের সমকক্ষ নেই। তারপর ভগবান শিব বলছেন 'তুমি এই অস্ত্র শুধু মাত্র সঙ্কল্প, দৃষ্টিতে, কথা দিয়ে মানে এই পাশুপত অস্ত্র চালালাম আর শেষে ধনুর উপর রেখে চালাতে পারবে। তুমি যুদ্ধে আছে, সেই সময় তুমি ধনুর উপরে সন্ধান করে একে চালাতে পারবে। তোমার হাতে ধনু নেই কিন্তু তুমি শুধু বলে দিলে যাও পাশুপত অস্ত্র একে শেষ করে দাও। মুখেও যদি না বলতে পার তাহলে শুধু দৃষ্টি দিয়ে বা সঙ্কল্প করেই পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে'। যাঁর খুব বড় সাধু সন্ন্যাসী তাঁদের কোন অস্ত্রের দরকার হয় না, সঙ্কল্প মাত্রেণ তিনি অনেক কিছু করে দিতে পারেন। চণ্ডীতে আছে মা দূর্গা হুঙ্কার দিলেন তাতেই অসুরদের অনেক সৈন্যের বিনাশ হয়ে গেল।

অর্জুন ও ঊর্বশীর কাহিনী, ঊর্বশী ও পুরুরবার কাহিনী

অর্জুন শিবের কাছ থেকে বর ও অস্ত্র লাভ করার পর এবার তিনি স্বর্গের দিকে এগিয়ে চললেন। অর্জুন হলেন ইন্দ্রপুত্র। অর্জুনকে পেয়ে ইন্দ্র নাকি তাঁকে পাঁচ বছর স্বর্গে রেখে দিয়েছিলেন। কোথায় বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে অর্জুন তার চাইতে বরং এখানে আমার কাছে পাঁচ বছর থাকুক। স্বর্গে থাকার সময় ইন্দ্র অর্জুনকে কিছু কিছু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ইন্দ্র অর্জুনকে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কাছে নাচ-গানটা ভালো করে শিখে নিতে বললেন, তোমার পরে কাজে লাগবে। দেবতা কিনা তাঁরা অনেক সময় বুঝতে পারেন ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে। অস্ত্র তোমাকে এমনিতেই অনেক দিয়ে দেব কিন্তু তার সাথে তুমি নাচ-গানটাও শিখে রাখ। চিত্ররথের কাছে অর্জুন সঙ্গীত বিদ্যাটা খুব ভালো করে শিখে নিয়েছে। স্বর্গের অনেক নামকরা অপ্সরা ছিল। এদের মধ্যে মেনকা, ঊর্বশী, ঘৃতাচী, রম্ভা ও তিলোত্তমা খুব নামকরা অপ্সরা ছিল। তিলোত্তমার কাহিনী একবারই আসে সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনীতে। ঊর্বশীর কাহিনী কিছুটা বেদেই এসে গিয়েছিল কিন্তু পরের দিকে পুরানে আরও বিস্তৃত ভাবে সেই কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে।

কোন এক সময় পুরুরবা বলে একজন খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি এত শক্তিশালী রাজা ছিলেন যে কিভাবে কিভাবে একবার ঊর্বশীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে যায়। ঊর্বশী হলেন স্বর্গের অপ্সরা তাকে তো স্বর্গ ছাড়া আর কোথাও রাখা যাবে না, কিন্তু পুরুরবা ঊর্বশীকে চিরদিন নিজের কাছে রেখে দিতে চাইছে। তখন ঊর্বশী খুব কায়দা করল। পুরুরবাকে ঊর্বশী বলল তুমি যদি কোন দিন আমার চোখের সামনে বস্ত্রহীন অবস্থায় পড়ে যাও তাহলে সেদিনই আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। পুরুরবা রাজী হয়ে গেল। এরপর ঊর্বশীর থেকে সন্তান হয়েছে। এদিকে দেবতাদের মহা চিন্তা হচ্ছে, ঊর্বশী স্বর্গের একজন নামকরা অপ্সরা হয়ে পৃথিবীতে পড়ে আছে, এদিকে আমাদের কাজকর্ম চলবে কি করে! ঊর্বশীর খুব সুন্দর দুটো ছাগল ছানা ছিল। দেবতারা খুব কৌশল করে গভীর রাতে এসে ছাগল ছানা দুটোকে চুরি করতে এসেছে। এমন ভাবে চুরি করছে যে ছাগল ছানা গুলো খুব চেঁচাতে শুরু করেছে। ঊর্বশী ছাগল ছানার আওয়াজ শুনে নিজের বরকে ডেকে খুব হম্বিতম্বি করতে শুরু করে দিল, এই দেখ আমার ছাগল ছানা কার চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি রাজা অথচ তোমার বাড়ি থেকে চুরি হচ্ছে কিছু করতে পারছ না। এদিকে পুরুরবা রাত্রে বস্ত্রহীন হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, উঠবে কি করে। এদিকে ঊর্বশী যাচ্ছেতাই ভাবে গালাগাল দিতে শুরু করেছে – তুমি কি একটা পুরুষ না নপুংসক, আমার ছাগলের বাচ্চাকে রক্ষা করতে পারছো না। শেষে পুরুরবা আর কি করবে তলোয়ার নিয়ে বেরিয়েছে, আর ঠিক সেই সময় দেবতারা একসঙ্গে আকাশে অনেক গুলো বিদ্যুৎ চমকে দিয়েছে। ঐ আলোতে পুরুরবা বস্ত্রহীন অবস্থায় ঊর্বশীর চোখে পড়ে গেল। ঊর্বশী বলল – আর আমি পৃথিবীতে থাকব না, তুমি বস্ত্রহীন অবস্থায় আমার চোখে পড়ে গেছ। পুরুরবার চোখে জল, অনেক করে ঊর্বশীকে বোঝাল কিন্তু ঊর্বশী আর থাকবে না। শেষে বছরে একবার করে ওদের ঘোড়া রূপে দেখা হবে, এই রকম নানা রকমের কাহিনী আছে।

অর্জুন হল এই পুরুরবা বংশের। ঊর্বশী এখন এসেছে ইন্দ্রের রাজসভাতে নৃত্য করতে, সেখানে অর্জুনও বসে ছিল। ঊর্বশীও অর্জুনকে দেখেছে। স্বর্গে মা, ভাই, বোন বলে কিছু নেই, একেবারে পশুদের জীবন, কেন যে লোকে স্বর্গে যেতে চায় ভগবানই জানেন। অর্জুন পৃথিবী থেকে এসেছে, এখন অর্জুনকে দেখে ঊর্বশী মুগ্ধ হয়ে গেছে। অথচ ঊর্বশী হল অর্জুনের বাবা ইন্দ্রের সেবাদাসী। অর্জুন হয়তো ঊর্বশীর ইতিহাস জানতেন, ঊর্বশীকে দেখে অর্জুনও খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়ে

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ইনিই কিনা আমাদের পূর্ব পূর্ব বংশের মাতামহী। অর্জুনরা ঊর্বশীর সন্তান থেকে এসেছে। কিন্তু পৃথিবীতে যে ঊর্বশী ছিল আর স্বর্গে যে ঊর্বশী আছে এই দুটো আলাদা। স্বর্গে কারুরই বয়স বাড়ে না। ইসলামে আছে মৃত্যুর পর যখন এরা স্বর্গে যাবে তখন ছেলেদের বয়স হবে বত্রিশ বছর আর মেয়েদের সবার বয়স পঁচিশ বছর থাকবে। এদের বয়স কোন দিন বাড়বে না। পৃথিবীতে ঊর্বশী তোমার ঠাকুরমা যাই থাকুন স্বর্গে কিন্তু তার বয়স কখন বাড়বে না। ঊর্বশী অর্জুনকে দেখার পর এক চিন্তা কি করে অর্জুনকে তার কাছে নিয়ে আসা যায়। আর অর্জুন ঊর্বশীকে দেখে ভাবছেন ইনিই হলেন আমাদের পূর্ব পুরুষদের মা। অর্জুনও তাই হাঁ করে তাকাচ্ছেন, আর ঊর্বশী ভাবছে অর্জুন আমার দিকে ভোগের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এদিকে ঊর্বশী অর্জুনকে খবর পাঠিয়েছে আজকে তুমি আমার মহলে এস। এই কথা শুনে তো অর্জুনের মাথা গেছে ঘুরে। ভয়ে ভয়ে অর্জুন গেছে। অর্জুনকে দেখে ঊর্বশী বলছেন 'আমি তোমার সঙ্গে শুতে চাই'। অর্জুন শুনেই বললেন 'তা কি করে হবে, ইন্দ্র হচ্ছেন আমার বাবা, আপনি তাঁর প্রেয়সী, ইন্দ্রের শক্তিতে আমার জন্ম। আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি আমার মা। আমার দৃষ্টিতে কুন্তি, মাদ্রী ও শচী যে রকম আপনিও সেই রকম'। কুন্তী হলে অর্জুনের নিজের মা, মাদ্রী সৎ মা আর শচী ইন্দ্রের স্ত্রী, ইন্দ্রের শক্তিতে যেহেতু অর্জুনের জন্ম সেই দিক থেকে শচীও অর্জুনের সৎ মা। অর্জুন বলছেন এরা আমার কাছে যে রকম তুমিও আমার কাছে সেই রকম। একদিকে তুমি আমার পিতা ইন্দ্রের নর্তকী অন্য দিকে আমাদের পুরু বংশের পুরুরবার তুমি স্ত্রী, আমি ঐভাবে তোমাকে দেখেছি। আমি তোমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে চাইছি। ঊর্বশী অর্জুনের কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেছে 'আমি হলাম অপ্সরা, আমি আবার কিসের মা? তুমি এভাবে 'মা' সম্বোধন করে আমাকে অপমান করছ। স্বর্গে এই সব কোন সম্পর্ক থাকে না, এখানে free for all'। কিছু দিন আগে একটা ব্যঙ্গ কাহিনী বেরিয়েছিল। একজন লোক বহু কষ্টে করে করে অসৎ কাজ করত না, মিথ্যা কথা বলত না, এই সব করে করে সে মৃত্যুর পর স্বর্গে গেছে। স্বর্গে গিয়ে সে বেচারা দেখছে তার এক পরিচিত যে খুব ভালো লোক ছিল, পৃথিবীতে থাকার সময় কোন দিন মদ খেত না, সে স্বর্গে বসে বসে দিব্যি মদ গিলে যাচ্ছে। আরেকজনকে সে জানতো যে খুব সচ্চরিত্রের ছিল, কোন দিন কোন মেয়ের দিকে তাকাত না, সে কিনা স্বর্গে সব সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করছে। সে বেচারা তো অবাক হবে চেঁচিয়ে উঠেছে কি হচ্ছে এগুলো! তখন ঐ সৎ ও চরিত্রবান লোক দুটো বলছে – আরে ভাই এখান থেকে তো আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এত দিন যা ভালো কিছু করেছিলাম সেটা এখান পর্যন্ত আসার জন্য, কিন্তু এখান থেকে তো আর কোথাও যেতে হবে না। তখন বেচার বলছে – 'ওঃ! তাই! বলো কি!' বলেই সেও লাফিয়ে ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বর্গ হল ভোগভূমি। পৃথিবীকে বলা হয় কর্মভূমি বা পূণ্যভূমি। স্বর্গের অপ্সরারা কম বয়সী, এদের মা বলে দিলে প্রচণ্ড রেগে যায়। ওদের বয়স কোনদিন বাড়েনা। 'তুমি মা বলে আমাকে অপমান করেছে, তুমি যখন পৃথিবীতে ফেরত যাবে তখন তুমি চিরদিনের মত নপুংসক হয়ে ফেরত যাবে। আর তুমি স্ত্রী জাতির অপমান করেছ বলে নপুংসক হয়ে তোমাকে স্ত্রী জাতির মধ্যে থাকতে হবে'। ঊর্বশীর অভিশাপ শুনে অর্জুনের মাথায়তো বজ্রপাত। তারা দুজনেই ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্রকে সব কাহিনী শোনান হলো। অভিশাপের কথা শুনে ইন্দ্রও প্রচণ্ড অস্বস্থিতে পড়ে গেছেন, তার ওপর আবার তার নিজের অপ্সরা তার ছেলেরই পিছনে দৌঁড়াচ্ছে। তখনকার দিন এই রকম বহু ঘটনা আছে, একই মহিলা বাপের দিকে ছুটছে আবার তার ছেলের পেছনেও লাগতে যাচ্ছে। যাই হোক ইন্দ্র ঊর্বশীকে বলছেন 'এসব অভিশাপ-টভিশাপ অর্জুনকে দেওয়া চলবেনা। তুমি তোমার অভিশাপ তুলে নাও'। অভিশাপ তো দিয়ে ফেলেছে, ফেরাতে পারছেনা। তখন ঠিক হলো তুমি যখন অভিশাপ ফেরত নিতে পারছো না তাহলে এক বছরের জন্য নপুংসক থাকার অভিশাপ দিয়ে দাও অর্থাৎ অর্জুন এক বছরের জন্য নপুংসক হয়ে থাকবে। অভিশাপ কমিয়ে দেওয়া হলো। আরেকটা শর্ত হল অর্জুন যখনই চাইবে নপুংসক হতে শুধু তখনই হবে। যখন-তখন করা যাবেনা। অর্জুন যখন বলবেন এবার আমি নপুংসক হব তখনই সে নপুংসক হবে। এটাই হলো, যখন পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসে বিরাট রাজার বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল, সেই সময় অর্জুন বৃহন্নলা নাম নিয়ে এক বছর নপুংসক হয়ে কাটিয়েছিল।

এই কাহিনীর মধ্যে সেরকম কিছু নেই মনে হবে, কিন্তু মজার হল এই কাহিনীর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিষের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যারা ঈশ্বরের প্রতি ঠিক ঠিক সমর্পিত, আজকে যেটা তাদের কাছে অভিশাপ বা দুঃখ কষ্ট হয়ে আসে, পরে সেটাই আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা হলাম অতি সাধারণ মনের একটু কিছু হলেই ছটফট করি। কিন্তু যখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা আধ্যাত্মিকতার একটা স্তরে চলে যাবে তখন বোঝা যাবে ঐ খারাপটা যদি আমার জীবনে না ঘটে থাকতো, তাহলে কিন্তু আমি এত উঁচুতে উঠতে পারতাম না। অর্জুনকে যদি ঊর্বশী অভিশাপ না দিত, তাহলে মহাভারতের কাহিনীটাই অন্য দিকে চলে যেত। এই যে পরীক্ষিৎএর জন্ম হলো, ঊর্বশী অভিশাপ না দিলে পরীক্ষিৎই জন্ম নিত না। বিরাট রাজার কাছে গেলেন, উত্তরাকে নাচ গান শেখালেন, উত্তরার সঙ্গে অভিমুন্যর বিয়ে হলো। পরে যে মহাভারতকে

পাচ্ছি, কিভাবে পেলাম – পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎএর পর জনমেজয়, সর্পযজ্ঞে জনমেজয়কে যে মহাভারতের কাহিনী বলা হয়েছে, তার জন্যই আজ এই মহাভারত পাচ্ছি। কারণ, অর্জুন অপ্সরার অভিশাপে নপুংসক হয়েছিলেন বলেই।

মহাভারতই হোক কিংবা বাল্মীকি রামায়ণই হোক বা পুরানই হোক, আমাদের শাস্ত্রের একটা প্রচলিত ধারণা বহু দিন থেকে চলে আসছে, সেটা হল – ভগবানকে ধরে রাখো। ভালো মন্দ যাই আসুক আসতে দাও, এই ভাবকে ধরে রাখলে ভবিষ্যতে দেখা যায় যেটা ভালো ছিল সেটাও ভালোর দিকে নিয়ে গেছে, যেটা বাজে হয়েছে সেটাও তোমাকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা শুধু কথার কথা নয় বা কোন তত্ত্বই নয়, কাহিনী বা গল্পে বলছে বলে নয়, বাস্তবিকই আমাদের জীবনেই এই জিনিষটাকে অনেকবার আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, অবশ্য যদি আমরা ভগবানে সমর্পিত থাকি। যে মানুষ ভগবানে সমর্পিত নয় সে হল একটা হাল বিহীন পাল বিহীন নৌকার মত, তার কোন direction নেই নিজের মত ভেসে চলেছে। কখন পূব দিকে যাচ্ছে, কখন দক্ষিণ, পশ্চিম বা উত্তরে। একশ বছর ঘুরে এসে দেখা যাবে যেখানে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। যখনই সামনে কোন একটা আদর্শকে আমি ঠিক করে নিলাম আর আমি এই আদর্শের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন কি হয়, যদি কেউ একটু ডান দিক বাঁদিকেও যদি চলে যায় তাহলে এই যাওয়াটাও তার লক্ষ্যের যাত্রাপথে একটা সংযোজন হয়ে যায়।

নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান

অর্জুন এবার সব দিব্যাস্ত্র নিয়ে ফিরে আসার মুখে। এদিকে যুধিষ্ঠির বনে আছেন, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঘুরতে ঘুরতে ওনার মনের কষ্টটা মাঝে মাঝেই চাড়া দিয়ে ওঠে, কি থেকে কি হয়ে গেল, কোথায় কিভাবে ফেঁসে গেলাম। অর্জুনও কাছে নেই, অর্জুন এখন কোথায় কিভাবে কি অবস্থায় আছে এই সব ভেবে ভেবে যুধিষ্ঠির খুব বিমর্ষ হয়ে আছেন। সেই সময় একজন খুব উচ্চ কোটির ঋষি বৃহদাশ্বের সাথে যুধিষ্ঠিরের দেখা হয়েছে তাঁকে যুধিষ্ঠির খুব দুঃখ করে বলছেন – আমার থেকে অভাগা এই পৃথিবীতে আর কেউ হয়েছিল কি? তখনকার দিনে তো আর অত বই-টই ছিল না, লোকেরা বেশী কাহিনীও জানতো না। কিন্তু তখনকার দিনে ব্রাহ্মণরা পুরো ইতিহাস পুরানকে মাথায় নিয়ে ঘুরতেন। তখন বৃহদাশ্ব যুধিষ্ঠিরকে বলছেন 'দ্যাখো যুধিষ্ঠির! তোমার থেকেও বড় অভাগা আগে একজন ছিলেন তুমি এভাবে মন খারাপ করো না। তার নাম হল নল। তিনিও তোমার মত জুয়াতেই সব কিছু হারিয়েছিলেন। তুমি তো তাও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আছ কিন্ত নল বেচারা নিজের স্ত্রীকেও হারিয়ে ফেলেছিল'। যুধিষ্ঠির শুনে অবাক হয়ে বলছেন আপনি আমাকে পুরো ব্যাপারটা বিস্তৃত করে বলুন। বৃহাদাশ্ব তখন বলছেন 'তোমাকে আমি নলোপ্যাখ্যান অর্থাৎ নল-দময়ন্তীর কথা বলছি। এই কাহিনী শুনলে তোমার বিশেষ মঙ্গল হবে'। আমরা খুব সংক্ষেপে নল-দময়ন্তীর কাহিনীটা আলোচনা করছি। তখনকার সমাজে যে কাহিনী গুলো লোকের মুখে প্রচলিত ছিল সেই কাহিনীগুলিকেই মহাভারতে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের এই বাক্যটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় 'এই পৃথিবীতে আমার মত কি কেউ দুখী আগে হয়ছে'? তাহলে নল-দময়ন্তী আলাদা একটা উপন্যাস হয়ে যাবে। মহাভারত যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের মাধ্যমে নল-দময়ন্তীর কাহিনীকে টেনে এনেছে। স্বামীজী নল-দময়ন্তীর খুব প্রশংসা করতেন। তিনি বলতেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী এনারা হচ্ছেন আমাদের ভারতের আদর্শ নারী। কেন আদর্শ নারী বলা হতো, আর আদর্শটাই বা কি, সেটাই এখানে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি।

নল ছিলেন একজন খুব নামকরা রাজা। তিনি যুধিষ্ঠিরদের পুর্বজ ছিলেন। সেই সময় তার পাশের রাজ্যে দময়ন্তী নামে খুব সুন্দরী, রূপসী রাজকন্যা ছিল। দময়ন্তী এত সুন্দরী আর রূপসী ছিল যে দেবতারাও তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল। মহাভারতের সময় দেবতারা এখনো শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে মাঝে মাঝে আসেন। বেদের সময়ে যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ দেবতারা ছিলেন, এনারা ছিলেন সর্বেসর্বা। এদেরকে কেউ হারাতে পারবেনা। মহাভারতে এসে সেই বৈদিক দেবতারাই ছিলেন কিন্তু তাদের ঐ সর্বেসর্বার উপাধিটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে যাদের তপস্যা আছে তাদের কাছেই এসে দেবতাদের শক্তি কমে যাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তাদের শক্তি একই ছিল।

একদিন নল নিজের বাগানে ঘুরছেন, তখন দেখলেন একটা খুব সুন্দর হাঁস বাগানের সরোবরে খেলা করছে। হাঁসটা এমন ভাবে খেলা করছে যে নল আমাকে যেন ধরে ফেলুক। যে ভাবেই হোক রাজা নল হাঁসটাকে ধরে ফেললেন। তখন হাঁস মানুষের ভাষায় নল রাজাকে বলছে 'দ্যাখো নল, আমি কিন্তু কোন সাধারণ হাঁস নই, আমি তোমাকে একটা মজার কাহিনী শোনাব আর তুমি যদি আমাকে প্রাণে না মার তাহলে আমি তোমার অনেক উপকারে আসব'। নল এমনিতেই খুব দয়ালু রাজা ছিলেন। নল বলছে 'আমি তো তোমাকে ছেড়েই দেবো, কিন্তু তুমি আমাকে কি কাহিনী

শোনাবে বল আর আমার কি ভালো কাজ করবে'? হাঁস বলছে 'তোমার পাশের রাজ্যে দময়ন্তী নামে এক পরমা রূপসী রাজকন্যা আছেন। আমি সেখানে গিয়ে তার কাছে তোমার এমন প্রশংসা করব, সেই প্রশংসা শুনে তোমাকে ছাড়া দময়ন্তী কারুর দিকে তাকাতেই পারবেনা'। নল তখন একটু হেসে হাঁসকে ছেড়ে দিলেন।

হাঁস চলে গেল এবার দময়ন্তীর কাছে তার রাজমহলে। নলের কাছে দময়ন্তীর আর দময়ন্তীর কাছে নলের প্রশংসা করে তাদের মধ্যে একটা ভালোবাসা জন্ম দিয়ে দিল। দময়ন্তীর কাছে নলের এমন প্রশংসা করলো যে দময়ন্তীর মনে মনে নলের গুণের ও রূপের কথা চিন্তা করতে করতে মনের মধ্যে রাজা নলের ছবিকে বসিয়ে নিয়েছে। তারপর ঠিকই করে ফেলল, আমি নলকেই বিয়ে করবো। মনে মনে রাজা নলকে তার পতি রূপে বরণ করে নিল। মনের কথা দময়ন্তী কাউকে বলেওনি আর নলকে চোখেও দেখেনি, শুধু শুনে শুনে নলকে নিজের পতি রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। মীরাবাঈ যেমন মনে মনে কৃষ্ণকেই স্বামী রূপে বরণ করে নিয়েছিল, ঠিক সেই রকম। কিন্তু সেই সময় স্বয়ম্বর প্রথাই চালু ছিল। স্বয়ম্বর প্রথার মাধ্যমেই রাজকন্যারা নিজের স্বামীকে বেছে নিত। দময়ন্তীরও স্বয়ম্বরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে স্বর্গেও দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের খবর চলে গেছে। নারদ মুনি গিয়ে দেবতাদের বলছেন পৃথিবীতে দময়ন্তী নামে এক অতি অপার্থিব রূপসী নারী আছে, তার স্বয়ম্বর হতে যাচ্ছে আপনারাও সেই স্বয়ম্বর দেখবেন চলুন। নারদের কাছে শুনে দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, জলের দেবতা বরুণ আর প্রাণির শরীরকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করে যমরাজ এই চারজন দেবতা এখন চলেছেন স্বয়ম্বর সভায়। পথের মধ্যে নলের সঙ্গে এই চারজন দেবতাদের দেখা হয়েছে। নলকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি কোথায় যাচ্ছ। নলও বলল দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হচ্ছে সেখানে আমিও একজন প্রার্থি রূপে যাচ্ছি। দেবতারা আগেই বুঝে গেছেন দময়ন্তী নলের প্রতি আকৃষ্ট। চারজন দেবতারা নলের কাছে এসে নলকে বলল 'তুমি আমাদের দূত হয়ে দময়ন্তীর কাছে আমাদের নামে প্রশংসা করে এসো, যাতে সে আমাদের যে কোন একজনকে বিয়ে করে'। নল বলছে 'তা কি করে হবে, রাজমহলে দময়ন্তী সুরক্ষিত, সেখানে আমি কি করে প্রবেশ করব? আমি তো ধরা পড়ে যাব'। তখন দেবতারা বলছেন 'না, তোমাকে কেউ ধরতে পারবে না, আমরা তোমাকে আমাদের মত সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে দিচ্ছে এই সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে অনায়াসে দময়ন্তীর কাছে চলে যেতে পারবে কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না'। দেবতাদের যে কি উদ্দেশ্য ছিল এটা এখানে পরিষ্কার হয় না। নল তখন বলছেন 'যখন কোন পুরুষের মনে কোন নারীকে পাবার ইচ্ছা জেগে যায়, তখন সেই পুরুষ কি কখন সেই নারীকে অপর পুরুষের জন্য ত্যাগ করে দিতে পারে? আমার মনে দময়ন্তীকে পাওয়ার ইচ্ছা জেগেছে আর আপনার বলছেন আমি যেন আপনাদের জন্য দময়ন্তীকে ছেড়ে দিই, এটা কি কখন সম্ভব'! নল এই ব্যাপারে একেবারে পরিষ্কার। তখন দেবতারা বলছেন, 'দেখো, আমরা তখন তোমাকে বলেছিলাম আমাদের হয়ে একটা কাজ করে দাও। তুমি বলেছিলে হ্যাঁ আমি করে দেব, এখন তুমি তোমার কথা থেকে পিছিয়ে আসতে পারো না'। তখন নল মনের দুঃখে চলল দময়ন্তীর রাজমহলের দিকে। নল এসেছিল দময়ন্তীকে বিয়ে করতে কিন্তু মাঝখান থেকে ব্যাপারটা পুরো উল্টো হয়ে গেল, নলকে এখন দেবতাদের দূত হয়ে যেতে হচ্ছে। যেহেতু নল কথা দিয়েছে দেবতাদের কাজ করে দেবে, তোমাকে এখন দেবতারা যে কাজ করতে বলবে সেই কাজই করতে হবে, যে কোন মূল্যেই করতে হবে।

নল এখন দময়ন্তীর কাছে পৌঁছে গেছে, নলকে কিন্তু কেউই দেখতে পাচ্ছে না, কারণ তার এখন দেবতাদের শরীর হয়ে গেছে। আমাদের শরীরে পৃথিবী অংশ বেশী থাকে বলে স্থূল রূপটা সহজেই দৃষ্টি গোচর হয় কিন্তু দেবতাদের শরীর তেজ অংশ দিয়ে তৈরী বলে জ্যোতিটা বেশী থাকে। এর ফলে চর্মচক্ষু দিয়ে ঐ শরীর দেখতে পাওয়া যায় না। দময়ন্তীর কাছে গিয়ে নল সব বলতেই দময়ন্তী কাঁদতে শুরু করেছে 'আমি তো নলকে আমার পতি রূপে বরণ করে নিয়েছি, এই দেবতাদের কাউকেই আমি বরণ করতে পারব না'। নলও নিজের পরিচয় দিতে পারছে না শুধু বলে দিল 'আমি দেবতাদের দূত হয়ে এসে শুধু এই সংবাদ আপনাকে নিবেদন করলাম, এর বেশী কিছু বলার বা করার অধিকার আমার নেই'। এদিকে ইন্দ্র নলকে ডেকে বলল 'তুমি আমাদের কাজ করে দিয়েছ বলে তুমিও আমাদের মত দেখতে হয়ে যাবে'। নলও এখন দেবতাদের মত দেখতে হয়ে গেছে। এবার স্বয়ম্বর সভায় সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্যান্য রাজাদের সাথে এই চারজন দেবতারাও এসেছেন মানব শরীর ধারণ করে, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ আর যম। নলকে যদি দময়ন্তী চিনে ফেলে তাহলে দময়ন্তীতো ওর গলাতেই বরমালা দিয়ে দেবে। তাই দেবতারা নলকে ঠিক নিজেদের মতই চেহারা বানিয়ে দিয়েছে। এখন স্বয়ম্বর সভায় পাঁচজনই দাঁড়িয়ে আছে, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম চারজনই একই রকম দেখতে আর পঞ্চম নল পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সেও দেখতে একই রকম। দময়ন্তী যাকে বরণ করবে সেই দময়ন্তীর স্বামী হয়ে যাবে. এটা হল গল্পের প্রথম ভাগ।

এই যে স্বামীজী দময়ন্তীর এত প্রশংসা করেছেন –তোমার আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী কেন? দময়ন্তী যখন দেখছে পাঁচজন দেবতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, তখন সে মনে মনে প্রার্থনা করছে – *হংসানাং বচনং শ্রুত্বা যথা মে নৈষধো বৃতঃ। পতিত্বে তেন সত্যেন দেবাস্তং প্রদিশন্তু মে।* ।৩/৪৭/১৭। আমি হাঁসের মুখে বর্ণনা শুনে মনে মনে নল রাজাকে স্বামী রূপে বরণ করেছি। আমার এই যে পাতিব্রত, মনে মনে নলকে যে স্বামী রূপে বরণ করেছি, এই সত্যের প্রভাবে দেবতারাই যেন আমাকে বুঝিয়ে দেন কে আসল রাজা নল এবং আমি যেন তাঁকেই পতিরূপে বরণ করে নিতে পারি। ভারতে সতীত্ব ধর্মের যে কি প্রচণ্ড শক্তি এটাকে কাহিনী রূপে দেখানো হয়েছে এই নল-দময়ন্তী ও সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে। সতী শব্দটা এসেছে সৎ শব্দ থেকে, যার মধ্যে সত্য আছে। সতী শব্দের এই অর্থ হয় যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা থেকেই সতীত্বের শক্তি আসে। দময়ন্তী কি বলছে 'আমি হাঁসের কথা শুধু শুনে, রাজা নলকে চোখেও দেখেনি, কিন্তু মনে মনে তাঁকে আমি আমার পতিত্বে বরণ করে নিয়েছি, সেদিন থেকে আমি সতীত্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত. আমার এই যে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এর প্রভাবে আমি যেন এই পাঁচ জনের থেকে রাজা নলকে আলাদা করে চিনে নিতে পারি, শুধু তাই নয়, দেবতারাও যেন আমার এই কার্যে সহায়তা করেন। আমার পাতিব্রতা ধর্মে যেন কোন অবমূল্যায়ন না হয়।' দময়ন্তী খুব দামী কথা বলছেন *মনসা বচসা চৈব যথা নাভিচরাম্যহম্। তেন সত্যেন বিবুধাস্তমেব প্রদিশন্তু মে।* ।৩/৪৭/১৮। আর আমি যদি মন, বাণী, ক্রিয়া এই তিনটি থেকে এবং সদাচার থেকে যদি কখনই বিচ্যুত না হয়ে থাকি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে, এই সত্যের প্রভাবে দেবতারা আমাকে নলকে যেন পাইয়ে দিতে সাহায্য করেন'।

সদাচার মানে ধর্মের আচরণ, ধর্মের আচরণ বলতে বোঝাচ্ছে গুরুজনরা যেটা করে আসছেন সেটাই সদাচার। গীতা সদাচারকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে, বলছে *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*। তোমার ধর্ম কোনটা? যে শাস্ত্রটাকে তুমি অনুসরণ করছ। কিন্তু এখানে মহাভারত বলছে সদাচার হল বড়রা যেটা পালন করে আসছেন। এই দুটোতে খুব একটা তফাৎ নেই। যেমন একজন খ্রীশ্চানের ক্ষেত্রে বাইবেলে ধর্মকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটাকে পালন করা হলে সেটাই ধর্ম হয়ে যাবে। একজন মুসলমান যখন কোরান বা হাদিসকে অনুসরণ করে জীবন যাপন করছে তখন ঐটাই তার ধর্ম। বাইবেলে ও কোরানে যেমনটি বলা আছে একজন খ্রীশ্চান ও মুসলমানকে ঐ রকমটিই করতে হবে। পালন করলে সে লক্ষ্যতে গিয়েই পৌঁছাবে। ধর্ম পালনটা হল স্বল্পকালীন প্রচেষ্টা, এই স্বল্পকালীন প্রচেষ্টাই দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টাতে নিয়ে যাবে। আমি যদি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হই তখন আমি শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতই পড়ছি। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র একজন দেহধারীর পুরুষ নন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থুলশরীরতো এখন নেই, তাহলে তাঁর ভজনা করে আমার কি হবে! যারা মুর্তিপূজার বিরোধী এবং এই নিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে। হিন্দুরা মুর্তি পূজা করে বলে তারা কি এত বোকা নাকি যে অকারণে একটা মুর্তিকে পূজা করতে যাবে! শ্রীরামকৃষ্ণের যখন ভজনা করা হচ্ছে তখন কিন্তু মানবদেহধারি রূপে একজন ব্যক্তির পূজা করা হচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন কিছু কিছু ভাবের মুর্ত রূপ, ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ, যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ এনারা সবাই কিছু কিছু ভাবের মুর্ত রূপ। যখনই কেউ এই মহামানবদের পূজা করছে বা তাঁর ভক্ত বলে পরিচয় দিতে চাইছে তখন সে ঐ মহামানবের যে ভাব সেই ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। বেশীর ভাগই লোক দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। এখন যদি কেউ ভাবে আমি এই দিনগত পাপক্ষয়ের বাইরে গিয়ে একটা নতুন জীবনকে অবলম্বন করতে চাই তখন তাকে এমন একজন মহামানবের জীবনের ছাঁচে নিজেকে ফেলতে হবে যাঁর জীবন শুধু মাত্র দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে না। আমি হলাম যেন একটা মাটির ঢেলা। এখন এই মাটির ঢেলার কোন দাম নেই। কিন্তু এই মাটির ঢেলাকে একটা আকৃতি দিতে চাইছি। তখন মাটির ঢেলাকে আগে পিটিয় পিটিয়ে ভাঙতে হবে, তারপর তাতে জল ঢেলে নরম করতে হবে, এবার একটা ছাঁচের মধ্যে ফেলে রূপ দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ এনারা হলেন একেকটি ছাঁচ আর আমরা হলাম মাটির ঢেলা। মাটির ঢেলাকে ভাঙা, তাতে জল ঢালা এটা হল ধর্মের আচরণ করা, এরপর কাদা মাটি তৈরী হলে ঐ ছাঁচে ফেলতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব, যিশুর যে ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ বা যিশুর ছাঁচে যখন ফেলা হবে তখন আমিও ঐ ভাবেরই মুর্ত রূপ হয়ে যাব। অতটা হয়তো হবে না কিন্তু দেখলেই বোঝা যাবে যে ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের পথিক। শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভাব? তুমি সত্য কথা বলবে, নিত্যানিত্য বিচার করবে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করবে, সাধু সঙ্গ করবে, নির্জন বাস করবে, ঈশ্বরের নামগুণগান করবে। যখন সে এই জিনিষগুলো করছে তখন সে নিজেকে মানে ঐ ভেজা মাটিকে আস্তে আস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের ছাঁচে তৈরী করছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, শ্রীকৃষ্ণের পূজা এগুলো আদপেই মুর্তি পূজা নয়, এগুলো সবই ভাবের পূজো, যখন তাঁর কোন মুর্তি বা ছবি রাখা হয় তখন সেই ভাবটা সহজেই বেশী করে মনে পড়ে। এখানে দময়ন্তী বলছেন মন, বাণী আর ক্রিয়া দিয়ে আমি সব সময় সদাচার করে

এসেছি। দময়ন্তীর কাছে সদাচারটা কি? দময়ন্তীর পারিবারিক পরম্পরা প্রথায় যে জিনিষগুলো পালন করা হয়ে আসছে, যেমন সত্য কথা বলবে, সবার সেবা করবে, গুরুজনদের সম্মান করবে ইত্যাদি, সেগুলোকে সে মন, বাণী ও ক্রিয়া দিয়ে পালন করে আসছে।

কিছু দিন আগে একটা বিখ্যাত ইংরাজী ম্যাগাজিনে একটা লেখাতে আধুনিক প্রজন্মকে বলতে চাইছে যদি অপরের একটু সেবা করা হয় তাহলে তোমার বিশেষ মঙ্গল হবে। কি রকম সেবার কথা বলছে? তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, কোন ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে তোমাকে রাস্তা পার হওয়ার সুযোগ করে দিল তুমি তাকে একটা থ্যাঙ্ক্যু বললে, এটাও একটা সেবা। আমাদের কত অধঃপতন হয়েছে ভাবলেই অবাক হতে হয়। আগে এটাই আমাদের স্বাভাবিক ছিল, কেউ কাউকে শিখিয়ে দিত না, বড়দের দেখেই ছোটরা নিজেদের সেইভাবে তৈরী করে নিত। কিন্তু এখন এই জিনিষগুলোকে মনে করাবার জন্য একটা ইংরাজী ম্যগাজিনকে পাঁচ পাতা খরচ করে লেখা ছাপাতে হচ্ছে। বৈদিক যুগ থেকেই আমাদের পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রচলন চলে আসছে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ মানেই হল অপরের সেবা করা। পঞ্চ মহাযজ্ঞ যে কোন হিন্দুর আবশ্যিক কর্তব্য বলেই সবাই ধরে নিয়েছিল। পঞ্চ মহাযজ্ঞ মানে, পশুপাখিকে রোজ একটু খাবারের অংশ দিতে হবে, ভিখারীকে খাওয়া দিতে হবে, অতিথিকে জল দিতে হবে ইত্যাদি। এই জিনিষগুলো আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি কিন্তু আমরাই এখন আমাদের সংস্কৃতিকে ভুলেই গেছি, এগুলোই আবার বিদেশী সাহেবদের কাছ আমাদের শিখতে হচ্ছে। এখন একটি হিন্দুও এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে কিনা বলা যায় না। আমাদের এক প্রজন্ম আগেও আমাদের বাবা-মা এনারা গরুগাড়িতেও চেপেছেন, রেলগাড়িতেও চেপেছেন, আর প্লেনেও চেপেছেন, আর অবাক হয়ে দেখতে হচ্ছে এক প্রজন্মের মধ্যে সব কিছু পাল্টে গিয়ে এখন আমরা সব পশুর স্তরে নেমে গেছি। এখন মানুষকে বলে দিতে হয় থ্যাঙ্ক্যু বলতে, ভিখারীকে দুটো টাকা দেওয়ার জন্য বলতে হয়, অপরের সেবা করা জন্য বলতে হয়। এখানে দময়ন্তী বলছেন আমি আমার পরিবারের পরম্পরাতে যা শিখেছি সেটাকেই আমি মন, বাণী আর ক্রিয়া দিয়ে সদাচার করে এসেছি।

মন হল অন্তরতম। মনে যেটা উঠছে সেটা ক্রিয়াতে গিয়ে রূপ নেয়, মাঝখানে থাকে বাণী। তাই বাণীকে যদি নিয়ন্ত্রণ ও সংযম করা যায় তাহলে তার এক ধাপ চলে যায় শরীরে আরেক ধাপ চলে যায় মনে। সেইজন্য বাণীকে আগে সংযম করতে হয় আর বাণীর উপর সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, আমি কি ধরণের কথা বলছি তাতে বোঝা যাবে আমি কোন দিকে এগোচ্ছি। কথা দিয়ে এটা বোঝা যাবে না যে তার ভেতরে কি আছে, কিন্তু কথা দিয়ে বোঝা যাবে সে কোন দিকে এগোচ্ছে। যেমন ধরুন একজন মহা চালবাজ লোক, যত রকমের ছল চাতুরি করে বেড়ায় কিন্তু অন্য দিকে ধর্মে তার খুব মন আছে আর সুযোগ পেলেই ধর্মের কথা বলে। আমি তাকে কি বলব? লোকটা একটা ভণ্ড। ভণ্ড তাকে কোন দৃষ্টি থেকে বলছি? লোকটির ধর্ম কথা আর তার কাজকর্ম দেখেই বলছি। কিন্তু যদি অন্য দিক দিয়ে দেখি? লোকটার কাজকর্ম চোর ছ্যাঁচড়ের মত কিন্তু তাও সে ধর্মের কথা বলে। এখানে দেখতে হবে কোন জিনিষটার জন্য তার প্রাণ বেশী ছটফট করছে। গীতাতে বলছে সংস্কার বশতঃ মানুষ অনেক কিছু করে। যেমন বিশ্বামিত্র মেনকাকে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে গেলেন, তাতে বিশ্বামিত্রের কি পতন হয়ে গেল? যে দম্পতীরা ঠাকুরের কথামৃত পড়ে ঠিক করেছেন আমরা একটা দুটো সন্তান হয়ে যাওয়ার পর ভাই-বোনের মত থাকব। বিশ্বামিত্র কি এদের থেকেও বাজে লোক? আদপেই নয়। কারণ দেখতে হবে আমি কোনটা করতে বেশী ভালোবাসি, কোন জিনিষটার জন্য আমি বেশী ছটফট করছি। আমি চুরি চামারি করে বেড়াই, লম্পটগিরি করছি, এখন এগুলো করতে আমার ভালো লাগে কি লাগে না, যদি বলি আমার এগুলো করতে ভালো লাগে না, আমার চোখ মুখ দেখেও বোঝা যাচ্ছে আমার এগুলো ভালো লাগছে না, তাহলে বুঝতে হবে আমি এগোচ্ছি। যদি কাউকে বোকা বানিয়ে, ঠকিয়ে কারুর কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিজেকে খুব তৃপ্ত মনে হয়, খুব আনন্দ লাগে তাহলে বুঝতে হবে আমি বিপদের দিকে এগোচ্ছি। বাণী দিয়ে বোঝা যায় আমার আগাম পাটা কোথায় ফেলব। একজন লোক অনেক কিছু আজেবাজে কাজ করতে পারে, আরেকজন লোক আজেবাজে কাজ নাও করতে পারে। কিন্তু এদের দুজনের কথাবার্তা যদি শোনা হয় তাহলে বোঝা যাবে এদের দুজন কোন দিকে এগোচ্ছে। একজন ভালো লোক যদি বলে – আমি অনেক দিন সহ্য করেছি, আর সহ্য করব না, এবার আমার সন্তানের স্বার্থে আমাকে চুরি করতে হবে। বুঝে নিতে হবে সে কিন্তু এবার নোংরার দিকে এগোচ্ছে। তার মানে আবার এও নয় যে একটা জিনিষ আমার ভালো লাগে না কিন্তু তাও আমি করি। অফিসের সাহেবকে রোজ গুডমর্ণিং বলতে আমার ভালো লাগে না কিন্তু তাও বলি, এখানে মনটা এক রকম কিন্তু ক্রিয়া করছে অন্য রকম। আমরা ক্রিয়া রূপে যেটা করি মন কিন্তু সেটাতে থাকে না। কিন্তু দময়ন্তী বলছে, তিনটেই আমার সমান। এই তিনটেই মন, বচন আর ক্রিয়া সমান কার হতে পারে? অত্যন্ত উচ্চ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছাড়া এই তিনটেকে সমান ভাবে চালিয়ে যাওয়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের ক্ষেত্রে মন, বাণী আর ক্রিয়ার এই তিনটেতে কোথাও না

কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাবে। সাহেবকে আমি পছন্দ করছি না, কিন্তু রোজ সকালে আমাকে গুডমর্ণিং স্যার বলতে হচ্ছে, এখানে মন এক রকম আর ক্রিয়া অন্য রকম। গুডমর্ণিং মুখে বলছি কিন্তু মনে মনে ভাবছি শালার পাটা ভাঙলে হয়। এখন আমি যদি চাই আমার মন ও ক্রিয়াকে সমান করতে হবে তাহলে সবার আগে ঐ সাহেবকে আমায় ভালোবাসতে হবে। সত্যি কারের ভালোবাসা দিয়ে কখন আমি আমার সাহেবকে ভালোবাসতে পারব? যখন আমার মন প্রাণ চিত্ত সব সত্যিকারের শুদ্ধ হবে তবেই আমি তাকে ভালোবাসতে পারব। লর্ড মাউন্টব্যাটনের আগে ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড লিলিন্টো। তিনি যখন ভারত থেকে চলে যাচ্ছেন তখন গান্ধীজী তাঁকে জেল থেকে একটা চিঠি লিখছেন 'আপনি ভারত থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন, আমি আপনাকে বিদায় জানাবার জন্য জেল থেকে এই চিঠি লিখছি। আমরা দুজনে বন্ধু ছিলাম আর চিরদিন বন্ধুই থাকব। কিন্তু আপনার জন্য আমি অনেক কষ্টও পেয়েছি। কারণ মানবজীবনের যেটা উদ্দেশ্য সত্য কথা বলা, আপনি কিন্তু সেটাতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। আপনি আমার কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে অনেক মিথ্যে কথা বলেছিলেন, সেই কারণে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি, আমি মর্মাহত। কিন্তু তথাপি আমি আজও আপনার বন্ধুই আছি ও চিরদিন থাকবও'। একটা মানুষ কত উচ্চ অবস্থায় গেলে এই ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। গান্ধীজী বলছেন – সত্যাগ্রহ করার অধিকার একমাত্র তারই আছে যে ভেতর থেকে শুদ্ধ ও পবিত্র। শুদ্ধ ও পবিত্র যদি তুমি না হও তাহলে সত্যাগ্রহ করার কোন অধিকারই তোমার নেই, ওটা একটা প্রতারণা মাত্র। দময়ন্তীও ঠিক তাই বলতে পারছেন যে মন, বাণী ও ক্রিয়া থেকে আমি কখন অভিচরণ করিনি, আমি সদাচারে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য দেবতারাই আমাকে নলকে চিনিয়ে দিক। আমাদের সমস্যা হল আমরা সদাচারে যুক্ত নই। মনে থাকলে বাণীতে নেই, বাণীতে থাকলে কর্মে নেই, কর্মে থাকলে বচনে নেই। কোথাও না কোথাও এই তিনটের মধ্যে একটা সংযোগ বিহিন অবস্থা থেকে যায়। এই তিনটের যদি ঐকতান কারুর মধ্যে তৈরী হয় তাহলে তার মধ্যে এমন অসীম শক্তি আসবে আমরা কল্পনাই করতে পারবো না, সেই শক্তির সামনে বিশ্বের কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না। গান্ধীজীকে এক সময় বলা হয়েছিল – বৃটিশরা এই রকম ভদ্রলোক বলে আপনি সত্যাগ্রহ করতে পারলেন, কিন্তু যদি জার্মানদের হিটলার থাকত তাহলে আপনি পারতেন? গান্ধীজী তখন হেসে একটা কথা বলেছিলিনে – আপনারা বুদ্ধি দিয়ে এই জিনিষটাকে বিচার করছেন কিন্তু সত্যের যে কি অসীম শক্তি, ধর্মের যে কি অসীম শক্তি এই ব্যাপারে আপনারা কল্পনাই করতে পারেন না। আপনাদের ভেতরটা যদি পরিষ্কার থাকে আপনার সামনে কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না, সেই ইংরেজই হোক আর জার্মানই হোক। জিম করবেটের একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে। বাঘকে ধরার জন্য একটা ছাগলের বাচ্চাকে বনের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই বাচ্চা ছাগলটা বাঘ কি জিনিষ জানে না, ভয় কাকে বলে জানে না। বাঘ যখন এসেছে ছাগলের বাচ্চা মুখ বাড়িয়ে বাঘের নাকে নাক লাগিয়ে শুঁকছে। বাঘের কি গন্ধ সে জানে না। জিম করবেট তার বইতে লিখছেন, বাঘের মনে কি একটা করুণা এলো, বাঘটা ছাগলের বাচ্চাটাকে না মেরে আস্তে করে যেমনে ভাবে এসেছিল সেইভাবে চলে গেল। ছাগলের বাচ্চাটার মধ্যে এমন একটা নিরীহ নিষ্পাপ শিশুর সরলতার ভাব যে, তাই দেখে বাঘটার মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন এরাও আর বাঘটাকে গুলি করে মারল না। ঠিক এই রকম যে ভেতর থেকে সত্য, তার মধ্যে এমন একটা শক্তি থাকে যে তাকে আর কেউ কিছু করতে পারেনা। আমরা এগুলো বিশ্বাস করতে চাইনা, কারণ আমাদের ভেতরটা কপটতায় ভর্তি, সব ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমরা ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছি। আমরা যদি নিজেদের ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কত মিথ্যা কথা বলি, কত রকমের ছলচাতুরির আশ্রয় নিই, ভাবলে আমরা নিজেরাই চমকে উঠব। উচ্চস্তরের সন্ন্যাসী ছাড়া মন, বাণী আর ক্রিয়াকে সমন্বয় করে রাখা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সত্যি কথা বলতে পারব না, কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে সমাজে মারামারি লেগে যাবে। সবাইকে সমান ভাবে ভালোবাসতে হবে, সবাইকে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করতে হবে, সত্যে দৃঢ় থেকে নিজের জীবনকে আগে পরিবর্তন করতে হবে, এগুলো সত্যিই খুব কঠিন। খুব উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সাধক না হলে কখনই কারুর এই তিনটে জিনিষ মন, বাণী ও ক্রিয়া দিয়ে সত্য আচরণ করে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার শক্তি তখনই বাড়বে যখন আমি মন, বাণী আর ক্রিয়া থেকে এক। এই এক হতে গেলে আমাকে আগে বিরাট বড় সাধু হতে হবে। চ্যবন ঋষির কাহিনীতেও এই একই ধরণের ঘটনা দেখতে পাই। দময়ন্তী খুব আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করছে – 'হে দেবতাগণ, আমি প্রথম দিন থেকে নলকে স্বামী রূপে বরণ করে নিয়েছি'। এখানে দময়ন্তী কিন্তু একবারও বলছেন না যে আমি নলকে ভালোবাসি, শুধু বলছেন আমি নলকে আমার স্বামী হিসাবে বরণ করেছি। এটা একটা দিক। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে – 'আমি জীবনে কখন সদাচার থেকে সরিনি। তাই আমি প্রার্থনা করছি, এই তপস্যার প্রভাবে দেবতারা যেন নিজেরাই দেখিয়ে দেন এই পাঁচজনের মধ্যে কে নল'। এইবার লোকপাল গণ তাঁদের শক্তি দময়ন্তীকে দিয়ে দিলেন, লোকপাল হলেন যাঁরা মানুষের দেখাশোনা করেন। দময়ন্তী তখন সে লোকশক্তিকে লাগিয়েছেন। আমি যে এতদিন সদাচারে প্রতিষ্ঠিত এর জোরে আমি যেন সব পরিষ্কার বুঝতে পারি। তখন ঐটা বলতেই দময়ন্তীর মাথাটা খুলে গেছে। কাছে সত্য জিনিষটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি কি দেখছেন? এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হচ্ছে।

এই প্রার্থনা করার পর দময়ন্তী যখন ঐ পাঁচজনের দিকে অবলোকন করেছে, পাঁচজনের রূপ একই রকম কিন্তু দেবতার শরীরে কোন ঘাম নেই, শুধু একজনের শরীরে ঘাম আছে। কারণ নলের পার্থিব শরীর আর দেবতাদের তেজোময় শরীর, তেজের শরীরে ঘাম কি করে হবে। দেবতাদের চোখের পাতা নড়ছে না, কারণ পার্থিব শরীরের চোখে জলীয় কণা দ্বারা পরিষ্কার করার জন্য চোখের বিশ্রামের দরকার, কিন্তু দেবতাদের এর প্রয়োজন হয় না বলে চোখের পাতা পড়ে না। ঠাকুরের বইতে এক জায়গায় আছে, আপনি ধ্যানের গভীরে রয়েছেন, এখন একজন কেউ আপনার সামনে এসেছে আপনি কি করে বুঝবেন এই লোকটি ভূত, না মানুষ, না দেবতা, সেখানে এই কথাটা উল্লেখ করা আছে, দেবতাদের চোখের পাতা নড়ে না, চিত্রের মত চোখটা স্থির হয়ে থাকে। পাঁচজনের গলাতেই মালা আছে কিন্তু দেবতাদের গলায় যে মালা রয়েছে সেগুলি একটুও শুকনো নয়, কোথাও মালায় একটুও ধুলো বা মলিনতা লেগে নেই একবারে তরতাজা। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি সবে যেন মালাটা গাঁথা হয়েছে। কিন্তু নলের মালা দেখে বোঝা যাচ্ছে পুরনো। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, সবাই সিংহাসনে বসে আছে, কিন্তু তাদের পা মাটি স্পর্শ করছে না। দেবতাদের শরীর তেজ পদার্থ দিয়ে তৈরী। আমাদের মানুষের শরীর ভূমি অংশ দিয়ে তৈরী। পৃথিবী অংশ বেশী হওয়ার ফলে আমাদের শরীর ভারী হওয়াতে সব সময় মাটি স্পর্শ করে থাকে। আরেকটা হল দেবতাদের ছায়া পড়ছে না কিন্তু নলের ছায়া পড়ছে। তেজ শরীর যাদের তাদের এই গুলোই হবে। এরপর দময়ন্তীর আর কোন অসুবিধাই হল না, চারজনের মধ্যে একজন পুরো আলাদা হয়ে গেল। চারজনের শরীরে ঘাম নেই, তাদের মালা একেবারা টাটকা, চোখের পাতা পড়ছে না, পা মাটিতে পড়ছে না আর তাদের ছায়া নেই। ব্যস্, দময়ন্তী গিয়ে নলকে বরমাল্য পড়িয়ে দিলেন। দেবতারা এটা যেন একটা পরীক্ষা নিচ্ছিলেন, ভালোবাসাটা কি জিনিষ!

দময়ন্তী নলকে স্বামী রূপে বরণ করে নেওয়ার পর দেবতারাও খুব খুশী হয়ে গেলেন। ইন্দ্র নলকে বলছেন, 'দেখো আমরা তোমার উপর খুব খুশি। তোমাকে আমরা দূত করে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি ভেতর থেকে এত সৎ যে তুমি ইচ্ছা করলে দময়ন্তীকে সরাসরি বলেই দিতে যে আমিই নল, কিন্তু তুমি তা করোনি, তুমি আমাদের হয়ে যে কাজ করেছ সেটা একেবারেই তোমার মনের বিরুদ্ধে কিন্তু যেহেতু তুমি আমাদের কথা দিয়েছ তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তুমি যা কথা দিয়েছ সেই কাজই করেছে। দ্বিতীয়তঃ তুমি দময়ন্তীর মনের উপর এত গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে যে সে তোমাকেই বরণ করেছে। আমরা সত্যিই খুব খুশি, তোমাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন হিংসা হচ্ছে না। আমি তোমার উপর খুশি হয়ে তোমাকে দুটো করে বর দিচ্ছি। তুমি যখনই কোন যজ্ঞ করবে যেই যজ্ঞে আমি উপস্থিত থাকব আর তুমি আমাকে এই স্থূল চোখেই দেখতে পাবে'। অগ্নিদেব বললেন 'তুমি যেখানেই চাইবে সেইখানেই আমি প্রকট হয়ে যাব, তোমাকে আগুন জ্বালাতে কাঠ, অরণি এসব কিছুই জোগড় করতে হবে না'। যমরাজ প্রাণের শক্তি, তাই তিনি বলছেন 'তুমি যে রকমই রান্না করো না কেন, আমি ওর মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ রস ঢেলে দেব যার ফলে সেই রান্না সর্বোত্তম হবে'। রস দেওয়া মানে বলতে চাইছেন, যখন সব্জী বানাবে তখন সব্জীর যে শ্রেষ্ঠ রস তার মধ্যে দিয়ে দেবেন, যখন মিষ্টি বানাবে তখন মিষ্টির যে শ্রেষ্ঠ রস ওর মধ্যে যমরাজ ঢেলে দেবেন, ফলে নল যা কিছু রান্না করবে ওর মত স্বাদিষ্ট রান্না আর কোন দিন হবে না। বরুণ দেবতা বললেন 'তুমি যেখানেই জল চাইবে সেখানেই জল এসে যাবে আর তোমার মালাতে সব সময় উত্তম গন্ধ থাকবে'। নল যদি বলে এই গ্লাশে জল হোক, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাশে জল এসে যাবে, বোতল থেকে বা ট্যাপ থেকে জল ভরে আনতে হবে না। এগুলো খুব মজার জিনিষ। যোগীদের এই ধরণের অনেক সিদ্ধাই থাকে। যোগীরা বলেন, এই পৃথিবী পাঁচটা তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। যেমন বাতাস, বাতাসও পাঁচ তত্ত্ব দিয়ে তৈরী, যোগ শক্তিতে এক তত্ত্বকে আরেক তত্ত্বে রূপান্তরিত করা যায়। রসগোল্লা যে তত্ত্ব দিয়ে তৈরী বাতাসও সেই তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। যোগীদের তাই যোগ শক্তিতে বাতাস থেকে রসগোল্লা তৈরী করা কিছুই অসাধ্য নয়। কিন্তু এখানে নলকে দেবতারা বর দিচ্ছেন, দেবতাদের মাধ্যমে নলের মধ্যে ঐ শক্তিটা এসেছে।

পরে দেখতে পাবো সত্যিই এই নলই সেই নল কিনা তার জন্য তাঁকে এই পরীক্ষাগুলো দিতে হয়েছিল। এই হচ্ছে নলের বরপ্রাপ্তি দেবতাদের কাছ থেকে। রাজা নল দময়ন্তীকে পেয়ে খুবই খুশী। রাজ্যে ফিরে এলেন। নল-দময়ন্তীর এই কাহিনীতে একটা খুব মজার ব্যাপারে দেখানো হয়েছে, বলা হচ্ছে কলিযুগ রাজা নলের শরীরে প্রবেশ করে গেল। রাজা নলের সময়টা যদিও দ্বাপর যুগের কিন্তু কলিযুগ দ্বাপর যুগকে বলছে 'যদিও এখন তোমার যুগ চলছে কিন্তু রাজা নল আমাকে অপমান করেছে তাই আমি তার শরীরে গিয়ে বাস করব'। এর কিছুক্ষণ পরেই হনুমান আর ভীমের সাথে দেখা হবে, সেখানে হনুমান ভীমকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি এই চারটে যুগের কথা বলবেন। শাস্ত্রে এই সব যুগের অনেক রকম বর্ণনা পাওয়া যায়, সত্যযুগে বলা হয় তখন সব এক হয়ে যায়, বেদ এক, ধর্ম এক, জাতি এক। সত্যযুগে ধর্ম চারটে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই ধর্মের অনুশীলন করে। ত্রেতা যুগে এসে ধর্ম তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মানে ধর্মের

একটু নাশ হয়, শ্রীরামচন্দ্রের সময় হল ত্রেতাযুগ। শ্রীকৃষ্ণ হলেন দ্বাপর যুগের কিন্তু এই দ্বাপরে এসে ধর্মের দুটো পা ভেঙে যায়, লোকেরা আরেকটু ভোগের দিকে যায়। কলিযুগে এসে ধর্ম একটি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ধর্মের তো কখন বিলোপ হয় না, ঐ এক পায়েই কোন রকমে চলতে থাকে। কলিযুগের খুব ইচ্ছে ছিল দময়ন্তীকে বিয়ে করার। দময়ন্তীকে না পেয়ে এখন দ্বাপরের অনুমতি নিয়ে নলের শরীরের মধ্যে কলিযুগ প্রবেশ করে গেছে। অথচ নলের কোন দোষই নেই, কিন্তু কলিযুগ যে করেই হোক কায়দা করে নলকে প্রতিশোধ নেবে।

এদিকে নলের একটা মহা দোষ ছিল যে সে খুব জুয়া খেলতে ভালোবাসত। আমাদের রাজাদের বরাবরই জুয়া খেলার প্রতি আসক্তি ছিল। রাজা নলের ভাই ছিল পুষ্কর, সে আবার জুয়া খেলাতে খুব ওস্তাদ ছিল। নিজের ছোট ভাই পুষ্করের সাথে রাজা নল জুয়া খেলতে শুরু করেছে। জুয়া যখন খেলতে শুরু করেছে ভেতরে থেকে দময়ন্তী বার বার খবর পাঠাচ্ছে জুয়া খেলা এক্ষুনি বন্ধ করতে। কিন্তু রাজা নলের এমন জুয়ার নেশা দময়ন্তীর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে নিল না। শেষ পর্যন্ত রাজা নল জুয়াতে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছেন। আবার দময়ন্তীকেও প্রায় হারাতে বসেছিলেন। জুয়াতে হেরে যাওয়াতে রাজা নলকে এখন রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আগে থাকতেই দময়ন্তী বুঝে গিয়েছিল যে এই গোলমালটা হতে যাচ্ছে, এদের দুটো বাচ্চা ছিল, এইসব হওয়ার আগে কোন রকমে বাচ্চাগুলিকে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একদিন নয়, অনেক দিন ধরে এই জুয়া খেলা চলছিল, দময়ন্তী অনেক ভাবে নলকে জুয়া খেলা থেকে নিবৃত্ত হতে চেষ্টা করে গেছেন, কিন্তু রাজা নলকে কলিযুগ খেলাচ্ছে, কে কার কথা শুনবে।

রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর এইবার তাদের পথ চলা শুরু হল। সত্যিকারের কাহিনী যেগুলিকে বলা হয় তার মধ্যে নল-দময়ন্তীর এই কাহিনী অনন্য সাধারণ। মহাভারতের যদি কোন কাহিনীকে কাব্যিক উপন্যাস বলতে হয় তাহলে একমাত্র এই নল-দময়ন্তী কাহিনীকেই তা বলা যাবে। যদি কখন সম্ভব হয় শুধু নল-দময়ন্তীর কাহিনীটা সবারই একবার পড়া উচিৎ। এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয় পুরো কাহিনীকে বলা।

নল-দময়ন্তী দুজনে এখন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় আর যাবে, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না কাউকে। বাচ্চা দুটোকে তাদের দাদুর বাড়িতে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোন আস্তানা নেই গাছের তলায় মাটিতেই শয়ন করে। কোন খাওয়া নেই দাওয়া নেই, কি আর খাবে কেই বা তাদের খেতে দেবে, হাতে তো কানাকড়ি নেই। এইভাবে একদিন রাত্রিতে তারা দুজনে মাটিতে শুয়ে কাটিয়েছে। ভোর হতে চলেছে। ভোরের আবছা অন্ধকার মেশানো আলোতে নল দেখছে কিছু পাখি, যাদের ডানাগুলো সোনার, নদীর তীরে বসে আছে। তখন নল ভাবলো নিজে যে কাপড়টা পরিধান করে আছে সেই কাপড়টা দিয়ে পাখিগুলোকে কোন রকমে যদি ফাঁসিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে ঐ পাখি বিক্রী করে কিছু টাকা পেলে তখন কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যেমনি নল পাখিগুলোর উপর কাপড়টা ফেলেছে, পাখিকগুলো নলের কাপড় শুদ্ধু উড়ে গেছে। পাখিরা বলছে 'রাজা আমরা কিন্তু পাখি নই, আমরা হলাম সেই পাশা, যে পাশা খেলাতে হেরে তোমার আজ এই দুর্গতি। তোমাকে আরও সঙ্কটে ফেলার জন্য আমরা এই পাখির রূপ নিয়েছিলাম'। মূল কথা হল রাজা নলের এখন পরিধানের কাপড়টাও চলে গেছে। বেচারা আর কি করবে। রাজা নল এর আগেই দময়ন্তীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল কোন দিকে গেলে কোন রাজ্য, কোন পথে গেলে নিরাপদ ইত্যাদি। রাত্রিবেলা দময়ন্তী যখন ঘুমিয়েছে তখন নল একটা কোষ মুক্ত তলোয়ার দিয়ে দময়ন্তীর পরনের শাড়ীটাকে অর্দ্ধেক কেটে নিয়ে দময়ন্তীকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই দময়ন্তী দেখছে তার শাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ নেই, আর নলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দময়ন্তী একা একা অসহায়ের মত অনেকক্ষণ খুব কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু কোথায় নল? নল কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। দময়ন্তী এখন এক একা অসহায় নারী।

ইতিমধ্যে একটা অজগর সাপ দময়ন্তীকে খেতে এসেছে। দময়ন্তী খুব চিৎকার করছে, তাঁর চিৎকার শুনে একজন স্থানীয় আদিবাসী ব্যাধ এসে একটা অস্ত্র দিয়ে অজগর সাপটাকে মেরে দময়ন্তীকে রক্ষা করেছে। এই আদিবাসী লোকটি দময়ন্তীকে এই নির্জন স্থানে একা দেখে খুব অবাক হয়ে গেছে, আর দময়ন্তীর ঐ রূপ দেখে সে খুব আকৃষ্ট হয়ে গেছে। এখন সে এসে দময়ন্তীকে বলতে চাইছে আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি, তাই তুমি এখন আমার বাড়িতেই চল, তুমি এখন আমার। দময়ন্তী তখন আদিবাসী লোকটাকে সাবধান করে দিচ্ছে, তুমি মনে এই কুভাব একেবারেই আনবে না। লোকটি দময়ন্তীর কথা কিছুতেই শুনবে না, না শুনতেই দময়ন্তী খুব জোর রেগে গেছেন। দময়ন্তী বলছেন – *যথায়াং নৈষধান্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। তথায়ং পততাং ক্ষুদ্রঃ পরাসুর্মৃগজীবনঃ।।*৩/৫২/৩৮ 'আমি রাজা নল ছাড়া অন্য

কোন পুরুষের চিন্তা যদি স্বপ্নেও না করে থাকি তাহলে এই ব্যাধ প্রাণশূন্য হয়ে ভূতলে পতিত হোক'। এই বলেই অভিশাপ দিতেই ঐ ব্যাধ সঙ্গে সঙ্গে ঐখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আবার বলছে যে ব্যাধ যেন আগুনে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল। দময়ন্তী সত্যে এমন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড যোগশক্তি চলে এসেছিল। যোগশাস্ত্রে আছে যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত তার *সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বাম্*, তার আর কাজ করতে হয় না, কাজ না করেই সেই কাজের ফল সে পেয়ে যায়। একটা লোক আমার শ্লীলতাহানী করতে এসেছে, এখন এই লোকটাকে মারার জন্য তার তলোয়ার দরকার, তীর দরকার বা বিষ দরকার, কিছু একটা দরকার। কিন্তু দময়ন্তী সত্যে এমন প্রতিষ্ঠিত শুধু বলল এই লোকটা থেকে আমার রক্ষা হোক, তাতেই লোকটা মরে গেল। ঠিক তেমনি এর আগেও দময়ন্তী যখন বলল আমি যেন রাজা নলকে চিনতে পারি। ঐ পাঁচজনের থেকে দময়ন্তী ঠিক নলকে চিনে নিতে পেরেছিল।

এরপর অনেক কাহিনী আর খুবই গতিময় কাহিনী। সব শেষে একটা বণিক দলের সঙ্গে তার দেখা হলো। তারা বাণিজ্য করতে চলেছে। তাদের সঙ্গে তার আলাপ হলো। ওদেরকে দময়ন্তী বলল আমি অমুক রাজ্যে যেতে চাই, মানে নিজের পিতার রাজ্যের কথা বলল। কিন্তু তাদের সাথে ঘুরতে ঘুরতে দময়ন্তী একটা রাজ্যে এসে পোঁছেছে। এখনও তার সেই অর্দ্ধেক শাড়ী, চুল উশকোখুশকো, বাচ্চারা একটা পাগলী ভেবে দময়ন্তীর পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে আর উত্যক্ত করে যাচ্ছে। এদিকে ঐ রাজ্যের রানী দময়ন্তীকে দেখে বলছে 'এই মেয়েটির কোন বিপদ হয়েছে এর সাহায্যের দরকার, শীঘ্রই একে ধরে নিয়ে এসো'। দময়ন্তীকে ধরে রানীর কাছে নিয়ে আসা হলে রানী দময়ন্তীর পরিচয় জানতে চাইছে। তখন দময়ন্তী বলছেন 'একটা ছায়া যেমন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ঠিক তেমনি আমি আমার স্বামীকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে চলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার স্বামী জুয়া খেলাতে সর্বস্বান্ত হয়ে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন'। তখন রানী তাকে তার কাছে থাকতে বলল। দময়ন্তী নিজেকে স্বৈরিন্ধ্রী জাত বলে পরিচয় দিয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদীও এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট রাজার রাজমহলে নিজেকে স্বৈরিন্ধ্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল। স্বৈরিন্ধ্রীদের কাজ হল সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়েদের চুলের কারুকাজ করে দেওয়া। দময়ন্তী বলছেন *উচ্ছিষ্টং নৈব ভুঞ্জীয়াং ন কুর্য্যাং পাদধাবনম্। ন চাহং পুরুষানন্যান্ প্রভাষেয়ং কথঞ্চন্।।৩/৫৩/১৯৭*। 'আমি এখানে থাকতে পারি কিন্তু এখানে থাকার জন্য আমার কিছু শর্ত আছে। আমি স্বৈরিন্ধ্রী হতে পারি কিন্তু আমি কোন দিন কারুর উচ্ছিষ্ট কিছু খাবো না'। উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে এই কড়া আপত্তি একমাত্র হিন্দুদের মধ্যে একটা উচ্চ ধারণা রূপে বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। হিন্দুদের মধ্যে এই ধারণা হয়ে আছে যে, যদি কেউ কারুর উচ্ছিষ্ট খেয়ে নেয় তাহলে তার সব শেষ হয়ে গেল। এখন অবশ্য উচ্ছিষ্টের ব্যাপারটা হিন্দুদের মধ্যে অনেক শিথিল হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু দিন আগেও এই ব্যাপারে হিন্দুদের খুব কড়া মনোভাব ছিল। দময়ন্তীও তাই বলছেন 'আমি কারুর উচ্ছিষ্ট কিছু খাবো না, দ্বিতীয় আমি কারুর পা ধুইয়ে দেব না'। কারুর পা ধুয়ে দেওয়া মানে নিজেকে একেবারে নীচে নামিয়ে দেওয়া। তৃতীয় বলছেন 'কোন পুরুষের সঙ্গে আমি কথা বলব না, আর যদি কোন পুরুষ আমার প্রতি কুদৃষ্টি বা আমাকে পাওয়ার চেষ্টা করে তাকে কিন্তু প্রাণদণ্ড দিয়ে দিতে হবে'। স্বৈরিন্ধ্রীর অবস্থায় দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই উল্টো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দময়ন্তীর ক্ষেত্রে দময়ন্তীর উপর এই ধরণের কোন আক্রমণ হয়নি। যাই হোক দময়ন্তীর একটা আস্তানা হয়ে গেছে।

এদিকে রাজা নল একা একা চলেছে। চোখে জল। সব কিছুই হারিয়েছে। রাজা একা একা যাচ্ছেন, পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন একটা জঙ্গলে আগুন জ্বলছে আর একটা সাপ চিৎকার করছে –আমাকে বাঁচাও নল, বাঁচাও। কাহিনীটা হলো, সে একটা অভিশপ্ত সাপ। নল এগিয়ে গেছে, দেখছে আগুনের লেলিহান শিখা কিছুক্ষণের মধ্যেই এই নাগকে গ্রাস করে নেবে। নল জিজ্ঞেস করছে তোমার কি পরিচয়, নাগ তখন বলছে যে আমার নাম কর্কোটক। ক্যান্সারের বাংলা নাম কর্কট। কর্কোটকের বিষ সাঙ্ঘাতিক, ওর বিষ যে কি মারাত্মক কেউ কল্পনা করতে পারবে না। এখন আগুন লেগে গেছে, সে পালাতে পারছেনা, কিছুক্ষণের মধ্যেই পুড়ে যাবে। নল তাকে বলছেন 'তুমি এই আগুনের থেকে পালাও, তাহলেই তো বেঁচে যাবে'। কর্কোটক বলছে 'আমার উপর এক ঋষির অভিশাপ আছে, তাই এই গাছের তলা থেকে আমি নড়তে পারবো না'। নল বলছে 'তোমার শরীর এত বিশাল আর ভারী আমি তোমাকে কি করে টেনে সরাব'? কর্কোটক বলছে 'না, আমার সেই ক্ষমতা আছে আমি নিজেকে ছোট করে নিতে পারি, শরীরটা ছোট করে দিলেই আমি হাল্কা হয়ে যাব। আপনি যদি আমার জীবন রক্ষা করেন তাহলে তার বিনিময়ে আমিও আপনার উপকারে আসব'। কর্কোটক শরীরটাকে ছোট করে দিতেই নল যেমনি তুলতে গেছে দেখছে নাগ একেবারেই হাল্কা। নল নাগকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সাপটাকে তুলে আগুনের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে অনেক দূরে রেখে দিল। এবার কর্কোটক আর রাজা নল

চলেছেন। কর্কোটক নলকে বলছে 'হে নৈষধরাজ', নিষাদ বলে পশ্চিমের দিকে একটা রাজ্য ছিল আর নল ওখানকার রাজা ছিলেন বলে তাঁকে নৈষধরাজ বলে সম্বোধন করছে। 'আপনি যে চলেছেন, আর পা ফেলছেন, আপনি পা গুনে গুনে ফেলুনতো'। কর্কোটক বন্ধুর মত ভালোবেসে বলেছে বলে রাজা নলও একম্ দ্বয়ম্ বলে বলে পা ফেলতে ফেলতে চলেছেন। এইভাবে বলতে বলতে যেই দশ এসেছে রাজা নলও সংস্কৃতে যেমনি দশম্ বলেছেন আর কর্কোটক নাগ সঙ্গে সঙ্গে ছোবল দিয়েছে। সংস্কৃতে দশমকে শোনাচ্ছে দংশন। রাজা নল যেন বলতে চাইছেন 'হে কর্কোটক তুমি আমাকে দংশন কর'। কর্কোটককে নল বাঁচিয়েছে সেইজন্য তাঁর বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে নাগ কখন আমাকে দংশন করবে না। কিন্তু কর্কোটকের ভাব যেন হল, তুমি যদি আমাকে দংশন করতে বল তাহলেই আমি তোমাকে ছোবল দেব। যেমনি রাজা নল বলেছেন দশম্ তেমনি বুম্ করে এসে সে ছোবল দিয়েছে। রাজা নলের গায়ের রঙ ছিল একেবারে ধব্‌ধবে সাদা। কর্কোটক দংশন করতেই রাজা নলের গায়ের রঙটা একেবারে নিগ্রোদের মত কালো হয়ে গেছে, সাথে একটু খর্বাকৃতিও হয়ে গেছেন। কর্কোটক বলছে 'তুমিতো আমাকে বললে দংশন করতে, তাই আমি তোমাকে দংশন করেছি'। নল তাকে বলছে 'এটা আপনি কি করলেন'? তখন সাপটা বলছে 'আমি জানি আপনি আমার উপর খুব রেগে যাবেন, কিন্তু আমি জানি আপনি খুব বিপদে পড়ে আছেন, আসলে আমি বিরাট উপকারই করলাম। এই যে আপনার চেহারাটা পুরো পাল্টে গেল এর ফলে আপনাকে আর কেউ চিনতে পারবে না। আপনি এখন অমুক রাজ্যে চলে যান সেখানে আপনি এই এই কাজ করবেন। আর আপনার যা কিছু গোলমাল চলছে তার কারণ আপনার ভেতরে কলি যুগ ঢুকে বসে আছে। এ আপনাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবেনা। আপনার রাজ্যে এবং আপনার যা ঘটনা ঘটেছে, আমি সব জানি। কিভাবে আপনি রাজ্য হারিয়েছেন, বউ হারিয়েছেন, বাচ্চাদের হারিয়েছেন আমি সব জানি, কিভাবে কাপড় চুরি গেছে সবই আমার জানা। আপনি অত্যন্ত ভালো লোক তাই আপনাকে সাহায্য করার জন্যই এই বিষ ঢেলে দিয়েছি। কলিযুগ. এই যে আপনাকে এখন ছোবল মারলাম এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু আমার বিষ আপনার শরীরে ঢুকে ওকে এবার জ্বালাতে শুরু করেছে। আমার এই বিষটা গিয়ে এই পাপ কলিকে এত জ্বালান জ্বালাবে যে ও শেষ পর্যন্ত দগ্ধ হয়ে এখন মরবে। এক সময় প্রাণ ভয়ে আপনাকে ছেড়ে পালাবে। যেদিন কলি আপনাকে ছেড়ে পালাবে তখনই আপনার আবার সব কিছু আগের মত হয়ে যাবে। আপনাকে এই বস্ত্রটা দিলাম, যে দিন আপনি এই বস্ত্রটা আপনার শরীরে জড়াবেন তখনই আপনার পূর্ব রূপ ফিরে পাবেন। কিন্তু সব কিছু আগের মত না হওয়া পর্যন্ত আপনি এই বস্ত্র জড়াবেন না, তাহলে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে'। রাজা নলের কাছে পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন স্বপ্নের মত অবাক লাগছে। আসলে এখানে বলতে চাইছে যে আমাদের ভেতরে অনেক পাপ জমে থাকে, এই পাপ সহজে যায় না। যতক্ষণ পাপ থাকবে ততক্ষণ আমরা কোন ভালো কাজই করতে পারবো না। ভেতরের এই পাপকে আগে দূর করতে হবে।

ঠাকুরের জীবনেও এই ধরণের কাহিনী পাওয়া যায়। ঠাকুর যখন ধ্যানে বসতেন, একদিন দেখছেন তাঁর শরীর থেকে একটা পাপ পুরুষ বেরিয়ে এসেছে, আর ঠিক তখনই একজন ভৈরবও বেরিয়ে এসেছে। পাপ পুরুষকে দেখেই ভৈরব ত্রিশুল দিয়ে সেই পাপ পুরুষকে মেরে দিলেন। কর্কোটকের আর নলের এই কাহিনীকে আমরা বিশ্বাস নাও করতে পারি, এমনকি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যে দর্শন হয়েছিল সেটাকেও বিশ্বাস না করতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য এটাই যে ঠাকুরের এই সব কাহিনী গুলি জানার কোন সম্ভবনাই ছিল না বিশেষ করে এতো বিস্তারিত ভাবে। সূক্ষ্ম স্তরে গেলে তখন বোঝা যায় কোথাও ঠাকুরের দর্শন আর ব্যাসদেবের কল্পনাই হোক আর যাই হোক একটা মিল রয়েছে। ব্যাসদেবের মনেও কোথাও এই পাপ পুরুষ বলে যে আমাদের ভেতরে থাকে, যার নাশ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে না, এই চিন্তাটা ছিল। তাকে নাশ করব কিভাবে? আরেকটা উচ্চ বাহ্যিক শক্তি এসে এই পাপ পুরুষকে নাশ করে। আমরা সঠিক জানিনা এটা হয়েছিল কিনা, কিংবা ব্যাসদেবেরও ঠাকুরের মত কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল, সেটাকেই তিনি এই পৌরানিক কাহিনীর মাধ্যমে ব্যক্ত করছেন।

তারপর রাজা নল ঋতুপর্ণ নামে এক রাজার কাছে গিয়ে বলল 'আমি ঘোড়ার ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ আপনি আমাকে ঘোড়াদের দেখাশোনার কাজ দিন'। ঋতুপর্ণ কথা বলে বুঝলেন লোকটি ঠিকই বলছে। রাজা নলকে চেনাও যাচ্ছে না, কালো কুচকুচে আদিবাসীদের চেহারার মত হয়ে গেছে। রাজা নল এত বড় রাজা সে এখন ঋতুপর্ণের ঘোড়া দেখার কাজ নিয়েছে। রাজা নলের একটা আস্তানা মোটামুটি হয়েছে, সব কাজকর্ম করে যাচ্ছেন কিন্তু মন সব সময় দময়ন্তীর কাছে পড়ে থাকে। দময়ন্তী যে এখন কোথায় আছে, কিভাবে আছে, এই চিন্তায় খুব অধৈর্য হয়ে পড়ে। এদিকে দময়ন্তীর বাবার কাছে খবর এসেছে রাজা নল জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দময়ন্তীর বাবা খবর পেতেই সব ব্রাহ্মণদের বলে দিলেন আপনারা খোঁজ করে দেখুন দময়ন্তী এখন কোথায় আছে। ব্রাহ্মণদের সব জায়গায় অবারিত দ্বার। ব্রাহ্মণরা একটা জায়গায় গিয়ে দময়ন্তীকে ঠিক চিনতে পেরেছে। দময়ন্তীর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ওর দুই ভ্রুর মাঝখানে

একটা তিল ছিল। দময়ন্তী ইচ্ছে করে যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে ঐ তিলের উপর ময়লা লাগিয়ে রাখত। ব্রাহ্মণরা গিয়ে জোর করে ঐ ময়লা পরিষ্কার করতেই ধরে ফেলেছে যে এই দময়ন্তী। আর যে রানীর কাছে দময়ন্তী আশ্রয় নিয়েছিল সে তার সম্পর্কে মাসি ছিল, দময়ন্তী সেটা আবার জানত না। রানীকে ব্রাহ্মণরা বলতেই দময়ন্তীর মাসি বলছে 'আমরা তো অনেক দিন আগে থেকেই শুনে এসেছিলাম দময়ন্তীর ভ্রুর মাঝখানে একটা দাগ আছে, যেটা ইঙ্গিত করে যে দময়ন্তী চির সৌভাগ্যবতী হবে'।

এরপর দময়ন্তীকে তার পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাপের বাড়িতে এসে দময়ন্তীর বসে বসে পরিকল্পনা করে চলেছে কিভাবে নলকে খুঁজে বার করা যায়। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সব ব্রাহ্মণদের ডেকে বলা হল সব রাজ্যে গিয়ে রাজসভাতে এই কবিতাটা পাঠ করতে। যাতে বলা হচ্ছে তুমি কেমন স্বামী নিজে জুয়া খেলায় সব কিছু হারিয়ে নিজের স্ত্রীকেও ত্যাগ করে আছ, স্ত্রীর খোঁজ পর্যন্ত নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছ। হাজারে হাজারে ব্রাহ্মণকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোথাও থেকে কোন সারা পাওয়া যাচ্ছে না। যে ব্রাহ্মণ ঋতুপর্ণের রাজসভাতে গিয়েছিল যেখানে রাজা নল বাহুক নাম নিয়ে ঋতুপর্ণের দরবারে চাকরি করছে, ব্রাহ্মণের কবিতা শোনার পর বাহুক একটা জবাব দিয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে অসহায় অবস্থায় পতিত হয়ে গেলে মানুষ এই রকমই করে, তবে যারা উত্তম বংশের স্ত্রী তারা নিজেকে রক্ষা করতে জানে। পরোক্ষ ভাবে রাজা নল ব্রাহ্মণের মাধ্যমে দময়ন্তীকে একটা বার্তা দিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ কিছুই বুঝতে পারেনি। দময়ন্তীর কাছে এসে সেই ব্রাহ্মণ বাহুকের এই কথাগুলো বলেছে। দময়ন্তী সব শুনেই একটু আলো দেখতে পেয়েছেন। দময়ন্তী জিজ্ঞেস করছেন ঐ বাহুককে কি রকম দেখতে। চেহারায় যদিও বা একটু মিল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু গায়ের রঙের ব্যাপারে কোন মিলই নেই। তবুও দময়ন্তী বলছেন, এই বার্তা যে দিয়েছে আমাদের উচিৎ আরও ভালো করে এই লোকটির ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া এই লোকই রাজা নল কিনা। এইবার দময়ন্তী একটা কৌশল অবলম্বন করেছে। বাবাকে বলছেন 'বাবা আমি আবার স্বয়ম্বর সভাতে বসব কিন্তু এই স্বয়ম্বর সভার খবর একমাত্র রাজা ঋতুপর্ণের কাছেই যাবে'। ঋতুপর্ণের কাছে দূত মারফৎ খবর পাঠানো হয়েছে আগামীকাল দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হবে কারণ রাজা নলের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না, সেই স্বয়ম্বর সভাতে আপনাকেও আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল ঋতুপর্ণের রাজ্য থেকে দময়ন্তীর রাজ্যের দূরত্বটা এমন যে সেখানে আজ রওনা হলেও কোন ভাবেই দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভার আগে পৌঁছান যাবে না। দময়ন্তী হিসেব করে দেখেছে এই ভারতবর্ষে রাজা নল ছাড়া আর কেউ রথ চালিয়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করে ঠিক সময়ের আগেই এখানে পৌঁছাতে পারবে না। দময়ন্তীর আরেকবার স্বয়ম্বর হচ্ছে এই খবর শুনে এদিকে ঋতুপর্ণের মাথা গেছে ঘুরে। ঋতুপর্ণ এখন সব সারথিকে জিজ্ঞেস করে বুঝে গেছে এরা কেউই তাকে এই দূরত্ব অতিক্রম করে ঠিক সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না। তখন ঋতুপর্ণ বাহুককে ডেকে জিজ্ঞেস করছে 'তুমি তো সব ঘোড়ার খবর রাখ, তুমি কি পারবে দময়ন্তীর রাজ্যে আমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে'? বাহুক রাজাকে জিজ্ঞেস করছে 'হঠাৎ কি কারণে আপনি ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে দময়ন্তীর ওখানে যেতে চাইছেন'? ঋতুপর্ণ তখন দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের খবর দিতেই বাহুক খুব ভেঙে পড়েছে। আমার স্ত্রী স্বয়ম্বর সভাতে বসতে যাচ্ছে, এটা কি করে সম্ভব! মনে মনে ভাবলেও মুখে সে বলল 'হ্যাঁ, আমি নিয়ে যেতে পারব'। বাহুক তখন ঘোড়া বাছাই করতে গেল। চারটে ঘোড়াকে বাছা হল, কিন্তু ঘোড়াগুলো সেই রকম হৃষ্টপুষ্ট ছিল না। ঐ ঘোড়া দেখে রাজা ঋতুপর্ণ খুব রেগে গেছে 'তুমি কি ঘোড়া সব বাছাই করেছ, এই ঘোড়া নিয়ে তুমি কি করে পৌঁছাবে'! নল অশ্ববিদ্যাটা খুব ভালো করেই রপ্ত করেছিলেন। অশ্ববিদ্যা একটা খুব নামকরা বিদ্যা। পরে দেখা যাবে সহদেব ও নকুলও অশ্ববিদ্যায় বিশারদ ছিলেন, বিরাট রাজার দরবারে অজ্ঞাতবাসের সময় এই অশ্ববিদ্যাকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন। নল বলছেন 'রোগা প্যাটকা দেখে ঘোড়ার বিচার হয় না, ঘোড়ার শরীরের কাঠামো দেখেই ঠিক করা হয় কোন ঘোড়া বেশী জোরে ছুটবে, যে ঘোড়ার শরীরের তিনটে অংশে ঢেউ খেলানো থাকে সেই ঘোড়া বেশী জোরে দৌড়াতে পারে। আমি যে ঘোড়াগুলো বেছেছি এই ঘোড়াগুলোই আপনাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে দেবে। আর আমার ঘোড়া যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে আপনিই বলে দিন কোন ঘোড়াগুলো নিতে হবে সেই ঘোড়াই নিয়ে যাওয়া হবে। তখন কিন্তু পৌঁছতে না পারার জন্য আমাকে দোষ দিতে পারবেন না, এরপর আপনার দায়ীত্ব এসে যাবে'। ঋতুপর্ণ মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন বটে কিন্তু মুখে কিছু বললেন না, কারণ রাজাও ভালো করেই জানেন এই দূরত্বকে চব্বিশ ঘন্টায় অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ঋতুপর্ণ বাহুকের উপরই সব কিছু ভরসা করে ছেড়ে দিলেন।

এইবার নল রথ চালান শুরু করেছে। নল এমন বেগে রথ চালিয়েছে যে রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন যে বাহুক খুব বেগে রথ চালাতে পারে, কিন্তু এইরকম তীব্র গতিতে যে চালাতে পারে বুঝতে পারেনি। রাজা নল এত বেগে রথ চালিয়েছে যে একটু অসাবধনতার জন্য হাওয়ার তোড়ে ঋতুপর্ণের উত্তরীয় উড়ে চলে গেল। উত্তরীয়টা উড়ে

যেতেই ঋতুপর্ণ বলছে ‘বাহুক! আমার উত্তরীয়টা উড়ে গেছে, রথটাকে একটু দাঁড় করিয়ে আমার উত্তরীয়টা নিয়ে এসো’। তখন বাহুক বলছে ‘হে রাজা! ঐ উত্তরীয় পাওয়ার আশা আপনি ছেড়ে দিন, আপনি যখন বললেন আপনার উত্তরীয়টা নিয়ে আসতে, সেই সময় থেকে এর মধ্যে আমরা চার ক্রোশ দূরে চলে এসেছি। উত্তরীয়টাকে আনতে গেলে রথ থামিয়ে যেতে হবে তার ফলে আপনাকে আর ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে না’। চার ক্রোশ মানে আট মাইল। রাজার চাদর উড়ে গেছে আর রাজা বলেছে এইটুকু সময়ের মধ্যে আট মাইল মানে চৌদ্দ পনের কিলো মিটার পথ চলে এসেছে। রাজধানীর চাইতেও বেশী গতিতে যাচ্ছে। বাহুক একেবারে হিসেব করে বলে দিচ্ছে যে তারা ঐটুকু সময়ের মধ্যে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছে। ঋতুপর্ণ অবাক হয়ে চুপ করে গেছে। কেননা আবার অতটা পথ গিয়ে চাদর আনতে গেলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে। রাজার মাথায়তো দময়ন্তী ঘুরছে, তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে চাইছে। অন্য দিকে এটাও ঋতুপর্ণ ভাবছে দূরত্বের এত নিখুঁত হিসেব রাজা নল ছাড়া আর কারুর পক্ষে বলা অসম্ভব। রাজা নলকে সবাই জানত, কিন্তু রাজা নলের গায়ের রঙ এই রকম মিশকালো ছিল না।

এবার ঋতুপর্ণ নিজের কেরামতি দেখাতে চাইছে। যেতে যেতে পথে বিভীতক নামে একটা অভিশপ্ত গাছ (বয়ড়া জাতীয় গাছ) পড়েছে, যাতে অনেক ফল ফলে রয়েছে। রাজা ঋতুপর্ণ নলকে বলছে ‘বাহুক, তুমি নিজেকে খুব ওস্তাদ মনে কর তাই না। সবাই সব বিদ্যা জানেনা গণনাতে আমিও কম যাইনা’। বাহুক ঋতুপর্ণকে শুনিয়ে দিয়েছিল যে এত কিলোমিটার চলে এসেছি। রাজা বলছে ‘আমিও কিন্তু গণনাতে ওস্তাদ, ঐ যে গাছটা দেখছ ওতে কটা পাতা, কটা ফল, কটা ডাল, কটা ফুল আছে আমি এক নজর দেখেই বলে দিতে পারবো’। এরপর খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন ‘সবাই সব বিদ্যা জানেনা, এই জগতে সবাই সব কিছুর খবর জানেনা আর এই জগতে কেউ এমন নেই, যে বলতে পারে আমি সর্বজ্ঞ আর একই পুরুষের মধ্যে সব রকমের বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়না’। ঋতুপর্ণ রাজা বলে কথা, এখন সারথির ক্ষমতা দেখে ওর কাছে ছোট হয়ে গেছে বলে মনে করতে পারে। তাই সারথিকে বলছে ‘তুমিই যে সব কিছু জানো, তা নয়, আমিও কিছু জানি। তোমার মধ্যেই যে সব বিদ্যা আছে ভেবোনা, আমার মধ্যেও এমন বিদ্যা আছে তা দেখলে তুমিও চমকে যাবে’। এই বলে রাজা বলছে ‘ঐ গাছটার উপরে এত ফল আছে, গাছের নীচে এত ফল পড়ে আছে, গাছের এত ডাল আছে, গাছে এত পাতা আছে, গাছের নীচে এত পাতা ঝরে পড়ে আছে’ – সব চট জলদি করে বলে দিল। রাজা নলতো চমকে গেছে, তখন সে রাজাকে বলছে ‘হে রাজা, আপনি কিছুক্ষণের জন্য লাগামটাকে ধরুন, আমি দেখে নিতে চাই আপনি ঠিক বলছেন কিনা’। রাজা বলছে ‘না না, এখন আমাদের সময় নেই’। কিন্তু রাজা নলতো বুঝতে চাইছে। তখন রাজা বলছেন ‘এত সময় নষ্ট করার কি দরকার, তুমি বরং গাছের একটা ডাল কেটে নাও আর ঐ ডালে কত ফল, কত পাতা, কটা ডাল আছে আমি বলে দিচ্ছি, তারপর তুমি সেইটা থেকে গুণে নিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে’। তখন নল তাই করল। রাজা ঐ ডালের কত পাতা ও ফল বলে দিল। নল গুনে দেখে ঠিক তাই আছে। নলতো অবাক, এই এক নজরের মধ্যে কি করে একেবারে নিখুঁত হিসাব করল। রাজা বলছে ‘আশ্চর্য হবার কিছু নয়, আসলে আমি দ্যুত ক্রীড়ায় a great master’। এবারে দুজনের মধ্যে একটা চুক্তি হল, বাহুক ঋতুপর্ণকে শেখাবে অশ্ববিদ্যা আর রাজা ঋতুপর্ণ নলকে শেখাবে জুয়া বিদ্যা। ঋতুপর্ণ ছিল জুয়া খেলার একেবারে মাস্টার, জুয়া খেলার বিদ্যাটা পুরোপুরি অঙ্ক আর সংখ্যার উপর দাঁড়িয়ে। জেমস্ জয়েস নামে একজন নামকরা ইংরেজ লেখক, তিনি gambling কে নিয়েই একটা বই লিখেছিলেন। সেই উপন্যাসে একজন Accountant এর কাহিনী আছে। সে কিভাবে একটা জুয়ার আড্ডায় পৌঁছে গেছে, সঙ্গে তার বউও ছিল। বউকে বলছে ‘আমি এখানে জুয়া খেলব’। বউ বলছে ‘লোকেরা বলে এখানে এসে সবাই হেরেই যায়’। তখন ও বলছে ‘পার্থক্য হল, সবাই আমার মত অঙ্ক বিশারদ নয়’। তারপর খেলা শুরু হলো, আর শুরুতেই সে হারতে থাকল। বউ বলছে ‘সবইতো হেরে যাচ্ছ, বাড়ি ফেরার পয়সাটাও তো থাকছেনা’। আর সে খালি বলেই যাচ্ছে ‘আরে তুমি একটু দম ধরে বসে থাকো I know the probability theory’. তারপরে ঠিক তাই হল, সে যেমন যেমন হিসেব করেছিল, তারপর দেখা যাচ্ছে সেই জিততে শুরু করেছে। জেতার মধ্যেও হারার একটা হিসেব আছে। এখন এরা যখন দেখছে লোকটা জুয়াতে জিতে চলেছে তখন অন্যরাও এর সাথে জুয়াতে নেমে পড়ছে। লোকটি জানত আমি চারটে তে যদি জিতে যাই তাহলে এর পরের দুটোতে আমি হারব, তখন এই হারটাকে পোষাবার জন্য জেতার জায়গাতে সে বেশী টাকা ঢালছে। অন্যরা তো এর হিসেব বুঝছে না, তারাও টাকা ঢেলে ডুবে যাচ্ছে। ওরা মনে করছে লোকটা বাই চান্স জিতছে, কিন্তু আদপেই না, সে পুরো গাণিতিক নিয়মানুসারেই জিতে যাচ্ছে। একদিন দুদিন পর দেখে ক্যাসাইনোতে যত টাকা ছিল সব টাকা এই লোকটা জিতে নিয়েছে।’

এরপর বাহুক এখন রথ ছুটিয়ে যাচ্ছে আর অন্য দিকে ঋতুপর্ণ তাকে পুরো রাস্তায় জুয়া বিদ্যাটা শিখিয়ে গেল। যেই জুয়া বিদ্যাটা নল শিখে নিয়েছে, এই বিদ্যাতেই নল দুর্বল ছিল আর এটাকেই আশ্রয় করে কলি যুগ রাজা নলের শরীরে ঢুকে বসেছিল, এখন কলি ভেতরে হাঁশফাঁস করতে শুরু করেছে। একেই তো কর্কোটকের বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল তার ওপর জুয়াবিদ্যাটা রপ্ত করতেই এখন কলি যুগের দম বন্ধ হয়ে আসছে। নলের শরীর থেকে এখন কলি যুগ বেরোতে চাইছে, নলকে বলছে 'আমি এখন তোমার শরীর থেকে বেরোবে'। রাজা নল তখন অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছে, কলি যুগও খুব ভয় পেয়ে গেছে। এখন কলি কোথায় থাকবে? তখন কলি ঐ বিভীতক গাছের মধ্যে ঢুকে গেল, সেই দিন থেকে বয়ড়া গাছ অভিশপ্ত গাছ হয়ে গেছে, মানুষ আর এই গাছ কোন কাজেই ব্যবহার করে না। কলি তখন বলছে, যদি কেউ আলস্য ত্যাগ করে এই নলোপখ্যান পাঠ করে তাহলে কোন দিন তাকে আমাকে নিয়ে ভয় করতে হবে না। অর্থাৎ নলের কীর্তিকথা যে পাঠ করবে তার কলি যুগ থেকে কোন ভয় হবে না। আসলে কলি যুগের এই কথার মধ্যে একটা গভীর তাৎপর্য আছে। জুয়া খেলাটা অত্যন্ত খারাপ নেশা, এই কাহিনী যখন আমরা শুনছি বা পাঠ করছি তখন এই সচেতনতা আসতে শুরু করে যে জুয়া খেলা মানুষকে একেবারে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। এই কারণেই সব মহাপুরুষরাই বলে আসছেন সব সময় শাস্ত্র পড়তে হয়, শাস্ত্র পাঠ না করলে আমাদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত হয় না, ভালো-মন্দের বিচার বোধটা আসে না। নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করতে করতে কখন শাস্ত্রের কোন্ জিনিষটা আমাদের মনকে একটা ধাক্কা মেরে উপরের দিকে ঠেলে দেবে বোঝা যায় না, সেইজন্য সব সময় নিয়মিত ভাবে শাস্ত্র পড়ে যেতে হয়। আমি কোথাও একটা ভুল করে যাচ্ছি, ভুল মানে কোথাও আমার মনে মধ্যে পাপ জমে আছে, কলি যুগ মানেই পাপ। এই ধরণের শাস্ত্র পাঠ করতে থাকলে মানুষের পাপ কর্ম করার স্পৃহাটা কমে আসে।

আবার রথ চলছে। চলতে চলতে ঠিক সময়ে দুজনেই দময়ন্তীর রাজ্যে পোঁছে গেছে। আসলে নলকে ওখানে কায়দা করে নিয়ে আসার জন্যই এই স্বয়ম্বরের নাটক ফাঁদা হয়েছিল। কোথায় স্বয়ম্বর সভা! এদিকে খবর চলে গেছে দময়ন্তীর কাছে ঋতুপর্ণকে বাহুক নামে এক সারথি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এখানে নিয়ে এসেছে। দময়ন্তী খবর পেয়েই একজন দাসীকে পাঠান হয়েছে, দময়ন্তী জানেন নল ছাড়া চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আর কেউ পোঁছতে পারবে না। দাসী বাহুককে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করে দময়ন্তীকে বলছে 'ঐ বাহুককে দেখলাম কিন্তু ওর মধ্যে কিছু উদ্ভট জিনিষ লক্ষ্য করেছি। যেমন ছোট দরজা দিয়ে যখন সে প্রবেশ করে সে কখনই মাথা নিচু করে না, রাজা কিনা, দরজাটা যেন আপনা থেকেই উঁচু হয়ে যায়। ছোট জায়গাতেও যখন থাকে তখন জায়গাটা যেন তার জন্য বড় হয়ে যায়। জল কখনই সে ভরে আনে না, জলের ঘটি সব সময় জলে পূর্ণ হয়ে আছে, কারুর কাছে আগুন চায় না, আপনা থেকেই তার কাছে আগুন এসে যায়। আপনি রান্না করে পাঠাতে বলেছিলেন এই সেই রান্না দেখুন কারুর কাছে আগুন, জল না চেয়েই এই রান্না করে দিয়েছে'। দময়ন্তী রান্নাটা মুখে দিতেই বুঝে গেছেন যে এই রাজা নল, কারণ রান্নার এই স্বাদ রাজা নল ছাড়া আর কেউ আনতে পারবে না।

দময়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে বাহুককে অন্দরমহলে ডেকে পাঠিয়েছেন। বাহুক আসতেই দময়ন্তী বলছেন 'আমি জানি তুমিই আমার স্বামী রাজা নল কিন্তু তোমার এই রকম চেহারা কি করে হল'। রাজা নল এদিকে বলছেন 'তুমি একি করতে বসেছ, তুমি কি করে আবার স্বয়ম্বর হতে চাইলে'। দময়ন্তী তখন ঐ কথাই বলছেন 'আমার চেষ্টায় আর আমার তপস্যায় কলি যুগ পরাস্ত'। কলি যুগ মানে পাপ। এই পাপ কিভাবে গেছে? দুটো ভাবে, এক তপস্যার দ্বারা আর ব্যবসায়, আমার চেষ্টায়। মানুষের মনের পাপ একমাত্র এই দুটোতেই পরিষ্কার করা যায়, মনের তপস্যা আর জাগতিক চেষ্টা। দময়ন্তী তখন হেসে বলছে 'আমি মন থেকেও কখন অসৎ আচরণ করিনি আর আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। এই ব্যাপারে সমস্ত দেবতারা আমার সাক্ষী'। এইভাবে দময়ন্তী অনেক কথা বলছেন। তখন বায়ু দেবতা এসে বলছেন 'আমি সব জায়গায় বিচরণ করি, সবারই মনের খবর আমি জানি, তাই আমি জানি দময়ন্তী যেমন সতী ছিলেন তেমন সতীই আছে'। তখন দময়ন্তীও বলল 'তোমার কোন খোঁজ না পেয়ে আমাকে স্বয়ম্বরের বাহানার এই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল'। ইতিমধ্যে রাজা ঋতুপর্ণও খবর পেয়ে গেছে যে রাজা নলই আমার অশ্বশালায় বাহুকের ছদ্মনামে কাজ করেছে, রাজা নলকে দিয়ে আমি সারথির কাজ করিয়েছি, এই সব ভেবে ঋতুপর্ণ খুব লজ্জায় পড়ে গেছে। ঋতুপর্ণ খুব ক্ষমা চেয়ে ফিরে যাবে, যাবার আগে শুধু বল 'আপনি আমাকে অশ্ববিদ্যাটা শিখিয়ে দিন'। রাজা নল তাকে অশ্ববিদ্যাটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর রাজা নল দময়ন্তীকে নিয়ে আবার তাঁর রাজ্যে ফেরত এসেছেন। এখন তো রাজা নল কলি যুগ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। রাজা নল তখন তাঁর ভাই পুষ্করকে আহ্বাণ করে বলছেন 'পুষ্কর! হয় তুমি আমার সাথে জুয়া খেল আর তা না হলে ধনুষ নিয়ে আমার মোকাবিলা কর। হয় তুমি বাঁচবে না হয় আমি বাঁচব'। পুষ্কর হেসে বলছে 'তোমার কাছে তো কিছুই নেই, জুয়া খেলাতে কি বাজী লাগাবে'? রাজা নল তখন বললেন 'আমি দময়ন্তীকেই বাজীতে লাগাচ্ছি'। এইটা শুনেই পুষ্কর তো লাফিয়ে উঠেছে 'আহারে আমার কত দিনের আশা ছিল দময়ন্তী কোন দিন যদি আমার সেবায় আসত তাহলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম, আমার মনে এই একটাই খেদ থেকে গিয়েছিল, যাক ভালোই হল আজ রাত থেকেই দময়ন্তী আমার সেবায় আসবে। আমি আমার বাজীতে আমার পুরো সাম্রাজ্য এমনকি আমার প্রাণ পর্যন্ত লাগাচ্ছি তুমি শুধু দময়ন্তীকে লাগাও'। রাজা নল তো এখন জুয়া বিদ্যাটা শিখে নিয়েছে। প্রথম দানেই সব শেষ। তখন রাজা নল পুষ্করকে বলছেন 'ওরে অধম তুমি তোমার সাম্রাজ্য থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই হারিয়েছ, এর পর থেকে তুমি কোন দিন দময়ন্তীর দিকে কুদৃষ্টি নিয়ে একবারও তাকাতে পারবে না। তুমি তো তোমার প্রাণকেও বাজী রেখেছিলে, কিন্তু তুমি আমার ভাই হও আর আমার যে দুঃখ কষ্ট হয়েছে এগুলো সব কলির জন্য হয়েছে। সেইজন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি, এখানে কিছু দিন থেকে তুমি চিরদিনের মত এই রাজ্য ছেড়ে অন্য যে কোন জায়গায় চলে যাবে'। এরপর পুষ্কর রাজা নলের কাছে এক মাসের মত ছিল, তারপর সেখান থেকে সে বেরিয়ে চলে গেছে। বৃহদাশ্ব রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই বিরাট লম্বা কাহিনী বলার পর বলছেন – *কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ। ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্।*।৩/৬৫/১০। 'যারাই এই কর্কোটক নাগ, দময়ন্তী, রাজা নল, রাজর্ষি ঋতুপর্ণের এই কাহিনীকে মাথায় চিন্তন করতে থাকবে, কলি যুগ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কলি যুগের নাশ হয়ে যাবে'। বৃহদাশ্বের এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেওয়া খুব কঠিন। রাজা নল ও দময়ন্তীর মিলনকে আমরা আত্মা ও পরমাত্মার মিলন বলে দেখতে পারি, আর এই আত্মা ও পরমাত্মার মিলনে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে এটাকে কলি যুগ বলে দেখানো হচ্ছে, আসলে এটা মনের পাপ। মনের পাপকে যতক্ষণ না দগ্ধ করা হচ্ছে তখন জীবনের দুঃখ-কষ্ট চলতেই থাকবে। বৃহদাশ্ব যুধিষ্ঠিরকে বলছেন এই কাহিনী কোন নিছক একটা রূপকথা বা পৌরানিক কাহিনী নয়, যারাই এই কাহিনী পাঠ করবে তাদেরই কলি যুগ নাশ হবে। তার মানে এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য রয়েছে। কি সেই আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য? নল ও দময়ন্তী হল আত্মা ও পরমাত্মার রূপ, মনের পাপকে কলি যুগকে দিয়ে দেখানো হয়েছে। কলি যুগকে কিভাবে নাশ করতে হবে? সেবা ও তপস্যার দ্বারাই এই কলি যুগ অর্থাৎ মনের পাপকে দগ্ধ করা যাবে। নল তো কর্কোটকে সেবাই করেছিল। আর ঋতুপর্ণ যেন গুরুর মত আত্মাকে কৌশলে পরমাত্মার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বৃহদাশ্ব শেষে বলছেন 'যখন দৈব প্রতিকুল হয়ে যায়, পুরুষার্থ নিষ্ফল হয়ে যায়' পুরুষার্থ নিষ্ফল হয়ে যাওয়া মানে আমি যে রকমটি পরিশ্রম করছি সেই অনুসারে ফল পাচ্ছি না, 'তখন তাকে সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিতে হয় আর মনের মধ্যে কোন রকম বিষাদ আসতে দিতে নেই'। এটাই এই কাহিনীর মূল শিক্ষা। মানুষের মনে হতাশার ভাব দুটি কারণে আসে, একটা হচ্ছে আমার মনে বিরাট চাহিদা আছে কিন্তু সে চাহিদাকে পূরণ করতে পারছি না, দ্বিতীয় হল আমি পরিশ্রম করছি কিন্তু কোন ফল পাচ্ছি না, আমি ফল পাওয়ার যোগ্য কিন্তু তাও ফল পাচ্ছি না। এই দুটো যখন কারুর মধ্যে হতে থাকে তখন তাকে সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিতে হয়। ধৈর্য ধারণ করাটা হল সত্ত্বগুণের লক্ষণ। ধৈর্যকে ধরে রাখতে হয়, আমার এই জিনিষ চিরদিন থাকবে না, সময় আবার অনুকূল হবে। নল ও দময়ন্তী যেমন ধৈর্যকে অবলম্বন করেছিল আর তাদেরও দিন পাল্টে গেল।

আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট সবারই আসে। শ্রীমা বলছেন 'এমন দিন গেছে কামারপুকুরে যখন একা একা ছিলাম, ভাতের উপর লবণটুকুও জুটত না, শাকতো দূরের কথা। শাড়ি ছিঁড়ে গেলে গিট্ দিয়ে পড়তুম'। এটা ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পরের কথা। শাড়ি ছিঁড়ে গেছে, দ্বিতীয় কোন শাড়ী নেই যে পড়বে। তারপরে মায়ের বাবা এসে এই সব দেখার পর সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সেই মায়ের এখন পূজো হচ্ছে। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমরাতো আরও অভাবগ্রস্ত লোক দেখেছি। শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার পর ঠাকুর বলছেন 'আমার যদি এখন মথুর থাকতো'। কিন্তু মায়ের যখন এই অবস্থা চলছে তখন মথুর হয়তো নেই কিন্তু আরও ধনী বড়লোক শিষ্যরা তো ছিল। কিন্তু ঠাকুরের দেহ চলে যাওয়ার পর শ্রীমাকে কতদিন একবেলা কি আধবেলা অভুক্ত থাকতে হত। তাই বলে কি মায়ের কোন হতাশা ছিল? কারুর প্রতি কোন অভিযোগ করেছেন কোন দিন? না। কেন? শ্রীমা সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে ছিলেন। সত্ত্বগুণ মানে – সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, ধৈর্য ইত্যাদি। ধর্মভাব যখন এই গুণগুলিকে মানুষ আশ্রয় করে থাকে তখন তার মনে কক্ষণ হতাশার ভাব আসেনা। এই যে রাজা নল আর দময়ন্তীর উপরে একটার পর একটা আঘাত প্রতিঘাত আসছে তারা কিন্তু সৎ পথকে কক্ষণ ছাড়ছে না।

সাধারণ মানুষের এটাই হয়। দুঃখ কষ্ট সবাই পায়, সাধারণ মানুষও পায়, সাধুরাও পায়, আর মহাত্মা সাধুরাও পায়, অবতাররাও পান। সমান ভাবে পান। আর যে যত বড় হয় তার দুঃখ কষ্টও ততো বেশী হয়। যীশুকে ক্রুসিফাই করে দিল, কৃষ্ণকে বাণ মেরে ছিটকে দিল, শ্রীরামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছর বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, আর বলতে গেলে সারাটা জীবন স্ত্রীকে ছাড়া কাটালেন। প্রত্যেক অবতারের এই দুরবস্থাই হয়। কিন্তু তাঁদের মনের মধ্যে কখনই হতাশার ভাব আসে না, আর সাধুবাবাদের কাছে জড়িবুটির জন্য দৌড়ঝাপও করেন না, ও আসছে আসতে দাও আবার চলে যাবে।

এরপর আরও খুব উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলছেন – রাজা নলের চরিত্র যে বর্ণনা করবে তার কখন দারিদ্র হবে না, মনের সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে এবং সংসারে তারা ধন্য হবে। অধ্যাত্ম রামায়ণে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পরেই এই ধরণের গ্রন্থ স্তুতি করা হয়েছে কিন্তু মহাভারতে এই ধরণের স্তুতি নেই। কিন্তু নল ও দময়ন্তীর কথা ভারতের পরম্পরাতে খুব প্রচলিত কাহিনী আর এই কাহিনী অনেক জায়গায় পড়ে শোনান হত। মানুষের স্বভাব হচ্ছে সব সময় বলতে চায়, শুনতে কেউ চায়না। এগুলি যাতে মানুষ শান্ত ভাবে বসে শোনে, আর দুটো ভালো কথা কানেতো যাচ্ছে। এই নল-দময়ন্তীর কাহিনী যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বৃহদাশ্ব ঋষি সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

মহাভারতে তীর্থাদির বর্ণন

পাণ্ডবরা এখন জঙ্গলেই আছে। বারো বছর জঙ্গলে সময় কাটাবে কি করে, এটা এক সমস্যা। বারো বছর তো এক জায়গায় বসে পাণ্ডবরা তপস্যা করতে পারবে না। পাণ্ডবরা জঙ্গলে বসে বসে কি করবে। অর্জুন ইতিমধ্যে স্বর্গে দেবতাদের কাছে চলে গেছে, এখনও ফেরত আসেনি। সে এখন ইন্দ্রের সঙ্গে আছে। দেবতা আর অসুরদের সঙ্গে প্রায়ই সংগ্রাম হয়। অর্জুনও সেই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। নিবাত কবচ বলে একটা লড়াই আছে। তাতে বলা হয় দেবতারা কখন অসুরদের হারাতে পারবেনা। সেখানে অর্জুন একাই সংগ্রাম করতে চলে গিয়েছিল। অর্জুনকে এমন বরদান দেওয়া ছিল যেহেতু সে একজন মানব শরীরধারি, তাই ওরা হারাতে পারবেনা। দেবতারা খুশী হয়ে পরে অর্জুনকে আরো অনেক দিব্যাস্ত্র দিয়েছিল। সে এক বিরাট কাহিনী। আমরা সেইসব আলোচনায় যাবো না। পরিবারে যখন কিছু অঘটন হয়ে যায়, প্রিয়জন যদি মারা যায় তখন মনের শান্তির জন্য লোকেরা তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। তীর্থ ভ্রমণ ভারতে খুব প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। তীর্থাদিতে বেরিয়ে গেলে কতকগুলো জিনিষ ভেতর থেকে কাজ করে, একটা হচ্ছে জায়গার পরিবর্তন হওয়াতে মনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যাথা বেদনাগুলো চলে যায়। পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। তীর্থ গুলোর সাথে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য জড়িয়ে থাকে বলে বুঝতে পারে ভগবানই আমার আশ্রয় আর তার সঙ্গে একটা উচ্চ আদর্শের দিকে মন যায়। বিদেশে এই জিনিষটা পাওয়া যাবে না। বিদেশে কিছু হলে মানুষ ঘুরতে বেরিয়ে যায়, ট্রেকিং এ চলে যায়, কিন্তু এগুলোতে মনের সেই শান্তি হয় না যেটা তীর্থ ভ্রমণে হয়।

বনপর্বে দশটি অধ্যায় শুধু তীর্থের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। শুধু তীর্থ আর তীর্থ। আমাদের সমস্ত প্রাচীন তীর্থস্থান গুলির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সব তীর্থের আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। মহাভারতের এই অধ্যায়ে এখন পাণ্ডবরা তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এই অধ্যায়ে শত শত তীর্থের নামের সাথে সাথে বিভিন্ন তীর্থের ইতিহাস, তীর্থের মাহাত্ম্য আর কোন্ তীর্থে কি করলে কি ফল পাওয়া যায় সব বর্ণনা করা হয়েছে। পরের দিকে পুরানাদি সাহিত্যে এবং আমাদের মুখে মুখে তীর্থের সম্বন্ধে যা কিছুর কথা চলে আসছে তার উৎস এই মহাভারতই।

মার্কণ্ডেয় ঋষির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দেখা হয়েছে। তিনি বলছেন ‘পিতামহ ভীষ্ম তিনিও একবার এই রকম তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। সেই সময় ভীষ্মের সাথে পুলস্ত্য ঋষির সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভীষ্ম সেই সময় খুব তপস্যায় ছিলেন। ভীষ্মের সাথে পুলস্ত্য ঋষির দেখা হওয়ার পর ভীষ্ম তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন ‘এই যে সবাই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়, এই তীর্থ করে কি লাভ হয়’? ভীষ্মের প্রশ্নের উত্তরে পুলস্ত্য ঋষি কয়েকটি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলছেন – *হন্ত তে কথয়িষ্যামি যদৃষীণাং পরায়ণম্। তদেকাগ্রমনাঃ পুত্র শৃণু তীর্থেষু যৎ ফলম্।।৩/৮২/৮*। তীর্থ হচ্ছে ঋষি ও সন্ন্যাসীদের বিরাট বড় এক আশ্রয়। তিনি তীর্থের কথা বলতে গিয়ে ‘আশ্রয়’ শব্দটাকে ব্যবহার করলেন। কাদের আশ্রয়? ঋষিদের, সাধুদের আশ্রয়। মনু স্মৃতিতেও আছে কোন সন্ন্যাসী কোন জায়গায় তিন দিনের বেশী থাকবে না। তিন দিনের বেশী কোথাও থাকলে ওখানকার লোকেদের সঙ্গে জাগতিক মনোভাব তৈরী হতে পারে, এই মনোভাবই সন্ন্যাসীকে আসক্তি এসে বেঁধে ফেলবে। তারপর দেখা যাবে শেষে সন্ন্যাসী গ্রামেই জমে বসে গেল। সন্ন্যাসী ঋষিরা যদি শহরে বা গ্রামে তিন দিনের বেশী না থাকেন তাহলে ওনারা করবেনটা কি! আবার বিধান দেওয়া আছে সন্ন্যাসী আশ্রম করে থাকবে না। আশ্রম

করে থাকলে ইঁদুরকে তার গর্ত থেকে সাপ যেমন ধরে ফেলে, ঠিক তেমনি বিষয় বাসনা সন্ন্যাসীকে ধরে নেয়। গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে থাকতে পারবে না, আশ্রম করে থাকবে না, তাহলে সন্ন্যাসীরা যাবে কোথায়। সেইজন্য বলা হচ্ছে সন্ন্যাসী তীর্থে তীর্থে ঘুরতে থাকবে। সন্ন্যাসীরাও তাই একটু শিক্ষা-দীক্ষা হয়ে গেলে সারা ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে একটু গ্রাসাচ্ছদন করে নিতেন আর লোকেদের একটু ধর্ম কথা বলে বেড়াতেন, আর যে যে তীর্থে তিনি ঘুরে এসেছেন সেখানকার মাহাত্ম্য, ইতিহাসের কথা শোনাতেন।

আমাদের সবার শরীরে রজোগুণ সব সময় থাকবে। আমি সন্ন্যাস নিয়ে নিতে পারি, কিন্তু আমার শরীর কখনই সন্ন্যাস নেবেনা। আমার যে মন, মস্তিষ্ক, এরা কখনই সন্ন্যাস নেবেনা। এর ফলে হয় কি আমার মন যখন জানে ঐ জিনিষটা ভুল, কিন্তু মস্তিষ্ক অন্য রকম কাজ করতে থাকে। খুব সহজ উদাহরণ হচ্ছে – সকাল বেলা সূর্যকে বিরাট বড় বলে মনে হয়। সূর্য আসলে কি বড় হয়? নানান ভাবে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর এটা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত যে এটা হল চোখের ভ্রম। দৃষ্টির ভ্রম হলে কি হয়, যখন কোন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কিংবা কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়ে দৃষ্টিটা যায়, তখন মনে হয় ঐ জিনিষটা বিরাট দূরে আছে। বিরাট দূরের জিনিষ ছোট দেখার কথা কিন্তু বড় দেখাচ্ছে। সব জিনিষ মিলিয়ে মস্তিষ্ক এমন বিভ্রান্ত হয়ে যায় যে ছোট দেখার বদলে বিরাট দেখতে থাকে। আবার এই সূর্যই যখন মধ্যাহ্নে আকাশের মাঝখানে আসে, তখন আর reference point পায়না বলে ঐ সূর্যকে ছোট করে দেখাবে। আবার ঐ সূর্যই বিকালে পশ্চিমাকাশে যখন কোন বিল্ডিং বা পাহাড়ের আড়ালে চলে যায় তখন সেইটাকেই মস্তিষ্ক অন্য রকম করে দেখবে। মানুষ একশ বছর আগে যখন এই জিনিষগুলি জানতনা, তখন অনেক কাহিনী তৈরী করেছিল ঠিক আছে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এসে এগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার আমরা জানি কেন এই রকম দেখাচ্ছে, এটা হল চোখের একটা ভ্রম। আমি এও জানি যে মস্তিষ্ক এটাকে নিয়ে খেলা করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সূর্যকে কখন বড় দেখছি কখন ছোট দেখছি। এর একমাত্র কারণ হল মস্তিষ্ক আসলে একটা বোকা যন্ত্র। কম্প্যুটারে যা ডাটা দেওয়া থাকে তার বাইরে সে আর কিছু করতে পারেনা, মস্তিষ্কের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই জিনিষ হয়। কিছু কিছু বাড়িতে বোকা চাকর থাকে, ওকে যতবার আপনি বারণ করুন ও ততবার ওটাই করবে। ঠিক বোকা চাকরের মত আমাদের মস্তিষ্কও ব্যবহার করবে। সকালবেলা সূর্যটা বড় হয়ে গেছে, দুপুর বেলা ছোট হয়ে গেছে আবার বিকেলবেলা বড় হয়ে গেছে। মন, যে কিনা তার মাস্টার, সে বলছে – দ্যাখো, তুমি কিন্তু বোকাম করছ, এটা কিন্তু দৃষ্টির ভ্রম মাত্র। মস্তিষ্কও বলবে – হ্যাঁ স্যার, আমি বোকামো করছি। বলেই সকাল বেলা আবার আপনার কাছে বড় সূর্যকে এনে দেবে। আমাদের শরীরটাও ঠিক সেই একই রকমের, a very stupid thing. আমার যদি হাত কেটে বাদ হয়ে যায় শরীর কখনই মানবেনা যে আমার হাত নেই, ব্রেনও মানবেনা যে আমার শরীরের হাত নেই। ভি এস রামচন্দ্রনের একটা বই আছে 'Phantoms in the Brain'- এটাতে সব খুব interesting observations আছে। বাস্তবে না থাকলেও স্বপ্নে ব্রেন ওটাকে নিয়ে আসবে। আমার কোন প্রিয়জন মারা গেছে, তাকে স্বপ্নে নিয়ে আসবে, কেননা ব্রেন কিছুতেই মানতে চায়না যে প্রিয়জান মারা গেছে। জাগ্রত অবস্থায় মন বলছে ও নেই কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় ব্রেন বলবে – না, সে আছে। এইভাবে মস্তিষ্ক নানা রকমের কল্পনা করতে থাকে, আর সেটাকেই বাস্তবে দেখতে চায়। মনকে কে আপনি training দিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে ঠিক করে দেবেন মনও বারবার ব্রেনকে বলবে ওটা ভুল ব্রেনও বলবে হ্যাঁ ভুল কিন্তু করার সময় উল্টোটা করে বসবে।

এখন যে সন্ন্যাস হয়ে গেছে, সন্ন্যাসীর মন গেছে পালটে, মন বলছে ঠাকুর ছাড়া আমার আর কেউ নেই, সাথে সাথে ব্রেনও বলছে ঠাকুর ছাড়া আমার কেউ নেই, শরীরও বলছে ঠাকুর ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু যখন বাঁদরামো করার সুযোগ পাবে শরীর তখন বাঁদরামো করবে, আর বলবে সন্ন্যাস বলে কিছু হয় নাকি! ব্রেনও বলবে আমরা সন্ন্যাস বলে কিছু জানিনা। প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিকতা হল সম্পুর্ণ ভাবে প্রকৃতির স্বভাবের বিরুদ্ধে। তাই ব্রেন কে আপনি চড় মারুন তখন বলবে হ্যাঁ হুজুর সন্ন্যাসের মত কিছু আছে নাকি। কিন্তু করার সময় নিজের মত করবে। শরীর জানে যে ভোগ করতে নেই, কিন্তু যেমনি ভোগের কিছু সামনে পাবে অমনি ঝপাস্ করে ঝাপিয়ে পড়বে। সে যারই শরীর হোকনা কেন, সন্ন্যাসীর শরীরও ঝাঁপাবে, কারণ শরীর ও মস্তিষ্ক সন্ন্যাস বলে কিছু জানেই না।

পুলস্ত্য মুনি তাই বলছেন 'তীর্থ যাত্রা হচ্ছে ঋষিদের পরায়ণম্'। পরায়ণম্ মানে এটাই বাঁচায়, পর+আয়ণম্। এটাই আশ্রয় দেয় ঋষিদের, সন্ন্যাসীদের। সংসারে থাকলে আলাদা কথা। আশ্রমে কতদিন আর ঝোল চচ্চড়ি খাব, হয়ে যাক একটু মাছ মাংস। কেননা শরীর তো মানবেনা, মস্তিষ্কতো কথা শুনবেনা। আর কতদিন আর ধ্যান-জপ করব, সারা জগত টিভি দেখছে, ক্রিকেট খেলা দেখছে, তুমি দেখবেনা! যাই বলল, চলল দৌড়ে টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখতে।

সেইজন্য বলছে আশ্রয় নিতে। কিসের আশ্রয় নেবে? তীর্থ যাত্রায় বেড়িয়ে পর। চলল তীর্থ যাত্রায়। আমরা কিন্তু মহাভারতের সময়কার কথা বলছি, যখন কোন রেল লাইন ছিলনা। এখান থেকে পায়ে হেঁটে হরিদ্বার চলল। তখনকার দিনে গ্রামের কেউ যখন বদ্রিকাশ্রমের দিকে তীর্থ যাত্রা শুরু করত, বেরুবার আগে তাকে ভালো করে ভোজ খাইয়ে দেওয়া হতো। মানে তার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, কেননা তুমি ফিরবে কিনা ঠিক নেই। বিশেষ করে বদ্রিকাশ্রম আর গঙ্গাসাগর গেলে ধরেই নিত সে আর ফিরবে না, তাই যাত্রা করার আগে গ্রামের লোকরা তার শ্রাদ্ধ করে খাইয়ে দিত।

সাধুরা তীর্থ যাত্রায় বেড়িয়ে শুধু ঘুরে বেড়াত। কোথাও একটা জায়গায় বেশী দিন বসবেনা, সেখানকার কারুর সঙ্গে affinity grow করবেনা। রাস্থায় চলতে চলতে শারীরিক কষ্ট আসবে। শরীরতো মানবেনা। শরীরের ধর্মই হচ্ছে আরাম খোঁজা। এমন কোন শরীর নেই, সে পশুর শরীর, পাখির শরীর, মানুষের শরীর, সন্ন্যাসীর শরীর, সাধুর শরীর, এমনকি অবতারেরও শরীর – সব শরীরই তার আরামকে চাইবে। শরীরের মৌলিক ধর্মই হল সে পুষ্টি চাইবে, ভালো খাবার চাইবে, আরাম চাইবে, বিশ্রাম চাইবে। এটাই শরীরের স্বভাব। সেইজন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরতে থাকে শরীরকে কষ্ট দেবার জন্য।

তীর্থের ফল ঠিক ঠিক কে পায়? পুলস্ত্য ঋষি বলছেন – ***যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে।।***৩/৬৭/৩১। তীর্থে গিয়ে যার দুটো হাত, দুটো পা আর মন সুসংযত সেই ঠিক ঠিক তীর্থের ফল পায়। তীর্থে প্রচুর লোকেরাই যাচ্ছে, কিন্তু বেশীর ভাগই তীর্থে পৌঁছেই সাইট সীয়িং এর দিকে দৌড়াতে শুরু করবে, কোন হোটেলে কি ভালো ভালো খাবার পাওয়া যাবে, ওখান থেকে কি কি কেনা যাবে এইগুলোই করে বেড়ায়। কিন্তু এখানে বলছেন হাত, পা আর তার সাথে মনকে সুসংযত রাখতে হবে। এর সাথে কি করতে বলছেন – *বিদ্যা তপশ্চ কীর্তিচ স তীর্থফলমশ্নুতে*। যার বিদ্যা আছে, অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেছে, তপস্যা করেছে আর কিছু একটা কীর্তি আছে, তারাই তীর্থের ফল পায়। যারা শক্তিহীন তাদের দ্বারা তীর্থ করেও কোন লাভ হয় না। মূল কথা হল মন যার সংযমে আছে আর শাস্ত্র অধ্যয়ণ আছে অর্থাৎ একটা উচ্চ আদর্শকে যে ধরে রেখেছে সেই ঠিক ঠিক তীর্থের ফল পায়। খুব সহজ উদাহরণ হল, বেলুড় মঠে বিশেষ করে শীতের সময় কত দূর দূর থেকে হাজারে হাজারে লোক তীর্থ করতে আসছে। এরা সবাই কি তীর্থের ফল পাচ্ছে? অত ভিড়ের মধ্যে পুলিশ শুধু লাঠি উঁচিয়ে লোকেদের তাড়া করে যাচ্ছে। কেন? ছেলে মেয়েরা কেউ হাত ধরাধরি করে চলছে, এ ওকে টানছে, ও একে টানছে। কতবার পুলিশকে এদের পিটিয়ে থানায় নিয়ে যেতে হয়েছে। এদের কোন সংযমই নেই। সংযম যদি নাই থাকে তাহলে তীর্থের আর কি ফল পাবে। এরপর বলছেন *প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে।।*৩/৬৭/৩২। যারা প্রতিগ্রহ থেকে দূরে থাকে তারাই তীর্থের ফল পায়। প্রতিগ্রহ হল আমি কিছু দেওয়ার পর প্রতিদানে কিছু পাওয়ার আশা করছি। তীর্থে যখন যাবে তখন নিজের কাছে যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, তীর্থে গিয়ে কারুর বোঝা হতে নেই। *অহঙ্কারনিবৃত্তিশ্চ*, অহঙ্কারের নিবৃত্তি না করে তীর্থে যেতে নেই। আসলে তীর্থ হল যেখানে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তি বিশেষ ভাবে প্রকাশ হচ্ছে, সুতরাং ঈশ্বরের কাছে যে যাবে সেতো দীন হীন কাঙালী হয়েই তাঁর কাছে যাবে। তীর্থে গিয়ে অল্পাহারী ও জিতেন্দ্রিয় থাকতে হয় আর কর্তৃত্ব ভাবের অভাব রাখতে হয়। মূল কথা হল সাধু সন্ন্যাসী, ঋষি-মুনিদের জীবনটি যে রকম, তীর্থে গিয়ে সেই রকম জীবন যদি না হয় তাহলে তীর্থে গিয়ে কোন লাভ হয় না। বেশীর ভাগ লোকই ট্যুরিস্ট হয়ে তীর্থে যায়, তীর্থ করতে যাচ্ছি এই মনোভাব নিয়ে কেউই যায় না। উত্তরকাশী, হরিদ্বার, হৃষিকেশ এই তীর্থস্থানে আমিষ খাদ্য নিষিদ্ধ। কিন্তু ওখানে গিয়েও এরা চেঁচাতে থাকবে – কোথায় এসে পড়লাম, একটু মাছ মাংস কিছুই পাওয়া যায় না। সারা জীবন ধরে মাছ-মাংসই খেয়ে আসছে, এই কটা দিনের জন্যও জিহ্বাকে একটু সংযম করতে পারছে না। পরে আবার বলবে – জানেন আমি হরিদ্বার, উত্তরকাশী ঘুরে এসেছি। এদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যাওয়া যা হরিদ্বার যাওয়াও তাই, তীর্থের কোন ফলই এরা পায়না।

পুলস্ত্য মুনি বলছেন 'আমাদের বেদে বিধান আছে তুমি স্বর্গ যদি লাভ করতে চাও তাহলে তোমাকে সেই সেই দেবতার সেই সেই রকম যজ্ঞ করতে হবে, ঐ যজ্ঞ করলে তখন ঐ রকম ফল পাওয়া যায়'। কিন্তু সাধারণ দরিদ্র মানুষ যজ্ঞ করতে যে এত টাকা পয়সা লাগে সেই অর্থ কোথা থেকে জোটাবে, তাছাড়া যজ্ঞের অনেক আনুষাঙ্গিক জিনিষ জোগাড় করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে এরা যজ্ঞের ফল পাবে কি করে? সেইজন্য এদের জন্য তীর্থের বিধান করা

হয়েছে। তীর্থ করলে সেই একই ফল পাবে যজ্ঞ করলে যেটা পেতে। মানুষ এই জন্মে কেন দরিদ্র হয়েছে? বলছেন, তীর্থ গিয়ে যদি তিন দিন উপোস না করে থাকে, তীর্থযাত্রা যদি আদপেই না করে থাকে, গোদান ও সুবর্ণ দান যদি না করে থাকে তাহলে পরের জন্মে সে দরিদ্র হয়ে জন্মাবে। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, আগের জন্মে দান ধ্যান করা থাকলে পরের জন্মটা তাদের ভালো হয়।

এরপর বনপর্বের প্রায় দশ এগারোটা অধ্যায় কোন তীর্থে গেলে কি হয়, কোন তীর্থে গিয়ে কি কি করলে কি কি ফল পাওয়া যায় শুধু এইটাকে নিয়েই বলে গেছেন। মঙ্কণক বলে এক ঋষি ছিলেন, তিনি খুব তপস্যা করেছিলেন। ঐ কঠোর তপস্যার ফলে তাঁর কিছু সিদ্ধাই এসে গিয়েছিল, মজার ব্যাপার হল তিনি নিজেও জানতেন না যে তাঁর এই ধরণের সিদ্ধাই আছে। একদিন কিছু একটা করতে গিয়ে কুশ ঘাসে তাঁর হাতটা কেটে গিয়েছিল। রক্ত বেরোচ্ছিল বলে মুখ দিয়ে টেনে রক্তটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে জিহ্বাতে সুস্বাদু তরকারির ঝোলের স্বাদ লাগছে, আর সত্যিই দেখেন যে রক্তের বদলে তরকারির ঝোল বেরোচ্ছে। সেটা দেখে তাঁর খুব আনন্দ হয়েছে আর নৃত্য করতে শুরু করেছেন, আমার কি বিরাট সিদ্ধাই হয়েছে। তিনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ, তিনি নৃত্য করছেন আর তাঁর সাথে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছে। শিব এসে তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন তোমার এত নৃত্য করার কি হয়েছে, তোমার নৃত্য থামাও। শিবকে ঋষি দেখাচ্ছেন ‘এই দেখুন আমার হাত কেটে গিয়েছিল আর সেখান থেকে সব্জীর ঝোল বেরোচ্ছে’। শিব থামতে বলার পরও নৃত্য করে যাচ্ছে। তখন শিব পায়ের আংটা দিয়ে মাটির উপর তিন বার ঠক ঠক করতেই সেখান থেকে ধবধবে সাদা ভস্ম বেরোতে লাগল। ঐটা দেখেই তাঁর মনে হল আমি কেন এত নৃত্য করছি। যেখানে শিব এই সিদ্ধাই দেখালেন সেটা আবার একটা তীর্থ হয়ে গেল। এই ভাবে কয়েকটি শ্লোকের পরে পরেই একটা করে তীর্থের বর্ণনা করে যাচ্ছেন। এটাই মহাভারতের বিশেষত্ব।

এর মধ্যে একটা বলছেন, যে হরিদ্বারের কঞ্জখলে গিয়ে তিন রাত্র উপবাস করেন তাহলে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। এগুলো হল শাস্ত্রের কথা, গীতাতেও ভগবান বলছেন *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*, শাস্ত্র যেটা বলছে সেটা করতে হয়। এখন করলে কি হয় সেটা বলা মুশকিল। তার পাশেই কপিলাবট বলে একটি তীর্থ আছে, সেখানে এক রাত্র উপবাস করলে এক হাজার গোদানের ফল পাওয়া যায়। প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে শুধু স্নান করলেই দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যাবে। বারাণসীতে গিয়ে যদি কেউ ভগবান শিবের আরাধনা করে এবং কপিলাহ্রদে স্নান করে তাহলে সে রাজসূয় যজ্ঞের ফল পায়। ভারতের সমস্ত প্রান্তে যত তীর্থ আছে সব তীর্থের এই মাহাত্ম্যগুলো ব্যাসদেব নিজের মন থেকে কল্পনা করে বলছেন না, তীর্থের এই ধারণাগুলো তখন সমাজের মানুষের মধ্যে বসে গিয়েছিল, এতেই বোঝা যায় আমাদের ধর্ম কত প্রাচীন। এই ধারণাগুলো আমাদের পরম্পরাতে কবে থেকে চলে আসছে কেউ বলতে পারবে না। কারণ এই ধারণাগুলো সারা ভারতের মানুষের মধ্যে বসে যেতে কত হাজার বছর লেগেছে আমরা কল্পনাই করতে পারব না। ব্যাসদেব এগুলোকে সংগ্রহ করে মহাভারতে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

এরপর গয়াতীর্থের কথা বলা হচ্ছে। গয়াতে গিয়ে কেউ যদি তীর্থ করে তাহলে তাতে তার বংশের পিতৃপুরুষরা উদ্ধার পেয়ে যান। গয়ার অক্ষয়বটে কেউ যদি পিতৃদের নামে পিণ্ড দান করে তাহলে সেই পিণ্ডটা অক্ষয় হয়ে থাকে, ঐ পিণ্ড থেকে পিতৃরা চিরদিন তাঁদের খাওয়া পেয়ে থাকেন। কারুর বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সে বুঝতে পারছেন আমার বাবা-মা যেখানে আছেন সেখানে খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না। বলা হয় ঐ অক্ষয়বটে পিণ্ড দান করলে বাবা-মা যেখানেই থেকে থাকুন না কেন সেখানেই তাঁদের খাওয়ার পৌঁছে যাবে আর বাবা-মা চিরদিন তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। গয়াসুরকে নাকি ভগবান বিষ্ণু এই রকম কি একটা বরদান দিয়েছিলেন। প্রচুর তীর্থের বর্ণনা করা হচ্ছে। গঙ্গাসাগর, অযোধ্যা, পুষ্কর প্রচুর তীর্থের কথা বলা হচ্ছে। মহাভারতে এসে গঙ্গাকে খুবই পূণ্যতোয়া করে দেওয়া হয়েছে। তীর্থের বর্ণনা করতে করতে একটা জায়গায় বলছেন – যখন কোন মানুষ তীর্থে গিয়ে শরীর শুদ্ধির নিয়ম পালন করে ঐ নিয়মকে বলা হয় মানুষব্রত। ঠিক তেমনি তীর্থে গিয়ে যখন মনকে শুদ্ধ রাখা হয় তখন তাকে দৈবব্রত বলা হয়। বলা হয় তীর্থে গিয়ে যদি মনে কোন রাগ ও দ্বেষ না থাকে তাহলে তাতেই পুরো মনের শুদ্ধি হয়ে যায়। এই ধরণের মনোভাব নিয়ে অর্থাৎ আমি মনে কোন রাগ দ্বেষ রাখব না, এই ভাবকে আশ্রয় নিলে তখনই সে তীর্থের ঠিক ঠিক ফল পায়। এই কথা বলার পর পাণ্ডবদের বলা হচ্ছে, তোমরা যে এখন তীর্থ করতে বেরোচ্ছ এই সময় কারুর প্রতি তোমরা কোন রাগ দ্বেষ রেখো না এমনকি মনে দুর্যোধনাদির প্রতিও কোন রাগ দ্বেষ আসতে দেবে না, তখনই তোমরা তীর্থের ফল পাবে।

যুধিষ্ঠিরকে লোমশ মুনির উপদেশ

তীর্থের বর্ণনা হয়ে গেল। পাণ্ডবরা বারো বছর বসে বসে কি করবে, এরাও বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ যাত্রায়। তারাও একটু একটু করে চলেছে, কিন্তু মনের মধ্যেতো সন্তাপ রয়েছে। সব কিছু চলে গেছে, বারো বছর বনে কাটাতে হবে। যাই হোক, পথে যেতে যেতে তাদের সঙ্গে লোমশ মুনির দেখা হল। অনেকে বলে ঋষির শরীরে বড় বড় লোম ছিল বলে তাঁর নাম লোমশ ঋষি। যুধিষ্ঠির লোমশ মুনিকে দেখে ভেঙ্গে পড়েছেন। তিনি লোমশ মুনিকে দেখে বলছেন 'হে মুনিশ্রেষ্ট, আমার শরীরে সত্ত্বগুণ ছাড়া আর কিছু নেই। শিশুকাল থেকেই আমি নিজেকে মনে করি আমার মনের মধ্যে সত্ত্বগুণ ছাড়া আর কিছুই নেই। রজো গুণ, তমো গুণ, কাম ক্রোধ, লোভ এসব কোন কিছু কোন সময় অনুভব করিনি। আমি নিজেকে সত্ত্বগুণ থেকে হীন মনে করি না তাও আমি দুঃখে এত সন্তপ্ত হয়ে আছি'। সব কিছু হারিয়ে বনবাসে এসে রাজা যুধিষ্ঠির নিজেকে সন্তপ্ত মনে করছেন। যুধিষ্ঠির ধর্মকে ঠিক ঠিক জানেন, তিনি মনে করছেন আমার মধ্যে সত্ত্বগুণ থাকা সত্ত্বেও আমার এত খারাপ অবস্থা হয়েছে এবং আমি সব সময় সন্তপ্ত হয়ে আছি। অন্য দিকে দুর্যোধনের মধ্যে সত্ত্বগুণ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এই সমৃদ্ধি কি করে হচ্ছে! যুধিষ্ঠিরের মনে যেন একটা সংশয় হচ্ছে।

লোমশ মুনি তখন বলছেন *নাত্র দুঃখং ত্বয়া রাজন্ কার্যং পার্থ কথঞ্চন। যদধর্মেণ বর্ধেয়ুরধর্মরুচয়ো জনাঃ।।*৩/৯৪/৩। 'হে রাজন্! যদি কোন মানুষ অধর্মে রুচি রাখে আর সেই অধর্ম থেকে যদি সে সমৃদ্ধি পেতে থাকে সেটা দেখে তোমার মনে কখনই কোন দুঃখ হওয়া উচিত নয়'। এই জিনিষটা ভক্তদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, যারা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসছেন, দীক্ষা নিয়েছেন সবাইকে বলতে শোনা যায় আমি ঠাকুরের আশ্রিত। এখন যদি এদের কিছু একটা অঘটন হয়ে যায়, মেয়ের ডিভোর্স হয়ে গেল, ছেলে মরে গেল, ছেলে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে তখনই এরা আক্ষেপ করতে থাকে 'হে ঠাকুর তুমি একি করলে, আমার একি হয়ে গেল'। শিক্ষিত ভক্তই হোক আর অশিক্ষিত ভক্তই হোক সবাইকে এই এক কথা বলতে দেখা যায়। আমরা নিজেদেরকে ভালো লোক মনে করছি, আমি সৎ লোক কিন্তু আমার সেই রকম সমৃদ্ধি নেই, কিন্তু যারা অসৎ লোক তাদের আমার তুলনায় অনেক সমৃদ্ধি, তার ছেলেমেয়েরা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে, আমার সন্তান একটা উচ্ছৃঙ্খল। শুধু গৃহীদেরই এই সমস্যা নেই, সন্ন্যাসীদেরও এই সমস্যা আছে। অনেক আশ্রমের মহন্তদের বলতে শোনা যায়, আমরা এত সৎ লোক কিন্তু ঐ আশ্রমের সন্ন্যাসীরা ব্ল্যাকমানি নিয়ে কি বিশাল আশ্রম বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের কি কোন দিন এই সচ্ছল অবস্থা হবে না! কিন্তু আমরা একবার ভাবিও না যে সততা থাকলেই সমৃদ্ধি হবে এটা কোন শাস্ত্রেই লেখা নেই। অন্য দিকে আমরা ঠাকুরের মন্ত্র নিচ্ছি, জপ করছি, কিন্তু কোথাও কি ঠাকুর বলেছেন তুমি আমার মন্ত্র জপ করছ বলে তুমি কোন দিন বিধবা হবে না, তোমার সন্তান মারা যাবে না, তোমার ছেলে উচ্ছৃঙ্খল হবে না! দুঃখ-কষ্ট সবারই জীবনে আসে, কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে আমি এত ধর্মপ্রাণ তাও আমার এত দুঃখ-কষ্ট আসছে। তাকে এটাই জিজ্ঞেস করতে হয়, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে যে ধর্মপ্রাণ লোকেদের কোন দুঃখ-কষ্ট হবে না! আমি ভগবানের নাম করছি, ধর্ম পালন করছি সেটা আমার ব্যাপার কিন্তু তার সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধি, সামাজিক সমৃদ্ধির কি সম্পর্ক থাকতে পারে। এটা কি কোথাও বলা আছে যে যারা অধর্ম করছে তাদের উন্নতি হবে না! বলছে যারা অধর্ম করে তাদের পাপ হবে, তাই সমৃদ্ধিও থাকবে পাপও থাকতে পারে, এতে তো কোন অসুবিধার কিছু নেই। স্বামীজী বার বার বলছেন 'Religion for the sake of religion, good is for the sake of being good'। আমি ভালো কেন হব? আমার ভালো হতে ভালো লাগে, ব্যস্ এর বাইরে আর কোন কিছু নেই। কিন্তু যদি বলি আমি ভালো হব কারণ ভালো হলে আমি এটা পাব সেটা পাব, তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে ভেতরে গোলমাল আছে। সেইজন্যই লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করে দিচ্ছেন, যারা অধর্মে রুচি রাখে আর অধর্মেই সমৃদ্ধি পেতে থাকে সেটা দেখে তুমি কখন মাথা ঘামিও না। অবশ্য তারপরেই আবার বলছেন 'মানুষ যখন অধর্মকে আশ্রয় করে নেয় প্রথমেই তার সব কিছু ভালো হতে থাকে, সুখ সমৃদ্ধি বাড়তে শুরু করে। সমৃদ্ধি যখন বাড়তে শুরু হয় তখন তার শত্রুদেরও সে হারিয়ে দিতে থাকে। তখন খালি জয়, জয় আর জয়। টাকা পয়সা সম্মান সব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ভাবে কিছু দিন বাড়তে বাড়তে একটা সময় আসে যখন তাকে শেকড় সমেত উপড়ে ফেলে। যত লোক তাকে আশ্রয় করে থাকে তাদের সবারই নাশ হয়ে যায়। এইসব বলে লোমশ মুনি খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন 'আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি অনেক কিছুই দেখেছে, আমার চোখের সামনে দৈত্য, দানবদের অধর্ম দিয়ে বাড়তে দেখেছি আবার এদের বিনাশও দেখেছি'। এই কথা ঋষি বলছেন। কিন্তু আমাদের এই যুগেও হর্ষদ মেহতাকে কত হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যেতে দেখেছি, আবার তার বিনাশটাও দেখেছি। টেলিকম মিনিস্টার কত লক্ষ কোটি টাকার স্ক্যাম করলেন, তারপর দেখলাম তার প্রাইভেট সেক্রেটারি আত্মহত্যা করল, মন্ত্রী এখন কারাগারে বন্দী। অধর্মের সাহায্য নিয়ে যখন উঠতে শুরু করে তখন কি হারে যে উঠতে শুরু করবে আর

সমৃদ্ধির কত উঁচুতে চলে যাবে ভাবাই যায় না, কিন্তু তারপর পা পিছলে কোথায় যে মুখ থুবড়ে পড়বে সেটাও কল্পনা করতে পারা যায় না। যখন সে ওপরের দিকে ওঠে তখন তো সে একা ওঠেনা আরও দশজনকে নিয়েই ওঠে, যখন পতন হতে থাকে তখন সবাইকে নিয়েই পতন হয়। আমাদের নতুন প্রজন্ম এখন অর্থটাকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে, কিন্তু অর্থের সাথে আরও কত কিছু জড়িয়ে আছে সেগুলোর দিকে নজর নেই। লোমশ মুনি বলছেন 'এগুলো আমার নিজের চোখে সব দেখা তাই ঐদিকে তুমি মন দিও না'।

অগস্ত্য মুনির ইতিহাস

এরপর যুধিষ্ঠিররা যখন গয়া তীর্থকে পার করে মনিমতি বলে একটি তীর্থে পৌঁছেছেন। এখানকার মাহাত্ম্য হল অগস্ত্য মুনি এখানে বাতাপিকে নাশ করেছিলেন। এখানে অগস্ত্য মুনির বর্ণনা আসছে। অগস্ত্য মুনি হলেন বাল্মীকি রামায়ণের কালের, রামনামের মধ্যেও উল্লেখ আছে যে শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্য মুনির কৃপা পেয়েছিলেন। অগস্ত্য মুনির কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে যেমন আছে মহাভারতেও কয়েকটি ছোট খাটো কাহিনী পাওয়া যায়। অগস্ত্য মুনির চেহারাটা ছিল খর্বাকৃতি, দেখতে খুব একটা আহামরি কিছু ছিল না কিন্তু তিনি বিরাট তপস্বী ছিলেন। দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যেকার লড়াই বহু দিনের। দেবতারা যখন দৈত্যদের আক্রমণ করত তখন দৈত্যরা সমুদ্রের ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত বলে দেবতারা আর দৈত্যদের নাগাল পেত না। দেবতারা তখন অগস্ত্য মুনির শরণাপন্ন হয়েছেন, আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। দেবতারা বলতেই অগস্ত্য মুনি সমুদ্রের তীরে এসে গণ্ডুষে পুরো সমুদ্রের জল পান করে নিয়েছেন। এখন সমুদ্রের সব জল অগস্ত্য মুনির পেটে চলে গেছে, সমুদ্র এখন হয়ে গেল ফাঁকা মাঠ। সব দৈত্যগুলি ধরা পড়ে গেল আর দেবতারাও সব কটা দৈত্যকে শেষ করে দিলেন। সমুদ্রকে অগস্ত্য মুনি শুকিয়ে দিয়েছেন, এখন কি হবে? অগস্ত্য মুনিতো সমুদ্রের সব জল হজম করে নিয়েছেন। এরপর গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্তে অবতরণ করিয়ে সমুদ্রকে জল দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়েছিল। যেখানে আবার এক বিরাট কাহিনী আসছে, সগর রাজা ও ভগীরথ। শ্রীরামচন্দ্র হলেন ভগীরথের বংশধর, ভগীরথ কত আগেরকার সেই সময়েও অগস্ত্য মুনি ছিলেন, সেই অগস্ত্য মুনির সাথে আবার শ্রীরামচন্দ্রের দেখা হয়েছিল।

ইল্বল তখনকার দিনে ছিল দানবরাজ, সে একবার এক ব্রাহ্মণকে একটা যজ্ঞ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করতে রাজী না হওয়াতে ব্রাহ্মণদের উপর ইল্বলের খুব আক্রোশ জন্মে গিয়েছিল। ইল্বলের এক ভাই ছিল যার নাম বাতাপি। ইল্বলের আবার একটা মন্ত্রশক্তি ছিল, যেই মন্ত্রশক্তিতে নিজের ভাইকে ভেড়া ছাগল বানিয়ে নিত। বাতাপি যেখানেই কোন ভালো ব্রাহ্মণ দেখত মাংস খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে আসত আর ইল্বল বাতাপিকে ভেড়া বানিয়ে কেটে খাইয়ে দিয়ে ডাকত 'বাতাপ বেরিয়ে এসো'। বাতাপি তখন ঐ ব্রাহ্মণের পেট চিড়ে বেরিয়ে আসত। এই ভাবে তখন ইল্বল আর বাতাপি প্রচুর ব্রাহ্মণের প্রাণ হরণ করেছিল। অগস্ত্য মুনি কিছু অর্থের জন্য দানবরাজ ইল্বলের কাছে গিয়েছিল। ইল্বলও অগস্ত্য মুনিকে খুব খাতির করে বাতাপিকে ভেড়া বানিয়ে কেটে মাংস রান্না করে অগস্ত্য মুনিকে খাইয়ে দিয়ে ডাকছে 'বাতাপি বেরিয়ে এসো'। ততক্ষণে অগস্ত্য মুনি খুব জোর একটা ঢেকুর তুলে হেসে বলছেন 'আরে বাতাপি এখন আসবে কোত্থেকে ওতো হজম হয়ে গেছে'। যিনি পুরো সমুদ্রকে হজম করে নিতে পারেন তাঁর কাছে একটা ছাগল হজম করা কি আর এমন! অগস্ত্য মুনির এই রকম ক্ষমতা ছিল।

অগস্ত্য মুনিকে নিয়ে আরেকটা খুব মজার কাহিনী আছে। সূর্য সব সময় মেরু পর্বতকে পরিক্রমা করেন। বিন্ধ্যাচল পর্বতের খুব হিংসা, তার দাবী সূর্যকে তাকেও পরিক্রমা করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে এটা হবার নয় বলে সূর্য পরিক্রমা করতে চাইল না। তখন বিন্ধ্যাচল পর্বত সূর্যের গতিরোধ করার জন্য নিজেকে বড় করতে শুরু করে দিল। তখন খুব মুশকিল হয়ে গেছে, সূর্যের গতিপথের পরিবর্তন হলে সব ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। তখন সবাই গিয়ে সেই অগস্ত্য মুনিকে ধরেছেন, আপনি কিছু একটা করুন। তখন অগস্ত্য মুনি নিজের স্ত্রী লোপমুদ্রাকে নিয়ে বিন্ধ্যাচলের কাছে এসে বলছেন 'বিন্ধ্যাচল, আমি এখন দক্ষিণ দেশে যাবো, আমায় পথ দাও'। ঋষির আদেশ, বিন্ধ্যাচল মাথা নীচু করল। অগস্ত্য মুনি তখন বললেন 'তুমি এইভাবেই থাকবে যত দিন না আমি দক্ষিণ দেশ থেকে ফেরত না আসি'। অগস্ত্য মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ, গুরু। গুরুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করতে নেই। অগস্ত্য মুনিও নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আর কোন দিন তিনি দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরলেনই না। বিন্ধ্যাচল এখনও ঐ এক ভাবে মাথা নীচু করে রয়েছে। এই কাহিনীকে আধার করে অনেকে বলেন যে দক্ষিণ দেশে প্রথম ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন এই অগস্ত্য মুনি। অগস্ত্য মুনির মাধ্যমেই দাক্ষিণাত্যে বেদের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। এটাকেই কথা কাহিনী রূপে এইভাবে দাঁড় করান হয়েছে।

অগস্ত্য মুনি যখন সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসে তপস্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেই সময় যেতে যেতে তিনি দেখেন পিতৃগণ একটা গর্তের মুখে অধোমুখে লম্বমান হয়ে ঝুলে আছেন। তিনি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন 'আপনারা কার? আর এই ভাবে কেন মাথা নীচের দিকে পা উপরের দিকে করে ঝুলে আছেন'? তখন তাঁরা বলছেন 'আমরা হলাম তোমার পূর্বপুরুষ, এখন আমরা নরকের দিকে যাচ্ছি'। অগস্ত্য মুনি শুনে বলছেন 'আপনারা কেন নরকে যাচ্ছেন, আপনারা তো বেদবাদী, আর আমি তো উচ্চবংশ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি'। 'তুমি ব্রহ্মচারী, তোমার সন্তান হয়নি, আমাদের ক্রিয়াকর্ম কে করবে? সেইজন্য আমাদের এই অবস্থা। তুমি মরবে ব্যাস, আমরাও নরকে চলে যাব'। 'তাহলে আমাকে কি করতে হবে'? 'তোমাকে এখন বিয়ে করতে হবে, সন্তানের জন্ম দিতে হবে'। এখন অগস্ত্য মুনিকে বিয়ে করতে হবে। অগস্ত্য মুনিতো আর যাকে তাকে বিয়ে করতে পারেন না। তখন তিনি এক রাজার মেয়ে ছিল লোপমুদ্রা নাম, তাকে বিয়ে করবেন ঠিক করলেন। এখন লোপমুদ্রাকে অগস্ত্য মুনি বিয়ে করবেন শোনার পর কোন রাজকুমার ভয়ের চোটে আর লোপমুদ্রাকে বিয়ে দেবার জন্য এগোচ্ছে না। কারণ ঋষির দৃষ্টি পড়ে গেছে লোপমুদ্রার উপর, আর কারুর সাহসো কুলোচ্ছে না যে লোপমুদ্রাকে বিয়ে করবে। মেয়েটি যখন বিয়ের উপযুক্ত বয়স হয়েছে তখন রাজার কাছে গিয়ে অগস্ত্য মুনি বলছেন 'তোমার মেয়েকে আমার কাছে সমর্পণ কর'। অগস্ত্য মুনি দেখতে একেবারেই সুন্দর ছিলেন না, শুনে রাজারও খুব মন খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারছে না। অগস্ত্য মুনির অত নাম আর ঐ ক্ষমতা! লোপমুদ্রা যখন জানতে পারল অগস্ত্য মুনি তাকেই পত্নী রূপে চাইছেন তখন রাজাকে গিয়ে আশ্বস্ত করে বলছে 'বাবা, আপনার কোন চিন্তা নেই আমি নিজেই অগস্ত্য মুনিকে বিয়ে করব'। লোপমুদ্রা সঙ্গে সঙ্গে অগস্ত্য মুনির সাথে বেরিয়ে এসেছেন।

লোপমুদ্রার সাথে কিছু দিন থাকার পর অগস্ত্য মুনি বলছেন 'আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম সন্তানের জন্য, এবার তো আমাদের গৃহস্থ কর্ম করতে হবে'। লোপমুদ্রা তখন খুব সুন্দর কথা বলছে 'আমি জানি আপনি আমাকে বিয়ে করেছেন সন্তানের জন্য, আপনাকে সন্তান দেওয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখবেন আপনি ঋষি হতে পারেন কিন্তু আমি একজন রাজকন্যা। কিন্তু আমি যেহেতু আপনার স্ত্রী তাই আপনার এই ঋষির বেশ চিরকাষায় বসন আমিও ধারণ করে রয়েছি'। অগস্ত্য মুনি এতো তপস্যা করেছিলেন যে তিনি শুধু বল্কালাদি মানে চিরকাষায় পড়ে থাকতেন, কিছুই তার কাছে থাকতো না। লোপমুদ্রা বলছেন *অন্যথা নোপতিষ্ঠেয়ং চীরকাষায়বাসিনী। নৈবাপবিত্রো বিপ্রর্ষে ভূষণোঽয়ং কথঞ্চন।* ।৩/৭৩/১৯। এই চিরকাষায় বসন ধারণ করে আমি কিন্তু কোন জাগতিক আমোদ আহ্লাদ করে এই ঋষির বেশকে অপবিত্র করতে পারবো না। তাছাড়া আমি রাজকন্যা, আমার সাথে যদি আমোদ আহ্লাদ করতে হয় তাহলে আমার জন্য মূল্যবান অলঙ্কারাদি, পোষাক ও শয্যার ব্যবস্থা আগে আপনাকে করতে হবে। এখানে দুটো ব্যাপার আসছে। শ্রীমা বলতেন সাধুদের গেরুয়া হল কুকুরের গলার বকলেস্। কুকুরের গলার বকলেস্ দেখলেই বোঝা যায় যে এই কুকুরটা কারুর পালিত। ঠিক তেমনি সাধু যখন গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে থাকে তখন বুঝতে হবে এ হল ভগবানের লোক, এর দিকে দৃষ্টি দিও না। গেরুয়া মানে তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই পোষাক যখন তুমি নিয়েছ তখন ভোগের পথে তুমি আর যেতে পারবে না। অগস্ত্য মুনি এত বড় ঋষি ছিলেন কিন্তু তাঁকেও তাঁর স্ত্রী একজন রাজকুমারী মনে করিয়ে দিচ্ছেন এই বেশে কোন কিছু আমোদ আহ্লাদ করা যাবে না। এটা হল প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হল, আপনি ভুলে যাবেন না যে আমি একজন রাজকুমারী, আপনি মনে করছেন একটা সামান্য শাড়ি আর কিছু ইমিটেশানের গয়না বানিয়ে আমাকে গৃহস্থ বানিয়ে সখ আহ্লাদ করবেন, তা করা যাবে না, আমার যে রকম মর্যাদা সেই অনুসারে সব রকম সাজ পোশাক নিয়ে আসুন।

অগস্ত্য মুনি তখন খুব মিষ্টি আর মোলায়েম হয়ে বলছেন 'তোমার বাবা একজন রাজা, তোমার বাবার যা ঐশ্বর্য, সম্পদ আছে সেই রকম ঐশ্বর্য, সম্পদ আমি কোথায় পাবো, আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তপস্যা ছাড়া আমি জীবনে কিছুই জানিনা'। আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে এই জিনিষগুলোকে খুব সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়। আমাদের ঋষি মুনিরা সব সময় প্রচণ্ড ভাবে সচেতন, কোন নারীকে নিয়ে যদি অধর্ম কারণেই হোক বা ধর্মের কারণেই হোক মন যদ চঞ্চল হয় তখনও খুব সচেতন। লোপমুদ্রা অগস্ত্য মুনির কথা শোনার পর বলছেন ***ঈশোঽশি তপসা সর্বং সমাহর্তুং তপোধন। ক্ষণেন জীবলোকে যদ্ বসু কিঞ্চন সুমধ্যমে।*** ।৩/৯৭/২০। হে স্বামী! এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ইষ্ট বস্তু আছে আপনার ইচ্ছা মাত্রই সব এসে হাজির হয়ে যাবে, আপনার কাছে তপোধন আছে। যে ঠিক ঠিক তপস্যা করেছে সেতো জগতের মালিক। আপনার এত তপস্যা আপনি কেন অত চিন্তা করছেন! আপনি চাইলেই সব এসে যাবে। অগস্ত্য মুনি তখন খুব চিন্তান্বিত হয়ে বলছেন 'তুমি ঠিকই বলেছ, আমি চাইলেই সব এসে যাবে কিন্তু এতে আমার তপস্যার ফল সব ক্ষয় হয়ে যাবে'। তপস্যা করলে প্রচুর ক্ষমতা ভেতরে চলে আসে ঠিকই কিন্তু সেই ক্ষমতাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগালে

তপস্যা ক্ষয় হয়ে যায়। বিশ্বামিত্র অত তপস্যা করে যখন বশিষ্ঠের উপর তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন তখনই তার তপস্যা সব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, আবার তাঁকে নতুন করে তপস্যা করতে হচ্ছিল। তখন অগস্ত্য মুনি লোপমুদ্রাকে বলছেন 'তুমি এমন একটা উপায় বার কর যাতে আমার এই কাজটাও হয়ে যাবে আবার তপস্যাও ক্ষয় হবে না'। লোপমুদ্রা বলছেন 'আপনি যে সন্তান চাইছেন তার জন্য আপনাকে যা কিছু করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ আপনার আর বেশী সময় নেই, কিন্তু আমার যা কথা সেখান থেকে আমি সরছি না। আমিও চাইনা আপনার তপস্যা ক্ষয় হোক আর আপনার ধর্ম নাশ হোক'।

অগস্ত্য মুনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন, লোপমুদ্রাকে রাজকুমারির মত অলঙ্কার আর সাজ পোষাকের ব্যবস্থা করার জন্য কোথায় অত অর্থ পাবেন আবার অন্য দিক তাঁকে পিতৃপুরুষদের নরকে পতন থেকে উদ্ধার করতে হবে। তখন তিনি ঠিক করলেন শ্রুতর্বা রাজার কাছে কিছু অর্থের জন্য অনুরোধ করবেন। এই জায়গাটা খুবই আশ্চর্যের আর অবাক হওয়ার ব্যাপার। অগস্ত্য মুনির মত এক বিরাট ঋষি যিনি কিনা এক রাজার কাছে গিয়ে টাকা চাইছেন নিজের বউয়ের জন্য কিছু গয়না ও শাড়ি কিনবেন বলে। অগস্ত্য মুনি আবার রাজাকে বলছেন 'তোমার যেটা অতিরিক্ত আছে সেখান থেকেই তুমি দাও'। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী এসে হিসেব দেখিয়ে দিলেন ঐ বছর যত আয় হয়েছে তত খরচ হয়ে গেছে, অতিরিক্ত কিছু নেই। রাজা তখন অন্য খাত থেকে অগস্ত্য মুনিকে টাকা দিতে চাইলে অগস্ত্য মুনি অস্বীকার করলেন কারণ এই টাকাতো প্রজাদের কল্যাণের জন্য আমি সেখান থেকে টাকা নিলে প্রজা ও অন্যান্য প্রাণিদের ক্লেশ হতে পারে। অগস্ত্য মুনি টাকা নিলেন না। কিছু দিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল ক্রিকেটের বিশ্বকাপে ভারত জেতার পর বিভিন্ন রাজ্য সরকার থেকে ধোনিদের টিমকে কেউ দু কোটি, কেউ চার কোটি, কেউ পাঁচ কোটি টাকা পুরস্কার দিচ্ছেন। এই টাকা রাজ্য সরকার কোথা থেকে দিচ্ছে? শিক্ষা খাত থেকে এই টাকা দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য যে টাকা রাখা ছিল সেখান থেকে ভারতের ক্রিকেট টিমকে টাকা দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা হলে সেই দেশের শিক্ষার মান আর কত ভালো হবে! তারপর অগস্ত্য মুনি ইল্বলের কাছে গিয়েছিল। আর ঐভাবে বাতাপিকে হজম করে দেওয়ার পর ইল্বল খুব ভয় পেয়ে গেছে। তখন অগস্ত্য মুনি তার কাছে কিছু ধন সম্পদ চেয়েছিল। ইল্বল কিন্তু তাতেও অগস্ত্য মুনিকে ছাড়েনি। ইল্বল বলছে 'আচ্ছা বলুন তো আমি মনে মনে আপনাকে কত ধন দেব বলে ঠিক করেছি'। অগস্ত্য মুনিও যোগশক্তিতে ইল্বলের মনের সব খবর জেনে নিয়ে বলে দিলেন তুমি আমাকে এত ধন সম্পদ দেব বলে ঠিক করেছ। ইল্বল ঠিক ততটাই অগস্ত্য মুনিকে দিলেন। সেখান থেকে অগস্ত্য মুনির সন্তান হয়ছিল। সেই সন্তান থেকে আবার বংশ পরম্পরা রক্ষা হতে থাকল।

দধীচি মুনির কাহিনী

পাণ্ডবরা সব তীর্থে ঘুরছেন। এরপর আসছে দধীচির কাহিনী। দেবতারা একবার তাঁদের সব অস্ত্র দধীচির কাছে সংরক্ষিত রেখেছিল। দধীচির স্ত্রী একদিন দধীচিকে বলছে 'আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের কাছে এই ধরণের অস্ত্রশস্ত্র রাখাটা ঠিক নয়, তাছাড়া এগুলো চুরিটুরি হয়ে যেতে পারে, তখন আবার আরেক বিপদ হতে পারে'। তখন দধীচি যত অস্ত্র তাঁর কাছে দেবতারা মজুত রেখেছিল সব অস্ত্রগুলিকে মন্ত্রসিদ্ধ করে জলের মধ্যে নিয়ে এসে সেই জলটাকে পান করে নিয়েছেন। অস্ত্রের যত তেজ ও শক্তি সব এখন দধীচির শরীরের চলে গেছে। এবার দেবতাদের বৃত্রাসুরকে বধ করতে হবে, কিন্তু বৃত্রাসুরকে বধ করার কোন উপায় নেই। একমাত্র দধীচির দ্বারাই এই বৃত্রাসুরের বধ হতে পারে। তিনি এমন তপস্যা করেছেন যে তার মধ্যে এক প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হয়েছে অন্য দিকে সমস্ত অস্ত্রকে মন্ত্রসিদ্ধ করে পান করে নিয়েছিলেন বলে তাঁর হাড়ের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি এসে গেছে। এখন সেই হাড় দিয়ে যদি বজ্র তৈরী করা হয় তাহলে একমাত্র ঐ বজ্রেই বৃত্রাসুরকে বধ করা যাবে। দধীচি সব শুনে বললেন 'এমনিতে তো আমার শরীর যাবে না, আমি ধ্যানে বসে যাচ্ছি আর তোমরা আমার গলাটা কেটে দাও। লোকহিতের জন্য আমার হাড় নিয়ে যাও'। ব্যস্, উনি ধ্যানে বসে গেলেন আর তখন ইন্দ্র এসে দধীচির গলাটা কেটে দিলেন। খ্রীশ্চানরা বলে যিশু মানবহিতের জন্য নিজের জীবন দিয়ে দিলেন। আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে এই রকম কত যিশু আছে আমরা নিজেরাই জানিনা। আমার হাড় দিয়ে মানব কল্যাণের জন্য অশুভ শক্তিকে নাশ করতে হবে, ঠিক আছে নিয়ে নাও আমার হাড়। তারপর সেই হাড় থেকে বজ্র তৈরী হল। এই রকম নানা কাহিনী চলছে। কাহিনীর পর কাহিনী চলছে, এই কাহিনীর জন্যই মহাভারত এত বিখ্যাত।

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির কাহিনী

এরপর আসছে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির কাহিনী। যে কজন বড় ঋষির নাম আমরা পাই তার মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ খুব বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। শৃঙ্গী ঋষি থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ নাম হয়েছে। এই নামের পেছনেও আবার বিরাট কাহিনী আছে। বিভাণ্ডক নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি থেকে খুব তপস্যা করতেন। কিন্তু কিভাবে কোন এক অপ্সরার সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। সেইখান থেকে তাঁর এই ঋষ্যশৃঙ্গ নামে সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু পরবর্তি কালে বিভাণ্ডক বুঝতে পারেন যে তাঁকে প্রতারিত করা হয়েছে। সেই থেকে তিনি মেয়েদের নাম শুনলেই রেগে যেতেন, মেয়েদের নাম সহ্য করতে পারতেন না। তিনি তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে এইজন্য খুবই সামলে রেখেছিলেন, যাতে কোন নারীর মুখও না দেখতে পায়। এই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকেই রামায়ণেও দেখতে পাওয়া যাবে, রাজা দশরথের যখন কোন সন্তান হচ্ছিল না, তখন তিনি সন্তান লাভের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা করেছিলেন। যজ্ঞের জন্য একজন পুরোহিতের দরকার। বশিষ্ঠ মুনির আজ্ঞায় ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোহিত করে অযোধ্যায় নিয়ে আসা হয়েছিল। যাই হোক ঋষ্যশৃঙ্গ এখন বড় হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে নিজের বাবাকে ছাড়া আর কোন কিছুই জানেনা। অন্য কোন ধরণের প্রাণী যে হয় সেটাই সে জানেনা।

সেই সময় অঙ্গ দেশ, অর্থাৎ ভাগলপুরের কাছে লোমপাদ বলে এক রাজা ছিলেন। কোন এক অভিশাপের ফলে বেশ কয়েক বছর ধরে অঙ্গ দেশে কোন বৃষ্টি হচ্ছিল না। তখন একজন বললেন, যদি কোন বড় ঋষিকে এই রাজ্যে নিয়ে আসা হয় তাহলে বৃষ্টি হবে। বড় ঋষির কথা বলাতে সবাই ঋষ্যশৃঙ্গের নাম করল। কিন্তু সমস্যা হল ঋষ্যশৃঙ্গকে এই রাজ্যে নিয়ে আসা হবে কি করে! তাঁর বাবা বিভাণ্ডক এমন তেজী যে যদি জানতে পারেন তাঁর ছেলেকে নিয়ে যেতে এসেছে তাহলে রেগে অভিশাপ দিয়ে হয়ত সবাইকে ভস্মই করে দেবেন। সে তাঁর ছেলেকে যেভাবে আগলে রেখেছেন তাঁকে নিয়ে আসা দূরের কথা দেখাই করতে দেবেন না। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গকে তো আনতে হবে। আর এও বলা হয়েছিল যে রাজা যদি তাঁর কন্যার সাথে ঋষ্যশৃঙ্গের বিয়ে দেন তাহলে রাজ্যে আর কখনই কোন অমঙ্গল হবে না।

এখন তাঁকে এই রাজ্যে আনা হবে কি করে? ঠিক হল, কয়েকজন নর্তকী মানে সেই দেশের কয়েকজন গণিকাকে পাঠানো হবে। সেইভাবে তারা নৌকা করে অযোধ্যার কাছাকাছি গেছে। আর গুপ্তচর লাগিয়ে নজর রাখছে বিভাণ্ডক মুনি কখন আসেন আর কখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে যান। যখন বিভাণ্ডক মুনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন এই নর্তকীরা ভালো ভালো খাবার দাবার, পানীয় নিয়ে আশ্রমে গেছে। এতো সুন্দর সুন্দর উৎকৃষ্ট খাবার দাবার নিয়ে এসেছে যেগুলি জীবনে ঋষ্যশৃঙ্গ কোন দিন দেখেইনি। আর এমনিতে ওরা সব নারী, তায় আবার গণিকা ছিল, কিন্তু সবাই পুরুষের বেশে তপস্বী সেজে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে গেছে। তারা একেই ছিল রূপসী নারী তার উপর এতো সুন্দর সেজেছে, ঋষ্যশৃঙ্গ সবাইকে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

পরে সন্ধ্যে বেলায় ওর বাবা যখন ফিরে এসেছে তখন ছেলে বাবাকে বর্ণনা করছে 'বাবা কয়েকজন ব্রহ্মচারী এসেছিল, ওরা যে কি উদার, আমাকে খাওয়ার জন্য জল দিল সেই জলটা যে কি মিষ্টি, ঐ রকম জল আমি কোন দিন খাইনি'। আসলে ওটা যে শরবৎ ছিল সেটা ঋষ্যশৃঙ্গ জানেই না। বলছেন 'বাবা, ওদের গলায় এমন একটা মালা ছিল যেটাতে আকাশে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, সেই রকম মালাটা চমকাচ্ছিল'। আসলে ওটা আর কিছু নয়, ওটা একটা মুক্তাহার ছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ জঙ্গলে বড় হয়েছে মুক্তাহার কি জিনিষ সে জানেইনা। 'আর তাদের শরীরের সামনের দিকটা সরু, পেছন দিকটা ভারী' – আসলে মেয়েদের শরীর সে কোনদিন দেখেই নি। মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। 'ওরা যখন আমার সাথে খেলাধুলা করছিল তখন আমার এত আনন্দ হচ্ছিল মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা ঘুরছে। আর তারা যে খাবারগুলো দিয়েছে, ফলটল যা দিয়েছে আমরা এই জঙ্গলে যে ধরনের ফল খাই সেরকম নয়, ঐ ফলের স্বাদই আলাদা। আর জল যেটা পান করতে দিয়েছে, সেই জলের কি সুগন্ধ কল্পনাই করা যায় না। ব্রহ্মচারীরা যখন এই আশ্রমে এলো আশ্রমটা যেন তখন আলোময় হয়ে ঝলমল করছিল। আর যে জলটা আমায় পান করতে দিয়েছিল সেটা এতো মিষ্টি যে খেয়ে আমার এমন আনন্দ হতে লাগলো, কি বলব আপনাকে'। আসলে ঐ জলটা আর কিছুই নয়, জল বলে ছেলেকে মদ খাইয়ে দিয়েছে। এই সব খেয়ে দেয়ে তো তার মাথা গেছে খারাপ হয়ে। বলছে 'বাবা, দেখুন এরা যখন থেকে এই আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে তখন থেকে আমার আর মন কোন কাজে লাগছেনা। আমার মনটা ওদের সঙ্গেই পড়ে আছে, আপনি যদি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেনতো'। ওদিকে নর্তকীরা সব ভয় পাচ্ছে বিভাণ্ডককে। ঋষ্যশৃঙ্গ বাবকে বলছে 'বাবা আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওদের কাছেই যাই, আমি দেখতে চাই ওরা কিভাবে সাধনা করে'। আসলে ঋষ্যশৃঙ্গ ছিল ব্রহ্মচারী, ওরাও ব্রহ্মচারীর বেশে এসেছিল। তাই ঋষ্যশৃঙ্গ ভাবছে ওরা ব্রহ্মচর্য সাধনা করছে – ব্রহ্মচর্য মানে একটা বিশেষ ব্রত নিয়ে তপস্যা করা। ওরা কি ধরণের তপস্যা করছে, ওদের জীবন পরিচর্যাটা কি ধরণের যার জন্য ওদের এত সুন্দর

ফল, এত মিষ্ট সুগন্ধ জল, ওদের এত সুন্দর দেখতে, শরীরটা এত সুন্দর কি করে হল? আমরা এত রুক্ষ শুষ্ক। ঋষ্যশৃঙ্গ হঠাৎ যেন তাঁর শরীরের ব্যাপারে খুব সচেতন হয়ে গেছে।

মানুষের মনের ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য, মনের যে বিচিত্র আচরণ এর উপর যত কাহিনী আছে তার মধ্যে মহাভারতের এই ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী সত্যিই অনন্য। একটা লোককে ছোটবেলা থেকে এমন ভাবে বড় করা হয়েছে যে জীবনে কোনদিন নিজের বাবাকে ছাড়া কোন নারীতো দূরের কথা, কোন পুরুষের শরীরই দেখেনি। কিন্তু হঠাৎ তার সামনে কিছু অন্য মানুষের আবির্ভাব ঘটে গেলে। তার মনের মধ্যে যে Genetic blue print রয়েছে সেখানে তার মনের আবেগ, ভালোবাসা এগুলো এতদিন চাপা হয়ে পড়েছিল। আগন্তুকদের দেখেই বিষয় সংযোগ হতেই হঠাৎ করে সব জেগে উঠেছে। সেইজন্য বলছে গীতাতে *'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ'*। একটা লোককে সমস্ত ভোগ সামগ্রী থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিলে কিছু বোঝা যাবে না, মনে হবে সে বিরাট মহাপুরুষ। এই যে আমরা দেখি নির্জন আশ্রমে কি জঙ্গলে সাধু সন্ন্যাসীরা দিনের পর দিন থাকেন, ভাবি তারা বুঝি বিরাট কিছু, কিন্তু ভোগের বিষয়ের একটু সামান্য ছিঁটা মেরে দিলেই ফস্ করে সব জেগে উঠবে। ঋষ্যশৃঙ্গ বাবাকে বলছেন, আমার ভেতরে এত আনন্দ হচ্ছিল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, পৃথিবীটা ঘুরছে। কারণ, যতক্ষণ না কারুর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ না হচ্ছে তার আগে পর্যন্ত যখন তখন তার পতন হয়ে যেতে পারে। তিনি কেন মহৎ? কারণ তাঁকে এখনও ভোগের বিষয়ের উত্তেজনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। আর ভোগের বিষয়ের আকর্ষণ থেকে দূরে থাকার ব্যাপার জানার কিছু দরকারই নেই, সামান্য যখন loud speakerএ হিন্দী সিনেমার গান গুলি বাজান হয়, সেই গানের অর্থ বুঝুক আর নাই বুঝুক, গানের ছন্দে শরীর নিজে থেকেই দুলতে থাকবে।

সমস্ত বস্তুর একটা আকর্ষণ শক্তি থাকে। আমরা মনে করি the world is purely subjective, কথায় আছে -Beauty lies in the beholder. আমি আপনাকে সুন্দর দেখছি কি দেখছিনা সেটার ওপর আপনার সৌন্দর্য নির্ভর করে। এর অন্য একটা দিকও আছে। ঠাকুরের কথায় আছে – কেউ যদি বুট জুতো পড়ে নেয় তাহলে সে দুটো সিড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে যাবে, আর শিস্ দিতে থাকবে। আমাদের মনে বস্তুর একটা প্রভাব পড়ে। আমার যদি একটা দামী ঘড়ি থাকে, একটা দামী সেল ফোন থাকে তখন আমি তখন সেই দামী বস্তুর ব্যাপারে সব সময় সজাগ। প্রত্যেক দ্রব্যের একটা গুণ থাকে, এই গুণটাই তার মনের উপর খেলা করতে থাকে। এইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের ভোগ সামগ্রী, দামী কোন জিনিষ কাছে রাখতে নিষেধ করা হয়। রাখলে কি তাদের তপস্যা নষ্ট হয়ে যাবে? না, তা হবেনা, কিন্তু ঐ দ্রব্যগুলির একটা প্রভাব মনের মধ্যে পড়ে। এই যে সন্ন্যাসী ঋষ্যশৃঙ্গকে এতদিন বিভাণ্ডক ঋষি এত সামলে রেখেছিলেন, কিন্তু বেচারারতো এখনো ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, তপস্যাতেও এখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে জানতও না নারী কাকে বলে, কিন্তু যে মুহুর্তে ঐ সৌন্দর্য দেখে নিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নারী শরীরের তন্মাত্রা তাকে ঘিরে ফিলেছে, বাবাকে সে যেভাবে নারী শরীরের বর্ণনা দিয়ে গেছে ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। কেবলই বলছে আমার আর মন ভালো লাগছে না, ওদের কাছে যাবার জন্য ছটফট করছে। একবার মাত্র দেখেছে – আর তাতেই বলছে 'আমি ওদের কাছেই যাব, ওরা কিভাবে তপস্যা করে জানতে চাই'।

এইসব কথা শুনে বিভাণ্ডক খুব চিন্তিত হয়ে গেছেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলছেন 'দ্যাখো, এখানে অনেক রাক্ষস টাক্ষস থাকে, এদেরই কেউ এসে তোমাকে ফাঁসাবার মতলব করেছে মনে হচ্ছে, তুমি কিন্তু নিজেকে খুব সংযত ও সাবধানে রাখবে'। পরের দিন বিভাণ্ডক আশ্রম থেকে বেরিয়ে যেতেই, গণিকাগুলি আশ্রমে এসে হাজির হয়েছে। যেই ওরা ঢুকেছে, ওদের দেখেই ঋষ্যশৃঙ্গ আনন্দে ফেটে পড়েছে। মহাভারতে যেভাবে এই আনন্দের বর্ণনা দেওয়া আছে অবাক হয়ে যেতে হয়, কিন্তু বাস্তবে এইটাই হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ বলছে 'চল চল, বাবা ফেরত আসার আগেই আমরা তোমাদের আশ্রমে যাই, বাবা এসে পড়লে তোমাদের উনি পছন্দ করবেন না। চল তোমাদের আশ্রমে গিয়েই আনন্দ করব'। ঋষ্যশৃঙ্গ নিজেই যাবে বলে তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, তাকে আর কিডন্যাপ করতে হচ্ছেনা।

ভোগসামগ্রীর মধ্যে পড়ে সাধু, সন্ন্যাসীদের যেরকম দুরবস্থা হয় ভাবা যায় না। যারা এগুলি জানেন, শুধু তারাই জানেন। মাথা ঘুরে যায়। দশকুমার-চরিত্রে এরকম সব আছে। মারীচ বলে এক ঋষি ছিলেন। দুটো নর্তকীর মধ্যে বাজি হয়েছে, কে ঐ সাধুকে ফাঁসিয়ে বিয়ে করাতে রাজী করতে পারবে। একজনতো গিয়ে খুব সেবা টেবা করতে শুরু করে দিল। বেশ কয়েক দিন থাকতে থাকতে সাধু বাবাতো আর সামলাতে পারছেনা নিজেকে, একদিন সে বলেই বসল যে সে তাকে বিয়ে করবে। এরপর শেষমেশ না থাকতে পেরে রাজার কাছে গিয়ে সাধু মেয়েটিকে বলছে 'আমাকে বিয়ে কর'। তখন নর্তকী বলছে 'বিয়ে! আর তোমার মত এক বুড়োকে বিয়ে করব! আরে আমাদের মধ্যে বাজি ছিল তোমার মত একজন সাধুকে বিয়ে করাতে রাজী করান। বেরোও বুড়ো'।

এই হচ্ছে ব্যাপার, সমস্ত সাধককুলকে তাই বলা হয় – ভোগ্যবস্তু থকে দূরে থাকতে। এরপর যেই শারীরিক ভাবে ভোগসামগ্রী থেকে দূরে সরে আসা গেল তখন আবার মনের সূক্ষ্ম স্তরে সচেতন ভাবে এই ভোগ্য বিষয়ের ব্যাপারে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ঠাকুর বলছেন – তেঁতুলের কথা শুনলেই জিভে জল চলে আসে, এই দ্যাখ, তেঁতুল বলতে বলতে আমারই জিবে জল এসে গেছে। দ্রব্যগুণে কি হয়, ঐ জিনিষটাকে ভোগ করার দরকার নেই, থাকলেই হল, তাতেই তোমাকে নাচিয়ে দেবে।

এই কাহিনীতে এই ব্যাপারটাকেই বলা হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ বলছে 'চলো চলো, বাবা এসে গেলে তোমাদের উপর রাগ করবে, বরং আমরা তোমাদের আশ্রমেই যাই'। কিন্তু সে তো আর জানেনা যে এদের কোন আশ্রমই নেই। বিরাট একটা নৌকাকে camouflage করে আশ্রমের একটা রূপ দেওয়া হয়েছে। মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গও নৌকাতেই গেছে। ওখানে নিয়ে তাকে খুব করে মদ টদ খাইয়ে বেহুঁশ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। নৌকা চলতে শুরু করল। ঋষ্যশৃঙ্গ টেরও পেলনা। এদিকে বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে এসে দেখে ছেলে নেই। তিনি তাঁর যোগ শক্তিতে বুঝতে পারলেন যে আমার সন্তানকে অপহরণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে এরা অঙ্গ দেশে পৌঁছে গেছে। আর ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ রাজ্যের মাটিতে যেই পা রেখেছে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঋষ্যশৃঙ্গ কত বড় ঋষি ছিলেন যে, যেই মাত্র অঙ্গ দেশের মাটিতে পা দিয়েছেন বৃষ্টি হতে শুরু হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদে আসার পর রাজা তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিয়েও দিয়ে দিলেন। এদিকে বিভাণ্ডক পায়ে হেঁটে তাড়া করতে করতে ঐ অঙ্গ রাজ্যের দিকে চলেছেন। রাজা জানতেন বিভাণ্ডক ঋষিও খুব বড় তপস্বী, তাঁর ছেলেকে যেভাবে অপহরণ করে এনে তাঁর মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন তিনি যদি কোন অভিশাপ দিয়ে দেনতো সব চেষ্টাই বিফল হয়ে যাবে। বিভাণ্ডকতো সবই জানতে পারবেন। তাই আগে থাকতেই তাঁকে শান্ত করবার জন্য বিভাণ্ডক ছেলেকে উদ্ধার করতে যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই তাঁকে খুব খাতির আদর যত্নাদি করা হচ্ছে, পা টিপে সেবাটেবা করা হচ্ছে। বিভাণ্ডক ঋষি এত সব সুন্দর আয়োজন দেখে জিজ্ঞেস করছেন 'এগুলি কার ব্যবস্থা আর এত জিনিষ দিয়ে কে আমাকে আপ্যায়ন করছে'? তখন রাজার লোকেরা বলছে 'এখানে আমাদের যে রাজা আছেন, সেই রাজা ঋষ্যশৃঙ্গেরই সব ব্যবস্থা, সব তাঁরই জিনিষ'। রাজারতো কোন পুত্র ছিলনা, একটিই মাত্র কন্যা, এখন ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়াতে প্রকারান্তরে সেই এখন রাজা। বিরাট লম্বা পথ দিয়ে চলেছেন বিভাণ্ডক ঋষি, আর কিছু দূর পরে পরেই রাজার লোকেরা তাকে বিরাট খাতির করে চলেছে। এইভাবে আস্তে আস্তে তাঁর যে রাগটা ছিল সেটা প্রশমিত হতে থাকল। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ সিংহাসন নেননি, বউকে নিয়ে আশ্রমেই থাকতেন আর ঋষি হয়েই ছিলেন। পরে রামায়ণে রাজা দশরথ যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ সেই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হয়েছিলেন। যজ্ঞের যে অগ্নি দেবতা তিনি নিজে তাঁর হাতে পায়েসের বাটি তুলে দিয়েছিলেন। কত বড় ঋষি ছিলেন যে স্বয়ং অগ্নি দেবতা নিজে পায়েসের বাটি হাতে করে এনে ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়েছিলেন।

এরপর জামদগ্নির সন্তান পরশুরামে বিরাট কাহিনী। তিনি কিভাবে রেগে গিয়ে পৃথিবীতে যত ক্ষত্রিয় আছে, একুশবার তিনি তাদের শেষ করে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। সহস্রার্জুন রাজা ওনার বাবাকে মেরে দিয়েছিলেন, সেই রাগেই তিনি এমনটি করেছিলেন।

চ্যবন ঋষি ও সুকন্যার কাহিনী

তারপরে আরেকটি সুন্দর কাহিনী আছে, চ্যবন ঋষি আর সুকন্যা কাহিনী। চ্যবন ঋষির কাহিনী বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে। এক সময় চ্যবন ঋষি এমন তপস্যা করছিলেন যে তাঁর চারিদিকে উঁইয়ের ঢিপি হয়ে তাঁকে ঢেকে দিয়েছিল, ঠিক যেমন বাল্মীকি মুনির হয়েছিল। সুকন্যা ঐ দেশের যে রাজার কন্যা। খুব আদরিণী মেয়ে ছিল। একদিন সুকন্যা সবার সাথে পিকনিকে গেছে। পিকনিকে গিয়ে সখীদের সাথে খেলা করতে করতে এক জায়গায় একটা উঁইয়ের ঢিপি দেখতে পায়। ওরা বুঝতে পারেনি। ঐ ঢিপির মাঝখানে আবার দুটো ফুটো ছিল, সে ফুটো দিয়ে সুকন্যা উঁকি মেরে দেখে ঢিপির ভেতরে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। ওরা ভেবেছে ঢিপির মধ্যে কোন হরিণ লুকিয়ে আছে। সুকন্যা তখন বাচ্চা মেয়ে, কিছু বুঝতে না পেরে চুলের কাঁটা দিয়ে ঐ ফুটোতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আসলে ওটা ছিল মুনির চোখ, চ্যবন মুনি ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, চোখে চুলের কাঁটা বিদ্ধ হয়ে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। কিছু পরেই দেখা গেল ঐ ফুটো দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। রক্ত যেই বেরোচ্ছে ঐ দেখেই সুকন্যা ভয়ে কাঁটা ফাঁটা ফেলে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যে মুনির ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেছে, তখন তাঁর এত প্রচণ্ড রাগ হয়েছে যে তাতে রাজার যত হাতি ঘোড়া ছিল তাদের সব রকমের শারীরিক ক্রিয়া থমকে গেল। বিরাট তপস্বী ছিলেন কিনা। অর্থাৎ পায়খানা, প্রস্বাব, কিছুই করতে পারছেনা। তার ফলে পশু গুলো সব চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। এইসব অদ্ভুত কাণ্ড দেখে মন্ত্রিরা চিন্তায় পরে গেলেন। তারা ভাবলেন নিশ্চই কোন ঋষি মুনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা নাহলে এই অদ্ভূত কাণ্ড কিছুতেই হতে পারেনা। সবাই অনুসন্ধান করতে করতে চ্যবন ঋষি যেখানে তপস্যা করছিলেন সেখানে গিয়ে দেখেন এই ব্যাপার। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। বাচ্চা মেয়ে না জেনে ভুল করে ফেলেছে – এইসব বলে ঋষিকে ক্ষমা করে দিতে বললেন। চ্যবন মুনি বলছেন 'ক্ষমা না হয় আমি করে দেব কিন্তু আমি যে অন্ধ হয়ে গেলাম'। সবাই বলছে 'তাহলে কি উপায়'? মুনি তখন বলছেন 'উপায় আর কি, তোমার মেয়েকে আমার সেবায় দাও, তা নাহলে এই অবস্থায় আমাকে দেখবে কে'? সঙ্গে সঙ্গে সুকন্যা বলছে 'হ্যাঁ বাবা আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমাদের সবার মঙ্গলের জন্য আমি সারা জীবন এনাকেই সেবা করে যাব'। শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর কাহিনীতেও আমরা দেখেছিলাম – কুলের স্বার্থে একজনকে ত্যাগ করতে হয়, আর গ্রামের স্বার্থে পুরো একটা পরিবারকে ত্যাগ করে দিতে হয়।

সুকন্যা মুনির কাছে চলে এসেছে। সেই মেয়ে এখন মুনিকে এমন নিষ্ঠা দিয়ে সেবা করতে লাগল যে তাতে চ্যবন মুনি তার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যতই হোক একে বুড়ো স্বামী তার উপর অন্ধ। একদিন দুই অশ্বিনীকুমাররা ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখেন অল্প বয়সী সুন্দরী যুবতী একটি মেয়ে এই বুড়ো স্বামীর সঙ্গে পড়ে আছে। ওরা গিয়ে সুকন্যাকে বলছে 'এ কি করছ তুমি, তোমার এই যৌবন এই বুড়ো বরের সঙ্গে থেকে কেন নষ্ট করছ? এসব ছাড়ো, বুড়ো মুনিকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে চলে এসো'। সুকন্যাতো সাথে সাথেই বলে দিল 'এ কি ধরণের কথা আপনারা বলছেন, এসব আমার চিন্তারও বাইরে'। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যাকে বলল 'ঠিক আছে, আমরা তোমার বুড়ো স্বামীকে সুন্দর যুবক বানিয়ে দেব। কিন্তু সে আমাদের মতই দেখতে হয়ে যাবে আর আমরা তিন জনে এক সঙ্গে দাঁড়াব, ঐ তিন জনের মধ্যে থেকে তোমাকে তোমার স্বামীকে বেছে নিতে হবে। যাকে তুমি বাছবে সেই তোমার স্বামী হবে'। নল-দময়ন্তীর ক্ষেত্রে দেবতারা যে কায়দা করেছিল, এখানেও অশ্বিনীকুমাররা তাই করতে চাইছে। তখন এরা সবাই গিয়ে চ্যবনকে সব কথা বলল, চ্যবন শুনে রাজী হয়ে গেলেন।

ওরা তিন জনে মিলে একটা জলাশয়ে নেমেছে ডুব দিতে। ডুব দিয়ে যখন উঠে আসছে তখন তিন জনকেই একই রকম দেখতে হয়ে গেছে। এই তিনজনের মধ্য থেকে সুকন্যাকে তার স্বামীকে বেছে নিতে হবে। তখন সুকন্যা মনে মনে ঠিক করল – আমিতো পতিব্রতা, আমি কখনই নিজের স্বামীকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষের কথা চিন্তাতেও আনতে পারিনা। এই পতিব্রতাই আমাকে স্বামীর কাছে নিয়ে যাবে। এই ভেবে নিয়ে সুকন্যা যেই তিনজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়েছে দেখছে সুকন্যা চ্যবন মুনির গলাতেই মালা দিয়েছে। নল-দময়ন্তীতে আমরা যেমন দেখেছিলাম, দেবতাদের ঘাম হচ্ছেনা, মালা শুকিয়ে যাচ্ছেনা, মাটিতে পা পড়ছে না। সুকন্যা এসব কিছুই ভাবল না, আর দেবতাদের যে এইভাবে আলাদা করা সম্ভব, সেই দিকেই গেল না। সুকন্যা শুধু নিজের পতিব্রতাকে স্মরণ করে নিল আর তিনজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিল। অশ্বিনীকুমারেরা খুব খুশী, তাঁরা সুকন্যা বললেন 'তোমার স্বামীর এখন থেকে এই রূপই বরাবরের জন্য থেকে যাবে'। চ্যবন এখন বলছেন, 'তোমাদের জন্য আমার এই সুন্দর রূপ আর যৌবন পেয়েছি তাই আমিও তোমাদের আশীর্বাদ করব'। কি আশীর্বাদ করবেন ঋষি? আগে যখন যজ্ঞ করা হত, তখন অশ্বিনীকুমারদের যজ্ঞের সোমরস পান করবার কোন অধিকার ছিলনা। ঠাকুর বলতেন ডাক্তার আর উকিলের ছোঁয়া খেতে পারিনা। ভারতে বরাবরই ডাক্তারি পেশাকে খুব নীচু ভাব নিয়ে দেখা হত। বিদেশেও তাই ছিল, ডাক্তারদের নিচু ভাব নিয়ে দেখা হত আর ধারণা ছিল যারা ভালো কিছু হতে পারেনা তারাই ডাক্তার হয়। বর্তমান যুগে এর ঠিক উল্টো হয়ে গেছে। অশ্বিনীকুমারেরা বৈদ্য ছিলেন বলে যজ্ঞে সোমরস পান করার অধিকার ছিল না, এটা এক ধরণের অপমান করা। দক্ষ যজ্ঞে সেখানেও একই ব্যাপার ছিল শিবকে যজ্ঞের কোন ভাগ দেওয়া হত না। বেদের সময় ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা, রাজা যাকে বলবে দিতে তাকেই দেওয়া হবে আর যাকে দিতে বারণ করা হত তাকে দেওয়া যেত না।

সুকন্যার বাবা রাজা শর্য্যাতি এখন খবর পেয়েছেন যে চ্যবন মুনি যৌবন প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি সস্ত্রীক জামাতা আর কন্যাকে দেখতে এসেছেন। চ্যবন ঋষিকে দেখে বাবা-মা দুজনেই আহ্লাদিত। চ্যবন ঋষি রাজাকে কথা দিলেন আপনি যে যজ্ঞ করবেন আমি নিজে গিয়ে সেই যজ্ঞ সম্পাদন করব। রাজা এখন যজ্ঞের আয়োজন করে চ্যবন ঋষিকে নিয়ে এসেছে। ঋষিও যজ্ঞ করতে বসে সবার নামে আহুতি দিয়ে অশ্বিনীকুমারদের নামেও আহুতি দিয়েছেন। চ্যবন প্রচণ্ড ক্ষমতাবান ঋষি

ছিলেন। অশ্বিনীকুমারদের আহুতি দিতেই ইন্দ্র প্রচণ্ড রেগে গেছেন, এরা যজ্ঞের অধিকারী নয়, আপনি এদের নামে আহুতি দিতে পারেন না। আগেকার দিনে জমিদারের বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ মাথার উপর ছাতা খুলে যেতে পারতনা, ইন্দ্রের রাগটা ঐরকমের কিছু ছিল। ইন্দ্র ঠিক করলেন বজ্র চালিয়ে চ্যবন ঋষিকে মেরে দেবেন। এই ঠিক করে ইন্দ্র বজ্র মারবেন বলে হাতটা একটু উপরে তুলেছেন আর সেই সময় চ্যবন ঋষি ইন্দ্রের দিকে এমন একটা দৃষ্টিপাত করলেন যে ইন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাঁর হাতটা যে রকম উপরে তোলা ছিল, সেই অবস্থাতেই থেমে রইল। ইন্দ্রের ঐ অবস্থা দেখে দেবতাদের এক মহা সমস্যা হয়ে গেছে। ক্ষমা চেয়ে কোন রকমে মিটমাট করে অশ্বিনীকুমারদের যজ্ঞে অধিকার দিয়ে দেওয়া হল। মহাভারতে ঋষিরা তপস্যা আর মন্ত্রের শক্তিতে দেবতাদেরকেও বশে করে নিতে পারতেন। এইখানে এসে বোঝা যায় বৈদিক যুগের ধারণাগুলো মহাভারতের এসে কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে। বেদের কোন মন্ত্র পাল্টে যাচ্ছে না, কিন্তু বেদের অনেক ধারণাকে মহাভারতে এসে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। বেদের সময় যে ইন্দ্র ছিলেন দেবতাদের রাজা, তাঁর সমস্ত রকমের ক্ষমতা, আর বেদে সব থেকে স্তুতি ইন্দ্রকে নিয়েই। সেই ইন্দ্রকে মর্ত্তের এক ঋষির কাছে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হচ্ছে। এটাকে দেখানোর জন্যই এই কাহিনীটা বলা হল। পরবর্তি কালে মহাভারত যাদের মূল্য দিলো তারাই থাকল, মহাভারত যাদের উড়িয়ে দিল তারা সবাই বাদ হয়ে গেল। ভারতের যারা ইতিহাসবিদ্ তাদের অনেকেই বলেন – মহাভারত হল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ। কিন্তু ইতিহাসবিদদের এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা, এই ধারণাকে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। কেননা মহাভারত লিখেছেন ব্যাসদেব, যিনি তখনকার দিনে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কি করে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লিখতে যাবেন। কিন্তু এটা ঠিক বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারত এই উভয় সাহিত্যে, বিশেষ করে মহাভারতে বৈদিক দেবতাদের অনেক নীচু করে দেওয়া হয়েছে।

এই কাহিনীতে আমরা কি দেখছি? অশ্বিনীকুমাররা বৈদিক যুগে কোন গুরুত্বই পাননি অথচ মহাভারত তাঁদের বড় করে দিচ্ছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের গুরুত্বকে খর্ব করতে কে আসছেন? স্বয়ং দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। কিন্তু একজন ঋষির কাছে তাঁকে ছোট করে দেওয়া হল। এটার আবার দুই ভাবে ব্যাখ্যা হতে পারে। এক – বৈদিক দেবতাদের হাসি মেরে মজা করে উড়িয়ে দেওয়া হল। দুই – এটাকে একটা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তখন যে একটা শক্তি মাথা তুলছে তার তথ্য দিচ্ছে, আর এটাই বেশীর ভাগ ইতিহাসবিদদের কাছে গ্রহণীয় হয়েছে। তাই যদি হয়, কে কার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চাইছে? ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। এই জিনিষ কি কখন হতে পারে? অথচ এই মহাভারতেই আবার এই তীর্থপর্বেই বলা হচ্ছে অমুক তীর্থে যাবে আর সেখানে ব্রাহ্মণদের এতো এতো দান করবে, না করলে তুমি তীর্থের ফল পাবে না। যদি সত্যিই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বলার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তারা কখনই তীর্থে গিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করার কথা বলতে যেতেন না।

মহাভারতে মিত্রকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, তাই পরবর্তি কালে ভারতে মিত্রকে কেউ মনেই রাখেনি। যমকে কিছু গুরুত্ব দিয়েছে তাই এখনো যমকে অনেকে মানে। আর ইন্দ্রকে মহাভারত একেবারে ক্যারিকেচার বানিয়ে দিয়েছে। বরুণের কথা ভুলেই গেছে। দ্বাদশ আদিত্যকে মহাভারত কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছে, যখন যুধিষ্ঠির বনে সূর্যের উপাসনা করেছেন আর সূর্য তাঁকে অক্ষয় পাত্র দিয়েছিলেন। অক্ষয় পাত্রের খাবার দাবার কখন শেষ হতো না। মহাভারত যাকেই গুরুত্ব দিয়েছে ভারত তাকেই মাথায় তুলেছে, যাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি, ভারত তাকে ভুলে গেছে। মহাভারত জাতপ্রথাকে বড় করেছে, তাই এই জাতপাতের প্রথা ভারতকে ছাড়তেই চাইছে না। মহাভারত পুত্র সন্তানের উপর জোর দিয়েছে, পুত্র না হলে তুমি শেষে নরকে বাস করবে, আর তাতেই সারা ভারতবাসী পুত্র সন্তানের জন্য ফাটাফাটি করে মরছে।

স্বামীজীই এই জিনিষটাকে আবার আলাদা একটা পরিবর্তন আনলেন, তিনি বলছেন 'go back to Upanishad, go back to spiritual truth'. আধ্যাত্মিক সত্যে এসে বেদ আর মহাভারত কিন্তু এক। উপনিষদের আধ্যাত্মিক সত্যকে যদি মহাভারত না গ্রহণ করত তাহলে কিন্তু হিন্দুধর্মও মহাভারতকে গ্রহণ করত না। কেন হিন্দু ধর্ম খ্রীশ্চান ধর্মকে মুসলমান ধর্মকে মানেনা, বুদ্ধ, মহাবীর তো তাঁরই সন্তান, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্মকে প্রত্যাখান করে দিল, কেন হিন্দু রজনীশ কে নিল না, কেন হিন্দু কৃষ্ণমুর্ত্তিকে মানেনা? কারণ তুমি যত বড় ওস্তাদই হও না কেন, বেদের সঙ্গ যদি তোমার কথা না মেলে তাহলে হিন্দু ধর্ম কখনই তোমাকে গ্রহণ করবেনা। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দকে শুধু এই কারণ হিন্দুরা মাথায় করে রেখেছে। বেদের কিছু কিছু জিনিষকে মহাভারত আমাদের নজরে নিয়ে এসেছে আবার অনেক কিছুকেই সে নজরের বাইরে রেখে দিয়েছে। যেগুলিকে বাইরে রেখেছে সেগুলিকে হিন্দুধর্ম বাদ দেয়নি কিন্তু তারা ইতিহাস হয়ে গেছে। আর যেগুলিকে ধরে রেখেছে সেগুলি এখনও সমান ভাবে ভারতে চলছে।

অষ্টাবক্র মুনির কাহিনী

এরপর পাণ্ডবরা তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে মিথিলাতে এসেছেন। এখানেও অনেক কাহিনী আর অনেক রাজা, ঋষিদের বর্ণনা যেমন রাজা শিবির কথা, মান্ধাতার কাহিনী, এই রকম অনেক কাহিনী আসছে। সব কাহিনীকে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তীর্থের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরদের অষ্টাবক্র মুনির কাহিনী বলছেন। উদ্দালক নামে একজন খুব নামকরা ঋষি ছিলেন, উপনিষদেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। তাঁর ছেলের নাম শ্বেতকেতু, ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে *তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু*। পরের দিকে শ্বেতকেতু খুব নামকরা ঋষি হয়েছিলেন। উদ্দালক মুনির এক শিষ্য ছিল, তাঁর নাম ছিল কহোড়। কহোড় খুব গুণী শিষ্য ছিলেন। উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতার সাথে কহোড়ের বিয়ে দেন। সুজাতার গর্ভে কহোড়ের সন্তান এসেছে। কহোড় রাত ভোর হওয়ার আগে থেকেই উঠে বেদ মন্ত্র পাঠ করতেন। সন্তানটি মায়ের গর্ভ থেকে বলছে *সর্বাং রাত্রিমধ্যয়নং করোষি নেদং পিতঃ সম্যগিবোপবর্ততে।।*৩/১৩২/১০। 'বাবা! আপনি সারা রাত ধরে বেদ অধ্যয়ণ করেন কিন্তু আপনার উচ্চারণ গুলো খুব ভুলভাল, ভুলভাল মন্ত্রের উচ্চারণে আমার রাত্রে ঘুমটুম হয় না, এই কারণে আমার খুব অশান্তি হচ্ছে'। কহোড়ের এখন নিজেরই অনেক শিষ্য হয়ে গেছে। শিষ্যদের সামনে গর্ভ থেকে সন্তান এই কথা বলতেই কহোড়ের মেজাজটা গেছে গরম হয়ে, আর দ্বিতীয় কথা হল এখন সে গর্ভেই আছে। কহোড় তখন নিজের সন্তানকে রেগেমেগে বলছেন 'এখনও তুমি মায়ের গর্ভে কিন্তু এখনই এই রকম ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলছ, পরে যে তুমি কি করবে কোন ঠিক নেই, এই যে তুমি ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বললে তাই তোমার শরীরের আটটা অঙ্গ বাঁকা হবে'। কহোড়ও কম বড় ঋষি নন, তিনি নিজের গর্ভাবস্থার সন্তানকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন। ছেলে যখন জন্ম নিল দেখা গেল তার শরীরের আটটা জায়গা বক্র, তার নাম রাখা হল অষ্টাবক্র। অষ্টাবক্রের পোলিও ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। এখানে যাই হোক না কেন তার পেছনে একটা কাহিনী তৈরী করে দেবে।

উদ্দালকের ছেলে শ্বেতকেতু অষ্টাবক্রের মামা হয়। দুজনের বয়সের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। দুজনে একসাথেই বড় হচ্ছে, বাচ্চা বয়স থেকে দুজনেই একসাথে খেলাধূলো করছে। অষ্টাবক্র মনে করত শ্বেতকেতু বুঝি তার দাদা। অষ্টাবক্র বাচ্চা হতে পারে কিন্তু তাঁর বেদের জ্ঞান একেবারে জন্ম থেকেই। মায়ের গর্ভ থেকেই বাবার ভুলভাল উচ্চারণ ধরিয়ে দিচ্ছেন। এদিকে রাজা জনকের এক রাজ পুরোহিত ছিল যার নাম বন্দী। বন্দী নিজেও একজন বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। একে পণ্ডিত তার ওপর রাজা জনকের পুরোহিত বলে বন্দীর খুব অহঙ্কার ছিল। ইতিমধ্যে কহোড় খবর পেলেন রাজা জনকের ওখানে যজ্ঞ-যাগ হচ্ছে, তিনি ঠিক করলেন রাজা জনকের ওখানে যাবেন যদি কিছু দান সামগ্রী পাওয়া যায়। বন্দী আবার এই ধরণের ব্রাহ্মণদের দেখলে তাদের ধরে বসে শাস্ত্রার্থ করতে বসে যেত। আর নিজেই নিয়ম করে রেখেছিল শাস্ত্রার্থ করতে গিয়ে যে হেরে যেত তাকে নদীতে গিয়ে ডুবিয়ে দিত যাতে অন্যরা কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী না হতে পারে। সব ব্রাহ্মণরা তাই বন্দীকে খুব ভয় পেত, যদি আমি হেরে যাই তাহলে আমাকে নদীতে ডুবিয়ে দেবে। কহোড়ও বন্দীর কাছে হেরে গেছে আর তাকেও নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। উদ্দালক ঋষি কি আর করবেন, জামাই হেরে গিয়েছে তাই নদীতে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অষ্টাবক্র নেহাতই বাচ্চা। উদ্দালকই তাকে বড় করতে লাগলেন। একদিন অষ্টাবক্র উদ্দালকের কোলে বসতে গেছে আর শ্বেতকেতু তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে 'তুইতো ওনার ছেলে না, আমি ছেলে আমিই কোলে বসতে পারি'। অষ্টাবক্র এই ঘটনায় মনে খুব ব্যাথা পেয়েছে। এত দিন অষ্টাবক্র উদ্দালককেই মানে দাদুকেই সে নিজের বাবা বলে জানত। এখন সে জানতে চাইছে আমি তাহলে কার ছেলে।

তখন সে জানত পারল যে তার বাবার নাম কহোড়, আর তার বাবাকে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অষ্টাবক্র আরও ভেঙে পড়েছে। তখন অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুকে বলছেন 'মামা! চলো আমরা দুজনে রাজা জনকের ওখানে যাই, বাবাকে নদীতে ডুবিয়ে মারার বদলা আমরা নেব'। এখন জেনে গেছেন শ্বেতকেতু তাঁর মামা। বাড়িতে কাউকে না বলে দুজনে রাজা জনকের ওখানে পালিয়ে এসেছে। রাজা জনকের ওখানে তখন বিরাট বড় যজ্ঞ হচ্ছিল। অষ্টাবক্র তখন কত আর বয়স হবে আট দশ বছরের একটা বালক। প্রথমেই সে রাজা জনকের সামনে পড়ে গেছে। অষ্টাবক্র রাজা জনককে বলছেন *অন্ধস্য পন্থা বধিরস্য পন্থাঃ স্ত্রিয়ঃ পন্থা ভারবাহস্য পন্থাঃ। রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য সমেত্য তু ব্রাহ্মণস্যৈব পন্থাঃ।।*৩/১৩৩/১। 'অন্ধের রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়, বধিরের রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়, স্ত্রীর রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়, বোঝা যে নিয়ে যাচ্ছে তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয় আর রাজার রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়'। এখন যেমন এ্যম্বুলেন্সের গাড়ী, মন্ত্রীর গাড়ীকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। 'কিন্তু এরা সবাই তাদের রাস্তা ছেড়ে দেবে যখন ব্রাহ্মণ রাস্তা দিয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ স্নাতক যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন এরা সবাই রাস্তা ছেড়ে দেবে'। অষ্টাবক্র বলতে চাইছে যে 'রাজা আপনার জন্য

সবাই রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে কিন্তু আপনি আমার জন্য রাস্তা ছাড়ুন'। রাজা জনকও খুব সুন্দর বলছেন 'হে বালক! তুমি যেদিক দিয়ে যেতে চাইছ সেই দিক দিয়েই যাও, কারণ *ন পাবকো বিদ্যতে বৈ লঘীয়ানিন্দ্রোহপি নিত্যং নমতে ব্রাহ্মণানাম্* (৩/১৩৩/২) আগুন কখনই ছোট হয় না। আগুনের কোন ছোট বড় নেই, আগুন আগুনই। ব্রাহ্মণের বাচ্চাও ব্রাহ্মণ, তেজী। দেবরাজ ইন্দ্রও ব্রাহ্মণকে ভয় পায়, তিনিও নিত্য ব্রাহ্মণের সামনে মাথা নত করেন। ঠাকুর বলছেন কেউটের বাচ্চাও কেউটে। কেউটের মধ্যে কোন বড় ছোট নেই, বড়র যা তেজ ছোটরও ঐ একই তেজ। আগুনও কখন বড় ছোট হয় না, আগুন মানে আগুনই, একটা স্ফুলিঙ্গই দাবানলের জন্য যথেষ্ট।

ওখান থেকে বেরিয়ে যজ্ঞের দ্বারদেশে যখন অষ্টাবক্র আর শ্বেতকেতু এসেছে তখন দ্বারপাল এসে দুজনকে আটকে দিয়েছে। দ্বারপাল তাদের বলে দিল, বন্দীর যতক্ষণ না অনুমতি হবে ততক্ষণ এখান দিয়ে কেউ যেতে পারবে না। একমাত্র ব্রাহ্মণ এবং তাঁকে বৃদ্ধ ও বিদগ্ধ হতে হবে, তবেই তিনি প্রবেশ করতে পারবেন। এখানে যজ্ঞ হচ্ছে বাচ্চাদের প্রবেশের অনুমতি নেই। বালক অষ্টাবক্র তখন বলছে *যদ্যশ্চ বৃদ্ধেষু কৃতঃ প্রবেশো যুক্তং প্রবেষ্টুং মম দ্বারপাল। বয়ং হি বৃদ্ধাশ্চরিতব্রতাশ্চ বেদপ্রভাবেণ সমন্বিতাশ্চ।।*৩/১৩৩/৬। হে দ্বারপাল! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যদি এখান দিয়ে যাওয়ার অনুমতি থাকে তাহলে আমাদেরকেও যেতে দাও কারণ আমরাও বৃদ্ধ। আমরা ব্রহ্মচর্য পালন করেছি, সমস্ত বেদ অধ্যয়ণ করেছি তাই আমরা বৃদ্ধ'। আমাদের পরম্পরাতে শূদ্রের ক্ষেত্রে বয়সের হিসাবে সম্মান হয়, বৈশ্যের ক্ষেত্রে সম্মান হয় টাকায়, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে হয় শক্তিতে আর ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে হয় বিদ্যায়। অষ্টাবক্র এই কথাই বলতে চাইছেন, আমরা ব্রহ্মচর্য পালন করেছি, আমরা বেদ অধ্যয়ণ করেছি আমাদের বিদ্যা আছে তাই আমরাও বৃদ্ধ, আমাদের পথ দাও। বালক অষ্টাবক্র বলছে 'হে দ্বারপাল! খুব সাবধান, আমরা কিন্তু আগুনের মত, ছোট হলেও হেলাফেলার কিছু নয়, বয়ঃবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সমান। আমরা যদি অপমানিত মনে করি তাহলে তুমি শেষ হয়ে যাবে'। দ্বারপাল যে শ্লোকটি এখন বলছে এটিও একটি খুব জটিল শ্লোক, সংস্কৃত না জানা থাকলে শ্লোকের গূঢ়ার্থ বোঝা খুব কঠিন। দ্বারপাল এখন বালক অষ্টাবক্রকে প্রশ্ন করছে – *সরস্বতীমীরয় বেদজুষ্টামেকাক্ষরাং বহুরূপাং বিরাজম্। অঙ্গাত্মানং সমবেক্ষস্ব বালং কিং শ্লাঘসে দুর্লভো মনীষী।।*৩/১৩৩/৮। তুমি বেদ প্রতিপাদিত একাক্ষর ব্রহ্মের বোধ করেছ বলছ, শব্দগুলো সুন্দর উচ্চারণ করছ আবার তুমি নিজেই নিজের প্রশংসা করছ। এই জগতে জ্ঞানী অতি দুর্লভ। তখন অষ্টাবক্র দ্বারপালকে বলছে *ন জ্ঞায়তে কায়বৃদ্ধয়া বিবৃদ্ধির্যথাষ্টীলা শাল্মলেঃ সম্প্রবৃদ্ধা। হ্রস্বোহল্পকায়ঃ ফলিতো বিবৃদ্ধো যশ্চাফলস্তস্য ন বৃদ্ধভাবঃ।।*৩/১৩৩/৯। 'তুমি যে তখন থেকে বাচ্চা বাচ্চা বলে যাচ্ছ, তুমি জেনে রেখো শরীরের বয়স হলেই কেউ বড় হয় না, যেমন শাল্মলি বৃক্ষেরও অনেক বীজ হয় কিন্তু তাতে তার কোন সারবত্তা প্রমাণিত হয় না, ওগুলো কোন কাজে লাগে না। যদি ছোট বৃক্ষ ফলে পরিপূর্ণ থাকে তখন সেই ছোট গাছেরই কদর বেশী হয়। কারুর মাথার চুল পেকে গেলেই সে বৃদ্ধ হয়ে যায় না, যে জ্ঞানে বড় সেই বড়। ঋষিরাই এই নিয়ম করে গেছেন যারা বেদবেত্তা তারাই ঠিক ঠিক বৃদ্ধ'। এরপর দ্বারপাল বালক অষ্টাবক্রকে আর বেশীক্ষণ আটকে রাখতে পারেনি, কায়দা করে সে দুজনকে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

এবার রাজা জনককে অষ্টাবক্র বলছে আমরা শুনেছি আপনার রাজ পুরোহিত বন্দী অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বাদে পরাস্ত করে জলে নিমজ্জত করে, আজ আমরা তাঁর সাথে অদ্বৈত ব্রহ্মের আলোচনা করতে এখানে এসেছি, আমরা বন্দীকে পরাস্ত করব। জনক রাজা শুনেই বিস্মিত হয়ে অষ্টাবক্রকে বলছেন 'তোমরা বন্দীর বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অবগত নও বলেই এই দুঃসাহস করছ। এই জগতের এমন কেউ নেই যে বন্দীকে বাদে পরাস্ত করতে পারে আর তোমরা তো নেহাতই ছেলে মানুষ'। তখন অষ্টাবক্র বলছে 'আসলে আমার সঙ্গে কোন দিন বিচার করেনি তাই বন্দী ঐ রকম সিংহের মত গর্জন করে'। অষ্টাবক্রের তখন মাত্র দশ বছর। রাজা জনক অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করবার জন্য কিছু ধাঁধার মত প্রশ্ন করে দেখে নিচ্ছেন বন্দীর সাথে বিচারে এর যোগ্যতা কতখানি। বেদে কিছু মন্ত্র আছে যার উপর আধার করে রাজা জনক বলছেন 'যে পুরুষ তিরিশটি অঙ্গ, বারোটি অংশ, চব্বিশটি পর্ব আর তিনশ ষাটটি অরসংযুক্ত পদার্থের অর্থ জানেন তিনিই যথার্থ উচ্চকোটির জ্ঞানী'। শ্লোকের মাধ্যমে রাজা জনক প্রশ্ন করছেন। এখানে রাজা জনক কালের ব্যাপারে, অর্থাৎ সম্বৎসরের কথা বলছেন। আগে সম্বৎসরকে দেবতা রূপে দেখা হত এবং তাকে পূজো করা হত। অষ্টাবক্র বলছে না যে তুমি সম্বৎসরের কথা বলছ কিন্তু উল্টো দিক থেকে ঘুরিয়ে বলছে 'যার মধ্যে বারোটি অমাবস্যা বারোটি পূর্ণিমা রয়েছে, ঋতু রূপে তার ছটি নাভি রয়েছে আর মাস রূপী বারোটি অংশ আর দিন রূপী তিনশ ষাটটি স্পাইক্স (অর) রয়েছে সেই সম্বৎসর স্বরূপ কাল তোমার রক্ষা করুন'। রাজা জনক তখন আবার জিজ্ঞেস করছেন 'ঘুমোনর সময় কে চোখ বন্ধ করে না? জন্ম দেওয়ার পর কার গতি বাড়ে না? কার হৃদয় হয় না? আর কে নিজের বেগেতেই বৃদ্ধি পেতে থাকে'? এগুলো সবই ধাঁধা,

অষ্টাবক্রও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিচ্ছেন – মাছ ঘুমনোর সময় চোখ বন্ধ করে না, ডিম জন্ম নেওয়ার পরেও কোন চেষ্টা করে না, পাথরের হৃদয় হয় না আর নদী বেগে বাড়ে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করছে – কে আছে যাকে দুটো ঘোড়া আর ঘোড়ী ধরে রাখে, বাজ পাখির মত দুম্ করে এসে পড়ে আর তাকে কোন দেবতা ধারণ করেন? অষ্টাবক্র তখন বলছেন – হে রাজা! ঐ জিনিষ আপনার শত্রুর বাড়িতেও যেন বাজপাখির মত না নামে। এটা হল মেঘ রূপী দেবতা আর তার হৃদয়ে থাকে বিদ্যুৎ। অষ্টাবক্র যখন আগের চারটে ধাঁধার উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন তখন রাজা জনক বলছেন 'আপনার বুদ্ধি দেবতাদের বুদ্ধির মত'। তখন অষ্টাবক্রকে বন্দীর সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

বন্দীর সাথে অষ্টাবক্রের বিচার

এরপর বন্দীর সাথে যে বিচার হচ্ছে সেটাও খুব মজার ও বুদ্ধির খেলা। এখানে সংখ্যার মহিমা নিয়ে লড়াই চলবে। প্রথমে একজন একের মহিমা অর্থাৎ এক দিয়ে যা কিছু আছে সেটা শ্লোকের মাধ্যমে বলছেন। তারপর অন্য জন দুই নিয়ে বলবেন। এরপর আগের জন তিন নিয়ে বলবেন। এইভাবে বিচার চলছে। যারা সংস্কৃত খুব ভালো জানেন তারাই এর রসটা আস্বাদন করতে পারেন। শ্লোকে না বললে এর মজাও পাওয়া যায় না।

অষ্টাবক্র আর বন্দীর বিচার শুরু হয়েছে। সংখ্যা দিয়ে বিচার চলছে। প্রথমে বন্দী একের প্রশংস করছেন *এক এবাগ্নির্বহুধা সমিধ্যতে একঃ সূর্যঃ সর্বমিদং বিভাতি। একো বীরো দেবরাজোহরিহন্তা যমঃ পিতৃণামিশ্চরশ্চৈক এব।* ।৩/১৩৪/৮।'অগ্নি এক, এই একই অগ্নি বিভিন্ন রূপে বিভাগ হচ্ছে যেমন দক্ষিণাগ্নি ইত্যাদি, সূর্য এক, শত্রুর নাশ করেন একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্র আর এক যম পিতৃগণের ঈশ্বর'। একের স্তুতি করা হল।

অষ্টাবক্র এবার দুইয়ের প্রশংসা করে বলছেন *দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ দ্বৌ দেবর্ষী নারদপর্বতৌ চ। দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে ভার্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা।* ।৩/১৩৪/৯। 'ইন্দ্র আর অগ্নি এই দুই দেবতা সব সময় এক সঙ্গে চলেন, নারদ ও পর্বত এই দুইজন দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমারেরা দুইজন, রথের চক্র দুই আর বিধাতা এক সঙ্গে স্বামী আর স্ত্রী এই দুইকে সৃষ্টি করেছেন'। অষ্টাবক্র দুইয়ের প্রশংসা করার পর বন্দী তিনের প্রশংসা করছেন *ত্রিঃ সূয়তে কর্মণা বৈ প্রজেয়ং ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি। অধ্বর্যবর্ত্রিসবনানি তন্বতে ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ।* ।৩/১৩৪/১০। 'জন্ম তিন প্রকার, দেবযোনি, মনুষ্যযোনি আর তির্যকযোনি, যজ্ঞাদিতে তিনটে বেদের দরকার পরে ঋক্, সাম্ ও যজুর্বেদ'। এখান থেকেই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ধরে নিয়েছেন আগে তিনটে বেদই ছিল, আসলে তা নয়। যখন যজ্ঞ হয় তখন চারটে বেদের ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে রাখতেই হবে। অথর্ববেদের যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই কিন্তু যজ্ঞের সমস্ত কার্যের প্রধান পর্যবেক্ষক। অথর্ব বেদ সবাই অধ্যয়ন করতেন না, অথর্ব বেদ তাঁরাই পড়তেন যাঁদের তিনটে বেদ অধ্যয়ন হয়ে গেছে। 'লোকও তিনটে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল। বেদের ব্রাহ্মণ যাদের অদ্ধুর্য্য বলা হত তাঁরা ত্রিবিধ সবনের (যজ্ঞ) বিধি বিধান করে গেছেন, জ্যোতি তিন প্রকার, সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি'। একেকটি শ্লোকে একেকটি সংখ্যার প্রশংসাকে ছন্দের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টাবক্র এবার চারের প্রশংসা করে বলছেন *চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি। দিশাশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ং চ চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা।* ।৩/১৩৪/১১। 'ব্রাহ্মণের জন্য চারটি আশ্রম, মানে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্ত আর সন্ন্যাস। সমাজে বর্ণ চারটি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মুখ্য দিশা চার, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ'। যদিও সব মিলিয়ে দশটি দিশা হয় কিন্তু মুখ্য দিশা চারটি। 'বাণীর যে বর্ণ সেটাও চার আর তার চরণ সেটাও চার'। এখানে আবার ব্যকরণের খেলা চলছে, চারটে হল পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী আর উচ্চারণে হ্রর্ষ, দীর্ঘ, প্লুত ও হল্ এই চার রকমের উচ্চারণ হয়। এখন হ্রর্ষ ও দীর্ঘই চলে প্লুত ও হল্ উঠে গেছে যদিও বাংলায় হলন্ত্ যেমন 'শরৎ', 'ত'টাকে আধখানা উচ্চারণ করা হয়। আগেকার দিনে উচ্চারণ শেখানোটা খুব জটিল শিক্ষা ছিল। আমরা যখন কথা বলি তখন উচ্চারণটা আলাদা আলাদা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। বন্দী এবার বলছেন 'যজ্ঞের অগ্নি পাঁচ রকমের হয়'। বেদের সময় অগ্নি পাঁচ রকম ছিল গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আবাহনীয়, সভ্য ও আবাস্থ্য। এগুলো এখন উঠে গিয়ে শুধু দক্ষিণাগ্নিই ব্যবহার করা হয়, যখন পূজো হয় তখন অগ্নিকে দক্ষিণামুখি করে দেওয়া হয়। পংক্তি ছন্দে পাঁচটি করে পদ থাকে। বেশীর ভাগ কবিতাই দুটি পদ বা চারটি করে পদ থাকে, কখনও ছটি পদও থাকে কিন্তু পাঁচ

পদের যে পংক্তি ছন্দ এটা খুব কঠিন। আমাদের পুরো গীতা চারটে পদে রচিত এবং প্রত্যেক পদে আটটি করে মাত্রা থাকে এর নাম অনুষ্টুপ ছন্দ, পংক্তি ছন্দে পাঁচ পাঁচ করে মাত্রা থাকে। পংক্তি ছন্দে সবাই লিখতে পারে না। যজ্ঞ পাঁচ রকমের। আমরা এর আগেও পাঁচটি মহাযজ্ঞের কথা আলোচনা করেছি, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ মহাভারতের সময়েই এসে গিয়েছিল, পরের দিকে মনুস্মৃতিতে আরও সুসংবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম দেবযজ্ঞ, দেবতাদের পূজা অর্চনা করা। দ্বিতীয় পিতৃযজ্ঞ, পিতৃদের উদ্দেশ্যে অন্ন জল নিবেদন করা এবং শ্রাদ্ধাদি ও পিণ্ডদান করা। তৃতীয় ঋষিযজ্ঞ, যখন জপ-ধ্যান করা হচ্ছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা ইত্যাদি, এখন এর নাম হয়ে গেছে ব্রহ্মযজ্ঞ। চতুর্থ ভূতযজ্ঞ, পশুপাখিদের রোজ কিছু খাবার দিতে হয়, এটাকে বলা হচ্ছে ভূতযজ্ঞ। শেষে হল নৃযজ্ঞ, অতিথিকে অন্ন জল দেওয়া। প্রত্যেক গৃহস্থকে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হয়। হিন্দুধর্মে হিংসা করা একেবারে নিষেধ। জৈনরা যেমন অহিংসাকে একেবারে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে, আমরা মুখে কাপড় বেঁধে রাখব, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ঝাঁটা দিতে দিতে যাব, এইভাবে জগৎ চলে না আর একেবারেই বাস্তবসম্মত নয়। একজন দুজন এভাবে পালন করতে পারে কিন্তু পুরো সম্প্রদায় এভাবে চলতে পারেনা। আমরা যখন মাছ, মাংস খাচ্ছি তখন একটা জীবের প্রাণ যাচ্ছে এটা বুঝতে পারি কিন্তু যখন চাল, গম, আলু ও অন্যান্য সব্জী খাচ্ছি তখন সেগুলোরও তো প্রাণ আছে। যখন উনুন কিংবা গ্যাস জ্বালান হচ্ছে, যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি তখনও কিছু প্রাণ হানি হচ্ছে, যখনই খাওয়া-দাওয়া করছি তখন ঐ গ্রাসটাও অপরের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া। এত ভাবে প্রাণের হানি হচ্ছে বলে গৃহস্থদের জন্য এই পাঁচটি যজ্ঞের বিধান করা হয়েছে। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থকে করতেই হবে। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞই হিন্দুধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। কোন হিন্দুকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি হিন্দু কেন? তখন সে বলে আমি পঞ্চ মহাযজ্ঞ করি বলে হিন্দু। যারা হিন্দু ধর্ম নিয়ে প্রচুর কথা বলছে তাদের অনেকেরই এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, অথচ প্রাচীন কাল থেকে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ হিন্দুধর্মের রক্তের মধ্যে মিশে ছিল। যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করেনা সে কখনই হিন্দু হতে পারেনা। বিশেষ করে শঙ্করাচার্য এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞে যখন আমরা নিয়মিত শাস্ত্রাদি পাঠ করছি, জপ-ধ্যান করছি তখন আমরা ঋষিদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আজকে যে আমরা সুসভ্য, সংস্কৃতিবান হয়েছি এটা একমাত্র ঋষিদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। দেবতারা আমাদের জল দিচ্ছেন বাতাস দিচ্ছেন সেইজন্য দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য দেবতাদের পূজো অর্চনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিতৃরা ছিলেন বলে আজকে আমার এই শরীর ধারণ হয়েছে, সুতরাং তাঁদের প্রতি আমার এই কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য খাওয়ার সময় পিতৃদের উদ্দেশ্যে একটু নৈবেদ্য ও জল দিলাম, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম করলাম, গয়াতে পিণ্ডদান করলাম। আমরা যে নিত্য এত প্রাণ হরণ করে গ্রাসাচ্ছদন করছি এই প্রাণিজগতের ভারসাম্যকে রক্ষা করার জন্য ভূতযজ্ঞ। আমার প্রাণ ধারণ সম্ভব হচ্ছে এই প্রাণীদের জন্য তাই রোজ পশুপাখিদের একটু কিছু খাবার দিতে হয়। আমরা যে রোজ এত এত ভালো ভালো খাবার দাবার খাচ্ছি এই খাবারটা কারুর না কারুর মুখের গ্রাসকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাই রোজ কোন অতিথিকে খাওয়াতে হয়, এটাই মনুষ্যযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ যারা করে তারাই হিন্দু, একমাত্র হিন্দুরাই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে।

এতক্ষণ বন্দী পাঁচের প্রশংসা করলেন। অষ্টাবক্র এবার ছয়ের প্রশংসা করে বলছে *ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে ষট্ চৈবেমে ঋতব্যঃ কালচক্রম্। ষড়িন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ ষট্ সাদ্যস্কাঃ সর্ববেদেষু দৃষ্টাঃ।* ।৩/১৩৪/১৩। ‘যজ্ঞে যখন অগ্নি স্থাপন করা হয় তখন দক্ষিণা হিসাবে ব্রাহ্মণকে ছয়টি গরু দান করতে হয়। ঋতু ছয়টি যারা সম্বৎসরকে চালাচ্ছে, সম্বৎসর এই ছটি ঋতুর উপর দাঁড়িয়ে আছে বলে ছয়ের এই মাহাত্ম্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন। হিন্দু দর্শনে মন হল জড় কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা হয় না। কিন্তু হিন্দু দর্শনে মন হল ষষ্ঠেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয় মিলিয়ে আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ আর কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ আর একাদশ ইন্দ্রিয় হল মন। কৃত্তিকাও ছয়, কৃত্তিকা হল নক্ষত্র। আর বেদের যে মূল যজ্ঞ তার সংখ্যাও ছয়। বন্দী এবার সাতের প্রশংসা করে বলছেন *সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ সপ্তচ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি। সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা।* ।৩/১৩৪/১৪। গ্রাম্য পশু ছয়। কিছুদিন আগে একজন পাশ্চাত্য গবেষক বলছেন যে চারটে পশুকেই পোষ মানান হয়েছে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে গ্রাম্য পশু মানে যে পশুকে পোষ মানান হয়, তার সংখ্যা সাত। এগুলো হল গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, কুকুর আর গাধা। বেড়ালকে কিন্তু গ্রাম্য পশুর মধ্যে ধরা হচ্ছে না। আবার উটকেও পোষ মানান হয়, মরুভূমির দিকে উটের ব্যবহার অপরিহার্য। তখনকার দিনে যা যা ছিল সেটাকেই বলা হচ্ছে। এবারে বলছেন বন্য পশুও সাত, যেমন সিংহ, বাঘ, নেকড়ে, হাতি, বানর, ভাল্লুক আর মৃগ। মৃগ বলতে এনারা একসাথে সব কিছুকে যোগ করে দিচ্ছেন, যেমন হরিণ, শূকর, খরগোশ। বেদে ঠিক ঠিক যে কটি ছন্দ ব্যবহার হয় তার

সংখ্যা সাত, যেমন গায়ত্রী ছন্দ, গায়ত্রী ছন্দে তিনটে করে পদ থাকে, এই রকম উষ্ণীক, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ আর জগতি এই সাতটি ছন্দ। ঋষিরা হলেন সাতজন, যাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলা হচ্ছে – মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু, অঙ্গিরা আর বশিষ্ঠ। ভাগবতে এই সপ্তর্ষি মণ্ডলে সাতজন ঋষির নাম অনেকবার পাল্টে তিন চার রকমের সপ্তর্ষির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মূল সপ্তর্ষির ঋষিদের আসল নাম এই মহাভারতেই আসছে। পূজার উপাচার সাত রকমের – গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন ও তাম্বুল। আগে ছিল সপ্তোপাচার, এখন যে সংক্ষিপ্ত পূজো করা হয় তার নাম হল পঞ্চোপাচার, এতে আচমন ও তাম্বুলকে বাদ দেওয়া আছে। আর বীণাতে সাতটি তার থাকে।

অষ্টাবক্র এইবার আট সংখ্যা নিয়ে খুব কঠিন জবাব দিচ্ছেন। জগতে যে দাড়িপাল্লা হয় তাতে আট খানা দড়ি থাকে। এখানে অবশ্য বলে দিচ্ছেন যে যখন মণকে মণ জিনিষের ওজন করা হবে তখন সেই পাল্লাতে আট খানা দড়ি থাকে। দেবতাদের বসু এনারা আটজন। যখন যজ্ঞের যূপ নির্মাণ করা হয় তার আটটি কোণ থাকে। বন্দী তখন নয়ের প্রশংসা করছেন অষ্টাবক্র আবার দশের প্রশংসা করে তার জবাব দিচ্ছে। এইবার যখন বন্দী এগারোর প্রশংসা করছেন তখন তিনি এগারোটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলছেন। এখানে একসাথে বুদ্ধির খেলা আর কবিতার লড়াই চলছে। একটা শ্লোকের মধ্যে ঐ সংখ্যার মাহাত্ম্যকে বর্ণনা করা হচ্ছে। বারোতে এসে অষ্টাবক্র বলছেন যে কোন বছরে বারোটি করে মাসের কথা বলা হয়েছে, জগতি ছন্দে বারোটি করে অক্ষর থাকে, প্রাকৃত যজ্ঞ বারো দিন ব্যাপি চলে আর আদিত্য বারো জন।

বন্দী তখন তেরোর প্রশংসা করে বলছেন *ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ।* ত্রয়োদশী তিথি অতি পবিত্র ও প্রশস্ত তিথি, এই পৃথিবীতে তেরোটি দ্বীপ আছে। তখনকার দিনে আমাদের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষকেই পৃথিবী বলে মনে করতেন, ভারতের বাইরে কিছু আছে বলে জানতেন না। তেরোতে এসে প্রথম পঙক্তি বলেই বন্দী চুপ করে গেছে। প্রত্যেক শ্লোকে চারটি করে পদ থাকতে হবে, কিন্তু বন্দী এখানে দুটি পদ বলে থেমে গেছে। বন্দী যেই থেমে গেছে ততক্ষণে অষ্টাবক্র বাকি দুটি পদকে পূরণ করে দিয়ে জবাব দিয়ে বলছেন *ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ।।*৩/১৩৪/২০। 'ভগবান বিষ্ণু কেশির সঙ্গে তেরো দিন ধরে যুদ্ধ করেছিলেন আর বেদে অতি নামে একটি ছন্দ আছে যেতে তেরোটি অক্ষর আছে'। তেরোর প্রশংসা করছিল বন্দী কিন্তু প্রথম দুটো পদ বলার পর আর বাকি দুটো পদ মেলাতে না পেরে থেমে গেছে। যখন আমরা তর্কাতর্কি করব তখন আমরা জবাব দিয়ে দিতে পারবো, আমি চৌদ্দর ব্যাপারে অনেক কিছু জানি আপনিও পনেরর ব্যাপারে অনেক কিছু বলতে পারবেন কিন্তু যখন এটাকেই শ্লোকের মাধ্যমে ছন্দ মিলিয়ে তাৎক্ষণিক বলতে হবে তখন আলাদা একটা প্রতিভা থাকতে হবে, সবার দ্বারা এই জিনিষ হবে না। কবিতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথম হল কবিতা কোন কিছুই সরাসরি বলে না, কবি তার ভাবকে কবিতায় একটা আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন, কেউ বুঝবে কেউ বুঝবে না। আর যার যেমন ভাব সে সেই ভাব অনুসারে বুঝবে। যদি আকার ইঙ্গিত না থাকে তাহলে সেটা কবিতা না হয়ে গদ্য হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় হল লয় ছাড়া কবিতাই হবে না। লয়কে আমরা ভুলবশতঃ মনে করি দুটো লাইনের শেষের অক্ষর দুটো মিল রাখা, যেমন 'আমি ধরলাম রেলগাড়ি। তাতে গেলাম মামার বাড়ি'। গাড়ি আর বাড়ি মিলিয়ে দিলেই মনে করলাম এটা কবিতা হয়ে গেল। শেষের দুটো অক্ষরকে লয় করে দিলেই কবিতা হয় না। তৃতীয় হচ্ছে একটা ছন্দের মধ্যে পুরো জিনিষটাকে বাঁধতে হবে। বন্দী এখানে জানে তিনি কি বলতে যাচ্ছেন। আমাদের যদি সংখ্যা তেরোর উপর প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয় তাহলে আমরা একটা প্রবন্ধ লিখে দিতে পারব। সেটা বন্দীও জানেন কিন্তু জানা জিনিষটাকে ছন্দ আর লয়ের মধ্যে চট করে যে বাঁধতে হবে সেটা করে উঠতে পারলেন না। কিন্তু অষ্টাবক্র সঙ্গে সঙ্গে ঐটাকেই সুন্দর ছন্দে বেঁধে দিয়ে বলে দিলেন ভগবান বিষ্ণু কেশির সঙ্গে তেরো দিন যাবৎ যুদ্ধ করেছিলেন আর অতি ছন্দে তেরোটি করে অক্ষর থাকে। অষ্টাবক্রের মুখ দিয়ে বন্দীর অসমাপ্ত বাকি দুটো পদ বেরিয়ে আসতেই বিরাট সোরগোল পড়ে গেছে, বন্দী অষ্টাবক্রের কাছে পরাজিত হয়ে গেছে। আমরা যেটা মনে করছি যে অষ্টাবক্র শুধু সংখ্যার ব্যাপারেই অভিজ্ঞ ছিল, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ের উপরে গেলেও হয়তো এই রকমই হত। ঠিক এই ধরণের তর্ক তখন হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ভারতে যে এই ধরণের প্রতিভা ছিল সেটাই এখানে দেখান হল।

অষ্টাবক্র বন্দীকে বলছেন 'চলো, এবার তোমাকে নদীতে ডোবাব'। তখন বন্দী আসল রহস্যটা বললেন 'আমি বরুণ দেবতার পুত্র তাই জলমগ্ন হওয়া থেকে আমার কোন আশঙ্কা নেই। বরুণ রাজা জনকের মত বারো বছরের একটা যজ্ঞ করছেন সেখানে অনেক ভালো ভালো ব্রাহ্মণ দরকার ছিল বলে আমি সবাইকে পরাস্ত করে ঐ যজ্ঞে পাঠিয়ে দিতাম।

বর্তমানে সবাই বরুণ দেবতার যজ্ঞ দর্শন করছে। তাঁরা সবাই এক্ষুণি হয়ত এখানেই এসে পড়বেন’। এরপর কহোড়কে ফেরত আনা হল। আর এই কাহিনীটা এইখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে ঐ জায়গাটা একটা তীর্থ হয়ে গেল।

যবক্রীত মুনির কাহিনী

এরপর আসছে যবক্রীতের কাহিনী। যবক্রীত ছিলেন ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। ভরদ্বাজ আর রৈভ্য দুজন ঋষি ছিলেন, দুজনেই খুব বন্ধু ছিলেন। ভরদ্বাজ শুধু তপস্যা করতেন, তিনি শুধু তপস্বীই ছিলেন কিন্তু রৈভ্য ছিলেন পণ্ডিত এবং অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন। যিনি বিদ্বান ছিলেন তাঁর কাছেই শিষ্যরা আসা যাওয়া করত আর যে শুধু তপস্যা করতেন তাঁর কাছে কেউ যেত না। ভরদ্বাজের ছেলে যবক্রীত দেখছে আমার বাবা এত উচ্চমানের ঋষি কিন্তু কেউই বাবার কাছে আসে না, এর জন্য আমাকে কিছু করতে হবে। এই ভেবে যবক্রীত খুব জোর তপস্যা করতে শুরু করেছে। যবক্রীতের তপস্যা দেখে ইন্দ্র এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন ‘তুমি কিসের জন্য তপস্যা করছ’? যবক্রীত ইন্দ্রকে বলছে ‘আমি বেদের জ্ঞান পেতে চাই’। ইন্দ্র তখন বলছেন ‘না না এভাবে বেদের জ্ঞান হয় না, শাস্ত্র তোমাকে গুরুর কাছে গিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে’। ‘আমি গুরুর কাছে যেতে চাইনা, সাধনার দ্বারাই আমি শাস্ত্রের জ্ঞান পেতে চাই’। তখন ইন্দ্র এক বৃদ্ধের বেশ ধারণ করে নদীতে নেমে হাতে করে বালি তুলে নদীতে ফেলে যাচ্ছে। যবক্রীত বুড়োর ঐ কাণ্ড দেখে জিজ্ঞেস করেছে ‘তুমি একি করছ এখানে’? বৃদ্ধবেশী ইন্দ্র বলছেন ‘নদী পারাপার করতে সবার খুব অসুবিধা হয় তাই একটা বালির বাঁধ তৈরী করছি’। যবক্রীত ভাবছে এই বুড়োটার মাথাটা খারাপ ‘এইভাবে বালি ফেলতে থাকলে কি কোন দিন বালির বাঁধ তৈরী হবে’! বৃদ্ধ তখন বলছে ‘তুমি যদি মনে করে থাকতে পার সাধনা করে তপস্যা করে বেদের জ্ঞান লাভ করবে তাহলে আমিও এই বালির বাঁধ তৈয়ার করতে পারব’। তখন যবক্রীতের একটা চেতনা হল। কিন্তু নিজের গোঁ ছাড়ল না। সেখান থেকে যবক্রীত একটা বর লাভ করল ব্রাক্ষণরা যদি চায় তাহলে সে সাধনা করে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। এর নিদর্শন আমরা পাই যাজ্ঞবল্ক্যের ক্ষেত্রে তিনি গুরুকে পরিত্যাগ করে সূর্যের তপস্যা করে শুক্লযজুর্বেদ পেয়েছিলেন।

যবক্রীত ঐ ভাবে তপস্যা করে বেদের জ্ঞান লাভ করে ভরদ্বাজ মুনির কাছে এসেছেন। ভরদ্বাজ মুনি দেখেই ছেলেকে বলছেন ‘আমরা হলাম তপস্বী, তোমাকে কে বলেছে এইভাবে সিদ্ধাইয়ের দ্বারা বেদের জ্ঞান পেতে, এতে তোমার মধ্যে অহঙ্কার এসে তোমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে’। শেষ পর্যন্ত তাই হল। যবক্রীত খুব অহঙ্কারী হয়ে গেছে। একবার সে রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁর পুত্রবধুর উপর নির্যাতন করতেই রৈভ্য যবক্রীতকে এমন অভিশাপ দিলেন যে এক দৈত্য এসে ত্রিশুল দিয়ে যবক্রীতকে বধ করে দিলেন। এরপর অনেক কাহিনী, এখানে কোন ঋষি কত ভাবে এই জায়গায় তপস্যা করেছিলেন তাতেই এটাও একটা তীর্থ হয়ে গেছে। এরপর যুধিষ্ঠিররা গন্ধমাদন পর্বতে গেছেন।

হনুমানের সাথে ভীমের সাক্ষাৎ

গন্ধমাদন পর্বতে এসে দ্রৌপদী এত পথশ্রান্ত হয়ে গেছেন যে চলতেই পারছেন না। ঘটোৎকচ একবার পাণ্ডবদের বলেছিল ‘আপনাদের যখনই কোন প্রয়োজন হবে আমাকে স্মরণ করবেন আমি আপনাদের সেবায় চলে আসব’। এখন ঘটোৎকচকে ডাকা হতেই সে চলে এসেছে। ঘটোৎকচ বলছে আমাকে কি করতে হবে। তাকে বলা হল আমাদের সবাইকে পর্বতের এই দুর্গম পথটাকে পার করে দিতে হবে। ঘটোৎকচ তখন সবাইকে নিজের বাহুতে বসিয়ে পথ পার করে দিল।

একদিন দ্রৌপদীর কাছে হাওয়াতে একটা সুন্দর সহস্রদল পদ্মফুল সৌগন্ধিক উড়ে এসেছে। ফুলের গন্ধে দ্রৌপদী মোহিত হয়ে গেছেন। তিনি ভীমকে ডেকে বললেন ‘হে ভীম! এই পদ্মফুল পেয়ে আমার মন পরমাহ্লাদিত হয়ে উঠেছে, তুমি খোঁজ নিয়ে আরও অনেক ফুল সংগ্রহ করে আমাকে এনে দাও’। এই পদ্মফুলের বিশেষ গন্ধ। ভীমসেন সৌগন্ধিক পদ্মফুলের খোঁজে চলেছেন। যেতে যেতে পথে দেখছেন একটা বুড়ো বানর রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে। ভীমসেন বানরটাকে বলছেন রাস্তা দিতে। বুড়ো বানর বলছেন ‘আমি বুড়ো হয়ে গেছি নড়তে চড়তে পারিনা তুমি লেজটা সরিয়ে চলে যাও’। ভীমসেন তখন খুব তাচ্ছিল্য করে একটা আঙুলের ডগা দিয়ে সরাতে গিয়ে দেখছে লেজটাকে নড়ান যাচ্ছে না। তখন এক হাত দিয়ে ধরে সরাতে গেল তাও সরাতে পারলেন না, এরপর দু হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে দেখছনে লেজটাকে সরানতো দূরের কথা নড়াতেই পারছেন না। ভীমের ঐ নাস্তানাবুদ অবস্থা দেখে হনুমান ভীমসেনকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন ‘আমি হলাম মহাবীর হনুমান’। ভীমসেন হনুমানের কথা শুনে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত। তখন ভীমসেন হনুমানকে প্রণাম করে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন। সংক্ষেপে আমাকে শ্রীরামকথা বলুন। হনুমান শ্রীরামের কথা বলেছেন। এরপর

ভীমসেন বলছেন 'শ্রীরামচন্দ্রের সময় আপনার যে আসল স্বরূপ ছিল তখনকার সেই রূপটা আমাকে দয়া করে দেখান'। হনুমান ভীমসেনকে খুব সুন্দর বলছেন *ন তচ্ছক্যং ত্বয়া দ্রষ্টুং রূপং নান্যেন কেনচিৎ। কালাবস্থা তদা হ্যন্যা বর্ততে সা ন সাম্প্রতম্।। অন্যঃ কৃতযুগে কালস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরঃ। অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাদ্য তদ্ রূপমস্তি মে।। ভূমির্নদ্যো নগাঃ শৈলঃ সিদ্ধা দেবা মহর্ষয়ঃ। কালং সমনুবর্তন্তে যথা ভাবা যুগে যুগে।।*৩/১৪৯/৬-৯।'ঐ রূপতো এখান আর দেখান যাবেনা, কারণ তখনকার ব্যাপার আলাদা আর এখনকার ব্যাপার আলাদা। তুমি কেন, অন্য কেউ আমার ঐ রূপ আর দেখতে পারবে না'। কেন দেখা যাবে না? 'কারণ জগতে যা কিছু আছে, পৃথিবী, নদী, বৃক্ষ, পাহাড় এমন কি দেবতা, ঋষি সবাই কালের গতিতে চলেন। এখন এই দ্বাপর যুগে এসে ত্রেতা যুগের আমার ঐ রূপ দেখা যাবে না'। ঠাকুরও বলছেন কলিযুগে আকাশবাণী হয় না বাচ্চা, পাগলের মুখ দিয়ে দৈববাণী হয়। এটাই হল যুগের প্রভাব। এখন আর ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ দেবতাদের পূজা করা হয় না। এখন যতই যজ্ঞ করা হোক যজ্ঞের আহুতি দেবতাদের কাছে যাবে না।

হনুমানের কথা শোনার পর ভীমসেন বলছেন 'যুগের প্রভাবটা কি জিনিষ আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন'। তখন হনুমান সংক্ষেপে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগের কি কি বৈশিষ্ট্য সেগুলো বলছেন। সত্যযুগে ঋক, সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্রগুলির কোন বিভাজন থাকে না। সত্য যুগে এক জাতি, এক ধর্ম, এক বর্ণ, এক বেদ সব কিছু এক, মানে সমান ছিল। সত্যযুগের সব থেকে বড় যে বৈশিষ্ট্য তা হল *সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানং চ কেবলম্। তদা হি সমকর্মাণো বর্ণা ধর্মানবাপ্নুবন্।।*৩/১৪৯/১৯। ভগবান, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ঐ যুগে তিনি সবারই আশ্রয়। ঠাকুর বলছেন – মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর দর্শন। এর অর্থ হল আমাদের অবলম্বন হল একমাত্র ঈশ্বর। স্বামীজী বলছেন ঠাকুরের আগমনের পর থেকে সত্যযুগের আবির্ভাব হয়েছে। সমাজের সবাই যখন মনে করে আমার একমাত্র আশ্রয় হলেন পরমাত্মা পরব্রহ্ম তখন বুঝতে হবে সত্যযুগ এসে গেছে। সত্যযুগে যে সদাচার পালন করা হয় সেটাও শুধু পরমাত্মা পরব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য। আমরা এখানে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছি কেউ চুরি করি না, ঘুষ নিই না, অপরকে ঠকিয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করি না, খুব প্রয়োজন না হলে মিথ্যা কথা বলি না। আমরা কি কেউ ভেবে দেখেছি এগুলো আমরা কেন করিনা? স্বামীজীর সময়ে কিছু দার্শনিক ছিলেন যাঁরা ভগবান মানতেন না কিন্তু সদাচারের উপর খুব জোর দিতেন। স্বামীজী তাঁদেরকে এই কথা বলছেন 'তোমরা কেন সদাচার পালন করছ'? এনারা বলছেন অনেকের মঙ্গলের জন্য। যদি অপরের ভালোর জন্য সদাচার পালন করতে হয় তাহলে প্রথমে তো নিজের ভালোটা দেখতে হবে। চুরি, ডাকাতি, মিথ্যে কথা বলে আমার যদি ভালো হয় তাহলে আমি অবশ্যই এগুলো করব। আমরা যে যতটুকু সৎ পথে আছি কেন ততটুকুই আছি? প্রথম হল পুলিশের ভয়ে, পাড়া-প্রতিবেশীরা জানতে পারলে আর শান্তিতে থাকতে দেবে না, নিন্দার ভয়ে। মোদ্দা কথা আমাদের এই সৎ আচরণের পেছনে রয়েছে ভয়। আমরা সকাল থেকে উঠে যা করি সবটাই দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি, কিছুটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে বলে সকালে উঠে দাঁত মাজছি কারণ মুখে দুর্গন্ধ হলে লোকে গালাগাল দেবে, ঠিক সময়ে অফিসে যেতে হবে বলে তাড়াহুড়ো করে মুখে দুটো গুজে দিয়ে বেরিয়ে পড়ছি তা নাহলে হাজিরা খাতায় লালদাগ পড়ে যাবে, রাস্থায় ভদ্রভাবে যাচ্ছি নাহলে লোকে পিটিয়ে দেবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের যে জীবন যাত্রা এটা দিনগত পাপক্ষয় ছাড়া কিছু না। এই দিয়ে কখনই ধর্ম লাভ হয় না, আর আধ্যাত্মিকতার তো কোন প্রশ্নই নেই। মানুষ তখনই আধ্যাত্মিক হবে যখন তার এই মনোভাব আসবে যে আমার প্রত্যেকটি আচরণ হল পরমাত্মা পরব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য। আমি খাচ্ছি কেন? আমাকে শরীর সুস্থ রাখতে হবে। শরীর সুস্থ রেখে কি হবে? যাতে আমি জপ-ধ্যান ভালো করে করতে পারি। জপ-ধ্যান কেন করব? পরমাত্মা ও পরব্রহ্মকে জানবো। মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে পরমাত্মা পরব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য। সদাচার কেন করছি? কারণ সদাচার না করলে আমি পরমাত্মার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাব। যে কোন অসৎ আচরণ পরমাত্মার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এইজন্যই আমি সৎ আচরণ করি। এটা মনে রাখতে হবে সদাচার কখনই আমাকে পরমাত্মা বা ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে না বা ঈশ্বর লাভে কোন সাহায্য করবে না। কিন্তু অসৎ আচরণ আমাকে ভগবানের থেকে বিমুখ করে দেবে। সদাচার সম্বন্ধে সংস্কৃতে বলা হয় অকরণে প্রত্যবায়, সৎ আচরণ যদি না করা হয় তাহলে পাপ হবে। সত্যি কথা বললে কখনই পূণ্য হয় না কিন্তু মিথ্যে কথা বললে পাপ হয়।

এখানে উঁচু নিচু বলে কিছু নেই তোমার পথটা কি সেটাই আসল। আমি কি চাইছি? আমি ভোগ করতে চাইছি। ভোগ তো নিচু কিছু নয়, কোথাও তো বলা নেই যে ভোগ নিচু। আপনি বলছেন আমি ভোগ চাইনা যোগ চাই। এখানে উঁচু নীচু কিছু নেই। পথটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ভোগ চাইলে একটা পথ আবার যোগ চাইলে অন্য পথ। ভোগ, কামিনী-কাঞ্চন, নরক যা কিছু আছে ঈশ্বরের বাইরে কোন কিছুই নয়। ঈশ্বর ছাড়া যেখানে কিছুই নেই সেখানে উঁচু নীচুর প্রশ্ন আসবে কি

করে! কামিনী-কাঞ্চনের ভোগটাও ভগবানের আবার কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগটাও ভগবানের। আমি কোনটা চাইছি? ঠাকুর বলছেন একজনের একটা রঙের গামলা ছিল। তাঁর কাছে যে রঙ ছোপাতে চাইবে সেই রঙেই কাপড় ছুপিয়ে দেবে। তুমি কোন রঙে ছোপাতে চাইছ বল। এই জগতে ভোগ, যোগ, নরক, স্বর্গ সবটাই তাঁর। আমেরিকাতে একজন ভদ্রমহিলা স্বামীজীকে বলছেন 'আপনি আত্মা, ভগবান যাই বলুন আমি কিন্তু আমাকে আমার গয়না, টাকা-পয়সা, মান-যশের মধ্যেই দেখি'। স্বামীজী তখন সেই ভদ্রমহিলাকে বলছেন 'দেখুন, খুব ভালো করে দেখুন, হাজার হাজার বছর ধরে দেখতে থাকুন। তারপর যখন এগুলোর ওপর বিতৃষ্ণা আসবে, ধিক্কার আসবে তখন ভগবানের মধ্যে নিজেকে দেখার চেষ্টা করবেন'। গয়নাগাটি, টাকা-পয়সা, নাম-যশ এগুলো কি ভগবানের বাইরে? এগুলোও ভগবানের একেকটি রূপ। তুমি কি রূপ চাইছ? উট যদি কাঁটা ঘাস খায় তাহলে তার মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোবে। তুমি কি রাজী আছ রক্ত ঝড়াতে। না আমি রাজী না, আমার সুখও লাগবে না দুঃখও লাগবে না। তাহলে ভাই এই পথটা তুমি ছাড়। এবার আমি যখন অন্য পথে চলব তখন যদি সদাচার পালন না করি, মিথ্যা ভাষণ করি, অন্যকে ঠকাই তাহলে রাস্তা থেকে আমি পিছিয়ে পড়ব, লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেরী হবে। এখন যদি আমি বলি আমি পরমাত্মা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হতে চাই, তাঁর যে মায়া, তাঁর যে ঐশ্বর্য কোনটাই আমি চাইনা। তখন আমার সব কিছুই সদাচারে দাঁড়িয়ে যাবে। তুমি যদি বল আমি ভোগ করতে চাই। কে নিষেধ করেছে তোমাকে ভোগ করতে, খুব করে ভোগ কর। অসুররাও ভোগ করতেই চাইত, দৈত্যরা ভোগই করে গেছে, দানবরাও ভোগের মধ্যেই ছিল। তুমিও থাক, কিন্তু মার খাবে তখন চেঁচামেচি করতে পারবে না, অপরকে দোষ দিতে পারবে না, কারণ তুমিইতো ভোগ করতে চেয়েছিলে।

সত্যযুগে সবাই সদাচার করতেন। কেন করতেন? পরমাত্মা পরব্রহ্মকে পাবার জন্য। এইভাবে সদাচারে নিযুক্ত থাকত বলে সত্যযুগে সবাই খুব তাড়াতাড়ি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে নিতেন। ত্রেতা যুগে মানুষ যেমন তপস্যা করতেন সাথে সাথে কর্মও করতেন। সবাই স্বধর্ম পরায়ণ, ক্রিয়াশীল ছিলেন। তবে ধর্মের ফলটা ক্রমশ নীচের দিকে নামতে শুরু করেছিল। সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা ছিল কিন্তু ত্রেতা যুগে এসে ধর্মের তিনটি পা রইল। দ্বাপরে এসে ধর্ম চারটির জায়গায় দুটি চরণে এসে দাঁড়িয়ে যায় আর বেদের তিনটে ভাগ হয়ে যায়। মহাভারতের সময়টা ছিল দ্বাপর যুগের। কলিযুগে কি হবে তার ব্যাপারে হনুমান বলছেন *তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ। বেদাচারাঃ প্রশাম্যন্তি ধর্মযজ্ঞক্রিয়াস্তথা।* ।৩/১৪৯/৩৪। কলিযুগে তমোগুণীর রূপে ভগবান বিষ্ণুর যে বিগ্রহ আছে তার কালো রঙ হয়ে যাবে। এখন বিষ্ণুর যত বিগ্রহ সবই কালো রঙের হয়। বৈদিক যত সদাচার, যজ্ঞ কর্ম কলিযুগে এগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। খ্রীশ্চান ধর্মে ও ইসলামে যেমন সৃষ্টি একবার হয়ে গেছে এখন সেটাই চলতে থাকবে, আর সৃষ্টি হবে না। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই সৃষ্টি যেটা হয়েছে তার একটা সময় নাশ হয়ে যাবে, আবার সৃষ্টি হবে। ঠিক তেমনি এই চারটে যুগ চাকার মত ঘুরতে থাকে আর সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে চলে। সেইজন্য ঘুরে ঘুরে আবার এই কলিযুগ থেকে সত্যযুগে চলে আসবে তখন আবার ধর্ম চারটে পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এইভাবে চলতেই থাকবে কোন দিন থামবে না। কলিযুগে আর কি কি হবে? ব্যাধি, রোগ, আলস্য, ক্রোধ এই ধরণের দোষ অনেক বেড়ে যাবে। তবে মানসিক রোগ কলিযুগের একটা বৈশিষ্ট্য, মানসিক রোগ কলিযুগে প্রবল আকার ধারণ করবে। কলিযুগে ক্ষুধা, পিপাসার অনেক উপদ্রব বেড়ে যাবে। এইজন্য আমাদের কত রকমের জল এখন পান করে থাকতে হচ্ছে, কলের জল, ফিল্টারের জল, কোল্ড ড্রিঙ্কসই কত রকমের হয়ে গেছে। এইসব বলার পর ভীমসেন আবার হনুমানকে অনুরোধ করছেন হনুমানের সেই রূপ দেখাবার জন্য। তখন হনুমান ভীমকে নিজের ঐ বিশাল রূপটাকে দেখালেন। হনুমানের ঐ বিশাল রূপ ভীম কল্পনাই করতে পারেনি, ঐ রূপ দেখে ভীম একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় মুর্ছিত হয়ে যাচ্ছিল। ঐ রূপ দেখে হনুমানকে ভীমসেন বলছেন 'আপনি তো একাই যথেষ্ট ছিলেন, আপনার এই যে বিশাল শরীর, এই দিয়েই আপনি একা রাবণকে শেষ করে দিতে পারতেন, তাও আপনাদের এত কিছু কেন করতে হয়েছিল'? হনুমান বলছেন 'হ্যাঁ, আমি একাই লঙ্কার নাশ করে দিতাম, কিন্তু আমি যদি তাই করে দিতাম তাহলে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমার প্রকাশ হত না। শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাকে জগতে প্রচার করার জন্য আমি নিজেকে গৌণ ভূমিকাতে রেখেছিলাম'। বাল্মীকি রামায়ণে হনুমানের শক্তি, শৌর্য ও বীর্যের যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে ঠিক তাই হওয়ার কথা। নিজের বিশাল রূপ দেখিয়ে হনুমান ভীমসেনকে বলছেন 'তুমি আমার ভাই, আমি সব সময় তোমাদের সাথে থাকব আর অর্জুনের যে রথ তাতে আমি সব সময় বিরাজমান থাকব'।

স্বর্গলোক থেকে অর্জুনের প্রত্যাবর্তন, অর্জুনকে নারদের তিরস্কার

পাণ্ডবরা তীর্থাদি ঘুরে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে অর্জুনও স্বর্গলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করে এসেছেন। অর্জুনকে সবাই মিলে ধরেছে স্বর্গে কি কি হল সব বল। অর্জুনও সব ঘটনা বলতে লাগলেন, শিবের সঙ্গে যুদ্ধ হল, এই করলাম সেই করলাম, উর্বশীর সাথে এই কাণ্ড হয়েছিল। এরপর সবাই অর্জুনকে বলছে 'তুমি যে স্বর্গলোক থেকে দিব্যাস্ত্র নিয়ে এসেছ আর শিবের যে পাশুপত অস্ত্র এনেছ সেগুলো একটু আমাদের দেখাও'। অর্জুন বললেন 'ঠিক আছে, কাল সকালে দেখাব'। সকাল হতেই অর্জুন স্নান করে পূজো করে পবিত্র হয়ে প্রথমেই শিবের পাশুপত অস্ত্র বার করে গাণ্ডীবে লাগিয়েছেন। অর্জুনকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল কোন দুর্বলের প্রতি এই পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করবে না। যেমনি পাশুপত অস্ত্র লাগিয়েছনে তখনই পর্বতগুলো বিদির্ণ হতে শুরু হয়ে গেছে, বাতাস তার প্রবাহকে স্তব্দ করে দিয়েছে, সূর্যের রশ্মি ম্লান হয়ে গেছে। এইসব কাণ্ড দেখে সঙ্গে সঙ্গে নারদ সেখানে হাজির হয়ে গেছেন, নারদ মনের গতিতে চলেন। নারদ অর্জুনকে জোর ধমক দিয়ে বলছেন 'অর্জুন! এগুলো কোন খেলার সামগ্রি নয়, লক্ষ্য যদি না থাকে, উদ্দেশ্য যদি না থাকে এগুলো কখনই তুমি ব্যবহার করতে যাবে না। লক্ষ্য যদিও বা পেয়ে যায় তাও এমন লোকের উপর এর সন্ধান করবে না যদি না তুমি মহা বিপদে পড়ে থাক বা তার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করে পেরে উঠবে না। যদি তুমি এই রকম কর তাহলে তোমার মহা পাপ হবে, তোমার হাতে এখন ক্ষমতা এসে গেছে ঠিকই কিন্তু এইভাবে এই ক্ষমতাকে অপব্যবহার করতে যেও না'। নারদের কথা শুনেই অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন।

রাজা নহুষের কাহিনী

একদিকে পাণ্ডবরা তীর্থাদি ভ্রমণ করে ফিরে এসেছে আর অন্য দিক থেকে অর্জুনও স্বর্গলোক থেকে ফিরে এসেছেন। এখন সবাই একসাথে বনেই আছেন। ইতিমধ্যে একদিন ভীমসেন গভীর জঙ্গলে জল আনতে গিয়েছেন। সেখান এক অজগর সাপ ভীমসেনকে ধরে ফেলেছে। এই অজগর সাপ আর কেউ নয়, ইনি হলেন রাজা নহুষ, ঋষিদের অভিশাপে তিনি সাপ হয়ে এখানে পড়ে আছেন। সংক্ষেপে নহুষের কাহিনী হল, নহুষ এক সময় পৃথিবীর খুব প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের উপর একটা অভিশাপ পড়ে গিয়েছিল। ঐ অভিশাপের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গলোক ছেড়ে অনেক দিনের জন্য তপস্যায় চলে যেতে হয়েছিল। স্বর্গের সিংহাসনকে তো শূন্য অবস্থায় রাখা যায় না। সবাই চিন্তা পড়ে গেলেন কাকে এখন স্বর্গের রাজা করা যায়। তখন সবাই বিচার করে দেখলেন নহুষ খুব নামকরা রাজা তাই ঠিক করা হল নহুষকে এখন স্বর্গের রাজা করা হোক। কিন্তু যা হয়ে থাকে, নিজের যা ক্ষমতা তার থেকে বেশী ক্ষমতা পেয়ে গেলে সবারই মাথা ঘুরে যায়। নহুষ পৃথিবীতে সাম্রাজ্য চালাচ্ছিল সেখান পর্যন্ত ঠিক ছিল কিন্তু স্বর্গের সাম্রাজ্য পেতেই তাঁর মাথা গেছে ঘুরে। প্রথম দিকে ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু কিছু দিন পরে নহুষের মনে কি হল সে ভাবতে লাগল আমি এখন স্বর্গের রাজা, ইন্দ্রত্বের অধিকার আমার হাতে। তাই নহুষ চাইল ইন্দ্রের যে স্ত্রী শচী সে এখন এসে তার সেবা করুক। শচী নহুষের এই অভিলাষের খবর পেতেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি একটা কায়দা করলেন। তিনি বলে পাঠালেন সপ্তর্ষির ঋষিরা যদি পাল্কি কাঁধে করে নহুষকে এখানে নিয়ে আসেন তবেই তার অভিলাষ পূরণ হবে। নহুষ এখন ইন্দ্র, ঋষিদের আদেশ করা হল। ঋষিরা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। রাজা একজন নারীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে আর তার পাল্কিটা বইতে হবে ঋষিদের। ঋষিরা এখন পাল্কি করে নহুষকে শচীর কাছে নিয়ে চলেছে। নহুষের মনে হল ঋষিরা যেন ইচ্ছে করে পাল্কিটাকে ধীরে ধীরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা হয়ে থাকে, মানুষের মন যখন মোহান্ধ হয়ে যায় তখন তার বিবেক বুদ্ধি সব হারিয়ে যায়। তখন নহুষ একজন ঋষির মাথায় পা দিয়ে আঘাত করে বলছে 'সর্প সর্প' মানে তাড়াতাড়ি করে চল এত আস্তে আস্তে চলছ কেন। ঋষির মাথায় যখন নহুষ পা দিয়ে আঘাত করেছে সেই ঋষি প্রচণ্ড রেগে গেছেন। রেগে গিয়ে সেই ঋষি বলছেন 'তুমি সর্প সর্প বলছিলে তো, ঠিক আছে তুমি এক্ষুণি সাপ হয়ে এক জায়গাতেই পড়ে থাক'। ঋষির কথা শেষ হতেই নহুষ সঙ্গে সঙ্গে সাপ হয়ে স্বর্গ থেকে পড়ে যাচ্ছে। তখন নহুষ বলছেন 'আরে আমিতো দেবতাদের রাজা থেকে রাতারাতি সাপ হয়ে গেলাম, কিন্তু আমার মুক্তি কিভাবে হবে'? ঋষি তখন বলছেন 'যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে যখন তোমার জ্ঞান প্রাপ্তি হবে তখন তোমার মুক্তি হবে'।

নহুষ এখন অজগর হয়ে পড়ে গেছে। যেখানে পড়েছে সেখানেই পড়ে রয়েছে আর যাকেই নিজের সীমানার মধ্যে পেয়ে যায় তাকেই টেনে এনে খেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকছে। এদিকে ভীমসেন জল নিতে এসে নহুষের এলাকার মধ্যে ঢুকতেই নহুষ ভীমকে ধরে নিয়েছে। এদিকে ভীমসেন নহুষেরই বংশধর। ভীমকে নহুষ বলছে 'দেখো, তুমি আমারই বংশের কিন্তু আমার কিছু করার নেই আমার উপর অভিশাপ আছে তাই এই অজগর সাপ হয়ে আমি পড়ে আছি আর আমার এক্তিয়ারের

মধ্যে যা কিছু এসে যাবে সব আমার ভক্ষণে চলে যাবে। তাই আমি তোমাকে আজ ভক্ষণ করব। কিন্তু যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তাহলে তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে, তা নাহলে তুমি আমার পেটে চলে যাবে। ভীমসেন তো শুধু লড়াই করতেই জানে, প্রশ্নের উত্তর কি আর দেবে। ভীমসেনও যথারীতি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। নহুষও ভীমকে ছাড়বে না। ইতিমধ্যে ভীম জল নিয়ে ফিরছে না দেখে যুধিষ্ঠির খোঁজ নিতে গেছেন।

যুধিষ্ঠির নহুষ সংবাদ

যুধিষ্ঠির এসে দেখেন ভীমকে এক বিরাট অজগর সাপ গ্রাস করতে শুরু করেছে। যুধিষ্ঠিরকে দেখে নহুষ বলছেন 'হে যুধিষ্ঠির! আমি এক অভিশপ্ত সাপ। আমি তোমারই বংশধর রাজা নহুষ। সপ্তর্ষির ঋষি অগস্ত্য মুনির মাথায় পা দিয়েছিলাম বলে তাঁর অভিশাপে স্বর্গ থেকে আমার পতন হয়ে এই সাপ হয়ে পড়ে আছি। এখন একটাই পথ আছে আমি তোমাকে যে প্রশ্নগুলো করবো আর তার উত্তর তুমি যদি ঠিক ঠিক দিয়ে দিতে পার তাহলেই আমার মুক্তি হয়ে যাবে'। এই শ্লোকটিও খুব গূঢ়ার্থ এবং খুব গভীর একটা তাৎপর্য বহন করছে। বলা হয় মুক্তি সব সময় হয় জ্ঞান থেকে। অন্যান্য ধর্মের সাথে বেদান্তের মূল পার্থক্য এইখানে। সব ধর্মে আমি এখানে আছি আর ভগবান ঐখানে আছেন, এখন আমাকে এগিয়ে গিয়ে ভগবানকে ধরতে হবে। ভগবানকে ধরার জন্য আমাকে এত জপ করতে হচ্ছে, এত পূজো, এত অর্চনা, এত দান ইত্যাদি করতে হচ্ছে। যেমন জগতে খাটাখাটনি করলে টাকা-পয়সা, মান-সম্মান পাওয়া যায় ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে খাটলে ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদান্ত মতে ঈশ্বরীয় জ্ঞান আমাদের ভেতরে একেবারে চোখের সামনে পড়ে আছে কিন্তু একটা অজ্ঞানের আবরণে সেই জ্ঞানটা ঢাকা পড়ে আছে। আমার চোখের সামনে এই টিউব লাইটটা আছে, আমার চোখ খোলা কিন্তু ওতে আলো নেই, আলো আনতে হলে আমাকে ইলেক্ট্রিক কানেকশান দিতে হবে, সুইচ অন্ করতে হবে। কিন্তু টিউব লাইটে আলো জ্বলছে আর আমি হাত দিয়ে চোখটাকে ঢেকে রেখেছি। এখন কিভাবে আমি আলো আছে কিনা বুঝবো। আমাকে হাতটি চোখের ওপর থেকে সরাতে হবে চোখটাকে খুলতে হবে তখন আমি দেখব টিউব লাইটে আলো জ্বলছে। বেদান্ত মতে ঠিক এটাই হয়। আমাদের যত জ্ঞান কখন বাইরে থেকে আসে না, জ্ঞান আমাদের ভেতরে সব সময় আগে থেকেই বিদ্যমান, অজ্ঞানের আবরণটা সরে যাওয়া মানেই জ্ঞান হয়ে গেল। আচার্য শঙ্কর এই জিনিষটাকে খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, চন্দর, অগুরু এগুলো যদি অনেক দিন জলের সংসর্গে থাকে তখন এগুলোর মধ্যে দুর্গন্ধ এসে যায়। চন্দনের সুগন্ধটা স্বাভাবিক, চন্দনের ভেতরেই সুগন্ধটা আগে থাকতেই আছে কিন্তু দুর্গন্ধ চাপা পড়ে গেছে। এখন যদি কিছু দিন চন্দনটাকে ঘষে দেওয়া যায় তাহলে আবার তার সুগন্ধটা বেরিয়ে আসবে। ঠিক তেমনি আমাদের অজ্ঞানটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সবারই মধ্যে আগে থাকতেই যে স্বাভাবিক জ্ঞানটা বিদ্যমান রয়েছে সেই জ্ঞানটা বেরিয়ে আসবে। সেইজন্য বলে যাঁরা উচ্চকোটির সাধক তাঁদেরকে গুরু যখন একবার একটি কথা বলে দেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হয়ে যায়। এই রকম একটি ব্রহ্মবাক্য হল তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতুকে তাঁর গুরু বলে দিলেন 'তত্ত্বমসি শ্বেতুকেতু', তুমিই সেই শ্বেতকেতু, সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতকেতুর জ্ঞান হয়ে গেল। যাঁরা মধ্যম শ্রেনীর সাধক তাঁদেরকে একবার এইভাবে আরেকবার অন্য ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে হয়, তখন এক সময় বুঝে নিতেই তাঁর জ্ঞান হয়ে গেল। আর যারা সাধারণ সাধক তাদেরকে অনেক ঘষতে মাজতে হয়। ঠাকুর স্বামীজীকে শুধু একটু স্পর্শ করে দিলেন তাতেই স্বামীজী একেবারে জ্ঞানের অবস্থায় চলে গেলেন। অদ্বৈত সাধনার সময় তোতাপুরী ঠাকুরকে বললেন তোমার মনকে এই ভ্রুর মাঝখানে সমাহিত কর। ঠাকুর যত বার সমাহিত করতে যাচ্ছেন ততবারই মাকালীর রূপ এসে যাচ্ছে, মাকালীর প্রতি ঠাকুরের অত্যন্ত ভালোবাসা ছিল কিনা। ঠাকুর বলছেন আমার হচ্ছে না। তখন তোতাপুরী একটা কাঁচের টুকরো দিয়ে কপালে আঘাত করে বললেন এইখানটায় এইবার সমাহিত কর। ঠাকুর তখন একটু চেষ্টা করতেই তাঁর মন অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। এনারা ছিলেন উচ্চকোটির আধার। এখানে নহুষ যেন উচ্চ আধার, কিন্তু অজ্ঞান তাকে যেন আটকে দিয়েছে। এই অজ্ঞান যেটা রয়েছে, এর উত্তর যেমনি দেওয়া হবে তখনই সে তার স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে। পৌরানিক কাহিনীর এইটাই কাজ, বেদান্তের যে কঠিন তত্ত্বগুলি আছে, যেগুলোকে সহজ করে বোঝান যায় না, সেই তত্ত্বগুলিকে পুরান বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়। মাণ্ডুক্যকারিকা থেকে যদি আমাদের বলা হয় যে, উত্তম সাধককে একটি তত্ত্ব কথা বলতেই তার জ্ঞান লাভ হয়ে যায়, আমরা কিছুতেই বুঝতে পারব না। কিন্তু যদি বলা হয় নহুষ সাপ হয়ে পড়েছিল, যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করল আর তার উত্তর জানতেই নহুষের মুক্তি হয়ে গেল, তখন ব্যাপারটা অতি সহজে বোঝা যাবে।

সত্যিই নহুষ সাপ হয়েছিল কিনা, সাপ হয়ে নহুষ ভীমসেনকে খেতে গিয়েছিল কিনা, যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেটা জানার জিনিষ সেটা হল তখনকার দিনে মানুষের মনে যে নানান রকমের প্রশ্নাদি

ছিল, যে ধারণা গুলোকে নিয়ে মানুষের মধ্যে চর্চা ছিল, সেই সব কিছুকে ব্যাসদেব কথা কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির-নহুষ সংবাদের মাধ্যমে যে তত্ত্বগুলো সামনে আসছে এগুলোকে জানা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দরকার। নহুষ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন *ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্! বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির! ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে।* ।৩/১৫১/২০ 'তোমার সাথে আমার যে এতক্ষণ কথা হল তাতে আমি বুঝলাম তুমি খুব বুদ্ধিমান, মনে হচ্ছে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তুমি বল ব্রাহ্মণ কে আর তার জন্য জানার মত তত্ত্ব কি'? সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কে এই সমস্যা আমাদের আদিম কাল থেকে চলে আসছে। যুধিষ্ঠির নহুষের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন – *সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংশ্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।* ।৩/১৫১/২১। 'ব্রাহ্মণ তাকেই বলা হয় যার মধ্যে কয়েকটি সৎ গুণ আছে'। মহাভারতের সময়কার এই দ্বন্দ্ব মহাভারতেই বারবার আলোচনায় আসবে। বলছেন জন্ম থেকেই কেউ ব্রাহ্মণ নয়। যার মধ্যে সত্য আছে, সত্ত্বগুণ আছে, দান করার বৃত্তি আছে, ক্ষমা আছে, সুশীল, মৃদু, মৃদু মানে তার মধ্যে কোন ধরণের ক্রুরতা নেই। আমাদের সবারই মধ্যে কিছু না কিছু ক্রুরতার ভাব আছে, আমরা যদি কারুর থেকে কষ্ট বা আঘাত পেয়ে থাকে তাকেও পাল্টা কষ্ট দিতে চাই। ব্রাহ্মণের মধ্যে এই ক্রুরতা থাকবে না, আর কি থাকবে? তপস্যা আর দয়া। এই গুণগুলো যার মধ্যে আছে তাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। জানার মত তত্ত্ব কি? যুধিষ্ঠির বলছেন জানার মত তত্ত্ব একটাই আছে – *বেদ্যং সর্প! পরং ব্রহ্ম নির্দ্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ। যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্।* ।৩/১৫১/২২। যে অবস্থা সুখ-দুঃখের পার, সেই অবস্থা হচ্ছে ব্রহ্মপদ। এটাই ব্রাহ্মণদের জানার মত একমাত্র তত্ত্ব। সুখ-দুঃখের পার কেন বলা হচ্ছে? যেখানেই সুখ সেখানেই দুঃখ থাকবে, যেখানেই দুঃখ সেখানেই সুখও থাকবে, দুটো একসঙ্গেই চলে। একমাত্র দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা, যেটা সুখ-দুঃখের পার সেটাই হল ব্রহ্মপদ।

সর্প আবার প্রশ্ন করাতে যুধিষ্ঠির উত্তর দিচ্ছেন, শূদ্রের মধ্যেও যদি সত্য, দান, ক্ষমা, সুশীল ইত্যাদি যে গুণ গুলোর কথা বলা হয় সেই লক্ষণ গুলো থাকে তাহলে সে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি এই লক্ষণ গুলি না থাকে তাহলে সেই ব্রাহ্মণ হয়েও শূদ্র। সর্প তখন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন 'হে যুধিষ্ঠির! তুমি যে বললে জানার মত তত্ত্ব হল সেটাই যেটা সুখ-দুঃখের পার, কিন্তু জগতে আমি এমন কোন পদার্থ দেখছি না যেটাতে সুখ-দুঃখের সত্তা নেই'। যুধিষ্ঠির বলছেন 'হে সর্প! তুমি ঠিকই বলছ এমন কোন পদার্থ নেই যেটা সুখ-দুঃখের বাইরে। তার মানে এমন কোন বিদ্যা নেই যেটা পেলে তুমি সুখ-দুঃখের পারে যেতে পারবে কিন্তু একটা পদ বা অবস্থা আছে যেটা হল সুখ-দুঃখের পার'। এই জায়গাটাতে খুব সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা হচ্ছে। আমাদের দর্শনে যখন পদার্থ বা বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন বেদান্ত প্রথমেই বলে দেবে ব্রহ্ম কোন পদার্থ বা বস্তু নয়। যখনই কোন বস্তু বা পদার্থের কথা বলা হয় তখন সেই বস্তুর সঙ্গে সব সময় সুখ আর দুঃখ জড়িয়ে থাকে। সেইজন্য এই জগতের কথা যখন বলা হয় তখন এই জগতটাও একটা বস্তু, তাই জগতের সাথে আমরা যতক্ষণ জড়িয়ে থাকব ততক্ষণ সুখ আর দুঃখও আমাদের জড়িয়ে থাকবে। স্বর্গ ও নরকও বস্তুর মধ্যেই পড়ছে সেইজন্য সুখ-দুঃখ স্বর্গেও থাকবে আবার নরকেও থাকবে। কিন্তু একটা অবস্থা আছে সেই অবস্থা প্রকৃতির বাইরে, সেইজন্য সেই অবস্থাকে পদার্থ বা বস্তু বলা যায় না। এর সহজ উদাহরণ হল আমরা যখন গভীর নিদ্রায় সুষুপ্তিতে চলে যাই তখন আমাদের কোন সুখ-দুঃখের বোধ থাকে না, কিন্তু যখন ঘুম ভাঙে তখন এই বোধটা আসছে যে আমার কি গাঢ় ঘুম হয়েছিল, কি সুখেই ছিলাম। এই সুষুপ্তি কোন পদার্থ নয় এটি একটা অবস্থা। ঠিক তেমনি ব্রহ্মপদ একটা অবস্থা। তুমি ঠিকই বলছ সব পদার্থই সুখ-দুঃখে জড়িয়ে আছে কিন্তু ব্রহ্মপদ কোন পদার্থ নয় এটি একটা অবস্থা, যে অবস্থাটা সুখ-দুঃখের পার।

সর্প তখন বলছে 'তুমি যে বলে দিলে এই গুণ থাকলে ব্রাহ্মণ হবে আর এই গুণ না থাকলে ব্রাহ্মণও শূদ্র বলে গণ্য হবে, তাহলে তো কোন দিন জাতি বিচার করাই যাবে না'। একটা লোককে আমি দশ বছর ধরে দেখছি তার মধ্যে কোন ক্রুরতা নেই, হিংসা নেই কিন্তু হঠাৎ তাকে দেখলাম তাকে ক্রুর আচরণ করতে, আমি তাকে বললাম আপনার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত ভাব নেই। এইভাবে তো জাতি বিচার করাই যাবে না। যুধিষ্ঠির তখন বলছেন 'আপনি ঠিকই বলছেন, তবে কি জানেন আজকাল জাতি সঙ্কর খুব বেড়ে গেছে'। এই সমস্যা মহাভারতের সময়কার, এখন আমরা যতই অসবর্ণ বিয়ে নিয়ে চেঁচামেচি করিনা কেন মহাভারতেই বলছে এখন বর্ণসঙ্কর বড্ড বেশী হচ্ছে। সেইজন্য জন্ম দিয়ে কাউকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তাই এখন নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। যুধিষ্ঠির বলছেন, বাণী, মৈথুন, জন্ম ও মৃত্যু এই কটি জিনিষ প্রত্যেকটি প্রাণিতে সমান দেখা যায়। তাই আপনি বলতে পারবেন না যে কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র। ব্রাহ্মণ যে ভাবে কথা বলে অন্য বর্ণের লোকেরাও সেইভাবেই কথা বলে, ব্রাহ্মণ যেভাবে জন্মায় অন্যরাও সেইভাবেই জন্ম নেয়,

ব্রাহ্মণরাতো আর আকাশ থেকে আসছে না, সবাইকেই মায়ের গর্ভ থেকেই জন্ম নিতে হয়। তাহলে আপনি কি করে বুঝবেন সে ব্রাহ্মণ না শূদ্র? সেইজন্য এই গুণগুলো কারুর ভেতরে আছে কিনা দেখতে হয় যদি থাকে তাহলে সে ব্রাহ্মণ, না থাকলে সে শূদ্র। যুধিষ্ঠির আবার বলছেন 'যতক্ষণ একটি বালককে উপনয়নাদি না করিয়ে, বেদের স্বাধ্যায় না করিয়ে সংস্কার করা হচ্ছে ততক্ষণ তাকে শূদ্র বলেই গণ্য করা হয়'। বেদের স্বাধ্যায় করাবার পরেও যদি তার মধ্যে ব্রাহ্মণের মত শীল না থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে প্রবল বর্ণসঙ্করতা আছে। বর্ণসঙ্কর মানে দুটো আলাদা বর্ণ এসে মিশেছে। দুটো আলাদা বর্ণ মিশে যায় তারপর তাকে যদি বেদ পড়িয়ে দেওয়া হয় তাতেও কিন্তু তার মধ্যে ঐ শীল ভাব আসবে না। যুধিষ্ঠিরের সব কথা শোনার পর সর্প বলছে 'আমি বুঝে গেছি ব্রহ্মপদই একমাত্র জানার মত তত্ত্ব আর ব্রাহ্মণ কাকে বলে সেটাও বুঝে গেছি। আমি আর তোমার ভাইকে ভক্ষণ করব না'।

এরপর যুধিষ্ঠির নহুষকে বলছেন 'আপনি তো আমাদের পূর্বজ আর আপনি খুব বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আমারও কিছু ব্যাপারে জিজ্ঞাস্য আছে যদি আপনি জানিয়ে দেন'। যুধিষ্ঠির তখন অনেকগুলো প্রশ্ন করছেন। যেমন দান আর সত্য এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী মহৎ। রাজা নহুষ তখন যে কথাগুলো বলছেন এইগুলোই হল মহাভারতের সমগ্র বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু। নহুষ বলছেন – *দানঞ্চ সত্যং তত্ত্বং বাহপ্যহিংসা প্রিয়মেব চল। এষাং কার্য্যগরীয়স্ত্বাদ্দৃশ্যতে গুরুলাঘবম্।* ।৩/১৫৩/৪। 'দান, অহিংসা, সত্য তত্ত্ব আর প্রিয় ভাষণ এই চারটের গুরুতা আর লঘুতা সব সময় নির্ধারিত হয় কার্যের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের অনুসারে'। যে কোন কাজের মাহাত্ম্য অনুসারে নির্ভর করে জিনিষটা ভালো না খারাপ। যেমন মিষ্টি কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা তার বিচার হবে যে কার্যে মিষ্টি কথা বলে দশজনের ভালো হবে তখন অবশ্যই মিষ্টি কথা বলতে হবে। আর অপ্রিয় সত্য কথা বলা আর মিষ্টি কথা বলার মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব আসবে তখন আমি কোনটা করব? সেটাই করতে হবে যেটা করলে বেশী লোকের ভালো হবে। দেখতে হবে শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বা নিজের স্বার্থ জড়িয়ে আছে কিনা। কাউকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমার নিজের কিছু কার্য সিদ্ধি হবে, আমার একটা মোটা কিছু লাভ হবে তখন সেই মিষ্টি কথাটা বলা কোন ভালো কাজের মধ্যে পড়ছে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যে কথা বলতে হবে অশ্বত্থামা মারা গেছে। এখানে অহিংসা আর সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব এসে গেছে। কিন্তু সেখানে বেশী লোকের মঙ্গল জড়িয়ে আছে, একটা মিথ্যের জন্য ধর্ম রক্ষা পাবে। সেইজন্য বলছেন কার্যের মাহাত্ম্য দেখে বিচার করতে হবে। সরাসরি এক তরফা ভাবে বলে দেওয়া যায় না যে এটাই ঠিক। মূল্যবোধের বিচারের ক্ষেত্রে এই জিনিষগুলো খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কখনই বলা যায় না এটাই সব সময়ের জন্য ঠিক। এই চারটে জিনিষ ঠিক না ভুল এর বিচার করা হয় একমাত্র কর্তার স্বার্থ আর কর্মের মাহাত্ম্যের নিরিখে। সেইজন্য কখনই দুম করে বলে দেওয়া যাবে না দান আর সত্যের মধ্যে কোনটা বেশী ভালো। কোন কোন দান সত্য থেকে মহৎ আবার কোন কোন সত্য দান থেকে মহৎ। এইগুলোকে কখনই একই নিয়মে বেঁধে দিয়ে বলা যাবে না যে এটাই ঠিক। এটা ঠিক হবে না ভুল হবে এই ব্যাপারে মনই হল শ্রেষ্ঠ গুরু। আমার মনই বলে দেবে এই কাজটা আমি করব কি করব না। আমি একটা দিব্যি করে বসে আছি যে এই কাজ আমি কোন দিন করব না। হঠাৎ একটা পরিস্থিতি এসে গেল যেখানে ঐ কাজটাই যদি আমি করি তাহলে অনেকেরই মঙ্গল হবে। তখন আমি কি করব? অবশ্যই করতে হবে, আমার দিব্যিকে ভেঙে দিয়েই করতে হবে। তখন আমাকে যদি বলা হয় আমি সত্য থেকে সরে এলাম, কিন্তু আমি যদি সত্যকে ধরে থাকতাম তাহলে সেই সত্যের কোন দামই থাকত না। শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রতিটি পদে পদে আমরা এই জিনিষটাই পাই, সেইজন্যই তাঁরা আজ অবতার রূপে ঘরে ঘরে পূজিত। রামায়ণ আর মহাভারতে পদে পদে এই দ্বন্দ্বের সঙ্ঘাত লেগে আছে। এই ধরণের দ্বন্দ্বের সঙ্ঘাত শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশুর জীবনে পাই না, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে, আরও বেশী শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যখনই দ্বন্দ্ব আসছে তখন একটা পথ একদিকে ঠেলে দিচ্ছে আরেকটা পথ অন্য দিকে ঠেলছে, এখন আমি কোন পথটাকে নেব। সেইটাই বলা হচ্ছে তোমার পরিস্থিতি আর কার্যের মাহাত্ম্যটা দেখবে এবং সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে আমি কোন্ পথটা নেব। আমরা কি করে বুঝব কোন কার্যের কতটা মাহাত্ম্য, কারণ আমরা স্বাভাবিক ভাবেই প্রচণ্ড স্বার্থান্বেষী, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু জানিনা। সেইজন্য কার্যের মাহাত্ম্য বিচার করতে গিয়েও আমরা আগে আমাদের স্বার্থের কথা ভাবি। কিন্তু সেইভাবে দেখলে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়ে যাবে, নিজেই নিজের ফাঁস তৈরী করে নিলে। কার্যের মাহাত্ম্য বুঝতে গেলে আমাদের মনকে আগে খুব শুদ্ধ ও পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ ও পবিত্র মন যদি না হয় তাহলে এমন লোকের কাছে যেতে হবে যিনি বিদ্বদজন আর যাঁর মন পবিত্র ও পরিষ্কার, তখন তাঁরাই বলে দেবেন তোমার এই কাজ করাটা ঠিক হবে না ভুল হবে। ঠাকুর বলছেন – অত বড় বড় পালোয়ান থাকতে গ্রামের কোন ঝামেলা মেটানোর জন্য বিশ ক্রোশ দূর থেকে রোগা প্যাটকা পণ্ডিতকে পাল্কী করে নিয়ে আসা হয়। কারণ তাঁর পবিত্রতা আছে, পাণ্ডিত্য আছে, তিনি শাস্ত্র বোঝেন তাই বিবাদ

মেটানোর জন্য ঐ ধরণের লোককে নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রথমে আমাকে দেখতে হবে আমার কোন স্বার্থ এর মধ্যে জড়িয়ে আছে কিনা। যদি আমার স্বার্থ এই বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে থাকে তাহলে এর বিচার আমি কোন দিন করতে পারব না। যদি আমার স্বার্থ না জড়িয়ে থাকে তাহলে দেখতে হবে যেটা করলে বেশী লোকের ভালো হবে সেটাই আমাকে করতে হবে। সেইজন্য শুধু বলে দিলাম সত্য পালন করবে, দান করবে, অহিংসা করবে এইভাবে জীবন চলতে পারে না। এইটাই হচ্ছে মহাভারতের বক্তব্যের মূল কেন্দ্র বিন্দু। মহাভারতের জীবন ধারা হচ্ছে পদে পদে দ্বন্দ্ব। এখন আমি কি করে বিচার করব যে আমি কোন্ পথ গ্রহণ করব। মহাভারত বলছে আগে দেখ তোমার কোন স্বার্থ জড়িয়ে আছে কিনা, যদি স্বার্থ জড়িয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তোমার অশুদ্ধ মন, অশুদ্ধ মনকে বিচারে লাগিও না। স্বার্থ যখন জড়িয়ে থাকবে না তখন দেখবে কোনটাতে বেশী লোকের মঙ্গল হচ্ছে, যখন দেখবে বেশী লোকের মঙ্গল হচ্ছে তখন বুঝে নেবে ঐ পথটাই ঠিক। এই সব বলে বলছেন কার্যের অপেক্ষা যেটা হয় গুরু রূপে সেটা মন পরিষ্কার না হলে বোঝা যায় না কোনটা মহৎ কার্য আর কোনটা সাধারণ কার্য। সেইজন্য নিজের মন যদি পবিত্র ও শুদ্ধ হয় তাহলে সেই মনই গুরুর কাজ করবে, নিজের মন খুবই মাহাত্মপূর্ণ।

যুধিষ্ঠির আবার প্রশ্ন করছেন, মানুষ যখন কর্ম করে তখন সেই কর্মের ফল সে কিভাবে পায়? নহুষ তখন উত্তর দিচ্ছেন – *তিস্রো বৈ গতয়ো রাজন্! পরিদৃষ্টাঃ স্বকর্মভিঃ। মানুষ্যং স্বর্গবাসশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ তত্রিধা।।৩/১৫২/৯।* 'মানুষ যা যা কর্ম করছে তার ফল সে মৃত্যুর পর তিন রকম ভাবে পায় স্বর্গ, নরক আর পৃথিবী লোক। মনুষ্যযোনিতে যখন কেই প্রমাদ ও আলস্য ছেড়ে দানাদি শুভ কর্ম করে তখন সে স্বর্গ পায়'। আমাদের শরীরের মধ্যে যে জীব আছে সে বারবার এই স্বর্গ, মর্ত্ত আর নরকের মধ্যে ঘুরতেই থাকে, কারণ সে সব সময় কর্ম ফল পেতে চাইছে। যত দিন সে কর্মফলের প্রত্যাশা করতে থাকবে তত দিন তার কোন মুক্তি নেই এই তিনটে লোকের মধ্যেই ঘুরতে থাকবে। একমাত্র যে কর্মফল প্রত্যাশা করে না সেই ধীরে ধীরে পরমাত্মাতে গিয়ে অবস্থিত হয়ে যায়। ভগবানের পথে প্রথম পদক্ষেপ হল অনাসক্তি, ভালো মন্দ কোন কর্মের ফল আমি চাইছি না। কিন্তু আমাদের সবারই মন ছটফট করে যাচ্ছে শুধু কর্মফলকে পাওয়ার জন্য। একটা দামী পোষাক পড়লে বা ভালো সাজগোজ করলে আমাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে সবার কাছে এই প্রশংসা শুনতে চাইছে। দামী পোষাক কেন পড়ছি? যাতে সবার নজরে আমি পড়ি। তার মানে আমি কর্মফল চাইছি। এত সাধারণ জিনিষেই আমি কর্মফল চাইছি আর যখন ভালো কোন কাজ করব তখন আমার কি অবস্থা হবে কল্পনাই করতে পারব না, তার জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ বার জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে এই তিনটে লোকে ঘুরতেই থাকছি।

যুধিষ্ঠির এরপর প্রশ্ন করছেন, শব্দ, গন্ধ, রূপ ও স্পর্শ এগুলোর আধার কি, আর মানুষ এগুলোকে এক সঙ্গে ভোগ করতে পারেনা কেন? অর্থাৎ একটা জিনিষকে যখন ভোগ করি তখন আমরা অন্য জিনিষকে ভোগ করতে পারিনা। আসল ভোক্তা হল আত্মা, যে আত্মা নিজেকে মনের কার্যের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। শুদ্ধ আত্মার এগুলোর কোন কিছুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি চৈতন্য বলেই চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজেকে অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রাখেন। মনের ক্ষমতা খুবই সীমিত, মন যেমন যেমন বিষয় বস্তুকে গ্রহণ করে আত্মা ঠিক সেই ভাবেই বিষয় বস্তুকে গ্রহণ করে। জীবাত্মা যখন কোন জিনিষকে গ্রহণ করে তখন মনটাকে সে একটা জিনিষের উপরই স্থাপন করে রাখে বলে ঐ একটা জিনিষকেই সে ভোগ করে। সেইজন্য যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁরা বিজ্ঞানের ব্যাপারগুলো সম্বন্ধেই অভিজ্ঞ হয়, যাঁরা ধার্মিক তাঁরা ধর্মের ব্যাপারটাই বোঝেন কারণ মনের ক্ষমতা খুবই সীমিত। আমরা মনে করি আমরা যেন এক সঙ্গে অনেক কিছু গ্রহণ করছি কিন্তু মন ঐভাবে এক সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনা।

যুধিষ্ঠির আবার জিজ্ঞেস করছেন, মন আর বুদ্ধির উত্তম লক্ষণ কি? অর্থাৎ মন আর বুদ্ধি যে ভালোর দিকে যাচ্ছে কি করে বোঝা যাবে? নহুষ বলছেন, বুদ্ধির কাজ হচ্ছে আত্মাকে ভোগ আর অপবর্গ করান। সূক্ষ্ম স্তরে মনের চারটে অবস্থা, সেটা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে নহুষ বলতে চাইছেন সাধারণ ভাবে মন দুটো অবস্থায় কাজ করে একটা হল মন আর দ্বিতীয় হল বুদ্ধি। মন হল চঞ্চল, পাঁচ রকমের জিনিষের পেছন সব সময় ছুটে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধি এই মনেরই একটা অবস্থা যে অবস্থায় মন একটা কিছুকে নিশ্চয় করে নেয়। যেমন গুরুজনের কাছে শুনেছে, শাস্ত্রে পড়ে কিছু শিখেছে, কিছু ঠেকে শিখেছে তখন বুদ্ধি বলে এই জিনিষটা করতে নেই, যেমন বুদ্ধি বলছে চুরি করতে নেই। কিন্তু মন বলছে কেউ দেখছে না চুরি করে নাও। মনের স্বভাবই হচ্ছে চঞ্চল, সব সময় ছটফট করে যাচ্ছে, সে দেখছে চুরি করলে কেউ দেখতে

পাবে না তাই চুরি করে নাও। কিন্তু বুদ্ধি এত দিন ধরে গুরুজনদের কাছে শুনে শুনে, শাস্ত্র পড়ে পড়ে তার মাথাতে বসে গেছে চুরি জিনিষটা খুব খারাপ, তাই বুদ্ধি বলছে চুরি করো না। ফলে বুদ্ধি আর মনের মধ্যে সব সময় সঙ্ঘাত লেগে থাকে। বুদ্ধির আসল কার্য হল আত্মাকে সুখ দেওয়া। বুদ্ধি আত্মাকে কিভাবে সুখ দেয়? শাস্ত্র সম্মত ভোগ করিয়ে। আর অশাস্ত্র যত কর্ম করে তখন ওটা মনের কাজ, বুদ্ধি কখনই অশাস্ত্র কর্ম করায় না। বুদ্ধির দ্বিতীয় কাজ হল আত্মাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া, বুদ্ধি সব সময় বলে বাপু তুমি এটি করো না, এটা তোমার কাজ নয়। ঠাকুর খুব সহজ করে সত্ত্বঃ, রজঃ আর তমঃ এই তিন ডাকাতের গল্প দিয়ে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বুদ্ধি যখন পরিশ্রুত হতে থাকে তখন তার ভেতরটা সত্ত্বগুণের মত হয়ে যায়, আর পুরুষ যে বন্ধনে রয়েছে, তাকে হাত ধরে বলে ঐটা তোমার রাস্তা ঐ রাস্তা ধরে এবার তুমি তোমার বাড়ি চলে যাও। তার আগে পুরুষকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই বেঁধে রাখাটা হল ভোগে বেঁধে রাখা আর পরে তাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। এটাই হল বুদ্ধির ঠিক ঠিক কাজ। এইভাবে নানান রকমের প্রশ্ন করে করে শেষে যুধিষ্ঠিত জানতে চাইলেন কি কারণে আপনাকে এই সর্প শরীর প্রাপ্ত হতে হয়েছে। তখন নহুষ সব বললেন কিভাবে তাঁর অহঙ্কার হয়েছিল, সেই অহঙ্কার থেকে শচীর প্রতি দৃষ্টি গিয়েছিল, এই অহঙ্কারে মোহগ্রস্ত হয়ে অগস্ত্য মুনির মাথায় পা দিয়েছিলাম বলে অগস্ত্য মুনির অভিশাপে আমার এই অবস্থা হয়েছে। সব বলার পর এই কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

যুধিষ্ঠিরকে মার্কেণ্ডেয় ঋষির জীবাত্মা, কর্মফল ও কর্মের গতির ব্যাখ্যা

পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে এখনও জঙ্গলেই আছেন। জঙ্গলে বিভিন্ন ঋষিদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। এইভাবে একবার মার্কেণ্ডেয় ঋষির সাথে দেখা হয়েছে। মার্কেণ্ডেয় ঋষি খুব উচ্চকোটির ঋষি। যুধিষ্ঠির তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন 'হে মুনিবর! মানুষ কর্মের ফল এই লোকে পায় না অন্য লোকে পায়? আর মানুষ যখন মারা যায় তখন তার কর্ম কোথায় থাকে'? এই প্রশ্নের উপর মার্কেণ্ডেয় ঋষি বিরাট লম্বা আলোচনা করছেন। আলোচনার মূল বক্তব্য হচ্ছে, ব্রহ্মা যখন প্রথম সৃষ্টি করেন তখন সমস্ত জীবের শরীর একেবারে শুদ্ধ ও পবিত্র ছিল। জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মা বেদ দিলেন। তখন যত মানুষ সবাই স্বাধীন ছিল, যখন খুশি তারা দেবতাদের সঙ্গে দেখা করে আসত, আর সবারই মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধীন ছিল তার ফলে তারা যত দিন খুশি বেঁচে থাকতে পারতেন, যেখানে খুশি চলে যেতে পারত। কিন্তু সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ ছিল সেটা হল তারা সবাই পূর্ণকাম ছিলেন, তাদের মনে কোন ধরণের কামনা বাসনা ছিল না। কিন্তু পরের দিকে পৃথিবীত যারা বাস করছিল তাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ এগুলো ধীরে ধীরে আসতে শুরু করল। এই ধারণাট খ্রীশ্চান ধর্ম ও ইসলাম ধর্মেও পাওয়া যায়। আদম ও ইভ এরা দুজন স্বর্গলোকে ভগবানের সঙ্গেই ছিল, তাদের মধ্যে কোন পাপ বোধই ছিল না। ভগবান তাদের বলে দিয়েছিল তোমরা কোন দিন আপেল খাবে না। কিন্তু একদিন আদম আপেল খেয়ে নিয়েছে। আপেল খেয়ে নিতেই তাদের জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে গেছে। কিসের জ্ঞান? আমি পুরুষ আর এ নারী, এই ভেদ জ্ঞানটা তার মধ্যে এসে গেছে। আগে এদের অভেদ জ্ঞান ছিল, এখন একাত্ম বোধটা বহু বোধে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সব কিছু গোলমাল হতে শুরু করল। গোলমাল হতেই ভগবান সঙ্গে সঙ্গে তাদের বললেন, তোমরা আর এই স্বর্গলোকে থাকার যোগ্য নও। ভগবান তাদের স্বর্গচ্যুত করে দিলেন। ইসলাম, হিন্দুদেরও এই একই ধারণা যে মানুষ আগে ভালো ছিল কিন্তু সময়ের তালে তালে তাদের সত্ত্বগুণের আধিক্য কমে গিয়ে গোলমেলে হয়ে গেল। গোলমেলে হওয়াটা সব সময় কাম আর ক্রোধ থেকে হয়ে থাকে। যখনই আমরা কোন কার্য করি তখন সেই কার্যের মধ্যে যদি কামনা বাসনা এসে যায়, কামনা বাসনা এসে গেলে রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ এগুলো এসে তাকে জড়িয়ে ফেলে আর তখনই সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। ভালো লোক আর খারাপ লোকের মধ্যে তফাৎটা কোথায়? যার মধ্যে কামনা বাসনা বেশী সে খারাপ লোক আর যার মধ্যে কামনা বাসনা কম সে ভালো লোক। এই পৃথিবীতে চারিদিকে ভোগের বিষয় বস্তু ছড়িয়ে আছে, এই বিষয় বস্তু সব সময় আমাদের আকর্ষণ করে যাচ্ছে। ভোগ সামগ্রীর আকর্ষণ আমাদের মধ্যে কামের সৃষ্টি করে, এই কামের যখন কোন বিঘ্ন হবে তখন ক্রোধের জন্ম হয়ে প্রথমেই মাথাটাকে বিগড়ে দেবে। তখন মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে নানা রকমের ছল চাতুরির আশ্রয় নেয়, তখনই মানুষের পাপ কর্ম করা শুরু হয়। এই কথাই মার্কেণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন। যখন অশুভ কাজ করতে শুরু করেছে তখন মরার পর তারা অসুর যোনিতে জন্ম নিতে শুরু করেছে। একটা ক্ষুধার্ত সিংহের মধ্যে যে পরিমাণ ক্রোধের জন্ম হয় সেই ক্রোধ কি মানুষ নিজের মধ্যে অভিব্যক্ত করতে পারবে? কখনই পারবে না। এখন যার মনে প্রচণ্ড ক্রোধের জন্ম হয়েছে সেই ক্রোধটাকে অভিব্যক্ত করার জন্য তাকে এখন সিংহের শরীর ধারণ করতে হবে। সিংহ যোনি পেয়ে গেলে এবার তোমার যত খুশি ক্রোধ দেখাতে থাক। মদ খেয়ে মানুষ নর্দমায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। নর্দমার পাঁকে তো মানুষের শরীর থাকতে পারেনা। আচ্ছা এবার তুমি গুবড়ে পোকা হয়ে গিয়ে খুব আনন্দের সাথে বিষ্ঠার মধ্যেই থাক। আমাদের শরীরটা কোথা থেকে আসছে? আমি যেমনটি চাইছি সেই অনুসারেই আমার শরীর হবে। জোর করে কেউ শরীর ধারণ করতে পারেনা। আমরা প্রায়ই চেঁচিয়ে বলি মানুষের নিজের ইচ্ছায় কি কখন এই রকম হয়! হ্যাঁ, নিজের ইচ্ছাতেই

হয়। আমি সারাটা জীবন যে রকমটি কাজ করে গেছি, যে রকম আমার চাহিদা পরের জন্মে আমি সেই চাহিদা পূরণের উপযোগীই শরীরই পাব। আমরা অনেক সময় বলি, এই লোকটিকে দেখতে কত সুন্দর, এই লোকটিকে দেখতে কি কুৎসিত, যে যার রূপ নিজেই তৈরী করে। মানুষ ঐটাই করে যেটা তার পছন্দ, আর মন বেচারা বোকা। আমার যেটা ভালো লাগছে মন সেটাকেই আরও বড় করে করে দেবে। শরীরটা এইভাবেই হয়, যেমনটি সে চায় শরীরটাও সেইভাবেই পায়। যখন মানুষ বিভিন্ন রকমের শরীর পায় তখন তার জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে অন্তঃকরণে শুভ অশুভ কর্মের বিরাট রাশি সঞ্চয় করে নেয়। সঞ্চিত কর্মের রাশি অনুযায়ী অন্তঃকরণ একটা আকার নিয়ে নেয় আর ভোগ করতে করতে শরীর যখন জর্জরিত হয়ে যায়, যখন দেখে ঐ শরীর দিয়ে আর ভোগ করা যাবে না তখন জীব ঐ শরীরটাকে ছেড়ে দেয়। তিনটে ব্যাপার হচ্ছে, একটা হল জীবাত্মা মানে যিনি শুদ্ধাত্মা তিনি শরীর মনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন, দ্বিতীয় হল আমার এই শরীর আর তৃতীয়টা জীবাত্মা আর শরীরের মাঝখানে থেকে খেলাতে থাকে সেটা হল এই মন। মনের কাজ হল জীবাত্মা আর শরীরের সংযোগ করান। শরীর হল যন্ত্র আর আত্মা হলেন যন্ত্রী যিনি এই যন্ত্রকে চালাচ্ছেন। ড্রাইভার যখন দেখে গাড়িটা ঝরঝরে হয়ে গেছে তখন ঐ গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা নতুন গাড়ি নিয়ে আসে। জীবাত্মাও যখন দেখে এই শরীরের ক্যান্সার হয়ে গেছে, এই শরীরের হার্টের সমস্যা এসে গেছে তখন এই শরীর দিয়ে তার কোন কাজ চলবে না তখন নিজেই এই শরীরটাকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়। স্বামীজীর যখন শরীর চলে গেল তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণানন্দকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলছেন 'শশীভাই, আমি এই শরীরকে থুতুর মত ফেলে দিয়েছি'। স্বামীজী দেখছেন তিনি আলাদা তাঁর শরীরটা আলাদা, তাই তিনি থুতুর মত শরীরটাকে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এখানে বলছেন জীবাত্মা শরীরটাকে ফেলে দিয়ে অন্য একটা শরীর গ্রহণ করে। এই শরীর ছাড়া আর শরীর গ্রহণ করার মধ্যে একটুও ফাঁক থাকে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই জিনিষটাকে জোঁকের উপমা দিয়ে বলছেন 'জলৌপবৎ', জোঁক একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, এবার সে এগোবার সময় পেছনের অংশটাকে মাটিতে রেখে সামনের অংশটাকে দিয়ে দেখতে থাকে, যখন সামনের অংশটা একটা কিছু দেখে নিয়ে যখন সেটাতে স্পর্শ করল তখনই পেছনের অংশটাকে মাটি থেকে তুলে নেয়। এটা একটা মত যে, জীবাত্মা প্রথমে একটা শরীরকে ধরে নিয়ে তারপর এই শরীরটাকে ছেড়ে দেয়। আরেকটা মত আছে, যেটা গীতারও মত, জীবাত্মা আগে শরীরটা ছেড়ে দেয়, শরীরটা ছেড়ে দিয়ে তারপর আরেকটা শরীরকে গ্রহণ করে। কোন মতটা ঠিক আমাদের পক্ষে বলা খুব মুশকিল। আমাদের ঋষিরা দুটো মতকেই মেলানোর চেষ্টা করেছেন এবং এও বলছেন যে গীতাতে একটা অন্য অর্থে বলা হয়েছে আর উপনিষদে অন্য অর্থে বলছেন। স্থূল শরীর থেকে যেটা বেরিয়ে যায় সেটাও একটা শরীর, সেই শরীরকে বলছি সূক্ষ্ম শরীর। ভূত, প্রেত বা দেবতাদের যে শরীর সেটাও একটা শরীর, স্থূল শরীর ছেড়ে দিয়ে সূক্ষ্ম শরীর এই রকম কোন একটা শরীর প্রথমে নিয়ে আবার পরে অন্য একটা স্থূল শরীর গ্রহণ করে। মূল কথা হল জীবাত্মা কখনই অসংসারী হন না। সংসারী হল যে নতুন নতুন কর্ম সংগ্রহ করছে আর জমে থাকা কর্ম গুলি খরচ করছে। জীবাত্মা এক মুহুর্তের জন্যও অসংসারী হয় না। শরীর থাকলেই সে সংসারী, জীবাত্মার সব সময়ই শরীর থাকছে।

একজন লোক হার্টফেল করে মারা গেল, হার্টফেল করল মানে তার জীবাত্মা তার ঐ শরীরটাকে ছেড়ে দিয়েছে। শরীরটা ছেড়ে যখন সে অন্য একটা শরীরে যাচ্ছে তখন তার যত কর্মরাশি ছিল সব ছায়ার মত তার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। এরপর নতুন যে শরীরটা সে পেয়েছে সেখানে গিয়ে এই কর্মরাশি খরচ করতে শুরু করে তাকে ভোগের দিকে নিয়ে যায়। সেইজন্য মানুষ কখনই তার ভালো মন্দ যত কর্ম করেছে তার থেকে মুক্তি পায়না। মহাভারতের এটা একটা স্পষ্ট ও দৃঢ় মত, মহাভারতের আগের আগের শাস্ত্রগুলিতে এই মতটা অতটা পরিষ্কার ছিল না। নহুষ বলছেন – যাদের মধ্যে জ্ঞানদৃষ্টি আছে তারাই এই জিনিষটাকে দেখতে পান। আমরা তো বলতে পারি 'জীবাত্মা যে শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আমরাতো দেখতে পাচ্ছি না'। না আমরা কখনই দেখতে পারবো না। একমাত্র যাঁদের জ্ঞানদৃষ্টি আছে তাঁরাই দেখতে পান যে জীবাত্মা স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। গীতাতেও এই ঠিক এই কথাই বলছেন 'পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ'। এখানে প্রথমে বলা হল যে মানুষ যে কর্মরাশি সংগ্রহ করেছে সেই কর্মরাশি সব সময় তার পেছনে পেছনে ছায়ার মত ঘুরতে থাকে। একজন লোক হাওড়া থেকে চেন্নাই যাবে। তার করমণ্ডল এক্সপ্রেসে টিকিট কাটা আছে, তার সীট নং এ২/৩২, এসি টু টিয়ার কোচের ৩২ নং সীট। সারা ভারতে বিভিন্ন স্টেশন থেকে শত শত ট্রেন ছাড়ছে, কত লক্ষ লক্ষ লোক আসছে যাচ্ছে, এত হাজার হাজার ট্রেনের মধ্যে একটা ট্রেনের একটা জায়গায় লোকটির সীট সংরক্ষিত হয়ে আছে, ঐ সীটে সে ছাড়া কেউ বসতে পারবে না। এত লক্ষ লোকের মধ্যে একটা ছোট্ট চিরকূট নিয়ে সে টিকিট কালেক্টরকে দেখাতে লোকটিকে করমণ্ডলের এসি টু টিয়ার কোচে বত্রিশ নং সীটে নিয়ে বসিয়ে দিল। কর্মফল ঠিক এই এ২/৩২র মত। কোটি কোটি লোকের মধ্যে আমার কর্মফল

ঠিক আমাকে খুঁজে নেবে, ওখানে আর কেউ বসতে যাবে না। আমি কোন্ দিন কাকে গালাগাল দিয়েছি, কোন গরুকে ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়েছি, কারুর টাকা মেরে দিয়েছি ভাবছি আমাকে কেউ ধরতে পারবে না, কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু না, ঐ এ২/৩২র মত ঠিক আমাকে খুঁজে নিয়ে বসিয়ে দেবে। তোমার কর্ম থেকে কোন দিন তুমি পালাতে পারবে না।

মানুষ যখন কাজ করে তখন তার কিছু ফল সে প্রারব্ধ বশতঃ পেয়ে থাকে, আগে যে কর্মগুলো জমে আছে সেখানে ভালো কিছু করা ছিল বলে পেয়ে গেল, এটাকে বলছেন প্রারব্ধ বশতঃ। আবার কিছু ফল হঠাৎ করে পেয়ে যায়, এটা পাওয়ার কথা নয় কিন্তু হঠাৎ করে পেয়ে গেলাম। আমি চাষবাস করেছি, হঠাৎ খুব বৃষ্টি হয়ে ফসল নষ্ট হয়ে গেল, এই বৃষ্টিটা তো শুধু আমার জন্যই হয়নি আরও দশজনের পক্ষেই ক্ষতি হয়ে গেল। আর কিছু আসে নিজের উদ্যোগ নেওয়া থেকে। তিন ভাবে মানুষ কর্মের ফল পায় – *কিঞ্চিদ্দৈবাদ্ধঠাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব স্বকর্মভিঃ। প্রাপ্নুবন্তি নরা রাজন্! মা তেহস্ত্বন্যা বিচারণা।* ।৩/১৫৪/৮৬। প্রারব্ধে পায়, হঠাৎ পায় আর চেষ্টাতে পায়। সব মিলিয়ে ফল যেটা হয় সেটাও তিন রকমের হয়। *ইহ বৈকস্য নামুত্র অমুত্রৈকস্য নো ইহ। ইহ চামুত্র বৈকস্য নামুত্রৈকস্য নো ইহ।* ।৩/১৫৪/৮৮। কোন মানুষের ইহলোকেই পরম মঙ্গল হয়, কিন্তু পরলোকে কিছুই হয় না। আবার কোন মানুষের পরলোকেই পরম মঙ্গল হয় কিন্তু এই লোকে তাদের কিছুই হয় না। আর কোন মানুষের ইহলোক আর পরলোক এই দুই লোকেই সমান পরম মঙ্গল লাভ হয়। *ধনাং যেষাং বিপুলানি সান্তি নিত্যং রমন্তে সুবিভূষিতাঙ্গাঃ। তেষাময়ং শত্রুবরঘ্ন! লোকো নাসৌ সদা দেহসুখে রতানাম্।* ।৩/১৫৪/৮৯। যাদের কাছে প্রচুর ধন সম্পদ আছে এদের বেশীর ভাগ নিজের শরীরকে আমোদ আহ্লাদের ভোগের মধ্যে ঢেলে দেন। এই ধরণের মানুষ যাদের প্রচুর ধন সম্পদ আছে আর প্রচণ্ড আসক্তি আছে এদের যত রকমের পূণ্য সঞ্চিত হয়ে আছে সবই এই লোকেই ক্ষয় হয়ে যায়। *যে যোগযুক্তাস্তপসি প্রসক্তাঃ স্বাধ্যায়শীলা জবয়ন্তি দেহান্। জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তাস্তেষামসৌ নাহমবিঘ্ন।*।৩/১৫৪/৯০। যারা এই লোকে সমস্ত রকমের প্রাণিহিংসা থেকে নিবৃত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে যোগ সাধন করেন, তপস্যা করেন, স্বাধ্যায় করেন তারা এই জগতে কোন সুখ পায়না। একজন লোক বলল আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। সত্যিকারের সে সন্ন্যাসী হয়ে গেল, এখন সে যোগ সাধনা করছে, তপস্যা করছে, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছে অন্য দিকে ইন্দ্রিয়সুখ বলে তার কিছু নেই। বিয়েথা করেনি, ভালো মন্দ খাওয়া-দাওয়া, সাজপোশাক কিছুই নেই। মৃত্যুর পরই এরা সব সুখ পান, কারণ এই যে তপস্যা করছে, ইন্দ্রিয়সুখকে ত্যাগ করেছে, এই কর্মের ফলতো কোথাও যাবে না, মৃত্যুর পরই এই কর্মের ফল সুখ হয়ে ফিরে আসবে। *যে ধর্মমেব প্রথমং চরন্তি ধর্মেণ লব্ধা চ ধনানি কালে। দারানবাপ্যা ক্রতুভির্যজন্তে তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ।* ।৩/১৫৪/৯১। আর যারা কর্তব্য বোধে ধর্ম পালন করেন, আমাকে এই ধর্ম পালন করতে হবে। ঐ ধর্ম মতে যখন যজ্ঞ যাগ করেন, বিবাহ করেন, ধন উপার্জন করেন, ঈশ্বর ভক্তি করেন, তাঁরা ইহলোকের সুখ আর পরলোকের সুখ দুটোই পান। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষর্থের মধ্যে যারা শুধু অর্থ আর কামকেই চাইছে, আমি টাকা উপার্জন করব আর ভোগ করব, তারা জগৎ সুখ এই লোকেই পাবে। যারা শুধু ধর্ম করছে, ঈশ্বরের পূজো করছে, যে কর্মই করছে সবই ধর্ম মতে করছে, আর ঐ ধর্ম মত যে অর্থ পাচ্ছে এবং তাই দিয়ে ধর্মগত ভোগ করছে, ধর্মগত ভোগ মানে বিয়েথা করেছেন, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করছেন ইত্যাদি, তাঁরা ঐ ধর্মগত সীমিত অর্থের দ্বারা এই জগতের ভোগ করে আর ঐ ধর্ম করে যাচ্ছে বলে সেটা তাঁর পরলোকের জন্য সঞ্চিত হয়ে থাকল। আর যারা সন্ন্যাসী তারাতো ইহলোককে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে, সেইজন্য ইহলোকের সুখ তাদের জন্য নেই, এনারা মোক্ষ পথের দিকে চলে যান। সন্ন্যাসী ধর্মও পালন করেন না, তাঁদের ইহলোক বা পরলোক বলে কিছু নেই, একমাত্র লক্ষ্য হল মোক্ষ। এদের বাইরে আরেক ধরণের লোক আছে যাদের বলা হচ্ছে মূঢ়, এরা বিদ্যার জন্য চেষ্টা করে না, তপস্যার জন্য চেষ্টা করেনা, দানেরও চেষ্টা করে না আর ধর্মপূর্বক সন্তান উৎপত্তিরও চেষ্টা করে না। বেশীর ভাগ লোকই যা কিছু করে অধর্ম মতে করে, এরা ইহলোকেও সুখ পায়না আর পরলোকেও সুখ পায়না। মূল কথা হল তুমি যদি শুধু অর্থ কামকেই উদ্দেশ্য ঠিক করে থাক তাহলে এই লোকেই সুখ পাবে। মোক্ষ যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তুমি এখানে সুখ পাবে না কিন্তু পরে সুখ পাবে। ধর্ম যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, ধর্মমার্গে যদি অর্থ উপার্জন আর কাম ভোগ কর তাহলে তুমি এখানেও সুখ পাবে পরেও সুখ পাবে। আর অধর্ম পূর্বক যদি তুমি জীবন যাপন কর তাহলে তোমার দুটোই যাবে। এটাই হল মহাভারতের বক্তব্য।

দীর্ঘজীবি বক মুনির কাহিনী

এরপর আরেক ঋষির কাহিনী আসছে। একজন ঋষি ছিলেন তিনি ইন্দ্রের খুব বন্ধু ছিলেন, তাঁর নাম ছিল বক মুনি। তিনি এমন তপস্যা করেছিলেন যে মৃত্যুও তাঁর কাছে আসতে পারত না। সেই কারণে তিনি বিরাট দীর্ঘজীবি হয়ে বহু

দিন বেঁচে ছিলেন। দীর্ঘজীবিকে নিয়ে জর্জ বার্ণাড'শয়ের একটা গল্প আছে। একজন লোক সুদীর্ঘজীবি হয়ে গেছে। আমাদের এক বছর যতটা সময়ে হচ্ছে তার সেটা দশ বছর লাগছে। আমার যদি একশ বছর আয়ু হয় ওর পরমায়ু এক হাজার বছর হয়ে যাবে। এখন সেই লোকটি বিয়ে করেছে, এবারে তার বয়স যখন তিরিশ হয়েছে তার বউ তিরিশ থেকে চল্লিশ হয়ে গেছে। লোকটির বয়স একত্রিশ থেকে বত্রিশ হয়েছে তার বউয়ের বয়স পঞ্চাশ হয়ে গেছে। তারপর বউ বুড়ি হয়ে মরে গেল অথচ লোকটি এখনও পয়ত্রিশ বছরই পেরোতে পারল না। লোকটির বিরাট সমস্যা হয়ে গেছে, লোকেদের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে। কদিন পর সে ঐ শহর থেকে পালিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে আবার একটা নতুন জীবন যাপন করতে শুরু করে। এইভাবে গল্পটাতে অনেক মজার ব্যাপার নিয়ে আসা হয়েছে। যাই হোক, ইন্দ্র একবার বক মুনিকে জিজ্ঞেস করছেন 'আপনার বয়স প্রায় এক লক্ষ বছর হয়ে গেছে, এত দিন বেঁচে থেকে আপনার কি রকম মনে হচ্ছে, দীর্ঘায়ু হওয়াটা আপনার কি রকম লাগছে'? কঠোপনিষদে নচিকেতা ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন করছেন '*অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমতে*' অনেক দিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে কার হয়? আচার্য শঙ্কর নিজেই উত্তর দিচ্ছেন অবিবেকীর। এটা দেখা যায় যে, মানুষ যত বুড়ো হতে থাকে ততই তার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা জেগে ওঠে। কিন্তু কুড়ি একুশ বছরের যুবকরা মরা বাঁচাকে কোন গ্রাহ্যই করে না। সৈন্য বাহিনীতে সেইজন্য সব অল্প বয়সীদেরকেই নেওয়া হয়, এই বয়সে যে কোন জিনিষই করে দিতে পারে। ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বক মুনি বলছেন – *অপ্রিয়ৈঃ সহ সংবাসঃ প্রিয়ৈশ্চাপি বিনা ভবঃ। অসদ্ভিঃ সম্প্রয়োগশ্চ তদ্দুঃখং চিরজীবিনাম্।।*৩/১৬৩/১৭। 'অনেক দিন বেঁচে থাকাটা খুবই কষ্টের, কত অপ্রিয় জিনিষকে সহ্য করতে হয়, কত দুষ্ট মানুষের সঙ্গ করতে হয়। শুধু কি তাই! নিজের চোখের সামনে ভাই, বন্ধু, সন্তান প্রিয়জনদের মরে যেতে দেখতে হয়'। *অকুলানাং কুলে ভাবং কুলীনীনাং কুলক্ষয়ম্। সংযোগং বিপ্রয়োগঞ্চ পশ্যন্তি চিরজীবিনঃ।।*৩/১৬৩/২০। 'যাঁরা চিরজীবি তাঁরা দেখেন যারা অকুলীন ছিল তাদের কুলের উন্নতি হয়ে যাচ্ছে আর যারা কুলীন তাদের পতন হয়ে যাচ্ছে। হে শতক্রতু ইন্দ্র! আপনি তো নিজেও কত কি দেখছনে কত কিছু উঠছে নামছে। চোখের সামনে যখন এগুলো দেখতে হয় তখন মনে খুব কষ্ট হয়। আবার যারা খুব জ্ঞানী পুরুষ তাদের কত রকমের কষ্ট করতে হচ্ছে কিন্তু অন্য দিকে যারা মুর্খ, যাদের কিছুই নেই তারা কত কিছু ভোগ করছে। এত কিছু দেখতে হয় যে আর সহ্য হয় না। অনেক দিন বেঁচে থাকার এইটাই সব থেকে কষ্টের'। কবীর দোঁহা আছে 'মুরখ্ মুরখ্ কেঁয়ো রাজা পণ্ডিত কেঁয়ো ভিখারি', কর্মের গতি আজব মুর্খ গুলো রাজা হচ্ছে আর পণ্ডিত গুলো ভিখারি হচ্ছে। এটা গেল চিরজীবি মানুষের কষ্টের দিক কিন্তু সুখ কি পায়? বক মুনি বলছেন 'এবারে তোমাকে সত্যি কথাটা বলি। নিজের শক্তিতে আর নিজের চেষ্টাতে যে বাড়িতে দুটি শাক-ভাত খায়, কারুর সাহায্য নেয় না, কারুর মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয় না এরাই একমাত্র সুখী। নিজের ঘরে ফল-মূল শাক পাতা খেয়ে থাকা অনেক ভালো আর অপরের বাড়িতে তিরস্কার পেয়ে পেয়ে ভালো ভালো খাবারে কোন সুখ নেই। যে অপরের বাড়িতে খেয়ে বেড়াতে চায় সে কুকুরের মত রক্ত চেটে বেড়াচ্ছে। এই ধরণের কৃপণ মানুষের জীবনকে ধিক্কার। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করার পর যেটা অবশিষ্ট পড়ে থাকে সেটাই শুদ্ধ আর সেই শুদ্ধ খাবার খাওয়াতেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়'। অতিথিদের সেবা করিয়ে, প্রাণিদের কিছু দেওয়ার পর, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অন্ন জল নিবেদন করার পর, আর দেবতা বা ভগবানের পূজো নিবেদন করার পর যেটা থাকে সেটাই হল অমৃত। গীতাতেও এই একই কথা বলা হচ্ছে – *যজ্ঞশিষ্টামৃতোভুজো*, যজ্ঞের অবশিষ্ঠ অন্নই অমৃত। এইসব কথা বলে বক মুনি বলছেন এটাই হল ঠিক ঠিক সুখ বাকি সুখ গুলি সুখের মধ্যে পড়ে না।

পাণ্ডবদের সাথে অনেক ব্রাহ্মণরাও আসছেন, অনেকে অনেক রকম কথা বলছেন, যুধিষ্ঠিরও অনেক কিছু জেনে নিচ্ছেন। এখনও মার্কেণ্ডয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে অনেক কাহিনী আর শাস্ত্রের কথা বলে যাচ্ছেন। এর মধ্যে একটা জায়গায় আলোচনা চলছে নিন্দিত দান, নিন্দিত জন্ম, দানপাত্র, শ্রাদ্ধে কি দিতে হয় আর কি দিতে নেই এইসব নিয়ে। মার্কেণ্ডয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলে যাচ্ছেন – *বৃথা জন্মানি চত্বারি বৃথা দানানি ষোড়শ। বৃথা জন্ম হ্যপুত্রস্য যে চ ধর্মবহিষ্কৃতাঃ।।*৩/১৭০/৪। চার রকমের জন্ম বৃথা, কত রকমের দান বৃথা ইত্যাদি বলে বলছেন যে পুত্রহীন, যে ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত। *পরপাকঞ্চ যেহশ্নন্তএমআত্মার্থঞ্চ পচেত্তু যঃ। পর্য্যশ্নন্তি বৃথা যে চ তদসত্যং প্রকীর্ত্যতে।।*৩/১৭০/৫। যে অপরের বাড়িতে খেয়ে বেড়ায় আর যে শুধু নিজের জন্য খাওয়ার বানায় কারুকে দেয় না এদের অন্ন হচ্ছে অসৎ অন্ন, এদের অন্ন কখনই খেতে নেই। কাদেরকে দান করতে নিষেধ করছেন? *গুরৌ চানৃতিকে পাপা কৃতঘ্নে গ্রামযাজকে। বেদবিক্রয়িণে দত্তং তথা বৃষলপাচকে।। ব্রহ্ম বন্ধুষু যদ্দত্তং যদ্দত্তং বৃষলীপতৌ। স্ত্রীজনেষু চ যদ্দত্তং ব্যালগ্রাহে তথৈব চ।। পরিচারকেষু যদ্দত্তং বৃথা দানানি ষোড়শ। তমোবৃতস্তু যো দ্যাদ্ভয়াৎ*

ক্রোধাত্তথৈব চ।।৩/১৭০/৭-৯। যদি বাবা-মাকে দান করা হয় সেই দান বৃথা কারণ বাবা-মাকে কখনই দান করা হয় না, এটা আমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ছে বাবা-মাকে দেখতে হবে। সেই রকম মিথ্যাবাদীকে যদি দান করা হয়, কৃতঘ্নকে যদি অর্থ দান করা হয়, পাপীকে যদি দান করা হয়, গ্রাম্য পুরোহিতকে যদি দান করা হয় আর যারা বেদ বিক্রী করে মানে অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা দিচ্ছে, যে শূদ্রকে দিয়ে যজ্ঞ করায় তাকে যদি দান করা হয়, তার মানে মহাভারতের সময়ে কেউ কেউ নিচু জাতির লোকদের দিয়ে যজ্ঞ করিয়ে নিত, নিজের বাড়ির পরিচারকদের যদি দান করা হয় তাহলে সেই দান বৃথা। এর মধ্যে মনে রাখবে যে ব্রাহ্মণ জপ, মন্ত্র, হোম, স্বাধ্যায় মানে বেদ অধ্যয়ণ করে সেই ব্রাহ্মণ নিজেও মৃত্যুকে অতিক্রম করে যায় আর অপরকেও পার করায়, এই ব্রাহ্মণরাই ধন্য। অতিথি সেবাকে মহাভারত খুব জোর দিয়েছে, বলছেন যারা অতিথিদের অন্ন জল দান করে পরিতৃপ্ত করেন তাতে অগ্নি দেব যজ্ঞ করার থেকেও বেশী খুশি হন। শুধু তাই নয় মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – *তেষামেবং শ্রমার্ত্তানাং যো হ্যন্নং কথয়েদ্বুধঃ। অন্নদাতৃসমঃ সোঽপি কীর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ। তস্মাত্ত্বং সর্বদানানি বিত্বান্নং সংপ্রযচ্ছ হ*।।৩/১৭০/৪৩। কোন পথশ্রান্ত ক্ষুধার্ত পথিক যদি জিজ্ঞেস করে যে এখানে কি কেউ অন্নদাতা আছেন, তখন যে মানুষ সেই অন্নদাতার সন্ধান দেন তখন সেই মানুষও অন্নদাতার সমান হয়ে যান এই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তাই মার্কেণ্ডয় ঋষি বলছেন ‘যুধিষ্ঠির! তুমি সব দান ছেড়ে শুধু অন্ন দান করে যাও, অন্ন দানের থেকে বড় পূণ্য আর কিছুতে হয় না’। স্বামীজীও চেয়েছিলেন বেলুড় মঠে প্রচুর অন্ন দান হবে, ভাতের ফেনায় গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে।

এরপর যুধিষ্ঠির একটা প্রশ্ন করছেন মনুষ্যলোক থেকে যমলোক কত দূরে। এনারা এগুলো কি ভাবে হিসেব করে বলছেন আমাদের জানা নেই। মার্কেণ্ডয় বলছেন যমলোক মনুষ্যলোক থেকে ছিয়াশি হাজার যোজন দূরে। এই পথটি জলশূন্য আর আকাশমার্গ। এই পথটি অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম, এই পথের কোথাও বৃক্ষাদি নেই, ছায়া নেই বিশ্রাম নেওয়ার মত কোন জায়গা পাওয়া যায় না আর কোথাও জল পাওয়া যাবে না। যারা মৃত্যুর আগে ঘোড়া দান করেছিল তারা মৃত্যুর পর পথে ঐ ঘোড়া পেয়ে যায় আর সেই ঘোড়াই তাকে ঐ পথ দিয়ে নিয়ে যায়। যারা অন্ন দান করেছে, বস্ত্র দান করেছে তারাও মৃত্যুর পর যাওয়ার সময় ঐ পথে ঐ অন্ন বস্ত্রগুলো পেয়ে যায়। অনেকের ধারণা এগুলো হল ব্রাহ্মণরা সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে যাতে এই জিনিষগুলো আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। মার্কেণ্ডয় মুনি বলছেন, যারা গোদান করে তার ঐ পথ দিয়ে খুব সুখে নিশ্চিন্তে যেতে পারে, তাদের কোন ধরণের কোন সমস্যা হয় না। আর যারা এক মাস যাবৎ উপোসাদি করে তাদের জন্য হংসযুক্ত বিমান আসে ঐ পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই কথা গুলো এখানে এইজন্যই উল্লেখ করা হল যে মহাভারত যা কিছু ধারণা আমাদের দিয়ে গেছে সেই ধারণাই পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মে ঢুকে গেছে। এই যে বিচার গুলো বলা হল এগুলো আমরা এখনও বিশ্বাস করি আর এই ভাব নিয়েই দানাদি করছি। এরপর যুধিষ্ঠির শৌচের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন। মার্কেণ্ডয় বলছেন শৌচ তিন রকমের – *বাক্শৌচং কর্মশৌচঞ্চ যচ্চ শৌচং জলাত্মকম্। ত্রিভীঃ শৌচৈরুপেতো যঃ স স্বররগী নাত্র সংশয়ঃ*।।৩/১৭০/৮০। বাকশৌচ অর্থাৎ বাণীর শুচিতা, কর্মশৌচ, মানে ক্রিয়ার মাধ্যমে শুচিতা আর জলশৌচ, মানে শরীর শুদ্ধি। তিন রকমের শুদ্ধি বাকশুদ্ধি, কর্মশুদ্ধি আর শরীরশুদ্ধির দ্বারা মানুষ স্বর্গলাভ করে। মনশুদ্ধির কথা এখানে বলা হচ্ছে না। যে ব্রাহ্মণ সকাল সন্ধ্যে খুব করে গায়ত্রী জপ করে সেই ব্রাহ্মণ পুরোপুরি শুদ্ধ হয়ে যায়। যার দান গ্রহণ করা হয় তার পাপও তাকে গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সকাল সন্ধ্যে জপ করে সেই ব্রাহ্মণকে যদি পুরো পৃথিবীও দান করে দেওয়া হয় তাতেও তার কোন পাপ লাগবে না। *দুর্বেদা বা সুবেদা বা প্রাকৃত্যাঃ সংস্কৃতাস্তথা। ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মাচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ*।।৩/১৭০//৮৬। ব্রাহ্মণ যদি বেদ ভালো করে অধ্যয়ণ না করে থাকে আর আদপেই যদি বেদ না পড়ে থাকে, যদি উত্তম সংস্কার যুক্ত হয় তাও যদি তার মধ্যে সংস্কার না থাকে তাও ব্রাহ্মণকে অপমান করতে নেই, এরা হল ছাই চাপা আগুন। এর আগে বলা হয়েছিল এই ধরণের ব্রাহ্মণকে শূদ্রের মত মনে করতে কিন্তু এখানে এসে বলছেন তারা ছাই চাপা আগুন। এখানেই বিপরীত মত এসে গেল। এই বৈপরিত্যের জন্যই অনেকে বলেন মহাভারত একজনের রচিত নয়। আর দ্বিতীয় যেটা হতে পারে, মানুষের মনের ভাবের পরিবর্তন হয়, আর মহাভারত তো একদিনে লেখা হয়নি, ব্যাসদেবের মনে এক সময় এই ভাব ছিল পরে সেই ভাবটা পাল্টে যেতে পারে।

ধর্মব্যাধ ও কৌশিক ব্রাহ্মণ সংবাদ (ব্যাধগীতা)

এরপর আসছে ধর্মব্যাধের উপাখ্যান। মূলতঃ কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণকে নিয়েই এই উপাখ্যান। এই কাহিনীটা তিনটে ভাগে রয়েছে। প্রথম ভাগে কৌশিক ব্রাহ্মণ তপস্যা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে এক গৃহবধূর কাছে তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ

এবং তৃতীয় ভাগে এক ব্যাধের কাছে তাঁর জ্ঞান লাভ। কৌশিক একটা বৃক্ষের নীচে বসে অনেক দিন ধরে তপস্যা করে যাচ্ছিলেন। একবার বৃক্ষের ডাল থেকে একটা বক বিষ্ঠা ত্যাগ করতেই ব্রাহ্মণের গায়ের উপর পড়েছে। ব্রাহ্মণের গায়ে পড়তেই তিনি রেগে বকের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই বকটি ভস্ম হয়ে যায়। বকটি ভস্ম হয়ে যেতে একদিকে ব্রাহ্মণের একটু খারাপ লাগল আবার অন্য দিকে তপস্যাতে যে আমি একটা ক্ষমতা পেয়েছি সেটাতে তার অহঙ্কারও হয়েছে। এরপর একদিন সে এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণকে দেখে বাড়ির গৃহিণী বললেন 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি'। ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দেখছেন মহিলা ভিক্ষা নিয়ে আসছেন না। ভেতরে তো অহঙ্কার আছে, ব্রাহ্মণ এবার রাগতে শুরু করেছে, মনে মনে ভাবছে এই মহিলা নিজেকে কি মনে করে, আমাকে এতক্ষণ ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা! জানেনা আমি কে! ব্রাহ্মণ যতক্ষণে এই কথা ভাবছেন ততক্ষণে এই মহিলা ভিক্ষা দিতে বেরিয়ে এসেছেন। বেরিয়ে আসতেই ব্রাহ্মণ রেগেমেগে বলছেন 'আসছি বলে এতক্ষণ আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে তোমার সাহস কি করে হল'! গৃহিণী তখন বলছেন 'আপনি আমার উপর এই ভাবে রাগ করবেন না, আর আমি কোন বক নই যে আপনার রাগে আমি ভস্ম হয়ে যাব'। মহিলার কথা শুনেই ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হয়ে গেছে, বকের ভস্ম হওয়ার ব্যাপারটা জানল কি করে! তখন গৃহিণী বলছেন 'দেখুন, আমি এত কিছু তত্ত্ব বা জ্ঞানের কথা জানিনা বুঝিও না, আমি শুধু আমার স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে যাই, এর বাইরে আমি আর কিছু জানিনা। আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা, তপস্যা করে করে আপনি যে শক্তি পেয়েছেন শুধু স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ির সেবার দ্বারা পাতিব্রতা ধর্ম পালন করে সেই শক্তি আমার মধ্যে এসে গেছে, সেটাতো আপনি দেখতেই পেলেন। তবে আপনাকে ভালোর জন্যই বলছি, আপনি তপস্যা করেছেন ঠিকই কিন্তু ধর্মের যথার্থ জ্ঞান আপনার এখনও লাভ হয়নি। আপনি যদি যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে চান তাহলে আপনি মিথিলা গমন করুন আর সেখানে ধর্মব্যাধের সঙ্গে ধর্মের আলোচনা করুন। ধর্মব্যাধ হলেন একজন মাংস বিক্রেতা, তিনি মাংস বিক্রী করেন বটে কিন্তু সে ধর্মের জ্ঞাতা বলে তাঁর নাম ধর্মব্যাধ'। এত কথা শুনে তো ব্রাহ্মণের মাথা গেছে ঘুরে। আমি একজন ব্রাহ্মণ, তপস্যা করেছি, শক্তিও অর্জন করেছি আর আমাকে কিনা একজন ব্যাধের কাছে গিয়ে শিক্ষা নিতে বলছে!

যাই হোক, ব্রাহ্মণ মিথিলায় গেছেন। খোঁজ করে করে ধর্মব্যাধের সন্ধান নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন। গিয়ে দেখেন ব্যাধ মাংস বিক্রী করছে। মাংস দেখেতো ব্রাহ্মণের শরীরে ঘেন্না হতে শুরু হয়েছে। ব্রাহ্মণকে দেখে ব্যাধ বলছেন 'ও আপনি সেই ব্রাহ্মণ, আপনাকে সেই মহিলা এখানে পাঠিয়েছেন'। ব্যাধের মনের এমন শক্তি যে তাতেই বুঝে গেছেন যে সে কোথা থেকে এসেছেন আর কে তাকে পাঠিয়েছে। ব্রাহ্মণও খুব অবাক হয়ে গেছেন। এরপর ব্যাধের সাথে ব্রাহ্মণের অনেক কথাবার্তা হয়েছে। ব্যাধের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছেন এই ব্যাধ কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। অসাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁর মধ্যে। ভেতরে ভেতরে ব্রাহ্মণের মনের মধ্যে অনেক চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে। ব্যাধকে বলছেন 'আপনার মত একজন জ্ঞানীকে এইভাবে মাংস বিক্রী করতে দেখে আমার ভেতরে খুব সন্তাপ হচ্ছে'। ব্যাধ তখন বলছেন *কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং পরম্। বর্তমানস্য মে ধর্মে স্বে মন্যুং মা কৃথা দ্বিজ।।৩/২০৭/২০।* আমার পিতা, আমার ঠাকুর্দারা এই কাজই করে এসেছেন, আমার বংশের এইটাই পেশা। আমি তাই আমার বংশের কাজই করে আসছি এটাই আমার ধর্ম, আমি আমার ধর্ম পালন করে যাচ্ছি। অন্য কোন কিছু আমি আর বিচার করার প্রয়োজন মনে করিনি। বিধাতার বিধান অনুসারে আমার এই বংশে জন্ম হয়েছে, আমাকে এই বংশের পেশাগত কর্ম আমাকে করে যেতে হবে, তাই এই ব্যাপারে আমি বেশী চিন্তা করিনা। আর আমি আমার মা-বাবার সেবা করে যাচ্ছি'। এখানে মনে রাখতে হবে বিধাতা ভগবানকে বলা হচ্ছে না। বিধাতা হলেন যিনি কর্মফল প্রদান করেন। আমি গত জন্মে যা যা কর্ম করেছি সেই কর্ম অনুসারে আমি যে ফল পাচ্ছি বিধাতা আছেন বলে আমরা কর্মের ফল আর কারুর কাছে না গিয়ে আমার কাছেই আসছে। কর্মবাদের ধারণা যখন প্রথম এসেছিল তখন বিধাতাকে কখন ভগবানের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছিল, কখন ধর্মরাজকে বিধাতা বলা হত কিন্তু পরের দিকে বিধাতাকে একটা স্বতন্ত্র সত্তা রূপে ভাবা হতে থাকে। কর্মের একটা ম্যানেজমেন্ট আছে, এটাকেই বলা হচ্ছে বিধাতা। ব্যাধ বলছেন এই বিধাতা আমাকে এই বংশে এই বাড়িতে জন্ম দিয়েছেন, আমি এই নিয়ে আর চিন্তা করতে চাইনা আর আমি আমার মা-বাবার সেবা করে যাচ্ছি। আজকের দিনের সমাজ ব্যবস্থায় এসে বাপ-ঠাকুর্দার কাজ সবাই আর করছে না, যে যেমন কাজ জোটাচ্ছে সেই কাজই করে যাচ্ছে। আজকের যুগের ছেলে-মেয়েরা কম্প্যুটার নিয়ে যে কাজ করছে তাদের বাপ-ঠাকুর্দারাতো কম্প্যুটারই চোখে কোন দিন দেখেনি। সব কিছুই এখন নতুন করে গড়ে উঠছে।

ব্যাধ বলছেন – আমি নিজে কখনই পশু বধ করে তার মাংস বিক্রী করিনা। যারা শুয়োর মহিষাদি বধ করে নিয়ে আসে আমি তাদের থেকে মাংসটা কিনে নিয়ে বিক্রী করি। এখানে মহিষের মাংসের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের সমাজে তখন গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু মোষের মাংসের প্রচলন ছিল, অবশ্য নীচু জাতির মধ্যেই খাওয়া হত। শুয়োরের মাংসও খাওয়া হত, হিন্দুরা গরু ছাড়া আর সব মাংসই মোটামুটি খেত। ব্যাধ আবার বলছেন যে, আমি নিজে কিন্তু পশু বধ করিনা আর মাংসও খাই না, আমি শুধু বিক্রী করি। হিমালয়ের অনেক জায়গায় পাহাড়ী সব্জী বিক্রেতারা পটল বিক্রী করে, কেউ পটল কিনলে ওরা জিজ্ঞেস করে 'আপলোক ইয়ে সব্জী খাতে ক্যাইসে'। এরা পটল কি জিনিষ জানেও না আর খায়ও না কিন্তু বিক্রী করে যাচ্ছে। আফগানিস্থানে জিরের চাষ হয়। ওদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় এগুলো কি জিনিষ তখন আফগানিস্থানের লোকেরা বলে আমরা জানিনা কি জিনিষ, আমরা চাষ করি আর এগুলো ভারতে চলে যায়, এগুলো দিয়ে কি করে আমরা জানিনা। ব্যাধেরও ঠিক এই রকম ব্যাপার বিক্রী করছে কিন্তু খায় না।

ব্যাধ বলছেন – আমি কোন ভোগে লিপ্ত হই না। দিনে উপোস করি আর রাত্রে খাই। এখানে আবার ঋষিদের ক্ষেত্রে উল্টো হয়ে যায়। ঋষিরা দিনে খান কিন্তু রাত্রে খান না। ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলছেন *অশীলশ্চাপি পুরুষো ভূত্বা ভবতি শীলবান্। প্রাণিহিংসারতশ্চাপি ভবতে ধার্মিকঃ পুনঃ।।*৩/২০৭৩/৩৪। যারা শীল রহিত তারাও কোন না কোন দিন শীল যুক্ত হয়ে যায়। যারা প্রাণি হিংসা করে যাচ্ছে তারাও কোন দিন অহিংসায় চলে যেতে পারে। ব্যাধ পর পর অনেক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন – রাজা যখন রাজকার্যে নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না তখন বর্ণসঙ্কর হতে শুরু হয়। বর্ণসঙ্কর বলতে কি বলতে চাইছেন সেটা পরিষ্কার করে বলছেন না। তবে বর্ণসঙ্কর বলতে সাধারণত তখনকার দিনে বোঝাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণের মধ্যে যখন অসবর্ণ বিবাহাদি হয়ে যে সন্তান উৎপাদন হত তখনই তাকে বর্ণসঙ্কর বলা হত। ব্যাধ বর্ণসঙ্করের লক্ষণ বলছেন *ভেরুণ্ডা বামনাঃ কুব্জাঃ স্থূলশীর্ষাস্তথৈব চ। ক্লীবাশ্চান্ধাশ্চ বধিরা জায়ন্তেহত্যুচ্চলোচনাঃ।।*৩/২০৭/৩৬। মানুষের চেহারার মধ্যে যদি ভয়ঙ্করতার ছাপ এসে যায়, যদি খুব বেঁটে হয়ে থাকে, কুঁজো হয়ে থাকে, খুব মোটা যদি হয়ে যায়, মাথাটা চেহারার তুলনায় অত্যাধিক বড় থাকে আর যদি নপুংসক হয়, অন্ধ, বধির হয়ে যায় এগুলো হল বর্ণসঙ্করের লক্ষণ। এই ধরণের চেহারা দেখা গেলে বুঝতে হবে বর্ণ ও জাতির মধ্যে কোথাও কোন ভাবে পবিত্রতার হানি হয়েছে। জেনেটিক বিজ্ঞানে বলছে আমাদের প্রত্যেক মানুষের শরীরে যে জিন রয়েছে তার মধ্যে কিছু জিন খুব সক্রিয় থাকে আবার কিছু জিন নিষ্ক্রিয় থাকে। একজন সাদা আমেরিকান লোকের সাথে নিগ্রো মেয়ের বিয়ে হওয়ার পর দেখা গেল এদের চারটে সন্তানের গায়ের রঙ ফর্সা। ঐ চারটে ফর্সা সন্তান সাদা আমেরিকানদেরই বিয়ে করেছে। হঠাৎ দেখা গেল এদের কারুর সন্তানের গায়ের রঙ নিগ্রোদের মত কালো। সবাই অবাক হয়ে যাবে এদের বাবা ফর্সা মা ফর্সা হঠাৎ সন্তান কালো কি করে হয়ে গেল! জিনের ক্ষেত্রে এই জিনিষটাই দেখা যায় কয়েকটা প্রজন্ম বাদ দিয়ে একটা প্রজন্মে এসে জিনটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ধরণের জেনেটিক অনেক জটিলতা আছে। এখানে মহাভারতে অত কিছু না বলে বলছে শরীরের যে নানা ধরণের রোগ ত্রুটি দেখা দেয় এগুলোর পেছনে বর্ণসঙ্করই দায়ী। ভারতে যে কত রকমের প্রজাতি এসে মিশে গেছে আর এত মিলে মিশে গেছে যে এখন আর কাউকে দেখেই বলা যাবে না কার মধ্যে খাঁটি আর্য রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তাই ইদানিং যে এত রোগ এত বিকলাঙ্গ দেখা যাচ্ছে, এই কারণেই হচ্ছে।

ধর্মব্যাধ বলছেন *সাধুঃ সন্নতিমানেব সর্বত্র দ্বিজসত্তম। মূঢ়ানামবলিপ্তানামসারং ভাবিতং ভবেৎ। দর্শয়ত্যন্তরাত্মা তং দিবা রূপমিবাংশুমান্।।*৩/২০৭/৪৮। যাঁরা উত্তম পুরুষ, তাঁরা সব সময় বিনয়শীল হন, বিনয় যদি কারুর মধ্যে না থাকে তাহলে সে উত্তম পুরুষ নয়। বিনয়হীন পুরুষ যারা, অর্থাৎ যারা অহঙ্কারী পুরুষ তাদের প্রত্যেকটি কথা হল নিঃসার, তাদের কথার মধ্যে কোন সার থাকে না। সূর্য যেমন দিনের স্বরূপটাকে প্রকাশ করে দেয় ঠিক তেমনি মুর্খদের যে অন্তরাত্মা মুর্খদের যথার্থ স্বরূপটা উন্মোচন করিয়ে দেয়। তার মানে হল, যদি কেউ মুর্খ থেকে থাকে তাকে লোকে ঠিক বুঝে যাবে। বিদ্বান পুরুষ, যিনি ঠিক ঠিক ভালো মানুষ, সে যদি কোন কারণে কান্তিহীন হয় মানে ফর্সা যদি না হয় তাহলে সে জগতে বিখ্যাত হয়ে যায়। সেইজন্য বলে কখন কারুর নিন্দা করবে না আর নিজের প্রশংসা করবে না। যে কোন গুণবান পুরুষ অপরের নিন্দা আর নিজের প্রশংসা কখনই করেন না। কোন মানুষই পরনিন্দা আর আত্মপ্রশংসা এই দুটো ত্যাগ না করলে জীবনে বড় হতে পারেনা। জগতে যাঁরাই বড় হয়েছেন তাঁরাই পরনিন্দা আর আত্মপ্রশংসাকে ত্যাগ করেই বড় হয়েছেন। *বিকর্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্ বিপরিমুচ্চতে। ন তৎ কুর্যাং পুনরিতি দ্বিতীয়াৎ পরিমুচ্চতে।।* ৩/২০৭/৫১। কোন মানুষ পাপ কাজ করার পর ঠিক ঠিক হৃদয় থেকে পশ্চাৎতাপ করে বলে আমি খুবই অন্যায় করেছি ভবিষ্যতে কখনই আর এই অন্যায় কাজ করব না, তখনই সে সেই পাপ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে যায়। ঠাকুরও ঠিক

একই কথা বলছেন – মানুষ যদি কোন দোষ করার পর ভাবে এটা আমার ভুল হয়ে গেছে, তখন যদি ঠাকুরের সামনে বলে ঠাকুর এটা আমার ভুল হয়ে গেছে আর কখন এই কাজ করব না, তখনই সে সেই দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমরা যে কোন ভুল কাজে দু ভাবে দোষ করি। একটা আমি জানি এটা দোষ, হঠাৎ কোন পরিস্থিতিতে আমি হয়তো খুব রেগে গেলাম তখন রাগে আমি কোন ভুল কাজ করে বসলাম। এই ক্ষেত্রে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে এই ভুল কাজ থেকে মুক্তি হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু ভেতরে একটা গ্লানিবোধ থেকে যায়। তিন বছর আগে আমি হয়তো কারুর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলাম, যেটা মুহুর্তের মধ্যেই আমার ভুল মনে হয়েছিল। ওটাতে হয়তো আমার পাপ লাগবে না কিন্তু একটা গ্লানি থেকে যাবে। আরেকটা যেটা হয়, সমাজ একটা ঠিক করে দিয়েছে এই কাজ করবে না, এই কাজ করলে দোষ হবে। কিন্তু এই দোষ হওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে ধোঁয়াশা। এক সময় ঐ কাজটা করতে আমাকে যেন কেউ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আর আমিও ঐ কাজটাকে পুরোপুরি দোষ মনে করিনা, আবার এক সময় মনে করি কাজটা ভুল। কখন মনে করি এই কাজটা না করলে আমি পেরে উঠব না। এই ধরণের কাজে যে পাপ লাগছে সেটাতে খুবই সংশয় লেগে থাকে। যেমন একজন মদ খেতে ভালোবাসে আর সমাজ বলছে মদ খাওয়া ভালো নয়, সেও জানে মদ খাওয়া ভালো নয়। এখন একজন বন্ধু তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুব করে অনুরোধ করাতে সে মদ খেয়ে নিল। খাওয়ার সময় ভাবছে দেবতারাও তো সুরা পান করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনটা খুঁত খুঁত করছে। আবার অন্য দিকে নিজেকে দোষমুক্ত করার চেষ্টা করার জন্য যুক্তিও খুঁজছে সাথে সাথে খুঁতখুঁতানিটাও আছে। ছাড়তেও পারছে না আবার খেতেও পারছে না। এইসব ক্ষেত্রে খুব সমস্যা হয়ে যায়। কিন্তু রেগেমেগে গুরুজনকে অপমান করে দিয়ে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতেই বুঝতে পারছে যে আমি ভুল কাজ করে ফেলেছি। এই ধরণের ভুল কাজের স্বীকার করে যদি বলে দেয় এই কাজ আর করব না, তাহলে সে মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের ভুল কাজটাই মানুষকে শেষ করে দেয়। যেমন রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল, রাবণও জানে যে এই কাজটা আমি ঠিক করিনি তা সত্ত্বেও এই কাজের জন্য সে যুক্তি দেখাচ্ছে আমি রাজা, আমি যাকে খুশি তুলে নিয়ে আসতে পারি। রাবণকে অনেকেই বোঝাচ্ছে যে কাজটা ঠিক হয়নি কিন্তু রাবণ মানতে চাইছে না। এর আগেও রাবণ অনেক মেয়েকে তুলে নিয়ে এসেছিল সেই ক্ষেত্রে মেয়েগুলো রাবণের রূপ আর তেজে আকৃষ্ট হয়ে নিজে থেকেই রাজী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সীতার ক্ষেত্রে অন্য ব্যাপার হয়েছিল, সীতা রাজী ছিল না। এইগুলোই হয়ে যায় সমস্যার। প্রথম ধরণের ভুল কাজে কোন সমস্যা হয় না, ঐ কাজ থেকে খুব সহজেই বেরিয়ে আসা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের ভুল কাজ থেকে কিছুতেই বেরনো যায় না, আর এটাই মানুষকে শেষ করে দেয়।

পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ধর্মব্যাধ বলছেন *কর্মণা যেন তেনেহ পাপাদ্ দ্বিজবরোত্তম। এবং শ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্ ধর্মেষু প্রতিদৃশ্যতে।। পাপান্যবুদ্ধবেহ পুরা কৃতানি প্রাগ্ ধর্মশীলোহপি বিহন্তি পশ্চাৎ। ধর্মো রাজন্ নুদতে পুরুষাণাং যৎ কুর্বতে পাপমিহ প্রমাদাৎ।।*৩/২০৭/৫২-৫৩। যদি শাস্ত্র বিহিত কোন কর্ম নিষ্কাম ভাবে করা হয়, শাস্ত্র বিহিত কর্ম মানে, জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, স্বাধ্যায় ইত্যাদি, এই কর্মগুলি নিষ্কাম ভাবে করতে থাকলে সব পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। মনুস্মৃতিতে বলা আছে তুমি যদি এই পাপ করে তাহলে এই প্রায়শ্চিত্ত করলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে বলছে তুমি যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাও করতে পার তাহলে শুধু গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে যাও বা ইষ্টমন্ত্র জপ করলে তাতেই সব পাপ থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আসলে পাপ, মুক্তি, প্রায়শ্চিত্ত সবই মনের ব্যাপার। গুরুজনরা যেটা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, সমাজ যেটা নিষেধ করছে সেই কাজটা করে ফেললে মনটা খুঁত খুঁত করতে শুরু করে। মন যদি খুঁত খুঁত করতে থাকে তাহলে মনের শক্তিটা ক্ষয় হয়ে যায়। এই খুঁতখুঁতানিটাকে বন্ধ করার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হয়। এই কারণেই আগেকার দিনের ঋষিরা নানা রকমের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করে গেছেন। তারমধ্যে একটা হল, আমি এই পাপ কর্ম করে ফেলেছি তাই আমি ঠিক করলাম আমি এতদিন ধরে রোজ এত জপ করব, তখন সেটাতেও পাপ থেকে মুক্তি হয়ে যায়, তার জন্য আর যজ্ঞাদি আর তীর্থাদি করার দরকার পড়ে না। তবে মানুষ মনে করে যত কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি তাহলে আমি পাপের থেকে মুক্তি পেয়ে যাব।

ব্যাধ বলছেন *পাপং কৃত্বা হি মন্যেত নাহমস্মীতি পুরুষঃ। তং তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপুরুষঃ।।* ৩/২০৭/৫৪। তবে কি জান যে পাপকর্ম করে বলে আমি পাপ করিনি আমি পাপী নই, সে কিন্তু মারাত্মক ভুল করছে। সে জানেনা ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে বসে আছেন তিনি সব দেখছেন আর দেবতারা সব লক্ষ্য রাখছেন, সেইজন্য দোষ করে মেনে নিতে হয় আমি দোষ করেছি। বলছেন*পাপং চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে। মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাভ্রেণেব চন্দ্রমাঃ।।*৩/২০৭/৫৬। মানুষ যদি পাপ কর্ম করার পরও অপরের ভালোর জন্য, কল্যাণার্থে

কোন কাজ করে কিংবা জপ-ধ্যান করতে থাকে তাহলে সে মহা মেঘ থেকে মুক্ত চন্দ্রমার মত হয়ে যায়। চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণ সব সময় জ্বলজ্বল করছে, হঠাৎ মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে দিল। মানে আমি কিছু খারাপ কাজ করেছি, পাপ এসে ঢেকে দিল। এই পাপকে আমি সরাতে পারছি না কিন্তু অপরের জন্য ভালো কাজ করতে শুরু করলাম তখন ঐ পাপটা কেটে যায়। সব থেকে ভালো পাপ কাজ না করা, কিন্তু যদি করে ফেলে তাহলে কল্যাণকারী কাজ করতে হয়, করলে সত্যিকারের মুক্তি পেয়ে যায়, এটা শাস্ত্র বলছে। মানুষ কত কাজই তো করছে আর বেশীর ভাগ কাজই নিজের জন্য করে, অপরের জন্য কাজ না করলে মানুষ রাক্ষস হয়ে যায়। শাস্ত্র তাই অপরক সেবা করার কথা বলছে যাতে তুমি রাক্ষস না হয়ে যাও আর এতে তোমার পাপকৃত কর্ম থেকেও রেহাই পেয়ে যাবে।

*যজ্ঞো দানং তপো বেদাঃ সত্যং চ দ্বিজসত্তম। পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি শিষ্টাচারেষু সর্বদা।।*৩/২০৭/৬২। যাঁরা সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন তাঁদের মধ্যে সব সময় এই পাঁচটা লক্ষণ দেখা যায় – যজ্ঞ, দান, তপস্যা, স্বাধ্যায় আর সত্য ভাষণ। আমাদের সময়ে যজ্ঞ পাঁচ রকমে এসে দাঁড়িয়েছে, এই পাঁচটি যজ্ঞকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলা হয়। এর আগেও আমরা এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, পরেও আলোচনায় আসবে। প্রথম ঋষিযজ্ঞ, নিয়মিত শাস্ত্রাদি পাঠ করা। দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ, পূজো, জপ ইত্যাদি। তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ, খাওয়ার সময় পিতৃদের উদ্দেশ্যে সামান্য কিছ অন্ন জল নিবেদন করা। চতুর্থ নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ, অতিথিকে খাওয়ান, গরীব কাঙালীকে ভিক্ষা দেওয়া, সাধু সন্ন্যাসীকে দান করা আর পঞ্চম ভূতযজ্ঞ, পশুপাখি, জীবজন্তুদের নিয়মিত কিছু খাওয়ানো। এখন শহরে ভূতযজ্ঞ করা সম্ভব হয় না বলে অনেকে রোজ আট আনা করে রেখে দেন, সারা বছরে যেটা জমবে সেই অর্থটা কোন গোশালাতে গিয়ে দান করে দেন। ঠিক সেই রকম কিছু টাকা নির্দিষ্ট করে রাখা থাকে সেটা কোন মঠ মিশনে দিয়ে বলে দিল এই টাকাটা রিলিফের কাজে ব্যয় করবেন, এটা হয়ে গেল মনুষ্য যজ্ঞ। আমি রোজ কোথায় অতিথি খুঁজে বেড়াব। আর দান করার কথা যেটা এখানে বলা হচ্ছে সেই দানটা আলাদা এটা এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের সাথে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না। তপস্যা হল, রোজ যেটা করছি তার বাইরে, যেমন একাদশী বা অন্যান্য ব্রত করা। আর স্বাধ্যায় এবং সত্য ভাষণ, এই পাঁচটি জিনিষ সব সময় সৎ বা শ্রেষ্ঠ লোকের মধ্যে দেখা যায়। যদিও ঋষিরা বিভিন্ন ধরণের হন, সৎ পুরুষও বিভিন্ন রকমের হন কিন্তু এই পাঁচটি জিনিষ সব সময়ই এঁদের মধ্যে দেখা যাবে। শ্রেষ্ঠ পুরুষ হতে গেলে, সাধু পুরুষ হতে গেলে, সে গৃহী না সন্ন্যাসী, নারী না পুরুষ তাতে কিছু আসে যায় না, এই পাঁচটা জিনিষ তার মধ্যে থাকবেই।

ব্যাধ ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। *বেদস্যোপিনষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষৎ দমঃ। দমস্যোপনিষৎ ত্যাগঃ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা।।*৩/২০৭/৬৭। বেদের সার হল সত্য, সত্যের সার হল ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয় সংযম না থাকলে সত্য কথা বলা যায় না, যারা প্রচুর বকবক করে বেড়ায়, সাথে সাথে অনেক কিছু করে বেড়াচ্ছে এদের মনটা খুব চঞ্চল থাকে, এরা সত্যকে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখতে পারে না, ইন্দ্রিয় সংযম না থাকলে কখনই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। আর ইন্দ্রিয় সংযমের সার হল ত্যাগ। ত্যাগ হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ। যাঁরা খুব উচ্চ পুরুষ তাঁদের মধ্যে সমান ভাবে একটা জিনিষ দেখা যায় সেটা হল ত্যাগের ভাব। এনারা কোন কিছুর বন্ধনেই থাকেন না, আর কোন জিনিষকে আঁকড়ে ধরে রাখবো এই ভাবটাও তাঁদের থাকে না। ত্যাগ যদি না থাকে তাহলে ইন্দ্রিয়গুলো এদিক সেদিক দৌড়াতে থাকে, ত্যাগের ভাব এসে গেলে এই দৌড়ানটা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাধ বলছেন – অহিংস আর সত্য বচন এই দুটো সমস্ত প্রাণির জন্য হিতকর আর *অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্। অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং তু প্রবর্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ।।*৩/২০৭/৭৪। অহিংসা আর সত্য সমস্ত প্রাণির পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।অহিংসা পরম ধর্ম কিন্তু সেটাও সত্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সত্যই হচ্ছে আধার, অহিংসা আর সত্যের মধ্যে সজ্ঘাত হলে সত্যকেই অবলম্বন করবে। কিন্তু মহাভারতেই পরে একটা জায়গায় বলছে সত্য আর অহিংসার মধ্যে দ্বন্দ্ব এলে অহিংসাকেই বেছে নেবে। এখানে যেটা বলা হচ্ছে এই মত হল ব্যাধের। মহাভারতকে যদিও আমরা শাস্ত্র বলছি কিন্তু এখানে অনেক ধরণের চরিত্রকে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই চরিত্রগুলোর ব্যক্তিগত জীবনেরও একটা দিক এখানে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের মত শাস্ত্র কখনই বলে দেবে না যে সত্য আর অহিংসার মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে তুমি একমাত্র সত্যকেই ধরে থাকবে। মহাভারত শুধু বলে দিচ্ছে এই ঋষি এই পরিস্থিতিতে এই রকম করেছিলেন অন্য ঋষি এই কথা বলেছিলেন। এখন আমি কোনটাকে গ্রহণ করব সেটা আমার উপর নির্ভর করছে, কার্যের মাহাত্ম্য ও পরিস্থিতি অনুসারে নির্ভর করবে আমি কোন পথটা গ্রহণ করব। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মূল হচ্ছে ভেতর থেকে আমি আমার স্বার্থকে ত্যাগ করছি কিনা। স্বার্থ ত্যাগ না থাকলে সবটাই অসার হয়ে

যায়। স্বার্থ ত্যাগই হল শেষ কথা। সেইজন্য স্বামীজী সব কিছুকে নিয়ে একটা জায়গাতে মিশিয়ে দিলেন – তুমি নিঃস্বার্থ হও। নিঃস্বার্থ পরায়ণ আর ত্যাগ একই জিনিষ।

বলছেন *যো যথাপ্রকৃতির্জন্তুঃ স স্বাং প্রকৃতিমশ্নুতে। পাপাত্মা ক্রোধকামাদীন্ দোষানাপ্নোত্যনাত্মবান্।।* ৩/২০৭/৭৬। জীবের যার যেমন প্রকৃতি সবাই সেই প্রকৃতির অনুসারে কাজ করতে থাকে। যার মন ইন্দ্রিয়া গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনা সে কাম, ক্রোধাদি নানা জিনিষে লিপ্ত হয়ে অধর্ম করতে থাকে। বলছেন *বিধিস্তু বলবান্ ব্রহ্মন্ দুস্তরং হি পুরা কৃতম্। পুরা কৃতস্য পাপস্য কর্মদোষো ভবত্যয়ম্। দোষস্যৈতস্য বৈ ব্রহ্মন্ বিধাতে যত্নবানহম্।।* ৩।২০৮/২। দৈব অতীব শক্তিমান, পূর্ব পূর্ব জন্মে যে কাজগুলো করা হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে দৈব বা কপাল। এই দৈবকে অতিক্রম করা খুব কঠিণ। এই যে আমি ব্যাধের বংশে জন্ম নিয়েছি, পূর্ব জন্মে আমার হয়তো কিছু পাপকর্ম ছিল তা নাহলে আমি কেন ব্যাধের বংশে জন্ম নেব। এইখানে এসে অন্যান্য ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের তফাৎ হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মে যা কিছু হচ্ছে সবই ভগবান করেন, আমার ভালোর জন্যও ভগবান দায়ী আমার খারাপের জন্যও ভগবানকেই দায়ী করা হয়। হিন্দুরা কখনই এই ধরণের কথা বলবে না, যেটা হয়েছে তা ভালো হোক মন্দ হোক সব আমার জন্যই হয়েছে। আমি দারিদ্রের মধ্যে আছে, আমার চেহারাটা খারাপ এর জন্য আমি দায়ী। অষ্টাবক্রের কোন রূপ ছিল না, তাই বলে কি তিনি হা হুতাশ করতেন? আমি যদি দরিদ্রের মধ্যে থাকি, আমার চেহারাটা কুৎসিৎ কিমাকার তার জন্য কি আমি হা হুতাশ করছি কিনা এইটাই গুরুত্ব। হিন্দুরা এইসব ক্ষেত্রে বলে তোমার উপর যা কিছু ঘটছে সেটা তুমি নিজে মাথা পেতে নিয়ে নাও কারণ আমার যদি দারিদ্রতা থাকে আমার যদি অন্য কিছু কষ্ট থাকে তার জন্য আমিই দায়ী, অন্য কেউ এর জন্য দায়ী নয়। ব্যাধ এই কথা বলছেন, আমার যে এই ব্যাধ বংশে জন্ম হয়েছে, আমাকে যে এই কাজ করতে হচ্ছে যে কাজটা আমার পছন্দের নয়, এর জন্য কে দায়ী? আমার পূর্বজন্মে এমন কিছু কর্ম করা ছিল যার জন্য আজকে আমাকে এই বংশে জন্ম নিতে হয়েছে। যদি আমাকে আধ্যাত্মিক পথে চলতে হয়, যদি আমি ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে চাই তাহলে সব কিছু আমাকে আমার নিজের কাঁধে নিতে হবে। আর আমি যদি আগামী দিনে সুখ শান্তিতে থাকতে চাই তাহলে আমিই আমার কর্মকে পাল্টাতে পারব। আমি বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে আছি সেখানে আমি আনন্দে আছি কিনা এটাই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আনন্দে থাকি তাহলে দারিদ্র, চেহারা কোনটাই কোন ব্যাপার হয় না। কোনটা ব্যাপার হয়? আধ্যাত্মিক চিন্তন। আধ্যাত্মিক চিন্তন না থাকলে মন জগতের উপর চলে যাবে, জগতে মন চলে গেলে টাকা-পয়সা, মান-সম্মান এই জিনিষগুলো আমাকে কষ্ট দেবে। ব্যাধ বলছেন *ওষধ্যো বীরুধশ্চৈব পশবো মৃগপক্ষিণঃ। অনাদিভূতা ভূতানামিত্যপি শ্রুয়তে শ্রুতিঃ।।*৩/২০৮/৬। তবে কি জানো ভাই আদিম কাল থেকে আমরা শুনে আসছি গাছপালা, অন্ন, তৃণ, লতা পশু, মৃগ, পাখি এগুলো মানুষের ভক্ষ। সেইজন্য এই মাংস বিক্রী করাতে তোমার আপত্তি কেন হচ্ছে। এই আলোচনার এক জায়গায় ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলছেন, এই যে চাল, গম তুমি খাচ্ছ এই চাল, গমকেও যদি মাটিতে ফেলে জল দিলে সেখান থেকেও প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে, কিছু দিন পর গাছ বেরিয়ে আসে। তুমি শুধু চাল, গম খেয়ে যদি মনে কর আমি হিংসা করছি না, কিন্তু তাত হচ্ছে না, এগুলোতেও প্রাণ আছে। শুধু ছাগলেই প্রাণ আছে তুমি মনে করছ কিন্তু তাতো নয়, সব কিছুতেই প্রাণ আছে। কোন কিছু খাওয়া-দাওয়া করলেই তোমার প্রাণহানি হচ্ছে। একটা জিনিষ মনে রেখো যে ক্রুর কর্মে বা বাজে কর্মে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে, সে যেন সব সময়েই চিন্তা করে আমি কেন নিজেকে এই বাজে কর্মে জড়িয়ে রেখেছি, কি করে এই কর্ম থেকে আমি মুক্তি পাবো। এই চিন্তা যখন সে করতে থাকে তখন এই রকম ভাবতে ভাবতে কোন এক সময় সে মুক্তির পথ পেয়ে যায়। আসলে আমরা যেটা নিয়েই ভাবব সেটা থেকেই মুক্তি পেয়ে যাব। এখানে বলা হচ্ছে কিভাবে অশুভ কর্ম থেকে মুক্তি পেতে হবে। কিন্তু আমরা মনে করে আমি যে পরিস্থিতিতে আছি সেটা আমার মনের মত নয় বলে অশুভ মনে করছি তাই সেখানে থেকে আমি মুক্তি পেতে চাইছি। কিন্তু এখানে আমরা ভাবছি না যে, আমি যে মুক্তি পেতে চাইছি এই চাওয়াটাই আমার অশুভ কর্ম। ব্যাধ আবার বলছে, যদি কেউ দান, সত্য বচন, গুরুসেবা, ব্রাহ্মণ পূজা এইগুলো করতে থাকে তাহলে এখান থেকে আস্তে আস্তে তার উন্নতি হতে থাকে।

এক জায়গায় কৌশিক ব্রাহ্মণ ধর্মের ব্যাপারে ব্যাধকে জিজ্ঞেস করাতে ব্যাধ বলছেন সত্য কথাটাই ধর্ম তবে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে যেমন প্রাণের সংশয় যখন এসে যায় বা মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে অসত্য ভাষণ করা যায়, এগুলো বাইরে কখনই অসত্য ভাষণ করতে নেই। তবে অন্তিমে যদি দেখা যায় অসত্য ভাষণের জন্য কোন প্রাণির অত্যন্ত হিত হবে তাহলে সেই অসত্য ভাষণকেও সত্য ভাষণ বলেই গ্রহণ করতে হয়। এই মত গুলোর মীমাংসা করা খুব জটিল। এক গ্রীক দার্শনিক ছিলেন তিনি বলতেন, আগে ভাবতে হবে এই কাজটা করে লোকটার ভালো হবে কি হবে না, যদি ভালো হবে

মনে করবে তবেই তুমি সেই কাজটা করবে। সেই গ্রীক দার্শনিক একদিন খুব মদ খাওয়ার পর নর্দমায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর এক শিষ্য রাস্থা দিয়ে যেতে গিয়ে দেখে গুরু নর্দমায় পড়ে আছে, একটু দাঁড়িয়ে দেখে নিয়ে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে চলে গেল, কিছুই করল না। তারপর দার্শনিকের এক বন্ধু ওখান দিয়েই যাচ্ছিল বন্ধুকে ঐভাবে নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে টেনে তুলে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। যখন একটু হুঁশ হয়েছে তখন তাকে বন্ধু বলছেন, আরে তোমার নিজের শিষ্য তোমাকে ঐভাবে নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখেও তুলল না! দার্শনিক পরে শিষ্যকে জিজ্ঞেস করেছেন। শিষ্য বলল 'আমি আপনাকে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে অনেকক্ষণ ভাবলাম আপনাকে টেনে তুললে আপনার কি এতে সত্যিই ভালো হবে কিনা। আমি ভেবে কোন উত্তর পাইনি বলে আমি ছেড়ে দিয়েছি'। শিষ্যের কথাতে গুরু খুব খুশি হয়েছেন, তুমি আমার ঠিক ঠিক শিষ্য, এই যে তুমি প্রশ্ন করলে এতে আমার ভালো হবে কি হবে না, ঠিকই করেছ।

ব্রাহ্মণ নানান রকমের প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। ব্যাধ বলছে, এই ধর্ম অধর্মের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে, ধর্ম অধর্মের ব্যাপারে অনেক বেদ আছে অনেক ঋষিরা আছেন। কোনটা তুমি করবে ঠিক করতে পারবে না, সেইজন্য সহজ পথ হচ্ছে জন্ম সূত্রে আমি যে বংশে জন্মেছি, সেই বংশের পরম্পরায় যে কর্ম করতে হচ্ছে সেটাতে লেগে থাকাটাই সব থেকে সহজ। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এখানে বলছে না যে ঐটাতেই লেগে থাক, যেমন গীতাতে বলছে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মের নিধনং কে কেন শ্রেয় বলা হচ্ছে? কারণ স্বধর্মটাকে সহজে বোঝা যায়, অন্য কোন কারণ নেই। আগে তোমার বংশের পরম্পরাতে যে কাজ হয়ে আসছে সেটা আগে করে সাফল্য পেতে হবে, এবার তোমার ভেতরে যদি অন্য কোন দিকের প্রতিভা থাকে তারপর সেটাকে প্রকাশ কর। কিন্তু ভেতরে কোন প্রতিভা নেই, শক্তি নেই, দম নেই বংশ পরম্পরার কাজ ছেড়ে অন্য লাইনে গেলে তখন তাদের মার খেতে হচ্ছে, কোন লাইনেই সফল হরতে পারছে না। সেইজন্যই বলছে ধর্মের ব্যাপারে অনেক রকমের পথ আছে কিন্তু তুমি যে কুলধর্মটা পেয়েছ ঐটাকে আগে কর, কারণ কুলধর্মে তুমি সহজে বুঝতে পারবে কোনট ভুল কোনটা ঠিক। আর অজানা অচেনা পথে যদি তুমি নেমে পড় তাহলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে।

আরেকটা প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, যারা মুর্খ ও চপল তারা থেকে থেকেই নানান ঝামেলায় পড়ে যায়। তার বুদ্ধি, শিক্ষা, নীতি ও পুরুষার্থ তাকে এই ঝামেলা থেকে রক্ষা করতে পারেনা। অনেকের হয়ত প্রচুর বিদ্যা বুদ্ধি আছে কিন্তু থেকে থেকে অনেক রকমের ঝামেলায় পড়ে যায়, ভালো করে এদের যদি বিচার করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে এদের মনটা খুব চঞ্চল, সাধন ভজন নেই, আর তা নাহলে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথাও একটা মুর্খতা আছে, এদের বিদ্যা বুদ্ধি কোন কাজে লাগে না। যাদের বিদ্যা বুদ্ধি আছে, শাস্ত্র পড়া আছে, নীতি জানা আছে আর পরিশ্রম করার মানসিকতা আছে, এই ধরণের লোকরা সব সময় সাফল্য পাবে, কখনই কোন ঝামেলাতে পড়া কথা নয় এদের। পুরুষার্থ থেকে ফল যেটা হয় সেটা সব সময় পরাধীন। ফল পাওয়ার পেছনে অনেক কারণ কাজ করে, তা নাহলে মানুষ নিজের ইচ্ছায় ফল পেয়ে যেত। সবাই জীবনে শীর্ষে উঠতে চায় আর সবাই চেষ্টাও করে কিন্তু সবাই পারেনা। *বহবঃ সম্প্রদৃশ্যন্তে তুল্যনক্ষত্রমণ্ডলাঃ। মহচ্চ ফলবৈষম্যং দৃশ্যতে কর্মসংধিষু।* ।৩/২০৯/২১। অনেককে দেখা গেছে যারা একই নক্ষত্রে জন্ম নিয়েছে, আর মঙ্গল কৃত্য, অর্থাৎ তাদের মঙ্গলের জন্য যা কিছুই করা হয়েছে সবই একই রকম করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় তাদের ফল এক রকম হয় না। এর কারণ হচ্ছে মানুষের যে কোন ফল লাভের পশ্চাতে অনেক রকমের কারণ থাকে, সেইজন্য জ্যোতিষ বিদ্যাতে পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। এনারাও এগুলো খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেই এই কথাগুলো বলছেন। যমজ ভাই একই সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে, একই ভাবে বড় হচ্ছে কিন্তু বড় হয়ে দুজনের ভাগ্য দুই রকমের হচ্ছে, আবার অনেকের একই রকম ভাগ্য হতেও দেখা যায়। সেইজন্য গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না যে এই রকমই হবে। মহাভারতে কত রকমের সূক্ষ্ম বিচারের আলোচনা করা হয়েছে ভাবা যায় না।

যখন মানুষের বন্ধন কারক অনেক বাজে কর্মকে সৎ কর্ম দিয়ে শুদ্ধি করা হয় তখন অনেক ধরণের বন্ধন কেটে যায়। সৎ কর্ম মানে, মন্দিরে প্রণাম করা, গঙ্গা স্নান করা, আটকে প্রসাদ খাওয়া, জপ-ধ্যান করা, সাধুসঙ্গ করা ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে যে স্বাভাবিক গতি আছে বাজে কর্মে সেই গতিটা বন্ধনে আটকে যায়। অনেকে সাধু হওয়ার বাসনা নিয়ে আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস জীবনকে ধরে রাখতে পারেনা, কোথায় একটা বন্ধন পড়ে গেছে। তখন ঐ সৎ কর্ম দিয়ে ঐ বন্ধনটাকে আটকাতে হয়। এই বন্ধন গুলি সরে গেলে তখনই সে তপস্যা আর যোগ ঠিক ঠিক করতে পারে। টিভিতে যখন ক্রিকেট খেলা দেখি তখন টানা তিন ঘন্টা ধরে খেলা দেখছি, সিনেমা হলে টানা তিন ঘন্টা বসে সিনেমা দেখছি, তিন ঘন্টা

এখানে শাস্ত্রের কথা শুনছি কিন্তু যদি বলা হয় দিনের যে কোন সময় তিন ঘন্টা বসে জপ করতে, তখন আমরা কেউই পারবো না। এর কারণ একটাই বন্ধন কারক কর্ম আমাকে জপ করতে আটকে দেবে, জোর করে বসতে গেলে মাথা খারাপ করে দেবে, তুলে আছাড় মেরে ফেলে দেবে। সেইজন্য ঐ সৎ কর্ম দিয়ে আগে বন্ধন কারক কর্ম গুলোকে সরাতে হয়। প্রথমে পাপ কর্ম করাটা বন্ধ করতে হবে, এরপর সৎ কর্ম করে করে বন্ধন কারক কর্মটাকে নষ্ট করতে হবে তারপর তপস্যা আর যোগ শুরু হবে। যাদের আমরা আধ্যাত্মিক লোক বলে মনে করি আসলে তারা আদপেই আধ্যাত্মিক নয়, ধার্মিক পুরুষ হতে পারে, ধার্মিক মানে মন্দিরে যাচ্ছে, তীর্থ করছে, ভক্ত সম্মেলনে যাচ্ছে তার বেশী না। এদেরকে যদি বলা হয় বসুন তো টানা দু তিন ঘন্টা জপে। পারবেই না, ছিটকে ফেলে দেব। ঐ বন্ধন কারক কর্মকে যতক্ষণ না সৎ কর্ম দিয়ে সরান হচ্ছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক সাধনা শুরুই করা যাবে না।

ব্যাধ বলছেন *পাপং কুর্বন্ পাপবৃত্তঃ পাপস্যান্তং ন গচ্ছতি। তস্মাৎ পুণ্যং যতেৎ কর্তুং বর্জয়ীত চ পাপকম্।।৩/২০৯/৪২*। মানুষ যখন পাপ কর্ম করতে শুরু করে তখন পাপে তার স্বভাব এমন মজে যায় যে পাপ কর্মের আর অন্ত থাকে না। ঠাকুর বলছেন – মেথর মাথায় ময়লা বইতে বইতে তার এমন হয়ে যায় যে তার ঘেন্নাটাই মন থেকে চলে যায়। মানুষও যখন নিষিদ্ধ কর্ম করতে শুরু করে তারপর করতে করতে তার লজ্জা, ঘৃণাটাই মন থেকে চলে যায়। এই ধরণের লোক যদি বলে আমি তপস্যা করব, সেটা কি তার পক্ষে করা সম্ভব হবে? আর এটা জেনে রাখতে হবে তপস্যা না করা পর্যন্ত জীবনের সদ্গতি হয় না। এইভাবে বিশাল এক আলোচনা চলছে, বিষয় সেবন করলে কি হানি হয়, এই করলে কি হয় ইত্যাদি। এছাড়া দেবতাদের নিয়ে তখনকার দিনে যেসব কাহিনী আছে তার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, এগুলো আমাদের কাছে তত গুরুত্ব নয়। এই সব শোনার পর কৌশিক মুনির জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল।

দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ

পাণ্ডবদের বনবাস চলছে। এখনও সবাই জঙ্গলেই আছেন অনেক মুনি ঋষিরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তাঁদের কাছে যুধিষ্ঠির অনেক প্রশ্ন করছেন আর তাঁরাও নানা রকমের কাহিনী শোনাচ্ছেন। এই সময় একবার শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে পাণ্ডবদের সাথে দেখা করতে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দুই স্ত্রী রুক্মিনী আর সত্যভামা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সত্যভামা এসেই দ্রৌপদীর কাছে চলে গেছেন। দুজনে পরস্পর সম্ভাষণের পর সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞেস করছেন *তব বশ্যা হি সততং পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনে। মুখপ্রেক্ষাশ্চ তে সর্বে তত্ত্বমেতদ্ ব্রবিহী মে।।৩/২৩৩/৬।* 'হে দ্রৌপদী! পাণ্ডবরা সব সময় তোমার কাছেই থাকে আর তোমারই বশে থাকে, এটা কি করে সম্ভব'! সাধারণত স্বামীরা দিনের বেলায় কাজে কর্মে বাইরে থাকেন সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সান্নিধ্য পায়। কিন্তু পাণ্ডবরা সারা দিনই জঙ্গলেই রয়েছে, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তাই সারাটা দিন দ্রৌপদীর সাথেই আছে অথচ সবাই দ্রৌপদীর অধীনে, কোন ঝগড়া বিবাদ নেই, মনোমালিন্য নেই। শুধু তাই নয় সব সময় পাণ্ডবরা তোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, সব কিছুতে তুমি যেমনটি বলবে তেমনটিই হবে, এটা কি করে সম্ভব করলে। সত্যভামার বক্তব্য হচ্ছে পাণ্ডবরা হল ক্ষত্রিয় আবার রাজা, এরা দ্রৌপদীর মুঠোর মধ্যে কি করে আছে, আর এক আধজনকে নয় পাঁচজন পুরুষকেই দ্রৌপদী মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছে। সত্যভামা বলছেন 'আমার একটি স্বামী শ্রীকৃষ্ণ, এই একজনকে সামলাতেই আমার দম বেরিয়ে যায়, আর তোমার পাঁচ পাঁচটা স্বামী, পাঁচটা স্বামীকে কি করে মুঠোর মধ্যে রেখে সামলাচ্ছ'। তুমি নিশ্চয়ই কোন *ব্রতচর্যা তপো বাপি স্নানমন্ত্রৌষধানি বা। বিদ্যাবীর্যং মুলবীর্যং জপহোমাগদাস্তথা।। মমাদ্যাচশ্চ পাঞ্চালি যশস্যং ভগদৈবতম্। যেন কৃষ্ণে ভবেন্নিত্যং মম কৃষ্ণো বশানুগঃ।।৩/২৩৩/৭-৮*।, তুমি কি ব্রত কর, কি তপস্যা বা মন্ত্র জপ কর, কি কি স্নান কর, কি ঔষধ ব্যবহার কর? তুমি যা যা করে তোমার পাঁচজন স্বামীকে তোমার মুঠোয় রেখেছে, কি কি ব্রত কর বা কোন বিশেষ মন্ত্র, কোন ওষুধ বা জড়িবুটি ব্যবহার কর আমাকে বলে দাও।। *বিদ্যাবীর্যং মুলবীর্যং জপহোমাগদাস্তথা* কোন একটা বিদ্যাশক্তি বা মূলশক্তি মানে জড়িবুটি যেটা দেওয়া হয় বা যেটাই হোক আমাকে দাও যাতে আমার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হতে আর আমার শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ আমার মুঠোতে থাকতে পারে।

সত্যভামার এখানে একটাই সমস্যা কিভাবে তার পতি শ্রীকৃষ্ণকে বশে রাখবে। সত্যভামা মনে করছে দ্রৌপদী যে ভাবে পাঁচজন স্বামীকে বশে রেখেছে আমিও সেভাবে রাখব। কিভাবে রাখবে? ব্রত, তপস্যা, স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, বিদ্যাশক্তি, মূলশক্তি, জপ ইত্যাদি। বিমল মিত্রের বাংলা উপান্যাস সাহেব বিবি গোলামে ভূতনাথ নামে একটি চরিত্র আছে। সে সিঁদুর

কোম্পানিতে কাজ করে। বাড়ির বউরা ভূতনাথের কাছ থেকেই সিঁদুর কেনে কারণ তারা মনে করে ঐ সিঁদুর ব্যবহার করলে তাদের স্বামীরা বশে থাকবে। এই সমস্যা আমাদের সমাজে বহু দিন আগে থাকতেই চলে আসছে। আসলে পুরুষরা স্বভাবে বাইরে বাইরে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে শিকার করা আর মেয়েরা ঘর-বাড়ি পরিবারকে ধরে রাখে। মেয়েদের সব সময় দুশ্চিন্তা লেগে থাকে, স্বামী বাইরে গেলে ফেরত আসবে কিনা, না জঙ্গলে থেকেই আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করে নেবে। গ্রাম দেশে কিছু ওঝা গুণীন এইসব লোক থাকে, বাড়ির মেয়েরা লুকিয়ে চুরিয়ে এদের কাছে গিয়ে কিছু টোটকা নিয়ে আসে আর সেটাকে জলে মিশিয়ে স্বামীকে খাইয়ে দেয়। মনে করে এতে স্বামী বুঝি তার বশে থাকবে। সবই ধাপ্পা হলেও মেয়েদের মনে একটা বল আসে যে এবার বুঝি আমার স্বামী বশে আসবে। কিছুই বশে আসে না, কিন্তু এতেই লেগে থাকে। সত্যভামার কথা শুনে দ্রৌপদী বলছেন *অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং সত্যে মামনুপৃচ্ছসি। অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্তনম্।* ।৩/২৩৩/১০। 'হে সত্যভামা! তুমি যে কথা গুলো আমাকে জিজ্ঞেস করলে, যারা সাধ্বী স্ত্রী হন, পতিব্রতা নারী, তাঁরা কখনই এই ধরণের কোন কাজ করে না। যারা দুরাচারিণী, কুলটা নারী তারাই এই রকম। আর তোমার আমার মত নারীরা এই ধরণের আলোচনাই কি করে করতে পারে! *কথং স্যাদনুকীর্তনম্* আমাদের মত মেয়েরা এই ধরণের অসৎ চরিত্রের কুলটা নারীদের কির্তন কি করে করতে পারে! এদের কথা মুখেও আনতে নেই'। কথামৃতে এক জায়গায় মাস্টার মশাই আর নরেন্দ্রনাথের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। ঠাকুর এসে নরেনকে জিজ্ঞেস করছে 'তোমাদের মধ্যে কি কথা হচ্ছিল'? নরেন্দ্রনাথ বললেন 'এই কিছু না, আজকালকার ছেলেমেয়েদের চরিত্র কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল'। ঠাকুর শুনেই প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে গেলন, তারপর মাস্টার মশাইকে বলছেন 'এই ধরণের কথাবার্তা কখনই করতে নেই, তুমি বয়সে বড় এই কথা উঠতে দেওয়া তোমার উচিৎ হয়নি'। দুশ্চরিত্র লোকেদের আলোচনা কখনই করতে নেই, কারণ এদের কথা যত আলোচনা করা হবে মনের মধ্যে এই ধরণের লোকেদের একটা ছাপ পড়ে যায়। যারাই অমুক লোক চোর, অমুক দুশ্চরিত্র এই সব নিয়ে আলোচনা করে, বুঝতে হবে এদের মনেও চুরি করবার ও দুশ্চরিত্র হওয়ার প্রবল ইচ্ছা আছে, সুযোগ পাচ্ছে না বলে করতে পারছে না। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে 'Honesty is lack of opportunity' যারা সুযোগ পাচ্ছে না তারা সৎ আর যারা সুযোগ পাচ্ছে তারা লুটেপুটে খাচ্ছে। যারা ঠিক ঠিক সৎ তারা কখন এই ধরণের প্রসঙ্গই ওঠাবে না। আগেকার দিনে বাড়িতে বড়রা স্কুলের ছেলেমেয়েদের সিনেমার হিরো হিরোইনদের আলোচনা করতেই দিতেন না। ঠাকুর খবর কাগজ পড়াটাও সহ্য করতে পারতেন না। খবর কাগজে তো একটাও ভালো কথা থাকে না, খালি এর নিন্দা, একে গালাগালি, এর দুর্নীতি এই সবই থাকে। আর আমরা সকালে উঠেই সবাই বিষপান করতে শুরু করি। দ্রৌপদী এটাই বলছেন – *অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্তনম্* - যারা অসৎ পথে যাচ্ছে তাদের নিয়ে আমরা কি করে আলোচনা করতে পারি, মানে তাদের জিনিষগুলো পালন করা তো অনেক দূরের কথা।

এখানে সত্যভামা ও দ্রৌপদী কেউই আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক নন, এনারা সাধারণ নারী কিন্তু একটা ভালো জীবন-যাপন করছেন। তাই প্রথমেই সত্যভামাকে দ্রৌপদী আটকে দিচ্ছেন এইসব কথা আলোচনাই করতে নেই বলে। আমরা যেটাকে পরনিন্দা পরচর্চা বলি, এখানে সত্যভামা যেটা বলতে চাইছেন সেটা তার থেকেও বাজে। এরা হল অসৎ পথের চারিণী, এদের কথা আমরা আলোচনাই করতে পারিনা। এই জিনিষ গুলোকে মনে হবে অতি সাধারণ ব্যাপার কিন্তু এইগুলো পালন করেই মানুষ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে। আমরা যে প্রায়ই কাউকে দেখে বলি এই লোকটির ব্যক্তিত্ব কি প্রভাবশালী, এমনি এমনি লোকের ব্যক্তিত্ব প্রভাবশালী হয় না, আরও অনেক কিছুর মধ্যে তাঁরা কখনই খারাপ লোকেদের নিয়ে আলোচনা করেন না। দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলছেন 'এই ধরণের প্রশ্ন করা আর তোমার স্বামীর উপর সন্দেহ করা তোমার মত নারীর একেবারেই উচিৎ নয়, তুমি তো শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। *যদৈব ভর্তা জানীয়ান্মন্ত্রমূলপরাং স্ত্রিয়ম্। উদ্বিজেত তদৈবাস্যাঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব।* ।৩/২৩৩/১২। স্বামী যদি কোন ভাবে জানতে পারেন তার স্ত্রী তাকে বশে আনবার জন্য জড়ি, বুটি, মন্ত্র, ঔষধ ব্যবহার করছে, সেই লোকটা তখন ভয় পেয়ে যায়'। কি রকম ভয় পেয়ে যায়? *উদ্বিজেত তদৈবাস্যাঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব* ঘরের মধ্যে যদি একটা সাপ ঢুকে থাকে তখন লোকে কি রকম ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে! রাত্রে তার ঘুম আসবে না কারণ সে জানে ঘরে একটা সাপ ঢুকে আছে। এই ধরণের স্ত্রীকে দেখে স্বামী সেই রকম ভয় পায়। 'সেইজন্য তুমি কখনই এই জিনিষ করতে যেও না'। দ্রৌপদী বলছেন 'যে উদ্বিগ্ন তার শান্তি কোথায়, যে অশান্ত তার সুখ কোথায়'। এখানে যে বলা হচ্ছে *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, গীতাতেও ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন, যারা অশান্ত তাদের সুখ নেই। অশান্ত বলতে এখানে তিনটেকেই বোঝাচ্ছে, কর্মেন্দ্রিয় যাদের চঞ্চল তাদেরও সুখ নেই, যাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় চঞ্চল তাদের সুখ নেই আর যাদের মন শুধু চঞ্চল তাদেরও সুখ নেই। আমি ঘরে সাউণ্ডপ্রুফ করে আসনে ধ্যান

করতে বসে গেলাম, এখন আমার কর্মেন্দ্রিয় কোন কাজ করছে না, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও শান্ত হয়ে আছে কিন্তু মনটা চঞ্চল, একটা জায়গায় স্থির করে রাখতে পারছি না। এতে কি আমার শান্তি হবে? কখনই হবে না – কারণ *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, অশান্ত লোক যারা তাদের সুখ বলে কিছু নেই। আমরা সুখ আর শান্তি এক সঙ্গে বলি। কিন্তু শান্তি হলে তবেই সুখ আসবে, শান্ত লোক হলেই যে তার সুখ আসবে তা নয়। কিন্তু অশান্ত লোকের কখনই সুখ আসবে না।

দ্রৌপদী বলছেন 'এই যে তুমি জড়িবুটি ঔষদের কথা বললে, এগুলো খাইয়ে দিলে আবার বিপদ হয়ে যেতে পারে কারণ তুমিতো জানো না কোন্ দ্রব্যের কি প্রতিক্রিয়া হয়, এগুলো খাইয়ে দিলে স্বামীর হয়তো শরীরে খারাপ রোগ এসে যেতে তখন আরেক বিপদ। এমন এমন এই ধরনের চূর্ন পাওয়া যায় যেগুলো জিভে ছুঁইয়ে দিলেই মারা যেতে পারে'। আগেকার দিনে গ্রামে ও শহরে উভয় ক্ষেত্রেই এই ধরণের ঘটনা খুব দেখা যেত, কাউকে বশে আনতে হবে তাকে কায়দা করে এই ধরণের জিনিষ খাইয়ে দিত। নারীদের উপর আগে এত অত্যাচার হত বলে মেয়েরা সব সময় নিজেরা একটা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগত। তাই স্বামীকে কিভাবে হাতে রাখা যেতে পারে তার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা করত।

এইবার দ্রৌপদী নিজে কি করেন বলছেন *অহঙ্কারং বিহায়াহং কামক্রোধৌ চ সর্বদা। সদারান্ পাণ্ডবান্ নিত্যং প্রযতোপচরাম্যহম্।।*৩/২৩৩/১৯। আমি তিনটে জিনিষকে আমার জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। কি কি? অহঙ্কার, কাম আর ক্রোধ'। কোন স্ত্রী যদি অহঙ্কার, কাম আর ক্রোধকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেয় তাহলে আর কোন দিন তার স্বামীর সাথে বিবাদ হবে না। 'তার সঙ্গে আমি *সদারান্ পাণ্ডবান্ নিত্যং প্রযতোপচরাম্যহম্* পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকেই আমি সমান ভাবে সেবা করি আর তাদের যে অন্যান্য স্ত্রীরা আছে আমি তাদেরও পরিচর্যা করি, আর তার মধ্যে তিনটে জিনিষ বাদ। সেবার ব্যাপারে আমার মনের মধ্যে কোন অহঙ্কারাদি কিছু নেই আমি কোন ধরণের কাম বা ক্রোধের বশে যাই না। এখানে বিবাহিতা মেয়েদের কি ধরণের আচরণ করতে হয় বলা হচ্ছে। দ্রৌপদী বলছেন *দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃস্থিতাদ্ দুরবেক্ষিতাৎ। দুরাসিতাদ্ দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি।।*৩/২৩৩/২১। 'আমি সব সময় আশঙ্কায় থাকি আমার মুখ থেকে যেন কখন কটূ কথা না বেরিয়ে যায়। অশালীন ভাবে আমি কোথাও দাঁড়িয়ে থাকি না আর নির্লজ্জের মত আমি চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকি না। কোন ধরণের ভুল কাজ যাতে না করে ফেলি সেই ব্যাপারে খুব সাবধান থাকি। কোন অশালীন আচরণ যাতে না করে ফেলি সেই ব্যাপারে আমি সব সময় সজাগ থাকি। আমার স্বামীরা যখন ইঙ্গিত ইশারাতেও যদি কিছু বলেন আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা পূর্ণ করে দিই'। হয়তো স্বামী বলল 'আজকে গরমটা বেশী মনে হচ্ছে', স্ত্রী সঙ্গে পাখা এনে বাতাস করতে শুরু করল। স্বামী কিন্তু বলছে না যে আমাকে পাখা দিয়ে হাওয়া কর, ইঙ্গিত ইশারাতে বলছে তাতেই স্ত্রী বুঝে নিয়ে বাতাস করতে শুরু করে দেবে। দ্রৌপদী বলছেন *দেবো মনুষ্যো গন্ধর্বো যুবা চাপি স্বলঙ্কৃতঃ। দ্রব্যবানভিরূপো বা ন মেহন্যঃ পুরুষো মতঃ।।*৩/২৩৩/২৩। দেবতা হোক, মানুষ হোক, গন্ধর্ব হোক, যুবা হোক বা খুব সাজগোজ করে থাকা পুরুষ হোক আমার মন কিন্তু পাণ্ডবদের ছাড়া অন্য কোন দিকে যায় না'। মেয়েদের ভেতরকার এটা এক খুব গভীর সমস্যা। আমরা যে মনে করি আগেকার দিনের সমাজ খুব ভালো ছিল, তা কখনই ছিল না। সমাজ চিরকাল এই রকমই ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যা দেখতে খুব রূপসী ছিলেন, আর জঙ্গলে স্বামীর সাথে তপস্যাদি করতেন। ইন্দ্রের একবার খুব ইচ্ছে হল অহল্যাকে কাছে পাওয়ার। ইন্দ্রের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে অহল্যার প্রথমেই মাথায় এল সাক্ষাৎ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আমার সাথে থাকতে চাইছেন, আমার কি সৌভাগ্য। এতেই অহল্যার মন চঞ্চল হয়ে গেল। Evolutionary Psychology নামে একটা subject আছে। প্রজাতির যে বিবর্তন হয়, এখান থেকে একটা psychology বেরিয়েছে। নারী প্রজাতির সব সময় একটা ইচ্ছে থাকে জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ যারা তাদের সাথে কিভাবে সম্ভোগ করা যায়। শ্রেষ্ঠ প্রাণি কারা? দেবতা, গন্ধর্ব বা মানুষের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ। ক্রিকেট প্লেয়ার, সিনেমার হিরোদের পেছনে যে আজকাল মেয়েরা কিভাবে দৌড়াচ্ছে দেখা যায় তার পেছনে এই মনস্তত্ত্বটাই কাজ করে। দ্রৌপদী বলছেন *নাভুক্তবতি নাস্নাতে নাসংবিষ্টে চ ভর্তরি। ন সংবিশামি নাশ্নামি সদা কর্মকরেষ্বপি।।* ৩/২৩৩/২৪। 'আমার স্বামী আর আমার বাড়িতে যত ভৃত্য ও কর্মচারীরা আছে, এদের সবাইকে না খাইয়ে আমি কখন খাই না'। আমরা যে প্রায়ই বলি আজকের যে হিন্দুদের ধর্ম এটা হল মহাভারতের ধর্ম। ভারতের এক সাধারণ নারী তার স্বামী ও পরিবারের প্রতি তার কি রকম ব্যবহার হবে এটাকে নিয়ে এখানে মহাভারত দ্রৌপদীর মাধ্যমে আলোচনা করছে। দ্রৌপদী বলছেন *অনর্ম চাপি হসিতং দ্বারি স্থানমভীক্ষ্ণশঃ। অবস্করে চিরস্থানং নিষ্কুটেষু চ বর্জয়ে।।৩/২৩৩/২৮* 'স্বামী যখন পরিহাস করেন, রসিকতা করেন তখনই আমি হাসি, অন্য কারুর হাসাহাসিতে আমি হাসি না'। বাড়িতে স্বামীর কোন বন্ধু এসেছে বা কোন পুরুষ অতিথি এসেছে, সে কোন একটা পরিহাস করল আর আমি হা হা করে হাসতে শুরু

করলাম, তা কখনই করিনা। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – আমি নষ্টা মেয়ে দেখলেই বুঝতে পারি, যদি তাকে ভেতর থেকে বাড়ির লোক ডাকে তখন সে চিৎকার করে বলবে 'আসি বাপ', এই ধরণের চিৎকার করে যদি সাড়া দেয় তাহলে বুঝতে হবে মেয়েটির চরিত্রে গোলমাল আছে। মেয়েদের গলার স্বর এমন হবে যাতে অপর কেউ টের না পায়। দ্রৌপদী বলছেন 'থেকে থেকে বাড়ির দরজায় গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি না আর বাগানে একা একা কখন ঘুরি না। নীচ পুরুষের সঙ্গে কথা বলিনা, পরচর্চা থেকে দূরে থাকি, বেশী হাসাহাসি করিনা, বেশী ক্রোধ করিনা, সত্য কথা বলি, আর আমার স্বামীকে ছেড়ে একা কোথাও গিয়ে বেশীক্ষণ থাকা আমি একেবারেই পছন্দ করিনা'। এগুলো মেয়েদের বিশেষ গুণ। আজকাল তো কথায় কথায় মেয়েরা বাপির বাড়ি গিয়ে থাকে। স্বামীকে ছেড়ে একা একা কোথাও গিয়ে থাকতে চাইছে মানে কিছু একটা গোলমাল আছে বুঝতে হবে। দ্রৌপদী বলছেন সর্বথা ভর্তৃরহিতং ন মমেষ্টং কথঞ্চন। *যদা প্রবসতে ভর্তা কুটুম্বার্থেন কেনচিৎ।। সুমনোবর্ণকাপেতা ভবামি ব্রতচারিণি। যচ্চ ভর্তা ন পিবতি যচ্চ ভর্তা ন সেবতে।। যচ্চ নাশ্নাতি মে বর্তা সর্বং তদ্ বর্জয়াম্যহম্।*৩/২৩৩/৩০-৩১।'স্বামী যদি কোন কারণে বাইরে কোন পরদেশ চলে গিয়ে থাকে তখন আমি কোন শৃঙ্গার করিনা, কোন অঙ্গরাগ করিনা আর নিজেকে খুব সংযত রাখি। স্বামী কাছে না থাকলে আমার কায়িক যা কিছু করার সব বন্ধ রাখি। আমার স্বামী যেটা খেতে পছন্দ করেন না, যে পানীয় পান করেন না, যেটা সেবন করেন না, আমি সেগুলো কোন মতেই গ্রহণ করিনা। এমনকি গৃহে যখন কোন কাজকর্ম হয় তখন সব কাজকর্মে লক্ষ্য রাখি, কর্মচারিরা যাতে কাজে ফাঁকি না দেয় সেদিকে নজর রাখি। কত টাকা আয় হচ্ছে কত টাকা ব্যয় হচ্ছে সব আমি হিসাব রাখি। আর এটা মনে রাখবে আমার পাঁচ জন স্বামীর জন্য আমার উপর যা দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, যদি কোন দুষ্টা নারী থাকত তাহলে সে এই দায়ীত্ব সামলাতে পারত না, সৎ নারী না হলে এই গুরু দায়ীত্ব সামলান যেত না'। এত কথা বলার পর অন্য প্রসঙ্গে সরে গিয়ে দ্রৌপদী এবার অতীতের কথা বলতে শুরু করেছেন – 'ইন্দ্রপ্রস্থে যখন রাজভবনে থাকতাম সেই সময় আমি সবার আগে শয্যা ত্যাগ করতাম আর সবার শেষে শুতে যেতাম। এগুলোই হচ্ছে একমাত্র পথ নিজের স্বামীকে বশে রাখা'।

মহাভারতে সবারই আচরণ ও ধর্ম কি রকম হবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। একজন সতী নারীর আচরণ কি রকম হবে মহাভারত এখানে সেই ব্যাপারে আলোচনা করছে। এখানে আমরা অত্যন্ত একটা গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায় আলোচনা করলাম, এই যে এখানে একজন সাধ্বী স্ত্রীকে বলা হচ্ছে তুমি স্বামীর সেবা করে যাও, এই কথা যদি এখন নারী মুক্তি আন্দোলনের নেত্রীদের বলা হলে তারা কি বলবে? কি আর বলবে! ব্যাসদেবকে পেলে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসত। এই যে এখানে সাধ্বী নারীর ব্যাপারে এত গুলো কথা বলা হল, এর আসল তাৎপর্য কোথায়? এখানে কোন ধরণের চালাকি করে, কৌশল করে নারীকে বন্ধনে রাখার কোন ব্যাপারই নেই। এখানে একটা খুব সহজ ব্যাপারকে মহাভারত আমাদের বলতে চাইছে, আশা করা যায় যারাই বুদ্ধিমান ও সচেতন তারা এটা বুঝতে পারবেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটের বাইরে পঞ্চম কোন উদ্দেশ্য জীবনের নেই। এখন সাধারণ মেয়েদের জন্য আর সাধারণ মানুষের জন আমরা মোক্ষটাকে বাদ দিয়ে রাখতে পারি। মোক্ষ বাদ দিলে থাকবে ধর্ম, অর্থ আর কাম। যে কোন মানুষকে ধর্ম, অর্থ আর কামকে পেতে হলে তাকে একমাত্র স্বধর্ম পালন মানে নিজের কর্ম করেই পেতে হবে। স্বধর্ম পালন করেই ধর্ম, অর্থ আর কামকে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের কোন কাজটা ঠিক আর কোন কাজটা ভুল এটা কিভাবে নির্ধারিত হবে? আমাদের সামনে এত রকমের কাজ, এত রকমের কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, একজন ছেলে যখন শিক্ষার গণ্ডী বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তার সামনে এত রকম কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে মাথা ঘুরে যাবে। এখন সে কোন কাজটা করবে? কোন কাজটা করা তার ভুল না ঠিক এটাকে কিভাবে ঠিক করা হবে? মহাভারতের বিশেষত্ব হল, যার জন্য মহাভারতকে মহৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠো শিরোপা দেওয়া হয়। একটা জিনিষ মহৎ কখন হয়? যখন সে হয়ে যায়, it becomes। আমি যখন বলছি আমি ধার্মিক হতে চাই, আমি আধ্যাত্মিক হতে চাই, এই হতে চাই, এই becoming জিনিষটার মহাভারতে কোন স্থান নেই। মহাভারতে কোন স্থান নেই বলে হিন্দুধর্মেও এর কোন স্থান নেই। হিন্দুধর্মে ঠিক এই কারণেই ধর্মান্তর হয় না। যেমন মনে করা যাক আমি বললাম আমি খ্রীশ্চান মতে সাধনা করতে চাই, তাহলে আমাকে আগে ব্যপটাইস্ট হতে হবে বা আমি ইসলাম মতে সাধনা করতে চাই সেখানেও আমাকে আগে কল্মা পড়তে হবে। হিন্দুধর্ম এই জিনিষটাকে প্রথমেই কেটে বাদ দিয়ে রেখেছে। তুমি ধর্ম, অর্থ আর কামের সাধন কিভাবে শুরু করব? মহাভারত বলছে as is where is তুমি যেখানে যেভাবে আছ সেখানে থেকেই সাধনা হবে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে বিশ্বনাথ দর্শন করলে আমি ধার্মিক হব, হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গাস্নান করলে আমি ধার্মিক হব, মহাভারতে এবং হিন্দু ধর্মে ধার্মিক হওয়ার এই ধারণার কোন স্থান নেই। মহাভারত বলছে তুমি যেখানে আছ যেভাবে আছ সেখানে থেকেই তুমি

ধার্মিক হবে। এর আগে আমরা কৌশিকী ব্রাহ্মণের তপস্যার কথা পেলাম, সে কিন্তু হওয়ার চেষ্টা করছে, এই হওয়াটাকে এখানে বারণ করা হচ্ছে না, যে ঋষি হচ্ছে, সন্ন্যাসী হচ্ছে সেও কিন্তু পাল্টাচ্ছে, become মানে হওয়ার চেষ্টা করছে। তার এই হওয়াটাকে আটকানো হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে যে পাল্টাতেই হবে বা আমাকে যদি বলা হয় যে তোমাকে সন্ন্যাসীই হতে হবে তা নাহলে আমার ধর্ম হবে না, তাহলে আমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে, you have to become, মহাভারতে এই becoming টাকে বাধ্য করা হচ্ছে না, মহাভারতেরই এটা বৈশিষ্ট্য। পরে হিন্দুধর্মেও এটা ঢুকে গেছে, মহাভারতের বৈশিষ্ট্যই হল তুমি যা আছ তাই থাক, তোমাকে কিছুই পাল্টাতে হবে না। এখন এই যে বলা হল তোমাকে কিছুই পাল্টাতে হবে না, তোমাকে আলাদা করে কিছু হতে হবে না, তখন একজন সাধারণ গৃহিণী এসে যদি বলে আমি সংসারের কাজকর্ম করি, যিশু যেরকম ছিলেন আমি কি সেই রকম হতে পারি? হিন্দুধর্ম সঙ্গে সঙ্গে বলবে নিশ্চয়ই হতে পারবে। হিন্দুধর্ম অবশ্য বলবে যিশু ছিলেন ঈশ্বরের সন্তান, বুদ্ধ, মহম্মদ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা ছিলেন অবতার, এনার হলেন ঈশ্বরের রূপ। তুমি অবতার কোন দিন হতে পারবে না, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের যে অবস্থাটা হয়েছিল সেই অবস্থাটাকে তুমি লাভ করতে পার। কিন্তু যদি সেই গৃহিণী বলে আমি কি সন্ত মহাত্মা হতে পারব? হ্যাঁ হতে পারবে, এই দেখ কৌশিক মুনি তপস্যা করেছিল বলে তার মধ্যে একটা বিশেষ ক্ষমতা চলে এসেছিল কিন্তু তার থেকে উচ্চ অবস্থায় গিয়েছিল সেই গৃহবধূ, সেই গৃহবধূর থেকে আরও উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন একজন ব্যাধ শুধু মাংস বিক্রী করে। কিভাবে ব্যাধ উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিল? শুধু কর্ম করে করে। কি কর্ম করছে? স্বধর্ম। স্বধর্মটা হচ্ছে যে কর্মটাতে আমি নিজেকে খুব সহজ ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারছি। দ্রোণাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু তিনি বেদ পাঠ না করে অস্ত্রবিদ্যা শিখে সব রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে থাকলেন। অন্য দিকে ক্ষত্রিয় সন্তান বিশ্বামিত্র রাজা হয়েও তপস্যা করে করে ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। এই রকম ব্যতক্রমি ঘটনা যে নেই তা নয়। আমাদের বোঝার ভুলে মনে করি জাতিপ্রথার দোষ আমাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু না, আমাদের কখনই বাঁধেনি। ওনারাও জানতেন ব্যতক্রমি কিছু সব সময়ই থাকবে কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতক্রমি লোককে বাঁচাতে গিয়ে আপামর মানুষকে পিষে মেরে ফেলবে না। সেইজন্য ওনারা সাধারণ মানুষের জন্য ঠিক করে সহজ পথ করে দিলেন তুমি যে অবস্থায় যে বর্ণে ও যে বংশে আছ, সেই বর্ণ ও বংশের যা কাজ সেটাকে যদি তুমি কামনা বাসনা ত্যাগ করে করতে থাক তাহলে তুমিও মহৎ হয়ে যাবে। আমাদের মনে হতে পারে এত এত গৃহিণীরা রয়েছে কিন্তু কারুকে দেখিনা তো মহৎ হতে। আসলে কেউই গৃহিণীর স্বধর্ম ঠিক ঠিক মত পালন করছে না। আমাদের হিন্দু সমাজে বলা হয় মায়ের আশীর্বাদের মত আর কিছু মঙ্গল হতে পারেনা। পৃথিবীর আর কোথাও, কোন ধর্মে, কোন সমাজে মায়ের আশীর্বাদকে এত উচ্চস্থান দেওয়া হয় না। কারণ আমাদের পূর্বজরা জানতেন কোন মা যদি তার সন্তান, স্বামী, পরিবারের সবাইকে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে যায় তাহলে তার মধ্যে যোগশক্তি এসে যাবে। এই যেমন গান্ধারী, স্বামী অন্ধ ছিলেন বলে তিনিও চোখ দুটোকে ফেট্টি দিয়ে বেঁধে দিলেন আর স্বামীর সেবা করে যেতে থাকলেন। সেই গান্ধারী দুর্যোধনকে বললেন আমার চোখ খুলে দিচ্ছি। তাহলে কি হবে? দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টি পড়লেই দুর্যোধনের শরীর বজ্রের মত হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি নারীর কিন্তু এই যোগ সিদ্ধিটা স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসবে যদি সে সন্তান আর স্বামীর ঠিক ঠিক সেবা করে থাকে। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সেতো যে কোন পশুরই থাকে কিন্তু যখনই কোন নারী বলে আমি ঠিক ঠিক ভাবে ঘর সামলাব আর আমার স্বামীকে সামলাব তাতেই তার মধ্যে যোগ সিদ্ধি এসে যাবে। সেই নারীর মুখ থেকে যদি কোন কথা বেরিয়ে যায় সেটা সত্য হতে বাধ্য। কিন্তু কোন নারী মুখের কথা সত্য হয় না, কারণ যোগ সিদ্ধাই নেই। কেন যোগ সিদ্ধাই নেই? কাজে কোথাও গাফিলতি হচ্ছে। গাফিলতি যদি কাজে না থাকে যোগ সিদ্ধাই হতে বাধ্য। মূল কথা হল যে কর্মটা আমার স্বভাব অনুসারে স্বাভাবিক ভাবে আমার কাছে এসে গেছে সেই কর্মটাকে যদি আমি নিঃস্বার্থ ভাবে, কামনা-বাসনা শূন্য হয়ে করতে থাকি তাহলে আমার সিদ্ধি হতে বাধ্য, আর সেখান থেকে ধর্ম, অর্থ আর কাম হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা এইভাবে করিনা, সরকারী চাকরি করছে, সেখানে ঘুষ নিচ্ছে ঘুষ না নেওয়ার সুযোগ থাকলে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। আমাদের কাজের মধ্যেই গণ্ডোগোল বলে কোন কিছুই আমাদের হয় না।

দ্রৌপদী এইসব কথা বলতেই সত্যভামা বলছে ‘না না দিদি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি আপনার সাথে একটু মজা করার জন্য বলছিলাম, অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই’।

গন্ধর্বদের হাতে দুর্যোধনাদিদের বন্দী এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক বন্দীমোচন

চারিদিকে এখন খবর ছড়িয়ে গেছে অর্জুন স্বর্গে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে অনেক দিব্যাস্ত্রাদি নিয়ে এসেছে। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এই সব খবর চলে যাওয়াতে তিনিও খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন। ইতিমধ্যে দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসনরা বসে বসে পরামর্শ করছে, এখন পাণ্ডবরা জঙ্গলে রয়েছে, তাদের পাশে এখন কেউ নেই, সৈন্য-সামন্তও নেই,

এরা এখন দুর্বল হয়ে একা একা পড়ে আছে। এই সময় যদি কোন রকমে কায়দা করে জঙ্গলে গিয়ে এদের সব কটাকে শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে সব ঝামেলা চিরদিনের মত মিটে যাবে। মহাভারতের এই অংশের ঘটনাকে নিয়ে পরবর্তিকালের সাহিত্যিকরা অনেক কাহিনী তৈরী করেছেন। জয়ঘোষ নামে কৌরবদের একজন গোপালক ছিল, বছরের কোন একটা মরসুমে জয়ঘোষ কৌরবদের যত গরু, মোষ ছিল সব জঙ্গলে চরাতে নিয়ে যেত। সেই সময় জঙ্গলে প্রচুর সবুজ তৃণ গুল্মাদি জন্মাত, ঐ ঘাস খেয়ে গরুগুলো হৃষ্টপুষ্ট হত। হাজারে হাজারে গরু নিয়ে জঙ্গলে চরাতে যেত। দুর্যোদনরা নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করে ঠিক করল তাদের গরুগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কেমন হচ্ছে দেখার ছলে পাণ্ডবরা যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে তাদের গঞ্জনা দিতে হবে। ধৃতরাষ্ট্রকে গরু দেখার কথা আর তার সাথে শিকারে যাবার নাম করে অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওখানে গিয়ে দুর্যোধনরা নানা রকমের উৎপাত করতে শুরু করছে, যেমন পাণ্ডবরা যে জলাশয়ের জলপান করে সেই জলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। সেই জলাশয় আবার গন্ধর্বদের পরিবাররা আমোদ আহ্লাদের স্থান। গন্ধর্বরা কৌরবদের দেখতেই ওদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এখানে কিছু অলীক কাহিনীর সাথে বাস্তবতাকে এমন ভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোনটা সত্য আর কোনটা অলীক কাহিনী বোঝা যায় না। যেমন গন্ধর্ব, বর্ণনা অনুসারে এরা ঠিক মানুষ নয় দেবতাদের থেকে একটু নীচে, অথচ মানুষের সাথে সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়ছে। এই জিনিষটা ঠিক মিল খায়না। পৌরানিক কিছু কাহিনী এই রকম মিশে যায়।

গন্ধর্বদের রাজা চিত্রসেনের নেতৃত্বে এরা সবাই কৌরবদের আক্রমণ করে সবাইকে বন্দী করে ফেলেছে। কৌরবরা বন্দী হয়ে খুব অস্বস্থিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছে, গন্ধর্বরা হয়তো এদের বধও করে দিতে পারে। যুধিষ্ঠিরের কাছে এই খবর পৌঁছে গেছে। তিনি তক্ষুণি অর্জুনকে ডেকে বলছেন 'দেখো অর্জুন! চিত্রসেন তোমার বন্ধু, তুমি চিত্রসেনকে কোন ভাবে বুঝিয়ে বল যে দুর্যোধনরা আমাদের বংশের, এদের যদি বন্দী করে নেওয়া হয় তাতে আমাদের বংশের বিরাট অপমান, তুমি ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে এস'। অর্জুন, ভীম এরা বলছেন 'কোন দরকার নেই ছাড়াবার, দুর্যোধনরা বেশ জব্দ হয়েছে'। আমাদের হিন্দুদের এটা একটা বিরাট সমস্যা। স্বামীজীও বলছেন হিংসে ভাব হল ভারতের সমাজের অভিশাপ। আমরা যে এত হিংসুটে জাত এই রকম হিংসুটে জাত আর কোথাও পাওয়া যাবে না, এটা হল ভারতের অভিশাপ। অর্জুন ভীম 'ঠিক হয়েছে খুব জব্দ হয়েছে' বললেও যুধিষ্ঠির কিন্তু বলছেন 'না, এই রকম করতে নেই, যতই হোক ওরা আমাদের বংশের লোক বিপদে আমাদের পাশে দাঁড়াতে হবে'। ঠাকুর এই ঘটনাটাকে নিয়ে এক জায়গায় বলছেন 'যখন বংশে একজন সৎ লোক জন্ম নেয় সেই কিন্তু বংশের বাকী সবাইকে উদ্ধার করে'। যেমন যুধিষ্ঠির, দুর্যোধনরা যখন গন্ধর্বের হাতে বন্দী হয়ে গেছে যুধিষ্ঠিরই কিন্তু অর্জুনকে দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন, বললেন এটা আমাদেরই অপমান।

মহাভারতের প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে একটা অন্য প্রসঙ্গকে আনা হচ্ছে। ভারতে যখন কেউ সেনাবাহিনীতে নাম লেখায় এদের প্রথমে ব্যাটেলিয়ানে দেওয়া হয়। এই সময় সেনাদের পুরো নিষ্ঠাটা থাকে ব্যাটেলিয়ানের প্রতি। ব্যাটেলিয়ানের উপরে হল রেজিমেন্ট, একজন সেনার কাছে রেজিমেন্টই সব কিছু, রেজিমেন্টই ওর মা, বাবা, ভাই বন্ধু সব, রেজিমেন্ট ছাড়া আর কিছু বোঝে না। রেজিমেন্টের ঠিক পরে সেনারা যেটাকে মানে সেটা হল আর্মি আর আর্মির উপরে দেশ। কিন্তু সেনারা দেশ, আর্মি থেকে বেশী বোঝে নিজের রেজিমেন্টকে। রেজিমেন্টের প্রতি সেনাদের এত নিষ্ঠা যে, চারটে প্রজন্ম পর্যন্ত দেখা গেছে একই রেজিমেন্টে যেতে। ঠাকুর্দা যে রেজিমেন্টে ছিল তার নাতিও চেষ্টা করে ঐ রেজিমেন্টে ঢুকতে। নিজের রেজিমেন্টকে এরা পরিবারের মত দেখে। যখন নতুন কোন সেনা রেজিমেন্টে ভর্তি হয়ে তখন এরা তাকে গর্ব করে দেখায় 'এই দেখো এই ট্রফি আমরা এই খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে পেয়েছিলাম, এই কামানটা আমরা ঐ যুদ্ধে দখল করেছিলাম'। কলকাতা ময়দান এলাকায় ইংরেজ আমলের দুজন সৈনিকের স্ট্যাচু ছিল। মুর্তি দুটো ইংরেজ আমল থেকেই একই জায়গায় একই ভাবে রাখা ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও ইংরেজ আমলের দুজন সৈন্যের মুর্তি নিয়ে কারুর সেই রকম মাথাব্যাথা ছিল না। কিন্তু যখন বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলো এরা ঐ মুর্তি দুটোকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পুর্ত বিভাগকে নির্দেশ পাঠাল। সেই সময় আবার ফোর্ট উইলিয়মে একজন মেজর জেনারেল ছিলেন তিনি খোঁজ নিলেন কেন মুর্তি সরানো হচ্ছে। খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল মেজর যেই রেজিমেন্টের আর যে দুই সৈনিকের মুর্তি করা ছিল এরাও ঐ একই রেজিমেন্টের ছিল। মেজর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রেজিমেন্টের উপরের কর্তাব্যক্তিদের বলছে 'বিদেশী হতে পারে কিন্তু এরা দুজন আমাদের রেজিমেন্টের সৈনিক, এরা দুজন শহিদ হয়ে গেছে কিন্তু এদেরকে আমরা এভাবে অপমানিত হতে দেব না'। সেই কবেকার মুর্তি, ১৯১০-১১ সালের হবে। কিন্তু এরা সঙ্গে সঙ্গে হেডকোয়ার্টারসের সাথে কথা বলে সবাই চাঁদা করে টাকা তুলে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে সেই মুর্তি দুটো পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে কিনে নিল, তারপর স্পেশাল ট্রাকে ওদের রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারসের মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখল। এরা আমাদের রেজিমেন্টের লোক ছিল

এদের স্ট্যাচুকে পর্যন্ত অপমানিত হতে দেবনা। রেজিমেন্ট মানেই আমাদের বংশ। নিজের রেজিমেন্টের লোকেদের বাঁচাবার জন্যে এরা যা খুশি করে দেবে। যুধিষ্ঠিরের সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী। দুর্যোধনরা আমার বংশের লোক, যা কিছু ঝগড়া বিবাদ সেটা আমার আর ওর মধ্যে, তুমি মাঝখানে আসতে পারবে না।

অর্জুনের বন্ধু ছিল গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ। অর্জুন গিয়ে চিত্ররথকে বলছে 'আপনি যদি আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখতে চান তাহলে আমার দাদা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আদেশ করেছেন আপনি দুর্যোধনদের ছেড়ে দিন, কারণ এরা সবাই আমাদের ভাই, আমাদের বংশের লোক'। চিত্রসেন অর্জুনকে দুর্যোধনরা কি কি অন্যায় কাজ করেছে বলতে শুরু করেছে। কিন্তু অর্জুনও বলছেন 'ওরা যাই করে থাকুক, ওরা আমাদের ভাই আপনি ওদের ছেড়ে দিন'। যাই হোক দুর্যোধনদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্যোধনকে ছেড়ে দিতেই যুধিষ্ঠির চিত্ররথকে বলছেন *উপকারো মহাংস্তাত কৃত্যোহয়ং মম খেচরৈঃ। কুলং ন পরিভূতং মে মোক্ষণেহস্য দুরাত্মনঃ।।৩/২৪৬/১৪*। এদের বন্ধন মুক্ত করে আমার ভাইদের ছেড়ে দিয়ে আমাদের বড়ই উপকার করলেন, এতে আমাদের কুল অপমান থেকে রক্ষা পেল।

ঐভাবে গন্ধর্বদের কাছে বন্দী হয়ে আর পাণ্ডবদের দাক্ষিণ্যে মুক্তি পেয়ে দুর্যোধনের মন প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে ভরে গিয়েছে। কর্ণাদিদের বলছেন 'এরপর থেকে আমার সব ধর্ম, সম্পত্তি, সুখ, ঐশ্বর্য, প্রশাসন, ভোগ এগুলো আর কোন কিছুই চাইনা, তোমরা ফিরে যাও আমি এখানে প্রায়োপবেশন করে প্রাণ ত্যাগ করে দিচ্ছি। আমি এই অপমান আর সহ্য করতে পারছি না, আমি রাজা হয়ে পাণ্ডবদের শিক্ষা দিতে এসে আমি নিজেই বন্দী হয়ে গেলাম, আর পাণ্ডবদের আনুকুল্যেই আমাকে মুক্তি পেতে হল! আমি আর বাঁচতে চাই না'। এই অংশে এসে একটা উদ্ভট ধরণের পৌরানিক কাহিনীকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই কাহিনীর বিষয়বস্তু দেখে মনে হয় না যে ব্যাসদেব এটা নিজে লিখেছেন, পরের দিকে কোন লেখক এই কাহিনীটাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক আলবেরুনির ইচ্ছে হয়েছিল হিন্দুদের যত দর্শন আছে সেগুলোকে সব অধ্যয়ণ করে যেমনটি আছে তেমনটি সাজিয়ে রাখবেন। আজকে যে আমরা প্রাচীন ভারতের অনেক কিছু জানতে পারছি এগুলো আলবেরুনির ইতিহাস থেকে। আলবেরুনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লিখছেন হিন্দুদের একটা দোষ আছে, এরা যেটা মুখস্ত করে নিচ্ছে সেটাতে ঠিক আছে কিন্তু যে জিনিষটাকে ওর লিখে দিচ্ছে সেটার ওপর আর ভরসা করা যায় না। বর্তমানে আমাদের জীবনে এখন উল্টো, মুখস্তকে আমরা বিশ্বাস করিনা কিন্তু লেখা থাকলে সেটা বিশ্বাস করি। হিন্দুরা বেদ যেটা মুখস্ত করে রেখেছিল সেটা ছয় হাজার সাত হাজারে একটুও পাল্টায়নি। কিন্তু কোন শাস্ত্রকার যেটা লিখে দিল সেটাকে পরে তার অনুগামীরা পাল্টে দেবে, কিছু না কিছু নিজে থেকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। দু বার যদি কোন জিনিষ লেখা হয়ে যায়, তৃতীয় বারে লেখক নিজেই বিশ্বাস করতে পারবে না যে সে এটা নিজে লিখেছে। আলবেরুনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করছেন।

এখানে বলা হচ্ছে পাতালবাসী যারা দৈত্য দানব ছিল এরা আগে আগে দেবতাদের কাছে অনেকবারে হেরে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্যোধনের উপর এরা ভরসা করেছিল যে এই দুর্যোধনকে সামনে রেখে দেবতাদের শুভ শক্তিকে তারা পরাস্ত করতে পারবে। দুর্যোধনকে তারা নেতা রূপে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, দুর্যোধন আবার নিজেও এই ব্যাপারে কিছু জানত না। দুর্যোধন যে এখন প্রায়োপবেশন করে বসে পড়েছে, এরা রাতারাতি দুর্যোধনকে অপহরণ করে পাতাললোকে নিয়ে এসেছে। পাতাললোকে নিয়ে গিয়ে দুর্যোধনকে এরা বলছে 'আপনি মরতে যাবেন না, এইভাবে ভেঙে পড়বেন না, আমরা আপনার পেছনে আছি। পাণ্ডবরা হল দেবতাদের অংশের আর আপনি হলে আমাদেরই বংশের। আপনাকে সামনে রেখে এবার আমরা পাণ্ডবদের মেরে শেষ করে দেব। আর আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, যুদ্ধ যখন হবে তখন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যের মত বীরদেরও আমরা আমাদের বশে করে নেব। এরা সবাই আপনার হয়েই কাজ করবে'। একটা সংশয় আমাদের মনের মধ্যে সব সময়ই আসে ভীষ্মের মত এত জ্ঞানী, দ্রোণাচার্যের মত পুরুষ কি করে দুর্যোধনের হয়ে এই অন্যায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পরে যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠির শেষ বারের মত দুই পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে এখনও যদি কেউ মনে করেন আমরা ঠিক তাহলে তাঁরা আমাদের পক্ষে অনায়াসে যোগ দিতে পারেন। তখন ভীষ্ম বলেছিলেন আমি রাজ পরিবারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছি তাই এই কুরু রাজবংশের বিপদের সময় এদের ছেড়ে যেতে পারিনা। দ্রোণাচার্যও বললেন আমি রাজ পরিবারের বেতনভুক, তাই এদের ছেড়ে আমি যেতে পারিনা। পরে এদের দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করার যৌক্তিকতাকে দাঁড় করাবার জন্য এই ধরণের কাহিনীকে নিয়ে আসা হয়েছে। *ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীংশ্চ প্রবেক্ষ্যন্ত্যপরেহসুরাঃ। যৈরাবিষ্টা ঘৃণাং ত্যক্ত্বা যোৎস্যন্তে তব বৈরিভিঃ।।৩/২৫২/১১*।'এই

যে দানবীয় শক্তি এরা ভীষ্ম, দ্রোণের মনকে বশীভূত করে দেবে, আর এরা সবাই তোমার হয়েই যুদ্ধ করবে, তাই তুমি চিন্তিত হয়ো না'। কিন্তু যত যাই হোক না কেন একটা সংশয় সব সময়ই থেকে যায়। এই দানবী শক্তির লোকেরা আবার দুর্যোধনকে কিছু বিদ্যাও শিখিয়ে দিয়েছে যাতে পরে যুদ্ধের সময় কাজে লাগাতে পারে। দানবদের কাছে এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর নাকি দুর্যোধনের আবার সাহস বেড়ে গিয়েছিল, সাহস বেড়ে যাওয়াতে সে আবার ফেরত চলে এসেছে, আর সবাইকে গিয়ে বলছে 'আমাদের এই যে কলঙ্ক হয়েছে, এই কলঙ্ককে আমরা যুদ্ধে বদলা নেব'।

এরপর আসছে দুর্বাসা মুনির সেই বিখ্যাত কাহিনী। দুর্বাসা মুনি খুব বিরাট তপস্বী ছিলেন, কিন্তু তপস্যা করলেও ওনার মনে কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল থেকে গিয়েছিল, ওনার মনে অপরকে ছোট করে দেওয়ার একটা রোগ থেকে গিয়েছিল। বেশী তপস্যা করলে অনেক কিছুর সাথে অহঙ্কাররের মাত্রাটাও বেড়ে যায়। দুর্বাসা মুনি প্রচুর তপস্যা করতেন বলে অনেক ক্ষমতা যেমন অর্জন করেছিলেন সাথে সাথে অহঙ্কারের মাত্রাটাও বেড়ে গিয়েছিল।

মুদ্গল ঋষির কাহিনী

এখনো পাণ্ডবদের বনপর্ব শেষ হয়নি। এরমধ্যে একটা খুব মজার কাহিনী আছে। মুদ্গল ছিলেন খুব বড় একজন ঋষি। সেই সময় কেউ যদি প্রশ্ন করত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি কে? সবাই এক বাক্যে মুদ্গল ঋষির নাম করতেন। কেন তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি বলা হতো? সেটাই এখন আলোচনা করা হচ্ছে। মুদ্গল ঋষির তপস্যাই ছিলো অতিথি সেবা – তিনি বলতেন 'আমি শুধু অতিথি সেবাই করব'। ঋষিদের এই অতিথি সেবা, তপস্যার ভাব থেকেই ভারতে অতিথি সেবাকে এত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। যাই হোক, সেই সময়ের তিনি একজন খুব বড় তপস্বী ছিলেন। তপস্যা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানতেন না। অতিথি সেবা ছাড়াও তাঁর ছিল কপোতিবৃত্তি – *অতিথিব্রতী ক্রিয়াবাংশ্চ কপোতিং বৃত্তিমাস্থিতঃ। সত্রমিষ্টীকৃত্নগ নাম সমুপাস্তে মহাতপাঃ।* ।৩/২৬০/৪। কপোতিবৃত্তি মানে – কপোত মানে পায়রা, পায়রার মত বৃত্তি করাকে কপোতবৃত্তি বলে, মুদ্গল ঋষি কপোতের মত উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে সর্বদা অতিথি সৎকার করতেন, নিত্যনৈমিত্তিক ও ইষ্টীকৃত যজ্ঞ করতেন।

ব্যাপারটা হল, যখন চাষ-বাস হয়ে ফসল উঠে গেল, তখনও ক্ষেতে ধান গমের মত শস্য দানা পড়ে থাকে। পায়রারা ঐ পড়ে থাকা শস্যগুলিকে খুঁটে খুঁটে তুলে খায়। মুদ্গল ঋষি করতেন কি, মাঠে ঘাটে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। বাজারে বড় বড় আড়তে বস্তা বস্তা খাদ্য শস্য মজুত করা আর বাইরে বের করার সময় কিছু কিছু শস্য দানা এদিক সেদিক পড়ে থাকত। অত বড় ঋষি ছিলেন, কিন্তু কোন দিন কারুর দান গ্রহণ করতেন না, কারুর কাছে ভিক্ষা করতেন না। তিনি শস্য ক্ষেতে, বাজারে ঐ রকম আড়তের সামনে পড়ে থাকা শস্য দানা যেগুলো পাখিরা খায়, তার একটি একটি করে তুলতেই থাকতেন। এইভাবে পনের দিন ধরে শুধু তুলতেই থাকতেন। পনের দিনে তাঁর এক কৌটা চাল ডাল বা গম যাই হত, আর উনি পনের দিন পর সেটাকে রান্না করে অন্ন গ্রহণ করতেন। প্রতিদিন তপস্যা করার পর বিকেলে বেরিয়ে যেতেন। মাঠে বাজারে যাবেন, যেখানেই যান না কেন সেখানে যাই পরে থাকত তার একটা একটা করে দানা তুলতেন। পনের দিনে যেটুকু হতো তিনি সেটা রান্না করতেন। অতিথি যিনি থাকতেন তাঁকে আগে খাওয়াবেন, তারপর তার বউ ছেলেকে খাইয়ে সবার শেষে নিজে আহার করতেন। আবার পনের দিন ধরে উপবাস করে থাকতেন আর ঐভাবে চাল বা গম সংগ্রহ করতেন। ওনার সাথে সাথে ওনার ছেলে বউও উপোস করে থাকত। আর এই ঘোরতর তপস্যার ফলে তাঁর চেহারা সব সময় থাকত উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান।

দুর্বাসা মুনি ঠিক করলেন মুদ্গল ঋষিকে সবাই একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি বলে তাই একে একবার পরীক্ষা করতে হবে। দুর্বাসা মুনি একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে বলছেন 'আমি অনেকদিন কিছু খাইনি, বাড়িতে কি খাবার দাবার আছে আমাকে দাও'। সেই দিনই পনের দিন পর ঋষির বাড়িতে রান্না হয়েছে। তপস্যার ফলেই হোক বা যে ভাবেই হোক একটা জিনিষ হয়েছিল কি মুদ্গল ঋষি রান্না করার পর যে পাত্রে তিনি খাবারটা রাখতেন সেই খাবার কখনই ফুরিয়ে যেত না। যত অতিথিই আসুক না কেন। তিনি চাইলেই পাত্রের গায়ে যেটুকু অবশিষ্ঠ লেগে থাকত, সেটা থেকেই আবার পাত্রে খাবার দাবারে ভরিয়ে দিতে পারতেন। সব শেষে মুদ্গল ঋষির খাওয়া হয়ে গেলে আর ঐ ভাবে ভর্তি হয়ে যেত না। যাই হোক যা কিছু ছিল ঋষি দুর্বাসা মুনিকে সব খুব আনন্দ সহকারে দিয়েছেন। যা কিছু ছিল দুর্বাসা সব খেয়ে নিয়েছে। আর পাত্রের গায়ে যেটুকু অবশিষ্ঠ লেগে ছিল, যেটা থেকে মুদ্গল ঋষির ছেলে বউ আর নিজে খাবেন, সেটুকুও গায়ে মেখে বেরিয়ে চলে গেলেন। মুদ্গল ঋষি কিছু বললেন না। পনের দিন ধরে আবার তিনি ঐ ভাবে শস্য

দানা তুলেছেন। পনের দিন পর আবার রান্না হয়েছে। দুর্বাসা মুনি আবার তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে বলছেন ‘আমি খুব ক্ষুধার্ত আমাকে কিছু খেতে দাও’। মুদ্গল ঋষি যা রান্না করেছেন সব দিয়েছেন। দুর্বাসা মুনি সব খেয়ে পাত্রের গায়ে যা লেগেছিল সব চেটেপুটে খেয়ে আর বাকীটা গায়ে মেখে বেরিয়ে গেছেন। পাত্রের গায়ে যদি কিছু থেকে যায় তাহলে কখন কমবে না, ঐটুকু থেকেই আবার সবার পুরো খাবার হয়ে যাবে। কিন্তু দর্বাসা মুনি পাত্রের গায়ে কিছুই থাকতে দিচ্ছেন না। মুদ্গল ঋষি আবার শান্ত মনে তাঁকে বিদায় দিয়ে পনের দিন ধরে আবার উপোস করে শস্য দানা সংগ্রহ করতে থাকলেন। পনের দিন পর তৃতীয় বার আবার দুর্বাসা মুনি এসেছেন। এই ভাবে দুর্বাসা মুনি ছয় বার গিয়েছিলেন। ছয় বার গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে গায়ে মেখে চলে এসেছেন। মুদ্গল ঋষির কোন বিকার নেই।

দুর্বাসা মুনি তখন ছয় বারের বেলায় হাতজোড় করে মুদ্গল ঋষিকে খুব মূল্যবান একটা কথা বললেন, মহাভারতের এই বাক্যটি খুব বিখ্যাত। এই শ্লোকটা পড়ার পর মনে মনে অবাক হয়ে ভাবতে হয় তখনকার দিনের এইসব বড় বড় মুনিরা কত বাস্তববাদী ছিলেন। দুর্বাসা মুনি বলছেন *ক্ষুদ্ধর্মসংজ্ঞাং প্রণুদত্যাদত্তে ধৈর্যমেব চ। রসানুসারিণি জিহ্বা কর্ষত্যেব রসান্ প্রতি।*।৩/২৬০/২৪। ‘ক্ষুধা বড় বড় লোকের, মানে বিরাট ধর্মজ্ঞানীর ধর্মজ্ঞানকে অপহরণ করে নেয়, আর রসনা মানে জিহ্বা, বড় বড় মুনিকে রসের দিকে টেনে নিয়ে চলে যায়। আর আপনি এই দুটোকে জয় করেছেন, তাই আপনি মহান, মহৎ পুরুষ’। এখানে যদিও বলা হচ্ছে পেটের ক্ষিদের কথা, কিন্তু যে কোন ক্ষিদেতেই এই একই জিনিষ হবে, যার গান শুনতে ভালো লাগে তার কানের ক্ষিদে আছে, যার রূপ দেখতে ভালো লাগে তার চোখের ক্ষুধা আছে, যে কোন ক্ষুধাই মানুষকে ধর্ম পথ থেকে সরিয়ে দেয়। পেটের ক্ষুধাতো আরও মারাত্মক। দুর্বাসা মুনি তিন মাসের উপর মুদ্গল ঋষিকে খেতে দিলেন না, তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী, ছেলেও উপোস করে আছে, কিন্তু মুদ্গল ঋষি তাঁর মনকে চঞ্চল হতে দিলেন না, তাই দুর্বাসা মুনি বলছেন ‘আপনি মহান, মহৎ পুরুষ’।

ক্ষুধা বড় বড় মহাপুরুষের জ্ঞান, ধৈর্য্যকে হরণ করে নেয়। আর রসনা মানুষকে রসের দিকে টেনে নিয়ে চলে যায়। আমি যত বড়ই ধর্মজ্ঞানী, মহাপুরুষ হয়ে থাকিনা কেন যদি আমার পেটে ক্ষিধে থাকে, তাহলে সেই ক্ষিধে আমাকে সব মূল্যবোধ থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন ‘খালি পেটে ধর্ম হয় না’। ভুখে ভজন ন হোয়ে ভূপালা, সাধারণ মানুষদের পক্ষে তো কোন কথাই নেই এমনকি বড় বড় ঋষিরাও ক্ষুধাকে সহ্য করতে পারেন না।

ঠিক এই রকমেরই একটি ঘটনা বেলুড় মঠে আছে। মঠের দ্বাদশ অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহরাজের জীবনেই এই জিনিষ দেখা গেছে। তখনও তিনি অধ্যক্ষ হননি, অনেক কম বয়স ছিল। আমাদের মঠে যে Dispensary আছে, সেখানে একজন মহারাজ ছিলেন। তিনি গরমের সময় অনেককে ডেকে ডেকে সরবৎ খাওয়াতেন। স্বামী ভুতেশানন্দজী তখন Assistant Secretary ছিলেন, তিনি ঐ মহারাজকে বললেন ‘আপনি সবাইকে সরবৎ দেন, তা আমাকে একদিন আপনার সরবৎ খাওয়াবেন’? ঐ মহারাজ সব সময় না না করত। ভুতেশানন্দজী জোর করে একদিন Dispensary তে ঢুকে গেছেন। ঢুকেই বলছেন ‘আমাকে সরবৎ খাওয়ান’। ঐ ভাবে বলাতে ঐ মহারাজ একদম সাদা রংয়ের জল গ্লাশে করে ওনার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। ভূতেশানন্দজীও ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ‘বাঃ, thank you’ বলে চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন। ভূতেশানন্দজী কোনদিন কারুকে এই ঘটনাটা বলেননি। কিন্তু Dispensary র ঐ মহারাজ সবাইকে বলতেন ‘দেখুন আমি কিন্তু ওনাকে সরবৎ দিইনি, তবুও তিনি thank you বলে চুপচাপ বেরিয়ে চলে গেলেন’। আসল অঘটন যেটা হয়েছে, তিনি জলে চিনিতো দেনইনি উপরন্তু ওতে কুইনাইন মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ভাবুন কি প্রচণ্ড তেতো। কিন্তু উনি নির্বিকার চিত্তে সেটা ঢক্ঢক্ করে পান করে thank you বলে চলে গেলেন। মহারাজ ওনার সাথে মজা করবার জন্য করেছিলেন কিন্তু ভুতেশানন্দজীর কোন কিছুই মুখে চোখে বিকার হল না উপরন্তু বাঃ thank you বলে সেই নির্বিকার ভাবে বেরিয়ে গেলেন। দেখুন এনাদের মনের level কোথায়! আমাদের যদি এই রকম শুধু সাদা জলই দিত কুইনাইন না মিশিয়ে তাতেও আমার দু চারটে কথা শুনিয়ে দিতাম ‘কি কিপ্টেমি করছেন, একটু চিনিও খরচা করতে পারেন না’। এই ঘটনাতো আর আজগুবি নয়, এটা এখন ছাপা হয়ে গেছে, মহারাজের জীবনীতে লেখা আছে। সেই মহারাজই সবাইকে বলেছিলেন। পরে উনি দুঃখ করতেন, আমি ওনার সাথে এই রকম বাজে ব্যবহার করেছিলাম!

ভূতেশানন্দজীর জীবনে এই রকম অনেক ঘটনাই শোনা যায়। ওনাকে তখন চেরাপুঞ্জীতে সেক্রেটারী। তখন কোন টাকা পয়সা নেই। এক জায়গায় ট্রাইবাল ছেলেরা শুয়ে থাকে উনিও ওদের কাছে চাদর পেতে শুয়ে থাকতেন। সপ্তাহে একদিন শিলংয়ে ধর্ম ক্লাশ নিতেন। ওখান থেকে তিনি যা প্রণামী পেতেন, সেটাকে বাঁচিয়ে তিনি চেরাপুঞ্জীর আশ্রম চালাতেন। একবার কোন ভক্ত শ্রদ্ধা করে এক কৌটা গাওয়া ঘি দিয়েছিলেন। আশ্রমে নিয়ে এসে তিনি রেখেছেন। ঠিক

করলেন সপ্তাহে একদিন ছেলদের সবাইকে একটু একটু করে দেবেন। এর মধ্যে একদিন যথারীতি শিলংয়ে ক্লাশ নিতে গেছেন, এদিকে আশ্রমের শিক্ষকরা ঘিয়ের কৌটটা দেখতে পেয়েছে। ঘিয়ের কৌটা দেখে ভাবছে, মহারাজ নিজে একা একা এটা খেয়ে শেষ করবেন, আমাদের কপালে জুটবে না। এই ভেবে সেইদিনই ওরা লুচি পরোটা করে পুরো ঘিটাকে শেষ করে দিয়েছে। মহারাজ ফিরে এসে দেখেন ঘি নেই। উনি কাউকে কিছু বললেন না। আসলে উনি বুঝে গেছেন কি হয়েছে – শিক্ষকদের ধারণা যে ঘিটা আমার জন্যই রাখা আর আমিই একা ভোগ করব। পরের দিন থেকে উনি নিজের জন্য সমস্ত রকমের উপাদেয় রান্না বন্ধ করে দিলেন, থাকত শুধু ভাত, আলু আর কোয়াশ সিদ্ধ আর তাতে তেল না, কোন মশলা না, এমনকি নুন পর্যন্ত থাকত না। তখন তিনি খুবই যুবা সাধু। ঐভাবে ছয় মাস ভাত, আলু ও কোয়াশ সেদ্ধ খেয়ে গেছেন। এই দেখে শিক্ষকরা লজ্জায় পড়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত ওনার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে বলছে 'আমাদের খুব অন্যায় হয়ে গেছে মাফ করুন। আপনি যা খাচ্ছেন ওটা মানুষের খাবার নয়, আপনি আর এরকম করবেন না'। ক্ষমা চেয়েছে তাই উনিও নির্বিকার চিত্তে আবার স্বাভাবিক খাবার খেতে শুরু করলেন।

দুর্বাসা মুনি এই রকম হাত জোড় করে বলছেন 'আপনি মহৎ'। ক্ষুধা সব মানুষকে উড়িয়ে দেয় আর রসনা যে তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে জানা নেই। যেসব যুবকরা সাধু হয়ে যখন প্রথম প্রথম মঠে জয়েন করে তখন তাদের প্রাচীন সাধুরা বলেন 'দ্যাখো, ঠিক ঠিক সাধু যদি হতে চাও মঠের ঝোল চচ্চড়ি খেয়ে পড়ে থাকো, ভক্ত বাড়িতে মাছ মাংস খেতে যেও না'। এনাদের কথাগুলি আর উপদেশ কিছু কিছু সাধুদের মাথায় এমন ঢুকে গেছে যে ভক্ত বাড়িতে খাওয়াতো দূরে থাক কোন ভক্ত কিছু রান্না করে এনে দিলেও এদের গা বমি বমি করতে থাকে। রসনা এমন একটা জিনিষ যে সবাইকে টেনে নেয়। ঠাকুর কামারপুকুরে গেছেন। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞেস করতেন 'আজ কি রান্না হবে গো'? তারপর ডাল রান্না হয়েছে তখন ঠাকুর বলছেন 'ডাল হল, কৈ তোমাদের ফোড়নের ছং টাতো শুনলুম না'। এরপরই ঠাকুর বলছেন 'ছিঃ সকাল থেকে খালি খাওয়ার কথা মাথায় উঠছে'। এগুলো স্বাভাবিক কিন্তু এই রসনাকে যে সত্যি সত্যি জয় করে নেয় সেই মহৎ হয়ে যায়। ঠাকুরের মহত্ত্ব কোথায়? তিনি একবার বলে দিলেন 'ছিঃ, সকাল থেকে খালি খাওয়ার কথাই মাথায় উঠছে', ব্যাস্, রসনার ঐখানেই ইতি।

মুদ্গল ঋষি যখন শরীর ত্যাগ করবেন, তখন সবাই দেখলেন ইন্দ্রলোক থেকে রথ এসেছে ওনাকে নিয়ে যাবার জন্য। মুদ্গল ঋষি জিজ্ঞেস করছেন 'আপনার আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন এই রথে করে'? বলা হল স্বর্গলোকে নিয়ে যাওয়া হবে। মুদ্গল ঋষি জানতে চাইলেন 'স্বর্গে সব কি রকম হয় আমাকে একটু বল'। হিন্দুদের স্বর্গের বর্ণনার সাথে অন্যান্য ধর্মের স্বর্গের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু অন্যান্য ধর্মে স্বর্গটা চিরন্তন কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে স্বর্গ চিরন্তন নয়। এখানে বলছে *তৈজসানি শরীরাণি ভবন্ত্যত্রোপপদ্যতাম্। কর্মজান্যেব মৌদ্গল্য! ন মাতৃপিতৃজান্যুত।।* ৩/২৬১/১৩। অর্থাৎ যারা স্বর্গে থাকে তাদের শরীরটা তেজোময়, আর কর্মের দ্বারাই এনারা জাত হয় আর এঁদের মাতা পিতার সম্পর্ক থেকে জন্ম হয় না। পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি, ভূমি, অপঃ, তেজ, বায়ু আর আকাশ। তেজ তত্ত্ব মানে অগ্নি তত্ত্ব দিয়ে স্বর্গের বাসিন্দাদের শরীরটা নির্মিত, তার মানে এদের আলোময় শরীর। আমাদের শরীরটা ভূমি তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। দেবতাদের ভূমিতত্ত্ব থাকে না, ভূমিতত্ত্ব না থাকাতে দেবতাদের চলাফেরা খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়। এই তেজোময় শরীরের জন্য বাবা-মায়ের সংযোগের দরকার পড়ে না। ভূমিতত্ত্বের শরীরই বাবা-মায়ের সংযোগে জন্ম নেয়। ভূমিতত্ত্ব না থাকাতে দেবতাদের তেজোময় শরীরে কখন ঘর্ম হয় না। ঘর্ম না হওয়ার জন্য শরীর থেকে কোন দুর্গন্ধ বেরোয় না। তেজোময় শরীরে কোন মলমূত্রাদি ত্যাগ করতে হয় না। খ্রীশ্চানদের যে এ্যঞ্জেলের ধারণা আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে এ্যঞ্জেলদের জৈবিক কোন কিছুর চাহিদা থাকে না। একদিকে জৈবিক চাহিদা নেই কিন্তু অন্য দিকে দেবতাদের সাজ-পোষাক ব্যবহার করতে হচ্ছে কিন্তু সেই জামা কাপড় কখন ময়লা হয় না। আমাদের জামা কাপড় ময়লা কেন হয়? আমাদের শরীর থেকে যে ঘাম বেরোয় তাতে হাল্কা তেলাক্ত পদার্থ থাকে। এই তেল আমাদের জামা কাপরে লাগে বলে কালো হয়ে যায়। দেবতাদের শরীরে ভূমি তত্ত্বই নেই তাই তেল বেরোবে কোত্থেকে, ঘামও হয় না আর জামা কাপড়ও কালো হয় না।

এখানে কয়েকটি লোকের বর্ণনা করা হচ্ছে। সব থেকে উপরে হল ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক খুবই মঙ্গলকারী, সাধারণত শুভ কর্ম করে একমাত্র ঋষি মুনিরাই ঐ লোক পর্যন্ত যেতে পারেন সাধারণ লোক ওখানে যেতে পারেনা। *স্বয়ম্প্রভাস্তে ভাস্বন্তো লোকাঃ কামদুঘাঃ পরে। ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো ন লোকৈশ্বর্য্যমৎসরঃ।।* ৩/২২৬১/২০। এই ব্রহ্মলোক স্বয়ং প্রকাশ, সমস্ত কামনা সেখানে পুর্তি হয়ে যায় আর কোন নারীর জন্য সন্তাপ হয় না। আমাদের এই

জগতে সন্তাপ বেশী কি নিয়ে হয়? কামিনী আর কাঞ্চন। টাকা দিয়ে মানুষ কামনা বাসনাই পূরণ করে। আমার যদি বসে বসেই কামনার পুর্তি হয়ে যায় তাহলে আমি কেন টাকা পয়সার জন্য ছুটোছুটি করতে যাব। কামিনী কেন চাইছি? মনে ইচ্ছা জাগছে বলেই কামিনীর জন্য সন্তাপ হচ্ছে, কামিনীকে পাওয়ার জন্য আবার অর্থের দরকার। কিন্তু ওখানে কামিনী নিয়েই কোন সন্তাপ হয় না। ব্রহ্মলোকে গিয়ে কি হয়? *ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো* স্ত্রী জনিত তাপ শরীরে কখনই জন্ম নেয় না। ইসলাম ধর্মে বলে স্বর্গে যারাই যাবে তারা প্রত্যেকেই হুরিদের পায়, হুরিরা আমাদের পরী বা অপ্সরাদের মত। কিন্তু এখানে বলছেন ব্রহ্মলোকে কোন নারীই থাকবে না। পুরুষের নারীর কখন প্রয়োজন হয়? যখন নারীর চিন্তন করে শরীরের তাপের জন্ম হয় তখনই তার নারীর প্রয়োজন হয়। বাল্মীকি রামায়ণে মন্দোদরী সীতার ব্যাপারে রাবণকে বলছেন 'হে রাজন্! যদি কোন নারী আপনাকে না ভালোবাসে তখন আপনি যদি সেই নারীকে ভালোবাসতে যান তাহলে শরীরে তাপ সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না'। আসলে আমাদের মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থ গুলি এমন ভাবে থাকে যে, যখন কোন বিশেষ নারীর দিকে মনটা চলে যায় তার ফলে তখনই শরীরের মধ্যে আপনা থেকেই একটা তাপ সৃষ্টি হয়। ঐ তাপকে প্রশমিত করার জন্য ঐ নারীকেই দরকার, অন্য কোন নারী দ্বারা সেই তাপ নির্বাপিত হবে না। ব্রহ্মলোকে একমাত্র ঋষি মুনিরাই যেতে পারেন, যাঁরা তপস্যা করেছেন তাঁরাই যাচ্ছেন, এনাদের আবার নারীকৃত তাপ হয় না বলে এই সমস্যা তাঁদের হয় না। তার ফলে আসল যে সমস্যা সেই কামিনী-কাঞ্চনই চলে গেল। কামিনী কেন দরকার হচ্ছে না? কারণ তাঁদের মনেই কোন ইচ্ছা জাগছে না। আর কাঞ্চনের কেন দরকার নেই? কারণ যেটাই সঙ্কল্প করছেন সেটাই পেয়ে যাচ্ছেন। ব্রহ্মলোকের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আমরা এখানে বিভিন্ন শাস্ত্রের মাধ্যমে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের আলোচনা করছি। আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যদি ঠিক ঠিক জানতে হয় তাহলে আমাদের গীতা উপনিষদে যেতে হবে। এখানে যদিও সেই অর্থে আধ্যাত্মিকতার কিছু নেই কিন্তু মানুষের চিন্তা ভাবনা কিভাবে ধর্মীয় ভাবনাতে রূপান্তরিত হতে প্রভাবিত করে খুব সুন্দর বোঝা যায়। অন্যান্য ধর্মে চিন্তা জগতের এই ব্যাপকত্বকে পাওয়া যাবে না। এক ঋষি এক গ্রন্থ হলে চিন্তার এই ব্যাপকতা আসবে না। যখন অনেকের চিন্তা ভাবনা এসে মিলিত হয় তখনই এই জিনিষ পাওয়া যায়। এখানে খুব সুন্দর বলছেন *ন বর্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যমৃতভোজনাঃ। তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্তয়ঃ।*।৩/২৬১/২১। ইন্দ্রাদি দেবতাদের জীবিকা কিভাবে চলে? আমরা জানি আমাদের তেত্রিশ জন দেবতা আছেন, এখানে এসে বলছেন তেত্রিশ কোটি দেবতা। এই দেবতাদের পেট চলছে কি করে? যজ্ঞের আহুতির দ্বারা। সেইজন্য বলা হয় মানুষ যেভাবে নিজের স্বার্থে গাধা, ঘোড়াকে ব্যবহার করে, দেবতারা ঠিক সেইভাবে মানুষকে ব্যবহার করেন নিজের বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মানুষ মেঘ চাইছে, বৃষ্টি চাইছে, সন্তান চাইছে, অর্থ চাইছে তার জন্য মানুষ এই যজ্ঞ সেই যজ্ঞ করছে আর *যজামহে স্বাহা* বলে যে আহুতি দিচ্ছে তাতেই দেবতাদের জীবিকা চলে। কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মলোকে আছেন তাঁদের শরীর এত বেশী তেজস সম্পন্ন যে তাঁদের এই জীবিকার দরকার পড়ে না, শুধু তাই নয় তাঁদের অমৃত পানেরও দরকার পড়ে না, কোন কিছুরই দরকার পড়ে না। তাঁদের শরীর – *তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্তয়ঃ* দিব্য জ্যোতির্ময় শরীর হওয়ার জন্য ব্রহ্মলোকের বাসিন্দাদের কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

পৌরানিক ধর্মী যত কাহিনী আছে সেগুলোকে নিয়ে বেশী টানাটানি করা যায় না। তার কারণ হল, একটা বিচার ও ভাবকে এনারা মানুষের সামনে একটা বিশেষ ভাবে উপস্থাপন করেন। এখন দেবতাদের আমরা কেউই দেখিনি, কিন্তু এনারা মনে করলেন আমাদের যেমন শরীর আছে ঠিক তেমনি স্বর্গে যত দেবতা আছেন তাঁরা আমাদের সাহায্য করেন। দেবতাদের আবার দানবদের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, যুদ্ধ করতে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হতে হচ্ছে। সেই ক্ষত বিক্ষত শরীরকে কে চিকিৎসা করবে? তখন অশ্বিনীকুমাররা গিয়ে চিকিৎসা করবেন। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, এনারা দেবতাদের এক বিশেষ ধরণের শরীর দিচ্ছেন অন্য দিকে এদের চরিত্রটা আবার মানুষের মত বানিয়ে দিচ্ছেন, ফলে এই চরিত্র গুলো মিশে গিয়ে একটা রসাল কাহিনীতে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু দার্শনিক মানসিকতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিত্ব এই কাহিনীগুলোকে আবার বিশেষ গুরুত্ব দেননা। মহম্মদ যখন হীরা পর্বতে তপস্যা করছিলেন তখন তাঁর দিব্য দর্শনে দেখছেন তাঁকে একটা ঘোড়াতে বসিতে স্বর্গে আল্লার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। এখন এই ঘোড়ার কি ধরণের শরীর ছিল বা মহম্মদেরই কি ধরণের শরীর ছিল? মহাভারতেও আমরা এরা আগে দেখলাম অর্জুন সশরীরের স্বর্গে গেলেন। অর্জুনের এই কাহিনীকে আমরা গালগপ্পো মনে করছি না, কিন্তু মহম্মদের বেলায় প্রশ্ন করছি তখন তাঁর কি ধরণের শরীর ছিল। সম্রাট আকবর আবার মহম্মদের ব্যাপারে এই ধরণের পৌরানিক মিথকে বিশ্বাস করতেন না। এই সব পৌরানিক কাহিনীতে কোথায় সত্য ঘটনা আর কোথায় কল্পনা

মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে পরের দিকে আর সেটা ধরা যায় না। সেইজন্য পৌরানিক ধর্মী যত কাহিনী আছে তার মধ্যে পৌরানিক ব্যাপার গুলোকে নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই, শুধু শুনে যেতে হয় আর মেনে নিতে হয় যে এই কাহিনীকে তাঁরা এইভাবে রচনা করেছেন আর এই কাহিনী শুনে শুনেই আমরা বড় হয়েছি। আমাদের কাছে অর্জুনের কাহিনীটাই সত্য আর মুসলমানদের কাছে মহম্মদের কাহিনীটাই সত্য। এগুলোকে নিয়ে বেশী টানাটানি না করে এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বা ভাবটাকে বুঝতে হয়। ঠাকুর যেমন ধ্যানে দেখছেন তাঁর শরীর থেকে আরেকটা শরীর বেরিয়ে এসেছে, সেই শরীর আবার জ্যোতির্ময়। এই জিনিষটাকেই হয়তো পরে কেই এসে একটা পৌরানিক আখ্যায়িকাতে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

ব্রহ্মলোকের বাসিন্দাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল – *ন চ বিগ্রহমূর্তয়ঃ*। এনাদের বিশেষ কোন আকৃতি হবে না, শরীরটা যেন আলোর পুঞ্জ, যে কোন রূপ ধারণ করে নিতে পারেন। আলোর কোন বিশেষ আকৃতি হয় না, কিন্তু যদি কিছু কাঁচের পুতুল থাকে আর তার মধ্যে যদি আলো দেওয়া থাকে তাহলে আলোটা সেই পুতুলের আকার নিয়ে নেয়, সেই রকম এনাদের শরীরও যখন খুশি যেমন আকার নিয়ে নিতে পারে। তাঁরা সুখে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সুখের কামনা করেন না। এই ব্রহ্মলোকে দুটো সমস্যা আছে, যখনই এঁদের শুভকর্ম শেষ হয়ে যায় তখনই তাঁদের এই লোক থেকে পতন হয়ে যায়। স্বর্গে সব সময় সুখভোগ হয় বলে যাঁর মন এখনও সুখভোগে পরে আছে হঠাৎ করে পতন হয়ে স্বর্গলোক থেকে পড়ে যাওয়াটা এঁদের কাছে অত্যন্ত দুঃখদায়ক, কারণ মনটা তো তাঁর পাল্টাচ্ছে না। শ্রীমাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে স্বর্গ নরক কি রকম হয়। শ্রীমা ঠিক এই উত্তরই দিচ্ছেন, মোমের মুর্তিটা যে একটু একটু করে গলতে থাকবে তা নয়, হঠাৎ করে উবে যায়। বাকি যারা স্বর্গে আছেন তারা দেখছে আমাদের মধ্যে একজন উধাও। কিন্তু যে পড়ে যাচ্ছে সেতো বুঝতে পারছে আমি পড়ে যাচ্ছি, এই কষ্টটা খুবই বেদনাদায়ক। দ্বিতীয় সমস্যা হল, যারা নীচের স্বর্গে আছে তারা কল্পনা করে আমাদের থেকে যার উচ্চ স্বর্গে আছে তারা আরও কত সুখভোগ করছে, এই চিন্তা করে তারা কষ্ট পায়। এগুলো হচ্ছে নানান রকমের কল্পনা, মানুষের মনে এই ধরণের চিন্তা ভাবনাগুলো খেলা করে।

এই সব কথা শোনার পর মুদ্গল ঋষি বলছেন 'আমার মনের মধ্যে যদি সুখভোগের ইচ্ছা আর উচ্চ স্বর্গের সুখভোগের প্রতি হিংসা থাকে আর যেখান থেকে আমার পতন হওয়ার সম্ভবনা যদি সব সময় থেকেই থাকে তাহলে এইসব স্বর্গে গিয়ে আমার কি হবে'? তখন মুদ্গল ঋষিকে বলা হচ্ছে 'এই লোকেই যদি আপনি মমতা আর অহংতা, মানে আমি আর আমার এই রোগ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এমন লোকে যাবেন যেই লোক সুখ-দুঃখের পার আর সেখান পৌঁছে গেলে আপনাকে আর আসা-যাওয়া করতে হবে না'। তখন যারা স্বর্গ থেকে দিব্য রথ নিয়ে মুদ্গলকে নিয়ে যেতে এসেছিল তাদের মুদ্গল ঋষি বলছেন 'আপনারা এই রথ নিয়ে ফিরে চলে যান আমার আর স্বর্গ লাগবে না'। এই বলে তিনি আমি আর আমার এই ভাবের উপর মনটাকে স্থির করে অহংতা আর মমতাকে ত্যাগ করে দেহ ছেড়ে দিতেই তিনি মুক্তি পেয়ে গেলেন।

মুদ্গল ঋষির এই কাহিনীতে অনেক গুলো চিন্তা ভাবনা ও ধারণাকে নিয়ে জাল বুনে দেওয়া হল। বুনে দেওয়ার পর মূল একটাই ভাব বেরিয়ে এসেছে, সেটি হল স্বর্গ হল অশাশ্বত। আমাদের উদ্দেশ্য হল সুখ-দুঃখের পারে যাওয়া। সুখ-দুঃখের পারে কিভাবে যাওয়া যাবে? আমি আর আমার এই ভাবটা থেকে মানুষ যে অবস্থায় বেরিয়ে আসে সেই অবস্থায় সে সুখ-দুঃখের পারে চলে যায়। এটাই হল মোক্ষ পথ। মায়ার বন্ধন হল আমি আর আমার, আর মুক্তি হল এই আমি আর আমার থেকে বেরিয়ে আসা। মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য হলে এই আমি আর আমার থেকে বেরিয়ে আসা।

দুর্বাসা মুনির অভিশাপ থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা

মুদ্গল ঋষির কাহিনীতে যেমন দুর্বাসা মুনির প্রসঙ্গ এসেছিল এর পরের কাহিনীটিও দুর্বাসা মুনির প্রসঙ্গেই আসছে। পাণ্ডবরা এখনও জঙ্গলে আছেন আর এদিকে দুর্যোধনরা নানা ভাবে ষড়যন্ত্র করে চলেছে কিভাবে বনবাস চলাকালীন অবস্থাতেই পাণ্ডবদের নাশ করে দেওয়া যায়। দুর্বাসা মুনি ঘুরতে ঘুরতে হস্তিনাপুরে যাওয়ার পর দুর্যোধনরা খুব খাতির যত্ন করে সেবাদি করেছে তিনিও খুব করে আশীর্বাদ করেছেন। দুর্বাসা মুনি চলে আসবেন সেই সময় দুর্যোধন বলছে 'আপনি তো আমাকে এত কৃপা করলেন, আমার ভাইরা জঙ্গলে আছে আপনি ওদের উপরও একটু কৃপা করুন'। ওখান থেকে দুর্বাসা মুনি পাণ্ডবদের কাছে এসেছেন। অসময়ে কোন খবর না দিয়ে ষাট হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা মুনি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, বলছেন 'আজ এখানেই আমরা সবাই তোমাদের সেবা গ্রহণ করব। আমাদের খাওয়ার আয়োজন কর'। এর আগে আমরা দেখেছিলাম যুধিষ্ঠিরের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে সূর্য দেবতা একটি অক্ষয় পাত্র

বর দিয়েছিলেন, দ্রৌপদীর খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত ঐ পাত্রের খাবার শেষ হবে না। এখন দ্রৌপদী দেখছেন, তাঁর খাওয়া সমাপ্ত হয়ে গেছে, দুর্বাসা মুনি হঠাৎ ষাট হাজার শিষ্যদের নিয়ে হাজির হয়েছেন, বলছেন 'আমরা স্নানাদি করতে যাচ্ছি তার মধ্যে তুমি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে রাখ'। দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেছে, কোন ভাবেই এত লোককে খাওয়ান সম্ভব নয়, পাণ্ডবরা সব ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছেন। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সবাই দেখলেন আর কোন উপায় নেই, দুর্বাসা মুনির অভিশম্পান্তের জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা ছাড়া আর কোন রাস্থা নেই। তখন দ্রৌপদী আবার সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন *কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! দেবকীনন্দনাব্যয়ঃ। বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্তিবিনাশন।। বিশ্বাত্মন্! বিশ্বজনক! বিশ্বহর্তঃ প্রভোহব্যয়। প্রপন্নপাল! গোপাল! প্রজাপাল! পরাৎপর।। আকূতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্তক! নতাস্মি তে। বরেণ্য! বরদানন্ত অগতীনাং গতির্ভব।। পুরাণপুরুষ! প্রাণ! মনোবৃত্ত্যাদ্যাগোচর। সর্ব্বাধ্যক্ষ! পরাধ্যক্ষ! ত্বামহং শরণং গতা।। পাহি মাং কৃপয়া দেব! শরণাগতবৎসল। নীলোৎপলদলশ্যম! পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ। পীতাম্বরপরীধান! লসৎকৌস্তভভূষণ।। ত্বমাদিরন্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্। পরাৎ পরতরং জ্যোতির্বিশ্বাত্মা সর্বতোমুখঃ।। ত্বামেবাহুঃ পরং বীজং ন্ধানং সর্বসম্পদাম্। ত্বয়া নাথেন দেবেশ! সর্বাপদ্ভ্যো ভয়ং নহি।। দুঃশাসনাদহং পূর্বং সভায়াং মোচিতা যথা। তথৈব সঙ্কটাদস্মান্মামুদ্ধর্ত্তুমিহার্হসি।।*৩/২৬৩/৮-১৬। হে অব্যয়, হে ভগবান, হে শ্রীকৃষ্ণ আপনি দেবকিনন্দন, আপনি মহাবাহু, আপনি অবিনশ্বর, বাসুদেব জগন্নাথ আপনি সবার কৃষ্ণ কেশব। যারা আর্ত হয়ে দুঃখী হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয় আপনি তাদের রক্ষা করেন। আপনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বজনক, বিশ্বনাশক, প্রভু, অচল, বিপন্ন রক্ষক। আপনি গোপাল, প্রজারক্ষক, আকৃতি ও চিত্তিনামক চিত্তবৃত্তির প্রবর্তক। আমি তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করছি, আমরা নিরুপায় হয়ে তোমার শরণাপন্ন। অতএব হে বরেণ্য, হে বরদে, হে অনন্ত, তুমিই আমাদের উপায়, তুমি ছাড়া এই বিপদ থেকে উদ্ধারের আর কেউই নেই। এখানে পাঁচটি শ্লোকে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন। মজার ব্যাপার হল মানুষ যতই নিরাকারের সাধনা করে থাকুক না কেন, কিন্তু যখনই কোন আপদ বিপদে পড়ে তখন মনে হয়ে এই সাকার ভগবান ছাড়া আর কোন গতি নেই। খুব বিপদে পড়লে মানুষের মুখ থেকে অনায়াসে এই রকম প্রার্থনা বেরিয়ে আসে। সেইজন্য হিন্দুরা অত কিছুতে না গিয়ে সোজা সগুণ সাকারের ভাবে নিজেকে বেঁধে রাখে। বৈষ্ণবরা তো এই ব্যাপারে প্রচণ্ড গোঁড়া, তারা বলে আমাকে যদি শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করতে হয় তাহলে আমি কি করতে মিছিমিছি নির্গুণ নিরাকারে যাব। এরপরে বলছেন *পাহি মাং কৃপয়া দেব! শরণাগতবৎসল। নীলোৎপলদলশ্যম! পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ। পীতাম্বরপরীধান! লসৎকৌস্তভভূষণ।।* হে শরণাগত বৎসল তুমি তোমার শরণাগতকে রক্ষা করে থাক, তুমি নীলোৎপলতুল্য শ্যামাবর্ণ, তোমার নয়ন পদ্মের মত লাল, তুমি পীতবসনযুক্ত এবং উজ্জ্বল কৌস্তভ মণিতে ভূষিত তুমি আমাকে কৃপা করে রক্ষা কর। তুমি জগতের আদি ও অন্ত, তুমি পরম আশ্রয়, তুমি শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম, তুমি জগতের আত্মা, তোমার মুখ সকল দিকে। জ্ঞানীরা তোমাকেই জগতের প্রধান বীজ ও সমস্ত সম্পদের আশ্রয় বলে থাকেন এবং তুমি রক্ষা করলে কোন বিপদেই ভয় থাকে না। হে কৃষ্ণ! পূর্বে রাজসভাতে তুমি দুঃশাসন থেকে আমাকে যেভাবে রক্ষা করেছিলে সেই ভাবে এখন আমাকে রক্ষা কর।

মহাভারত একদিকে যেমন তখনকার দিনের লোকাচার, শিষ্টাচার, বিভিন্ন ধর্মের যেমন পাতিব্রতা ধর্মের, রাজধর্মের ইত্যাদির বর্ণনা করে যাচ্ছে অন্য দিকে কাহিনীর পর কাহিনী চলছে তার মাঝে মাঝে এই ধরণের খুব উচ্চস্তরের কবিত্ব মণ্ডিত ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনাও সংলগ্ন করে দেওয়া হয়েছে। দ্রৌপদী প্রার্থনা করতেই কিভাবে কিভাবে সেই জঙ্গলে পাণ্ডবদের মাঝখানে দ্রৌপদীর সামনে শ্রীকৃষ্ণ এসে হাজির হয়ে গেছেন। যুক্তির দিক থেকে দেখলে মনে হতে পারে শ্রীকৃষ্ণ হয়তো আশেপাশেই কোথাও ছিলেন কিভাবে কিভাবে এখানে এসে গেছেন আরেকটা হতে পারে পরের দিকে শ্রীকৃষ্ণের কোন খুব ভক্ত কবি এটাকে মহাভারতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যেটাই হয়ে থাকুক না কেন, আপামর ভারতবাসীর মনে কিন্তু এইটাই স্থায়ী ভাবে বসে গেছে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে পাণ্ডবদের পদে পদে রক্ষা করে গেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এসেই দ্রৌপদীকে বলছেন 'ভালো করে দেখো পাত্রের গায়ে খাবারের কোন কণা লেগে আছে কিনা'। দেখা গেল একটু শাকান্ন লেগে ছিল। এই জন্যই অনেক মজা করে বলে দ্রৌপদী আর যাই হোন বাসন ভালো মাজতেন না। যাই হোক ঐ শাকান্নটুকু খেয়েই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *উপযুজ্যাব্রবীদেনামনেন হরিরীশ্বরঃ। বিশ্বাত্মা প্রিয়তাং দেবস্তুষ্টশ্চাস্তিতি যজ্ঞভুক্।।*৩/২৬৩/২৫। আমার এই শাকান্ন গ্রহণের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বের যে আত্মা যজ্ঞভোক্তা সর্বেশ্বর ভগবান সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হউন। শ্রীহরি, তিনি কে? সম্পূর্ণ বিশ্বের যিনি আত্মা, বিশ্বাত্মা আর যজ্ঞভুক্, যত যজ্ঞে যত কিছু

আহুতি দেওয়া হচ্ছে তার শেষ ভোক্তা হলেন এই শ্রীহরি, ভগবান, সর্বেশ্বর মানে তিনি সবারই ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এই শাকান্ন খেয়ে সেই সর্বেশ্বর, ভগবান শ্রীহরি সন্তুষ্ট হউন। ভগবানকে কিভাবে সন্তুষ্ট করা হয়? এইভাবে পূজো দিয়ে ভগবানকে বলা হল হে ভগবান আপনি সন্তুষ্ট হউন। এইভাবে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পারবেন তা নয়, যে কোন আধ্যাত্মিক পুরুষই এইভাবে ভগবানকে সন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আমরা এর আগে দেখছেই অগস্ত্য মুনি পুরো সমুদ্রের জল পান করে নিচ্ছেন কিংবা বাতাপির মাংস খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হজম করে নিচ্ছেন। যে কোন আধ্যাত্মিক পুরুষ কোন কিছুকে নিমিত্ত করে নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে লাগিয়ে সেই কাজটা করে দেন। যেমন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিকে ব্রহ্মাস্ত্র রূপে কোন তীরের উপর লাগাচ্ছেন তখন ঐ তীর সমস্ত জগৎকে বিনাশ করে দেবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন সুদর্শন চক্রে নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রয়োগ করে কারুর উপর ছাড়ছেন তখন তাকে শেষ করে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসছে। স্বামীজী যখন তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিকে এর উপর লাগালেন সেটাই তখন তীরের মত হয়ে সভাস্থ সবাইকে সম্মোহিত করে দিয়ে তাদের চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তিকে একেবারে বশীভূত করে দিচ্ছে। চৈতন্য সত্তার সাথে যাঁরাই নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন তাঁদের সেই আধ্যাত্মিক সত্তাকে এখন লেখাতে হোক, ভাষণের ক্ষেত্রেই হোক, কোন অস্ত্রে হোক যেখানেই লাগাবেন সেটাই তাঁকে সাফল্যের চরম শীর্ষে পৌঁছে দেবে। মৌনতা হল আধ্যাত্মিকতার একটি রূপ, এই মৌনতে যখন কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ চলে যান তখন সেই মৌন অবস্থা থেকে যখন কোন শব্দ বেরোয় সেই শব্দের শক্তি তখন একটা মাত্রা পেয়ে যায়। মানুষ যখন যে কোন একটা জিনিষকে নিয়ে সারা জীবন সাধনা করে যায় সেই সাধনাটাই পরে আধ্যাত্মিক সত্তাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ঐ শাকান্নটুকু মুখে দিয়ে যখন বললেন, হে সর্বেশ্বর বিশ্বাত্মা আপনি সন্তুষ্ট হউন। বিশ্বাত্মা যদি সন্তুষ্ট হয়ে যান তখন জগতের সমস্ত প্রাণিই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এখন এতে দুর্বাস মুনি ও তাঁর ষাট হাজার শিষ্যদের সবার খাওয়ার ইচ্ছা এক সাথে নিবৃত্ত হয়ে গেল এটা সত্যি কি মিথ্যা আমাদের জানা নেই। কিন্তু এগুলো হচ্ছে পৌরানিক কাহিনী, এই কাহিনীর মাধ্যমে একটা উচ্চ তত্ত্বকে আমাদের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। তত্ত্বটা কি? ঈশ্বর যদি তুষ্ট হয়ে যান তাহলে পুরো জগৎই তুষ্ট হয়ে যাবে, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশ্বাত্মাকে সন্তুষ্ট করে দিতেই দুর্বাসা মুনি আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গো সবাইর পেট ভরে গেছে। যিনি বিশ্বাত্মা তাঁরই পেট ভরে গেছে, দুর্বাসারা তো তাঁরই অঙ্গ। একজন খেলোয়াড়কে মাঠে খেলতে নামার আগে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে 'তুমি ফিট তো'। 'হ্যাঁ আমি পুরো ফিট, কিন্তু হাতে একটু ব্যাথা আছে'। হাতে যদি ব্যাথা থাকে তাহলে তুমি পুরো ফিট কি করে হলে। পুরো ফিট মানে তোমার সর্ব অঙ্গ পুরো ফিট হতে হবে। বিশ্বাত্মা যদি বলেন আমি সন্তুষ্ট তার মানে তাঁর যত অঙ্গ আছে সবই সন্তুষ্ট, তাই দুর্বাসারাও সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। এখন যত ঋষিরা ছিলেন সবাই ঢেকুর তুলতে শুরু করেছেন, পেট ভরে গেছে তাই ঢেকুর উঠছে। এমন জোর ঢেকুর উঠছে যে চিন্তায় পরে গেলেন, খাবেন কি করে। যুধিষ্ঠিরকে তো বলে দেওয়া হয়েছে রান্নাবান্না করে রাখতে। যত শিষ্যরা ছিল সবাই দুর্বাসা মুনিকে বলছেন 'আমরা এখন যুধিষ্ঠিরের ওখানে খেতে যাবো কি করে, এত এত রান্না আমাদের খেতে দিলে খেতে না পারলে অন্ন নষ্ট হয়ে আমাদের পাপ লেগে যাবে, যুধিষ্ঠিরও রেগে যেতে পারে, অত্যন্ত অস্বস্থিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আর যুধিষ্ঠিরও তো শক্তিমান লোক সেও আমাদের না ভস্ম করে দেয়। তার থেকে বরং আমরা এখান থেকেই চুপি চুপি সরে পড়ি'। নদীতে স্নান করে ওখান থেকেই সবাই অন্য দিকে পালিয়ে গেছে। এদিকে পাণ্ডবরাও ভয়ে কাঁপছে, দুর্বাসা এসেই আমাদের সবাইকে ভস্ম করে দেবেন। উভয় উভয়কে ভয় পাচ্ছে। যুধিষ্ঠির ভাবছে দুর্বাসা এসে ভস্ম করে দেবে বলে ভয়ে কাঁপছে আর এই দিকে দুর্বাসারা সবাই ভয়ে কাঁপছে অন্ন নষ্ট হয়ে যাবে বলে যুধিষ্ঠির তাঁদের ভস্ম করে দেবে। উভয় উভয়কে ভয় করছে। এই জগৎটা ঠিক তাই। আমরা জগৎকে দেখে ভয় পাই, কিন্তু এটা জানিনা যে জগৎও আমাকে দেখে ভয় পায়। দুজনেই একে অপরকে ভয় পাচ্ছে, আসলে কিছুই হয় না। সেইজন্য ভয়ের কিছু নেই, নির্ভয়ই আছে। এখানে মূল কথা হল সারা জীবন আমি জগতের সেবা করতে করতে মরে যেতে পারি কিন্তু কোন দিন জগতকে সন্তুষ্ট করতে পারব না। কিন্তু মানুষ যখন ঠিক ঠিক ঈশ্বরের সেবা করতে শুরু করে আর তাতে যদি ঈশ্বর একবার সন্তুষ্ট হয়ে যান তখন সেই মানুষ অপরের জন্য যদি সামান্যও কিছু করে দেয় তাতেই সে বিরাট সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এই ভাবটাকে ঠাকুর একটু অন্য ভাবে বলছেন 'ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলে তাঁর কৃপা পেলে সবাই তার বশে আসে। রাজা, বড়লোক তারাও বশে আসে এমনকি নিজের স্ত্রী পর্যন্ত'। আমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছি তিনি আমাকে কৃপা করছেন এর লক্ষণ কি? আমাকে বড়লোকও মানবে রাজাও মানবে, সবাই বশে আসবে। জগতের সব থেকে কঠিন কাজ হল নিজের স্ত্রীকে বশে রাখা, কিন্তু ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে নিজের স্ত্রীও বশে এসে যায়। এই ধারণাটাই দুর্বাসা মুনির এই কাহিনীর মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ একটা শাকের কণা মুখে দিয়ে বিশ্বাত্মাকে সন্তুষ্ট করে দিলেন সেই সঙ্গে দুর্বাসা মুনিও সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন।

দ্রৌপদীর প্রতি জয়দ্রথের কুদৃষ্টি

এক সময় জঙ্গলে দ্রৌপদী একা ছিলেন, সেই সময় পাঁচ ভাইয়ের কেউই সেখানে ছিলেন না। দুর্যোধনের এক বোন ছিল, একশ ভাইয়ের একটি বোন তার নাম দুঃশলা। দুঃশলা খুবই শীল সম্পন্না নারী ছিল, তার বিয়ে হয়েছিল জয়দ্রথের সাথে। জয়দ্রথ একদিকে যেমন খুব নামকরা রাজা ছিলেন আবার বড় যোদ্ধাও ছিলেন। জয়দ্রথের বাবা আবার ছিলেন বিরাট বড় তপস্বী। দুর্যোধন যেমন ভেবে নিয়েছে পাণ্ডবরা সব শেষ, জয়দ্রথও সেই রকম ভেবে নিয়ে বারো বছর বনে বনে ঘুরে ঘুরে আর অজ্ঞাতবাস করে পাণ্ডবরা আর রাজ্য ফিরে পাবেনা, তার আগেই ওরা সব কটাই শেষ হয়ে যাবে। এত কিছু ভেবে নিয়ে জয়দ্রথ দ্রৌপদীর কাছে মাঝে মাঝেই খবর পাঠাতে থাকত তোমার পাণ্ডবেরা সব শেষ, তুমি আমাকে বিয়ে করে নিয়ে রাজসুখে দিন কাটাও। এইসব কাহিনী দেখে এটা পরিষ্কার যে হিন্দুদের মধ্যে যে ধারণা হয়ে আছে মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় না, এটা সম্পূর্ণ ভুল। মনুস্মৃতিতেও পরিষ্কার ভাবে মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহের কথা আলোচনা করা হয়েছে। দ্রৌপদীর স্বামীরা বেঁচে থাকতেই জয়দ্রথ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণও একবার এক জায়গায় রুক্মিণীকে বলছেন তোমার যদি সেই রকম কোন অভিরুচি থাকে তাহলে অন্য কাউকে বিয়ে করে নিতে পার।

সেদিন পাণ্ডবদের কেউ দ্রৌপদীর কাছে নেই দেখতে পেয়ে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে জোর করে রথে তুলে পালিয়ে গেছে। আমরা মনে করি রাবণই শুধু সীতাকে অপহরণ করেছিল, ভারতে নারী বা স্ত্রীকে অপহরণ করার রেওয়াজ অনেক আগে থেকেই আছে। জয়দ্রথ একজন অত বড় রাজা, বিরাট যোদ্ধা আর যার বাবা এত বড় তপস্বী আর সব থেকে বড় ব্যাপার হল পাণ্ডবরা সম্পর্কে তার শালা হয়, দুঃশলা তো পাণ্ডবদেরও বোন, সেই জয়দ্রথ নিজের শালার বৌকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। দ্রৌপদী অনেক করে চেঁচিয়ে বলছে এই রকম দুষ্কর্ম করো না, তোমার খুব বিপদ হয়ে যাবে। জয়দ্রথ কিছুই শুনছে না। ইতিমধ্যে পাণ্ডবরা এসে দেখছেন দ্রৌপদী নেই, কোথাও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। আশেপাশে ব্রাহ্মণদের কাছে দ্রৌপদীর অপহরণের খবরটা শুনেই জয়দ্রথের পেছনে ধাওয়া করেছেন। জয়দ্রথ রথে করে পালাচ্ছে আর এরা পায়ে দৌড়ে ধাওয়া করেছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রথ অত দ্রুত যেতে পারেনা আর এরাও কোন শর্টকাট রাস্তা ধরে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত জয়দ্রথকে ধরে ফেলেছে। দ্রৌপদী তো রাগে কাঁপছে আর নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করছে। একবার দুঃশাসন ঐভাবে অপমান করেছিল এখন জয়দ্রথ তাকে অপহরণ করে নিয়ে পালাচ্ছে। ভীম আর অর্জুন জয়দ্রথকে ধরতেই ঠিক করে ফেলেছে এর গলাটাই কেটে উড়িয়ে দেবে। যুধিষ্ঠিরই আবার জয়দ্রথের রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যতই হোক জয়দ্রথ আমাদের ভগ্নিপতি, ভগ্নিপতি যাতে বিধবা না হয়ে যায় সেটাও আমাদের দেখা কর্তব্য, তাই একে বধ করা যাবে না, তবে এই অপকর্মের জন্য একে দণ্ড দিতে হবে। কি দণ্ড দেওয়া হবে? এর মাথায় পাঁচটা চটি রেখে মাথাটা মুড়িয়ে দেওয়া হোক। মানে মাথাটাকে এমন ভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে যাতে মাথায় পাঁচটা টিকি থাকে। আর জয়দ্রথকে যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব করতে হবে। কারুর মাথায় পাঁচটা চটি থাকা মানেই সে কারুর দাস। জয়দ্রথ একেই রাজা, এখন যুদ্ধে হেরে গেছে, অন্য দিকে সে দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছে বলে তার মাথায় পাঁচখানা চটি রেখে দিয়েছে, আর বলতে হবে আমি যুধিষ্ঠিরের দাস। এইসব হয়ে যাওয়ার পর যুধিষ্ঠির বলল আমার দাসত্ব করতে হবে না, এই বলে তিনি জয়দ্রথকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন আর বললেন কেন তুমি এই দুষ্কর্ম করতে গেলে। এই বলে জয়দ্রথকে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু মাথায় পাঁচটা চটি থেকে গেল।

জয়দ্রথের শিবের তপস্যা

জয়দ্রথ প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে গেছে। অপমানিত হয়ে জয়দ্রথ ভাবছে আমি এই অবস্থায় আর কোথায় যাব। এই ভেবে সেখান থেকেই শিবের তপস্যা করতে চলে গেল। মানুষ যখন মানবীয় শক্তির সাহায্যে কিছু করতে পারেনা তখন সে দৈবী শক্তির শরণাপন্ন হয়। শিবের তপস্যা করতে থাকল। জয়দ্রথের তপস্যাতে খুশি হয়ে শিব এসে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি কি চাও বাবা'। জয়দ্রথ বলছে আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে যুদ্ধে হারাতে চাই। শিব তখন বললেন 'দেখো, অর্জুনের কাছে আমার পাশুপত অস্ত্র আছে, পাশুপত অস্ত্র যদি একবার চালিয়ে দেয় তাহলে এই জগৎ পুরো বিধ্বংস হয়ে যাবে, তাই তুমি অর্জুনকে কোন দিন হারাতে পারবে না। তবে অর্জুন ছাড়া আর বাকি চার ভাইকে তুমি যুদ্ধে একদিনের জন্য হারাতে পারবে'। অর্জুনকে তো হারাতেই পারবে না আর বাকি চার ভাইকে হারাতে পারাবে তাও চিরদিনের মত হারাতে পারবে না আর যখন খুশি চাইলেই তুমি রোজ রোজ হারাতে পারবে না, মাত্র একটি দিনের জন্য হারিয়ে দেবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যেদিন দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন সেদিন দুর্যোধন শিবের এই বরের কথা জানত বলে জয়দ্রথকে মূল দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সেদিন আবার অর্জুন গেছে অন্য দিকে যুদ্ধ করতে, আসলে অর্জুনকে কায়দা করে

সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এখন অভিমন্যু চক্রব্যূহে ঢুকতে যাবে জয়দ্রথ ওকে আটকাতে পারেনি, কারণ অভিমন্যুর উপর বরের কোন প্রভাব নেই, শুধু এই চারজন পাণ্ডবের উপরই ছিল। অভিমন্যু ঢুকে পড়েছে আর ওদিকে ভীম বলছেন 'বাবা, তুমি এগিয়ে চল আমরাও একে একে আসছি'। কিন্তু ভীমতো জানেনা জয়দ্রথ যে সেদিনই শিবের বরটাকে কাজে লাগাতে যাচ্ছে। জয়দ্রথ সেদিন চারটে ভাইকেই এমন মার দিয়েছে যে কেউ ঢুকতেই পারল না। অভিমন্যু এদিকে চক্রব্যূহে ঢুকে গিয়ে ফেঁসে গেছে। এই কাহিনী পরে আসবে। যাই হোক শিবের বর পাওয়ার পর ফিরে এসেছে। আর এখান থেকেই পুরো পরিস্থিতিটা যুদ্ধের দিকে এগোতে শুরু করেছে।

সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী

এই সময় যুধিষ্ঠির খুব দুঃখ করে মার্কেণ্ডয় ঋষিকে বলছেন 'আমার মত দুঃখ যন্ত্রণার কি আর কারুকে কোন দিন ভোগ করতে হয়েছিল'? এর আগে যখন এই প্রশ্ন করেছিলেন তখন তাঁকে নল-দময়ন্তীর কাহিনী বলা হয়েছিল। এবার আবার যখন প্রশ্ন করেছেন তখন তাঁকে মার্কেণ্ডয় ঋষি বলছেন 'হে যুধিষ্ঠির! তোমাদেরই বংশে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম নিয়েছিলেন'। এখন যুধিষ্ঠিরকে শ্রীরামচন্দ্রের উপখ্যান বলা হচ্ছে। মহাভারতের এই অংশে রামকথা খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এই নিয়ে আবার পণ্ডিতরা অনেক প্রশ্ন তোলেন। তাতে একটা কথা বলা হয় যে রামকথা মহাভারতের সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল বা পরের দিকে এই কাহিনীকে মহাভারতে ঢোকান হয়েছে। রামকথা বলে দেওয়ার পর মার্কেণ্ডয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন 'দেখো, ধৈর্য্য হারাতে নেই, ধর্মকে তুমি ধরে রাখো। তোমার মত মহাত্মারা কখন শোক করেন না'।

এরপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী বলছেন। সাবিত্রী ছিলেন অশ্বপতি বলে এক রাজার মেয়ে। তিনি যদিও রাজা ছিলেন কিন্তু দিনকাল তার খারাপ যচ্ছিল। এদিকে সাবিত্রী সত্যবানকে নিজের স্বামী রূপে পাবার জন্য পছন্দ করেছিলেন। সত্যবানের বাবাও ছিলেন রাজা, তার নাম ছিল দ্যুমৎসেন, তিনি ছিলেন অন্ধ। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি রাজ্যও হারিয়ে ফেলেছেন। সাবত্রী কিন্তু মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিল সত্যবানকে বিয়ে করবে। বিরাট লম্বা কাহিনী, কাহিনীর মধ্যে না গিয়ে আমরা কাহিনীর মূল বিষয়টাকে তুলে আনব। সত্যবানরা রাজ্য হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সাবিত্রীর সঙ্গে সত্যবানের বিয়ে একেবারে ঠিক হয়ে গেছে, তখন একদিন নারদ এসে সাবিত্রীর বাবা মাকে বলছেন 'আরে, কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছ? সত্যবানের আয়ু মাত্র এক বছর আছে'। নারদ আবার দিনক্ষণ সব ঠিক করে বলে দিলেন। কিন্তু সাবিত্রী শুনে বলছে 'আমি মনে মনে ঠিক করেছি যখন, তখন এঁকেই আমি বিয়ে করব, যা হবার হবে আমি সত্যবানকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে যাব না'। নল-দময়ন্তীর কাহিনীতেও ঠিক এই ব্যাপারটাই দময়ন্তীর ক্ষেত্রেও হয়েছিল। বাবা মা মেয়েকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু মেয়ে কোন কথা শুনতে রাজী হল না, সত্যবান ছাড়া আমি আর কোন পুরুষের দিকে তাকাতেই পারব না। শেষে বিয়ের কথাই ঠিক থাকল কিন্তু সাবিত্রী মনে মনে ঠিক করেছে আমার স্বামীর এই মৃত্যুর ভবিষ্যৎ বাণী স্বামীকে এবং আর কারুকেই বলব না। বিয়ে হয়ে গেল। সাবিত্রী ভালো করে জানত যে আমার স্বামী অমুক দিন অমুক সময়ে মারা যাবে।

সত্যবান দিনের বেলায় বনে জঙ্গলে চলে যেত কাঠ কাটতে, বাবা মা দুজনেই অন্ধ, বন থেকে রোজ ফল-টল, কাঠ বাবা মার জন্য নিয়ে আসত। সাবিত্রীও সত্যবানের সাথে বনে যায়, আর বাড়ি ফিরে শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীকে নিষ্ঠা নিয়ে সেবা করে যাচ্ছে। একদিন সত্যবান বনে কাঠ কাটার পর গাছের তলায় বসে পড়েছে। বসে পড়েই সাবিত্রীকে বলছে 'হে সাবিত্রী! এই কাঠগুলো কাটার পর হঠাৎ আমার মাথাটা খুব ব্যাথা করতে শুরু করেছে, শরীরের সমস্ত অঙ্গও ব্যাথা করছে আর গা দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, আমি এই গাছের তলায় একটু ঘুমোব'। এখানে দেখাচ্ছে মানুষের মৃত্যু যখন আসে সেটা কিভাবে আসে। যার মৃত্যু আসছে সে বুঝতেই পারবে না যে তার মৃত্যু আসছে। সত্যবান আস্তে করে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সাবিত্রী দেখতে পাচ্ছে *শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়বহম্। স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ।।*৩/২৯৬/৮। একজন দিব্য পুরুষ গায়ে তার লাল রঙের কাপড়, মাথায় মুকুট আর প্রচণ্ড তেজস্বী কিন্তু ভয়ঙ্কর দেখতে এই রকম একজন লোক সত্যবানের পাশে এসে হাজির হয়েছে। এটা হল আমাদের যমরাজের কল্পনা ঋষিদের চোখে। মৃত্যুর দূতকে কি রকম দেখতে হয় এটা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়। খ্রীশ্চানদের মতে মৃত্যুর একটা বর্ণনা করা হয় কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ নিয়ে আসে, এই নিয়ে তাদের আবার অনেক রকম কাহিনীও আছে। এমনকি হ্যারি পটারে একটা চরিত্রে মৃত্যুকে এই ঠাণ্ডা আর ছায়ার মত দেখান হয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের মৃত্যুর রূপ হল তেজস্বী পুরুষ, সব সময় জ্বলজ্বল করছে কিন্তু মনে একটা ভীতির সৃষ্টি করে।

সাবিত্রী এমন পতিব্রতা নারী ছিলেন যে তিনি যমরাজকে চর্মচোখে দেখতে পাচ্ছিলেন কিন্তু যমরাজকে অন্যরা কেউ দেখতে পায় না। সাবিত্রী তখন সেই দিব্য পুরুষকে জিজ্ঞেস করছেন 'আপনি কে? আপনি নিশ্চয় কোন দেবতা? কি হেতু আপনাকে এখানে আসতে হয়েছে'? যমরাজ বলছেন *পতিব্রতাসি সাবিত্রি! তথৈব চ তপোঽন্বিতা। অতস্ত্বামভিভাষামি বিদ্ধি মাং ত্বং শুভে! যমম্।*।৩/২৯৬/১১। 'আমি হলাম যম, তুমি পতিব্রতা ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা আর তোমার তপস্যা আছে, পতিব্রতা ধর্ম পালন আর তপস্যা করে তোমার মন বুদ্ধি একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে বলে আমি তোমার সাথেই কথা বলতে পারি, অন্য কেউ হলে আমি কথা বলতাম না'। ভগবান সব সময় আমাদের সাথে কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু আমাদের মন এত অশুদ্ধ যে তিনি কথা বললেও আমরা শুনতে পাইনা। আমরা তো এত মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে সাষ্টাঙ্গ করছি, সবাই এত জপ করছে কিন্তু কেউ কি ঠাকুরের কথা শুনতে পাচ্ছি? শ্রীমা বলে গেছেন ছায়া কায়া সমান। ঠাকুরের যে মুর্তি সেটাতো ঠাকুরেরই ছায়া, যদি ছায়া কায়া সমান হয় তাহলে কায়া যদি কথা বলে তাহলে ছায়াও কথা বলবে। কিন্তু কই আমাদের সাথে তো ঠাকুরের কথা হয় না। কারণ আমাদের না আছে কোন তপস্যা, না আমরা কোন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। আমরা চাইলে দেবতাদের সাথেও কথা বলতে পারব না। যমরাজ তাই সাবিত্রীকে বলছেন তুমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আর তোমার তপস্যার দ্বারা তুমি নিজেকে একেবারে শুদ্ধ করেছ বলেই আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারছি। সাবিত্রী শুনে বলছেন 'আমি শুনেছি আপনি তো কখন কাউকে নিতে আসেন না, আপনার দূতরাই নিয়ে যান, তা আপনি কি করে এসেছেন'? যমরাজ বলছেন *অয়ঞ্চ ধর্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ। নার্হো মৎপুরুষৈর্নেতুমতোঽস্মি স্বয়মাগতঃ।।* ৩/২৯৬/১৬। এই সত্যবান ধর্মপ্রাণ, রূপবান আর গুণের সাগর। আমার দূতের দ্বারা নিয়ে যাওয়ার এ যোগ্য নয়, তাই আমি নিজেই এসেছি সত্যবানকে নিয়ে যেতে। কাহিনীতে আছে যে প্রথমে যমদূতরা সত্যবানকে নিয়ে যেতে এসেছিল কিন্তু সাবিত্রীর ঐ তেজ দেখে তারা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ছিচকে চোরকে ধরতে হলে থানা থেকে কনস্টেবলকে পাঠান হয় কিন্তু যদি কোন মন্ত্রীকে গ্রেফতার করতে হয় তাহলে খুব উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারকে পাঠান হয়, তখন কনস্টেবলকে পাঠান হয় না।

এরপর বলছেন *ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ।*।৩/২৯৬/১৫। যমরাজ তখন সত্যবানের শরীর থেকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জীবাত্মাকে পাশ দিয়ে বেঁধে বার করলেন। পাশ মানে দড়ি। জীবাত্মার আকার কতটা? *অঙ্গুষ্ঠমাত্রম্*। জীবাত্মা শরীর থেকে নিজে বেরোতে চায় না তাই সময় হয়ে গেছে বলে তাকে টেনে বার করা হচ্ছে। এখানে জীবাত্মাকে বলা হল *অঙ্গুষ্ঠমাত্রম্*, কঠোপনিষদে ঠিক এই ধরণের একটা মন্ত্র আছে – *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।*।২/১/১৩। যিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা তিনি নির্ধূম জ্যোতিঃ সদৃশ অঙ্গুষ্ট পরিমাণ অন্তরাত্মা। ইদানীং তিনিই বর্তমান আছেন এবং আগামীকালও তিনিই বর্তমান থাকবেন। *অঙ্গুষ্ঠমাত্রম্* এই ধারণার পেছনে একটা প্রেক্ষাপট আছে, যাঁরা ধ্যানের গভীরে চলে যান তাঁদের আস্তে আস্তে শরীর বোধটা চলে যায়। শরীরবোধ চলে যাবার পর তিনি নিজেকে তখন জ্যোতিঃস্বরূপ দেখতে পান। জ্যোতিঃস্বরূপ যেটা দেখেন তার আকারটা এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ আকারে দেখেন। আমাদের পরম্পরাতে এই জ্যোতিঃ দর্শন নিয়ে বেশী বলা না থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে ঠিক এই ব্যাপারটাকেই উল্লেখ করেছেন। ঠাকুরও নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পরিষ্কার এই জ্যোতির কথা বলছেন। আল গাজালি বলে একজন মুসলিম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সুফি সাধকদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দিব্য দর্শন কি রকম হয় এই ব্যাপারে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেখানে তিনি বলছেন, যাঁরা ধ্যান করেন তাঁরা প্রথমে যে জ্যোতি দর্শন করেন তখন দেখেন আলোটা ঘুরতে থাকে। শরীরের বোধটা চলে গেছে তখন নিজেকে আলোর মত দেখেন আর সেই আলোটাকে প্রথমে ঘুরতে দেখেন। তারপর দেখেন জোনাকির মত জ্বলছে নিবছে। তারপর এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র দেখেন। খ্রীশ্চান ধর্মের সাধকরাও ঠিক একই জিনিষ দর্শন করেন। হিন্দুধর্মে তো মোটামুটি সবারই এই একই দর্শন হন, কঠোপনিষদে পরিষ্কার বলছেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্রম্। জ্যোতিরিবাধূমকঃ*, শুভ্র জ্যোতির মত আর ওর মধ্যে কোন ধূয়োর ব্যাপার নেই, মণির আলো যেমন হয়। ঠাকুরও মণির আলোর মত বলছেন। মহাভারতে আবার জীবাত্মাকে নিয়ে আসা হয়েছে, এই জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা এই রকম অঙ্গুষ্ঠমাত্র হন না, তিনি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন। এখানে জীবাত্মার কথা বলা হচ্ছে। ঐ শুদ্ধ আত্মা যখন নিজেকে শরীর মনের সঙ্গে একাত্ম করে নেয় তখন মনে হয় যেন সেই আত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্রম্, এইটাই হল জীবাত্মা দর্শন। কিন্তু এই জীবাত্মার নিজস্ব কোন সত্তা নেই, এটা হল বন্ধনে পরে থাকা আত্মা। বন্ধন যখন কেটে যায় তখন এই জীবাত্মার আর আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকে না, সে তখন ঐ শুদ্ধাত্মার সাথে এক হয়ে যায়। আমরা যখন বলি অমুকের শরীর থেকে

আত্মা বেরিয়ে গেল, এই আত্মা শুদ্ধাত্মা নয়, জীবাত্মা। জন্ম-মৃত্যুর যে খেলা চলছে এটা এই জীবাত্মারই হয়। জীবাত্মা একটা শরীর ছেড়ে আরেকটা শরীরে চলে যাবে, সেখান থেকে আবার আরেকটা শরীরে চলে যাবে। জীবাত্মা যদিও আলোময় কিন্তু তার কর্মগুলি পাল্টাতে থাকে। এটা অনেকটা ঠিক আমাদের কম্প্যুটারের মত, হার্ডডিস্ক পাল্টায় না তার প্রোগ্রামগুলি পাল্টে যাচ্ছে।

যমরাজ যখন সত্যবানের শরীর থেকে এই জীবাত্মাকে টেনে বার করে নিয়েছেন তখন *ততঃ সমুদ্ধৃতপ্রাণং গতশ্বাসং হতপ্রভম্। নির্বিচেষ্টং শরীরং তদ্বভূবাপ্রিয়দর্শনম্।।*৩/২৯৬/১৮। সত্যবানের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, শরীরের কান্তি ফ্যাকাসে, শরীরটা নিশ্চেষ্ট হয়ে কাষ্ঠবৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। জীবাত্মা যতক্ষণ শরীরে থাকে ততক্ষণ শরীরটাকে এক রকম দেখায়, জীবাত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে শরীরটা অন্য রকম হয়ে যায়। অনেক ঋষি মুনিরা দেখেছেন এই শরীর থেকে জীবাত্মা কিভাবে বেরিয়ে আসে। ঠাকুরও যখন তাঁর ভ্রাতষ্পুত্র অক্ষয় মারা যায় তখন তিনি দেখলেন অক্ষয়ের জীবাত্মা কিভাবে তার শরীর থেকে বেরিয়ে এলো, যেন খাপ থেকে তরোয়ালটা বেরিয়ে এলো।

এরপরে কি হল? *যমস্তু তং ততো বদ্ধা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ।*৩/২৯৬/১৯। এটা হল আমাদের হিন্দুদের খুব প্রচলিত ধারণা, যম সব সময় দক্ষিণ দিকে গমন করেন। কথায় বলে যমের দক্ষিণ দুয়ার। কোথা থেকে এই ধারণা এসেছে আমাদের জানা নেই কারণ বেদ উপনিষদে এর কোন রকম উল্লেখ পাইনা। একটা হতে পারে নদীগুলো সব দক্ষিণমুখো হয়ে সমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যায়। যাই বলা হোক না কেন কোনটাই ঠিক ঠিক মনে হবে না। তবে এটা হিন্দুধর্মে সবারই বিশ্বাস যে যমের বাড়ি দক্ষিণ দিকে আর তিনি সবাইকে টেনে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যান। সেইজন্য মারা গেলে তার মাথা উত্তর দিকে রাখে আর মানুষ যখন ঘুমোয় তখন দক্ষিণ দিকে মাথা রাখে। যাই হোক যম এখন সত্যবানের জীবাত্মাকে বেঁধে নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করেছেন। সাবিত্রীও যমের সাথে সাথে চলতে শুরু করেছে।

যমরাজ তখন সাবত্রীকে বলছেন 'হে সাবিত্রী! তুমি গিয়ে এখন সত্যবানের দেহের অন্ত্যেষ্টি কার্য কর, তুমি অনেক দূর চলে এসেছ তোমার আর এভাবে আসা উচিত হবে না'। সাবিত্রী খুব মিষ্টি করে বলছেন *যত্র মে নীয়তে ভর্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি। ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।*৩/২৯৬/২১। স্বামী যেখানে যাচ্ছেন আমাকে তো সেইখানেই যেতে হবে আর এটাই তো সনাতন ধর্ম'। *তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্তুঃ স্নেহাদ্‌ব্রতেন চ। তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ।।*৩/২৯৬/২২। তপস্যা করে, গুরুর সেবা করে, স্বামীর সেবা করে, ব্রত পালন করে আর আপনাদের আশীর্বাদে আমার গতি কোথাও আটকাতে পারেনা'। সাবত্রীর এখন এমন ক্ষমতা এসে গেছে সে যেখানে যেতে ইচ্ছে করবে সেখানেই সে যেতে পারবে, সাবিত্রীকে আর আটকান যাবে না। তার জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণের কথা বলছেন। অবাধ গতি কিভাবে হচ্ছে? তপস্যার দ্বারা, গুরুর সেবার দ্বারা, স্বামীর সেবার দ্বারা এবং ব্রত পালনের দ্বারা আর যমরাজের স্তুতি করার জন্য বলছেন আপনার আশীর্বাদের দ্বারা। সাবিত্রী তাই বলছেন আমার গতিকে আটকান যায় না। সাবিত্রী তখন বলছেন *প্রাহুঃ সাপ্তপদং মৈত্রং বুধাস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ। মিত্রতাস্তু পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।।*৩/২৯৬/২৩। তত্ত্বার্থদর্শি বিদ্বান যাঁরা তাঁরা বলেছেন সাত পা এক সঙ্গে যার সাথে চলবে তার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়'। হিন্দু প্রথায় বিয়ের সময় তাই বর ও কনেকে সাতপাক দেওয়া হয়। সাবিত্রী বলছেন 'আমি আপনার সাথে অনেক পা চলে এসেছি এখন আমি আপনার বন্ধু, সেই বন্ধুত্বের জোরে আপনার কাছে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি'। এই কথা বলার পর সাবিত্রী ধর্মের ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলছেন *নানাত্মবন্তস্তু বনে চরন্তি ধর্মং চ বাসং চ পরিশ্রমং চ। বিজ্ঞানতো ধর্মমুদাহরন্তি তস্মাৎ সন্তো ধর্মমাহুঃ প্রধানম্।।*৩/২৯৬/২৪।'যে নিজের মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযম করেনি সে কখনই জঙ্গলে থেকে একান্ত বাস করে ধর্ম পালন, গুরুকুল বাস আর কৃচ্ছ সাধন রূপী তপস্যা এই তিনটে জিনিষ করতে পারেনা'। সাবিত্রী এখানে যেটা বললেন এটা আমাদের সব ভক্তদের খুব গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিৎ। আমরা কিছু হলেই মনে করি কয়েক দিন একটু নির্জনবাস করে আসব, কোন মঠে গিয়ে কদিন থাকব। কিন্তু কোনটাই আমরা করতে পারব না যতক্ষন আমাদের মন আর ইন্দ্রিয়কে সংযম না করতে পারি। বলছেন 'যাঁরা মহাত্মা সেইজন্য তাঁরা বলেন মন সংযমে এসে গেলে শুধু বিবেক বিচার দ্বারা ধর্ম প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য মহাপুরুষরা ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলেন'।

আরও কয়েকটা কথা সাবিত্রী বলার পর যমরাজ বলছেন *নিবর্ত তুষ্টোহস্মি তবানয়া গিরা স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া। বরং বৃণীষ্বেহ বিনাস্য জীবিতং দদানি তে সর্বমনিন্দিতে বরম্।*।৩/২৯৬/২৬। 'হে সাবিত্রী! তোমার যে কথার স্বর, অক্ষর, ব্যঞ্জনা আর কথার যে তাৎপর্য ও যুক্তি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও শ্রুতিমধুর। আমার খুব ভালো লাগল, তবে মা, তুমি এবার ফেরত যাও অনেক দূর চলে এসেছ। তোমার কথা দিয়ে আমাকে প্রসন্ন করেছ বলে তুমি একটি বর আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও'। তখন সাবত্রী বললেন 'আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব যেন ঘুচে যায় আর তিনি যে সাম্রাজ্য হারিয়েছেন সেই সাম্রাজ্য যেন তিনি ফিরে পান'। যমরাজ বললেন তাই হবে।

আবার সাবিত্রী যমরাজের পেছনে পেছনে চলেছেন দেখে যমরাজ বলছেন 'হে সাবিত্রী তোমার অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম হচ্ছে'। সাবিত্রী বলছেন 'স্বামীর কাছে থেকে আমার মত একজন পতিব্রতা স্ত্রীর কি করে ক্লান্তি বোধ হতে পারে! যেখানে আমার স্বামী সেখানেই আমার গতি নিশ্চিত। হে যমরাজ! আপনি আমার কয়েকটি কথা মন দিয়ে শুনুন। *সতাং সকৃৎ সঙ্গতমীপ্সিতং পরং ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে। ন চাফলং সৎ পুরুষেণ সঙ্গতং ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে।*।৩/২৯৬/৩০। যদি কারুর সৎ পুরুষের একবার মাত্র সঙ্গ হয়ে যায় তখন তার কাছে এটি অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর তাঁর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয়ে যায় তাহলে তো আর বলার কিছু নেই। সাধুপুরুষের সঙ্গ কখনই নিষ্ফল হয় না'। ঠাকুরও বলছেন ভালো লোকের সঙ্গ করলে কখন ক্ষতি হয় না। যমরাজ তখন বলছেন 'ওঃ সাবিত্রী! তুমি যে এত সুন্দর আর ভালো কথা বললে, সৎ পুরুষের সঙ্গ সবাই চায় কিন্তু সৎ পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব যে হবে এটা খুব কঠিন। খুব দামী কথা বললে, ঠিক আছে সত্যবানের জীবন ছাড়া তুমি আরেকটি বর চাও'। এর আগে সাবিত্রী বর নিয়েছিলেন আমার শ্বশুড় যেন দৃষ্টি আর সাম্রাজ্য ফিরে পান, এখন সাবিত্রী বর নিল আমার শ্বশুড়ের ধর্ম থেকে যেন কখন পতন না হয়। যম সেই বর দিয়ে দিলেন।

এরপরও সাবিত্রী কথা বলার জন্য কথা বলে যাচ্ছেন। তারমধ্যে একটা বলছেন *প্রজাস্ত্বয়েতা নিয়মেন সংযতা নিয়ম্য চৈতা নয়সে ন কাময়া। ততো যমত্বং তব দেব! বিশ্রুতং নিবোধ চেমাং গিরমীরিতাং ময়া।*।৩/২০৬/৩৪। 'হে দেব! আপনি এই সকল লোককে নিয়ম অনুসারে নিয়মন করেন এবং অন্তিমকালে আপনার ইচ্ছাতে নয়, এদেরই কর্ম অনুসারে নিয়ে যান। সেইজন্যই আপনি 'যম' নামে বিখ্যাত হয়েছেন'। যমরাজকে কেন যম বলা হয়? প্রত্যেকটা নামের একটা বিশেষ অর্থ হয়, যম শব্দটা সংযম থেকে এসেছে। সংযম কথার অর্থ হল যিনি নিয়ন্ত্রণে রাখেন, অষ্টাঙ্গ যোগে যেমন বলা হয় যম নিয়ম, যেটাকে পালন করা হয় সেটাকে বলছে সংযম, ইন্দ্রিয়াদি সংযম করা। সাবিত্রী বলছেন 'হে যমরাজ! জগতে যত প্রাণিকুল আছে যত জীব আছে সবাইকে আপনিই নিয়ন্ত্রণ করেন, আপনার নিয়মের মধ্যেই তারা সব কিছু করে। তাই আপনিই সবাইর নিয়মন করেন'। এখানে নিয়মন মানে বিধাতার মত যার যেটা প্রাপ্য আপনিই দেন। যখন তার মৃত্যু প্রাপ্য তখন তাকে মৃত্যু দিচ্ছেন, এই করেই আমরা সব কিছু পাই। রাবণ যখন বিশ্ব বিজয় করতে বেরিয়েছে তখন সব জয় করতে করতে যমলোকে ধাওয়া করেছে। যমলোকে আক্রমণ করতেই যমরাজ রাবণের উপর এতো রেগে গেছেন যে তিনি রাবণের উপর কালদণ্ড চালিয়ে দিয়েছেন। কালদণ্ড মানে যমরাজ যেটা দিয়ে সব কিছু নিয়মন করেন। এই কালদণ্ড চালালে কেউই বাঁচতে পারেনা। ব্রহ্মা তখন এসে যমরাজকে আটকেছেন 'হে যমরাজ! তুমি এই কালদণ্ড ফিরিয়ে নাও কারণ আমি রাবণকে বর দিয়ে রেখেছি কোন দেবতা তাকে হারাতে পারবে না'। এখানে একটা দ্বন্দ্ব এসে গেল, একদিকে রাবণকে বলা আছে তোমাকে কোন দেবতা হারাতে পারবে না আবার যমরাজকে ক্ষমতা দেওয়া আছে যখন তুমি কালদণ্ড চালাবে তখন কেউ বাঁচবে না। এখন ব্রহ্মা এসে যমরাজকে আটকে দিলেন, যমরাজও কালদণ্ড ফেরত নিয়ে নিলেন। কঠোপনিষদে বলছে *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ* – এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, ভয়ে সূর্য কিরণ বিকিরণ করেন, ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু এবং মৃত্যুও স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত হয়, নিয়ন্ত্রণকারী কেউ না থাকলে কোন কিছুই সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত ভাবে চলত না। এই যে মৃত্যুর দেবতা যমরাজ যিনি সব কিছুর নিয়মন করছেন সেটাও ভগবানের ইচ্ছাতেই করেন।

এই কথা বলার পর সাবিত্রী আবার বলছেন *অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা। অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ।*।৩/২৯৬/৩৫। মন, বাণী আর ক্রিয়া এই তিনটে দিয়ে কোন প্রাণির প্রতি দ্রোহ না করা, কোন হিংসা না করা, সবার প্রতি দয়ার ভাব রাখা, সবাইকে দান করা, এগুলোই হল সাধপুরুষের সনাতন ধর্ম। সাধুপুরুষের কি

কি লক্ষণ, লোকটি যে ভালো কি করে বুঝব? এর জন্য তিনটে লক্ষণের কথা সাবত্রী বলছেন – কোন প্রাণির প্রতি হিংসা না করা। হিংসা তিন ভাবে করা হয়, মন, বাণী আর ক্রিয়া। আমি চড় মারলাম না, কিন্তু রেগে বললাম 'এক চড় মারব'। আমি ভদ্র বাড়ির লোক, আমি মুখেও বললাম না কিন্তু মনে মনে বললাম 'এক চড় মারব'। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই তিনটেই সমান পাপ। দ্বিতীয় লক্ষণ হল সবারই প্রতি দয়ার ভাব, করুণার ভাব রাখা। আর তৃতীয় হল দান করা, যেটা আমরা একটু আগে মুদ্‌গল ঋষির ক্ষেত্রে দেখলাম, তিনি অতিথি সেবা করে যাচ্ছেন। এই তিনটে যদি কারুর মধ্যে থাকে অদ্রোহ, দয়া আর দান তিনিই একমাত্র সাধুপুরুষ। 'এই সন্ত মহাত্মারা সবারই উপর দয়া করেন আর সন্ত মহাত্মার যদি কেউ শরণাগত হয়ে যায় তখন তো তিনি তার উপর বিশেষ দয়া করেন'। সাবিত্রী বলতে চাইছেন, আপনি যমরাজ, আপনি হলেন সন্ত মহাত্মা আর আমি সাধারণ লোক, আমি আপনার উপর শরণাগত, তাই আমার উপর আপনি বিশেষ দয়া করবেন। সাবিত্রী শুধুই পতিব্রতা নারী নয়, তাঁর কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কত কিছু তাঁর জানা। সব কিছু মিলিয়ে তিনি সুন্দর ভাবে যমরাজের স্তুতি করে যাচ্ছেন আর খুব সযত্নে নিজের আবেদনটাও জানিয়ে দিচ্ছেন। সাবিত্রী সরাসরি কিছু বলছে না, খুব সুন্দর ভাবে গুছিয়ে বলছেন আপনি সংযমন করেন, আপনি সন্ত মহাত্মা, সন্ত মহাত্মারা সবারই প্রতি দয়ার ভাব রাখেন আর শরণাগত যারা তাদের উপর তো বিশেষ দয়া করেন। তখন যমরাজ খুব খুশি হয়ে কাব্যিক সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়ে বলছেন 'আহা শুভে! যারা প্রচণ্ড জল তৃষ্ণায় রয়েছে তারা জলপান করার পর যেমন শান্তি পায়, তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে ঠিক সেই রকম আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে, তোমার কথাগুলো এতই মিষ্টি। তা তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া যা চাও বল'। তখন সাবিত্রী বলছেন 'আমার বাবা অশ্বপতির সন্তান নেই, এমন করুন যাতে তাঁর একশটি নিজের সন্তান হয়'। যমরাজও বললেন 'ঠিক আছে তাই হবে'।

আবার সাবিত্রী যমরাজের পেছনে পেছনে হাঁটছে। তখন যমরাজ বলছেন 'হে সাবিত্রী! তোমার সবটাই হয়েছে, পৃথিবীলোক থেকে তুমি অনেক দূর চলে এসেছে এবার তুমি ফেরত যাও'। সাবিত্রী বলছেন 'আমি তো স্বামীর সঙ্গেই আছি, স্বামীর সঙ্গে থাকলে দূর কি করে হয়'। যমরাজ প্রথমে বললেন ক্লান্তি এখন বলছেন দূর। সাবিত্রী বলছেন 'দূর কখন হবে? যখন আমি স্বামীর কাছ থেকে দূরে আছি, যখন স্বামীর কাছে আছি তখন আর দূর কি করে হবে! পৃথিবীলোক তো আমার বাসস্থান নয় স্বামীই হলেন আমার চরম বাসস্থান'। এবারে সাবিত্রী যমরাজকে বলছেন 'আপনি হলেন বিবস্বান সূর্যপুত্র, সেইজন্য আপনাকে বৈবস্বত বলা হয়'। কঠোপনিষদে আছে '*হর বৈবস্বতোদকম্*' হে বৈবস্বত তুমি নচিকেতার জন্য জল নিয়ে যাও। বিবস্বানের পুত্র বলে যমরাজকে বলা হয় বৈবস্বত। সাবিত্রী বলছেন 'আপনি সবার সাথে ধর্ম পূর্বক আচরণ করেন কারুর সাথে কোন পক্ষপাত করেন না। সেইজন্য আপনার নাম ধর্মরাজ'। ভারতীয় পরম্পরাতে এটা খুব প্রাচীন প্রথা, যখন কারুর প্রশংসা করা হত তাঁকে একাধিক নাম দিয়ে দেওয়া হত। ঐ নামের আবার গুণের সাথে ব্যাখ্যা করে দিত। এখানে যমরাজের কয়েকটা নাম সাবিত্রী বলে যাচ্ছেন, ধর্মাত্মা, ধর্মরাজ, যমরাজ, বৈবস্বত। একেকটা নাম করে সেই নামের আবার বিশেষত্বকে বলে যাচ্ছেন। সাবিত্রী বলছেন 'আর কি বলব আপনাকে, আপনি তো ধর্মরাজ, মহাত্মা। মানুষ নিজের উপর ততটা বিশ্বাস করে না যতটা সাধু, সন্ন্যাসী, সন্তদের উপর বিশ্বাস করে সেইজন্য মানুষ সন্ত, মহাত্মাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে চায়'। এখানে সাধু সন্ন্যাসী সন্ত মানে শুধু গেরুয়াধারীকেই বোঝাচ্ছে না, যাঁর মন প্রাণ জাগতিক বস্তু থেকে সরে গিয়ে সম্পূর্ণ ঈশ্বরে গত হয়েছে। এরা আগে সাধু সন্তদের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল যিনি অদ্রোহ, দয়া আর দান এই তিনটেতে প্রতিষ্ঠিত তিনিই সন্ত মহাত্মা। মানুষ নিজের উপর ভরসা করে না কিন্তু এই সন্ত মহাত্মাদের উপর ভরসা করে। একই কথা যখন সাধারণ লোক বলে আর সেই কথাই যখন সাধু মহাত্মারা বলেন সেই কথার হাজার গুণ দাম হয়ে যায়। সেই কথা যদি ঠাকুর বলে থাকেন তখন সেটাই বেদবাক্য হয়ে যাবে। আমাকে যদি কোন বন্ধু বলে ভাই টাকা-পয়সা আর মেয়ে মানুষে বেশী মন দিতে নেই, তখন সেটা আমার কাছে বন্ধু বলেছে বলে শুনে গেলাম, খুব বেশী দাগ কাটবে না। এখন বেলুড় মঠের আমার কোন পরিচিত সন্ন্যাসী যদি বলে তখন সেটা আমার কাছে হাজার গুণ বেশী দামী হয়ে গেল। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে থাক, তখন ঐটাই বেদবাক্য হয়ে গেল। আমি পালন করি আর নাই করি সেইজন্য কিছু হবে না, কিন্তু এই নিয়ে আর কখনই কোন প্রশ্ন করা যাবে না যে সংসারে টাকা পয়সারও দরকার আছে ওসব কিছু বলা যাবে না, এটা বেদবাক্য। ঠিক এটাই সাবিত্রী বলছেন যে মানুষ নিজেকে যত না বিশ্বাস করে তার থেকে বেশী ভরসা করে সন্ত মহাত্মাদের।

মানুষ সব থেকে কাকে বেশী বিশ্বাস করে? সচরাচর যেটা দেখা যায়, এর ব্যতিক্রমও থাকতে পারে, মানুষ বেশী বিশ্বাস করে নিজের মাকে, বাবার থেকেও। কারণ মায়ের হৃদয় সন্তানের জন্য ছটফট করছে, সৌহার্দ্য এই ভাব থেকে। যে কোন লোকের হৃদয় যার জন্য বেশী ছটফট করে তার মানে তাকে বিশ্বাস করা যাবে। মায়ের মন সব সময় সন্তানের জন্য

ছটফট করছে, সৌহার্দ্য তার মধ্যে পূর্ণ হয়ে আছে ফলে মানুষ নিজের মাকে সব থেকে বেশী বিশ্বাস করে। বন্ধুকে মানুষ বিশ্বাস করে, বন্ধুর সাথে সৌহার্দ্য থাকে, সৌহার্দ্য আছে মানে প্রাণ ছটফট করছে। নিজের স্ত্রীর প্রতি যদি সৌহার্দ্য থাকে তখন নিজের স্ত্রীকে পুরো বিশ্বাস করে। সৌহার্দ্য যদি না থাকে তাহলে আর বিশ্বাস করা যাবে না। সাধু মহাত্মাদের কেন বেশী বিশ্বাস করে? কারণ তাঁদের হৃদয়ে সবারই প্রতি সৌহার্দ্য আছে। সাবিত্রী এইটাই বলছেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করি? কারণ আপনি মহাত্মা। মহাত্মা তাই আপনার হৃদয়ে সবারই প্রতি সৌহার্দ্য আছে। যমরাজ তখন বলছেন 'আহা! তুমি কি সুন্দর গভীর সব কথা বলছ, এত সুন্দর কথা আমি আজ পর্যন্ত কারুর মুখে শুনিনি। তা সত্যবানের প্রাণ ছাড়া আমার কাছে কোন একটা বর চেয়ে নাও'। সাবিত্রী তখন বলছেন 'আমাকে এই বর দিন যাতে আমার আর সত্যবানের সংযোগে একশটি বলপরাক্রম তেজস্বী ঔরসজাত পুত্র হয়'। ঔরস পুত্র মানে ঠিক ঠিক নিজের সন্তান। সাবত্রী অনেক কথা বলে যাচ্ছে বলে যমরাজের মনটা অন্য দিকে ঘুরে গিয়েছিল, সাবিত্রী কি বর চাইছে না বুঝেই বলে দিলেন তাই হবে মা। সাবিত্রী তখনও যমের সাথে সাথে চলেছেন। যমরাজও বলছেন মা তুমি এবার ফিরে যাও।

এইখানে এসে সাবিত্রী খুব সুন্দর বলছেন *সতাং সদা শাশ্বতধর্মবৃত্তিঃ সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে। সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোহস্তি সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবর্তন্তি সন্তঃ।।*৩/২৯৬/৪৭। 'সৎ পুরুষের বৃত্তি, মানে মন, সব সময় ধর্মে লেগে আছে। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ কখনই দুখী হয় না, ব্যথিত হয় না কারণ তাঁর মন সব সময় উচ্চ অবস্থায় বিরাজ করে। আর সৎ পুরুষের যদি সন্তের সঙ্গে মিলন হয় সেতো কখনই নিষ্ফল হবে না। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষরা কখনই সন্ত মহাত্মাদের ভয় পাননা। সাধারণ মানুষও যদি সন্ত মহাত্মার সঙ্গ করে সেটা নিষ্ফল হয় না আর শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যদি সন্ত মহাত্মাদের সঙ্গ করেন তখন নিষ্ফল হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। *সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি। সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্! সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ।।*৩/২৯৬/৪৮। বলছেন সত্য দিয়ে সঞ্চালন করেন। কাকে সঞ্চালন করেন? সূর্যকে। সন্ত মহাত্মাদের যে সত্যের শক্তি সেই শক্তিতে সূর্য চলছে। *সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি* – সন্ত মহাত্মারাই নিজেদের তপস্যার জোরে এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। *সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য*– সন্ত মহাত্মারা ভূত, ভবিষ্যত বর্তমানের আশ্রয়। *সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ*– সেইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষরা সন্ত মহাত্মাদের মাঝখানে গিয়ে কক্ষণ কষ্ট পেতে পারেনা। ঠিক এই কথাই শুক্রাচার্য নিজের ব্যাপারে দেবযানীকে বলেছিলেন – সূর্যের নিয়মন আমি করি, বৃষ্টি আমিই দিই। কারণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে যান। যা কিছু এই প্রকৃতিতে হচ্ছে তিনি জানেন এই সব কিছু আমার দ্বারাই হচ্ছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে* – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার থেকেই বেরিয়েছে, তাই এই সূর্য আমার শক্তিতে ঘুরছে, বৃষ্টি আমার শক্তিতে হচ্ছে, আমার শক্তি এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, এই দিন ও রাত আমারই শক্তিতে সম্ভব হচ্ছে। যিনি নিজেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন তিনি এই রকমই দেখেন। সাবিত্রী ঠিক এই কথাই বলছেন, নিজের নামে বলছেন না সন্ত মহাত্মাদের নামেই বলছেন।

সনাতন সদাচার, যেটাকে সত্যিকারের ধর্ম বলা হয়, সত্যিকারের আচরণ বলা হয় সেটা সৎ পুরুষদের দ্বারা পালিত হয়। সৎ পুরুষরা এইগুলো পালন করেন সেইজন্য একে সদাচার বলা হয়। সদাচার মানে সৎ আচার, যেটা সৎ পুরুষরা আচরণ করেন। এই সব শ্রেষ্ঠ পুরুষরা সব সময় পরোপকার করেন, অপরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে একান্ত ভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছেন আর অপরের দিকে কখনই স্বার্থের দৃষ্টিতে তাকান না। শ্রেষ্ঠ পুরুষরা জানেন তাঁর মধ্যে সব ক্ষমতা আছে তা সত্ত্বেও তিনি অপরের মঙ্গল করে বেড়ান, এটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। কক্ষণ কোথাও তাঁদের কোন স্বার্থ থাকে না। সৎ পুরুষ যে কথা বলে দেন সেটা কখনই বৃথা হয় না, আর তাতে কোন মানুষের স্বার্থের হানি হয় না, কারুর মান-সম্মান নষ্ট হয় না। তিনটে জিনিষ, প্রথম সৎ পুরুষের কৃপা কখনই বিফল হয় না, নিজের যে অর্থ তার কখনই হানি হয় না সৎ পুরুষের কাছে গিয়ে তার মান-সম্মান কখন নষ্ট হয় না। সাধু সেবায় যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেই অর্থ কখনই হানি হয় না, আর সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে যদি নিজেকে কেউ ছোট করে নেয় তার মান-সম্মানের কখনই হানি হবে না।

তখন যমরাজ বলছেন 'আরে একি তুমি বলছ! তোমার এই কথাগুলোর কি গভীর অর্থ আর তোমার বাণীগুলো কি সুন্দর। তুমি আমার কাছ থেকে একটা বর চেয়ে নাও'। তখন সাবিত্রী বলছেন 'হে যমরাজ! আপনিই তো আমাকে বর দিলেন সত্যবানের থেকে আমার সন্তান হবে। কিন্তু এই বর আমার আর সত্যবানের দাম্পত্য সংযোগ না হলে কি করে ফলপ্রসু হবে! আমি তো সত্যবানের ঔরসজাত সন্তানই চেয়েছি। আপনি যদি সত্যবানকে নিয়ে চলে যান তাহলে এই বর তো আর কার্যকরী হবে না'! সাবিত্রীর এই কথা শোনার পর যমরাজ খুব হাসতে শুরু করেছেন 'সাবিত্রী! আমি তোমার

বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, যাই হোক তুমি তোমার এই ধর্ম অর্থ যুক্ত বচনের দ্বারা আমাকে এমন সন্তুষ্ট করেছ যে আমি অভিভূত হয়ে গেছি। ঠিক আছে তুমি যাও সত্যবানের থেকেই তোমার সব কিছু সাফল্য হবে। এই আমি সত্যবানকে পাশমুক্ত করে দিলাম'। পাশমুক্ত করে দেওয়ার পর সাবিত্রী ফিরে এসে দেখছেন সত্যবান ঘুম থেকে যেন সদ্য উঠে এলেন। এরপর বাকিটা কাহিনী। সাবিত্রীর শ্বশুড়ের অন্ধত্ব ঘুচে গেছে আর সাম্রাজ্যও ফিরে পেয়েছেন আর অন্য দিকে বাবারও সন্তান হল। তারপর সবার দিন আনন্দে চলতে থাকল। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী বলার পর মার্কেণ্ডয় যুধিষ্ঠিরকে বলছেন 'ধৈর্য হারিয়ো না, ধৈর্য ধরে রাখো এই কষ্টের দিন একদিন শেষ হয়ে আবার তোমাদের ভালো দিন আসবে'।

ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচ গ্রহণ এবং কর্ণের শক্তি অস্ত্র লাভ

পাণ্ডবদের বনবাসের সময় ক্রমশ শেষের দিকে এগিয়ে আসছে। শেষের দিকেও অনেক কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে একটা কাহিনী হচ্ছে, অর্জুন হলেন ইন্দ্রপুত্র, ইন্দ্রের শক্তিতে তাঁর জন্ম। অর্জুন জানতেন কর্ণ একটা কবচ ধারণ করে জন্ম নিয়েছে। কবচ হল গণ্ডারের মত একটা শক্ত চামড়া কর্ণের শরীরের সাথে একেবারে সেঁটে ছিল, এই কবচ থাকার ফলে কোন অস্ত্রই কর্ণের শরীরকে ভেদ করতে পারবে না। ছোটবেলা থেকেই কর্ণ খুব দান করতেন। দানের মত পূণ্য আর কিছু নেই, সেইজন্য সব ধর্মই দানের উপর খুব জোর দিয়েছে। হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল যেমন গরীব, কাঙাল, দীন দুখীদের দান করতে বলা হয় ঠিক তেমনি যাঁরা সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ এঁদেরকেও দান করতে বলে। বলে ব্রাহ্মণদের যদি দান করা হয় সেই দানের ফল আরও ভালো পাওয়া যায়। কর্ণ ঠিক করে রেখেছিল কোন ব্রাহ্মণ যদি এসে তার কাছে কিছু চায় কর্ণ সেটা দিয়ে দেবেন।

অর্জুন যেমন ইন্দ্রপুত্র ঠিক তেমনি কর্ণ হল সূর্যপুত্র। দেবতাদের মানব সন্তান এর অর্থ ঠিক কি এখন বলা খুব মুশকিল। ঠাকুর কথামৃতে বলছেন – যারা বিষ্ণুর অংশে জন্ম নিলে ভক্তি হয় আর শিবের অংশে জন্ম নিলে জ্ঞানের ভাব বেশী থাকে। তার মানে যে কোন মানুষই যখন জন্ম নিচ্ছে তখন তার মধ্যে দৈবীশক্তির একটা বিশেষ অংশ থাকে। ঠাকুর একবার তাঁর কয়েকজন যুবক শিষ্যকে পাঠিয়েছেন ভিক্ষা করতে। এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা নিতে গিয়ে সেই বাড়ির গৃহিণী তাদের দেখে বলছেন 'তোমরা কত পূণ্যবান, তোমরা সবাই সূর্যপুত্র'। ঠাকুরের কাছে ফিরে আসার পর ঠাকুরকে এই কথা বলাতে ঠাকুর খুব খুশি হয়ে বলছেন 'ঠিকই বলেছে, তোরা সেই সূর্য থেকেই এসেছিস'। সূর্যকে ভারতে খুব উচ্চ দেবতা বলে দেখা হয়। এখন দেবতাদের অংশ মানুষের শরীরে কিভাবে থাকে এটা খুব একটা পরিষ্কার নেই। তবে আমরা এই ব্যাপারে প্রথম দুটো উল্লেখ পাই বাল্মীকি রামায়ণে। যেমন বলা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন বিষ্ণু দেবতার অংশ থেকে আর মহাবীর হনুমান হলেন বায়ু দেবতার অংশ থেকে, সেইজন্য তাঁকে বলা হয় পবনপুত্র। বায়ু দেবতা অঞ্জনীকে বলছেন 'আমি মনে মনে তোমার সঙ্গে সমাগম করলাম, তোমার যে সন্তান হবে তার মধ্যে আমার সব গুণই থাকবে'। এখন কর্ণ হলেন কুন্তিপুত্র, কুন্তি দুর্বাসা মুনির থেকে বর পেয়েছিলেন, সেই বরকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে সন্তান এসে গেছে, সেইখান থেকে কর্ণের জন্ম।

সবাই এখন বুঝতে পারছে যে পরিস্থিতি ক্রমশ যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে। অর্জুন ইন্দ্রের পুত্র তাই ইন্দ্র চাইছেন অর্জুন যাতে যুদ্ধে জেতে। কিন্তু কর্ণের শরীরে যে কবচ আছে সেটা যতক্ষণ থাকবে কর্ণকে কেউ বধ করতে পারবে না। তাই অর্জুনকে জেতাবার জন্য ইন্দ্র ঠিক করলেন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে কর্ণের থেকে ঐ কবচ চেয়ে নেবেন, কর্ণ ব্রাহ্মণদের কখন বিমুখ করবে না। কর্ণ আবার সূর্যপুত্র, তাই সূর্য এসে কর্ণকে স্বপ্নের মধ্যে সাবধান করে দিচ্ছেন 'কর্ণ! তুমি যে এই দান ধর্ম করছ এখন ইন্দ্র এসে কায়দা করে তোমার এই কবচ চেয়ে নেবে'। কবচ যদি চলে যায় তাহলে কর্ণকে পরাস্ত করার আর কোন ঝামেলা থাকবে না। কর্ণ তখন সূর্য দেবতাকে বলছেন *ভূয়শ্চ শিরসা যাচে প্রসাদ্য চ পুনঃ পুনঃ। ইতি ব্রবীমি তিগ্মাংশো! ত্বন্তু মে ক্ষন্তুমর্হসি।।৩/৩০২/৫*। 'আপনার চরণে মাথা রেখে আমি বার বার প্রণাম করছি। কিন্তু আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি তার জন্য আমি আগে থাকতেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি মৃত্যুকে ভয় পাইনা কিন্তু মিথ্যে কথা বলাকে ভয় পাই'। সব ধর্মেই সত্য কথা বলাকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। এখানে সত্য কথা বলা বলতে আমরা মনে করি আগে যেটা করা হয়েছে সেটার বর্ণনা যখন করা হচ্ছে সেটাকে ঠিক ঠিক যেমনটি হয়ে তেমনটি বলা। সত্য কথা শুধু এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আবার কথা যেমন দেওয়া হয়েছে সেটাকে রক্ষা করাও সত্য কথা বলা। কথার খেলাপ যদি করা হয় তাকে অসত্য ভাষণ বলা হয়। কর্ণ বলছেন 'আমি সঙ্কল্প করে রেখেছি কোন ব্রাহ্মণ এসে যদি ভিক্ষাতে আমার প্রাণও চায় তো আমি আমার প্রাণও দিয়ে দেব কারণ আমি মিথ্যা কথাকে

ভয় পাই। সেইজন্য আপনার কথা আমি রক্ষা করতে পারবো না, ইন্দ্র যদি ব্রাহ্মণ বেশে আসে তাহলে আমাকে দিতেই হবে। তবে আপনি যেটা আশঙ্কা করছেন সেই রকম আশঙ্কা করার কিছু নেই, কারণ আমার কবচ যদি চলেও যায় আমার কাছে যা অস্ত্রবল আছে আর পরশুরাম থেকে আমি ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান নিয়ে রেখেছি তাই অর্জুনকে আমি হারিয়ে দেব এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন'। সূর্য দেখলেন কর্ণকে তো তার সঙ্কল্প থেকে সরান খুবই মুশকিল তাই বলছেন 'তবে তুমি এক কাজ কর, ইন্দ্র যদি তোমার কবচ নিতে আসে তখন তুমি বলবে আমি আপনাকে আমার কবচ দিচ্ছি তার বদলে আপনি আপনার শক্তি অস্ত্র আমাকে দিন'। শক্তি অস্ত্র হল ইন্দ্রের একটা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্র। এই অস্ত্র যার উপর ছাড়া হবে তাকে বধ করবেই করবে, কোন ভাবেই সে আর বাঁচতে পারবে না। দেবতাদের সবারই এই ধরণের কিছু কিছু অমোঘ অস্ত্র থাকত। ঐ অস্ত্র মন্ত্র দিয়ে যার উপরেই চালাবে সে আর কোন ভাবেই বাঁচতে পারবে না।

যথারীতি ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে এসেছেন। এসে কর্ণের কাছে ভিক্ষা চেয়েছেন। কর্ণ বলছেন আপনি কি চাইছেন বলুন। আমি আপনার কবচটা চাই। শুনেই কর্ণ হাসতে শুরু করে দিয়েছেন। ইন্দ্রকে বলছেন 'আমি জানি আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, তা আপনার প্রার্থনা মত আমি অবশ্যই আমার কবচ দেব। কিন্তু দুটো জিনিষ, একটা হল আমি জানিনা যে এই কবচকে আমার শরীর থেকে কিভাবে আলাদা করা যাবে'। যে চামড়াকে কোন অস্ত্র ভেদ করতে পারছে না সেই জিনিষকে কাটবে কিভাবে? একটা কাহিনীতে আছে ইন্দ্র তখন বললেন 'তোমার জিভটাকে প্রথমে ফাঁক করে সেখানে থেকে চিরে নিয়ে এই কবচকে আলাদা করতে পার'। তখন কর্ণ বললেন 'আমর আসল চামড়াটা যেন সুস্থ থাকে আর তার বদলে আপনার শক্তি অস্ত্র আমাকে দিতে হবে'। ইন্দ্র তাতে রাজী হয়ে গেলেন। কর্ণের কবচটা নিয়ে শরীরটাকে সুস্থ করে দিলেন। ইন্দ্র কবচ নেওয়ার পর কর্ণের শরীরের সেই সুরক্ষটা চলে গেল কিন্তু তার বদলে তিনি শক্তি অস্ত্র পেয়ে গেলেন। ইন্দ্র বলে দিলেন এই অস্ত্র তুমি একবার মাত্র একজনের উপরেই চালাতে পারবে, দ্বিতীয়বার আর চালাতে পারবে না। কর্ণ এই শক্তি অস্ত্রকে অর্জুনের জন্য চিহ্নিত করে রেখে দিল, অর্জুনের সঙ্গে যেদিন যুদ্ধ হবে সেদিন এই অস্ত্র চালানো হবে, অর্জুনের উপরে চালালে অর্জুনের আর কোন পথ থাকবে না, মরতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাপারটা জানতেন বলে যুদ্ধের সময় যখন রথ চালাতেন তিনি কিছুতেই অর্জুনকে কর্ণের রথের সামনে নিয়ে যেতেন না। পরে একদিন ঘটোৎকচ এমন যুদ্ধ শুরু করেছিল যে সেদিনই যুদ্ধ প্রায় সমাপ্ত হয়ে বসেছিল, কৌরবরা একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। তখন দুর্যোধন এসে কর্ণকে বার বার বলতে শুরু করেছে তোমার শক্তিটা এই ঘটোৎকচের উপর লাগাও। কর্ণতো এই অস্ত্র অর্জুনের জন্য চিহ্নিত করে রেখেছিল। কর্ণও দুর্যোধনকে বলল এটা অর্জুনের জন্য রাখা আছে। দুর্যোধন তখন বলছে তার আগেই যদি আমরা সবাই মারা যাই তাহলে অর্জুনের জন্য রেখে কি হবে। শেষ পর্যন্ত কর্ণ বাধ্য হয়ে ঐ শক্তি ঘটোৎকচের উপর চালিয়ে দিয়েছিল। ঘটোৎকচ মারা গেল আর মাঝখান থেকে অর্জুন বেঁচে গেল। কর্ণের এই গণ্ডারের চামড়া ছিল আর তার জন্য যে কর্ণের বিশেষ সুবিধা ছিল সেই রকম বিবরণ আমরা কোথাও পাইনা। পরের দিকে মৃত্যুঞ্জয় নামে একটা খুব নামকরা উপন্যাস লেখা হয়েছিল, সেখানে লেখক বলছেন যখন গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছিল তখন গন্ধর্বরা যত তীর চালিয়েছে একটাও কর্ণের শরীরকে ভেদ করতে পারছিল না। গন্ধর্বরা তখন বুঝতে পেরেছে এর গায়ে সেই গণ্ডারের চামড়া, কোন অস্ত্রই এর শরীরকে ভেদ করবে না। তীর বা তলোয়ার কর্ণকে কোন আঘাত করতে পারবে না কিন্তু কর্ণ কখন হারবে না এই কথা কোথাও নেই। গন্ধর্বরাও তাকে হারিয়ে দিয়েছিল। গন্ধর্বরা বলল একে বেঁধে নাও। গন্ধর্বরাও তখন কর্ণকে ধরে বেঁধে নিয়েছিল। এই একটাই বর্ণনা পাওয়া যায়, এর বাইরে আর কোন কিছু পাওয়া যায় না।

যক্ষ ও যুধিষ্ঠির সংবাদ

পাণ্ডবরা একদিন সবাই বসে আছেন সেই সময় একটা হরিণ এসে ছুটোছুটি করতে গিয়ে শিংয়ের মধ্যে অরণি কাঠটা আটকে গেছে। অরণি কাঠ দিয়ে তখনপকার দিনে আগুন জ্বালান হত। সেই অরণি কাঠটা আটকে যেতেই হরিণও ছুটে পাণ্ডবদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। সবাই পেছনে পেছনে দৌড়ে গেছে, কিন্তু এত তীব্র বেগে হরিণটা দৌড়ে পালিয়েছে আর নাগালই পেল না। অনেকক্ষণ দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে একটা বৃক্ষের শীতল ছায়ায় পাঁচজন বিশ্রাম করছেন। হরিণের পেছনে ছুটে সবাই পরিশ্রান্ত আর তৃষ্ণার্ত। যুধিষ্ঠির নকুলকে বললেন গাছে উঠে দেখতে দূরে কোথাও জলাশয় দেখা যায় কিনা। নকুল জলাশয়ের সন্ধান পাওয়ার পর সেইদিকে এগিয়ে গেছে ভাইদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। জলাশয়ে নেমে জল খেতে গেছে তখন একটা যক্ষ এসে নকুলকে জল খাওয়া থেকে আটকেছে। যক্ষ বলছে 'এই জলাশয় আমার অধিকারে। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তারপর এই জলাশয়ের জল পান করবে, প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করলেই তুমি মারা যাবে'। নকুল এতই তৃষ্ণার্ত ছিল যে যক্ষের কথা তার কানেই গেল। জল খেতে গিয়ে নকুল ঐখানেই সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। নকুল ফিরে আসছে না দেখে চার ভাইরা খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। এরপর সহদেব গেল খোঁজ

করতে, সহদেবের পর অর্জুন, অর্জুনের পর ভীম আর সবারই একই পরিণতি হল। এরপর যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে ভাবছেন চার জনের কেউই ফিরছে না কেন। যুধিষ্ঠির তখন ভাইদের খুঁজতে খুঁজতে সেই জলাশয়ের কাছে এসে দেখছেন চার ভাই মরে পড়ে আছে।

যুধিষ্ঠির দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। ভাবছেন যে ভীম অর্জুন দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর সবাইকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে, তাদের এইভাবে কে বধ করতে পারে, অথচ শরীরের কোন শস্ত্রাঘাতের চিহ্ন মাত্র নেই। তবে কি এই জলে বিষ মেশানো আছে! তিনিও জলাশয়ে জল খাবেন বলে নেমেছেন। জলে যেই হাত দিতে যাবেন তখনই সেই যক্ষ এসে সাবধান করে দিয়ে বলছে 'আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এই জল পান করার দুঃসাহস তুমি করতে যেয়ো না, এই জলাশয়ের উপর আমার অধিকার'। তখন যুধিষ্ঠির চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন ধারে কাছে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না; যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করছেন 'আমি খুব বিনয়পূর্বক জিজ্ঞেস করছি আপনি কে? আপনি আমাকে দেখা দিন'। তখন যক্ষ বলছেন ***যক্ষোঽহমস্মি ভদ্রং তে নাস্মি পক্ষী জলেচরঃ। ময়ৈতে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরস্তে মহৌজসঃ।*** ।৩/৩১৩/৩৬। 'তোমার মঙ্গল হোক! আমি কোন পাখি নই আমি যক্ষ এবং আমিই তোমার এই মহাবলশালী বীর ভাইদের বধ করেছি'। ভারতে এবং ভারতের বাইরে যে কটি প্রাচীন ধর্ম আছে, জহুদিদের, গ্রীকদের, ভারতের যত প্রাচীন ধর্ম ছিল তাদের মধ্যে কিছু একই বিচিত্র ধরণের চিন্তা ভাবনা দেখা যায়। পৃথিবীর ভূমণ্ডলের উপরে যে আকাশ, এই আকাশকে এনারা অনেকগুলো স্তরে বিভাজন করে রেখেছিলেন, আর এনাদের একটা ধারণা ছিল যে বিভিন্ন ধরণের দিব্য প্রাণিরা আকাশের বিভিন্ন স্তরে বাস করেন। এই চিন্তা ভাবনার মধ্যে কতটা কল্পনা আর কতটা অনুভূতির ব্যাপার এটাকে জানার কোন পথ নেই। সবচেয়ে উপরের স্তরে আছেন সাক্ষাৎ ভগবান, তার নীচে অন্যান্য ধর্মে কখন এ্যঞ্জেল, কখন দেবদূত এই ধরণের দেবতারা আছেন বলা হয় যেটা আমাদের ইন্দ্র, মিত্র, বরুণকে বলা হয়। এদের সাথে অনেক সুন্দরী নারীরা থাকতেন যেটা আমাদের এখানে অপ্সরা বলা হয়। এরপরের স্তরে থাকেন গন্ধর্বরা, যাঁরা গান বাজনা করেন। এছাড়া আছেন বিদ্যাধররা, সিদ্ধরা, ঋষি মুনিরা যাঁরা তপস্যা করতেন তাঁদের সিদ্ধ বলা হত। দেবতাদের যে টাকা পয়সা থাকত তার দেখাশোনা করতেন যক্ষরা। যক্ষদের রাজা হলেন কুবের। আমাদের পৌরানিক কাহিনীতে বলে ভগবান বিষ্ণু যখন লক্ষ্মীকে বিয়ে করেছিলেন তখন লক্ষ্মীকে যে পণ দেওয়া হয়েছিল সেটা বিষ্ণু কুবেরের থেকে ধার করে দিয়েছিলেন। বলে তিরুপতিতে যে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির আছে সেখানে ভক্তরা যা প্রণামী দেয় সেই অর্থ কুবেরের কাছে ভগবানের যে দেনা থেকে গেছে সেটা শোধ হতে চলে যায়। এখনও সেই ধার শোধ হয়নি, ভগবানের বিয়ে বলে কথা, কত টাকা ধার করেছিলেন যে এখনও সেই টাকা শোধ হয়েই চলেছে।

যুধিষ্ঠির তখন দেখছেন গাছের উপর বিরাটাকৃতির একজন যক্ষ বসে আছেন আর সূর্যের সমান তেজস্বী। যক্ষ পরিষ্কার যুধিষ্ঠিরকে বলে দিলেন 'আমিই তোমার ভাইদের এই দুরবস্থা করেছি, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলপান করার দুঃসাহস করার জন্যই তাদের এই পরিণতি'। যুধিষ্ঠির বললেন ***যথাপ্রজ্ঞন্তু তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি পৃচ্ছ মাম্।*** ।৩/৩১৩/৪৪। 'আমার যত দূর বিদ্যা বুদ্ধি আছে সেই রকম ভাবেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব'। মহাভারতে এই যক্ষ প্রশ্ন খুব নামকরা অধ্যায়। এরমধ্যে নানা রকমের ধাঁধা, আমাদের লোককথার মধ্যে যে ধাঁধা গুলোর প্রচলন ছিল আবার অন্যান্য সংস্কৃতিতে যে ধাঁধা ছিল সব মিলিয়ে মিশিয়ে অনেক ধাঁধা রয়েছে, যেমন সকালে চার পায়ে চলে দুপুরে দু পায়ে বিকেলে তিন পায়ে চলে কোন প্রাণি। মানুষ শৈশবে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, যৌবনে দু পায়ে চলে, বৃদ্ধ বয়সে লাঠি নিয়ে চলে। ধাঁধার প্রচলন প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই চলে আসছে। ধাঁধা যেমন রয়েছে আবার কিছু ধর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন আছে আবার কিছু মনস্তাত্ত্বিক ধরণের প্রশ্ন। বিরাট লম্বা প্রশ্নের তালিকা, সব প্রশ্নের আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। আমরা কয়েকটি মূল প্রশ্নকে নিয়ে আলোচনা করছি।

যক্ষ প্রশ্ন করছেন সূর্যকে কে আকাশে রেখেছে? কে সূর্যকে উদয় আর অস্ত করায়? সূর্যের সঙ্গে চারিদিকে কে চলে? আর সে কিসে প্রতিষ্ঠিত? আমরা জানি এই বোতলটা এই টেবিলের উপর প্রতিষ্ঠিত, টেবিলটা আবার মেঝের উপর প্রতিষ্ঠিত, মেঝেটা পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পৃথিবীটা পড়ে যাচ্ছে না কেন? এ ধরণের প্রশ্ন আমাদের অনেকের মনেই ওঠে। যে কোন জিনিষ আকাশে ছুড়ে দিলে নীচে পড়ে যায়। কিন্তু সূর্যটা আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছে না কেন? আগেকার দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নানান রকমের এর উত্তর ছিল। এখন পদার্থ বিজ্ঞানে বলছে সব কিছুই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে চলছে, সব কিছুই সব কিছুর চারিদিকে ঘুরছে, ঘুরছে বলে পড়ে যাচ্ছে না। স্কুলের ক্লাশে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল এই

পৃথিবী পড়ে যাচ্ছে না কেন? একটি মেয়ে তার উত্তরে লিখছে পড়ে যাবেটা কোথায়? যুধিষ্ঠির এখন উত্তর দিচ্ছেন *ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়তি দেবাস্তস্যাভিতশ্চরাঃ। ধর্মশ্চাস্তং নয়ত্যেনং সত্যে চ প্রতিতিষ্ঠতি*।।৩/৩১৩/৪৬। 'যিনি ব্রহ্ম তিনি সূর্যকে ওপরে তোলেন মানে উদয় করান, দেবতারা সূর্যের চারিদিকে চলেন, ধর্ম সূর্যকে অস্ত করান আর সূর্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত'। যুধিষ্ঠিরের এই উত্তর অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য পূর্ণ। এই অধ্যায়ের কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তরের গভীরতা ও তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করতে পুরো একটা দিন লেগে যাবে। আমাদের উপনিষদেই আসে *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।* বলছেন ব্রহ্মের ভয়ে সূর্য তাপ বিকিরণ করছে, সূর্য উদয় হচ্ছে। ব্রহ্ম এখানে ঋতম্ রূপে আছেন। ঋতম্ হল মহাজাগতিক নিয়ম। মহাজাগতিক নিয়ম হল, যিনি ব্রহ্ম, যিনি ভগবান তিনি একটা নিয়ম করে দিয়েছেন। সূর্যকে এখানে ভগবান বা দেবতা রূপে নেওয়া হচ্ছে না, এখানে সূর্যকে স্থুল জাগতিক পদার্থ রূপেই নেওয়া হচ্ছে। সূর্য কেন তাপ দিচ্ছে, সূর্য কেন উদয় হচ্ছে, অস্ত যাচ্ছে? এটাই ব্রহ্মের আদেশ। ব্রহ্ম বা ভগবান বিষ্ণু সিংহাসনে বসে আদেশ করছেন এই ধরণের কোন কল্পনা আমাদের পরম্পরাতে নেই। আমরা সমাজে সবাই মিলে শান্তিতে সুস্থ ভাবে যাতে বাস করতে পারি তার জন্য কতকগুলি নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি এই মহাজাগতিক ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে, এটাকেই বলা হয় ঋতম্। উপনিষদের মন্ত্রে আছে *ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি*। ব্রহ্ম এই ঋতমের অনুসারে সূর্যকে ওপরে করেন। দেবতারা সূর্যের চারিদিকে চলে, দেবতা শব্দটা এসেছে দিব্ ধাতু থেকে। দিব্ মানে আলো, যাঁরাই আলোকিত প্রাণি তাঁরাই সূর্যের পাশে পাশে থাকবে। সেইজন্য দেবতারাই সূর্যের চারিদিকে থাকেন। আর অন্ধকারে কারা থাকে? দানব, অসুর এরা হল আলোর বিপরীত, তারা এই লোকে থাকে না, অন্য লোকে চলে যায়। সূর্যলোক হল আলোকপূর্ণ লোক সেইজন্য দেবতারাই এই লোকে থাকেন, কারণ দিব্ মানে আলো। আর বলছেন ধর্ম সূর্যকে অস্ত করায়, একই জিনিষ এখানেও। ব্রহ্মের যে ঋতম্ রূপ সেই রূপে সূর্যের উদয় হয় আবার ব্রহ্মেরই যে ধর্ম রূপ সেই ধর্মই সূর্যকে উদয় করায়। সূর্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তার অর্থ হচ্ছে সূর্যের যে গতি আছে সেই গতি থেকে সূর্য কখনই চ্যুত হবে না, সূর্য নিজের খেয়াল খুশি মত চলতে পারবে না, আজকে সকালে উদয় হল কাল সকালে উদয় হবে না, এই জিনিষ কখনই হবে না। আজকে বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা জানি মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে তাহলে এই এতক্ষণ যেটা বলা হল এই ধারণা কোথায় থাকবে? কোথাও যাবে না, যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আমাদের দিয়ে গেছেন সেটা হল জগতকে একভাবে দেখার একটা রূপ, জগতকে দেখার আরেকটা রূপ হল যেটা আমরা এখানে আলোচনা করছি। দুটোই ঠিক। আমি যদি মনে করি সূর্য স্থির আর পৃথিবী চারিদিকে ঘুরছে সেটাও ঠিক, আবার আমি যদি মনে করি পৃথিবী স্থির সূর্য চারিদিকে ঘুরছে সেটাও ঠিক আর যদি মনে করি সূর্য চারিদিকে ছুটছে আর তার পেছনে পৃথিবীও বোঁ বাঁ করে ছুটছে সেটাও ঠিক। কোনটাতেই কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যখন মনে করছি সূর্য স্থির আর পৃথিবী চারিদিকে ঘুরছে, এইভাবে দেখলে অন্যান্য যে গ্রহ নক্ষত্র আছে তাদের গতিবিধির হিসেব খুব সহজে বার করে নেওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীকে যদি স্থির করে দেওয়া হয় তাহলে হিসেবে অনেক গরমিল হয়ে যায়। এগুলো হল জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা। কিন্তু যখন ধর্মের দিক থেকে দেখা হয় তখন এগুলো কিভাবে চলছে দেখা হয়? ঈশ্বরের আদেশে চলে, ধর্মের কারণে অস্ত হয়, সত্যে প্রতিষ্ঠিত আর দেবতারা সূর্যের চারিদিকে চলে।

যক্ষ আবার প্রশ্ন করছেন মানুষ শ্রোত্রিয় কিভাবে হয়? শ্রোত্রিয় মানে যিনি বেদ অধ্যয়ণ করেছেন, সহজ কথায় যিনি সংস্কৃতবান। মহৎ কিভাবে হয়? দ্বিতীয় বাণ কিসে থেকে হয়? বুদ্ধি কিভাবে হয়? একটি শ্লোকে চারটে করে প্রশ্ন। যুধিষ্ঠির বলছেন, মানুষ যখন বেদ অধ্যয়ণ করেন তখন সে শ্রোত্রিয় হয়, ঠিক ঠিক সংস্কৃতি সম্পন্ন হওয়া যায় বেদ অধ্যয়ণের দ্বারা। তপস্যা করলে মহৎ পথ পায়। ধৈর্য থাকলে দ্বিতীয় বাণ হয়, দ্বিতীয় বাণ হল এক থেকে দুই হওয়া। যেমন আমি একা থাকি, একা থাকলে জীবনে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়। দুজন হলে শক্তি বেড়ে যায়। দ্বিতীয় কোথা থেকে পাবে? বলছেন ধৈর্য। যার ধৈর্য আছে সে যেন একটা বন্ধু পেয়ে গেল। কি রকম বন্ধু? চিরজীবনের বন্ধু, এইটাই হল দ্বিতীয় বাণ। ধৈর্য হল তার বিরাট বন্ধু, সে আর একা থাকল না। বুদ্ধিমান কিভাবে হয়? বৃদ্ধ সেবয়া, গুরুজনের সেবার দ্বারা মানুষ বুদ্ধিমান হয়। আমাদের পরম্পরাতে তাই বড়দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করা গুরুজনদের সেবা করার উপর প্রথম থেকেই প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বাসে ট্রেনে বৃদ্ধদের দেখলে নিজের বসার জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। বৃদ্ধ মানে গুরুজনদের সেবা না করলে বুদ্ধি আসে না। আগেকার দিনে গুরুরা, বড় বড় আচার্যরা শিষ্যদের বেশী শাস্ত্রাদি পড়াতে যেতেন না। গুরুরা নিজেদের আশ্রমে থাকতেন আর কেউ যখন শিষ্য হতে এল তখন তাকে সেবার কাজে লাগিয়ে দিতেন। গরুকে খাওয়ায়, গরুকে চড়াতে নিয়ে যাও, উঠোন ঝাড় দেওয়া, কাঠ নিয়ে আসা, জল আনা এই সব কাজ শিষ্যরা করতে থাকত। এই ভাবে কাজ করতে করতে গুরু মাঝে মাঝে একটি দুটি কথা শিষ্যকে বলে দিতেন। এই যে শিষ্য দিন রাত গুরুর আশ্রমে নিষ্ঠা নিয়ে সেবা করে যেত, এই সেবা করতে করতে শিষ্যের মনে একটা প্রস্তুতি

হয়ে যেত। গীতায় বলছেন – *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*। অর্জুনকে ভগবান বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে তোমাকে আগে গুরু বা আচার্যকে লম্বা প্রণাম করতে হবে আর সেবা করে আচার্যকে সন্তুষ্ট কর তারপর তিনি যেটা বলবেন সঙ্গে সঙ্গে সেটা তোমার উপলব্ধি হয়ে যাবে। বৃদ্ধজনের সেবা যতক্ষণ না করা হয় ততক্ষণ কিন্তু বুদ্ধির দরজা খুলবে না। যে কোন সমাজে যদি সিনিয়র সিটিজেনদের সম্মান করা না হয়, সেই সমাজে সংস্কৃতি কখনই উন্নত হয় না, সংস্কৃতি উন্নত না হওয়া মানে বুদ্ধি হয়নি।

যক্ষ প্রশ্ন করছেন – ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেবত্ব কি? সৎ পুরুষের ধর্ম কি? মনুষ্য ভাব কি? আর অসৎ পুরুষের আচরণ কি। মানে একজন ব্রাহ্মণকে আমি দেবতা বলে কেন জানব। যুধিষ্ঠির বলছেন *স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব। মরণং মানুষো ভাবঃ পরীবাদোহসতামিব।*।৩/৩১৩/৫০। ব্রাহ্মণরা যে বেদ অধ্যয়ণ করেছেন এটাই তাঁদের দেবত্ব। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা যে আট হাজার বছর ধরে শুধু বেদ মুখস্ত করে গেলেন ভাবলে অবাক লাগে। একেকটা বেদ মুখস্ত করার জন্য কম করে বারো বছর গুরুর বাড়িতে পড়ে থাকবে, আর শুধু মুখস্তই করে যাবে। আর কি খাওয়া দাওয়া করতেন? গুরুর বাড়িতে যা কিছু একটু পাওয়া গেল, বেশীর ভাগ দিন থাকত হবিষ্যান্ন, কোন ধরণের ভোগ বিলাস করতেন না। চটি জুতা পড়তে পারবেন না, ছাতা ব্যবহার করতে পারতেন না, দুটোর বেশী বস্ত্র রাখতে পারতেন না, কত রকমের নিয়ম ছিল আর খালি বেদ মুখস্ত করে যাচ্ছেন। এবার দেখা যাক, বেদ মুখস্ত করে তাঁর কি হবে? কোন চাকরি হবে না, একটি পয়সা পাবেন না, কিছুই পাবেন না। এই যে শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান আর তার জন্য এই কঠোর জীবন ভাবলেই আমাদের অবাক লাগে। কেবল মাত্র একটি কি দুটি প্রজন্ম ধরে করছেন না, সেই সাত আট হাজার আগে থেকে করে এসেছেন। লোকে যখন নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে যাচ্ছে তখন ভাবছে, বেদের পণ্ডিত ঠিকই কিন্তু আমার মেয়েকে খাওয়াবে কি করে! ঐ কবে কোথায় একটা যজ্ঞ হবে, পূজো হবে, শ্রাদ্ধ হবে প্রণামী পাবে আর সেই দিয়ে জীবন নির্বাহ করতে হবে। বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণদের এই অবস্থা ছিল। দেবত্ব ভাব না থাকলে এই ত্যাগ হয় না। মানুষের ক্ষমতাই নেই ত্যাগের ভাবকে নিয়ে আসা, ভেতরে দেবত্ব না থাকলে ত্যাগের ভাবকে ধরে রাখতে পারা যায় না। সেইজন্য মায়েদের যে সন্তানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, হিন্দুদের মধ্যে এই কারণেই মায়েদের এত সম্মান আর মায়ের পূজোকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। আর ব্রাহ্মণরা যে তপস্যা করেন এটাই হল সৎ পুরুষের ধর্ম। ব্রাহ্মণরা যে মারা যান এটাই মনুষ্য ধর্ম। প্রত্যেক মানুষকেই মরতে হবে ব্রাহ্মণরাও মরে। সাঁই বাবা এত চমৎকারিত্ব দেখিয়ে গেলেন, কত রকমের মানব সেবার কাজ করে গেলেন, কত বড় বড় হাসপাতাল, কলেজ কত কিছু করে গেলেন কিন্তু তাঁকেও মরতে হল। যিশুখ্রীষ্ট যাঁর নামেই একটা বিশাল ধর্ম সারা বিশ্বে চলছে তাঁকেও ক্রুশিফাইড হয়ে মরতে হল, মহম্মদকেও মরতে হল, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সবারই মৃত্যু হয়েছে। পৃথিবীতে যখনই কেউ আসে সে অবতার হয়ে আসুন, পয়গম্বর হয়ে আসুন, রাজা হয়ে আসুন মনুষ্য ধর্ম তাঁকে ধরবেই। মানুষের কোন ধর্মটা ধরে? এই মৃত্যু ধর্মটা। অসৎ পুরুষের আচরণ কি? যদি ব্রাহ্মণ কারুর নিন্দা করে তখন সেটাই অসৎ পুরুষের আচরণ। এই চারটে প্রশ্নের উত্তর হল – ব্রাহ্মণ যদি বেদ পড়ে থাকেন তিনি হলেন দেবতা, ব্রাহ্মণ যে তপস্যা করছে সেটা সৎ পুরুষের আচরণ, মৃত্যু হল মনুষ্য ধর্ম, ব্রাহ্মণ যদি কারুর নিন্দা করে তখন সেটা হল অসৎ পুরুষের আচরণ। কারণ বেদ অধ্যয়ণ, তপস্যা করে করে ব্রাহ্মণদের মানসিক গঠন এমন হয়ে যায় যে তাঁরা কখনই চুরি, ডাকাতি এগুলো করতে পারবে না কিন্তু অপরের নিন্দা করার প্রবণতাটা মানুষের মন থেকে সহজে যায় না, সেইজন্য এখানে বলা হল ব্রাহ্মণ যদি নিন্দা করে তখন সেটা অসৎ পুরুষের আচরণ।

এবার ক্ষত্রিয়েদের নিয়ে একই প্রশ্ন করছেন। বাণবিদ্যা হল ক্ষত্রিয়েদের দেবত্ব, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যে দেবত্ব সেটার প্রকাশ পায় বাণবিদ্যার দ্বারা। আর যজ্ঞ হল ক্ষত্রিয়েদের সৎ পুরুষের ধর্ম। ব্রাহ্মণদের সৎ পুরুষের ধর্ম বলেছিলেন তপস্যা, কারণ ব্রাহ্মণদের তো কোন সম্পদ নেই, যজ্ঞ করতে যে সামগ্রী লাগবে তার জোগাড় করার অর্থ নেই, দান যে করবে সেই সামর্থ ব্রাহ্মণদের নেই। ক্ষত্রিয় যে যজ্ঞ করে এটাই হল সৎ পুরুষের ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে ভয় আসে সেটাই তার মানবীয় ভাব। শরণাগতকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা না করা ক্ষত্রিয়ের অসৎ পুরুষের আচরণ। শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়াটাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। এতক্ষণ ব্রাহ্মণের কি কি কর্তব্য সেটা বলা হল, একজন ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করবে, তপস্যা করবে, আর এর বিরুদ্ধে যেটা করবে সেটাকে অসৎ বলা হচ্ছে। ক্ষত্রিয়দের যে আত্মশক্তি সেটা হল যুদ্ধ কৌশল তাই বাণবিদ্যাই তার দেবত্ব। শরণাগতকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, এটা যদি না কর তাহলে অসৎ পুরুষের আচরণ হয়ে গেল।

যক্ষ এরপর একটা প্রশ্ন করছেন এমন কোন্ পুরুষ যে বুদ্ধিমান, সমস্ত লোকে সম্মানিত, সমস্ত প্রাণির মাননীয়, নিঃশ্বাস নিচ্ছে অথচ সে কিন্তু ঠিক ঠিক জীবিত নয়? যুধিষ্ঠির উত্তর দিচ্ছেন *দেবতাথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ। ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ স ন জীবতি।*।৩/৩১৩/৫৮। যারা দেবতা, অতিথি, বরণীয় কুটুম্ব, পিতৃ আর আত্মা এই পাঁচ জনের পোষণ করে না, এরা নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু মৃত। এর আগে আমরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের আলোচনা করেছিলাম। প্রত্যেকটি হিন্দুকে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা বাধ্যতামূলক। হিন্দু ধর্মের সাথে অন্য যত ধর্ম আছে এদের মধ্যে উপাচারের দিক দিয়ে একটা বিরাট পার্থক্য এসে যায় এই পঞ্চ মহাযজ্ঞে। আমাদের এই শরীরটা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পাঁচ জন সব সময় সাহায্য করে যাচ্ছে। এই পাঁচ জন যদি সাহায্য না করে তাহলে শরীর এই মুহূর্তে নাশ হয়ে যাবে। প্রথম হল আমরা যে সংস্কৃতি পেয়েছি, যে সংস্কৃতির জন্য আজ আমরা সভ্য জাতি বলে গর্ব করছি, এই সংস্কৃতি পেয়েছি ঋষিদের জন্য, তা নাহলে আমরা জংলী পশুর মত বসবাস করতাম। দেবতারা বৃষ্টি দিচ্ছে, রোদ দিচ্ছেন, ঠিক সময়ে বৃক্ষে ফল ফুল দিচ্ছেন, ওষধি দিচ্ছেন বলে আমাদের জীবনটা চলছে। পিতৃপুরুষরা আমাদের জৈবিক পদার্থ দিয়ে এই শরীরটাকে দিয়েছেন, তা নাহলে এই শরীর হত না। আর আমাদের আশেপাশের মানুষ, প্রতিবেশীরা আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করছে, আপদে বিপদে পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, তা নাহলে চোর ডাকাত আমাদের শেষ করে দিত। আর শেষে আমরা যে মাছ খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি, চাল গম খাচ্ছি এই যে এত প্রাণ হানি হচ্ছে এই প্রাণ হানির জন্যই আমাদের শরীরটা চলছে। হিন্দুরা বলে এই পাঁচ জনের কাছে আমরা সব সময় ঋণী, এই ঋণটাকে আমাদের শোধ করে যেতে হবে। এই ঋণ শোধ করাটাকেই বলা হয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ। ঋষি যজ্ঞ হল নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করা। খ্রীশ্চানদের মধ্যে নিয়ম আছে রবিবার দিন চার্চে যাবে, সেখানে পাদ্রীর লেকচার শুনে নেয়, ওখানেই সারা সপ্তাহের ধর্ম পালন শেষ হয়ে গেল। মুসলমানদের প্রত্যেক দিন দিনে পাঁচবার করে নমাজ পড়তে হবে আর সময় থাকলে কোরান পড়তে থাকবে। এই যে নমাজ পড়া হচ্ছে বা কোরান পড়ছে এগুলো হল ভগবানের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক স্থাপন। ঋষযজ্ঞে তা বলা হচ্ছে না, ঋষিরা যে সংস্কৃতি তোমাকে দিয়েছেন সেটাকে তুমি ফেরত দাও। কিভাবে দেবে? নিয়মিত তুমি শাস্ত্র পাঠ করবে। কি শাস্ত্র পাঠ করবে সেটা এনারা বলেন না। উপনিষদ পড়তে পারে, গীতা পড়তে পারে, চণ্ডী পড়তে পারে, হনুমানচালিসা পড়তে পারে, রামচরিতমানস পড়তে পারে, ভাগবত পড়তে পারে, যে কোন শাস্ত্র, বা একাধিক শাস্ত্র নিয়মিত পাঠ করে যেতে হবে। এটাই হল ঋষিযজ্ঞ। তারপর দেবযজ্ঞ, এই যে যত দেবতারা আছেন, আমরা সব সাকার দেবতাকে এখনও মানি, শঙ্করাচার্য যিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী তিনিও এই দেবযজ্ঞের উপর জোর দিয়েছেন। দেবযজ্ঞ হল, যেখান নিয়মিত পূজো অর্চনা হচ্ছে সেখানে যাওয়া, রোজ স্নান করে বিগ্রহে ফুল চন্দন দেওয়া, গঙ্গাজল দেওয়া তারপর পূজো করা, জপ-ধ্যান করা, মালা জপা, মুসলমানদের মধ্যে মালা জপার প্রচলন আছে ওদের নিরানব্বুইটা আল্লার নাম নিয়ে মালা জপ করার কথা বলা আছে, হিন্দুদের ক্ষেত্রে মালাতে একশ আটবার ভগবানের নাম নিতে হয়, এগুলো সব দেবযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। এগুলো রোজ করে যেতে হয়। পিতৃযজ্ঞে খাওয়ার সময় আলাদা করে পিতৃদের উদ্দেশ্য একটু নৈবেদ্য আর জল দিয়ে পিতৃদের স্মরণ করা, আপনার জন্যই আজ আমি এই শরীর পেয়েছি। নৃযজ্ঞ হল অতিথিকে আদর আপ্যায়ন করে কিছু খাওয়ান। শেষে হল ভূতযজ্ঞ, যখন খাওয়া-দাওয়া করা হল তখন খাবারে একটু অংশ আলাদা করে রেখে দেওয়া, পরে কোন পশু, পাখি, গরু এদের খাইয়ে দেওয়া হয়। এই পাঁচটি একেবারে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেক দিন করে যেতে হয়। যুধিষ্ঠির বলছেন, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ যে করেনা, সে যতই বিদ্বান, পণ্ডিত, সম্মানিত হয়ে থাকুন সে একটা মৃত মানুষের মত।

যক্ষ প্রশ্ন করছেন পৃথিবী থেকে ভারী কে, আকাশ থেকে উঁচু কি, বাতাস থেকে বেগবান কে আর তৃণের থেকে সংখ্যায় কি বেশী? যুধিষ্ঠির বলছেন, মায়ের গৌরব পৃথিবী থেকেও বেশী ভারী, মানে যে কোন মানুষের জীবনে মায়ের স্থান পৃথিবী থেকেও ভারী। বাবা আকাশ থেকে উঁচু। বায়ুর থেকে মন বেশী বেগবান। মানুষের মনের চিন্তার সংখ্যা অসংখ্য। তৃণ বা সমুদ্রের বালি দেখে মনে হয় অসংখ্য কিন্তু মনের চিন্তা এদের থেকে অনেক বেশী।

যক্ষ আরেকটি প্রশ্ন করছেন, প্রবাসী, যে বিদেশে আছে তার বন্ধু কে আর যে বাড়িতে আছে তার বন্ধু কে? যে রোগী তার বন্ধু কে আর যে মুমূর্ষু তার বন্ধু কে? যুধিষ্ঠির বলছেন সহযাত্রী সমুদয়, ট্রেনে, বাসে, প্লেনে আমার সঙ্গে যাঁরা যাচ্ছেন এঁরাই আমার বন্ধু। স্ত্রী হল গৃহবাসীর ঠিক ঠিক মিত্র, স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন বন্ধু হয় না। রোগীর বন্ধু বৈদ্য আর মুমূর্ষু, অর্থাৎ যার মৃত্যুর সময় এসে গেছে তার বন্ধু হল দান। মানুষ যখন মৃত্যুর কাছে চলে আসে তখন জগতের কোন কিছুই আর তার কাজে লাগে না। তাই যা কিছু তার নিজের বলে ধরে রেখেছিল সেগুলো সব দান করে দিতে হয়, বলে দানটাই সঙ্গে যায়।

একা একা কে হাঁটে? একবার জন্ম নিয়ে কে আবার জন্ম নেয়? শীতের ওষুধ কি আর মহান ক্ষেত্র কোনটা? সূর্য একা একা চলে। চন্দ্রমা একবার জন্ম নিয়ে আবার জন্ম নেয়। আসলে চন্দ্রমা ষোলটা কলা হিসাবে বৃদ্ধি আর হ্রাস পায়। পূর্ণিমার পর যখন কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয় তখন চাঁদের ক্ষয় হতে থাকে, দেখে মনে হয় চন্দ্রমার ক্ষয় হচ্ছে, ক্ষয় হতে হতে মৃত্যু হয়ে গেল কিন্তু অমাবস্যার পর আবার জন্ম নেয়। ভাবলে অবাক লাগে আগেকার দিনের পুরুষরা বিজ্ঞানের এত কথাতো জানতেন না, কিন্তু আকাশের চাঁদের এই পরিবর্তনকে নিয়ে কি গভীর চিন্তা ভাবনা করতেন, চন্দ্রমা যেন মানুষের মত আকাশে এক সময় উঠল তারপর ক্ষয় হয়ে হয়ে মরে গেল। তারপরের দিন দেখল চন্দ্রমা নেই, তারপরের দিন দেখছে আবার চন্দ্রমা উঠেছে। শীতের ওষুধ হল আগুন। মহান ক্ষেত্র হল পৃথিবী, পৃথিবীর থেকে বড় ক্ষেত্র আর কিছু হয় না। ক্ষেত্রকে সব সময় পূণ্য ভূমির দৃষ্টিতে দেখা হয়, যেমন হরিদ্বার, গয়া এই জায়গাগুলো পূণ্য ক্ষেত্র, বলছেন পৃথিবীর থেকে আর বড় পূণ্য ক্ষেত্র হয় না।

এর পরের প্রশ্ন হল, মানুষের আত্মা কি? দেবতারা কাকে সখা বানিয়েছেন? মানুষের জীবনের আশ্রয় কি আর পরম আশ্রয় কি? মানবজীবনের উপর কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। যুধিষ্ঠির বলছেন *পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা। উপজীবনঞ্চ পর্জ্জন্যো দানমস্য পরায়ণয়ম্।।*৩/৩১৩/৭২। পুত্র বা সন্তান হল মানুষের আত্মা। শকুন্তলা দুষ্মন্তের সংলাপে শকুন্তলা এই কথাই বলেছিল। কারণ মানুষ নিজের স্ত্রীর মধ্যে প্রবেশ করে আবার নিজের সন্তান হয়ে জন্ম নেয়। স্ত্রীর থেকে নিজেই সন্তান হয়ে জন্ম নেয় বলে আমাদের পরম্পরাতে স্ত্রীকে মায়ের মত দেখতে বলা হয়। উপনিষদেও বলছে মম পুত্র মম আত্মা। এই ধারণাটা আমাদের খুবই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে যে, পুরুষ স্ত্রীর থেকে নিজেই সন্তান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। দেবতারা স্ত্রীকে সখা রূপে সৃষ্টি করেছেন। মেঘ হল মানুষের জীবনের আশ্রয়। মেঘ না হলে আমাদের জীবন চলবে না। কাশ্মীর থেকে গঙ্গাসাগর এই সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যাকা যেটা, এই অঞ্চলেই মহাভারত রচনা হয়েছে। এখানে যদিও অনেক নদী আছে, জলাশয় আছে কিন্তু এখানকার মানুষের জীবন পুরোপুরি নির্ভর করে থাকে মেঘের উপর, বৃষ্টি যদি না হয় তাহলে এখানকার জীবন শেষ। আর পরম আশ্রয় হল দান। কিন্তু গীতাতে গিয়েই এটা পাল্টে যাচ্ছে, সেখানে বলবে পরম আশ্রয় হলেন ভগবান। আসলে বেদের সময়ের যে যজ্ঞগুলো ছিল তার প্রভাব মহাভারতের সময়েও ভালোই ছিল তারই নিদর্শন এই ধাঁধা গুলোর মধ্যে দেখা যায়। যজ্ঞে দান করাটা খুব মাহাত্ম্যপূর্ণ ছিল। মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাসটাও ছিল আমি যে যজ্ঞ করছি, যা দান করছি এগুলোই আমার সঙ্গে যাবে। এই বিশ্বাসটা এখনও আমাদের মধ্যে থেকে গেছে, বাড়িতে যখন উপনয়ন, বিবাহ বা শ্রাদ্ধ হয় তখন দানের উপর খুব জোর দেওয়া হয়। কারণ জানে মানুষের সঙ্গে অন্য কিছুই যায় না, এই দানটাই সঙ্গে যায়। এখন যারা গরীব সাধারণ লোক তারা কোথা থেকে দান করবে! তাই তাদের বলা হয় ভগবানের নাম করে যাও। তাই বলছেন ভগবান হলেন পরম আশ্রয়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় যাদের ক্ষমতা আছে তাদেরকে বলা হয় তোমরা দান কর। শ্রীমা ঠিক এই কথাই সহজ করে বলে দিলেন 'যার আছে মাপো, যার নেই সে জপো'। দানের মত পূণ্য হয় না, তোমার যখন সাধ্য আছে তখন দান কর, আর তোমার যদি সাধ্য না থাকে তাহলে জপ কর, ভগবানের নাম কর।

এইভাবে যক্ষ একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর যুধিষ্ঠির তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। যক্ষের প্রশ্ন জগতে কোন্ ধর্ম প্রধান? কোন্ ধর্ম সর্বদা ফল উৎপাদন করে? কোন্ বস্তুকে সংযত করে মানুষ শোক পায় না? কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন *আনৃশংস্যং পরো ধর্মস্ত্রয়ীধর্মঃ সদাফলঃ। মনো যস্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন জীর্য্যতে।।*৩/৩১৩/৭৬। পৃথিবীলোকে দয়া হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বেদোক্ত কর্ম নিত্য ফল দেয়। শোক কে করেনা? বলছেন, মনকে যে সংযমে রেখেছে সে শোক করে না। যার মনে শোক আছে বুঝতে হবে তার মন বশে নেই। সৎ পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব কখনই নষ্ট হয় না। দুষ্ট লোক যারা, ছল চাতুরিতে ভরা যাদের মন, এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে যখন স্বার্থে আঘাত লাগে বা কাজ ফুরিয়ে গেলে এদের সঙ্গে সম্পর্কটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সৎ পুরুষের সাথে যদি পাঁচ মিনিটের জন্যও সঙ্গ করা হয় বা কথা বলা হয় তিনি কিন্তু সারা জীবন ঐটা মনে রাখেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সম্বন্ধে একটা ঘটনা আছে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। তিনি অফিসে বসে আছেন। এক সাহেব এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সাহেব মহারাজকে বলছেন আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল মনে আছে? একবারই মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলছেন 'আমরা একবার প্লেনে যাচ্ছিলাম তখন দেখা হয়েছিল তাই না'। সাহেব বলল 'ইয়েস'। তারপর মহারজ বলছেন 'আমরা অমুক জায়গায় যাচ্ছিলাম, তাই না'।

'ইয়েস'। এই ঘটনা প্রায় পনের ষোল বছর আগের। মহারাজ আবার বললেন 'অমুক সালে না'। সাহেবও বলছে 'রাইট'। বাইরের লোকেদের সন্ন্যাসীদের মনে রাখা খুব সহজ। সন্ন্যাসী সব সময় আলাদা বলে মনের মধ্যে একটা ছাপ পড়ে যায়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের পক্ষে সব লোককে মনে রাখা খুব কঠিন। কিন্তু স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী প্লেনে যাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এখন তো সেটা মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু সাহেব বলতেই তিনি কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করতে থাকলেন এই লোকটাকে আমি অনেক দিন দেখিনি, কিন্তু কোথায় এর সাথে দেখা হয়েছিল এই চিন্তা করতে করতে আস্তে আস্তে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলেন, অমুক জায়গায় প্লেনে যাচ্ছিলাম তখন আপনার সাথে দেখা হয়েছিল। সেই সাহেব তো অবাক হয়ে ভাবছেন আমাকে তিনি এখনও মনে রেখেছেন। এখানে মহাভারত বলছে সৎ পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে সেই বন্ধুত্ব কখনই নাশ হয় না, সেই বন্ধুত্ব যদি এক মুহূর্তের জন্যও হয় সেটাই চিরদিন থেকে যাবে।

এরপর বলছেন, মানুষ কোন বস্তু ত্যাগ করলে প্রিয় হয়? কোন জিনিষ ত্যাগ করলে শোক করে না? কোনটাকে ত্যাগ করলে অর্থবান হয়? আর কোনটাকে ত্যাগ করলে মানুষ সুখী হয়? এখানে শ্লোকটা হল *কিং নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি কিং নু হিত্বা ন শোচতি। কিং নু হিত্বার্থবান ভবতি কিং নু হিত্বা সুখী ভবেৎ।*।৩/৩১৩/৭৭। কি ত্যাগ করলে মানুষ সবার প্রিয় হয়? কি ত্যাগ করলে চিত্তে সন্তাপ হয় না? কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? এবং কি ত্যাগ করে মানুষ সুখী হয়? একটা ধাঁধাকে একটা শ্লোকের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এগুলো আমাদের কত পুরনো সংস্কৃতি। যুধিষ্ঠির উত্তরে বলছেন মান ত্যাগ করলে মানুষ প্রিয় হয়। মান মানে অহঙ্কারের ভাব, আমরা সব সময় নিজেকে মনে করি আমি একজন বিরাট কিছু কিন্তু এগুলো সবই মিথ্যা অহঙ্কার আমাদের, এই অহঙ্কারকে ত্যাগ করে দিলে মানুষ প্রিয় হয়। আমাদের এত অহঙ্কার যে সবাই আমাদের ভয় পায়। ক্রোধকে ত্যাগ করলে কেউ শোক করে না। আমাদের যখন কোন কিছু ত্যাগ করে দিতে হয় তখন সেটা চলে গেল বলে শোক হয়। কিন্তু ক্রোধকে ত্যাগ করার পর কেউ এই বলে হা হুতাশ করে না যে 'ইস্ আমার আগে কত ক্রোধ ছিল এখন সব ক্রোধ যে কোথায় চলে গেল'। ছেলের উপর বাবার রেগে রয়েছে, বাবার রাগের ভয়ে ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। এরপর বাবার রাগটা কমে গেল আর দু দিন পর ছেলে ফিরে এসেছে তখন বাবা এই বলে শোক করে না যে আমার ক্রোধটা চলে গেছে। কামনা বাসনা ত্যাগ করলে মানুষ অর্থবান হয়ে যায়। টাকার কামনাই মানুষকে দরিদ্র বোধ করায়। একজন সন্ন্যাসীও দরিদ্র আবার একজন ভিখারীও দরিদ্র, কিন্তু তফাৎ কোথায়? ভিখারি চায় যদি দুটো টাকা হয়, আর যে প্রকৃত সন্ন্যাসী তাঁকে কোটি টাকা দিলেও নেবে না। দারিদ্রের দিক থেকে দুজনে সমান কিন্তু অভাব বোধ থেকে দুজনেই দুই মেরুর। ফলে কামনা ত্যাগ করে দিলেই সে অর্থবান হয়ে গেল। লোভ ত্যাগ করে দিলে মানুষ সুখী হয়ে যায়। সমাজে যে এত অশান্তি, রাতে ঘুম হয় না, সব সময় হতাশা গ্রাস করে নিচ্ছে, খাওয়া হজম হয় না, আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে সবার মূলে এই লোভ। লোভের জন্য কেউই সুখী হতে পারছে না। এই চারটে জিনিষ, অহঙ্কার, ক্রোধ, কামনা আর লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত করে দিচ্ছে।

মানবজীবনের পর প্রশ্ন করছেন মৃত্যুকে নিয়ে। মানুষকে কখন বুঝবে যে সে মরে গেছে? এখানে বলতে চাইছেন যে জীবন্ত কিন্তু মৃতের মত। রাষ্ট্র কখন মরে যায়? শ্রাদ্ধকে কখন মৃত বলা হয়? এবং যজ্ঞকে কখন মৃত বলা হয়? এই চারটে জিনিষ – মানুষ, রাষ্ট্র, শ্রাদ্ধ আর যজ্ঞকে কখন মৃত বলা হয়। যুধিষ্ঠির উত্তর দিচ্ছেন – দরিদ্র মানুষ মৃত, দরিদ্র মানুষের দরিদ্র হয়ে বেঁচে থাকাকে বাঁচা বলা যায় না। রাজা বিহীন রাষ্ট্র মৃত। রাজা যদি না থাকে তখন কেউ কাউকে মানে না, মন্ত্রী সেনাপতিকে মানে না, সেনাপতি মন্ত্রীকে মানে না, সেনারা আমলাদের মানে না, আমলারা সেনাদের মানে না, পুরো অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলাতে দেশ উচ্ছন্নে চলে গিয়ে মৃত হয়ে যায়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেই শ্রাদ্ধ মৃত। শ্রাদ্ধের সময় পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রাখতে হয়। আর দান, দক্ষিণা যদি না থাকে তাহলে যজ্ঞ মৃত বলে গণ্য করা হয়। নচিকেতার বাবার যজ্ঞে ঠিক এই একই জিনিষ হয়েছিল। নচিকেতার বাবা যজ্ঞ করছেন কিন্তু দান দিতে চাইছেন না। তখনই নচিকেতা বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দান যদি না দেওয়া হয়, দক্ষিণা যদি ঠিক ঠিক না দেওয়া হয় তাহলে ঐ যজ্ঞটা নষ্ট হয়ে যায়।

তারপর বলছেন জ্ঞান কাকে বলে, শম মানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কাকে বলে, উত্তম দয়াটা কি আর সরলতা কাকে বলে? যুধিষ্ঠির বলছেন – পরমার্থ তত্ত্বের ঠিক ঠিক বোধই জ্ঞান। পরমার্থ তত্ত্ব বলতে বোঝায় ঈশ্বর জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। জ্ঞান একটাই, পরমার্থ তত্ত্বের ঠিক ঠিক বোধ। ঠাকুর বলছেন এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। একটাই বস্তু জানার মত, সেটা হল ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞানই জ্ঞান বাকি সব অজ্ঞান। মুসলমান রাজা

আলেকজেন্দ্রিয়া শহর আক্রমণ করে দখল করেছিলেন। ঐ শহরে খুব বিখ্যাত একটা লাইব্রেরি ছিল। রাজা বলছে এই লাইব্রেরিটাকে পুড়িয়ে দাও। সবাই বলছেন 'কি বলছেন! এই লাইব্রেরি খুব প্রাচীন লাইব্রেরি আর এতে বহু অমূল্য প্রাচীন সব পুস্তক রাখা আছে'। তখন রাজা বলছে 'এই বইগুলোতে যে কথাগুলো আছে সেগুলো কি কোরানে আছে? যদি কোরানে এর কথাগুলো থাকে তাহলে এই বইগুলো রাখার তো আর কোন দরকার নেই। আর কথা গুলি যদি কোরানে না থাকে তাহলে কোরানের বাইরের কথার কোন দাম নেই, তাই পুড়িয়ে দাও'। এরা হল ধর্মান্ধ, এদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। জার্মানের একটি বিখ্যাত ছোট শহর, শহরটি বিখ্যাত শুধু এই কারণে যে এখানে খুব নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জার্মানির একমাত্র এই একটি শহর যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডের বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়নি। এই একটি মাত্র শহর ছাড়া পুরো জার্মানিকে বোমা মেরে শেষ করে দিয়েছিল। বিদ্যাচর্চার প্রতি যাঁদের সম্মান থাকে তাঁরা কখনই এই রকম নৃশংস কাজ করবেন না। চিত্তের যে শান্তি হয় সেই অবস্থাকে বলা হয় শম। যোগশাস্ত্রে বলা হয় শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা। সেখানে ইন্দ্রিয় দমন করাকে বলা হয় শম। এখানে কিন্তু চিত্তকে শান্ত করাকে শম বলা হচ্ছে। সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া বলছেন – *দয়া সর্বসুখৈ ঈশিত্বম্*, যখন সর্ব প্রাণির সুখ চাইছে, সবারই মঙ্গল হোক, এই ভাব যখন ঠিক ঠিক হয় তখনই তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া বলা হয়। সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ, সবাই সুখী হোক এই ভাব আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হলে আসে না। সবাই নিজের প্রিয়জনের সব সময় মঙ্গলই চায়, প্রিয়জনের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থাকবে কিন্তু পাড়ার যে লোকটিকে নিয়ে অশান্তি চলছে তার প্রতি দুর্ভাব আসবে। এই মনোভাব আমাদের কিছুতেই যেতে চায় না, এটাই আপামর মানুষের দুর্বলতা। সেইজন্যই বলা হচ্ছে সবার সুখ হোক, সবার মঙ্গল হোক এই ভাব রাখা হল সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া। আর চিত্তের সমত্ব ভাবই হল সরলতা।

সাধু কে আর অসাধু কে? দুর্জয় শত্রু কে? আর অনন্ত ব্যাধি কি? সর্বভূত হিতঃ, যে সবারই ভালো চাইছে, যা করেন সবার ভালোর জন্যই করেন তিনিই সাধু। গীতাতে চার থেকে পাঁচবার এই কথা বলা হয়েছে সর্বভূতহিতে রতাঃ। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের একটা মৌলিক পার্থক্য এই সর্বভূতহিতে রতাঃতেই এসে ধরা পড়ে। হিন্দুধর্মে আর বৌদ্ধ ধর্মে বলবে, তুমি আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়েছ কি করে বুঝবে? এনারা একটাই লক্ষণের কথা বলছেন – সর্বভূতহিতে রতাঃ। তুমি যিশুর দেখা পেলে কি পেলে না, আল্লার ভালোবাসা তুমি পেয়েছ কি পাওনি সেটা তোমার নিজের ব্যাপার আমরা কি করে জানব, জানার কোন রাস্তাই নেই। কিন্তু ফলেন পরিচিয়তে, গাছটা কি গাছ কি করে বুঝবো? গাছের ফল দেখেই গাছকে চিনব। ঠিক তেমনি যিনি সাধু পুরুষ, যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, যিনি ভগবানকে ভালোবাসেন, সেই ভগবানকে আপনি আল্লাই বলুন, গড্ বলুন, বিষ্ণুই বলুন, সে যেই ভগবানই হোনা ন কেন, সেই ভগবানের প্রতি যদি ভালোবাসা আসে তাহলে তার একমাত্র লক্ষণ সর্বভূতহিতে রতাঃ, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সব সময় সমস্ত প্রাণির হিতের জন্য লেগে থাকেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মও তাই বলে, ভারতোদ্ভূত ধর্মের এইটাই বৈশিষ্ট্য। অসাধু কে? যার মধ্যে দয়া নেই, যে নির্দয়। নির্দয় এখানে সব অর্থেই আসছে, কাউকে গালাগাল দিয়ে দেওয়া, কটূ কথা বলা, অকারণে প্রাণি হিংসা করা। ক্রোধ হল মানুষের দুর্জয় শত্রু, ক্রোধকে জয় করা যায় না। কামনা বাসনাকেও জয় করা যায় কিন্তু ক্রোধকে জয় মানুষের সাধ্যের বাইরে। লোভ হল অনন্ত ব্যাধি। যার মধ্যে লোভ থাকে বুঝে নিতে হবে তাকে সে এক মহাব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যে ব্যাধিকে কখনই উপশম করা যায় না। একটা বাচ্চা যখন খেলনার জন্য কাঁদে তখন তাকে সেই খেলনাটা দিয়ে তাকে শান্ত করে দেওয়া যায় কিন্তু যার মধ্যে লোভ ঢুকে গেছে তাকে আর কোন দিন শান্ত করতে পারা যাবে না, যেটাই দেওয়া হবে তারপরে আরেকটার জন্য লোভ করবে।

যক্ষের এবার প্রশ্ন হল, স্থিরতা কি, ধৈর্য কি, পরম স্নান কি আর পরম দান কি? স্বধর্মে স্থিরতা – নিজের ধর্মে পুরোপুরি স্থিত হয়ে আছে এটাকে বলা হচ্ছে স্থিরতা। এখানে এই ধর্ম হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীশ্চান ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না। আমার স্বধর্ম বলতে আমি যেটা করব বলে ঠিক করে রেখেছি, বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে মানবধর্ম থেকে আমাকে যেটা করতে বলা হচ্ছে ঐটাতেই স্থির থাকাটাই স্থিরতা। যাই হয়ে যাক আমি আমার এই স্বধর্ম থেকে নড়ব না, যেমন বশিষ্টের কামধেনু নন্দিনীকে যখন বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা জোর করে নিয়ে যাচ্ছে তখন বশিষ্ঠ মুনি নন্দিনীকে বলছেন 'আমি কি করব মা! আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষমা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাই আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না'। স্বধর্মের এই হল স্বরূপ। এই স্বধর্মে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সেটাকেই বলা হয় স্থিরতা। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করাটা হল ধৈর্য। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের কাছাকাছি হলেই ইন্দ্রিয়গুলো ছটফট করতে থাকে, ইন্দ্রিয়ের এই ছটফটানিটাকে আটকে দেওয়াটাই হল ধৈর্য। মনের ময়লা ত্যাগ করাকে বলা হয় পরমস্নান। আর প্রাণির, ক্ষুদ্র পিঁপড়ে থেকে যে কোন বড় প্রাণীর জীবন রক্ষা করা হল পরম দান। আবার বলছেন ধর্মজ্ঞ পুরুষ, মানে যিনি ধর্মের মর্মটা জানে তাঁকেই বলা হয় পণ্ডিত। নাস্তিক কে? মুর্খই হল নাস্তিক, ঈশ্বরের কথা মানেনা

বিশ্বাস করেনা এরাই হল মুর্খ। কামনা বাসনা কি? সংসারে যে মানুষ ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে এটাই কামনা বাসনা। মৎসর কি? মৎসর মানে হিংসা। যুধিষ্ঠির বলছেন হৃদয়ের জ্বালাটাই মৎসর। অপরের ভালো কিছু দেখলে মনে একটা জ্বালা আসে, এটাকে বলছেন মৎসর।

এরপর যক্ষ প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা বল, এই ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটে পরস্পর বিরোধী, এই তিনটে একসঙ্গে কি করে হতে পারে? আমি একদিকে কামনা বাসনাতে জড়িয়ে আছি আবার বলছি ধর্ম করব আর টাকাও সঞ্চয় করব, এই তিনটে এক সঙ্গে হয় না। যুধিষ্ঠির বলছেন, ধর্ম আর নিজের ভার্যা এই দুটো যখন নিজের বশে এসে যায় তখন ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এসে যায়। আরব দেশে অনেক আগে লোকেরা একটা করে বিয়ে করত আর কদিন পরেই ছেড়ে দিত, এই ভাবে যত খুশি বিয়ে করে যেত। অন্য দিকে সেবিকা হিসেবে অনেকগুলো মেয়েকে রেখে দিত। মহম্মদ এসে দেখলেন এই ভাবে একটা সমাজ চলতে পারেনা, তাই উনি এটাকে বেঁধে দিলেন 'তুমি চারটে বিয়ে পর্যন্ত করতে পারো এর বেশী বিয়ে করতে পারবে না'। এরপর একটা মজার নিয়ম করে দিলেন যে তুমি যত খুশি হারেম মানে সেবিকা রাখতে পার। ঔরঙ্গজেবের পর ভারতে যত মুসলমান রাজারা ছিল এদের যত বেগমরা ছিল তাদের থেকে রাজার কোন সন্তান হত না, বেশীর ভাগই সন্তান হত এই সেবিকাদের থেকে। কারণ এদের সন্তানরা সিংহাসনের জন্য কামড়াকামড়ি করতে পারতো না, রানীদের সন্তানরাই সিংহাসনের জন্য দাবী করত। ভারতে ইসলাম সাম্রাজ্যের যে পতন হল পুরোপুরি এই কারণে। ধর্ম পথে থাকতে পারল না বলে পতন হয়ে গেল। ধর্ম মতে যে নারীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা হয়েছে সেই স্ত্রী যদি ধর্ম পথে চলছে এই রকম স্বামীর কথা মত চলে তাহলে ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটে এক সঙ্গে চলবে। এখন স্ত্রী যদি স্বামীর কথা মত না চলে তাহলে স্বামী অন্য নারীর পেছনে ছুটতে থাকবে, তখন তার ধর্ম আর কামটা গোল্লায় চলে যাবে। আবার স্ত্রী যদি ধর্ম মতে না চলে আর স্বামীর বশে না থাকে স্ত্রী অধর্মের পথে গিয়ে কুলটা হয়ে যাবে। তাই ধর্ম, অর্থ আর কামের সামঞ্জস্য নির্ভর করে একমাত্র গৃহিণীর উপরে। ধর্ম, অর্থ আর কাম এমনিতে তিন দিকে যায়, কখনই এক থাকে না, একমাত্র এক থাকে যদি ভার্যা ঠিক থাকে। এটা শুধু হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে না, যে কোন ধর্মে, ইহুদি হোক, পার্সি হোক, জহুদি হোক স্ত্রী যদি ঠিক না থাকে এই তিনটে এক সঙ্গে চলবে না।

আবার ব্রাহ্মণের ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন, ব্রাহ্মণত্ব কিভাবে আসে? যক্ষ চারটে জিনিষ বলে দিচ্ছেন কুল থেকে মানে বংশ থেকে, আচার থেকে, স্বাধ্যায় থেকে আর শাস্ত্র শ্রবণ থেকে। এই চারটের মধ্যে কোনটা থেকে ব্রাহ্মণত্ব আসে? যুধিষ্ঠির একেবারে দৃঢ় ভাবে বলছেন ব্রাহ্মণত্ব হয় একমাত্র আচার থেকে। সে যতই ভালো বংশে জন্ম নিক, প্রচুর স্বাধ্যায় করুক আর স্বাধ্যায় না করতে পারলে প্রচুর শাস্ত্র শ্রবণ করে থাকুক যদি আচরণে সদাচার না থাকে তাকে কোন ভাবেই ব্রাহ্মণ বলা যাবে না। উপনিষদে সত্যকামের কাহিনী আছে। সত্যকামের ইচ্ছে হল শাস্ত্র অধ্যয়ণ করবে। গুরুর কাছে যাবে বলে ঠিক করেছে, যাওয়ার আগে তার মা জাবালিকে জিজ্ঞেস করছে 'আমার বংশের কি পরিচয়, আমি কোন বংশের'? মা জাবালি বলছেন 'আমার কম বয়সে তোমার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তখন তোমার বাবাকে বংশের কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি, তাই আমার জানা নেই, তবে তুমি গুরুকে বলবে আমি জাবালি বংশের'। গুরুর কাছে যাওয়ার পর গুরু জিজ্ঞেস করেছেন তোমার বংশ পরিচয় কি, তখন সত্যকামকে মা যেভাবে বলতে বলেছে সেইভাবেই বলছে 'আমার মা বলেছেন তাঁর অনেক ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে বাবাকে বংশের কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি তাই মা বংশের পরিচয় জানেন না কিন্তু আমাকে বলে দিয়েছেন বলতে আমি জাবালি বংশের'। তখন গুরু বলছেন 'ব্রাহ্মণ সন্তান ছাড়া এইভাবে সত্য কথা বলার ক্ষমতা কারুর হবে না, তুমি অবশ্যই ব্রাহ্মণ, আজ থেকে তোমার না সত্যকাম'। গুরুই শিষ্যের নামকরণ করে দিলেন। পরে এই সত্যকামই বিরাট বড় ঋষি হয়েছিলেন। এই আচারই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়, সত্যমাক এই যে সত্য বলে দিল আমার মা জানেনা আমি কোন বংশের। এই কথার দু রকম অর্থ হতে পারে, একটা হতে পারে জাবালির আদৌ কোন বিবাহ হয়নি, হয়তো বিয়ে হয়ে থাকতে পারে কিন্তু বংশ পরিচয় জানা ছিল না। বংশ পরিচয় না জানাটা আগেকার দিনে হিন্দু সমাজে বিরাট কলঙ্কের ব্যাপার ছিল। সত্যকাম কলঙ্কের কোন ভয় না করে সত্য কথা বলে দিল আমার তো কোন বংশ পরিচয় নেই। সুপ্ত ব্রাহ্মণত্ব ভেতরে না থাকলে এই রকম সত্য কথা বলা যায় না। যুধিষ্ঠির এই উত্তরের প্রসঙ্গকে টেনে নিয়ে বলছেন যারা শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে যায়, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করায়, শাস্ত্র বিচারই করতে থাকে এরা সবাই ব্যসনী। ব্যসনী ব্যসন থেকে আসছে, ব্যসন মানে নেশা। মানুষ যেমন অনেক কিছুর নেশা করে, এগুলোও নেশার মত হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক ঠিক পণ্ডিত হচ্ছে যে নিজের কর্তব্য পালন করে। শাস্ত্র অধ্যয়ণ যখন আচরণে লাগান হয় তখনই সে ঠিক ঠিক ব্রাহ্মণ।

তারপরে আবার চারটে প্রশ্ন, সুখী কে? আশ্চর্য কি? পথ কি? আর বার্তা কি? সুখী কে? *পঞ্চমেহহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে। অনৃণি চা প্রবাসী চ স বারিচর! মোদতে।*।৩/৩১৩/১১৫। যুধিষ্ঠির সুখীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটে শর্তের কথা বলছেন। ১) যার উপর কোন ঋণ নেই। ২) যে নিজের বাড়িতে আছে। ৩) যে বাড়িরই শাক পাতা রান্না খায়। আমি বিদেশে গিয়ে যদি ভালো খাবার দাবারও পাই তাও আমি সুখী হব না, মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে ভালো খাবার দাবার পাই তাও কখনই সুখী হব না। নিজের বাড়িতে থেকে, দেনা মুক্ত হয়ে যদি শাক পাতাও খাই তাহলেও আমি সুখী। আশ্চর্য কি? *অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।*।৩/৩১৩/১১৬। নিত্য প্রতিদিন মানুষ এই জগতে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে দেখেও যারা বেঁচে আছে তারা ভাবে আমি যেন বেঁচে থাকি, এইটাই আশ্চর্য। আমরা যদি দিনে একবার অন্তত ভাবি যে আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে আছি, আর কিছুক্ষণ পরেই আমার শেষ নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যাবে, তখন নিজেরই অবাক লাগবে আমি এই দুনিয়ায় কি করে বেড়াচ্ছি! আসলে মানুষ কখনই কল্পনা করতে পারে না যে সে কখন মরতে পারে। এটাই সত্যিকারের আশ্চর্য। কোন মানুষই নিজের ভেতরে নিজের মৃত্যুর ভাব আনতে পারেনা। মার্গ কি? *বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।*।৩/৩১৩/১১৭। ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ় তাই মহাপুরুষেরা যে পথ দিয়ে গেছেন সেটাই পথ। ভারতে ঋষি তো একজন ছিলেন না, কত ঋষিরা এসেছিলেন। খ্রীশ্চান ধর্ম একমাত্র যিশুর উপরেই দাঁড়িয়েছে, ইসলামে হলেন মহম্মদ, এদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যখন বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয় তখন তো একজন ঋষি থাকছেন না। কে ঠিক ছিলেন, যিশু না মহম্মদ বা আমাদের এত এত ঋষিরা। কিন্তু এইভাবে কখনই বলা যায় না কে ঠিক ছিলেন। আমি যাকে গ্রহণ করেছি, আমি যাঁকে মহাপুরুষ বলে মনে করছি, তিনি যে পথ দিয়ে গেছেন সেই পথ অনুসরণ করাটাই হল ধর্ম। একটা ধর্ম কখনই হতে পারেনা, একটি ধর্মগ্রন্থ কখনই হতে পারেনা, একজন ঋষি কখনই হতে পারেন না। সেইজন্য বলছেন মহাপুরুষরা যে পথ দিয়ে গেছেন সেটাই ঠিক পথ। যখনই মনে কোন সংশয় বা দ্বন্দ্ব আসবে তখন দেখতে হবে এই পরিস্থিতিতে মহাপুরুষরা কি করেছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে যে এত এত কাহিনী ছড়িয়ে আছে তাতে ঠিক এই জিনিষটাই দেখানো হয়, মহাপুরুষদের দ্বন্দ্ব যখন এসেছিল তখন তাঁরা কি করেছিলেন।

বার্তা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন *অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন। মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।*।৩/৩১৩/১১৮। মহা মোহ রূপী কড়াইয়ে কাল সমস্ত প্রাণিকে মাস ও ঋতু রূপী হাতা খুন্তি দিয়ে সূর্য রূপ অগ্নিতে আর রাত ও দিন রূপী ইন্ধন দিয়ে রান্না করছে, এটাই খবর। কাল হল সবার উপরে, সেই কাল সমস্ত প্রাণিকে মাছের মত ভাজছে। কিসে ভাজছে? মহা মোহ রূপী কড়াইয়ে, সমস্ত মানুষ মোহের মধ্যে পড়ে আছে। এই মোহটাই হল কড়াই। আর যে হাতা খুন্তি দিয়ে মাছকে উল্টে পাল্টে ভাজা হচ্ছে সেটা হল মাস আর ঋতু। অগ্নি কোনটা? সূর্য হল অগ্নি, সূর্যই কালকে চালাচ্ছে। ইন্ধনটা কি? রাত আর দিন।

যুধিষ্ঠিরের সব উত্তর শুনে যক্ষ খুব খুশি হয়ে গিয়েছে। বলছেন 'তুমি যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছ এই জন্য আমি তোমার এক ভাইয়ের জীবন ফিরিয়ে দেব। তুমি চারজনের যে কোন একজনকে নিয়ে যেতে পার। বল তুমি কাকে চাইছ'? যুধিষ্ঠির তখন বলল আমার ভাই নকুলের জীবন ফিরিয়ে দিন'। যক্ষ তখন যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে বলছেন 'আরে! তোমার রাজ্য চলে গেছে, তুমি অর্জুনকে চাও বা ভীমকে চাও'। যুধিষ্ঠির বলছেন 'আমার পিতা পাণ্ডুর দুই স্ত্রী, কুন্তি আর মাদ্রী। আমি দুজনকেই সমান দেখি। আমি যদি ভীম বা অর্জুনকে চেয়ে নিই তাহলে আমার মা কুন্তিই পুত্রবতী থেকে যাবেন কিন্তু মাদ্রীর কোন পুত্রই থাকবে না। সেইজন্য মাদ্রীরও যদি এক সন্তান থেকে যায় তাহলে দুজনই পুত্রবতী থেকে যাবেন। আমি থেকে গেলাম কুন্তির তরফ থেকে আর নকুল মাদ্রীর তরফ থেকে জীবিত থাকবে'। তখন যক্ষ বলছেন 'আমি সব দিক বিচার করে দেখলাম তুমিই হলে ঠিক ঠিক ধর্মজ্ঞ'। এতক্ষণ যক্ষ যে প্রশ্ন গুলো করে গেছেন, যদিও আমরা সব প্রশ্নকে নিয়ে আলোচনা করিনি, কিন্তু বেশীর ভাগই উল্লেখ করা হয়েছে। এই যে এত কথা এগুলোকে সব সময় মাথায় বসিয়ে রাখা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা ধর্মপ্রাণ মানুষ তাঁদের জীবনের দর্শন এমন হয়ে যায় যে, স্বাভাবিক ভাবেই এই জিনিষগুলো মাথায় থাকে। উত্তর হয়তো একই রকম হবে না, কিন্তু ভাবটা পাল্টাবে না, ভাব একই থাকবে। সেইজন্য এই ধরণের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের খুব সম্মান করা হত। এঁদের যে কোন প্রশ্ন করলে উত্তর হয়তো আলাদা দেবেন কিন্তু ভাবটা কখন পাল্টাবে না। যুধিষ্ঠিরের যে এই ভাব, আমার মায়ের এক সন্তান আমি বেঁচে রইলাম, আমার সৎ মা মাদ্রীরও এক সন্তান বেঁচে থাকুক।

যক্ষ তখন খুশি হয়ে বললেন 'তোমার সব ভাইরাই বেঁচে উঠবে'। যক্ষ এবার নিজের পরিচয় দিচ্ছেন 'আসলে আমি হলাম ধর্মরাজ, আমি ধর্মকে নিয়মন করি, আমি তোমার পরীক্ষা নিতে এসেছিলাম'। যমরাজ তখন পাণ্ডবদের বললেন 'তোমরা ধৈর্য রাখ, যুদ্ধে তোমরাই জয়ী হবে'। এরপর তিনি অনেক আশীর্বাদ করার পর বিদায় নিলেন। এখানে এসে পাণ্ডবদের বারো বছরের বনবাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে বনপর্বও শেষ হয়ে গেল। এরপর শুরু হবে বিরাটপর্ব। বিরাটপর্বে এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময় রাজা বিরাটের রাজ্যে যা কিছু হয়েছে তার বর্ণনা।